The Life Divine Vol. 1
SRI AUROBINDO

দিব্য-জীবন

১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড
(পূর্বার্দ্ধ)

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
পণ্ডিচেরী

দিব্য-জীবন

The Life Divine

প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (পূর্বার্ধ)

শ্রীঅরবিন্দ
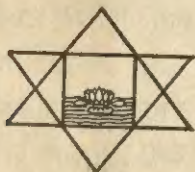
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পাণ্ডিচেরী-২
১৯৭০

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী-২

অনুবাদক : অনির্বাণ

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ২২০০ : ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭০

Fourth Five-year Plan--Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of West Bengal.

Price :

মূল্য

3.00

মুদ্রাকর শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র
নালন্দা প্রেস : কলিকাতা-৬

উপায়ন

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্
গভীরবেপা অসুরঃ সুনীথঃ।
ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্চিকেত
কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান॥

—ঋক্‌সংহিতা ১।৩৫।৩

কিরণ-কমল—দলে-দলে তার
কত-যে জগৎ উঠিছে ফুটি,
কাঁপিছে গভীরে প্রাণের নিঝর—
নিতেছে হেলায় বাঁধন টুটি।
এখনি ছিল যে উজলি গগন,
মিলালো কোথায় জানে কি কেউ—
কোন্ সে নবীন দ্যুলোকের 'পরে
ছড়াল তাহার আলোর ঢেউ!

—অনির্বাণ

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড (পূর্বার্ধ)

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্ম ও জগৎ

শ্রীঅরবিন্দ

নচিকেতার অভীপ্সা

পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী ॥
কিয়াত্যা যৎ সময়া ভবাতি যা ব্যূষুর্যাশ্চ নূনং ব্যুচ্ছান্।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষমন্যাভিরেতি ॥

ঋগ্· ১।১১৩।৮,১০

ওপারের বুকে মিলিয়ে যান যে-উষারা, তাঁদেরই লক্ষ্য ধরে চলেছেন—ওই যে আসেন যাঁরা সেই শাশ্বতীদের প্রথমা এই উষা ; বিচ্ছুরিতা হলেন তিনি —বেঁচে আছে যা তাকে ফুটিয়ে তুলে উপরপানে, মরে ছিল যে-কেউ আবার তাকে জাগিয়ে দিয়ে।...কতদূর ছড়ান তিনি যখন মিলিয়ে দেন অতীতের উষাদের তাঁদের সাথে, এখনই ফুটবেন যাঁরা ঝলমলিয়ে? প্রাক্তনী উষাদের তরে ব্যাকুলা তিনি, তেমনি করেই ভরে তোলেন তাদের আলো; প্র-চ্ছুরিত ক'রে তাঁর দিব্যবিভা, জড়িয়ে ধরেন নিবিড় করে সেই উষাদের আজও যাঁরা অনাগতা।

—কুৎস আঙ্গিরস—ঋগ্বেদ (১।১১৩।৮, ১০)

ত্রিরস্য তা পরমা সন্তি সত্যা স্পার্হা দেবস্য জনিমান্যগ্নেঃ।
অনন্তে অন্তঃ পরিবীত আগাচ্ছুচিঃ শুক্রো অর্যো রোরুচানঃ ॥
যো মর্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা দেবো দেবেষ্বরতির্নিধায়ি।
হোতা যজিষ্ঠো মহ্না শুচধ্যৈ হব্যৈরগ্নির্মনুষ ঈরয়ধ্যৈ ॥
উর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যান্যগ্নে।

ঋগ্· ৪।১।৭; ৪।২।১ ; ৪।৪।৫

অগ্নিরূপে এই বিশ্বে আছেন যে-দেববীর্য, তিনটি পর্বে ঘটে তাঁর সেই পরম আবির্ভাব সত্য তারা, বরেণ্য তারা; অনন্তেরই অন্তরেতে আপনাকে মেলে দিয়ে চলেন তিনি—শুচি শুভ্র দীপ্তরুচি, সব-কিছুকে ভরে তোলেন।... মর্ত্যের মধ্যে অমৃত যিনি ঋতের আধার, আমাদের চিৎশক্তিরাজির গভীরে প্রতিষ্ঠিত দেবতা তিনি তাদেরই উৎসারণের প্রেতিরূপে।...উৎশিখ হও হে তপোবীর্য—বিদ্ধ-বিদীর্ণ কর সব আবরণ—আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোল দেবত্বের বিভূতি যত।

—বামদেব—ঋগ্বেদ (৪।১।৭;৪।২।১; ৪।৪।৫)

কোন্ ধূসর অতীতে প্রবুদ্ধমনের প্রথম কিরণসম্পাতেই মানুষের মধ্যে জেগেছে এক লোকোত্তর এষণা—দিব্য-স্বরূপের এক অস্ফুট আভাস তার মধ্যে এনেছে পূর্ণতার প্রেতি। তাকে ছুটিয়েছে নিখাদ সত্যের অনির্বাণ আনন্দদীপ্তির সন্ধানে, অমৃতত্বের নিগূঢ় চেতনায় আকুল করেছে তার অন্তর। যুগযুগান্তের ধারা বেয়ে চলেছে তার অবিশ্রাম এষণা; তার আদি নাই। বুঝি-বা অন্তও নাই; সংশয়ের নাস্তিকতার দীর্ঘতম অমানিশার পরেও জীবনের প্রাচীমূলে বারবার দেখা দিয়েছে তার অরুণ-লেখা—মানবের প্রাচীন ইতিহাস তার সাক্ষী। আর আজ বহিঃপ্রকৃতির ঐশ্বর্যের বিপুল দানে যখন ভরে

উঠেছে মানুষের অঞ্জলি, তখনও তার প্রাণের গহনে কোথায় বেজেছে এক অতৃপ্ত হাহাকার, আবার সেই চিরন্তনী আকুতিতে এই প্রমত্ত বিত্তৈষণার মধ্যেও তাকে করে তুলেছে উন্মনা। আলো চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই, চাই অমৃতত্বের অধিকার, চাই দিব্যজীবনের ভাস্বর মহিমা—এই অভীপ্সা নিয়ে যেমন মানুষের যাত্রা শুরু, তেমনি এর চরিতার্থতাতেই তার ইতি। এর চেয়ে বৃহত্তর কামনা তার মনেরও অগোচর।

মানুষের মধ্যে এই যে অজর এষণা, ব্যাবহারিক জীবনের বাস্তবতায় তার কোনও সায় নাই। তবুও এরই মধ্যে রয়েছে তার অতিপ্রাকৃত জীবনের এক অন্তর্গূঢ় লোকোত্তর অনুভবের নিশানা, যার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে—হয় ব্যক্তির উজান-বওয়ার তপস্যায়, নয়তো বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের ছন্দে। অহমিকাক্লিষ্ট প্রাকৃত-চেতনার এই আধারেই দিব্য-পুরুষের বিজ্ঞান বীর্য ও সত্তাকে মূর্ত করে তোলা, এই জড়ীয় মনের প্রদোষচ্ছায়াকে অতিমানসের জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে উদ্ভাস্বর করা, আধি-ব্যাধির বেদনাবিধুর প্রাণের ক্ষণিক তর্পণের ক্লিষ্টতার 'পরে নিয়ে আসা স্বত-উৎসারিত শান্তি ও আনন্দের জোয়ার, এই জগতের আপাত-প্রতীয়মান নিয়তিকৃত-নিয়মের মধ্যে জাগিয়ে তোলা অকুণ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের প্রমুক্ত উল্লাস, এই নশ্বর মৃত্যুচ্ছায়া-কবলিত দেহের মধ্যেই অমৃতের নিরন্ত নির্ঝর আবিষ্কার করে দেবতার সোমপাত্রে একে রূপান্তরিত করা—এমনি করে জড়ের মধ্যেই পরমদেবতার দিব্য রূপায়ণ, এই তো পার্থিব-পরিণামের চরম নিয়তি। প্রাকৃত জড়বুদ্ধি জানে, চেতনার বর্তমান সংস্থানই চিৎপরিণামের শেষ পর্ব। তার মতে, আদর্শবাদ যে মিথ্যা, কল্পিত আদর্শের সঙ্গে অনুভূত বাস্তবের প্রত্যক্ষ বিরোধ তার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু আরও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তথাকথিত এই বিরোধ মহাপ্রকৃতির অনভিপ্রেত তো নয়ই, বরং একে আশ্রয় করেই ঘটছে তার সিসৃক্ষার অনুপম সার্থকতা।

কারণ, জীবনের সকল সমস্যাই স্বরূপত সৌষম্যসাধনার সমস্যা। স্পষ্টই অনুভব করছি, কোথায় যেন বেসুর বাজছে, তারই অন্তরালে পাই সুরের প্রচ্ছন্ন আভাস; তাকে ধরতে পারি না বলে সুরসঙ্গতির সাধনা বারবার হয়ে যায় ব্যর্থ এবং তাতেই জীবন হয়ে ওঠে কত-না সমস্যায় জটিল। মানুষের মধ্যে যেখানে ব্যাবহারিক অথবা জান্তব দিকটা ফুটেছে শুধু, বেসুর বজায় রেখেও সেখানে দিন চলে যেতে পারে—জীবনসমস্যার প্রতি অন্ধ থেকে অথবা কোনরকম জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ-চলা-গোছের একটা আপোসরফা দাঁড় করিয়ে। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে সোয়াস্তি তার নাই। কেননা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে ছন্দঃ-সুষমার প্রতি একটা আকুতি। সে-আকুতি যেমন আছে প্রাণ ও জড়ের জগতে, তেমনি

আছে মনের জগতে—অনুভবের সংগতিসাধনার স্বাভাবিক প্রচেষ্টায়। প্রকৃতির মধ্যে দেখি, তার বহুবিচিত্র সাধনসামগ্রীর মধ্যে বিশৃংখলা ও অসামঞ্জস্য যতই প্রবল হয়ে ওঠে, বিরোধ যতই মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, তাকে জয় করবার প্রেতিও হয় ততই প্রবল এবং তারই ফলে অনৃতের পরাভবে জাগে ঋতের এমন সূক্ষ্ম অপরাজেয় ছন্দোবীর্য, সাধনা অনায়াস হলে যার আবির্ভাব সম্ভব হত না কোনমতেই। বিরোধের সমাধান প্রকৃতি কতভাবেই না করছে। প্রাণের দুর্দম প্রবৃত্তি রূপায়িত হতে চায় জড়ের মধ্যে, যে-জড়ের সকল প্রবৃত্তি আপাত-অসাড়তায় পর্যবসিত। কিন্তু স্পন্দ ও অসাড়তার এই বিরোধের সমাধান প্রকৃতি করেছে জীবদেহে এবং সে-সমাধানের উৎকর্ষসাধনাই হল তার বর্তমানের তপস্যা। চরম সিদ্ধি তার ঘটবে, যেদিন মনোময় জীবের অন্নময় কোশ হবে অমৃতের স্বরূপাবিভূতি। দেহ এবং প্রাণ স্পষ্টত আত্মসচেতন নয়, তাদের মধ্যে বড়জোর দেখা দেয় অবচেতনার একটা যান্ত্রিক প্রবৃত্তি। অথচ এদিকে চিত্তে ও সংকল্পে চেতনার প্রকাশ সুস্পষ্ট। এ-দুটি বিরুদ্ধ উপাদানের একত্র সমাবেশ ও সংগতিসাধনা প্রকৃতির আর-এক বিস্ময়কর কীর্তি। এক্ষেত্রেও তার তপস্যার ইতি হয়নি আজও। সে-তপস্যার চরম চমৎকার হবে, এই জৈবচেতনাতেই সত্য ও জ্যোতির নিরূঢ় সিদ্ধিতে সকল এষণার চরিতার্থতা এবং অপরোক্ষ বিজ্ঞানসিদ্ধির ফলে এই ব্যবহারের জগতেই মহেশ্বরের অকুণ্ঠ ঈশনার আবির্ভাব। অতএব বিচিত্র দ্বন্দ্বসমাধানের ক্রমিক উৎকর্ষ-সাধনার প্রয়াস অযৌক্তিক তো নয়ই মানুষের পক্ষে, বরং মনে হয় এই তার নিয়তি—কেননা প্রকৃতির সকল তপস্যার মূলে রয়েছে এই দ্বন্দ্বসমাধানের প্রেতি।

আমরা জড়ের প্রাণে পরিণাম অথবা মনে পরিণামের কথা বলি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পরিণামবাদ ঘটনাপরম্পরার একটা বিবরণ মাত্র, ব্যাখ্যা তো নয়। জড়ভূতের মধ্যে কেন প্রাণ জাগবে, কেনই-বা প্রাণিদেহে জাগবে মন, তার কোনও হেতু খুঁজে পাই না যদি না বেদান্তের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বলি, প্রাণ জড়ের মধ্যে এবং মন প্রাণের মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে ছিল বলেই এমনি করে বিবৃত্ত হতে পেরেছে। স্বরূপত জড় প্রাণের একটি কঞ্চুক মাত্র, এবং প্রাণও চেতনার তা-ই। এই ধারা ধরে একটু এগিয়ে গেলে একথাও স্বীকার করতে আপত্তি থাকে না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের মনশ্চেতনাও কোনও লোকোত্তর অমনীভাবের একটা কঞ্চুক বা বিভূতি মাত্র। তাহলে, মানুষের মধ্যে এই যে দিব্যভাবের এষণা, আলো আনন্দ স্বাতন্ত্র্য ও অমৃতত্বের জন্য এই যে দুর্দম আকূতি, এরও একটা হেতু পাওয়া যায়। বোঝা যায়, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে যে প্রচেতনার প্রেতি, যা ফুটতে চাইছে মনেরও পরে, মানুষের মধ্যে সে-ই জ্বালিয়েছে এই নচিকেতার অভীপ্সা। এ তো অসংগত বা অবাস্তব কিছু নয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে জড়ের একটা বিশিষ্ট সংস্থানে যেমন

দেখা দিয়েছে প্রাণের আকূতি, আবার প্রাণের একটা বিশিষ্ট সংস্থানে জেগেছে মনের আকূতি, তেমনি মনোময় পরিণামেরও বিশিষ্ট একটা পর্বে একান্ত সহজভাবেই দেখা দেবে এই চিন্ময়ী আকূতি। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি—আধারে-আধারে এই প্রেতি কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও-বা বিস্পষ্ট হলেও সবার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে অপরাজেয় সিদ্ধির একটা উপচীয়মান সংবেগ। এখানেও প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের বিরাম নাই, সাধনসম্পদের পরিপূর্ণ সঞ্চয়ে এখানেও আধারকে দিব্যভাবের বাহন করে তুলবেই সে একদিন। ধাতুখন্ড বা উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণের অতিসূক্ষ্ম সাড়ায় সূচিত হয় মনের যে-আভাস, সে যেমন পর্বে-পর্বে তরঙ্গায়িত হয়ে অবশেষে মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে পরিপূর্ণ মহিমায়, তেমনি মানুষের নিজের মধ্যেও আছে এক উত্তরায়ণের প্রবৃত্তি—দিব্যজীবনের দিকে, তার বর্তমান জীবন যার প্রবেশক মাত্র। পশুর প্রাণের বীক্ষণাগারে প্রকৃতি যদি মানুষ গড়ে থাকে যুগযুগান্তের সাধনায়, তাহলে মানুষের প্রাণ-মনের বীক্ষণাগারে তার সচেতন সহযোগিতায় সে যে অতিমানব বা দেবতা গড়বার সাধনা করছে না, তাই-বা কে বলতে পারে? শুধু দেবতাই-বা কেন, এও কি বলা যায় না যে মর্ত্য আধারে দিব্য-পুরুষকে মূর্ত করবার তপস্যাই তার চলছে এখানে? কেননা প্রকৃতি-পরিণামের অর্থ তো শুধু তার সুপ্ত ও সংবৃত্ত বিভূতির ক্রমিক স্ফুরণই নয়, সেই সঙ্গে-সঙ্গে এ যে তার গুহাহিত আত্মস্বরূপেরও একটা রূপায়ণ। অতএব তার প্রগতির পথে আমরা দাঁড়ি টানতে পারি না কোথাও—ধর্মবাদীর মত একথা বলতে পারি না, বর্তমানের গন্ডি পার হবার আকূতি বা প্রচেষ্টা তার পক্ষে বিকৃত স্পর্ধা মাত্র; অথবা যুক্তিবাদীর মত বলতে পারি না, এ তার একটা কল্পনার বিকার বা বিভ্রম শুধু। এ যদি সত্য হয় যে মৃৎ-শক্তির মধ্যে চিৎ-শক্তিই রয়েছে সংবৃত্ত হয়ে, এই প্রকৃতি সেই গুহাশয় দিব্য-পুরুষেরই আ-ভাস মাত্র, তাহলে দিব্যভাবকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা, অন্তরে-বাইরে সেই দিব্য-পুরুষের অনুভবকে মূর্ত করাই হবে মর্ত্য মানবের চরম ও পরম পুরুষার্থ।

এই দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখি, তাহলে মানুষের প্রাকৃত দেহেই যে নিহিত রয়েছে অপ্রাকৃত দিব্যজীবনের শাশ্বত সম্ভাবনা, মার্জিত বুদ্ধির কাছে একথা আর প্রহেলিকা বলে মনে হয় না। স্বভাবের প্রেরণায় অথবা বোধিচেতনার উন্মেষে এই মর্ত্য আধারেই মানুষ যে অনুভব করে অমৃতত্বের প্রদীপ্ত অভীপ্সা, একেও আর তখন ভাবের কুহেলিকা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক অখন্ড বিশ্বচেতনাই যে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন সীমিত চিত্ত ও খন্ডিত অহং-এর বিচিত্র বিভূতিতে, এক অনির্দেশ্য বিশ্বোত্তীর্ণ পরমার্থ-সৎই যে দেশ-কালের অতীত হয়েও দেশ ও কালের কলনায় আপনাকে বিশ্বরূপে করছেন রূপায়িত

এবং আমাদের অবর চেতনাতে যে অবিকৃত স্বরূপে নেমে আসতে পারে ওইসব লোকোত্তর অনুভব, একথা তখন আর অযৌক্তিক বলে প্রতিভাত হয় না। তর্কবুদ্ধিতে যেসব জিজ্ঞাসার সমাধান আজও হয়নি, তাদের পাশ কাটিয়ে চিত্তের সকল শক্তিকে শুধু ব্যাবহারিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাসমাধানের চেষ্টাতে নিয়োজিত রাখা উচিত—বস্তুতন্ত্রীর এ-উপদেশ মানুষ অনেকবারই শুনেছে। তবুও তার জিজ্ঞাসার বিরতি কোনকালেই ঘটেনি, বরং বাধা পেয়ে তার সুর হয়েছে আরও চড়া, জানার পিপাসা মানুষের হয়েছে আরও অসহন। সেই পিপাসার সংবেগেই ভাবকের চিত্তে ফুটেছে সত্যের নূতন রূপ, প্রাণহীন প্রাচীন ধর্মের মূঢ়তার জঞ্জাল দূর করতে জেগেছে সংশয়। সে-সংশয় কখনও পুরাতনকে ভেঙে করেছে নূতন ধর্মের সংস্থাপন, কখনও-বা বীর্যের অভাবে সত্যানুসন্ধিৎসার মুখোস প'রে চিত্তকে শুধু করেছে ধূমায়িত অথচ অতৃপ্ত। সত্যের পরিপূর্ণ রূপটি একদিনে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। হয়তো অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্তিহীন বিশ্বাসের আকারে চিত্তে জাগে তার প্রথম আভাস। কিন্তু তার প্রকাশ অস্পষ্ট বা ব্যাহত বলেই তাকে অস্বীকার করা বা দাবিয়ে রাখাও আরেকধরনের অন্ধতা। সত্যের যে-স্ফুরণকে জানি বিশ্বের নিয়তি বলে, আজ যদি দুশ্চর হয় তার তপস্যা, বাস্তব প্রত্যক্ষের অগোচর হয় তার পরিণাম, মন্থর হয় তার প্রবৃত্তি, তাহলেই কি তার দায় এড়িয়ে যেতে পারি? বিশ্বপ্রকৃতির মর্মচর সত্যকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করা কি চিন্ময়ী মহাশক্তির গুহাহিত অবন্ধ্য ক্রতুর বিরুদ্ধে নিষ্ফল বিদ্রোহ ঘোষণা করা নয়? যে-আকূতিকে বিশ্বজননী নিখিল-হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখেছেন অনির্বাণ আগুনের গোপন শিখারূপে, তার দায়কে স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব। সংস্কারের মূঢ়তা হতে, বোধির স্তিমিতালোক হতে, অভীপ্সার খদ্যোত-দ্যুতি হতে প্রজ্ঞার ভাস্বর-দীপ্তিতে উন্নীত করা তাকে, তার কুণ্ঠিত প্রবেগকে সত্যসংকল্পের স্বয়ম্ভূবীর্যে রূপান্তরিত করা—এই তো পৌরুষের যথার্থ পরিচয়। প্রদীপ্ত বোধি অথবা স্বপ্রকাশ সত্যের উত্তরজ্যোতি যদি আজ মানুষের মধ্যে কুণ্ঠিত বা স্তিমিত হয়েই থাকে, অথবা আঁধারের আড়াল হতে কখনও যদি মানুষের চিত্তে স্ফুরিত হয় তার ক্বচিৎ-কিরণ, অথবা তার হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে যদি কদাচিৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই মর্ত্যের আকাশ, তাহলেই-বা আমাদের কোথায় ভয়, কোথায় সংশয়? কেননা এই আলোর ইশারাতেই কি আমরা দেখতে পাব না দেবযানের সেই জ্যোতির্ময় পথ—যার অনির্বচনীয় বর্ণৈশ্বর্যের ভিতর দিয়ে চলেছে নিখিল মানবের উত্তরায়ণের অভিযান তুর্যাতীতের শাশ্বতধামের দিকে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

জড়বাদীর নাস্তি

স তপোঽতপ্যত।। স তপস্তপ্ত্বা॥
অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজ্ঞায়।
পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।
তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
৩। ১-২

তপোদীপ্ত মনন দ্বারা চিৎশক্তিকে উদ্রিক্ত করে জানলেন তিনি, অন্ন বা জড়ই ব্রহ্ম, কেননা অন্ন হতেই জন্ম নেয় এই সমস্ত ভূত, জন্ম নিয়ে বেড়ে চলে তারই আশ্রয়ে, আবার এখান হতে চলে যায়—অনুপ্রবিষ্ট হয় তারা তারই মধ্যে। তারপর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন তিনি, 'ভগবান, আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করুন।' কিন্তু তিনি বললেন তাঁকে, 'চিৎ-তপস্‌কে আবার উদ্দীপ্ত কর তোমার মধ্যে, কারণ তপশ্চেতনাই ব্রহ্ম।'

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ (৩।১-২)

চিন্ময় যিনি তাঁরই বিলাস এই মৃন্ময় তনুতে, শাশ্বত যিনি এমনি করে তিনিই পরেছেন দুদিনের সাজ—শুধু তাই নয়, যে-জড়কে নিয়ে তাঁর এই সাজের মেলা, অফুরান এই ঘরবাঁধার খেলা, সেও কখনও অসার্থক বা অগৌরবের নয়—নিঃসংশয়ে যদি একথা জানি, তবে অসংকোচে বলা চলে, এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রেতি।

দেহের প্রতি যে-বিতৃষ্ণা আমাদের অভ্যস্ত তার মোহ কাটিয়ে উঠতে, চাই উপনিষদের ঋষির সেই সত্য এবং গভীর দৃষ্টি, যা চিন্ময় এবং অন্নময়ের সকল বিরোধ ছাপিয়ে এক অন্বয়তত্ত্বকে দেখতে পায় দুয়ের মূলে। দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে উদাত্তকণ্ঠে বলা চাই তাঁদেরই মত—'অন্নও ব্রহ্ম'। নিখিল বিশ্বকে তাঁরা যে দেখেছিলেন দিব্য-পুরুষের কায়ারূপে, সেই দৃষ্টির বীর্যকে সত্য করে তোলা চাই আমাদের চেতনায়। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি বলবে, চিৎ এবং জড় একান্তবিরোধী দুটি তত্ত্ব। দুয়ের মিথুনে আমাদের ব্যবহার চললেও তার প্রতি পদে দেখি কেবল ঠোকাঠুকি, অতএব দুয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে জীবনসমস্যার কোনও সত্য সমাধান সম্ভব নয়। চিৎ আর জড় হয় মূলে একই, নয়তো পরস্পরের পরিণাম তারা—এমন উক্তিতে তথ্য বা যুক্তির কোনও সমর্থন নাই, আছে শুধু বিকল্পবৃত্তির পরিচয়, যা যুক্তিহীন ভাবকালির বিলাস মাত্র।...চিৎ-জড়ের তফাতটাই প্রাকৃত বুদ্ধির চোখে পড়ে, তাই এ-আপত্তি তার খুবই স্বাভাবিক। বিশ্বে শুধু চিৎ ও জড় ছাড়া আর-কোনও

তত্ত্ব যদি না থাকত, এ-আপত্তি তাহলে টিকত। কিন্তু জড় হতে চিৎ পর্যন্ত আরোহক্রমে রয়েছে প্রাণ মন অতিমানস এবং মন ও অতিমানসের মাঝামাঝি আরও কতগুলি পর্ব। তাই আকস্মিক পরিণাম বুদ্ধির কাছে প্রহেলিকা হলেও পরিণাম যেখানে ধারাবাহিক, সেখানে আদি এবং অন্ত্য কোটির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া তো কঠিন নয়।

যদি বলি, বিশ্বে আছে শুদ্ধ ঈশ্বর বা পুরুষ নামে এক বিশুদ্ধ চিন্ময় তত্ত্ব আর প্রকৃতি নামে এক অচিৎ বস্তু বা শক্তির যন্ত্রলীলা, তাহলে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা অথবা প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হওয়া ছাড়া আমাদের কোনও উপায় থাকে না—কারণ বুদ্ধি ও জীবনকে চলার পথে এ দুটি কোটির একটিকে বেছে নিতেই হয়। বুদ্ধি তখন ঈশ্বর বা আত্মাকে বলবে কল্পনার একটা বিভ্রম, প্রকৃতিকে ভাববে ইন্দ্রিয়সংবিতের মায়া। তেমনি জীবনও হয় পালাতে চাইবে নিজের কাছ থেকে শুদ্ধ-চিতের অনুরাগে বিবাগী হয়ে আপনভোলা সমাধিরসে তলিয়ে গিয়ে, নয়তো নিজের অমৃতস্বরূপকে অস্বীকার করে দিব্যভাবের চেয়ে পশুত্বের সাধনাতেই হবে তার বিশেষ রুচি। বাস্তবিক, একটা দুরপনেয় বিরোধের কল্পনা রয়েছে যে-সমস্যার মূলে, তার সমাধান যে শুদ্ধ সর্বনাশের পথে—এদেশের দর্শনেও তার প্রমাণ আছে। সাংখ্যের পুরুষ চিৎস্বরূপ কিন্তু নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি পরিণামিনী অথচ যন্ত্রমূঢ়—দুয়ের মধ্যে সাম্য কোথাও নাই, এমন-কি দুয়ের অবিক্ষুব্ধ অব্যক্ত-স্বরূপেও নাই। তাই পুরুষের বিক্ষোভহীন প্রশান্তির বুকে যদি ঘটে ক্ষুব্ধা বিমূঢ়া প্রকৃতির বন্ধ্যা প্রতিবিম্বলীলার অত্যন্ত-প্রলয়, সাংখ্যমতে তবেই তাদের দ্বন্দ্ব ঘোচে! এমনি অনতিক্রমণীয় বিরোধ শঙ্করের অবর্ণ প্রপঞ্চোপশম আত্মা আর তাঁর বহুবর্ণা পুরুরূপা মায়ার মাঝে; সেখানেও পরমার্থ-সতের শাশ্বত নৈঃশব্দ্যে বিভ্রম-বৈচিত্র্যের একান্ত-প্রলয়েই সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

জড়বাদীর সমাধান কিন্তু এর চেয়ে সোজা। চিৎসত্তাকে অস্বীকার করে শুদ্ধ জড় বা শক্তিকে বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব বলে ঘোষণা করলে মেলে এক-ধরনের বাস্তব অদ্বৈতবাদ—তা যেমন বোঝা সহজ, তেমনি বোঝানোও সহজ। কিন্তু মুশকিল এই, এমনিতর কাটছাঁট উক্তিতে মানুষের জানার পিপাসা মেটে না, তাই উদ্দিষ্ট তত্ত্বের সে চায় লক্ষণ, চায় সমীক্ষা। তখন বাধ্য হয়ে জড়বাদীকেও বলতে হয়, তার কল্পিত অন্বয়তত্ত্বও প্রত্যক্ষের অগোচর, অকর্তা পুরুষ বা অশব্দ আত্মার মতই দৃশ্যজগৎ হতে বিবিক্ত উদাসীন। তাই এ-সমাধানও যথেষ্ট নয় আমাদের কাছে, কেননা এতে প্রকাশ পায় শুদ্ধ চিন্তাশক্তির দীনতা—শাণিত বুদ্ধির কঠিন দাবিকে অস্পষ্ট উক্তির ছলনায় ভুলিয়ে রাখবার অথবা 'জানা যায় না' বলে জানার কৌতূহলকে জোর করে দাবিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস।

বাস্তবিক, বিরোধের ভাবনা যদি চিন্তাশক্তিকে বন্ধ্যাই করে, মানুষের মন কিন্তু তাতে খুশী হয়ে ওঠে না। কেননা শুধু নেতিবাদের দিকে তার ঝোঁক নয়, সে চায় পরিপূর্ণ ইতির খবর—যা একমাত্র সর্বসমন্বয়ী বোধির দীপ্তিতেই মিলতে পারে। তার জন্যে অন্তশ্চেতনার সকল দাবি মেনে আমাদের চলতে হবে তারই পরিণামের ধারা ধরে। প্রাণ ও মনকে জড়ের মত পরাক্-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেই হ'ক, অথবা প্রত্যক্-দৃষ্টিতে তাদের সমন্বয় ও সন্দীপন দ্বারাই হ'ক—আমাদের পৌঁছতে হবে চরম ঐক্যের পরম প্রশান্তিতে, অথচ তার বহুধা-রূপায়ণের বীর্যকেও অস্বীকার করলে চলবে না। ইতিবাদের সর্বসমন্বয়ী ঔদার্যের পরিবেশেই আমরা খুঁজে পাব জীবনের আপাতবিরোধী বিচিত্র দ্বন্দ্বের সুষম সমাধান। আমাদের ভাবে ও কর্মে যে বহুমুখী শক্তির সংঘাত, তার মূলে আছে এক অখণ্ড সত্যেরই আত্মরূপায়ণের প্রেতি, কিন্তু সম্যক্-অনুভবের দীপ্তি ছাড়া সে-সংঘাতের মধ্যে ছন্দ ও সুর আবিষ্কার করা সম্ভব নয় কখনও। সত্তার মর্মসত্যের সন্ধান পেলেই আমাদের বুদ্ধি চক্রাবর্তন ছেড়ে চিৎকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন উপনিষদের ব্রহ্মের মত নিখিল বিশ্বে লীলায়িত হয়েও সে থাকবে স্বপ্রতিষ্ঠায় ধ্রুব ও অচঞ্চল এবং তারই ছন্দ মেনে প্রশান্ত আনন্দজ্যোতিতে জীবন হবে সেই শুদ্ধ বুদ্ধির অনুগামী—শক্তির সুষম বিচ্ছুরণে হিল্লোলিত।

কিন্তু অস্তিত্বের ছন্দে যদি তালভঙ্গ হয় কখনও, তখন বিরোধের দুটি কোটিকেই ঐকান্তিক মর্যাদা দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের মূল্য নিরূপণ করার একটা সার্থকতা আছে একথা সত্য। বৈষম্যকে এমনিভাবে একান্ত করে তুলে আবার বৃহত্তর সাম্যে ফিরে আসা মনের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ফেরবার মুখে মাঝপথে সে অনেক জায়গাতে থমকে দাঁড়াতে পারে বটে—অস্তিত্বের সমস্ত লীলায়নকে নিছক প্রাণস্পন্দ বা ইন্দ্রিয়সংবেদন বা ভাবের খেলা বলে ব্যাখ্যাও করতে পারে। কিন্তু এধরনের তত্ত্বমীমাংসাতে সবসময় থাকে অবাস্তবতার একটা অস্বস্তিকর ছোঁয়াচ। এতে যুক্তিবুদ্ধির সাময়িক তর্পণ হয়তো হয়, কেননা তার কারবার কেবল ভাব নিয়ে। কিন্তু বস্তুরসিক মনকে শুধু ভাব দিয়ে তো ভোলানো যায় না। মন জানে, তার পিছনে এমন-কিছু আছে, যা শুধু ভাবসর্বস্ব নয়; তার গভীর গহনে যা স্তব্ধ হয়ে আছে সে শুধু প্রাণবায়ুর লীলা নয়। চিৎ বা জড়কে চরম তত্ত্ব বললে তাতে সাময়িকভাবে সে সায় দিতেও পারে, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি কোনও তত্ত্বকে চরম বলে সে মানতে নারাজ। অতএব সম্যক্-দর্শনের উদার পরিবেশে সত্যের সমগ্ররূপটি ধরবার আগে, তাকে অবগাহন করতে হয় তার দুটি প্রত্যন্ত কোটিতে। মনের পক্ষে এ কিছু অস্বাভাবিক নয়। কেননা মন তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করে ইন্দ্রিয় এবং ভাষা দিয়ে। ইন্দ্রিয় অখণ্ড সত্তার খণ্ডরূপকেই

দেখে স্পষ্ট করে, আর ভাষা সীমার রেখায় সুনিপুণভাবে ভাবকে খণ্ডিত করে ফোটায় তার রূপ। অতএব এ-দুটি সাধনের সহায়ে মন যখন বিশ্বের বহুবিচিত্র মৌল বিভাবের সমাহার ঘটাতে চায় কোনও-একটি চরম তত্ত্বের মধ্যে, তখন সবকিছুকে ভেঙে-চুরে একাকার করা ছাড়া তার কোনও উপায় থাকে না। বাস্তব-রসিক মন একককে রাখতে গিয়ে আর-সবাইকে বিদায় তো করবেই। তাই, এমনতর কাট-ছাঁটের পথ বাদ দিয়ে সবার মূলে একের সত্যকে আবিষ্কার করতে গেলেই নিজের গণ্ডি তাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়—কখনও লাফ দিয়ে, কখনও-বা গুনে-গুনে পা ফেলে। অথচ প্রতিবার পথের শেষে সে দেখতে পায় সেই 'অলক্ষণম্ অব্যপদেশ্যম্' তৎ-স্বরূপকে, যাঁর মধ্যে সব-কিছুর অবসান, অথচ 'অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ' যিনি! বাস্তবিক যে-পথই ধরি না কেন, সবার শেষে আছেন শুধু সেই তৎস্বরূপ; পথের ধারে যদি খুঁটি গেড়ে বসি, তবেই তাঁকে এড়ানো চলে, নইলে নয়।

দীর্ঘযুগের বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষার পর আজ আমরা পেঁছেছি আদর্শ-বাদের দুটি প্রত্যন্তকোটির সামনে এসে। অন্যোন্যবিরোধী এই দুটি লক্ষ্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষ অক্লান্ত তপস্যায় তার অনুভবকে করছে শাণিত। কিন্তু কঠোর সাধনার চরমে যা সে পেল, সে যে সম্যক্-দর্শনের অনুকূল, বিশ্বমানবের সহজবুদ্ধি আজ তা স্বীকার করতে চাইবে না। অথচ এবিষয়ে তার রায়ই চূড়ান্ত, কেননা এই সহজবুদ্ধিই বিশ্বসত্যের রক্ষক ও প্রতিভূ—চেতনার গহনে 'গোপা ঋতস্য দীদিবিঃ'। ইওরোপে আর ভারতে যথাক্রমে জড়বাদীর 'নাস্তি-বাদ' আর বৈরাগীর 'নেতি-বাদ' উদাত্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে, তারস্বরে উভয় পক্ষই বলেছেন, এই তো মানুষের জীবনবেদ, এ ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!' ভারতবর্ষ নেতি-মন্ত্রে কুবেরের ঐশ্বর্য সঞ্চিত করেছে অধ্যাত্মলোকে, একথা মিথ্যা নয়; কিন্তু সেইসঙ্গে তার জীবন হয়েছে দেউলিয়া। তেমনি ইওরোপ উপকরণের বাহুল্যে পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের অকুণ্ঠিত উপচয়ে পেঁছেছে ঋদ্ধির চরমে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার আত্মা হয়েছে ফতুর। জড়বাদে জীবনসমস্যার সকল সমাধান খুঁজতে গিয়ে তার বুদ্ধিও আজ অতৃপ্ত, অশান্ত।

অন্যোন্যবিরোধী দুটি জীবনাদর্শ এমনি যে মুখামুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, একে শুভ লক্ষণই বলতে হবে—কেননা এতে দুয়ের মাঝে যে ন্যূনতা ছিল, আজ তা ধরা পড়েছে বিবেকীর দৃষ্টিতে। 'নেতি' বা 'নাস্তি'—কোনও মন্ত্রেই এখন মানুষের মন শান্ত হবার নয়। তার অন্তরের প্রেতি এবার মহত্তর নূতনতর 'ইতি'র দিকে, অন্তরের অনুভবে এবং জীবনের কর্মে সে চায় প্রাণের প্রসার এবং তা-ই দিয়ে কি ব্যক্তিতে কি জাতিতে সে খুঁজছে

অখণ্ড মানবতার সার্থক আত্মরূপায়ণ। আজ নবযুগের তোরণদ্বারের দিকে মহাকালের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত—আপাতপ্রতীয়মান সকল বিরোধ ও বিপর্যয় সত্ত্বেও।

চিৎ এবং জড় একই অজ্ঞেয় তত্ত্বের বিভূতি হলেও অজ্ঞেয়ের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ একধরনের নয়, তাই জড়বাদ আর চিৎবাদের নাস্তি- বা নেতি-মন্ত্র মানুষের উপর সমানভাবে কাজ করে না। জড়বাদীর নাস্তিকতা লোকাতত, বারবার শুনে মানুষ সহজে তাতে ভোলেও। কিন্তু তবু‍ও বৈরাগীর নেতিবাদের মত তা অত সাংঘাতিক মজ্জাগত হয়ে পড়ে না তার। কারণ, নাস্তিকতার নিজের মধ্যেই রয়েছে তার মুশকিল-আসান। নাস্তিক প্রকট বিশ্বের পিছনে প্রতিষ্ঠিত করে অজ্ঞেয়কে, কিন্তু তার কোনও সীমা নির্দেশ করে দিতে পারে না। মানুষের জিজ্ঞাসা অজ্ঞেয়ের সে-রাজ্যে নিরন্তর অভিযান চালিয়ে ক্রমেই তার রহস্য তরল করে আনে এবং অবশেষে 'অজ্ঞেয়' পর্যবসিত হয় শুধু 'অজ্ঞাত'তে। তখন বিশ্বের রহস্য 'জানা যায় না' এমন কথা বলা চলে না, বলা চলে—'আজও জানা যায়নি।'

অজ্ঞেয়বাদীর যুক্তিধারা এইঃ জড়-ইন্দ্রিয়ই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র সাধন। বুদ্ধি তর্কের পাখায় ভর করে যত উঁচুতেই উড়ুক, ইন্দ্রিয়সংবিতের সঙ্গে তার যোগসূত্র কিছুতেই ছিন্ন হবার নয়। ইন্দ্রিয় যে-তথ্য আহরণ করে আনবে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে, তা-ই দিয়ে তাকে গড়তে হবে তত্ত্বের ভিত। লৌকিক তথ্যের মধ্যে অলৌকিক তত্ত্বের ইঙ্গিত কোথাও যদি থাকে, তার শিকড় যে এই মাটিতেই রয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না। বুদ্ধির স্বর্গে জ্ঞানবৃত্তির অসঙ্কুচিত স্ফুরণে জিজ্ঞাসার নূতন পথ খোলবার সম্ভাবনা যতই প্রবল হ'ক না কেন—অলৌকিকের ইঙ্গিতকে স্বর্গারোহণের সিঁড়ি করে মাটির মায়া কাটিয়ে যাব, সে-অধিকার আমাদের নাই।

এইধরনের অযৌক্তিক যুক্তিতে তার ভিতরের দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শুধু মতুয়ার বুদ্ধির একটা জেদ। অপরোক্ষ-অনুভবের অগুনতি প্রমাণ তার বিরুদ্ধে স্তূপাকার করে তুললেও সে তাতে হয় কান দেবে না, নয়তো তাকে উড়িয়ে দেবে নানা অছিলায়। অন্তরের নিগূঢ় অথচ সার্থক দিব্যবৃত্তিকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করবে—মানুষের মধ্যে তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েও। অতিপ্রাকৃতের সত্যতা মানবে শুধু জড়ের রহস্যময় স্পন্দনে, জড়শক্তিরই একটা অবর অভিব্যক্তিরূপে। এর বাইরেও যে অতিপ্রাকৃতের অধিকার প্রসারিত হতে পারে, সেসম্পর্কে তথ্য বা তত্ত্বের অনুসন্ধানকেও সে মনে করবে বাহুল্য। কিন্তু জড়বাদই তো সত্যনিরূপণের একমাত্র পথ নয়। জড়বাদী যে মনের প্রবৃত্তিকে জড়শক্তির একটা অবর লীলারূপে দেখেন শুধু, এ-ও তো তাঁর কুসংস্কার। মন থেকে জড়ের আড়ষ্ট সংস্কার ঝেড়ে ফেলে মন এবং অতিমানসের স্বধর্ম নিরূপণ

করতে যাই যখন, তখন অলৌকিক তথ্যের যে বিচিত্র সম্ভার আমাদের অনুভবে আসে, তাদের আর জড়ীয় বিধানের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আটকে রাখা যায় না। অনুভবের প্রসারের সঙ্গে আমরা তখন বুঝতে পারি, 'জ্ঞানের সীমা শুধু ইন্দ্রিয়সংবেদনের মধ্যে'—জড়বাদী নাস্তিকের এ-যুক্তি একেবারেই অচল। অতীন্দ্রিয়জগতে কত তথ্য কত তত্ত্ব রয়েছে, যা মানুষের দুর্জ্ঞেয় হলেও অজ্ঞেয় নয়। মানুষের মধ্যেই নিগূঢ় হয়ে আছে এমন কত শক্তি ও বৃত্তি, যারা ইন্দ্রিয়সংবিতের নিয়ন্ত্রণ তো মানেই না, বরং তারাই ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা—ইন্দ্রিয়কে শুধু বাহন করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে যোগ রেখে চলে তারা। চিরাভ্যস্ত বহির্জীবন বিপুল অন্তর্জীবনের একটা বহিরাবরণ মাত্র—এই অনুভবের আভাস পেলেই আমাদের মনের জড়ত্ব ও সংশয় কেটে যায়। তখন অস্তিত্বকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে এবং জিজ্ঞাসাকে নিত্যনূতনের অভিযানে উদ্যত রাখতে আর আমরা ভয় পাই না।

অল্প কিছুদিন ধরে জড়বাদ মানুষের মনকে নিয়ে চলেছে যুক্তির পথে; কিন্তু তাতেই তার যে-উপকার হয়েছে, তার অপরিহার্যতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। অলৌকিক তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব সম্পর্কে আবার আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি, তার অনুকূলে প্রামাণিক তথ্যের সংকলনও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু কর্কশ যুক্তির পাথরে শাণ দিয়ে বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল না করে অলৌকিকের রাজ্যে ঢোকায় বিপদ আছে। অপরিণত অপরিশীলিত চিত্তের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনায় অলৌকিক অতিসহজেই হয়ে ওঠে কিম্ভূতকিমাকার—নানা অনর্থের সূত্রপাত হয় সেইখানে। অতীতে এমনি করে এক কণিকা সত্যের চারপাশে বিকৃত কুসংস্কার এবং যুক্তিহীন হঠধর্মের এত জঞ্জাল এসে জড়ো হয়েছিল যে তার ফলে সত্যের অভিযান প্রতিপদে ব্যাহত হয়েছে। তার জন্যে প্রয়োজন হল, অন্তত কিছুকাল কণাপ্রমাণ সত্য এবং স্তূপাকার সত্যের ভান উভয়কেই একসঙ্গে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা—যাতে নূতন পথে প্রগতির অভিযানে আর-কোনও বাধা এসে না পড়ে। জড়বাদের মধ্যে যে-যুক্তিপ্রবণতা রয়েছে, মানুষের বুদ্ধিকে সে মোহমুক্ত ও শাণিত করে তার এই উপকারটুকু করেছে।

সাধারণত চিত্তে অতীন্দ্রিয় বৃত্তির স্ফুরণ হয় আধারের জড়ত্বে আচ্ছন্ন হয়ে। তার 'পরে থাকে কায়িক স্থূলত্বের প্রলেপ, অপ্রবুদ্ধ বাসনার ঘোর, অনিয়ন্ত্রিত নাড়ীতন্ত্রের উত্তালতা। তাই তার ব্যামিশ্র প্রবৃত্তিতে সত্যের স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে ফোটে না, বরং সত্যানৃতের মিথুনলীলা হয়ে ওঠে আরও স্পষ্ট। অপরিশীলিত চিত্ত এবং অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়চেতনা নিয়ে মানুষ যখন অধ্যাত্মলোকের উত্তরভূমিতে আরোহণ করতে চায়, তখন ওই ব্যামিশ্র প্রবৃত্তিই বিশেষ করে তার বিপদ ঘটায়। অপরিণত বুদ্ধির এই ধৃষ্ট অভিযান যে-লোকে

তাদের উত্তীর্ণ করে, সেখানে অবাস্তবের মেঘচ্ছায়া বা অর্ধদীপ্ত কুহেলিকার মায়ায় কি তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে না—ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকে কি তাদের চোখ আরও ধাঁধিয়ে যায় না? অবশ্য দুরূহের প্রতি লোভ মানুষের আছেই। তার এই দুঃসাহসী অভিযানের ভিতর দিয়েই প্রকৃতি খুলে দেয় প্রগতির নূতন পথ। হয়তো এই তার কাজের ধারা, অথবা এ শুধু তার খেয়ালখুশির লীলা। কিন্তু তবুও মানুষের বিচারবুদ্ধি অপরিণত চিত্তের এই ধৃষ্টতাকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না।

অতএব দীপ্ত শুদ্ধ মার্জিত বুদ্ধির 'পরে নির্ভর করেই যে চলবে বিদ্যার অভিযান, একথা অনস্বীকার্য। এও মানতে হবে, চলার পথে মাঝে-মাঝে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য ও জড়জগতের নিরেট সত্যের শাসন মেনে বিদ্যাকে তার চলনের ত্রুটি শুধরে নিতে হবে। মানুষ 'পুত্রঃ পৃথিব্যাঃ'। তাই সে অজড় সত্যের সন্ধানী হলেও এই মাটির ছোঁয়া সবসময়েই তাকে ভরে তুলবে নতুন তেজে। বরং এই কথাই সত্য, জড়ের বুকে অটল হয়ে দাঁড়িয়েই আমরা পেতে পারি অজড় সত্যের পূর্ণ অধিকার। মাটির মায়া কাটিয়ে অজড়ের বুকে উড়ে যাওয়া, সে তো আমাদের আছেই—কিন্তু পুরাপুরি পাওয়া তাকে কিছুতেই বলা চলে না। বিশ্বরূপ পুরুষের স্বরূপ-কথায় উপনিষদ তাই বারবার বলছেন 'পদ্ভ্যাং পৃথ্বী', 'পৃথিবী পাজস্যম্'—এই পৃথিবীরই বুকে তাঁর চরণ দুটি। অতএব পৃথিবীর তত্ত্বজ্ঞানকে যত সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করব, ততই উত্তরজ্যোতি—এমনকি উত্তমজ্যোতিঃ-সাধনার ভিত্তিও আমাদের হবে অটল এবং উদার। ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের অধিগত হবে এমনি করেই।

অতএব জড়বিদ্যার যুগমায়াকে কাটিয়ে ওঠবার বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের বর্জননীতির মধ্যে যেন অবজ্ঞা বা হঠকারিতার উত্তাপ না থাকে, অথবা বর্জনের দুরাগ্রহে সত্যের একটি কণিকাও যেন খোয়া না যায়। চিন্ময় সাধনসম্পদকে যতদিন না হাতের মুঠায় আনতে পেরেছি, ততদিন জড়ের সাধনকে উপেক্ষা করবার কোনও অধিকার আমাদের নাই। বরং নিরীশ্বরবাদ যে ঈশ্বরের মহিমাকেই উজ্জ্বল করেছে প্রকারান্তরে, অজ্ঞেয়বাদ যে অন্তহীন দিগন্তের ইশারা এনেছে জ্ঞানের অভিযানে—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে এই সত্যকেই আমরা স্বীকার করে নেব। এ-জগতে ভ্রান্তিও সত্যেরই চিরপরিচারিণী, অজানার পথে কখনও-বা তার দিশারিনী। কারণ, ভ্রান্তি অর্ধসত্য মাত্র, সত্যের প্রতিষেধ নয়—শুধু সঙ্কোচে তার 'চলিতে চরণ বাধে'। কখনও-বা ভ্রান্তির ওড়নায় মুখ ঢেকে সত্যই বেরিয়ে পড়ে অজানার গোপন অভিসারে। আধ্যাত্মিকতার অভিমানে যাকে ভ্রান্তি বলে লাঞ্ছিত করি, সে যদি হয় সত্যেরই বিশ্বস্ত পরিচারিণী, নিষ্ঠাপূত এবং ছলনাহীন হয় যদি তার তপস্যা, নিজের পরিমিত অধিকারের মধ্যে সে যদি হয় সত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর, তাহলে

উদ্‌ভ্রান্তচিত্তের কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনার চেয়ে সে যে শ্রদ্ধেয়, এ কি অস্বীকার করা চলে ? আর এযুগে জড়বিজ্ঞানীর তথাকথিত ভ্রান্তি কি বস্তুত সত্যেরই ছদ্মরূপ নয় ?

সকল জানারই শেষে ফোটে সত্যের চিরন্তন রহস্যরূপ। তাই সমস্ত জিজ্ঞাসার চরম অঙ্কে দেখা দেয় অজ্ঞেয়বাদের একটা ছায়া। যে-পথ ধরেই চলি না কেন, পথের শেষে দেখি—বিশ্ব এক অজ্ঞেয়তত্ত্বের প্রতীক বা প্রতিভাস; এক অবিজ্ঞেয় বস্তুকেই আমরা বিশ্বের রূপে দেখছি জড়, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সংবিৎ, বুদ্ধি, ভাব, অধ্যাত্মচেতনা—এমন কত রকমারি পরকলার ভিতর দিয়ে। তৎস্বরূপ যত সত্য হয়ে ওঠেন চেতনায়, ততই তাঁকে অনুভব করি মনোবাণীর অগোচররূপে—'ন তত্র বাগ্‌ গচ্ছতি নো মনঃ।' কিন্তু মায়াবাদী যেমন প্রতিভাসের অবাস্তবতাকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেখেন, চরমতত্ত্বের অজ্ঞেয়তাকেও তেমনি বৃহৎ করে দেখা চলে। যখন বলি তৎস্বরূপ অবিজ্ঞেয়, তখন তার অর্থ এ নয় যে সবরকমেই চেতনার বাইরে তিনি; বস্তুত তার অর্থ এই যে, আমরা চিন্তা বা ভাষা দিয়ে তাঁর বেড় পাই না, কেননা চিন্তা এবং ভাষা আমাদের বোধ জাগায় বিষয়-বিষয়ীর ভেদ সৃষ্টি করে, বিষয়কে খণ্ডিত ও সীমিত করে। অথচ স্বরূপত তিনি অভেদ, অখণ্ড, আত্মস্বরূপ। কিন্তু মননের বিষয়রূপে জ্ঞেয় না হলেও, চেতনার চরম প্রসারে তিনি উপলব্ধির বিষয় তো বটে। তাদাত্ম্যবোধের মধ্যেও একধরনের জ্ঞানবৃত্তি আছে, যা দিয়ে তৎস্বরূপকে 'জানা যায়' বলা চলে। সে-বিজ্ঞানকে বাক্‌ বা মন দিয়ে প্রকাশ করা যায় না সত্য, কিন্তু তার উপলব্ধিতে তৎস্বরূপকে আমরা পাই বিশ্বচেতনার অভিনবা বৃত্তিরূপে এবং সে-বৃত্তির বিচিত্র ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়ে চেতনার স্তরে-স্তরে। তখন সে যে শুধু অন্তর্জীবনের রূপান্তর ঘটায় তা নয়, আমাদের বহির্জীবনেও বিকীর্ণ হয় তার নবচ্ছটা। তা ছাড়া আরেক ধরনের বিজ্ঞান আছে, যার মধ্যে তৎস্বরূপ প্রাতিভাসিক নাম-রূপের ভিতর দিয়েই নিজকে ফুটিয়ে তোলেন এই চেতনায়—যদিও প্রাকৃতবুদ্ধি জানে নাম-রূপ তাঁর স্বরূপের কঞ্চুক শুধু। এ-বিজ্ঞান গুহ্যতম না হলেও 'গুহ্যাৎ গুহ্যতর' তো বটেই। কিন্তু এখানে পৌঁছতে গেলেও জড়বাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকে ছাড়িয়ে উঠতে হয়, প্রাণ মন ও অতিমানসের তত্ত্বসমীক্ষা করতে হয় তাদের স্ব-ধর্মের পরিশীলন দিয়ে—জড়ে তাদের যে অবর বিভূতির প্রকাশ, শুধু তা-ই দিয়ে নয়।

উপনিষদ বলেন, 'অন্যদেব তদ্‌ বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি'—যা জানা যায়, তৎস্বরূপ তা হতে আলাদা; আবার যা জানা যায় না, তারও উপরে তিনি। বাস্তবিক, যা অজ্ঞাত, তা-ই অজ্ঞেয় নয়। জানতে না চাই যদি, অথবা গোড়াতেই জ্ঞানবৃত্তির সংকোচকে আঁকড়ে থাকি, তাহলেই অজানা থেকে

যায় জানার বাইরে। যা-কিছু স্বরূপত অজ্ঞেয় নয় (একটা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুই তা-ই), তাকে জানবার বৃত্তিও সে ব্রহ্মাণ্ডবাসীর আছে। মানবরূপী ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও আছে জ্ঞেয় ও জ্ঞানের এই সামানাধিকরণ্য; অস্ফুট জ্ঞানবৃত্তি ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে তার মধ্যে। তাদের ফোটানোর চেষ্টা না করতে পারি, অথবা আধফোটা কুঁড়িকে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থাও করতে পারি। কিন্তু তবু জ্ঞান সম্ভব হলে সাধ্যও হবে—কিছুতেই বিশ্বের এ মৌলিক বিধানের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারি না। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি ফুটিয়েছে স্বরূপোপলব্ধির দুর্নিবার আকূতি। অতএব শুধু বুদ্ধির জুলুমে তার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের সীমাকে সংকুচিত করবার প্রচেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না। জড়ের রহস্য উদ্ভেদ করে যখন তার শক্তিকে হাতের মুঠায় আনব, তখন জড়বিজ্ঞানের সেই সংকীর্ণ সিদ্ধিই বৈদিক প্রগতিবিরোধীদের প্রতি যেমন তেমনি আমাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করবে এই প্রৈষ-মন্ত্র ঃ 'নিরন্যত-শ্চিদারত !'—বেরিয়ে পড়—ছুটে চল আরও যেসব ভূমি আছে তাদের দিকে !

আধুনিক জড়বাদের লক্ষ্য যদি হত শুধু মূঢ়ের মত জড়ের জীবনকে আঁকড়ে থাকা, তাহলে মানুষের প্রগতি হত অনিশ্চিত ও বহুবিলম্বিত। কিন্তু বিদ্যার অভীপ্সা জড়বাদেরও মর্মসত্য, অতএব সেও মধ্যপথে থমকে দাঁড়াতে পারে না। আজ হয়তো সে ঠেকে গেছে ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধির বাঁধে এসে। কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রচেতনার প্রবেগে এ-বাঁধ সে ভাঙবেই। তখন, যে দুর্ধর্ষ বীর্যে এই দৃশ্যজগৎকে সে করেছে করামলকের মত, সেই বীর্যই যে তাকে প্রচোদিত করবে লোকোত্তরের বিজয়-অভিযানে—আমাদের এ-প্রত্যাশা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না। এবার শুধু তার বাকি আছে বাঁধের বাইরে পা বাড়ানোটুকু। তারও আয়োজন যে শুরু হয়েছে, সেই সূচনা দেখছি আজ দিকে-দিকে।

শুধু চরম দর্শনেই নয়, তার অবান্তর-সিদ্ধির সামান্য-ধারাতেও দেখি—একবিজ্ঞানেই সার্থক হতে চাইছে বিদ্যার বিচিত্র সাধনা। তাই, উপনিষদের বৈদান্তিক ঋষি (পরবর্তী তার্কিক বেদান্তীর কথা বলছি না) যে-ভাবে এবং যে-ভাষায় সত্যের স্বরূপকথা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানী যখন বিপরীত ধারায় সাধনা করেও সেই ভাবে ও সেই ভাষাতেই কথা বলেন, তখন উভয়ের এই অর্থপূর্ণ সাম্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই চিরন্তন একবিজ্ঞানের সুর। শুধু তা-ই নয়, বর্তমান বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের নবীন আলোকে প্রাচীন বেদান্তের মর্মসত্য স্ফুটতর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : যেমন ধরা যেতে পারে উপনিষদের সেই উক্তিটি, 'বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি'—বহুর একটি বীজ, কিন্তু বিশ্বশক্তি তাকেই করেছেন বহুধারূপায়িত। বেদের ঋষি বলেছিলেন, বিশ্বের মূলে যে 'একং সৎ' তিনিই হয়েছেন 'বহুধা'। আর আজ

বিজ্ঞানও চলেছে এমন-এক অদ্বৈতবাদের দিকে, বহুর সঙ্গে যার বিরোধ নাই; এখানেও বেদ ও বিজ্ঞানে ভাবের সারূপ্য অর্থপূর্ণ নয় কি? বিজ্ঞান যখন জড় ও শক্তির দ্বৈতকে মানে, তখন সে তো দ্বৈতবাদী—এমন কথা বললেও তার এই অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় না। কারণ, বৈজ্ঞানিক যাকে বলেন জড়ের স্বরূপতত্ত্ব, স্পষ্টই তা সাংখ্যের প্রধানের মত একটা অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত পদার্থ—যাকে বলা চলে বস্তুর ভাবরূপ। অতএব চেতন পুরুষকে বাদ দিলে সাংখ্যকে যেমন বলা যায় প্রধানাদ্বৈতবাদ, বিজ্ঞানের জড়বাদকেও তেমনি বলা যায় জড়াদ্বৈতবাদ। তাছাড়া বিজ্ঞানজগতেও জড়ের তত্ত্ব এবং শক্তির তত্ত্ব ক্রমেই এগিয়ে চলেছে এক মহাসংগমতীর্থের দিকে—শুধু ব্যাবহারিক কল্পনায় টিকে আছে তাদের যেটুকু পার্থক্য। অতএব একবিজ্ঞান যে বিজ্ঞানেরও চরম লক্ষ্য, একথা অনস্বীকার্য।

জড় কোনও অজ্ঞাত শক্তির রূপায়ণ, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতেও এই হল তার চরম পরিচয়। প্রাণরহস্যের শেষ আজও মেলেনি, তবু মনে হয় সে যেন জড়ের আধারে বন্দী সংবিতের অব্যক্ত স্পন্দন। আজও আমাদের অবিদ্যা-কবলিত দ্বৈতবুদ্ধিই জড় ও প্রাণের মাঝে ভেদের রেখা টেনে রেখেছে। এ-রেখা যেদিন মুছে যাবে, সেদিন একথা মানতে কোনই বেগ পেতে হবে না যে জড় প্রাণ ও মন একই বিশ্বশক্তির ত্রিধা রূপায়ণ মাত্র, বৈদিক ঋষি যাকে বলেছেন 'তিনটি ভুবন'। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করছে যে-শক্তি, তার স্বরূপ হল ইচ্ছা বা সংকল্প। আর সংকল্পের অর্থই হল একটা নির্দিষ্ট পরিণামের অভিমুখে চেতনার প্রবৃত্তি।

কিন্তু এই প্রবৃত্তি ও পরিণামের স্বরূপ কি?—সে শুধু চৈতন্যের আত্ম-সংবৃত্তি ও আত্মবিবৃত্তি : চৈতন্য রূপের গুহায় নিজকে গুটিয়ে নিয়ে আবার ফুটতে চাইছে সেই আবরণ দীর্ণ করে বিশ্বের কোন অন্তর্গূঢ় সুমহতী সম্ভাবনাকে মূর্ত করতে—এই তো তার লীলা। মানুষের মধ্যে তার কোন্ দিব্যক্রতুর প্রকাশ? সে কি তার মধ্যে নিয়ে আসেনি অন্তহীন প্রাণ, অসীম জ্ঞান ও অকুণ্ঠ বীর্যের প্রেতি? তাইতো আজ বিজ্ঞানের চোখেও এই স্বপ্নের ঘোর : এই মর্তদেহেই মানুষ হবে মৃত্যুঞ্জয়, চির-অতৃপ্ত তার জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটবে যেদিন, এই পৃথিবীর মানুষই সেদিন হবে জড়শক্তির মহেশ্বর। দেশ আর কাল আজ সংকুচিত হয়ে এক দুর্লক্ষ্য বিন্দুতে গুটিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের কাছে। কার্য-কারণের কঠিন নিগড় শিথিল করে মানুষকে অকুণ্ঠ সাম্রাজ্যের অধিকার দিতে কতশত কৌশলই না আবিষ্কার করে চলেছে সে। সিদ্ধির কোথাও সীমা আছে, জগতে অসম্ভব বলে কিছু আছে—এ-ধারণা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এসেছে মানুষের কাছে। বরং তার অবিচ্ছেদ আকূতিতে যে-কোনও সিদ্ধি মূর্ত হবেই একদিন, এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল তার মধ্যে।

তার এ-প্রত্যয়কে মিথ্যাও বলতে পারি না, কেননা শেষ পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধিই তো জাতির চিন্ময় ক্রতুর পরিণাম। বস্তুত অকুণ্ঠ ঈশনা ব্যক্তির বিবিক্ত সাধনার ফল নয়—তার মধ্যে সমষ্টি মানবের সংকল্প ফুটে ওঠে ব্যষ্টির আধারকে আশ্রয় করে। আরও একটু গভীরে গেলে দেখি, এ শুধু সমষ্টি-চেতনার ক্রতু নয়, সমষ্টির উদার পরিবেশে ব্যষ্টিকে কেন্দ্র ও সাধন করে এক অতিচেতনা মহাশক্তিই আপনাকে রূপায়িত করছেন এই ঐশ্বর্যের বিভূতিতে। এই মহাশক্তিই মানুষের 'হৃচ্ছয় পুরুষ', তাদাত্ম্যের অনন্তব্যঞ্জনা, ঐক্যের বহুধা রূপায়ণ। বিশ্বপ্রজ্ঞ বিশ্বেশ্বর তিনি, মানুষের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছেন নিজেরই স্বরূপ। তাঁর দিব্যক্রতুর চিন্ময় বিন্দু তার ব্যষ্টি-অহং। আর জাতির সমষ্টি-অহংএ বিশ্বমানবরূপী নারায়ণের বিশ্ববিগ্রহে সেই বিন্দুরই পরিধি ও বিচ্ছুরণের কল্পনা। এই যুগল আধারে তাঁর স্বরূপনিষ্ঠ একত্ব, সর্বজ্ঞতা ও সর্বৈশ্বর্যের আ-ভাসকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর সিসৃক্ষার তাৎপর্য। 'মর্তের মধ্যে অমৃত যিনি, আমাদের অন্তরে তিনি নিহিত আছেন চিন্ময় হয়ে এবং আমাদের চিৎশক্তিরাজিতে চলছে তাঁর কবিক্রতুর বিলাস।' আধুনিক জগৎ নিজের লক্ষ্য না জেনেও তার সকল কর্মে সকল সাধনায় অবচেতনভাবে অনুসরণ করে চলেছে বিশ্বচেতনার এই বিপুল প্রেতি।

তবুও এ-সাধনায় আছে সংকোচ, আছে বাধা। সংকোচ জ্ঞানের ক্ষেত্রে—জড়ত্বের পরিবেশে; আর বাধা শক্তির ক্ষেত্রে—জড়যন্ত্রের ব্যবহারে। কিন্তু ভবিষ্যতে এ-কুণ্ঠাটুকুও যে থাকবে না, বিজ্ঞানের অতিসাম্প্রতিক প্রগতিতে তার আভাস মেলে। জড়বিজ্ঞানের পরিধি ক্রমেই প্রসারিত হয়ে এখন এসে ঠেকেছে জড় আর অজড়ের প্রত্যন্তভূমিতে; আর বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগও চাইছে যন্ত্রের বাহুল্যকে যথাসম্ভব খর্ব করেই বিরাট সিদ্ধিকে আয়ত্ত করতে। বেতারবার্তার আবিষ্কারে সূচিত হচ্ছে প্রকৃতির প্রগতিতে একটা নূতন ধারা : জড়শক্তির পরিচালনায় কোনও মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বাহনের প্রয়োজন রইল না, জড়ের ছোঁয়া রইল শুধু শক্তির ক্ষেপণ ও গ্রহণের দুটি প্রান্তবিন্দুতে। শেষ পর্যন্ত এই ছোঁয়াটুকুও থাকবে না। তখন জড়াতীতের গতি-প্রকৃতি আলোচিত হবে জগৎরহস্যের সত্য ধারা ধরে এবং তার ফলে মানুষ খুঁজে পাবে শুধু মনঃশক্তি দিয়ে জড়শক্তির নির্ভুল প্রশাসনের কৌশল। প্রগতির এই সম্ভাবনাকে ঠিক যদি বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের চোখের সামনে খুলে যাবে বিপুল ভবিষ্যের অন্তহীন চক্রবাল।

এমনি করে জড়ের অব্যবহিত ঊর্ধ্বভূমির বিজ্ঞান ও প্রশাসনের অধিকার পেলেও সামর্থ্যের সঙ্কোচ আমাদের ঘুচবে না—ওপারের হাতছানি তবু মানুষকে ডাক দেবে অজানার অভিযানে। আমাদের শেষ গ্রন্থিমোচন তখনই হবে, যখন ভিতর-বাহির হবে একাকার, সংকীর্ণ অহংএর বিলাস সূক্ষ্ম হতে

সূক্ষ্মতর হয়ে শূন্যে যাবে মিলিয়ে। একত্বের আবেশে জারিত হবে নানাত্বের যত বিভূতি এবং সেই একরস প্রত্যয়ই আমাদের কর্মে আনবে প্রেরণা। তখন নানাত্ব-ভাবনার জোড়াতালি দিয়ে একত্ব গড়বার ব্যর্থ প্রয়াস আর থাকবে না। বিশ্বচেতনার সেই পরম অনুভবে দেখতে পাব, বৈন্দবাসনা মহাসরস্বতীর চরণতলে প্রসারিত রয়েছে অন্তহীন বিশ্বপটের অনুপম শিল্পচাতুরী। সেই ভূমিতেই আমরা ফিরে পাব স্বারাজ্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যের অকুণ্ঠ অধিকার, সালোক্যমুক্তির সঙ্গে সাধর্ম্যমুক্তির অসমোর্ধ্ব আস্বাদন—ধূলিলুণ্ঠিত এই মর্ত্য জীবনের দিব্য রূপায়ণে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈরাগীর নেতি

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম: অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ।
...অব্যবহার্যম্...অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্...প্রপঞ্চোপশমম্... ॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ২, ৭

এ সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাই ব্রহ্ম—আর এই আত্মা চতুষ্পাৎ।...
অব্যবহার্য্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, প্রপঞ্চের উপশম যাঁর মধ্যে।
—মাণ্ডূক্য উপনিষদ (২, ৭)

অথচ এরও পরে আছে ওপারের হাতছানি।

বিশ্বচেতনার ওপারে আছে এক বিশ্বোত্তীর্ণ চৈতন্যের অমেয় স্তব্ধতা (কিন্তু তবু মানুষের উপলব্ধির বাইরে সে নয়)—যা শুধু আমাদের ব্যষ্টি-অহংকে নয়, নিখিল বিশ্বকেও গেছে ছাড়িয়ে, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড যার অপরিসীম পটভূমিকায় তুচ্ছ একটি তুলির লিখন মাত্র! বিশ্ববিধানের সে-ই ভর্তা, অথবা উপদ্রষ্টা শুধু। মহাবৈপুল্যের আলিঙ্গনে বিশ্বপ্রাণকে সে জড়িয়ে আছে, অথবা আনন্ত্যের অমিতিতে উদাসীন হয়ে ছাড়িয়ে গেছে তাকে!

জড়বাদী যদি বলেন : জড়ই একমাত্র তত্ত্ব, প্রাতিভাসিক জগৎই একমাত্র বস্তু যার প্রামাণ্যকে মোটের উপর নিশ্চিত মনে করা চলে। এর পরেও যদি কিছু থাকে, সে আমাদের জানার বাইরে—সম্ভবত তা অসৎ বা মনের বিকল্প অথবা বস্তু হতে আচ্ছিন্ন ভাবের একটা খেয়াল শুধু।—তাহলে অধরার টানে বাউল সন্ন্যাসীও বলতে পারেন : শুদ্ধ চিৎই একমাত্র তত্ত্ব—তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পরিণাম নাই। এই ব্যাবহারিক জগৎ শুধু ইন্দ্রিয় ও মনের কল্পনা বা স্বপ্নবিলাস। শুদ্ধবিদ্যার শাশ্বতদীপ্তি হতে পরাঙ্মুখ অবিদ্যাচিত্তের এ একটা বিকল্প মাত্র।......এমনি করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হতে দুজনেই ভাবতে পারেন, তাঁর মতই সত্য।

বাস্তবিক, যুক্তিতে হ'ক অনুভবে হ'ক, অন্যোন্যবিরোধী এই দুটি মতেরই সপক্ষে তুল্যবল প্রমাণের পরম্পরা হাজির করা চলে। জড়জগৎ যে বাস্তব, তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভবে। জড়ের মত স্থূল হয়ে যা ফোটে না, ইন্দ্রিয় তাকে ধরতে পারে না, অতএব যা-কিছু অতীন্দ্রিয় তা-ই অসৎ—এই হবে তার রায়। দৈহ্য-ইন্দ্রিয়ের এই ভ্রান্তি অত্যন্ত স্থূল ও বর্বর, অতএব দর্শনের যুক্তি দিয়ে অলংকৃত করলেই তার মর্যাদা বাড়ে না—কেননা যে-অনুভবের 'পরে এই উক্তির ভিত্তি, সে যেমন সংকীর্ণ, তেমনি কাঁচা। ইন্দ্রিয়ের দাবি যে সত্য নয়, হাতের কাছেই তার প্রমাণ আছে। জড়ের জগতে এমন-সব সূক্ষ্ম বস্তু রয়েছে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে যাদের ধরা যায় না,

অথচ তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ গোঁড়া জড়বাদীও করতে পারেন না। তবু যে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বিভ্রম বা কুহকের খেলা বলে উড়িয়ে দিতে চান তাঁরা, তার কারণ ব্যাবহারিক জগতের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই তাত্ত্বিক মনে করা তাঁদের চিরাভ্যাস। অথচ এ-খেয়াল তাঁদের নাই যে, তাঁদের এ-সংস্কারও একটা কুহকের খেলা। তাই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যাকে, গোড়াতেই তাকে মেনে নেওয়ায় তাঁদের তর্ক হয় শুধু সিদ্ধ-সাধন—অতএব নিরপেক্ষ বাদীর কাছে নিষ্প্রমাণ।

জড়জগতের অনেক বস্তু শুধু যে অতীন্দ্রিয়, তা-ই নয়। অনুভবের সাক্ষ্যকে যদি সত্যের প্রমাণ বলে মানি, তাহলে বলা চলে—স্থূলদেহের স্থূল ইন্দ্রিয় ছাড়াও আমাদের সূক্ষ্মদেহে এমন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে যা দিয়ে জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও জড়জগতের বস্তুকে জানা যায়—এমন-কি জড়াতীত ঊর্ধ্বলোকের অতীন্দ্রিয় বস্তুকেও প্রত্যক্ষ করা চলে। বলা বাহুল্য, যে স্থূল জড়পদার্থ দিয়ে আমাদের গ্রহ-তারা-পৃথিবীর পত্তন, এইসমস্ত লোকের উপাদান তা হতে পৃথক। অতএব তাদের অনুভবও চিৎসত্তার একটা নূতন ভূমির বিশিষ্ট অনুভবের সগোত্র।

মানুষ ভাবতে শিখেছে যখন, তখন থেকেই অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে তার বিশ্বাস ও অনুভবকে সে ব্যক্ত করে এসেছে নানাভাবে। জড়জগতের রহস্য নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতির ফলে এ-প্রবৃত্তিতে তার ভাঁটা ধরেছিল বটে, কিন্তু আজ সেদিকের জিজ্ঞাসা কতকটা শান্ত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ঝোঁক আবার নতুন করে পড়েছে এইদিকে। এসম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে চিন্তা-সংক্রমণ এবং তার অনুরূপ অলৌকিক রহস্যের কোনও-কোনও বহিরঙ্গ বিভূতিকে এখন আর কেউ সংশয়ের চোখে দেখে না। এর পরেও যদি কেউ বস্তুনিষ্ঠার অজুহাতে এসব ব্যাপারের প্রতি অন্ধ থাকতে চান, তাহলে বুঝতে হবে অতীত দীপ্তির মোহে এখনও আচ্ছন্ন তাঁদের মন, অনুভব ও জিজ্ঞাসার স্বরচিত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে কুণ্ঠিত হয়ে ফিরছে তাঁদের শাণিত বুদ্ধির এষণা। অথবা অতীত শতকের উচ্ছিষ্ট বিজ্ঞানের মন্ত্রকে নিষ্ঠাভরে আউড়িয়েই মনে করেন, তাঁরা বুঝি যুক্তি-যুগের নূতন আলোর ঋত্বিক, তাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মৃত বা মুমূর্ষু অন্ধ সংস্কার-গুলিকে সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আগলে রাখাই তাঁদের কর্তব্য!

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জড়াতীত তত্ত্বের যেটুকু আভাস আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তা যেমন অস্পষ্ট তেমনি অনতিনিশ্চিত কেননা সে-গবেষণার ধরনে এখনও রয়েছে অনেক গলদ অনেক আনাড়িপনা। তবু এমনি করে নতুন-ফিরে-পাওয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা গেছে জড়জগতেরই অনেক

অতীন্দ্রিয় তথ্যের সত্য খবর। অন্নময় কোশের এলাকা ছাড়িয়ে জড়াতীত যে-জগৎ, এই তথ্যগুলি যখন তার বার্তাবহ, তখন তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না নিশ্চয়। যে-রীতিতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যাচাই হয়, অবশ্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বেলাতেও সে-রীতিই খাটবে। তাদের আনা খবরকেও যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সাজিয়ে নিতে হবে, এখানকার ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঠিক-ঠিক তর্জমা করতে হবে—তাদের ধর্ম প্রবৃত্তি ও অধিকারকে তলিয়ে বুঝতে হবে। জড়জগৎ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম-সাধন-গ্রাহ্য সূক্ষ্ম-ধাতুর জগৎ, সেখানেও পড়ে আছে সত্য অনুভবের এক বিশাল ক্ষেত্র। তার প্রামাণ্যকে অস্বীকার করার কোনও অর্থ হয় না। এই জগতের পরেও আছে আরও কত উত্তর-জগৎ—বৈরাজ-সামের ছন্দে আঁকা, অনির্বচনীয় রূপরেখায় বিপুল তাদের রূপায়ণ। তাদেরও আছে অমেয়বীর্যের স্বয়ম্ভূব্রত—সুদিব্য জ্ঞানের জ্যোতির্ময় সাধন। আমাদের এই জড়ের জীবনে জড়ীয় দেহে নেমে আসে তাদের অলৌকিক শক্তির আবেশ, এই ভূমিতেই চলে তাদের উন্মেষের আয়োজন, এই চেতনাতেই তাদের আলোকদূত বয়ে আনে সে গোপন রহস্যের ইশারা।

অবশ্য বিশ্বলোক আমাদের অনুভবের ক্ষেত্র শুধু, এবং ইন্দ্রিয়ই সে-অনুভবের অনুকূল সাধন। কিন্তু সবার মূলে রয়েছে চৈতন্য, এই হল আসল কথা। সাক্ষি-চৈতন্যে ভাসবে বলেই জগৎ হল অনুভবের বিরাট ক্ষেত্র, আর ইন্দ্রিয় তার সাধন। বিশ্বলোক যে সত্য, সাক্ষীর চেতনা ছাড়া তার আর-কোনও প্রমাণ নাই—হ'ক না সে ইহলোক বা পরলোক, এক লোক বা একাধিক লোক। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই যে অবিনাভাবের সম্বন্ধ, কারও-কারও মতে এ যে শুধু মনুষ্যচেতনার বৈশিষ্ট্য, জগৎকে বিষয়রূপে দেখার সংস্কার হতেই যে তার উৎপত্তি, তা নয়। সত্তার স্বধর্মই হল এই সাক্ষী ও সাক্ষ্যের অবিনাভাব। বিশ্বের সকল প্রতিভাসেরই দুটি কোটি—একদিকে তার সাক্ষি-চৈতন্য, আরেক দিকে সাক্ষ্যের স্পন্দন। কিন্তু সাক্ষী না থাকলে স্পন্দন থাকতে পারে না, কারণ সাক্ষীই বিশ্বের আধার এবং ভাসক, সাক্ষি-ভাস্যতা ছাড়া তার কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার জড়বাদী এর জবাবে বলছেন : এই জড়বিশ্বই শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ। প্রাণ ও মনের আবির্ভাবের পূর্বেও তার সত্তা ছিল এবং প্রাণের ক্ষণভঙ্গ ও মনের ক্ষণদীপ্তি একদিন মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে যখন, তখনও আকাশ জুড়ে চলবে ওই অগণিত সূর্যতারার চেতনাহীন শাশ্বত ছন্দোলীলা।...দুটি উক্তি তত্ত্বজিজ্ঞাসার শুধু দুটি বিপরীত ধারা হলেও একটা অনস্বীকার্য বাস্তব মূল্যও তাদের আছে, কেননা তত্ত্বজিজ্ঞাসার ধারা হতেই মানুষের মধ্যে ফোটে ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, নিরূপিত হয় তার সাধনার লক্ষ্য ও ক্ষেত্র। এ-জিজ্ঞাসার মূলে

রয়েছে বিশ্বের তাত্ত্বিকতার প্রশ্ন এবং মানবজীবনের সত্য ও সার্থকতার প্রশ্নও তার সঙ্গে জড়িত।

জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্যক্তির জীবন ও জাতির নিয়তি দুইই তুচ্ছ এবং অবাস্তব। অতএব ন্যায়ত আমাদের সামনে খোলা দুটি মাত্র পথ : হয় হন্তদন্ত হয়ে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে নিঙড়ে যথাসম্ভব তার রসটুকু আদায় করে নেওয়া—ঋণ করেও ঘৃত পান করা চার্বাকের মত; নয়তো জাতি ও ব্যক্তির লক্ষ্যহীন ও মমত্বশূন্য সেবায় জীবন দেওয়া—যদিও জানি ব্যক্তি শুধু নাড়ীতন্ত্রের বিকারজাত মনশ্চেতনার একটা স্বপ্নবুদ্বুদ, আর জাতির মধ্যেও জড়ের সেই নাড়ীর স্পন্দনই হয়েছে আর-একটু সংহত এবং দীর্ঘায়ত। কর্ম আর ভোগ দুয়েরই মূলে আছে অন্ধ জড়শক্তির তাড়না—যা আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলে ধরে জীবনের একটা ক্ষণিক বিভ্রম অথবা ধর্মানুশাসন এবং মানসী সিদ্ধির একটা বর্ণাঢ্য প্রবঞ্চনা। জড়বাদও এমনি করে নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের মত শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকে 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়া মায়া'তে। তারও মতে জড়জগৎ সৎ—কেননা সে প্রত্যক্ষ এবং অনস্বীকার্য; তেমনি আবার সে অসৎ—কারণ সে প্রাতিভাসিক এবং বিনশ্বর।... আবার মায়াবাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠিক উল্টা পথ ধরে যে-লক্ষ্যে এসে পেঁছই, তা জড়বাদী সিদ্ধান্তের অনুরূপ, অথচ তার চেয়েও সে আমাদের কড়া মহাজন। তার মতে : ব্যক্তির অহং আকাশকুসুমের মত অলীক, মানুষের জীবন অবাস্তব, কোনও স্বকীয় লক্ষ্য তার নাই, প্রাতিভাসিক জীবনের অর্থহীন জালের জটিল বন্ধন হতে নির্বিশেষ-সৎ অথবা পরম-অসতের অনুপাখ্য শূন্যতায় মুক্তি পাওয়াই তার একমাত্র পুরুষার্থ।

প্রাকৃত জীবনের বাস্তব তথ্যের 'পরে যে-তর্কবুদ্ধির নির্ভর, অস্তিত্বের রহস্য সমাধান কখনও সে করতে পারবে না—কেননা এসব তথ্যের মধ্যে অনুভবের ফাঁক যেখানে, সেখানে যুক্তিরও ফাঁক এসে জুটবে। প্রাকৃত চেতনায় আমরা যেমন বিশ্বমানস অথবা অতিমানসের বিশিষ্ট অনুভবকে কল্পনায় আনতে পারি না শরীরী ব্যক্তির সঙ্গে না জড়িয়ে, তেমনি প্রত্যগাত্মা বাস্তবিকই শরীরী, অথবা দেহপাতের পরেও তার সদ্ভাব বা দেহকে ছাপিয়েও তার সম্প্রসারণ একেবারেই অসম্ভব—জোর করে এমন কথা বলবার মত প্রামাণিক অনুভবও আমাদের নাই। কাজেই জড়বাদের দাবি সত্য না মায়াবাদের দাবি সত্য, এই প্রাচীন বিতর্কের মীমাংসা সম্ভব একমাত্র চেতনার সম্প্রসারণে অথবা সাধনসম্পত্তির অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষে—শুধু প্রাকৃতবুদ্ধির তর্কনৈপুণ্যে নয়।

চেতনার সম্প্রসারণ তখনই সার্থক হতে পারে যখন বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয় ব্যক্তির অন্তর্জীবন। বস্তুত, জগতে জীবজন্মের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে

যে শরীরী মন, তাকে কখনই সাক্ষি-পুরুষ বলা চলে না। সাক্ষী যিনি, তিনি বিশ্বচেতন—বিশ্ব তাঁর কুক্ষিগত। নিখিল বিসৃষ্টিতে অন্তর্যামী বোধিরূপে আবির্ভূত তিনি—বিশ্ব তাঁর চিরন্তন তত্ত্বভাবের পরিস্পন্দরূপে সত্য ও শাশ্বত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে, অথবা তাঁর প্রজ্ঞা ও চিৎশক্তির বিলাসরূপে 'তঁহি উপজি পুন তঁহি সমাওত—সাগর-লহরী-সমানা'। আমাদের প্রাকৃত মনের সংঘাতরূপকে কখনও বিশ্বের সাক্ষী ও প্রভু বলা যায় না। উপদ্রষ্টা মহেশ্বর তিনিই, যুগপৎ যিনি পৃথিবীর প্রাণে ও জীবদেহে শাশ্বতী শান্তির অচল প্রতিষ্ঠায় অন্তর্যামিরূপে সমাসীন—মানুষের ইন্দ্রিয়-মন যাঁর দিব্যক্রতুর পরোক্ষ সাধন শুধু।

আধুনিক মনোবিদ্যা মানুষের মধ্যেও বিশ্বচেতনার সম্ভাবনাকে ধীরে-ধীরে মেনে নিচ্ছে। এমন-কি আমাদের জ্ঞানের সাধন যে আরও সূক্ষ্ম ও প্রসারধর্মী হতে পারে, একথা মানতেও তার বিশেষ আপত্তি নাই। অথচ সে-সাধনের সামর্থ্য ও সার্থকতাকে কবুল করেও তার কৃতিকে কুহকের পর্যায়ে ফেলতে আজও তার বাধে না। প্রাচ্য মনোবিদ্যায় কিন্তু বিশ্বচেতনতা ও সাধনের উৎকর্ষকে বরাবর গণ্য করা হয়েছে অধ্যাত্ম-প্রগতির একটা বাস্তব সাধ্য বলে। তার মতে, সিদ্ধির একমাত্র সংকেত হল—ব্যক্তির কল্পিত অহং-চেতনার সংকোচকে অতিক্রম করা, জড়ে ও জীবে সর্বত্র গুহাহিত রয়েছে যে অন্তর্যামী আত্মসংবিৎ, তার সংগে তাদাত্ম্যবোধে যুক্ত হওয়া—অন্ততপক্ষে তার সার্ষ্টিত্ব অর্জন করা।

বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে আমরা বিশ্বসত্তার সংগে এক হয়ে থাকতে পারি তারই মত। তখন আমাদের চেতনায় এমন-কি ইন্দ্রিয়ানুভবেরও মধ্যে দেখা দেয় যে-রূপান্তর, তার দীপ্তিতে বুঝতে পারি—বিশ্বজড় এক অখণ্ড সত্তা। সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত ওই অন্নময় সত্তাই বিবিক্ত দেহের বিভূতিতে ঘটে-ঘটে করেছে স্বগতভেদের বিসৃষ্টি, আবার আত্মসত্তার পরিকীর্ণ সেই বিন্দুজালে যোগাযোগ ঘটিয়েছে অন্নময় সাধন দিয়ে। তেমনি প্রাণ-মনেও এক অখণ্ড সত্তাকেই দেখি বহুধা রূপায়িত। আপন-আপন অধিকারে তারাও দেখি নিজকে বিবিক্ত-বিকীর্ণ করে আবার যুক্ত করছে উপযুক্ত সাধন দিয়ে। এই ধারায় আরও এগিয়ে গিয়ে, চেতনার অনেক পর্ব পার হয়ে অবশেষে উত্তীর্ণ হই অতিমানসের অধিকারে, যার প্রোতি নিগূঢ় রয়েছে বিশ্বের সকল অবর প্রবৃত্তির মর্মমূলে। অখণ্ড বিশ্বসত্তাকে শুধু যে অনুভবে আনা যায় এমনি করে, শুধু যে ইন্দ্রিয়বোধে তার রূপ ধরা যায়, তা-ই নয়। অনুভবের অন্তরঙ্গতায় আমরা আবিষ্ট জারিত হয়ে যেতে পারি এই গভীর চেতনায়—আত্ম-সংবিৎরূপে অপরোক্ষ করতে পারি তাকে। অহংপ্রত্যয়ের মধ্যে যেমন স্বচ্ছন্দ হয়ে বাস করেছি এতদিন—তেমনি বাসা বাঁধতে পারি এই বিশ্ব-

চেতনাতেও, নিত্যস্পন্দিত হতে পারি তার উপচীয়মান নিবিড়তায়, খণ্ডিত সত্তার অভিমান ভুলে গভীরতর আত্মীয়তায় এক হয়ে যেতে পারি অপর মন প্রাণ ও দেহের সঙ্গে। কেবল যে আমাদের চিত্তে ও সংকল্পে এবং অপরের প্রত্যক্-চেতনাতেই ছড়িয়ে পড়ে এই নিবিড় তাদাত্ম্যবোধের বীর্য, তা নয়ঃ জড়জগতের গতি-প্রকৃতিতেও তার দিব্য প্রশাসন সঞ্চারিত হয়—যার কল্পনাও আজ আমাদের সংকুচিত অহমিকার অগোচর।

তাই, বিশ্বচেতনার স্পর্শ বা আবেশ যে পেয়েছে, তার অনুভবে এর সত্যতা বাস্তবকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার কাছে এ শুধু স্বরূপে সত্য নয়—পরিণামে ও প্রবৃত্তিতেও সত্য। এ-জগৎ ফুটেছে বিশ্বচেতনার পরিপূর্ণ সম্ভূতির লীলারূপে। অতএব বিশ্বচেতনা যেমন জগতের সত্য, তেমনি জগৎও তার কাছে সত্য—কিন্তু স্ব-তন্ত্র সিদ্ধসত্তারূপে নয়। চেতনার উত্তরায়ণে সংস্কারের সকল বাঁধন খসে যায় যখন, তখন অনুভব করি, চৈতন্য আর সত্তাতে কোনও ভেদ নাই—সকল আত্মভাবই স্বরূপত পরা সংবিৎ এবং সকল সংবিৎই স্বয়ম্ভাব মাত্র। চৈতন্য শাশ্বত ও স্বকৃৎ: অতএব তার বিসৃষ্টিও সত্য। সে তার আত্মসত্তারই অবিকৃত-পরিণাম—স্বপ্ন বা পরিণাম-বিকার নয় শুধু। এ-জগৎ সত্য, কেননা একমাত্র চৈতন্যই এর সত্তা। চিৎশক্তি এর স্বরূপ এবং পরমার্থসতের সঙ্গে সে-শক্তি অবিনাভূত—কেননা সে তো শুদ্ধ সত্তারই স্ব-ভাবের স্ফূর্তি। স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তিই ধরেছে জড়ের রূপ। জড়ের একটা বিবিক্ত স্ব-তন্ত্র সত্তা থাকত যদি, তাহলে তা-ই বরং হত স্ব-ভাবের বিপর্যয়—স্বপ্নকুহক মতিভ্রম বা অসম্ভাব্য অনৃতের ছলনা।

যে চিৎ-সত্তা অন্তহীন অতিমানসের স্বরূপসত্য, সে কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণ। যেমন বিশ্বছন্দে সে লীলায়িত, তেমনি অনির্বচনীয় আনন্ত্যের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে আত্মসমাহিতও সে। জগৎই আছে তৎস্বরূপকে আশ্রয় করে, তৎস্বরূপ জগৎকে আশ্রয় করে নাই। বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যেমন এক হয়ে যেতে পারি আমরা, তেমনি বিশ্বসত্তাকে ছাড়িয়েও ডুবে যেতে পারি বিশ্বোত্তীর্ণ চৈতন্যের অব্যক্ত গহনে। তখনই আমাদের মধ্যে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন—বিশ্বোত্তীর্ণের স্বরূপ কি নেতিতে? বিশ্বলোকের কি সম্বন্ধ লোকোত্তরের সঙ্গে?

বিশ্বোত্তীর্ণের দুয়ারে আছে বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপের অসঙ্গ কৈবল্য, উপনিষদ যাঁকে বলেছেন : শুভ্র শুদ্ধ তিনি, 'ঈশানো ভূতভব্যস্য', কিন্তু 'অনেজৎ'। তিনি 'অস্নাবির'—শক্তিসঞ্চরণের জন্য স্নায়ু নাই তাঁতে, দ্বৈতের পাপ নাই—ভেদের ব্রণ নাই তাঁর মধ্যে। তিনি কেবল অন্বয়রূপ অব্যবহার্য প্রপঞ্চোপশম। অদ্বৈতবেদান্তীরা তাঁকেই বলেন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ ব্রহ্ম, প্রপঞ্চাতীত নৈঃশব্দ্য। অধ্যাত্মচেতনার তীব্রসংবেগে সাধকের মন যখন

পর্বসংক্রমণের অপেক্ষা না রেখে সহসা এই অগমরাজ্যে ঢুকে পড়ে প্রলয়ের দুয়ার ঠেলে, তখন ওই অমেয় নৈঃশব্দ্যের নীল বিদ্যুতে ধাঁধিয়ে যায় তার চেতনা। মনে হয়, এই অবর্ণই সত্য—মিথ্যা জগতের বর্ণচ্ছটা। মানুষের মনে এর চেয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড অনুভবের বিচ্ছুরণ আর বুঝি হয় না। এই বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের দর্শনে অথবা তারও অতীত অসম্ভূতির অনুভবে শুরু হয় প্রতিষেধের আর এক কোটি—যা জড়বাদীর প্রতিষেধেরই অনুরূপ, অথচ তারও চেয়ে চূড়ান্ত, তার চেয়েও সর্বনাশা। তার উদাত্ত আহ্বান যে ব্যক্তি বা জাতির কানে বাজে, সে মরণের নেশায় মাতাল হয়ে ঘর ছেড়ে ছোটে বনের দিকে। এই প্রলয়ংকর প্রতিষেধকেই আমরা বলেছি 'বৈরাগীর নেতি'।

বৌদ্ধধর্ম যেদিন হতে প্রাচীন আর্যজগতে নিয়ে এল বিক্ষোভের আলোড়ন, তার পর থেকে দু'হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের হৃদয়ে মন্দ্রিত হয়েছে মহাকালের ডমরুধ্বনি—জড়ের বিরুদ্ধে চিৎ করেছে বিদ্রোহঘোষণা। কিন্তু মায়াবাদই যে ভারতীয় ভাবধারার সর্বস্ব, তা নয়। এ ছাড়াও এখানে ফুটেছে আরও কত দর্শন, সাধকহৃদয়ের আরও কত অভীপ্সা। দার্শনিক চরমপন্থীরাও যে জড় আর চিতের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চাননি, তাও নয়। কিন্তু নেতিবাদের করালছায়ায় সকল সাধনাই হয়ে গেছে পাণ্ডুর, সন্ন্যাসীর গৈরিকে রাঙা হয়েছে সবার মন। বৌদ্ধ কর্মবাদের আর প্রতীত্যসমুৎপাদের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে অস্তিত্বের সকল উল্লাস এবং তাইতে এসেছে বন্ধন ও মুক্তির দ্বিকোটিক বিরোধ—ভবপ্রত্যয়ে বন্ধন আর ভবনিরোধে মুক্তি! তাই সকল সাধকের কণ্ঠে একমাত্র এই বাণীই ধ্বনিত হয়েছে সমস্বরে—'হেথা নয়, হেথা নয়—অন্য কোন্‌ খানে'। বৈকুণ্ঠ কোথায় এই দ্বৈতের রাজ্যে? শাশ্বত বৃন্দাবনের অন্তহীন রসোল্লাস, ব্রহ্মলোকে আত্মার অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দিব্যসম্ভোগ, প্রপঞ্চোপশম অনুপাখ্য মহানির্বাণে অহং বাসনা ও কর্মের আত্যন্তিক প্রলয় অথবা অলক্ষণ অব্যবহার্য আত্মপ্রত্যয়সার পরমার্থসতে সকল ভেদসত্তার নির্বাপণ—এসমস্তই তো ওপারের অনুভব, এপারে তার কোথায় আভাস? কত শতাব্দীর ধারা বেয়ে চলেছেন উত্তরায়ণের অভিযাত্রী যত—ঋষি সাধু ও প্রবক্তার বিরাট জ্যোতির্বাহিনী—ভারতের স্মৃতি ও কল্পনায় দুর্মোচন বিদ্যুৎরেখায় জ্বলছে যাঁদের নাম ও রূপ, তার দু'কান ভরেছে তাঁদের এই অবিসংবাদিত উত্তুঙ্গ আহ্বানমন্ত্রে—'বৈরাগ্যই বিজ্ঞানের একমাত্র পথ, অজ্ঞান যে, সে-ই আঁকড়ে থাকে এই জড়ের মায়া। জন্মনিবৃত্তিতেই মানবজন্মের সার্থকতা! অতএব শোন চিৎস্বরূপের আহ্বান—তফাত হও জড়ের থেকে'!

সন্ন্যাসীর এই আহ্বানে সাড়া দেবার মত সমবেদনা আধুনিক মনে আর বেঁচে নাই। মনে হয়, জগতের সর্বত্রই সন্ন্যাসীর যুগ ফুরিয়ে গেছে বা যেতে বসেছে। তাই এযুগের মানুষ ভাবতে পারে : বৈরাগ্যের ধুয়া একটা পরিশ্রান্ত

জরাজীর্ণ জাতির প্রাণ-বৈকল্যের পরিচয় শুধু। একদিন সমগ্র মানবসভ্যতার বিপুল দায়কে সে বহন করেছে, মানুষের জ্ঞান ও কৃতির ভাণ্ডারে আহরণ করে এনেছে কত-না বিচিত্র ঐশ্বর্য। আজ যদি তার ক্লান্ত হৃদয় সংসার হতে ছুটিই চায়, সে কি দোষের !...কিন্তু আমরা দেখেছি, এই বৈরাগ্যও সত্তার একটা সত্যবিভাব—মানুষের প্রচেতনার চরম শিখরে স্ফুরিত হয় তার অপরোক্ষ অনুভবের চিন্ময়ী দীপ্তি। শুধু তা-ই নয়—মানুষের পূর্ণতা-সাধনারও অপরিহার্য অঙ্গ এই বৈরাগ্যের ভাবনা। মানুষের বুদ্ধি ও প্রাণ-সংস্কার পাশবতার নাগপাশ হতে মুক্ত নয় যতক্ষণ, ততক্ষণ বৈরাগ্যের বিবিক্ত সাধনা যে জাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর একথা অস্বীকার করি কি করে ?

আমরা নেতি- বা নাস্তি-বাদী নই। একটা বৃহত্তর পূর্ণতর ইতির সত্যে আমরা খুঁজি জীবনের সার্থকতা। ভারতবর্ষের বৈরাগ্যবাদ, 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'—বেদান্তের এই মহাবাক্যকেই মেনেছে। কিন্তু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই আর-একটি মহাবাক্যের সঙ্গে তার অখণ্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দেয়নি সে। মানুষের অভীপ্সা লেলিহান হয়ে উঠেছে দ্যুলোকের দিকে; কিন্তু দ্যুলোকের অভীপ্সাও যে নুয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে চির-আলিঙ্গনে বেঁধে নিতে তার চিন্ময়ী মায়াকে! এ-দুটি আকৃতির মিলনরাগিণী ভারতীর বীণায় তেমন করে বেজে উঠল কই ? চিৎস্বরূপের সত্যকেই বড় করেছে ভারত, কিন্তু মৃৎস্বরূপের তাৎপর্যকে তলিয়ে বোঝেনি। পরমার্থ-প্রত্যয়ের উত্তুঙ্গতায় সন্ন্যাসীর জন্মেছে পূর্ণ অধিকার, অথচ প্রাচীন বেদান্তীর মত তার পরিব্যাপ্ত সম্ভূতির পূর্ণতায় দখল জন্মেনি তাঁর।...কিন্তু নেতি ছেড়ে ইতির প্রশস্ততর ভূমিকায় যখন সাধনার প্রতিষ্ঠা খুঁজব, তখনও চিন্ময়ী প্রেতির বর্ণহীন শুদ্ধ প্রকাশকে এতটুকু খাটো করলে চলবে না। জড়বাদও যেমন আজ দিব্য-পুরুষের দিব্য-ক্রতুর সাধন, বৈরাগ্যবাদও যে একদিন তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সাধন ছিল সেকথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে। জড়বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে সংহরণ ও বর্জন করতে হবে ভবিষ্যতে, হয়তো-বা ঘটাতে হবে তার আমূল রূপান্তর। কিন্তু তবুও তার মধ্যে যা-কিছু সত্য ও শ্রেয়স্কর বৃহৎসামের সাধনায়, তাকে বাদ দিলে তো চলবে না। তেমনি আজ পিতৃরিক্থ যত ঊনীকৃত বা বিকৃত হয়েই আমাদের হাতে আসুক, প্রাচীন আর্যসভ্যতার দায়াদরূপে তার গ্রহণ-বর্জনের দায়কে আমাদের নির্বাহ করতে হবে আরও সূক্ষ্মতর বিবেক নিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৬

—অসৎই সে হয়ে যায় অসৎ বলে ব্রহ্মকে কেউ জানে যদি। ব্রহ্ম অস্তিস্বরূপ এ যদি কেউ জানে, তাহলে সৎ বলেই তাকে যায় জানা।
—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৬)

শুদ্ধচিৎ তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে। আবার বিশ্বজড় হতে চায় আমাদেরই বিসৃষ্টির নিমিত্ত এবং আধার। দুটি দাবির কোনটিকেই উপেক্ষা করতে পারি না যখন, তখন সত্যের এমন-একটা পরিপূর্ণ রূপ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুঁত সমন্বয়, যার মিলনমন্ত্রে মানুষের জীবনে পায় তারা স্বাধিকারের মর্যাদা এবং তার চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থন। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুণ্ণ হবে না, তাদের অন্তর্নিহিত সত্যের গৌরব কোথাও ম্লান হবে না। স্বীকার করতে হবে, দুয়েরই মূলে আছে এক মর্মসত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা। নইলে তাদের ভ্রান্তি বা অতিক্রান্তির মধ্যেও কোথা হতে আসে স্পর্ধিত সামর্থ্যের অফুরন্ত যোগান? বস্তুত যেখানেই কোনও চরম উক্তি মন্ত্রশক্তির মত অভিভূত করে মানুষের মন, বুঝতে হবে তার পেছনে প্রচ্ছন্ন আছে—কোনও ভ্রান্তি কুসংস্কার বা কুহকের ছলনা শুধু নয়; আছে কোনও পরম সত্যের দুর্নিরীক্ষ্য অথচ প্রচণ্ড দাবি যাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলে তার দরবারে আমাদের দণ্ড পেতেই হবে। এইজন্যই চিৎ ও জড়ের মধ্যে যত আপোস-রফাই করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার কোনটাকেই আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি না, সমস্যা-সমাধানের একটা সহজ রাস্তা খুঁজে পাই না কোনমতেই। রফামাত্রেই একটা চুক্তি—দুটি বিরোধী শক্তির কলহে স্বার্থের বনিবনাও; তাকে কিছুতেই সমন্বয় বলা চলে না। সত্যকার সমন্বয়ের মূলে আছে দুয়ের মাঝে একটা মন-জানা-জানির প্রেরণা, একাত্মবোধের অন্তরঙ্গতায় যার শেষ পরিণাম। অতএব চিৎ ও জড়ের মাঝেও সমন্বয়ী সত্যের সন্ধান পাব উভয়ের ঐক্যসাধনার চরম নিবিড়তায়। আর সেই সত্যের অটল ভিত্তিতে আমাদের গড়তে হবে ব্যক্তি-জীবনের অন্তরে-বাইরে সমন্বয়সাধনার ইমারত।

বিশ্বচেতনাকে আমরা দেখেছি দুটি ভাবনার সন্ধিভূমিরূপে; দেখেছি, এইখানে এসে চিতের কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চিৎও হয় সত্য। কারণ বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অখণ্ড সত্তার অন্তরিক্ষলোক—পরাবর-তত্ত্বের মাঝে তারা যেন সেতু। কিন্তু অহমিকাদুষ্ট প্রাকৃত-চিত্তে তারা দেখা দেয় সংভেদের হেতু হয়ে—একই অবিজ্ঞেয় পরমার্থ-সতের ইতি- ও নেতি-মূলক দুটি বিভাবের মাঝে একটা কৃত্রিম কলহের তখন তারা উদ্যোক্তা। বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে মন জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে সেই একবিজ্ঞানের দীপ্তিতে, যা একের সত্যের সঙ্গে নানার সত্যকে মিলিয়ে উভয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে যোগাযোগের সূত্রটি। সেই আলোতেই দীপ্ত মনে ঘুচে যায় সকল দ্বিধা, বৃহৎসামের দিব্যরাগিণী ঝঙ্কৃত হয় তার তারে-তারে: সৌষম্যের রসে তৃপ্ত হয়ে পরমদেবতার সঙ্গে এই জীবনের চিরাকাঙ্ক্ষিত চরম মিলনের সে তখন হয় দূতী। বিশ্বচেতনার আবেশে মননশক্তিতে সঞ্চারিত হয় অপরোক্ষ-অনুভবের বীর্য, ইন্দ্রিয়শক্তিতে আসে সূক্ষ্মদর্শনের দিব্য সামর্থ্য; তার ছটায় জড়ের স্বরূপ ফুটে ওঠে চিৎস্বরূপেরই ঘনবিগ্রহ-রূপে—তার আত্মবিভাবনী পরিব্যাপ্তিরূপে। আবার সেই দিব্য সাধনসম্পদের আনুকূল্যে চিৎও দেখা দেয় জড়ের আত্মভূত সত্য ও সারতত্ত্ব হয়ে। পরস্পরকে স্বীকার করতে তখন আর তাদের কোনও বাধা থাকে না, উভয়েই তখন উভয়কে জানে দিব্য বাস্তব এবং একাত্মসার বলে। চেতনার সেই দীপনীতে মন আর প্রাণ যুগপৎ পরা সংবিতের রূপায়ণ ও সাধনরূপে প্রকাশ পায়—যাদের দিয়ে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দেন রূপে-রূপে জড়বিগ্রহের গহন গুহায়, আবার সেই বিগ্রহে থেকেই বহুধাবিকীর্ণ তাঁর চিৎকেন্দ্রের কাছে নিজেকে করেন অনাবৃত। পরমার্থসতের যে-আত্মরূপায়ণ বিশ্বরূপে, তার অখণ্ড সত্যকে ধারণ করবার স্বচ্ছতা যদি পায় মনের মুকুর, তবেই তার নিজেকে পাবার তপস্যা সার্থক হয়। বিশ্বসত্তার নিত্যনবীন রূপোচ্ছ্বাসে ব্রহ্মের পরিপূর্ণ রূপায়ণের যে-আয়োজন, তার মধ্যে সকল শক্তি ঢালে যখন চেতন প্রাণ, তখনই তার সিদ্ধি।

এমন করে ভাবলে পরে এই মর্ত্যেরই বুকে দেখতে পাই দিব্য-জীবনের একটা সত্য সম্ভাবনা। তার মধ্যে বিশ্ব- ও পার্থিব-পরিণামের একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও জীবন্ত ব্যঞ্জনার আবিষ্কারে একদিকে যেমন মানুষের বিজ্ঞানসাধনার সার্থকতা হবে সপ্রমাণ, তেমনি আর একদিকে জীবভাবের দিব্যভাবে রূপান্তরে তার আধ্যাত্মিক আদর্শের সকল আকূতি সিদ্ধ হবে।

কিন্তু বৈরাগীর বিবিক্ত জীবনের পরম পুরুষার্থ যে অশব্দ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ বুদ্ধ স্বয়ম্ভূ আত্মারাম, আমরা কি তাঁকে স্বীকার করব না? এখানেও দুস্তর বৈষম্যে নয়—কিন্তু সৌষম্যের সহজ সত্যেই আমাদের চেতনাকে দীপ্ত করতে

হবে। নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্ব নিরাকৃত আর সগুণ ব্রহ্মে স্বীকৃত সুতরাং এ-দুটি বিবিক্ত বিরুদ্ধ ও বিষম দুটি তত্ত্ব—এ-ধারণা সত্য নয়। বস্তুত সগুণ এবং নির্গুণ এক পূর্ণ ব্রহ্মেরই ইতি- এবং নেতি-ভাব মাত্র—তাদের একটি দাঁড়াতেই পারে না আর একটিকে ছেড়ে। অশব্দ নির্গুণ যিনি, তাঁথেকেই তো বিশ্বজননী পরা বাকের শাশ্বতী প্রবৃত্তি, কারণ অশব্দের মধ্যে যা গূঢ়োত্থ হয়ে রয়েছে, ব্যক্ তারই ব্যঞ্জনা মাত্র। এই শাশ্বত নৈষ্কর্ম্য আছে বলেই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে স্ফুরিত হচ্ছে তাঁর শাশ্বত দিব্যকর্মের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও অকুণ্ঠিত ঈশনা। তাঁর দিব্য সম্ভূতিতে রয়েছে যে বিপুল বীর্য, বৈচিত্র্য ও সৌষম্যের যে অন্তহীন সামর্থ্য, তার প্রেতি আসে—স্বয়ং অপরিণামী হয়েও যে তিনি অফুরন্ত বিসৃষ্টির নিরপেক্ষ অনুমন্তা ও ভর্তা, তাঁর সেই অবিকৃত-পরিণামের দিব্যমায়া হতেই।

মানুষের জীবনেও সিদ্ধির পূর্ণতা আসে এমনি করে—যখন তার অন্তরে থাকে ব্রহ্মীভূত চেতনার পরম নৈষ্কর্ম্য ও প্রশান্তি অথচ তাহতেই উচ্ছ্বসিত হয় অফুরন্ত কর্মের স্বাতন্ত্র্য—ব্রহ্মেরই মত প্রশান্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ অনুমোদনে। নিজের মধ্যে যারা এই প্রশান্তির নির্ঝর খুঁজে পেয়েছে, তারা দেখতে পায় বিশ্বকর্মে ক্ষয়হীন শক্তির যোগান উৎসারিত হচ্ছে তার অমেয় নৈঃশব্দ্য হতে। অতএব বিশ্বস্পন্দের নিরাকরণ বা নিরোধই অশব্দ-স্বভাবের সত্য—এ-ধারণা ঠিক নয়। কর্মে ও নৈষ্কর্ম্যে আপাতবৈষম্যের অনুভব সংকুচিত মনের একটা ভ্রান্তি মাত্র। ব্যাবহারিক জীবনে ইতি-নেতির অপরিহার্য দ্বন্দ্বে অভ্যস্ত মন যখন হঠাৎ অনুভবের অবরকোটি হতে উত্তীর্ণ হয় পরমকোটিতে, তখন সম্ভূতি-সংবিতের বীর্যময় উদার ব্যাপ্তিতে দুটিকেই জড়িয়ে নেবার সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলে। যিনি অশব্দ, বিশ্বের ভর্তা তিনি—নিরাকর্তা নন। অথবা কর্মপ্রবৃত্তি এবং কর্মনিবৃত্তি উভয়কেই ধরে আছেন তিনি নিষ্পক্ষ হয়ে। যোগস্থ জীব যখন কর্মরত হয়েও অন্তরে থাকে স্তব্ধ ও অবন্ধন, তখন তার এই স্বভাবস্থিতিতেও তাঁর পরিপূর্ণ সায় আছে।

কিন্তু তার পরেও তো আছে অত্যন্তনিবৃত্তি বা অসতের কল্পনা। উপনিষদ বলছেন, 'অসৎই ছিল এসব আগে, অসৎ হতেই তো সতের জন্ম।' অতএব যা-কিছু হয়েছে, অসতের মধ্যেই আবার তা তলিয়ে যাবে। অন্তহীন অব্যাকৃত সৎস্বরূপ হতে যদি বহুধা-বিভূতির ব্যাকৃতি সম্ভবও হয়, তাহলেও কি বাস্তব বিশ্বের সকল সম্ভাবনাই প্রতিষিদ্ধ ও নিরাকৃত হচ্ছে না অসৎ দ্বারা—কেননা অসৎ যে সতেরও প্রাগ্‌ভাবী অনাদি পরমার্থ তত্ত্ব?... এ-যুক্তিতে বৈনাশিক বৌদ্ধের শূন্যবাদই হবে বৈরাগীর রুচিসম্মত সিদ্ধান্ত। অহংএর মত আত্মাও তখন হবে অতাত্ত্বিক বিজ্ঞানসন্তানের একটা বিকল্পনা শুধু।

কিন্তু এও তো কেবল কথার প্যাঁচে পথ খোয়ানো! আমাদের চিত্ত সঙ্কীর্ণ, তার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে অপরিহার্য-বিরোধের সংস্কার। তাকে সে চাপায় চরম সত্যেরও বিবৃতিতে—নির্দ্বন্দ্ব অনুভূতিতেও কথার দ্বন্দ্বকে তোলে জাঁকিয়ে। তাই তার তর্জমায় অতিমানস অনুভবও হয়ে ওঠে দুস্তর বিরোধের কণ্টক-শয়ন। বস্তুত অসৎ একটা কথার কথা—একটা বিকল্প শুধু। যখন তলিয়ে বুঝতে যাই 'অসৎ' শব্দের মূলে কোনও বস্তু আছে কি না, তখন দেখি, শাশ্বত আত্মাকে মনের বিকল্প বলতে পারি যে-যুক্তিতে, সে-যুক্তি তো অসতের বেলাতেও খাটে। বাস্তবিক অসৎ বা 'কিছু-না' বলতে আমরা বুঝি এমন একটা-কিছু—যা এই জগতের জ্ঞান বা কল্পনার মাপে বস্তু-সত্তার যে সূক্ষ্মতম নির্বিশেষ অনুভব ও শুদ্ধতম ধারণা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাহলে 'কিছু-না'র অর্থ হল 'এমন-কিছু'—আমাদের ধারণা দিয়ে যার ইতি হয় না। এমনি করে সমস্ত ইতি-কার হতে অত্যন্ত-ব্যাবৃত্ত সর্বশূন্যের একটা বিকল্পকে আমরা খাড়া করেছি—অনুভবের সকল সীমা ও স্বরূপের বিশিষ্ট চেতনাকে পেরিয়ে যাব বলেই। দার্শনিকের শূন্যবাদকে যাচাই করলে বোঝা যায়, শূন্য আসলে পূর্ণেরই নামান্তর—'কিছু-না' 'সব-কিছু'রই আর এক পিঠ। মন অভ্যস্ত সান্তের ধারণায়, তাই অনন্ত তার কাছে অনির্বচনীয় অতএব ফাঁকা। অথচ সত্য বলতে এই 'অসৎ'ই কিন্তু একমাত্র সত্যকার 'সৎ'।*

যখন বলি অসৎ হতে সতের আবির্ভাব, তখন কিন্তু কালাতীতকে আমরা কালের বিশেষণে লাঞ্ছিত করি। এও আমাদের মনের একটা বিকল্পমাত্র, কারণ অসতের বুকে সতের জন্ম হল যে-পরমক্ষণে, অথবা কালের যে-মুহূর্তে অবাস্তব সতের প্রলয় হল শাশ্বত শূন্যের করাল গহ্বরে, কার পাঁজিতে সে-দুটি মহালগ্নের সন্ধান মিলবে? সৎ আর অসৎকে অন্যোন্যসম্বন্ধের সূত্রে গাঁথতেই যদি হয়, তাহলে দুয়ের যৌগপদ্য না মেনে তো উপায় নাই। পরস্পরকে তারা বইতে পারে কিন্তু সইতে পারে না; আবার কালের ভাষায় বলতে গেলে উভয়েই তারা শাশ্বত। কিন্তু সৎ যদি শাশ্বতই হয়, তাহলে 'তত্ত্বত সৎ নাই, আছে শুধু শাশ্বত অসৎ,' একথার অর্থ হয় কোনও? এমনি করে সর্বনাশের অতলে সকল অনুভব তলিয়ে দিলে তার তত্ত্ব আবার কোথায় পাব?

---

* একটি উপনিষদে আছে, 'অসৎ হতে কি করে হবে সতের উৎপত্তি? সৎ তো সৎ হতেই জন্মাতে পারে শুধু।' কিন্তু অসৎ বলতে একান্ত-অবাস্তব শূন্যতা না বুঝে যদি বুঝি সত্তা-সম্পর্কে আমাদের অনুভব বা ধারণার অতীত একটা অনির্বচনীয় তত্ত্ব, তাহলে উপনিষৎ-কল্পিত অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন মোটেই ওঠে না। অসৎকে তখন বলতে পারি অদ্বৈতবেদান্তীর নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা বৌদ্ধের শূন্য। এই 'তৎ'-স্বরূপ অসৎ হতে বিবর্ত বা পরিণামের মায়ায় কিংবা আ-ভাস বা আত্মবিসৃষ্টির বশে সত্যের আবির্ভাব অসম্ভব নয়।

অতএব মানতে হবে পরমার্থসৎ স্বরূপত অবিজ্ঞেয়। বিশ্বসম্ভূতির স্ব-তন্ত্র অধিষ্ঠানরূপে নিজেকে যখন কলিত করেন তিনি, তখন তাঁকে বলি 'সৎ-স্বরূপ' : আর বিশ্বের সম্ভূতি হতে নির্মুক্ত তাঁর পরম স্বাতন্ত্র্যকেই বলি তাঁর 'অসৎ-রূপ'। এই শেষের স্বাতন্ত্র্য বলতে বুঝি : বিশ্বের মধ্যে থেকে তাঁর স্বরূপসত্তা বুঝতে গিয়ে, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম তুরীয় হতেও তুরীয় যত নিরুপাধিক ইতিকারের ভাবনাই করুক না কেউ—তাকেও ছাড়িয়ে গেছে তাঁর অতিমুক্তি। অথচ ইতিকার দিয়ে তাঁর স্বরূপের সত্য ভাবনা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু কোনও ইতিকারের বেষ্টনীতেই বাঁধা পড়েন না, অন্তহীন ইতিতেও ফুরিয়ে যান না—তাই তো তিনি 'অসৎ'। আবার সেই অসৎ হতেই উথলে ওঠে সৎ, নৈঃশব্দ্য হতে যেমন ঝরে লীলার ধারা। এমনি করে ইতি আর নেতির সমাহারে অন্যোন্যসম্বন্ধই সূচিত হয় পরিপূরকের মত—অন্যোন্য-অভাব নয়। তাই প্রবুদ্ধ জীবচেতনায় আত্মসংবিতের তত্ত্বরূপ ফুটে ওঠে তুর্যাতীতের অবিজ্ঞেয় ভূমিকাতেই—পরা সংবিতের অসমোর্ধ্ব অনুভবে মিটে যায় ইতি ও নেতির দ্বন্দ্ব। সম্যক্-সম্বোধিতে এ-সৌষম্য সম্ভব বলেই বুদ্ধদেব লোকোত্তর নির্বাণপদে আরূঢ় থেকেও কর্মের প্রচণ্ড আন্দোলন তুলেছিলেন জগতে, অন্তশ্চেতনায় নৈর্ব্যক্তিক হয়েও সার্থক ব্রতের উদ্‌যাপনে ব্যক্তিচেতনার চরম চমৎকার দেখিয়ে গেছেন পৃথিবীতে।

বাস্তবিক অনুভবের জগতেও 'বাগ্ বৈখরী শব্দঝরীর' কী যে জুলুম! সত্যদৃষ্টি ফোটে যখন, তখন দেখি এই জুলুমের পিছনে লুকিয়ে আছে কী যে গভীর ভাবের দৈন্য, চুলচেরা সূক্ষ্মতার অজুহাতে মূঢ়বুদ্ধির কত যে বঞ্চনা। এই যে ব্রহ্মের 'পরেও আমরা আরোপ করি ইতি-নেতির যত লাঞ্ছন, তাতে প্রকাশ পায় আমাদের ব্যক্তিমনেরই অনুভবের সংকীর্ণতা। অবিজ্ঞেয়ের একটি বিভাব যদি সে ইতি দিয়ে আঁকড়ে ধরে, অমনি আর-সব বিভাব মুড়িয়ে বা উড়িয়ে দিতে চায় নেতির ঝটকায়। নির্বিশেষের যে-কোনও অনুভব বা ধারণাকে আমরা তর্জমা করি ব্যক্তিগত বিশেষণের রং মাখিয়ে। 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'-এর তত্ত্বই যখন প্রচার করি জোরগলায়, উগ্র অহংকারে তখনও অপরের খণ্ডদর্শন ও ক্লিষ্ট মতের বিরুদ্ধে ঝেঁটিয়ে তুলি নিজেরই অসম্যক্ অনুভব ও মতুয়ার বুদ্ধির ধুলা। তার চেয়ে ভাল নয় কি সহিষ্ণু হয়ে শিক্ষার্থীর বিনয় নিয়ে অনুভবের পুঁজি বাড়ানো? ভাষাতীতকে যখন ভাষায় রূপ দিতেই হবে আমাদের—আর কিছু না হ'ক অন্তত নিজেকে ভরিয়ে তোলবার জন্যে—তখন কেন সবার চেয়ে বৃহৎ স্বচ্ছন্দ ও উদার হবে না তাঁর পরিচিতির সকল বাণী, যাতে তার মধ্যে রণিত হয়ে ওঠে বৃহৎসামের বিপুল মূর্ছনা?

তাই আমরা স্বীকার করি, ব্যক্তিচেতনা এমন জায়গায় পৌঁছতে পারে

যেখানে সব ব্যবহার অব্যক্তে লীন হয়ে যায়। এমন-কি আত্মার সংজ্ঞাও একটা বিকল্পনা সে-ভূমিতে। নৈঃশব্দ্যের ওপারে গহনতর নৈঃশব্দ্যে, 'আদিত্যের কৃষ্ণরূপকে ছাড়িয়ে পরঃকৃষ্ণরূপে'ও অবগাহন চলতে পারে। কিন্তু এতেই কি আমাদের অনুভবের পূর্ণ ও চরম চরিতার্থতা—শুধু বিনাশের সত্যেই কি মিথ্যা হয়ে যাবে সম্ভূতির সত্য? আমরা জানি, আত্মার এই পরিনির্বাণে অন্তরে নেমে আসে পরা শান্তি ও প্রমুক্তির যে বিপুল প্রবাহ, স্বচ্ছন্দেই সে উৎসারিত এবং যুক্ত হতে পারে ব্যাবহারিক জীবনের কামনাহীন অথচ বীর্যময় কর্মে। স্পন্দহীন নৈর্ব্যক্তিকতায় এবং প্রশান্তির রিক্ততায় নিজের মধ্যে অবিচল থেকে শীল সত্য ও প্রীতির শাশ্বত ছন্দে বাইরের জগৎকে দুলিয়ে দেওয়া—সম্ভবত বুদ্ধের ধর্মচক্রের এই ছিল মূল প্রবৃত্তি। কারণ, এ-আদর্শের মূলে আছে অহং হতে, ব্যক্তিগত কর্মের শৃঙ্খল হতে, ক্ষণভঙ্গুর নামরূপের অভিনিবেশ হতে প্রমুক্তির প্রেরণা—শুধু স্থূল দেহধারণের দুঃখ ও দৌর্মনস্য হতে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাবার হীনবুদ্ধি নয়। আসল কথা, সিদ্ধপুরুষের জীবনে যেমন ঝঙ্কৃত হবে নৈঃশব্দ্যের গীতিস্পন্দ, পূর্ণচেতন জীবও তেমনি ফিরে যাবে অসম্ভূতির নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে—কিন্তু বিশ্বসম্ভূতির ছন্দোদোলাকে সে ভুলবে না তা বলে। এমনি করে চলবে তার মধ্যে দিব্য-পুরুষের দৈবী মায়ার অন্তহীন আবর্তন, যে-মায়ার উল্লাসে বিশ্বে থেকেও বিশ্বকে এমন-কি আপনাকেও ছাড়িয়ে যান তিনি। কিন্তু বিনাশের অনুভব তার বিপরীত; তাতে আছে শুধু অসতের দিকে ব্যক্তি-মনের একাগ্র ভাবনা। তার ফলে কেবল ব্যক্তিরই বিস্মৃতি এবং নিবৃত্তি ঘটে বিশ্বস্পন্দ হতে, কিন্তু পরমার্থসতের শাশ্বত চেতনায় বিশ্বের মহারাস তেমনি অক্ষুণ্ণ আনন্দেই চলে লীলায়িত হয়ে।

এমনি করে বিশ্বচেতনায় চিৎ ও জড়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনায় পাই সকল ইতি ও নেতির পরম সমন্বয়। ইতিবাদ দিয়ে আমরা অবিজ্ঞেয়ের স্থিতি বা স্পন্দকে চাই প্রকাশ করতে। আর নেতিবাদ দিয়ে বোঝাতে চাই সেই স্থিতি বা স্পন্দে অনুস্যূত অথবা তাহতে নির্মুক্ত তাঁর নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য। যাঁকে বলি অবিজ্ঞেয়, একান্ত-অসৎ তো নন তিনি; অথচ সৎস্বরূপ হয়েও অনিরুক্ত পরম আশ্চর্য তিনি আমাদের কাছে। মুহূর্তে-মুহূর্তে এই চেতনায় বিচিত্ররূপে রূপায়িত হয়েও প্রতিমুহূর্তে তিনি সেই রূপায়ণের 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্!' তাঁর এই লুকাচুরিকে তো নষ্টামি বলতে পারি না, বলতে পারি না খেয়ালী মায়াবীর মত প্রতিপদেই তিনি শুধু বঞ্চনার ঘোর ঘনিয়ে তুলছেন এই জগতে। কিন্তু তাঁকে বলব, পরম 'মায়ী'; সত্যের উত্তরায়ণে এই মর্ত্য-চেতনারই চিন্ময় দিশারী তিনি, নিয়ে চলেছেন সেই মহাবিষুবের উত্তরবিন্দুতে, যেখান হতে শুরু হল আদিত্যদীপ্তির লোকোত্তর

অভিযান। চিন্ময় বস্তুসৎরূপেই ব্রহ্ম সর্বগত—দুরপনেয় বিভ্রমের সর্বগত নিমিত্ত তিনি নন।

ইতি-বাদের 'পরেই যদি সৌষম্যের ভিত্তি গড়তে চাই এমনি করে, (এছাড়া কি-ই বা হতে পারত সৌষম্যের আধার ?)—তাহলে অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের সম্পর্কে যত ভাবনা বা সংকল্পনা, মনের মধ্যে তাদের সবাইকে ঠাঁই দিতে হবে অবিরোধে—বাস্তব জীবনের 'পরে তাদের প্রভাবকে মেনে নিয়ে। কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে অধরাকে ধরবার একটা অকৃত্রিম প্রয়াস, অবর্ণনীয়ের একটা সত্যকার বর্ণবিভূতি; তাই তাদের যে-কোনও একটিকে বিবিক্ত বা ঐকান্তিক প্রাধান্য দিয়ে আর-সবাইকে ছেঁটে ফেললে কি দাবিয়ে রাখলে চলবে না। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই দর্শনই সত্যকার অদ্বৈতদর্শন; তার মধ্যে অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বকে সত্য-অনৃত, ব্রহ্ম-অব্রহ্ম, আত্মা-অনাত্মা, আত্মবস্তু আর অবস্তু অথচ শাশ্বত মায়া—এমনতর বিরুদ্ধ তত্ত্বে ভাগাভাগি করবার কথাই ওঠে না। একমাত্র আত্মাই আছেন এই যদি সত্য হয়, তাহলে এও সত্য যে যা-কিছু দেখছি সমস্তই আত্মা। আত্মা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে যদি স্বয়ংপ্রজ্ঞ ও সর্বময় বলে জানি, যদি তাঁকে অনীশ্বর খিলবীর্য কঞ্চুকাবৃত পুরুষ বলে না মনে করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে তাঁর এই বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে আছে একটা সুসংগত ও স্বাভাবিক হেতু-প্রত্যয়। তখন সেই হেতুকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাই হবে মানুষের পুরুষার্থ। তার জন্যে, এই বিসৃষ্টির মূলে রয়েছে যে প্রজ্ঞা বীর্য ও স্বভাবসত্যের একটা প্রৈতি—এই কথা মেনেই সত্যের সন্ধানে আমরা এগিয়ে যাব। জগতে বৈষম্য আছে, অনর্থ আছে কোথাও-কোথাও, একথা মানতে আপত্তি নাই আপাতত। কিন্তু মানুষ হয়ে কি করে হার মান্‌ব তাদের কাছে ? মানুষের অন্তরতম সহজবুদ্ধি এই বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে চিরকাল খুঁজে এসেছে এক দিব্যকবির মনীষা—শাশ্বত বিভ্রমের ছলনা নয়, এক নিগূঢ় কল্যাণশক্তির চরম অভ্যুদয়—সর্বপ্রসবিনী অনর্থসন্ততির অচল প্রতিষ্ঠা নয়, এক সর্বজয়া মহাশক্তির পরমা সিদ্ধি—উত্তরায়ণের অভিযান হতে ব্যর্থকাম জীবের অবসন্ন পরাবর্তন নয়। তার এই আশা ও এষণাকে কি বলব মূঢ়তা ?

অদ্বিতীয় পরমার্থসতের বাইরে কিছুই যখন থাকতে পারে না, তখন বহিরঙ্গ কোনও শক্তির জোর খাটে কি তাঁর 'পরে, কোনও পরবশতায় কি ক্ষুণ্ণ হতে পারে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ? একথাও তো বলা চলে না যে তাঁর অখণ্ড সত্তার একদেশে আছে এমন-একটা বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ, যার কাছে অনিচ্ছাতেই হার মানতে হয় তাঁকে, তাকে দূরে ঠেলবার চেষ্টা করেও তিনি কিছু করতে পারেন না। কারণ একথা বললে সর্বময়ের সঙ্গে তাঁর বাইরের একটা-কিছুর বিরোধকে প্রকারান্তরে যুক্তিযুক্ত বলে মানতে হয়। যদি

বলি ঃ বিশ্বে যা-কিছু ঘটছে, আত্মা তার সম্পূর্ণ নিষ্পক্ষ উপদ্রষ্টা শুধু—যা ভূত এবং ভব্য তাদের তিনি ঈশান নন, কেবল ভ্রূক্ষেপহীন ঔদাসীন্যে চেয়ে আছেন তাদের দিকে এবং তাতেই বিশ্ব চলছে; তাহলেও মানতে হবে, এই বিসৃষ্টির মূলে আছে কারও সংকল্প কারও বিধৃতি—নইলে শুধু যদৃচ্ছার বশে এ চলছে কেমন করে? কিন্তু ব্রহ্ম সর্বময় হলে এই সংকল্প ও বিধৃতি তাঁর ছাড়া আর কারও হতে পারে না। অখণ্ড ব্রহ্ম বিশ্বে সর্বগত হয়ে আছেন; অতএব যা-কিছু সংকল্পের খেলা তার মধ্যে, মূলত তা ব্রহ্মসংকল্পেরই প্রবেগ হতে জাত। বিশ্বের আপাতিক অনর্থ অজ্ঞান ও দুঃখে ত্রস্ত এবং পরাহত হয়েই আমাদের খণ্ডচেতনা মনে করে—এই সর্বনাশা বিপত্তির দায় হতে ব্রহ্মকেও অব্যাহতি না দিলে বুঝি চলে না। তাই জগতের আঁধার দিকটার একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতে তার দরকার হয় শিবসংকল্পের বিরোধী মায়া মার শয়তান বা অহ্রিমনের মত একটা স্বয়ম্ভূ অশিবশক্তির কারসাজি। কিন্তু এ-কল্পনাও মনের মায়া শুধু, কেননা তত্ত্বত এক অখণ্ড পরমাত্মাই আছেন মহেশ্বররূপে—বহু তাঁর প্রতীক এবং বিভূতি মাত্র।

জগৎ যদি স্বপ্ন বিভ্রম বা ভ্রান্তিও হয়, তবু এ-স্বপ্নের মূলে আছে অখণ্ড আত্মস্বরূপের সংকল্প এবং প্রেতি। শুধু তা-ই নয়, সে-স্বপ্নকে নিত্য ধারণ ও চরিতার্থও করছেন তিনিই। তাছাড়া পরমার্থসতের মধ্যেই তো এ-স্বপ্নের বাস্তব বিলাস, তিনিই তো এর স্বরূপধাতু; কারণ ব্রহ্ম যেমন জগতের আধার এবং অধিষ্ঠান, তেমনি তার উপাদানও তো তিনিই। যে-সোনা দিয়ে পাত্র হল, সে-সোনা যদি সত্য হয়, পাত্রটা তাহলে কি করে হয় মরীচিকা? বস্তুত 'স্বপ্ন', 'বিভ্রম' এসব শুধু কথার মারপ্যাঁচ বা আমাদের খণ্ডিত চেতনার সংস্কারমাত্র। কিছু সত্য তাদের মধ্যে আছে এবং তার গুরুত্বও কম নয়, তবুও তারা সত্যের প্রকাশকে বিকৃতই করেছে। যেমন 'অসৎ' শুধু অর্থক্রিয়াকারিতাশূন্য নাস্তিত্ব নয়, তেমনি স্বপ্নও শুধু মনের বিভ্রম বা কুহক নয়। প্রতিভাস সত্যেরই বাস্তব রূপায়ণ, অবাস্তব মরীচিকা নয় শুধু।

অতএব এক সর্বগত পরমার্থসতের স্বীকৃতি নিয়ে শুরু হল আমাদের এষণা। এই পরমার্থের এক কোটিতে অসৎ, আর-এক কোটিতে বিশ্ব—কিন্তু দুয়ের মাঝে মারাত্মক বিরোধ নাই কোনও। বরং তারা একই তত্ত্বের দুটি বিভাব মাত্র—নেতি আর ইতির আকারে। বিশ্বে এই পরমার্থসতের সর্বোত্তম অনুভবে ফোটে শুধু তাঁর চিন্ময় সত্তা নয়—ফোটে তাঁর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও বীর্যের ঐশ্বর্য, তাঁর স্বয়ম্ভূ আনন্দের বিলাস। আবার বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবে জাগে তাঁর অবিজ্ঞেয় সদ্ভাব, অনির্বচনীয় পরমানন্দের মূর্ছনা। তাই ইন্দ্রিয়বোধের আশ্রিত একদেশী বৃত্তি দিয়ে নয়, প্রমুক্ত বুদ্ধির অখণ্ড অপরোক্ষ বৃত্তি দিয়ে যদি বিশ্বের দৈবতলীলা অনুভব করি, তবে তারও মধ্যে

যে সচ্চিদানন্দের লোকোত্তর মহিমাকেই প্রত্যক্ষ করব, আমাদের এ-সংকল্পনা অসংগত নয়। যতক্ষণ দ্বৈতের চাপে বুদ্ধি ভারাক্রান্ত থাকবে, ততক্ষণ এই দিব্য অনুভবের সম্ভাবনাকে শুধু শ্রদ্ধায় আমরা লালন করব হয়তো, কিন্তু তবু জানব সে-শ্রদ্ধার পিছনে আছে বুদ্ধিযোগের দীপ্তি এবং সংস্কারমুক্ত সর্বতোদর্শী বিচারের অকুণ্ঠ সমর্থন। এই শ্রদ্ধার অবদানই হল উত্তরায়ণের যাত্রাপথে মানুষের প্রথম দিশারী; কিন্তু অধ্যাত্মপরিণামের ফলে একদিন এমন ভূমিতে সে পৌঁছবে, যেখানে শ্রদ্ধা ধরবে অখণ্ড অনুভব ও বিজ্ঞানের রূপ এবং পূর্ণপ্রজ্ঞার মধ্যে সার্থক হবে তার লীলায়ন।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবের নিয়তি

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।

ঈশোপনিষৎ ১১, ১৪

অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা বিদ্যার দ্বারা অমৃতকে করে সম্ভোগ;...বিনাশ দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা সম্ভূতি দ্বারা অমৃতকে করে সম্ভোগ।

—ঈশ উপনিষদ (১১, ১৪)

বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বসত্তা সবিশেষ-নির্বিশেষ, সকায়-অকায়, সজীব-নির্জীব, সচেতন বা অচেতন যা-ই হ'ক না কেন, এক সর্বগত পরমার্থসৎই যে তার মর্মসত্য—এই শ্রদ্ধা আমাদের প্রচেতনার ভিত্তি। ব্যাবহারিক জীবনের নিত্যপরিচিত নানা দ্বন্দ্ব হতে শুরু করে মার্জিত বুদ্ধির যে সূক্ষ্মতম দ্বন্দ্ব অসীমের অনির্বচনীয় রহস্যের কূলে এসে এলিয়ে যায়, সে-সবার মধ্যে আছে পরমার্থসতের অনন্তবিচিত্র আত্মরূপায়ণের লীলা। অথচ নিত্য-উপচিত এই বিরোধাভাসের মধ্যেও তিনি অখণ্ড, অবিভাজ্য, পরম এক—শুধু বহুর সমষ্টি বা সমাহার তিনি নন। সেই অখণ্ড সত্তা হতে এই বিচিত্র বিভূতির উদ্ভব, তাঁতেই তারা লীলায়িত, পরিণামে তাদের প্রলয়ও তাঁরই মধ্যে। তাঁর সম্পর্কে সর্ববিধ ইতির প্রতিষেধ আমাদের নিয়ে যায় তাঁর অনুত্তর পরম স্বীকৃতির দিকে। 'অরা নাভাবিব'—চক্রের নাভিতে অরের মত বিরুদ্ধ-প্রত্যয়ের সকল দ্বন্দ্ব সমাহিত হয় অখণ্ড সত্যের পরম প্রত্যয়ে। প্রত্যয়ের আপাতবৈষম্যে ফুটে ওঠে একই সত্যের বিভূতিভেদ শুধু—অন্যোন্যদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তারা খুঁজে পায় অন্যোন্যসঙ্গমের পথ। ব্রহ্মই নিখিলের আদি এবং অবসান, ব্রহ্মই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কিন্তু এই একত্ব স্বরূপত অনির্বচনীয়। মন দিয়ে যখন তার নাগাল পেতে চাই, তখন বিচিত্র ধারণা ও অনুভবের অন্তহীন পরম্পরার ভিতর দিয়েই রচতে হয় আমাদের মানস-অভিসারের পথ। কিন্তু যাত্রাশেষে সত্যধৃতির চরম ব্যাপ্তি ও অনুভবের সর্বাবগাহী বিস্তারকেও আমাদের লাঞ্ছিত করতে হয় 'নেতি'-বাচন দ্বারা—শুধু এই প্রত্যয়কে ব্যক্ত করতে যে, পরমার্থসৎ সকল বিশেষণের অতীত। উপনিষদের ঋষির মতই তখন আমাদের বলতে

হয়—'নেতি নেতি' : এমন-কোনও অনুভব আমাদের সম্ভব নয়, ব্রহ্ম যার কবলিত হবেন; এমন-কোনও ধারণা আমাদের নাই, যা দিয়ে তাঁকে বিশেষিত করব।

পরমসত্যের বেলায় এই হতে পারে মনের চরম রায় : বস্তু-সৎ স্বরূপত অজ্ঞেয়; আমাদের কাছে সে শুধু ধরা পড়ে সত্তার বিচিত্র বিভাব ও পর্যায়ে-চেতনার বিচিত্র রূপায়ণে, শক্তির বিচিত্র উল্লাসে। অথচ এই বস্তু-সৎ শুধু যে আমাদের স্বরূপধাতু তা নয়, বুদ্ধি- এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকল-কিছুতেই আমরা তার অনুভব পাই। সত্তা চেতনা ও শক্তির এই বিচিত্র বিভূতি দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে, তাদের আশ্রয় করেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে সেই অজানার অভিসারে। অধরাকে ধরে আপন মুঠায় বন্দী করে রাখবে, অনন্তকে বাঁধবে সান্তের ব্যাকুল আলিঙ্গনে—এমন-একটা ব্যগ্রতা মানুষের মনে আছে। তার প্ররোচনায়, পরমার্থের অনুত্তর সত্তার একটি বিশিষ্ট বিভাবকেই শাশ্বত-নিরঞ্জন জ্ঞানে যদি সে স্বরূপসত্যের আসন দেয়; তার যে-কোনও বিশিষ্ট পর্যায় বা ধর্মে ব্যাপ্তির যত ঔদার্যই থাকুক, তাকেই সত্যের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে যদি ধরে নেয়; চেতনার যে-কোনও বিশিষ্ট রূপায়ণ যত বিপুল ব্যঞ্জনারই বাহন হ'ক, তাকেই যদি দেয় অখণ্ড চিৎস্বরূপের মর্যাদা; শক্তির যে-কোনও স্ফুরণ অমেয় সামর্থ্যের বিলাস বলেই তার দৃষ্টিকে যদি করে সংকীর্ণ; এমনি করে পরামর্থসতের একটি বিভাবকেই একান্ত করে তুলে আর-সকল বিভাবের প্রতি সে যদি হয় অন্ধ : তাহলে অবিজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ের কোঠায় নামিয়ে এনে মানুষের মন তাঁর অপ্রতর্ক্য মহিমাকেই খর্ব করে এবং তার ফলে সে পেঁছয় অখণ্ডের খণ্ডবোধে শুধু—একবিজ্ঞানের পরমসত্যে নয়।

পরমার্থসৎ সকল বিশেষণের অতীত, এ-প্রত্যয় প্রাচীন বৈদান্তিক ঋষিদের দর্শনে এতই নিরূঢ় ছিল যে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অপরোক্ষ অনুভবকে তৎপদার্থের স্বরূপখ্যাতি বা 'ইতি'-রূপের চরম ভাবনা বলে ঘোষণা করেও তাঁরা থেমে যাননি। তারও পরে, বিকল্পবৃত্তি দিয়েই হ'ক অথবা সাক্ষাৎ অনুভব দিয়েই হ'ক, সতেরও ওপারে স্থাপন করেছেন তাঁরা এক 'অসৎ', এক চরম ও পরম প্রতিষেধ—যা আমাদের তুরীয়-প্রত্যয়গ্রাহ্য পর-সৎ-শুদ্ধ-চিৎ ও অনন্ত আনন্দেরও উজানে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আমাদের সকল অনুভবের উৎস ও পর্যবসান; কিন্তু ঋষির 'অসৎ' তাকেও পেরিয়ে গেছে। তার অনুভব বস্তুতই অনির্বচনীয়। যদি সৎ চিৎ অথবা আনন্দই বলতে হয় তাকে, তাহলেও সচ্চিদানন্দ বলতে আমরা সৎস্বরূপের যে বিশুদ্ধতম পরম অনুভব পাই ইতির চেতনায়, অসৎস্বরূপের সচ্চিদানন্দ হবে তারও পরপারে। অতএব আমাদের পরিচিত সচ্চিদানন্দের সংজ্ঞা তাতে আরোপ করা চলবে না। এদেশের শাস্ত্রপণ্ডিতেরা কতকটা অবিচার করেই বৌদ্ধধর্মকে

ঘোষণা করেছেন অবৈদিক বলে, কেননা বৌদ্ধেরা অপৌরুষেয় শাস্ত্রের শাসন মানেন না। কিন্তু এই বৈদান্তিক অসৎ-বাদ বস্তুত বৌদ্ধধর্মেরও লক্ষ্য। তার সঙ্গে উপনিষদের অনুশাসনের এই তফাত শুধু—উপনিষদের বাণীতে আছে সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা, অনুভবের 'ইতি'র দিকটাকে বড় করে দেখা। তাই সৎ আর অসৎ দুটি অন্যোন্যব্যাবৃত্ত তত্ত্ব নয় তার মধ্যে; তারা বুদ্ধিজাত বিরোধ-প্রত্যয়ের চরম নিদর্শন মাত্র। আবার এই বিরোধের পটভূমিকারূপে আমরা পাই অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের একটা আভাস। বাস্তবিক কোথায় বিরোধ নাই? ইতি-প্রত্যয় নিয়ে যে-দর্শনের কারবার, তাতেও এক-বিজ্ঞানকে বোঝাপড়া করতে হয় বহু-বিজ্ঞানের সঙ্গে—কেননা বহুও যে ব্রহ্মস্বরূপ। এক-বিজ্ঞান বা বিদ্যা দিয়ে আমরা জানি পরমদেবতাকে; বিদ্যার সমাবেশ না থাকলে অবিদ্যা 'অন্ধং তমঃ', বা 'ভূরি অনৃত'—সে ফোটায় শুধু বহুর বিশিষ্ট চেতনা। অথচ বিজ্ঞানের সাধনায় যদি অবিদ্যাকে বাদ দিয়ে চলি, অসৎ ও অবস্তু ভেবে নিরাকৃত করি তাকে, তাহলে বিদ্যাও হয় 'ভূয় ইব তমঃ'—যেন আরও অন্ধকার—পূর্ণসিদ্ধির অন্তরায় যেন। বিদ্যার আলোতে চোখ ঝলসে যাওয়ায় অবিদ্যার কোন্ ক্ষেত্রকে সে উদ্ভাসিত করছে, তার আর দিশা পাই না তখন।

প্রাচীনতম ঋষিদের এই অনুশাসনে আছে স্বপ্রতিষ্ঠ প্রজ্ঞার নির্মল দৃষ্টি। ঋষিদের বিদ্যার এষণায় ধৈর্য এবং বীর্য দুইই ছিল। কোথায় মানুষের জ্ঞানের সীমা, নম্রভাবে তা স্বীকার করবার মত প্রজ্ঞার বৈশারদ্যও তাঁদের ছিল। মানুষের জ্ঞান আপন সীমার বাইরে চলে যায় যে প্রত্যন্তভূমিতে এসে, তার খবর তাঁদের অজানা ছিল না। পরের যুগে এল হৃদয় এবং মনের একটা অদম্য অধীরতা, অনুত্তর আনন্দের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ, শুদ্ধসংবিতের একটা সর্বগ্রাসী প্রভাব। বুদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একের এষণাকে প্রতিষ্ঠিত করল বহুর অস্বীকৃতির 'পরে। অনুভবের তুঙ্গশৃঙ্গে মুক্তি পেয়ে রহস্যের অতলতার প্রতি বুদ্ধি হল বিরূপ অথবা পরাঙ্মুখ। কিন্তু পুরাণী প্রজ্ঞার স্থির দৃষ্টির কাছে এ-বিরোধ ছিল না। প্রাচীন ঋষিরা বুঝতেন, পরমদেবতাকে তত্ত্বত জানতে হলে সর্বত্র সমভাবে তাঁকে দেখতে হবে অভেদবুদ্ধি নিয়ে; তাঁর আত্মরূপায়ণের বৈচিত্র্যে আপাতবিরোধের যে-লীলা, শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করতে হবে—কিন্তু তার দ্বারা অভিভূত হলে চলবে না।

তাই একদেশদর্শী তর্কবুদ্ধি ভেদদৃষ্টিকেই একান্ত করে যদি বলে: বহুত্ব একটা অবাস্তব বিভ্রম মাত্র, কারণ অদ্বিতীয়-একই পরামর্থসত্য; একমাত্র নির্বিশেষই আছেন সৎস্বরূপ হয়ে, অতএব সবিশেষ বন্ধ্যাপুত্রের মতই অসৎ;—তাহলে তার এই রায়কে আমরা কিছুতেই মানতে পারব না। বহুর

মধ্যে একের এষণা আমাদের পরমপুরুষার্থ সত্য, কিন্তু তার সিদ্ধি আমাদের চেতনাকে প্লাবিত করবে অপরোক্ষ অনুভবের সেই পুণ্যচ্ছটায় যাতে আমরা আবার সেই এককে দেখব ভূতে-ভূতে 'সর্বেষাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।'

আর একটা বিষয়ে সতর্কতা চাই। অন্তর্গূঢ় শক্তির বিস্ফোরণে মন যখন এক ভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় উদারতর আরেকটা ভূমিতে, তখন সেই গোত্রান্তরের ফলে যে-কোনও বিশিষ্ট দৃষ্টি অতিমাত্রায় একান্ত হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। সত্যার্থীকে মনের এই অতিচার সাবধানে এড়িয়ে যেতে হয়। জড় মনের যে-দর্শন লোকোত্তর-ব্রহ্মবাদকে ভাবে একটা অলীক কল্পনা, আমরা তাকে ঠেলে ফেলি। কিন্তু চিন্ময় মন যদি উপলব্ধি করে, বিশ্ব একটা অবাস্তব স্বপ্নমাত্র, তাহলে তার অনুভবকেই-বা নির্ব্যূঢ় সত্য মনে করব কেন? জড় মন ইন্দ্রিয়সংবেদনে অভ্যস্ত শুধু, তাই বস্তুর তত্ত্বকে স্থূলবিগ্রহের তথ্যে না ঢেলে সে বুঝতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বাইরেও যে কোনও প্রমাণ থাকতে পারে, কিংবা সত্যধৃতিকে যে জড়াতীত ভূমিতেও উত্তীর্ণ করা চলে, এ তার কল্পনায় আসে না। আবার সেই মনই যখন প্রাকৃতচেতনার এলাকা ছাড়িয়ে চলে যায় বিদেহতত্ত্বের সর্বাতিভাবী অনুভবে, তখন সম্যক্-দর্শনের অসামর্থ্যকে সেও সংস্কাররূপে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় ভূমিতে। তাই তার একদেশী দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়সংবেদন দেখা দেয় স্বপ্ন বা কুহকরূপে। কিন্তু অনুভবের এই দুটি মেরুতেই আছে স্বরূপসত্যের কুণ্ঠাবিকৃত প্রকাশ শুধু। তার আসল পরিচয় তো আমাদের অগোচর নয়। একথা সত্য, আমাদের আত্মোপলব্ধির সাধনক্ষেত্র এই যে রূপের জগৎ, তার মধ্যে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বলে মানতে পারি তাকেই, যা অপ্রাকৃত হয়েও প্রাকৃতচেতনায় আবিষ্ট হয়েছে তার লোকোত্তর বিভূতিকে এখানকার ছন্দে ঢেলে। আবার একথাও সত্য, জড় এবং তার ব্যাকৃতিতে যে স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বরূপের ভান, তাও অবিদ্যার বিভ্রম ছাড়া আর-কিছুই নয়। জড়ের ব্যাকৃতি যদি জড়াতীত বিদেহ-সত্যের আত্মরূপায়ণের উপাদান ও রূপরেখা হয়, তবে সেই হবে তার সত্য পরিচয়। বস্তুত জড়ের রূপ দিব্যচেতনার একটা লীলায়ন—এই তার স্বরূপ। চিৎস্বরূপের স্বধাকে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলছে সে—এই তার প্রয়োজন।

কথাটা এই। অরূপ ব্রহ্ম রূপী হয়ে তাঁর চিন্ময় সত্তাকে বিভাবিত করেছেন জড়ধাতুতে। তাঁর এ-লীলার তাৎপর্য শুধু চিদাভাসের সবিশেষ ব্যঞ্জনাতে আত্মবিসৃষ্টির আনন্দকে সম্ভোগ করা। ব্রহ্ম জগৎ হয়েছেন প্রাণের বৈচিত্র্যে নিজকে ফুটিয়ে তুলতে। প্রাণ ব্রহ্মে নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত—নিজের মধ্যে ব্রহ্মের ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করবে বলে। এইখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মানবচেতনার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। বিশ্বের চেতনাকে মানুষ উত্তীর্ণ করে

সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মস্বরূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধিতে তার রূপান্তরসিদ্ধি সহজ হয়। পরমদেবতাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলা—মানুষের মনুষ্যত্বের এই তো পরিচয়। তার যাত্রা শুরু পশুপ্রাণের বিচিত্র প্রবৃত্তি হতে, কিন্তু দিব্যজীবনের উদ্‌যাপনে তার যাত্রা শেষ।

কি মননে, কি জীবনে আত্মোপলব্ধির ঋতময় ছন্দ ফোটে সর্বাবগাহী সংবিতের উপচয়ে। ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করছেন চেতনার বহু-বিচিত্র পর্যায়ে। সকল পর্যায়ই মহাকালের স্বরূপসত্তায় যুগপৎ আবির্ভূত। তবু তাদের মধ্যে সম্বন্ধের পারম্পর্য আছে। প্রাণকেও সেই ধারা ধরে আত্মসত্তার নিত্যনূতন ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে চলতে হয় নিজের রূপ। কিন্তু তাবলে এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে উঠতে গিয়ে প্রাক্তন সিদ্ধিকে বর্জন করলে চলে না নবীন সিদ্ধির উন্মাদনায়। মনোময় জীবনে পেঁছে তার অন্নময় ভিত্তিকে প্রত্যাখ্যান বা তাচ্ছিল্য করি যদি, অন্ন-মনোময় ভূমির প্রতি বিমুখ হই যদি চিন্ময় ভূমির আকর্ষণে, তাহলে একথা বলতে পারব না যে ব্রাহ্মী চেতনার সম্যক্‌সিদ্ধি আমাদের হয়েছে অথবা তাঁর পরিপূর্ণ আত্মরূপায়ণের সকল ছন্দকেই আমরা মেনে নিয়েছি। জীবনে সিদ্ধি কখনও এমন করে আসে না। এ শুধু অপূর্ণতাকেই এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে ঠেলে তোলা—বড় জোর সিদ্ধির কয়েকটি ধাপ পার হওয়া। অনুভূতির যত উচ্চ শিখরেই উঠি না কেন, এমন-কি অসতের দুর্গম উত্তুংগতাতেও যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তবু এ-অভিযান ব্যর্থ হবে—যদি ভুলে যাই কোথায় ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠা। অবরভূমিকে শুধু ছেড়ে আসা নয় ঔদাসীন্যভরে, পরন্তু উত্তরভূমির জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে প্লাবিত করে তার রূপান্তর ঘটানো—এই হল দিব্যপ্রকৃতির স্বধর্ম। ব্রহ্ম অখন্ড সমগ্রতায় পূর্ণস্বরূপ, তাঁর মধ্যে আছে বহু-বিচিত্র চেতনার যুগপৎ সমন্বয়। অতএব আধারে ব্রাহ্মী চেতনাকে ফোটাতে হলে আমাদেরও অখন্ড সম্যক্‌ সর্বাধার এবং সর্বাবগাহী হতে হবে।

মর্ত্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ছাড়াও উগ্রবৈরাগ্যের আরেকটা অনুচিত অভিনিবেশ আছে আমাদের মধ্যে, যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি—যদি অখন্ডচেতনার সম্যক্‌স্ফুরণকে জীবনাদর্শ করি। চেতনার তিনটি সামান্যরূপ —জীব বা ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বচেতনা এবং তুরীয় বা বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনা। প্রাণ এই ত্রয়ীর সংগে জড়িয়ে আছে অন্যোন্যসম্বন্ধ হয়ে। প্রাকৃত চেতনায় প্রাণপ্রবৃত্তির যে স্বাভাবিক প্রকাশ, জীব তাতে নিজেকে জানে বিশ্বের অন্তর্গত একটা বিবিক্ত সত্তা বলে; আবার নিজেকে ও বিশ্বকে সে মনে করে জীবোত্তীর্ণ ও বিশ্বোত্তীর্ণ এক তুরীয় সত্তার অধীন। এই তুরীয় ভাবকেই সাধারণত বলি ব্রহ্ম। আমরা ভাবি, বিশ্বকে তিনি শুধু যে ছাড়িয়ে গেছেন তা নয়, তিনি আছেন তার বাইরে দাঁড়িয়ে। ব্রহ্মকে এমনি করে জীব ও জগৎ হতে

বিবিক্ত ভাবার স্বাভাবিক পরিণাম এই হল যে, জীব আর জগৎ দুইই আমাদের কাছে তুচ্ছ এবং অপকৃষ্ট হয়ে গেল। অতএব, তুরীয়ভাবের সিদ্ধিতে জীবভাব ও জগৎভাবের নিবৃত্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ—যুক্তির ধারা ধরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় রইল না।

কিন্তু ব্রহ্মের অদ্বৈতভাবকে যদি অনুভব করি সম্যক্-দর্শনের পূর্ণতা নিয়ে, তাহলে আর এই বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় না। মনোময় ও চিন্ময় জীবন ফুটিয়ে তুলতে তো এই স্থূল দেহটাকে ছেড়ে যাবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি সম্যক্-দর্শনও এমন ভূমিতে পৌঁছে দিতে পারে মানুষকে যেখানে জীবপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রেখেই বিশ্বচেতনায় অবগাহন অথবা বিশ্বাতীত তুরীয় চেতনায় অবস্থান—এর মধ্যে অসংগতি কিছুই থাকে না। বিশ্বোত্তীর্ণ যিনি, বিশ্ব যে বাঁধা রয়েছে তাঁর আলিঙ্গনে। বিশ্বে যে তিনি অনুস্যূত, একীভূত—বিশ্ব তো নিরাকৃত নয় তাঁর দ্বারা। তেমনি বিশ্বের বুকেই জীবের বাস, বিশ্ব এক হয়ে আছে তার সঙ্গে—সেও তো জীবকে নিরাকৃত করেনি। সমগ্র বিশ্বচৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু হল জীব। আর বিশ্ব সেই নির্বিশেষ অরূপের বিশেষ রূপায়ণ, যাঁর সর্বাত্মভাবের সমগ্রতায় এই সৃষ্টিলীলা জারিত।

জীব জগৎ ও ব্রহ্মের এই হল সত্য সম্বন্ধ। এ-সত্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের অবিদ্যাবিকৃত দৃষ্টির কাছে। অবিকৃত সত্যচেতনাকে ফিরে পাই যখন বিদ্যার উন্মেষে, তখনও এই শাশ্বত সম্বন্ধের তত্ত্বে কোনও বিপর্যয় হয় না—শুধু জীবের চিৎকেন্দ্র হতে বিচ্ছুরিত তার প্রত্যক্ ও পরাক্ দৃষ্টিতে ফোটে কোন অনুত্তরের দিব্যবিভা। অতএব তার প্রবৃত্তিতেও দেখা দেয় একটা অভিনব পরিণামের ব্যঞ্জনা। জীব তখনও বিশ্বোত্তীর্ণের স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার অপরিহার্য আধার, অতএব দ্যুলোকের জ্যোতিঃসম্পাতেও সে-ক্রিয়ার নিবৃত্তি ঘটে না তার মধ্যে। বরং সম্বুদ্ধ ও প্রভাস্বর জীবচেতনার বিশ্বকর্মে অভিনিবেশ ও অনুবৃত্তি যে তখনও চলে, সে তো বিশ্বলীলারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে। কারণ, বিশ্বগত সমষ্টির মধ্যে আত্মচেতনা ফোটে—ব্যষ্টিতেই বিশ্বোত্তীর্ণের চিন্ময় স্ফুরণ হতে। অতএব ব্রহ্মজ্যোতির সংস্পর্শে জীবের আত্যন্তিক প্রলয়ই তার নিয়তি হত যদি, তাহলে এ-সংসার যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দুঃখ তাপ ও মরণের রঙ্গশালা হয়েই থাকবে অনন্তকাল ধরে, এ-নিয়তিও হত দুর্লঙ্ঘ্য। এমন সংসার তখন জীবের কাছে হয় একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষা, নয়তো একটা অনাদি বিভ্রমের চক্রাবর্তন।

বৈরাগ্যবাদীর ঝোঁক হল সংসারকে দেখা এই দৃষ্টিতে। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে আমাদের ঠাঁই পাওয়াটাই একটা বিভ্রম হয় যদি, তাহলে ব্যক্তির মুক্তির তো বাস্তবিক কোনও অর্থই থাকে না। অদ্বৈতবাদী বলেন : যীব আর

ব্রহ্ম এক, ব্রহ্ম হতে তার ভেদভাব অবিদ্যা মাত্র; ভেদভাব হতে অব্যাহতি পেয়ে যে ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করেছে, সেই মুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হবে, এমন অব্যাহতি-লাভে ইষ্টসিদ্ধি হল কার? পরব্রহ্মের ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই জীবের অব্যাহতিতে, কেননা অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত প্রশান্ত নির্বিকার—তাঁর স্বভাবচ্যুতি কিছুতেই ঘটতে পারে না। সমষ্টি বিশ্বেরও তাতে কোনও লাভ নাই, কেননা সমষ্টিগত বিভ্রম হতে একটি জীবব্যক্তি যদি মুক্তি পায় কোনরকমে, বিশ্বের তো মুক্তি হয় না তাতে। তার বন্ধন তেমনি অটুট থাকে, কারণ বিশ্বের বেলায় বন্ধহেতু অবিদ্যা যেমন অনাদি তেমনি অনন্ত, জীবের মত সান্ত তো নয়। অতএব সংসারচক্র হতে অব্যাহতি পেয়ে লাভ যদি কারও হয়, সে শুধু জীবের। দুঃখতাপ ও খণ্ডবোধের আড়ষ্ট বন্ধন হতে ছাড়া পায় সে-ই। শাশ্বতী শান্তির আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে পুরুষার্থের পরম সিদ্ধিতে সে-ই হয় কৃতার্থ। তাহলেই মানতে হয়, প্রমুক্ত চেতনার জ্যোতিতে উদ্ভাস্বর হয়েও ব্রহ্ম ও জগৎ হতে বিশিষ্ট একটা বাস্তব সত্তা জীবাত্মার বজায় থাকেই কোনরকমে। কিন্তু মায়াবাদীর মতে আত্মার জীবভাব একটা বিভ্রম মাত্র; অনির্বচনীয় মায়ার মধ্যে তার সত্তা কোনও উপায়ে সম্ভাবিত হলেও বস্তুত সে অসৎ। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় : অসৎ মায়িক বিশ্বের অসৎ মায়িক বন্ধনজাল হতে মুক্তি লাভ করছে অসৎ মায়িক জীব এবং এই অনির্বচনীয় মুক্তির সাধনাই হল সেই অসৎ জীবের পরমপুরুষার্থ। কেননা যেখানে সমস্তই কল্পিত অতএব অসৎ, সেখানে কেউ নাই বদ্ধ বা মুক্ত বলে—অতএব মুমুক্ষুও কেউ নাই; এই হল বিদ্যার চরম অনুভব! অর্থাৎ অবিদ্যাও যেমন প্রতিভাস মাত্র, বিদ্যাও শেষ পর্যন্ত তা-ই! আবার দেখি, সেই অনির্বচনীয়া মায়া—আমাদের মুক্তিপথের বাঁকে দাঁড়িয়ে। যে-তর্কবুদ্ধি তার রহস্যজালকে ছিন্নভিন্ন করেছে বলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, মায়াবিনীর হাসির কল্লোলে কোথায় ভেসে গেল তার মূঢ় আস্ফালন!

মায়াবাদী জানেন, তাঁর তর্কে ফাঁক আছে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন ঃ যুক্তি দিয়ে বন্ধন-মুক্তির প্রহেলিকা বোঝানো যায় না; এ-রহস্য অনাদি, এর কোনও সমাধান নাই। তবু আমাদের সাধনজীবনে এ যে একান্ত বাস্তব একটা তথ্য, সে তো মানতেই হবে। একটা ধাঁধা এড়াতে আরেকটা ধাঁধার আশ্রয় নিতে হয় যদি, তাতেই-বা ক্ষতি কি? ক্ষুদ্র অহংএর বাঁধন ছিঁড়তে পারে জীবাত্মা একটা চরম অহমিকার অভিঘাতে—তার ব্যক্তিগত মুক্তির দায়কেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তাতে মায়ার জগতে তার ব্যক্তিসত্তা অত্যন্ত উগ্র ও বিবিক্ত হয়ে দেখা দেয় যদি, আপত্তি কি? আমি ছাড়া আর-কোনও জীবের তাত্ত্বিক সত্তা আছে কি না, তার প্রমাণ নাই। আমি

ছাড়া আর সবাই আমারই মনের বিকল্প শুধু, তাদের মুক্তির প্রশ্নও তাই আমার কাছে নিরর্থক। শুধু আমার আত্মা একান্ত বাস্তব এবং আমার মুক্তিই একমাত্র পুরুষার্থ। বন্ধন হতে আমার ব্যক্তিগত মুক্তিই বিশ্বের একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব; আর-সব জীব আমার আত্মস্বরূপ হলেও থাক্ না তারা বন্ধনের মধ্যে পড়ে।

স্বতোবিরোধে কন্টকিত এই তর্কের ধাঁধা মিটে গিয়ে সুসংগতি দেখা দিতে পারে আমাদের দর্শনে—যদি একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি না করি ব্রহ্ম অথবা আত্মা আর জগতের মাঝে। বিসৃষ্টি অখণ্ডেরই, একথা সত্য। কিন্তু তাবলে কি বৈচিত্র্য নাই সে-বিসৃষ্টিতে, বহুমুখী বিচ্ছুরণ নাই? চোখ থাকতেও যদি অন্ধ না সাজি, তাহলে বিশ্বের যেদিকে তাকাই, সেদিকেই কি দেখি না এই চিত্রবহ অপরূপ সত্যের নিদর্শন? চিৎসত্তার তো বন্ধন নাই কোনও—যেমন নাই বহুত্বের বন্ধন, তেমনি নাই ঐক্যেরও। রহস্যময় হলেও এই কি নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক পরিচয় নয় তাঁর? তাঁকে 'নির্বিশেষ' বলি এই জন্য যে, বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণের অনন্ত সম্ভাবনাকে আপন কুক্ষিগত করে স্বধায় বিলসিত করবার অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য তাঁর আছে। বস্তুতই কেউ নাই বদ্ধ বা মুক্ত বলে, অতএব মুমুক্ষুও কেউ নাই—কেননা তৎস্বরূপ তাঁর অব্যাহত স্বাতন্ত্র্যে নিত্যমুক্ত। এমনিই অকুণ্ঠিত সে-স্বাতন্ত্র্য যে মুক্ত থাকার দায়টুকুও তাঁর নাই। অতএব বাস্তব বন্ধনের দ্বারা অস্পৃষ্ট থেকেই বন্ধন-লীলার অভিনয় করতে তিনি পারেন। বন্ধন স্বকল্পিত একটা বিশেষণ তাঁর পক্ষে। অহংএর সীমায় আপনাকে বাঁধা তাঁর বিসৃষ্টির একটা সাময়িক ভঙ্গি শুধু। এই দিয়ে ব্রাহ্মী চেতনার ব্যষ্টি বিভাবে সমষ্টির ঐশ্বর্য এবং তুরীয়ের অনির্বচনীয়তাকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন।

বিশ্বোত্তীর্ণ তুরীয় যিনি, স্বগত নিষ্কল স্বাতন্ত্র্যে তিনি দেশ-কালের অতীত। মনঃকল্পিত সান্ত ও অনন্ত ভাবনার দ্বন্দ্ব স্পর্শ করে না তাঁকে। কিন্তু বিশ্বে আছে তাঁর আত্মরূপায়ণের স্বাতন্ত্র্য বা মায়াশক্তির বিলাস। তা-ই দিয়ে একত্ব ও বহুত্বের আপূরণে আপন নিষ্কল স্বরূপকে করলেন তিনি স-কল, এবং অদ্বৈতসম্পুটিত বহু-ভাবনাকে স্থাপিত করলেন অবচেতন চেতন ও অতিচেতন এই তিনটি ভূমিতে। তাঁর বহু-ভাবনা যখন জড়বিশ্বে রূপায়িত হল, তখন তার মূলে দেখতে পেলাম এক অবচেতন অন্বয়ভাবেরই লীলা। বিশ্বের উপাদান ও ক্রিয়ারূপে প্রকট হয়েও সে-অন্বয়ভাবে নিজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট চেতনা রইল না। তার পরেই জীব-চেতনায় ভেসে উঠল অহংএর ব্যক্তবিন্দু অদ্বৈতচেতনার প্রমুখ হয়ে। কিন্তু সেখানেও জীব তার অদ্বৈতবোধকে খাটায় শুধু রূপের জগতে—বহিরাবৃত্ত ক্রিয়ার জগতে; তাই ব্যক্ত অহংএর অন্তরালে কি ঘটছে তার খবর সে রাখে

না। এইজন্যই, সংহতি-বোধ তার নিজের মধ্যে যে নয় শুধু, বিশ্বের সঙ্গেও যে সে এক—এ-প্রত্যয় কোনমতেই তার জাগে না। বিশ্বের অহংকে ব্যষ্টি অহংএর খণ্ডতায় সঙ্কুচিত করেছি, তাই জীব হিসাবে সবাই আমরা অপূর্ণ। কিন্তু ব্যষ্টিচেতনার সীমা ছাড়িয়ে গেলেই অতিচেতনার স্ফুরণ ঘটে অহংএর মধ্যে এবং তার অমোঘবীর্যে অনুষিক্ত হয়ে আমরা পাই বিশ্বাত্মভাবের অনুভব। সে-অনুভব আমাদের নিয়ে যায় ব্রহ্মের তুরীয় সত্তার মহাগহনে—বিশ্ব যাঁর অনির্বচনীয় স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলছে বহুধাবিকল্পিত অদ্বৈতের লীলায়নে।

অতএব জীবাত্মার প্রমুক্তিতে বিশ্বব্যাপিনী দৈবী মায়ার একটা চরম আকূতি সার্থক হচ্ছে। এই প্রমুক্তি হল সৃষ্টির দিব্যনিয়তি, এই দিব্যভাবনার নাভিতে আশ্রিত থেকেই বিশ্বচক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে। জীবচেতনা বিশ্বের সেই জ্যোতির্বিন্দু, যেখান থেকে শুরু হল অরূপের বহুধারূপায়ণের সুদূর অভিযান—পরিপূর্ণ রূপসিদ্ধির অলক্ষ্য দিগন্তের দিকে। এই বিন্দু হতেই প্রমুক্ত জীবাত্মা তাঁর অদ্বৈত-অনুভবকে অগ্র্যা বুদ্ধির এষণায় যেমন করেন উৎসর্পিত, তেমনি বিশ্বাত্মভাবনায় তাকে করেন প্রসারিত। বিশ্বের বহুরূপের সঙ্গে তাদাত্ম্যের অনুভব সিদ্ধ না হলে, তুরীয়ের যোগেও অদ্বৈতসিদ্ধি অপূর্ণ থাকবে। অতএব প্রমুক্তচেতনায় বিশ্বাত্মভাবের বিকিরণ সার্থক হবে প্রমুক্তিরই বহুধা রূপায়ণে, একটি মুক্তজ্যোতি অগণিত নক্ষত্রবিন্দুতে মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে দেবে বিশ্বের আকাশ জুড়ে। একটি প্রাণী যেমন বহু দেহে আপনাকে বিসৃষ্ট করে প্রজনন দ্বারা, তেমনি একজন দেবমানব বহু মুক্ত আত্মায় প্রজাত হয়ে আপনাকে করেন বিচ্ছুরিত। অতএব এ-জগতে কখনও একটি জীবাত্মারও মুক্তি ঘটে যদি, তাহলে আত্মসংবিতের সেই দিব্যসংবেগ বহু জীবে সঞ্চারিত হয়ে জাগিয়ে তোলে চিৎশক্তির একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। কে জানে তার উদ্ধৃত তরঙ্গ পার্থিব মনুষ্যচেতনাকে আলোড়িত করে লোক-লোকান্তরেও বিসর্পিত হয় কি না! বস্তুত অধ্যাত্মশক্তির ব্যাপ্তিতে দাঁড়ি টানা চলে কি কোথাও? মহানির্বাণের উপান্তে পৌঁছেও বুদ্ধ পিছন ফিরে দাঁড়ালেন তার দিকে—প্রতিজ্ঞা করলেন, পৃথিবীর একটি জীবও দুঃখের অভিঘাত ও অহমিকার কবল হতে অমুক্ত থাকবে যতক্ষণ, ততক্ষণ লোকোত্তরের মহাকর্ষণ সত্ত্বেও অনাবৃত্তির পথে কিছুতেই পা বাড়াবেন না তিনি!—মহাসত্ত্বের এই বিপুল আত্মবিচ্ছুরণের সঙ্কল্প কি উপন্যাস শুধু?

কিন্তু বিশ্বব্যাপ্তির মহিমা হতে নিজেকে নিরাকৃত না করেও আমরা সংবিৎসিদ্ধির চরমে পৌঁছতে পারি। ব্রহ্মের দুটি বিভাবই শাশ্বত; অন্তরে তিনি মুক্ত এবং বাইরে ব্যাকৃত। যেমন আছে তাঁর বিসৃষ্টি, তেমনি আছে নির্লিপ্ত স্বাতন্ত্র্যও। আমরাও যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন আমাদেরও মধ্যে

তাঁর দিব্য স্বধার বীর্য স্ফুরিত হবে না কেন? সত্য-সত্যই দিব্যজীবনের অধিকার যে চায়, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির মাঝে একটা পরমসাম্যের সূত্র আবিষ্কার তাকে করতেই হবে। যাকে অতিক্রম করে মুক্তি পেয়েছি তাকে বর্জন করাই যদি হয় চরম পুরুষার্থ, তাহলে ব্রহ্ম স্বীকার করে নিলেন যাকে, নিবৃত্তিপথের যাত্রী হয়ে আমরা যে তাকেই করলাম নিরাকৃত! আবার প্রবৃত্তির পথে চলতে গিয়ে কর্মে তন্ময় হয়ে ক্রিয়াশক্তির সঙ্গে নিজের অধ্যাস ঘটাই যদি, তাহলে শুধু চেতনার অবরভূমিকে সত্য মেনে পরা সংবিৎকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মে অখণ্ড সৌষম্যে সংহত যে-দুটি বিভাব, তাদের বিযুক্ত করতে কেন মানুষের এত দুরাগ্রহ? ব্রহ্মকে সম্যক্ পেতে হলে তাঁর অখণ্ড পরিপূর্ণতার বিকাশ আমাদেরও মধ্যে ঘটানো চাই—এই কি নয় জীবের দিব্য নিয়তি?

এই যে ব্যষ্টি-অহংএর সীমার মধ্যে নিজেকে আমরা চলার পথে ফুটিয়ে তুলছি, তাকে ছেয়ে আছে মৃত্যু ও দুঃখ-তাপের করাল অভিশাপ। কিন্তু শাপমুক্তি ঘটাতে হলেও বহুধাবৃত্ত অবিদ্যার ভিতর দিয়েই যে তার পথ। বহুর মধ্যে এককেই সম্যক্ জানলে ঘটে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার সহবেদন। সেই সম্যক্ বিদ্যার দ্বারাই আমরা পাই অমৃতসম্ভোগের অখণ্ড অধিকার। নিখিল সম্ভূতির ওপারে অসম্ভূতি যিনি, তাঁকে পেয়ে আমরা মুক্ত হই জন্মমৃত্যুর অবর আবর্তন হতে। কিন্তু প্রমুক্তচেতনার স্বাতন্ত্র্যে সম্ভূতিকেও দিব্য জেনে আমরা মৃত্যুকে জারিত করি অমৃতের সম্ভোগ দ্বারা। এমনি করে এই মনুষ্যপ্রকৃতিতেই সেই দিব্যরাতির চিন্ময় আত্মবিকিরণের ভাস্বর বিন্দুতে আমরা নিজেকে রূপান্তরিত করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্ব ও মানব

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৬

জীবনের সকল ধারা ও চেতনার সকল ভূমির সমষ্টি এই যে বৃহৎ ব্রহ্মচক্র, তাতেই জীব ঘুরছে ফিরছে হংস হয়ে—যিনি এই পথের নায়ক, নিজেকে তাঁর থেকে পৃথক ভেবে। অবশেষে জড়িয়ে ধরেন তিনিই তাকে; তখন সে পায় অমৃতের অধিকার।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৬)

এক বৃহৎ আভাস্বর তুর্যাতীত পরমার্থসৎই পর্বে-পর্বে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন বিশ্বরূপে; আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই জগতের সংগে অদৃশ্য কত লোক-লোকান্তরের বিচিত্র বুনানিতে রচিত তাঁর আত্মরূপায়ণের উপায় ও উপাদান, নিমিত্ত ও পরিবেশ !—এমনি করে তাঁর আনন্দশতদলের দল মেলা এই বিশ্বলীলার তাৎপর্য। একথা তো কিছুতেই মানতে পারি না, বিশ্বের কোনও অর্থ নাই, নাই কোনও লক্ষ্য—এ শুধু অন্তহীন বিভ্রমের নিরুদ্দেশ আবর্তন, অথবা যদৃচ্ছার একটা ক্ষণিক খেয়াল। যে-যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি জগৎপ্রপঞ্চ কোনও প্রবঞ্চক মনের চাতুরী নয় শুধু, সেই যুক্তিই আমাদের চিত্তে জাগায় তার স্বরূপ সম্পর্কে এই সুনিশ্চিত প্রত্যয় : অগণিত বিবিক্ত প্রাতিভাসিক ধর্মের একটা অন্ধ অসহায় লক্ষ্যহীন স্বয়ম্ভূ-পিণ্ড অনন্ত কালের কক্ষপথে ছুটে চলেছে সংঘাত ও সংঘর্ষের বিক্ষুব্ধ মত্ততায়—এ কখনও জগতের সত্যরূপ হতে পারে না। অথবা এমনও বলতে পারি না, এ শুধু একটা তামসী শক্তির অপ্রমেয় স্বতঃস্ফূর্ত বিসৃষ্টি ও উচ্ছ্বাস, এর অন্তরালে কোনও নিগূঢ় বিজ্ঞানের প্রবর্তনা নাই, যা যাত্রার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সজাগ থেকে তার গতি ও পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করবে। বরং এই প্রত্যয়ই সত্য এবং যুক্তিসহ : স্বয়ংপ্রজ্ঞ অতএব অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে স্বরাট এক অখণ্ড সত্তাই আবিষ্ট এবং অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে প্রাতিভাসিক সত্তাতে। বিশ্বের ব্যাকৃতিতে সে-ই আপনাকে রূপায়িত করছে, জীবব্যক্তির প্রচেতনায় মেলছে তার কমলদল।

এই জ্যোতির্ময় উন্মেষকেই আর্য পিতৃপুরুষেরা বন্দনা করেছেন উষা বলে। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদে চরম প্রতিষ্ঠা তাঁর, তাঁকে দেখেছিলেন তাঁরা মানসের দ্যুলোকে আতত এক বিরাট প্রজ্ঞাচক্ষুরূপে। এই 'বৃহৎ জ্যোতি'ই নিখিলের মর্মমূলে নিত্যজাগ্রত রয়েছেন সর্বভাসক ও সর্বনিয়ামক

ঋতস্বরূপ হয়ে, বিশ্বের সাক্ষী এই অন্তর্যামীই প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছেন মানুষকে আপনপানে। তাঁরই সংকর্ষণে চলেছে মানবযাত্রী—প্রথমত সচেতন মনের অগোচরে, অপরা প্রকৃতির প্রগতিস্রোতের টানে। তারপর প্রচেতনার পর্বে-পর্বে নিজেকে প্রসারিত করে ছুটেছে সে দেবযানের উত্তরায়ণে। এই উত্তরায়ণের পথেই মানবপ্রকৃতির জয়যাত্রা—এই তার পরম ব্রত, তার দেবতার অভীষ্ট যজ্ঞ। এ-জগতে মানুষের এই একমাত্র কৃত্য, এরই জন্য মানুষ হয়ে বাঁচা তার; নইলে জড়বিশ্বের অপ্রমেয় হতবুদ্ধিকর বৈপুল্যের বুকে এই যে একটুখানি কাদা ও জলের আঁচড়, তার মধ্যে দুদিনের জন্য কিলবিল করে বেড়ায় যেসব কীট, তাদের সগোত্র ছাড়া মানুষকে আর কিছু কি বলা চলত?

প্রাতিভাসিক জগতের সকল বিরোধ ছাপিয়ে ফুটবে যে ঋতম্ভরা সত্তার বীর্য, ঋষিরা বলেন, অনন্ত আনন্দ ও চিন্ময় আত্মভাবই তার স্বরূপ। সর্বদেশে সর্বভূতে সর্বকালে ও কালাতীতেও সমরস তিনি। সমস্ত প্রতিভাসের অন্তরালে তিনি নিত্যজাগ্রত, তবু তাদের প্রবলতম ক্রিয়াস্পন্দ বা বিপুলতম সংহতিতেও তাঁর সবখানি প্রকাশ পায় না বা তাঁর অপ্রমেয়তা সীমিত হয় না—কেননা স্বয়ম্ভূ বলেই যে বিভূতি হতে স্ব-তন্ত্র তিনি। বিভূতি তাঁর প্রতিরূপ, কিন্তু তাঁর নিঃশেষ পরিচয় নয়: স্বরূপের দিকে ইশারা তার, কিন্তু তাকে প্রকট করবার সামর্থ্য তার নাই। অরূপ নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন রূপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে। রূপের মধ্যে সংবৃত্ত ছিল যে চিৎ-সত্তা, আত্মপরিণামের পর্বে-পর্বে নিজকে জানে সে বোধি দিয়ে, আত্মদর্শন ও আত্মানুভব দিয়ে। সেই আত্মোপলব্ধি বিশ্বে সম্ভূতির পথ খুলে দেয় তার কাছে; আবার আত্মসম্ভূতিদ্বারাই ঘটে তার স্বরূপের উপলব্ধি। এমনি করে অন্তরাবৃত্তির দ্বারা আত্মস্বরূপে সমাবিষ্ট হয়ে তার বিচিত্র ব্যাকৃতি ও বিভাবে সে ঢেলে দেয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অমৃত-দ্যুতি। সচ্চিদানন্দ আপন তুরীয় স্বরূপে আছেন শাশ্বত হয়ে। কিন্তু তাঁর অন্তহীন ব্যঞ্জনাকে দেহ প্রাণ ও মনের আধারে মূর্ত করে তোলা, বিসৃষ্টির এই তো তাৎপর্য এবং এই দিব্য রূপান্তরকে সিদ্ধ করবার জন্যই বিশ্বে জীবব্যক্তির আবির্ভাব। যে পরিপূর্ণ তাদাত্ম্যে সচ্চিদানন্দ নিজেরই মধ্যে আছেন সমাহিত হয়ে, সম্বন্ধতত্ত্বের ভিতর দিয়ে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলছেন জীবে-জীবে।

অবিজ্ঞেয় সৎস্বরূপ নিজেকে জানছেন সচ্চিদানন্দরূপে, এই পরম প্রত্যয় বেদান্তের চরমে—আর-সব অনুভব এরই অন্তর্গত বা আশ্রিত। নেতিবাদে সমস্ত রূপের আবরণ খসিয়ে প্রতিভাসকে শূন্যেই মিলিয়ে দিই, অথবা ইতিবাদ দিয়ে নাম-রূপকে পর্যবসিত করি তার অধিষ্ঠানসত্যে—সত্যদর্শনে শুধু জেগে থাকে ওই একটি মাত্র চরম অনুভব। জীবনকে ভরিয়ে তুলি বা ছাড়িয়ে যাই, শুদ্ধচৈতন্যের বন্ধনহীন প্রশান্তবাহিতা অথবা সিদ্ধবীর্যের শক্তি ও

আনন্দ যা-ই হ'ক আমাদের পুরুষার্থ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দই সেই সর্বগত পরম-রহস্য—যার দুর্নিবার আকর্ষণ অনাদি যুগ হতে জ্ঞানের দীপ্তিতে বা ভাবের বিহ্বলতায়, ইন্দ্রিয়ের সংবেদনে বা কর্মের তপস্যায় উতলা করেছে মানব-চেতনাকে তারই ব্যাকুল এষণায়।

বিশ্ব আর জীব এই দুটি তাত্ত্বিক প্রতিভাসে অবিজ্ঞেয়-সৎ আপনাকে অবভাসিত করেছেন। তাঁকে পেতে হলে এদেরই ভিতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের—কেননা এ-দুটি কোটির মধ্যে আছে যত অবান্তর ব্যূহ, দুয়ের সংঘাত হতেই তাদের উৎপত্তি। পরমার্থের এই অবতরণের প্রকৃতি হল আত্মনিগূহন। বিসৃষ্টিতে নেমে এসেছেন তিনি ধাপে-ধাপে, আবরণের পর আবরণ দিয়ে নিগূহিত করছেন নিজেকে। অতএব তাঁর আত্মবিবৃত্তি স্বভাবতই ধরবে উদয়নের রূপ, আর দুয়েরই অভিব্যক্তি হবে পর্বে-পর্বে। দিব্য অবতরণের প্রত্যেকটি ধাপ মানবচেতনার দিক হতে উত্তরায়ণের এক-একটি ভূমিকা। যে-আবরণের অন্তরালে ঢাকা পড়েছে অজানা দেবতার গহনরহস্য, সত্যসন্ধানী ঈশ্বরপ্রেমিকের কাছে তা-ই আবার তাঁর গুণ্ঠনমোচনের সাধন। মূঢ় অথচ ছন্দোময় নিদ্রার ঘোরে অবচেতন জড়প্রকৃতি জানে না—ওই বাক্যহারা অপ্রমেয় জড়সমাধির গভীরে কোন্ ভাব ও চেতনার পরিস্পন্দ দ্বারা প্রশাসিত হচ্ছে তার অন্ধশক্তির ঋতময় প্রবৃত্তি। কিন্তু সেই সুপ্তিকে মন্থন করে জাগল স্পন্দিত প্রাণের বিচিত্র আকুল ছন্দ—আত্মসংবিতের উপান্তে এসে ঠেকেছে যার রূপায়ণের প্রবেগ। কঠিন তপস্যায় প্রাণের স্বপ্নলোক হতে বিশ্ব উত্তীর্ণ হল মনোময় চেতনার জাগ্রতভূমিতে। একটি ভূতসংঘাত সহসা জেগে উঠে দেখতে পেল নিজের সঙ্গে নিজের জগৎকে। আর এই জাগরণেই বিশ্বে সঞ্চারিত হল সেই চরম উদয়নের সংবেগ, আত্মসচেতন জীবব্যক্তির স্ফুরণে যার সার্থকতা। কিন্তু এ-সংবেগ মনোভূমিতে এসেই থেমে গেল না—মন আবার প্রচেতনার খাতে বইয়ে দিল তার প্রবাহকে। তীক্ষ্ণ হলেও সীমিত এই মনের দৃষ্টি, তাই তাকেও জীবনশিল্পী বলতে পারি না। প্রাণ তার কাছে বিচিত্র উপকরণের একটা এলোমেলো সঞ্চয় এনে হাজির করে। বুদ্ধিমান মজুরের মত মন তাকে সাধ্যমত ঘষে-মেজে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটুখানি অদল-বদল করে তুলে দেয় সেই পরমশিল্পীর হাতে, আমাদের দিব্যজীবনের রূপকার যিনি। অতিমানস সেই দেবশিল্পীর স্বধাম, কেননা অতিমানসই মূর্ত হয় অতিমানবে। অতএব মনোভূমি পার হয়েও উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের জগৎকে, উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে দিব্য প্রাণের বৈদ্যুতীতে ভরা সেই মহাভূমিতে, যেখানে বিশ্ব ও জীব উভয়েই আবিষ্ট হয় তাত্ত্বিক স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভবে। আর পরস্পরের অবিকল্প আত্মপরিচয়ে সামরস্যের ঐকতানে মিলে যায় দুয়ের সুর।

আমাদের প্রাণ-মনের বিশৃংখল চলন দূর হতে পারে, যদি জড়প্রকৃতির ছন্দের চেয়েও গভীর একটা ঋতময় ছন্দোরহস্য আয়ত্ত হয়। প্রাণ ও মনের অবরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে-জড়প্রকৃতি, তার মধ্যে পরিপূর্ণ প্রশান্ত-বাহিতা আর অপ্রমেয় শক্তির বিচ্ছুরণে একটা সমতা ঘটছে। কিন্তু তবু জড় তার অন্তর্গূঢ় সত্যকে হাতের মুঠোয় পায়নি। তাই আড়ষ্ট প্রাণের কুহেলিকায়, অবচেতনার গভীর সুপ্তিতে অথবা অবরুদ্ধ চেতনার আচ্ছন্ন বিমূঢ়তায় রচিত হল যে-তিমিরগুণ্ঠন, সেই হল তার প্রশান্তির রূপ। তার স্বরূপশক্তির মর্মসত্য জানে না সে, তাই তার প্রশাসনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে সেই শক্তিরই অন্ধ তাড়নায় সে ছুটে চলেছে শুধু -ঋতময় ছন্দের আনন্দদোলায় জেগে ওঠার অবসর সে এখনও পায়নি।

জড়প্রকৃতির এই ন্যূনতা সম্পর্কে প্রাণ ও মন সচেতন হয়ে ওঠে অবিদ্যার ব্যাকুল এষণায়, অচরিতার্থ বাসনার বিক্ষোভে। এর ভিতর দিয়েই ফোটে তাদের আত্মসংবিৎ ও আত্মসম্পূর্তির প্রথম প্রেতি। কিন্তু প্রাণ-মনের আত্মসম্পূর্তি ঘটে কোন্ স্বারাজ্যের অধিকারে?—বস্তুত আপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েই তারা আপনাকে পায় পুরাপুরি। প্রাণ-মনের ওপারে চেতনার দিব্যভূমিতে দাঁড়িয়েই আমরা আবার পাই সেই লোকোত্তর সত্যের সন্ধান, জড়প্রকৃতির সমত্বসাধনায় যার আভাস শুধু ফুটেছিল। অনুভব করি এক বিরাট প্রশান্তি, যাকে স্পন্দহীন জড়ত্ব অথবা মূর্ছিত চেতনার অসাড়তা বলা চলে না কিছুতেই—কেননা অকুণ্ঠিত শক্তি ও অবিকল্পিত আত্মসংবিৎ তার মধ্যে অবিচল একাগ্রতায় স্তব্ধ-সমাহিত হয়ে আছে। অনুভব করি এক অমেয় বীর্যের বিচ্ছুরণ, যা স্বরূপত শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দের বিদ্যুৎ-শিহরন। কারণ তার প্রত্যেকটি স্পন্দন জাগছে অভাবের বেদনা বা অবিদ্যার ক্ষুব্ধ আয়াস হতে নয়—কিন্তু অচলপ্রতিষ্ঠ প্রশান্তি ও স্বারাজ্যের স্বাতন্ত্র্য হতে। এই ভূমিতে এসে অবিদ্যা পায় সেই দিব্যজ্যোতির পরিচয়, যার আঁধারে-ছাওয়া অপূর্ণ প্রতিবিম্ব হতে তার আবির্ভাব। আমাদের সকল বাসনা মিলিয়ে যায় সেখানে আপ্তকামের সেই উচ্ছল ঐশ্বর্যে, অপ্রবুদ্ধ জড়ত্বের অন্ধ আকূতির মধ্যেও যার দিকে একদিন উদ্যত হয়েছিল তাদের স্তিমিত অভীপ্সার ম্লানশিখা।

উদয়নের পথে জীব আর বিশ্বকে চলতে হয় অন্যোন্যনির্ভর হয়ে। বস্তুত তাদের একটিকে না হলে আরেকটির চলে না, তাদের একের পুষ্টিতে হয় অপরের পুষ্টি। অনন্ত দেশে ও কালে সমষ্টিভূত দিব্যব্যূহের যে-বিকিরণ, আমরা তাকেই বলি বিশ্ব; আর দেশ-কালের সীমার মধ্যে সেই ব্যূহের ঘনবিন্দুকে বলি জীব। বিশ্ব চায় সেই পরমদেবতার সমষ্টিভাবের অনুভব—আনন্ত্যের প্রসার। সে জানে ওই তার স্বরূপ, কিন্তু উপলব্ধির পূর্ণতাকে

নিজের মধ্যে সে পায় না। কেননা সম্প্রসারণে সত্তা শুধু বহুত্ব-ভাবনায় আপনাকে পরিকীর্ণ করে চলে, কিন্তু আদিম বা অন্তিম একত্বে পৌঁছতে পারে না কোনরকমেই। তাই তার মূল্য হয় পৌনঃপুনিক দশমিকের ভগ্নাংশের মত, যার আদি-অন্তহীন প্রস্তার কোনদিনই গিয়ে ঠেকতে পারে না অভঙ্গের কোঠায়। বিশ্ব তাই নিজেরই মধ্যে গড়ে তোলে দিব্যব্যূহের একটা চিদ্‌ঘন বিন্দু, যাকে আশ্রয় করে তার অভীপ্সা আত্মসম্পূর্তির পথ খুঁজে পায়। আত্মসচেতন জীবব্যক্তিতেই প্রকৃতির দৃষ্টি অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিবন্ধ হয় পুরুষে, জগৎ খোঁজে আত্মাকে। আনন্দহিন্দোলার একটি দোলনে ঈশ্বর যদি পুরাপুরিই প্রকৃতিতে পরিণত হলেন, তাহলে তার আরেকটি দোলনে প্রকৃতি আবার পর্বে-পর্বে ফুটতে চাইল ঈশ্বর হয়ে। জীবলীলার তাৎপর্য এই।

আবার আরেকদিকে, বিশ্বকে আশ্রয় করেই জীবের মধ্যে জাগে আত্মোপলব্ধির প্রেরণা। বিশ্বই জীবের প্রতিষ্ঠা পরিবেশ ও সাধন, পরমপুরুষের দিব্যকর্মের উপাদানও এই বিশ্ব। শুধু তা-ই নয়। জীবের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ ঘনীভূত হয়েছে একটা সীমার বেষ্টনীতে, অতএব তার বৈন্দবসত্তা ব্রাহ্মী চেতনার বিজ্ঞানঘন মহাবিন্দুর মত অনিঃশেষে সঙ্কোচ ও বিশেষণের কল্পনা হতে মুক্ত নয়। সুতরাং দিব্য-পুরুষের সর্বময় ভাব তার স্বরূপসত্তা হলেও তাকে ফোটাতে নিজেকে তার ছড়িয়ে দিতে হয় বিশ্বময়, অহংশূন্য নৈর্ব্যক্তিকতায় খুঁজতে হয় সত্তার নিরাবরণ প্রকাশ। অথচ বিশ্বচেতনার সীমাহীন ব্যাপ্তিতে আপনাকে হারাতে গিয়েও তার সত্তার তন্ত্রীতে বেজে ওঠে এক তুর্যাতীত রহস্যের অশ্রুত রাগিণী, তার আত্মভাব যার অস্ফুট মূর্ছনাকে ব্যাবহারিক জগতে কুণ্ঠিত অহমিকার ছিন্নসুরে ফুটিয়ে তুলেছিল। উত্তরায়ণের পথিক অন্তহীন মহাকাশের এই ধ্রুববিন্দুটিকে হারিয়ে ফেলে যদি, তাহলে অসার্থক হবে তার সাধনা। অস্তিত্বের মহাসমস্যাকে সে পাশ কাটিয়ে যাবে শুধু, যে-দিব্যব্রতের উদ্‌যাপনে তার শরীর-স্বীকরণ তা থেকে যাবে অপূর্ণ।

জীবের কাছে বিশ্ব ধরা দেয় প্রাণরূপে। প্রাণ শক্তির তরঙ্গবিচ্ছুরণ। যে-রহস্য তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জীবকে আয়ত্ত করতে হবে তার সবটুকু। বহুমুখী পরিণামের সংঘর্ষে সঙ্কুল, স্ফুটনোন্মুখ বিচিত্র শক্তির সংক্ষোভে উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে প্রাণের প্রকাশ। তার মধ্য হতে জীবকে আবিষ্কার করতে হবে একটা সম্যক্ ঋতের ছন্দ, অনাগত সৌষম্যের একটা ঠাট। মানুষের প্রগতির এই না তাৎপর্য। এ তো শুধু জড়প্রকৃতির বাঁধা বুলিকেই একটু ভিন্ন সুরে আবৃত্তি করা নয়। মনোময়ী প্রকৃতির উঁচু পর্দায় পশুবৃত্তির আলাপ করতে পারলেই তো মনুষ্যজীবনের আদর্শ সার্থক হল না। তা-ই যদি হত, তাহলে যে-জীবনব্যবস্থায় বাইরের স্বাচ্ছন্দ্য

মোটামুটি বজায় রেখে খানিকটা মানসিক তৃপ্তিরও বরাদ্দ আছে, তার ফলে এসেই আমাদের প্রগতি ঠেকে যেত। পশু খুশী হয় প্রয়োজনের আংশিক তর্পণে; দেবতার তৃপ্তি ঐশ্বর্যের অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাসে। কিন্তু মানুষ তো চিরবিশ্রাম চায় না পথের ধারে—যতদিন না তার পরমশিবের সন্ধান মেলে! জীবের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ—কেননা অনির্বাণ তার দহনজ্বালা, সঙ্কোচের পীড়ন সবার চেয়ে অসহন তারই কাছে। অনাগতসিদ্ধির দিব্যোন্মাদ বুঝি নেমে আসে তারই বুকে শুধু!

জীবব্যক্তির মধ্যে নিহিত আছে চিন্ময়প্রাণের বিপুল সম্ভাবনা যত—তাই জীব বিশেষ করে 'মনু' বা 'পুরুষ' তার কাছে। একমাত্র মনুপুত্রেরই আছে ঈশ্বরকে আত্মবিগ্রহে মূর্ত করবার নিরঙ্কুশ সামর্থ্য। প্রাচীন ঋষিরা মানুষকেই বলতেন 'মনু' অর্থাৎ মনন যার স্বভাব; তাঁদের ভাষায় মানুষই 'মনোময় পুরুষ' অর্থাৎ মনোময়ী প্রকৃতিতে আবির্ভূত চিৎজ্যোতি। প্রাণিবিদের পরিভাষা অনুসারে শুধু স্তন্যপায়ীর উন্নত সংস্করণ মাত্র সে নয়। জড়ের মধ্যে পশুকায়কে আশ্রয় করে মননধর্মী চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে, এই তার সত্য রূপ। বেদান্তের ভাষায় বলা চলে, মানুষ চেতন 'নাম'। রূপকে সে স্বীকার করেছে তার আবশ্যক বাহনরূপে, যাতে তার ভিতর দিয়েই 'পুরুষ' হতে পারেন প্রাকৃত উপকরণের বিধাতা। জড়প্রকৃতি হতে উন্মেষিত পাশবপ্রাণের যে-প্রকাশটুকু তার মধ্যে, সে তার সমগ্র সত্তার অবরভাগ মাত্র। তারও পরে আছে তার মধ্যে ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প ও সচেতন প্রেতিতে স্পন্দমান একটা জীবন—সবশুদ্ধ যাকে আমরা বলি মন। এই মনই জড় ও প্রাণশক্তিকে হাতের মুঠায় এনে মনোময় পরিণামের পর্বে-পর্বে তাদেরও ঘটাতে চায় রূপান্তর। এই মনোভূমিই হল মানুষের জীবসত্তার মধ্যকান্ড, যেখানে দাঁড়িয়ে যা-কিছু ঘটবার সে ঘটিয়ে তোলে। কিন্তু তারও পরে আছে তার সত্তার উত্তরকান্ড। মানুষের মনোময় চেতনা তাকে খুঁজে ফিরছে প্রতিনিয়ত—তার বীর্যকে আয়ত্ত করে দৈহ্য ও মানস সত্তায় সঞ্চারিত করবে বলে। এই যে একটা-কিছু আছে তার মধ্যে যা তার বর্তমানকে ছাড়িয়ে গেছে, তাকে ব্যাবহারিক জীবনে রূপ দেওয়াই হল মর্ত্যপ্রকৃতিতে দিব্যজীবন-সাধনার অগ্নিমন্ত্র।

স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের যে মানসিক সংস্কার, তারও চেয়ে গভীরভাবে নিজেকে জানবার প্রতিভা যখন তার মধ্যে জাগে, তখন তার চিত্ত চায় সেই সাধ্যবস্তুকে ধরবার কোন-একটা সূত্র, তার কোন-একটা রূপের স্পষ্ট অনুভব। কিন্তু তার চেতনায় সে-রূপ ভাসে যেন দুটি অভাবপ্রত্যয়ের মধ্যে তটস্থ হয়ে। বর্তমানের সীমা ছাড়িয়ে কখনও পায় সে এক স্বয়ংপ্রজ্ঞ অনন্ত সত্তার শক্তি জ্যোতি ও আনন্দের ছোঁয়া বা অনুভব। সেই ছোঁয়াকে সে যখন তার মানসিক

সংস্কারের অনুকূলে তর্জমা করে বলে, এই তো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অনন্ত অমৃত, এই তো প্রমুক্ত প্রেম ও আনন্দ-স্বরূপ, এই তো ঈশ্বর—তখনও কিন্তু তার জ্যোতির্ময় অনুভবের সৌরদীপ্তি জ্বলে ওঠে দুটি অমানিশার করালছায়ার অন্তরালেই। এক অমানিশা তার পায়ের তলে, আর এক গাঢ়তর অমা তার অনুভবের ওপারে। অনন্তকে নিঃশেষে জানবার আকূতিতে সে দেখে, তাকে ধরতে গিয়ে অনুভূতির সকল সংজ্ঞা হারিয়ে গেছে। কোনও সংজ্ঞা দিয়ে অথবা একসঙ্গে সকল সংজ্ঞা জড়িয়েও পরিচিতির ডোরে সে-অধরাকে বাঁধা যায় না। তখন লোকোত্তর অনুভবের সর্বোত্তম সংজ্ঞা যে-ঈশ্বর, তাকেও প্রত্যাখ্যান করে সে ঝাঁপ দেয় মহাশূন্যে। অথবা দেখে, তার ঈশ্বরও বুঝি অনিরুক্ত মহিমায় ছাড়িয়ে গেলেন আপনাকে, কোনও সংজ্ঞার বাঁধন পরলেন না তিনি!—এই তো লোকোত্তরের অমানিশা। আবার বর্তমান পরিবেশের দিকে তাকিয়ে মানুষ দেখে, জগৎ জুড়ে অন্তরে-বাইরে কেবলই তার প্রদীপ্ত চেতনার প্রতিবাদ। মৃত্যু এখানে চিরসংগী তার, সংকোচের আড়ষ্টতায় কুণ্ঠিত তার জীবন ও অনুভব। ভ্রান্তি, দৌর্বল্য, জড়ত্ব, হতচেতনতা, শোক, দুঃখ, অনর্থ দ্বারা নিত্যলাঞ্ছিত তার সাধনা। তাই এখানেও বলতে হয় তাকে বাধ্য হয়ে, কোথায় ঈশ্বর! অথবা তার মনে হয়, পরমদেবতা বুঝি তাঁর শাশ্বত সত্যস্বরূপের বিপরীত কোনও প্রতিভাস বা পরিণামের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রয়েছেন নাস্তি হয়ে!

কিন্তু এই নাস্তি-প্রত্যয়ের হেতু লোকোত্তর নাস্তিত্বের মত অকল্পনীয় অতএব স্বভাবতই মনের অগোচর একটা অনির্বচনীয় রহস্য নয়। বরং মানুষের মনে হয়, এর তত্ত্ব জ্ঞানগম্য, জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট একটা-কিছু। অথচ তার রহস্যও পুরাপুরি ধরা পড়ে না তার কাছে। এই যে অনৃতের জঞ্জাল স্তূপাকার হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে, তারা কী, কোথা হতে এসেছে, কেনই-বা আছে—কিছুই সে বোঝে না। চেতনায় ভেসে উঠে দোল দিয়ে যায় তারা—এই চলনটুকুই চোখে পড়ে শুধু। কিন্তু তাদের তত্ত্বরূপ থেকে যায় বুদ্ধির অগোচর।

হয়তো তারাও অপ্রমেয়, হয়তো বুদ্ধির কাছে তাদের তত্ত্ব কোনদিনই ধরা পড়বে না। অথবা এমনও হতে পারে, কোনও তাত্ত্বিক রূপই তাদের নাই। তারা শুধু বিভ্রম, শুধু শূন্য—এই তাদের সম্পর্কে চরম কথা। লোকোত্তর নাস্তিত্ব কখনও আমাদের কাছে ফোটে শূন্য হয়ে। সম্ভবত এই ব্যাবহারিক নাস্তিত্বের বঞ্চনাও তা-ই—এও শূন্য, এও অসৎ। কিন্তু ওপারের রহস্যকে অসৎ বলে উড়িয়ে দিয়ে তুরীয়ানুভবের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে আমরা রাজি নই যেমন, তেমনি এখানকার রহস্যকেও তো নস্যাৎ করতে পারি না শূন্যবাদ দিয়ে। এ-জগৎ সত্যের শাশ্বত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত

হচ্ছে না বলে এর বাস্তবতাকেই পুরোপুরি অস্বীকার করা, অথবা একে পরিহার করে চলা সর্বনাশা বিভ্রম-জ্ঞানে—এতে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় শুধু, জীবনের সাধনাকে বীরের মত বরণ না করে। হতে পারে, এসমস্তই অশাশ্বত ক্ষণিকের মেলা—দিব্যভাবের মূর্ত প্রতিষেধ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিপরীত প্রত্যয় এরা। কিন্তু তবু জীবনের কাছে এরা যে বাস্তব, বিশ্বপ্রাণের এও যে একটা সত্যকার তরঙ্গদোলা, তাও তো অনস্বীকার্য। বিশ্বে আঁধারের ছায়ানৃত্যই তো নয় শুধু, আলোও যে আছে তার বুকে। আছে কল্যাণ জ্ঞান আনন্দ সুখ বল বীর্য অভ্যুদয়, আছে প্রাণের জয়যাত্রা। এসমস্ত নিয়েই তো বিশ্বপ্রাণের খেলা।

এও হতে পারে, ব্যাবহারিক জীবনের পদে-পদে এই যে অনর্থ-প্রত্যয়, শুধু একটা নির্বচনীয় বিভ্রমের লীলা এ নয়। সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ-বৈকল্যের এ হয়তো একটা অপরিহার্য পরিণাম। আর সে-বৈকল্যের মূলে নিহিত আছে বিশ্বের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে। সেই ভ্রান্তিই আবার ব্রহ্ম ও জগৎ, জীব ও তার পরিবেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করেছে। মানুষ আজ যা হয়েছে, তার সঙ্গে তার নিত্যপরিচিত পরিবেশ অথবা আদর্শ ও নিয়তির কোনও মিলই খুঁজে সে পায় না। তাই বিশ্বের মর্মসত্যের সঙ্গে বহির্জগতের একান্ত বিরোধ ও বিপর্যয়টাই বড় হয়ে তার চোখে পড়ে। তাহলে কিন্তু জীবধর্মের কুণ্ঠা নিয়ে জগতে আসাটা আদর্শচ্যুতির দণ্ড নয় তার, বরং এই হল তার ভবিষ্য প্রগতির সাধন। এই নিয়েই তো তার জীবনসাধনার শুরু, এই পণেই তো তাকে জিনে নিতে হবে যাত্রাশেষের বিজয়মালা, তার এই তপস্যার রন্ধ্রপথেই তো প্রকৃতি জড় হতে চেতনায় পেল মুক্তি। অতএব মানুষের এই বৈকল্যই একাধারে অপরা প্রকৃতির মুক্তিপণ এবং পুঁজি।

সত্যসম্বন্ধের এই বিকলতা হতে এবং তাকে দিয়েই আমাদের জানতে হবে সত্যকে। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা' আমরা পাব অমৃতসম্ভোগের অধিকার। বেদ তাই সন্ধাভাষায় বলেছেন বিশ্বের সেই গোপন শক্তিদের কথা, যারা দুষ্প্রবৃত্তিশালিনী বিপথচারিণী পতির অহিতকারিণী নারীদের মত নিজেরা অসত্য ও অসুখী হয়েও শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলে এই 'বৃহৎ সত্যকে'—আনন্দই যার স্বরূপ। তাই, মানুষ যখন আর আত্মপ্রকৃতির কলুষের উচ্ছেদ করতে চাইবে না পুণ্যসাধনার অস্ত্রোপচারে, অথবা জীবনকে বিভীষিকা ভেবে আতঙ্কে ছিটকে পড়বে না তার থেকে ঃ বরং কঠিন বীর্যের সাধনায় যখন মৃত্যুকেই রূপান্তরিত করবে সে প্রাণের দীপ্ত মহিমায়, সঙ্কুচিত মানবতার তুচ্ছতাকে উত্তীর্ণ করবে দিব্যভাবের ভূমানন্দময় ঐশ্বর্যে, বেদনাকে দেবে চিন্ময় আনন্দের রূপ, অশিবের অন্তর হতে ফুটিয়ে তুলবে তার শিবময় সার্থকতা,

প্রমাদ ও মিথ্যাকে পরিণত করবে অন্তগর্ঢ় সত্যের অনাবরণ ঋজ্বতায়—তখনই তার জীবনযজ্ঞে পর্ণাহর্তি পড়বে। তার যাত্রাশেষের পরমক্ষণে দ্যুলোক আর ভূলোক তখন সামরস্যের সর্রে বাঁধা পড়ে তুর্যাতীতের আনন্দধারায় হবে অভিষিক্ত।

তব্ প্রশ্ন জাগে, এপারে-ওপারে এই যে দার্ণ বিরোধ, কি করে তাদের মেশামেশি সম্ভব তবে? কোন্ পরশমণির ছোঁয়ায় এই মর্ত্যভাবের লোহা দিব্যভাবের সোনায় র্পান্তরিত হবে?...কিন্তু কোনও বৈষম্য যদি না-ই থেকে থাকে তাদের স্বর্পসত্তায়? যদি একই পরমার্থসতের বিভূতি হয়ে থাকে তারা, যদি কোনও ভেদ না থাকে তাদের ধাতুপ্রকৃতিতে? তাহলে তো মর্ত্যভাবের দিব্যর্পান্তর অসম্ভব নয়।

প্র্বেই বলেছি, আমরা লোকোত্তর অসৎ বলি যাকে, বস্তুত তার স্বর্প অলীক নয়। সত্তারই একটা অকল্প্য ভূমি সে, হয়তো অনির্বচনীয় আনন্দই তার স্বর্প। এই লোকোত্তর অসতের মধ্যে শাশ্বত প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস র্প ধরেছে বৌদ্ধ নির্বাণে, মান্ষের দ্ঃসাহসী সাধনার ইতিহাসে যার ভাস্বর মহিমা চির অম্লান থাকবে। জীবন্মর্ক্ত দেবমানবের চেতনায় সে-নির্বাণের অন্ভব ফোটে অনির্বচনীয় শান্তিতে, হ্লাদিনীর অপর্প উল্লাসে। জীবনে তার সার্থকতা দেখা দেয় অন্তরে-বাইরে অহংবৃত্তির পরিপ্র্ণ নিরোধে, সকল দ্ঃখের আত্যন্তিক প্রলয়ে। এ-অন্ভবের কোনও ইতি-র্প নাই। তব্ তার সংজ্ঞা দিতে চাই যদি, বলতে পারি—এ শ্ব্ধ্ অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য চিন্ময় আনন্দ মাত্র, যার মধ্যে আত্মসত্তার অন্ভবও তলিয়ে যায় কোন্ অতলে। কিন্তু নির্বাণের শান্তি এমনই নির্বিষয় ও অন্তরঙ্গ যে তাকে চিন্ময় আনন্দের সংজ্ঞা দিয়েও ব্যক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। অসৎ সচ্চিদানন্দেরই সেই অন্ত্তর প্রলয়ভূমি, সৎ চিৎ এবং আনন্দ বলেও আমরা ইতি করতে পারি না যার—কেননা এ-ভূমিতে ঘটে সমস্ত সংজ্ঞার উচ্ছেদ, কোনও বিজ্ঞানবৃত্তিই আর অবশিষ্ট থাকে না।

আবার একথাও বলেছি আমরা, এক অখণ্ড পরমার্থ-সৎ ছাড়া আর-কিছ্ না থেকে থাকে যদি কোথাও, তাহলে আমাদের অন্ভবের এই যে অবর কোটি, যার মধ্যে সচ্চিদানন্দের কোনও আভাস নাই বরং আছে বির্দ্ধ প্রত্যয় শ্ব্ধ্, তাকেও তো আর-কিছ্ বলতে পারি না সচ্চিদানন্দ ছাড়া। নাস্তি-প্রত্যয়ে ড্বে গিয়ে সচ্চিদানন্দকে কোথাও দেখতে পায় না যে অবর অন্ভব, সেও যে সচ্চিদানন্দেরই বিভূতি, এ শ্ব্ধ্ ব্দ্ধিযোগ বা অধ্যাত্মদর্শন দ্বারা নয়, এই ইন্দ্রিয়সংবেদন দিয়েও উপলব্ধি করা চলে। আমাদের নিত্যজাগ্রত চেতনায় এই পরমসত্যের অন্ভব কোথাও ব্যাহত হত না, যদি মায়া অথবা অবিদ্যার দ্র্নিবার অভিনিবেশবশত একটা অনাদি অধ্যাসের করালছায়ায় আমাদের দৃষ্টি

অন্ধ না হত। এইদিক দিয়ে বিশ্বসমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় হয়তো। জানি, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিকের তর্কবুদ্ধি খুশী হবে না সে-সমাধানে, কেননা এবার আমরা এসে দাঁড়িয়েছি অবিজ্ঞেয়ের অতর্ক্য অনির্বচনীয় রহস্যের উপান্তে—তীক্ষ্ণদৃষ্টির উদ্যত আকূতি নিয়ে। কিন্তু অপ্রমেয় রহস্যের ব্যঞ্জনায় তর্কবুদ্ধির সায় যদি না-ও থাকে, তবুও এবার দিব্যজীবন-সাধনার একটা অনুভবগোচর সুস্পষ্ট সঙ্কেত হতে তো আমরা বঞ্চিত হব না।

তার জন্যে মনের সুপরিচিত সংস্কারের চিরাভ্যস্ত আরামটুকু ভেঙে অসীম দুঃসাহসে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আরও গভীরে, অজানার স্তব্ধ বিপুল রহস্যকে চকিত করে ডুবে যেতে হবে চেতনার দুরবগাহ অতলতায়। যা-কিছু আপাতপরকীয় ছিল এতদিন, লোকোত্তর মহাভূমির পরিচয় নিতে তাকেও আত্মসাৎ করতে হবে। মানুষের ভাষা কতটুকু কাজে লাগে এই উদগ্র এষণায় ? তবু হয়তো তার মধ্যে আমরা খুঁজে পাব অজানার দু-একটি প্রতীক, অরূপের এক-আধটি রূপরেখা—আভাসে ফুটিয়ে তুলব অব্যক্তের এতটুকু ব্যঞ্জনা, যা সন্ধানী চেতনার দীপকে করবে আরেকটু উজ্জ্বল, ওপারের অনির্বচনীয় বর্ণরাতির একটুখানি ছায়াসুষমা দোলাবে মনের 'পরে।

সপ্তম অধ্যায়

অহং এবং দ্বন্দ্ববোধ

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৭

একই বৃক্ষে আসীন পুরুষ ডুবে আছে মুহ্যমান হয়ে—ঈশনা নাই বলে যত শোক তার; কিন্তু আবিষ্ট হয়ে যখন দেখতে পায় সে আরেকটি পুরুষকে যিনি সবার ঈশ্বর এবং তারও মহিমা, তখন চলে যায় তার সকল শোক।

বামদেবো গৌতমঃ।...আপো বা গাবো বা...ত্রিষ্টুপ্

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪।৭)

সমস্তই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই যদি সত্য হয়, তাহলে মৃত্যু দুঃখ অনর্থ সীমার সঙ্কোচ এরাও বিকৃত চেতনার সৃষ্টি শুধু। ব্যাবহারিক জীবনে তারা বাস্তব বলে অনুভূত হলেও তত্ত্বত তারা অসৎ। আত্মসংবিতের সর্বসমঞ্জস সম্যক্-অনুভব হতে স্খলিত হয়ে চেতনা আমাদের জড়িয়ে গেছে খণ্ডিত-অনুভবের প্রমাদজালে, তাই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের এই বিকৃতি। ইহুদী ধর্মশাস্ত্রের 'উৎপত্তি-প্রকরণে' কবিত্বের ভাষায় একেই বর্ণনা করা হয়েছে 'আদিমানবের স্খলনকথা'-রূপে। নিজেকে এবং ঈশ্বরকে, অথবা নিজেরই মধ্যে ঈশ্বরকে শুদ্ধসংবিতের পরিপূর্ণতা দিয়ে অনুভব করার অসামর্থ্য, এবং তার ফলে বিভজ্যবৃত্তি চেতনার অধ্যাসে জীবন-মরণ শিব-অশিব আনন্দ-বেদনা ও পূর্ণতা-ন্যূনতার দ্বন্দ্বে বিধুর জীবনের অস্বস্তিতে উদ্ভ্রান্ত হওয়া—এই তো আদিমানবের স্খলন। খণ্ডিতচেতনার এই পরিণামই বাইবেলের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল', যা খেয়ে পুরুষ-প্রকৃতিরূপী আদম ও ঈভ্ স্খলিত হল নন্দনবন হতে—চিরম্লান হল পুরুষের স্বারাজ্যের মহিমা প্রকৃতির প্ররোচনায়। তারপর ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বানুভবের উন্মেষে অন্নময় চেতনায় চিন্ময় দ্যুতির স্ফুরণে ঘটল তার শাপমোচন। তখন প্রকৃতিস্থ পুরুষ আবার পেল অনন্ত প্রাণের 'স্বাদু-পিপ্পল' ভোজনের অধিকার, দিব্য-পুরুষের সাযুজ্যলাভে হল সে চিরঞ্জীব। এমনি করেই সার্থক হয় তার পার্থিবচেতনার গহনগুহায় অবতরণ—যখন সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ অর্থ-অনর্থের সম্যক্-বিজ্ঞান মানুষের আয়ত্তে আসে সেই পরা বিদ্যার আবেশে, যা এসব বিরুদ্ধ-প্রত্যয়ের সমন্বয়ে বিশ্বচেতনার ভূমিকায় গড়ে তোলে একরস একটি প্রত্যয়, তাদের খণ্ডতাকে রূপান্তরিত করে অখণ্ড-সত্যের চিদ্ঘন বিগ্রহে।

অখণ্ড-সচ্চিদানন্দই ছড়িয়ে আছেন এই নিখিলে সর্বসম বিশ্বাত্মবোধের উদারতম সামানাধিকরণ্যে। তাই মৃত্যু দুঃখ অনর্থ বা সীমার সঙ্কোচ তাঁর

কাছে জ্যোতির্ময় দিব্য ভাবনারই তির্যক বিলাস বা ছায়ানৃত্য মাত্র। আমাদের চেতনায় বেসুরা হয়ে বেজে ওঠে এরা ঃ অখণ্ড-বোধের জায়গায় আনে খণ্ডতার পীড়া, ব্যামোহ এবং প্রমাদে আবিল করে বুদ্ধির প্রসন্ন স্বচ্ছতা। বৃহৎসামের মাধুরী স্বত-উৎসারিত হয়ে উঠবে যেখানে সুরসঙ্গীতির সমগ্রতায়, সেখানে বিবিক্ত সুরলীলার স্বাতন্ত্র্যকেই করতে চায় মুখর। একটি রাগিণীতে বাঁধা যায় যদি বিশ্বের সকল স্পন্দন—এমন-কি চেতনার স্থূল প্রকাশের অন্তরালে এবং তাকেও ছাড়িয়ে রয়েছে যে গভীরতর প্রেতি তার সম্যক্-অনুভব না পেয়েও যদি সম্ভবপর হয় একটা সমগ্রতার কল্পনা, তাহলেও সে-সমগ্রতাবোধের মধ্যে থাকবে বিরুদ্ধপ্রত্যয়ের সংঘর্ষকে সৌষম্যের ছন্দে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। কিন্তু অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ স্বরূপত বিশ্বোত্তীর্ণ। অতএব বিরুদ্ধপ্রত্যয়ের দ্বন্দ্বকে সত্য মানলেও কিছুতেই তাঁর মধ্যে তার আরোপ চলে না। যা বিশ্বোত্তীর্ণ, বেদের ভাষায় তা 'সুরূপকৃত্নু', ত্বষ্টার রূপদক্ষতা আছে তার মধ্যে। তাই বিরোধের সমন্বয় ঘটায় না সে—অরূপের পরশমণি ছুঁইয়ে রূপান্তরিত করে তাদের লোকোত্তরের অপরূপতায়, নিঃশেষে লুপ্ত করে বিরোধের শেষ চিহ্নটুকু।

সবার আগে, ব্যক্তির চেতনাকে বাঁধতে হবে সমগ্রতার সুরে, নইলে জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বের সমাধান কিছুতেই হবে না। গোড়াতেই একটা ধারণা স্পষ্ট হওয়া চাই। আমাদের প্রাকৃত-চেতনা বিশ্বের তত্ত্বনিরূপণ করছে যে-সংজ্ঞা দিয়ে, মানুষের ব্যাবহারিক অনুভব ও প্রগতির পক্ষে তা পর্যাপ্ত হলেও, কিছুতেই বলা চলে না বিশ্বের পক্ষেও এই সংজ্ঞাই পর্যাপ্ত, কিংবা তার চরম তত্ত্বের এই হল সত্য পরিচয়। যে ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সামর্থ্য নিয়ে জগৎটাকে দেখছি এখন, তার চাইতেও সুন্দর সমগ্রদৃষ্টিতে তাকে দেখা যায় এমন নূতনতর ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সামর্থ্যের উন্মেষ আশ্চর্য কিছুই নয়। তেমনি সমনী অথবা উন্মনী ভূমি হতেও নিখিল বিশ্বকে এমন-একটা ভঙ্গিতে দেখা সম্ভব, যা আমাদের প্রাকৃতদৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে। চেতনার এমন ভূমিও আছে, যেখানে মৃত্যু শুধু অমৃতজীবনে উত্তরণ, বেদনা শুধু বিশ্বের আনন্দ-জোয়ারের তীব্র উচ্ছ্বাস, সীমা শুধু অসীমের নিজের মধ্যেই কুণ্ডলীরচনা, অশিব শুধু শিবেরই পরিপূর্ণ মহিমাকে ঘিরে চক্রাবর্তন। এ কেবল সামান্যগ্রাহী চিত্তের বিকল্প নয়। এর প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত আছে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে, জাগ্রত অনুভবের নিত্যনিবিড়তায়। চেতনার এইসব ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া যে জীবের আত্মসম্পূর্তি-সাধনার মুখ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ, সেকথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দ্বৈতদর্শী ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ মন বিশ্বের যে ব্যাবহারিক মূল্য নিরূপণ করেছে ইন্দ্রিয়সংবেদনের সহায়ে, তার উপযোগিতার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে

নিশ্চয়। সাধারণ জীবনে ব্যবহারবুদ্ধির এই আদর্শকে মানা যায় ততদিন, যতদিন আমরা না পাই সৌষম্যের এমন-একটা বৃহত্তর ভূমি যার মধ্যে ব্যবহার-বুদ্ধির গোত্রান্তর ঘটলেও তার বস্তুনিষ্ঠার কোনও বিপর্যয় ঘটে না। সাধনার ফলে শুধু ইন্দ্রিয়শক্তির উৎকর্ষ ঘটে যদি, অথচ চিত্ত জ্ঞানের এমন্‌-কোনও ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় যেখানে নূতন দর্শনের আলোকে পুরাতন অনুভবও উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে ওঠে—তাহলে শক্তিলাভও হতে পারে নিদারুণ বিপর্যয় ও অশক্তির নিদান, বুদ্ধির সুষ্ঠু ও সংযত প্রবৃত্তিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ব্যাবহারিক জীবনে আনতে পারে ক্লৈব্যের অভিশাপ। তেমনি অহংকবলিত দ্বৈতবুদ্ধির বেষ্টনী ছাড়িয়ে মনের চেতনাও যদি অখণ্ড-চেতনার বিশিষ্ট কোনও বিভাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সৌষম্যের ছন্দ না জেনেই, তাহলে তারও ফলে বুদ্ধির বিপর্যয় এসে মানুষের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তিকে করতে পারে কুণ্ঠিত—ব্যবহারজগতের সাবলীল গতির যতিভঙ্গ করে। এইজন্যই গীতার উপদেশ, যিনি বিজ্ঞানী অজ্ঞানীর কর্ম ও চিন্তার জগতে বিপ্লব এনে তার বুদ্ধিভেদ ঘটানো তাঁর উচিত নয়। কারণ, অজ্ঞানী স্বভাবতই বিজ্ঞানীর আচারের অনুকরণ করতে চাইবে তাঁর কর্মযোগের রহস্য না জেনেই। তাতে তারা পরতর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে স্বধর্ম হতেই ভ্রষ্ট হবে শুধু।

অধ্যাত্মজগতে এমন বিপর্যয় ও অশক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করে নেন অনেক মহাপুরুষ—শুধু সাময়িক একটা সাধনক্রম হিসাবে। কাউকে হয়তো এই মূল্য দিয়েই পেতে হয় ব্যাপ্তিচৈতন্যের অধিকার। কিন্তু নিখিল-মানবের প্রগতির অভিযান এ-পথ ধরে নয়। তার লক্ষ্য, সত্যের সর্বসমন্বয়ী রূপটি আবিষ্কার করে তার বীর্যকে সার্থক করা বাস্তব কর্মে—জীবনের নবীন ব্যঞ্জনায়। তাই ব্যাপ্তিচৈতন্যের ঋতকে মানুষ ফুটিয়ে তুলবে সত্যের অভিনব রূপায়ণে, তার প্রবুদ্ধ চিত্তের দুর্ধর্ষ সংবেগ বিশ্বের প্রাণধাতুকে ব্যবহার করবে নবসৃষ্টির সার্থক উপাদানরূপে—এই হবে তার সাধনা। স্থূল ইন্দ্রিয় দেখে, সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে। এই আপাতদর্শন এতদিন ছিল মানুষের ইন্দ্রিয়জীবনের কেন্দ্র, তাকে ভিত্তি করেই সে সাজিয়ে নিল তার চলন্ত সংসার। আসল সত্য এ-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু সে-সত্যের আবিষ্কার মানুষের কোনও কাজেই লাগত না, যদি তাকে কেন্দ্র করে এমন-একটা বিজ্ঞান গড়ে না উঠত যা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও মার্জিত করতে পারে সুশৃঙ্খল ও যুক্তিযুক্ত তথ্যের সঙ্কলনে। তেমনি মানসী চেতনা দেখে, ঈশ্বর ঘুরছেন আমাদের ব্যষ্টি-অহংকে ঘিরে। অতএব তাঁর বিধি-বিধানকে আমরা বিচার করি আমাদেরই অহমিকাদুষ্ট চেতনা বেদনা ও ভাবনা দিয়ে। এমন-সব অর্থের আরোপ করি তাদের 'পরে, বস্তুত যা সত্যের বিকৃত ও বিপর্যস্ত রূপ—অথচ মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের প্রগতিকে

কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিতে সাহায্যই করে তারা। ভাব ও কর্মের একটা বিশিষ্ট জগতে আমাদের চলাফেরা যতক্ষণ, ততক্ষণ কোনও গলদ ধরা পড়ে না বিশ্ববিধানের এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যাতে—কেননা তার মধ্যে ব্যাবহারিক অনুভবকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা চলনসই রূপ দিয়েছি আমরা। কিন্তু বিশ্বের এই বস্তুতন্ত্র ব্যাখ্যাতে মানুষের জীবন এবং উপলব্ধির চরম ও পরম রূপটি কিছুতেই ফুটতে পারে না। 'সত্যের পথেই চলতে হবে, অসত্যের পথে নয়।' এ তো সত্য নয় যে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকে বিশ্বজীবনের কেন্দ্র করে ঈশ্বর ঘুরছেন তার চারদিকে, অতএব দ্বন্দ্ববোধজর্জরিত অহং দিয়েই বিচার চলে তাঁর। বরং সত্য হল এই যে, পরমপুরুষই বিশ্বের কেন্দ্র। ব্যক্তির অনুভব তাঁর সত্যস্বরূপটি জানতে পারে তখনই, যখন বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণের নিরিখে পায় সে তাঁর পরিচয়। তবু বিজ্ঞানের ভিত্তিকে পাকা না করে হঠাৎ যদি বিশ্বাত্মবোধের ভার চাপানো যায় কাঁচা আমির 'পরে, তাতে নতুন ভাব এসে পুরানো ভাবের ঠাঁই জুড়বে বটে; কিন্তু সে আসবে মিথ্যার ছাপ নিয়ে খাপছাড়া হয়ে—কেননা এই আকস্মিকতার ধাক্কায় ঘটবে সত্যেরই বিপর্যয়, তাই ঋতের ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবকাশই সে পাবে না। এমন বিপর্যয় হতেই অনেকসময় নূতন দর্শন ও নূতন ধর্মের সূচনা হয়, সমাজে দেখা দেয় সার্থক বিপ্লব। কিন্তু সত্য লক্ষ্যে পেঁছতে হলে, একটি ঋতময় ভাবকে কেন্দ্র করে ঘটাতে হবে বুদ্ধিযোগের সঙ্গে কর্মযোগের এমনই উদার সামঞ্জস্য যাতে ব্যক্তির অহংএর কাছে তার সকল বিত্ত ফিরে আসে পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে। এমনি করেই আমরা পাব সত্যের অভিনব রূপায়ণের সিদ্ধমন্ত্র, যা আমাদের এই মর্ত্যজীবনে স্ফুরিত করবে দিব্যমহিমার ব্যঞ্জনা, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত বৃত্তিতে ঢালবে দিব্যভাবনার সেই অমোঘ বীর্য যা বিশ্বের প্রাণধাতুকে ব্যবহার করবে নবসৃষ্টির সার্থক উপাদানরূপে।

অখণ্ড মানবতার মধ্যে এমনি করে প্রাণের নববীর্য উদ্দীপ্ত হবে, যখন মানুষ পাবে সেই মহাসত্যের অপরোক্ষ পরিচয় যা পরমপুরুষের দিব্য-প্রকৃতিকে চেতনায় ফুটিয়ে তোলে আমাদেরই ভাবধারার প্রতিরূপ করে। দিব্যভাবের এই সাধনায় অহংকে ছাড়তে হবে যত তার মিথ্যা দৃষ্টি ও মিথ্যা সংস্কারের নিরূঢ় অভিমান। ঋতসুষমার ছন্দ মেনে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে সেই অখণ্ডের মধ্যে যার সে খণ্ডবিভূতি মাত্র, উত্তীর্ণ হতে হবে সেই তুরীয়ধামে যেখান হতে সে নেমে এসেছে এই মাটির বুকে। এমনি করে সকল বিকল্পনার অতীত যে সত্য ও ঋত, তার কাছে আপনাকে অসংকোচে মেলে ধরে সেই সত্যের মধ্যে পেতে হবে নিজের চরম সিদ্ধি, সেই ঋতের ছন্দে খুঁজতে হবে নিজের পরম মুক্তি। এ-সাধনার লক্ষ্য হবে—অহংদৃষ্টির সকল বিকল্প ও সংস্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ; দুঃখ অশিব মৃত্যু অবিদ্যা—আধারের সকল

সংকোচকে প্রমুক্তির উল্লাসে ছাড়িয়ে যাওয়াই হবে সাধকের পরমপুরুষার্থ।

এই পৃথিবীর বুকে কখনও সিদ্ধ হবে না ওই উচ্ছেদ ও উত্তরণের সাধনা, যদি এখনকার মত জীবন জড়িয়ে থাকে অহংদুষ্ট সংস্কারের জালে। যদি বিশ্বাস করি ঃ বস্তুত এ-জীবন বিবিক্ত ব্যক্তিচেতনার একটা প্রতিভাস মাত্র, এর মূলে নাই কোনও বিশ্বব্যাপ্ত সত্তার অধিষ্ঠান, কোনও চিন্ময় 'মহদ্-ভূতের নিঃশ্বসিতে' এ নয় সঞ্জীবিত; বিষয়সংস্পর্শে ব্যক্তিচেতনায় জাগে দ্বন্দ্ববোধের যে-সাড়া, শুধু বাইরের সাড়াই সে নয়—সমস্ত প্রাণনের মর্মসত্য এবং নিরূঢ় ধর্মও প্রকাশ পায় ওই সাড়াতে; দেহ-প্রাণ-মনের যে-ধাতুতে গড়া আমাদের এই আধার, সংকোচবৃত্তিই তার অনুচ্ছেদ্য প্রকৃতি; মরণে পঞ্চভূতের বিশ্লেষ—এই হল জীবনের একমাত্র পরিণাম; জীবনের যাত্রা শুরু মরণ হতে এবং তারই মধ্যে তার অবসান; সমস্ত ইন্দ্রিয়সংবেদনেই আছে সুখ-দুঃখের অবিচ্ছেদ্য দ্বন্দ্বলীলা, সমস্ত বেদনার মধ্যে হর্ষ-শোকের আলো-ছায়া; মানুষের সকল জিজ্ঞাসা নিত্য-আবর্তিত হয়ে চলেছে শুধু সত্য ও প্রমাদের দুটি মেরুবিন্দুর অন্তরালেঃ এই যদি হয় আমাদের মজ্জাগত প্রত্যয়, তাহলে উত্তরণের পথ আমাদের খোলা আছে শুধু দুটি দিকে। হয় সকল সত্তার অতীত মহাশূন্যে মনুষ্যজীবনের মহাপরিনির্বাণে, নয়তো এই মাটির বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া কোনও লোকান্তরে বা বৈকুণ্ঠধামে।

অতীত-বর্তমানের সংস্কারজালে জড়িত প্রাকৃতমনের পক্ষে একথা কল্পনা করা খুব সহজ নয় যে, এই মর্ত্য আধারে থেকেই আমূল রূপান্তর ঘটতে পারে মানুষের—তার আড়ষ্টকঠিন পরিবেশের বন্ধন কাটিয়ে। মানুষের সম্ভাবিত পরিণামের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কে আজও তার ধারণা কতকটা ডারউইন-কল্পিত 'নরাদি' বানরেরই অনুরূপ। আদিম অরণ্যের শাখাবিহারী বানরের সহজ চেতনায় এ-কল্পনা কোনমতেই জাগতে পারে না যে, একদিন এই ধরাপৃষ্ঠেই এমন-কোনও জীবের আবির্ভাব হবে, যে তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সকল উপকরণের 'পরে খাটাবে 'বুদ্ধি' নামক একটা নূতন বৃত্তির প্রশাসন এবং তারই শক্তিতে সে নিয়ন্ত্রিত করবে তার চিরাভ্যস্ত সকল সংস্কার, বহির্জীবনের পরিবেশে আনবে অকল্পনীয় রূপান্তর, শাখাসঞ্চরণ ছেড়ে হবে পাষাণহর্ম্যের অধিবাসী, প্রকৃতির গোপন ঐশ্বর্য করায়ত্ত করে সমুদ্রে জমাবে পাড়ি, আকাশে মেলবে পাখা, ধর্মসংহিতার বিধান দিয়ে গড়বে সমাজ, নিজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে আবিষ্কার করবে সচেতন চিত্তের সহস্র সাধনা! বানরচিত্তে এমন জীবের কল্পনা যদিও-বা জাগে, তবু প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের অথবা অন্তর্গূঢ় সংকল্পের দীর্ঘ তপস্যায় সে যে নিজেই ওই জীবে পরিণত হবে কোনদিন, এ তার ভাবনারও অগোচর। কিন্তু মানুষের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে বুদ্ধি, দেখা দিয়েছে বোধি ও কল্পনার

অপূর্ব ঝলক। অতএব নিজের চাইতে উন্নততর জীবনের কল্পনা কঠিন নয় তার পক্ষে। এমন-কি সে যে নিজেই বর্তমানের গণ্ডি পেরিয়ে কোনদিন উত্তীর্ণ হতে পারে ওই অনাগত জীবনের মহত্তর পরিবেশে—এমন স্বপ্ন দেখাও তার পক্ষে অসংগত নয়। তাই তার মহাভূমির কল্পনায় এসে মিলেছে চিত্তের যা-কিছু অনুকূলবেদনীয়, সহজাত অভীপ্সার যা-কিছু কাম্য তার চরম। সেখানে আছে জ্ঞানের দিব্যবিভা, প্রমাদের লেশমাত্র ছায়াতে তা কলঙ্কিত নয়; আছে অনাবিল আনন্দ, দুঃখের ছোঁয়াচ এতটুকু ম্লান করতে পারে না তাকে; আছে নিরঙ্কুশ বীর্য, যাকে ছুঁয়েও যেতে পারে না অসামর্থ্যের লাঞ্ছনা। এমনি করে সে-জীবনে আছে শুধু নিষ্কলুষ শুভ্রতা ও অকুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের অদীন অনুভব। এই তো মানুষের দেবতার কল্পনা, এই তো তার স্বর্গের ছবি। কিন্তু এ-ছবি মূর্ত হবে এই পৃথিবীর বুকে, রূপ ধরবে ভবিষ্য মানবের সমাজে—তার বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয় এমন কল্পনায়। বস্তুত দেবতা ও স্বর্গের স্বপ্ন নিজেরই পুরুষার্থসিদ্ধির স্বপ্ন তার; কিন্তু সে-স্বপ্নকে এই বাস্তবের বুকে সফল করে তোলাই যে তার চরম নিয়তি, একথা স্বীকার করতে সে ভয় পায় সেই তার বানরগোত্র পূর্বপুরুষেরই মত—যে হয়তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে অনাগত মানবের মহতী সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তারই মধ্যে। মানুষের কল্পনা ও অধ্যাত্মপিপাসা ওই লোকাতীত আদর্শকে যদিও-বা জাগিয়ে রাখে চিত্তের নিরালায়, তবু তার সজাগবুদ্ধির দাপটে নিমেষে মিলিয়ে যায় বোধি ও কল্পনার লোকোত্তর বিলাস। তখন গম্ভীরচিত্তে সে ভাবে, এ তার কুসংস্কারের ঝলমলানি শুধু, জড়বিশ্বের নিরেট তথ্যের সঙ্গে কোথায় এর সংগতি ?......এধরনের কল্পনা তার চিত্তে তবু খানিকটা প্রেরণা জোগায় অসম্ভাবিতের স্বপ্নছবিরূপে। কিন্তু সে জানে, বাস্তবিক যা সম্ভব ও সাধ্য তার পক্ষে, সে হল নৈমিত্তিক জ্ঞান সুখ শক্তি ও কল্যাণের একটা সীমিত ও অনিশ্চিত বরাদ্দকে কোনরকমে হাতের মুঠায় পাওয়া !

এমনি করে প্রাকৃত-বুদ্ধি লোকোত্তরের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেও, তার মর্মে-মর্মে কিন্তু জড়িয়ে আছে লোকোত্তরেরই আবেশ। বুদ্ধির স্বরূপ ও লক্ষ্য হল বিদ্যার এষণা, অর্থাৎ প্রমাদরহিত সত্যের উপাসনা। সত্যের সন্ধানে প্রমাদের মাত্রাকে ক্রমে হ্রস্ব করেই যে খুশী সে, তা তো নয়। সে বিশ্বাস করে একটা নির্ভেজাল সত্যের প্রাক্-সত্তাতে, যার অস্তিত্ব অবধারিত বলেই প্রমা এবং অপ্রমার দ্বন্দ্বে দুলেও আমরা এগিয়ে চলেছি তারই দিকে। বুদ্ধির এ-বিশ্বাসই সূচিত করে লোকোত্তরের প্রতি তার শ্রদ্ধা। মানুষের অন্যান্য অভীপ্সার প্রতি বুদ্ধির যে সহজাত শ্রদ্ধার অভাব, তার কারণ—স্বত-উৎসারিত কোনও প্রাতিভদীপ্তির আলোকে তারা দীপ্ত নয় তার ব্যবহার-জগতের স্বাভাবিক চলাফেরার মত। নির্ভেজাল সুখের চূড়ান্ত অনুভব আমাদের

কল্পনায় আসে; কেননা সুখের আকূতি হৃদয়ের সহজধর্ম বলে সে-সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা একটা নিশ্চিত প্রত্যয় আমাদের আছে, এবং কামনার যে-অপরিতৃপ্তি দুঃখের আপাত-নিদান, তার উচ্ছেদও আমাদের মনের পক্ষে অভাবনীয় নয় একেবারে। কিন্তু নাড়ীচক্রের সংবেদন হতে বেদনাবোধের বিলুপ্তি, অথবা দৈহ্যজীবন হতে মরণসম্ভাবনার উচ্ছেদ কল্পনা করা যায় কি করে? অথচ বেদনাকে প্রত্যাখ্যান করা ইন্দ্রিয়সংবেদনের সহজ ধর্ম। প্রাণচেতনার মর্মে নিরূঢ় হয়ে আছে মরণকে অস্বীকার করবার একটা প্রচণ্ড আকূতি।... কিন্তু বুদ্ধি একে মনে করে শুধু মূঢ় অভীপ্সার আকুলিবিকুলি; এর সার্থক হবার এতটুকু সম্ভাবনা আছে বলে সে বিশ্বাস করে না।

অথচ সবজায়গায় একই নিয়ম খাটবে, এই তো সঙ্গত। ব্যাবহারিক বুদ্ধির গলদ এইখানে। চোখের সামনে ঘটছে বলে যা সদ্য-বাস্তব হয়ে ওঠে তার কাছে, সে শুধু তারই একান্ত অনুগত। কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচর কোনও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে যুক্তিসিদ্ধ পরিণামের দিকে এগিয়ে দেবার মত যথেষ্ট সাহস তার নাই। অথচ আজ যা ঘটছে, সে তো প্রাক্তন কোনও সম্ভাবনারই সিদ্ধরূপ। আর আজ যা সম্ভাবিত, ভবিষ্যসিদ্ধির দিকেই তো তার ইশারা। বস্তুত মানুষের আকূতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা বিপুল সম্ভাবনার প্রেতি; কেননা যে-কোনও ব্যাপারের 'কেন, কি বৃত্তান্ত,' জানতে পারলেই তাকে সে হাতের মুঠায় আনতে পারে। অতএব যদি বুঝতে পারি, এ-জগতে প্রমাদ শোক দুঃখ মৃত্যু কেন, তাহলে তাদের উচ্ছেদের একটা উপায় আবিষ্কার তো দুরাশা নয় আমাদের পক্ষে। কেননা জ্ঞানেই না মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে বীর্য, জেগে ওঠে ঈশনা।

সত্য বলতে আজও আমরা হাল ছেড়ে বসে নাই। বিশ্বব্যাপারে যা-কিছু অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল, সাধ্যমত তার মূলোচ্ছেদ করাকে আদর্শ সাধনা বলেই আমরা জানি। প্রমাদ ও দুঃখ-সন্তাপের নিদানকে যথাসম্ভব খর্ব করবার অবিরাম চেষ্টাও আমরা করছি। বিশ্বরহস্যকে আয়ত্তে আনবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিজ্ঞান দেখছে জন্ম-মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করে চিরায়ুষ্মান এমন-কি মৃত্যুঞ্জয় হবার স্বপ্ন। কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে অনর্থের অবান্তর বা গৌণ হেতুটাই শুধু। তাই আমাদের প্রতিকার-চেষ্টা অবাঞ্ছনীয়কে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কেবল, পারে না তার মূলোচ্ছেদ করতে। এই শক্তি-দৈন্যের মূলে আছে সাধনার দৈন্য। কেননা ব্যাবহারিক জীবনে গৌণপ্রত্যয়ের দিকেই আমাদের ঝোঁক—মূলা বিদ্যার দিকে নয়, বিশ্বব্যাপারের বহিঃপ্রবৃত্তিই আমরা চিনি—জানি না তার স্বরূপ-তত্ত্ব। তাই জগতের বাইরের দিকটাকে অসুরবীর্যে সংক্ষুব্ধ করতে জানলেও, আজও তার অন্তর্যামিত্বের অধিকার আমরা পাইনি। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্তর্মুখী সাধনায় সে-অধিকারও যে হাতে

আসবে না আমাদের, তাও তো বলা চলে না। যদি জানতে পারতাম দুঃখ মৃত্যু ও প্রমাদের যথার্থ স্বরূপ এবং নিদান কি, তাহলে তাদের পুরাপুরি বশে আনবার প্রয়াসও আমাদের ব্যর্থ হত না। এমন-কি তাদের ছায়াটুকু পর্যন্ত জীবন হতে বিলুপ্ত করে দিয়ে, অকুণ্ঠ জ্ঞান আনন্দ কল্যাণ ও অমৃতত্বের নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে সার্থক করে তুলতাম তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই অনির্বাণ আকূতি, যার পরিতৃপ্তিকে আমাদের অন্তরাত্মা জানে মানুষের পরম ও চরম পুরুষার্থ বলে।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'—প্রাচীন বেদান্তের এই দুটি বাণীর সাধনায় আমরা পাই ওই পুরুষার্থসিদ্ধির একটা অমোঘ সঙ্কেত।

বেদান্ত বলেন ঃ জীবনের মর্মসত্য নিহিত রয়েছে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃত-সত্তার পরিস্পন্দনে। সকল সংজ্ঞা ও বেদনার মর্মকথা হল এক স্বয়ম্ভূ বিশ্বাবগাহী স্বরূপানন্দের উচ্ছ্বাস। সমস্ত ভাবনার ও প্রত্যয়ের স্বরূপ হল এক সর্বগত বিশ্বসত্যের বিকিরণ। সমস্ত প্রবৃত্তির প্রেতি নিহিত আছে এক বিশ্বাত্মিকা কল্যাণী শক্তিরই স্বতঃপরিণামী প্রবেগে।

কিন্তু অখন্ড-সতের স্পন্দনলীলা মূর্ত হয়ে ওঠে রূপের বহুধা-বিসৃষ্টিতে, প্রবর্তনার বহুমুখী বৈচিত্র্যে, পরিকীর্ণ শক্তির অন্যোন্যসঙ্গমে। এই বহু-ভাবনা বা বিভূতি-বিস্তরের জন্যই অখন্ডের মধ্যে দেখা দেয় ব্যষ্টি-অহংএর খন্ডলীলা, যা সাময়িক বৈরূপ্যের লাঞ্ছনে নির্বিশেষের মধ্যে জাগায় বৈশিষ্ট্যের বিক্ষোভ। অহংএর প্রকৃতি হল চেতনার একটা খন্ড-পরিসরের মধ্যে নিজেকে নিবন্ধ রাখা, তার অন্যান্য বিভাবের প্রতি স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে। শুধু একটি রূপায়ণ, প্রবর্তনার একটি ধারা এবং শক্তিস্পন্দনের একটিমাত্র ক্ষেত্রের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশই তার লক্ষণ। অহন্তা আছে বলেই অখন্ডচেতনায় জাগে দুঃখ শোক অনর্থ প্রমাদ ও মৃত্যুর বেদনা। নইলে শাশ্বত সত্য শিব ও আনন্দের অদ্বৈতচেতনায় ঋত-সুষমার ছন্দেই জাগত তারা। কিন্তু অহন্তাই তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে অনৃতের বিকৃত বঞ্চনায়। ঋতের ছন্দ আবার ফিরে পেলে অহং-শাসিত এই বেদনার দ্বন্দ্বকে আমরা ছেঁটে ফেলতে পারি জীবন হতে, চেতনার কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে পারি তাদের সত্য স্বরূপ। সে-সাধনার মন্ত্র হবে, বিশ্বচেতনার ঐকতানে ব্যক্তিজীবনের খাঁটি সুরটিকে চিনে নেওয়া এবং বিশ্বোত্তীর্ণের গহনবীণায় কাঁপিয়ে তোলা তার নিঃশব্দ মূর্ছনা।

পরের যুগে বেদান্তের মধ্যে ধীরে-ধীরে শিকড় মেলেছে এই ধারণাই যে, অহন্তার সঙ্কোচ হতে দ্বন্দ্ববোধেরই সৃষ্টি হয়নি শুধু, বিশ্বসত্তারও ওই হল

একান্ত নির্ভর বা পরম অয়ন। অহং হতে যদি অবিদ্যা ও তজ্জনিত সকল উপাধি ছেঁটে ফেলতে পারি, তাহলে দ্বন্দ্ববোধের উচ্ছেদ তো ঘটেই, সেইসঙ্গে বিশ্বপ্রপঞ্চে আমাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়। তাইতে প্রমাণিত হয়, মানুষের জীবন বস্তুতই হেয় অসার ও অলীক একটা বিভ্রম, অতএব খণ্ডবোধের জগতে থেকে পূর্ণতা লাভের প্রয়াস মোহের ছলনা শুধু। নির্ভাজ ভাল বলে কিছুই নাই এখানে, একটু-না-একটু মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মধ্যে এর বেশী
নাই এখানে, একটু-না-একটু মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মধ্যে—এর বেশী
কিছু এখানে প্রত্যাশা করাও মূঢ়তা।...কিন্তু অহন্তার এমন ক্লিষ্ট ধারণাই কি তার শেষ পরিচয়? তার মধ্যে নিগূঢ় ও মহত্তর একটা প্রেতি থাকা কি একেবারেই অসম্ভব? যদি জানি, ব্যক্তির অহং কোনও লোকোত্তর তত্ত্বের অবান্তরব্যাপার মাত্র, তাহলে আর মায়াবাদের আসরে নামা যায় না তাকে ধরে। বেদান্তকে তখন জীবনবিমুখীনতার সাধনায় না লাগিয়ে লাগানো যেতে পারে জীবনের পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের সাধনায়। ঈশ্বর অথবা পুরুষই বিশ্বসত্তার নিমিত্ত ও অধিষ্ঠান—তিনিই বিশ্ব- এবং ব্যক্তি-রূপে নিজেকে বিসৃষ্ট করে আবিষ্ট আছেন সবার মধ্যে। ব্যক্তির সীমিত অহং শুধু চেতনার একটা অবান্তরব্যাপার, বিশিষ্ট বিভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার এ একটা অপরিহার্য কৌশল মাত্র। অহং-পরিণামের ধারা ধরে জীব ক্রমে পৌঁছয় সেই স্বোত্তর-ভূমিতে, যার স্বরূপসত্যের প্রতিভূ হয়ে সে নেমে এসেছিল এই জগতে। তার প্রতিভূর ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না সেখানে গিয়েও, কিন্তু তখন আর মূঢ় আচ্ছন্ন সংকুচিত অহন্তায় তার প্রকাশ হয় না। পরমপুরুষের দিব্য বিভূতিরূপে তখন সে জ্বলে ওঠে বিশ্বচিতের পরবিন্দু হয়ে—দিব্য সামরস্যের রসায়নে ব্যক্তিত্বের সকল বৈশিষ্ট্যকে করে জারিত প্রেষিত ও রূপান্তরিত।

জড়বিশ্বে মানবজীবনের ভিত্তিরূপে আমরা পেলাম তাহলে নিখিল জড়-প্রকৃতিতে স্ফুরিত চিন্ময় দিব্য-পুরুষেরই আত্মসম্ভূতির বীর্যকে। গুহাহিত সেই চিন্ময় পুরুষের যে সংবৃত্ত শক্তি রূপায়িত হয়ে উঠেছে প্রাণ মন ও অতিমানসের অকুণ্ঠিত উন্মেষণে, তার সংবেগই আমাদের সকল ক্রিয়ার প্রবর্তক—কেননা দিব্যপ্রকৃতির এই ঊর্ধ্বপরিণামের আকূতিই অন্নময় আধারে ঘটিয়েছে মনোময় জীবের আবির্ভাব। এই পরিণামের ধারা ধরে একদিন স্থূলদেহেই মানুষ ফুটিয়ে তুলবে সেই আনন্দচিন্ময়কে—বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-জনীন অবতরণকে সিদ্ধ করবে। অহংএর ব্যাকৃতিতে আমরা পাই চিৎশক্তির সেই বিনিগমক অবান্তরব্যাপারের পরিচয়—অব্যাকৃতের নির্বিশেষ নীরূপ গহন হতে, অবচেতনার 'হৃদ্য সমুদ্র' হতে ধীরে-ধীরে উন্মেষিত করে যা অখণ্ড-চিন্ময়ের অগণিত মণিবিন্দুতে ঝলমল বহুময় রূপ। এই অহংচেতনার প্রথম রূপায়ণে দেখা দেয় জীবন-মরণ সু-কু সত্য-অনৃত হর্ষ-শোক সুখ-দুঃখের

দ্বন্দ্ব শুধু। কারণ, বিশ্বের অখণ্ড সত্য আনন্দ কল্যাণ ও প্রাণলীলার সীমাহীন ঔদার্য হতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন-বিবিক্ত করে আপন-হাতে-গড়া একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে থেকেই যদি সে চায় একত্বের অনুভব, তাহলে দ্বন্দ্ব-বোধই হবে তার অনতিবর্তনীয় স্বাভাবিক পরিণাম। বিশ্ব এবং বিশ্বেশ্বরের কাছে জীবের অহং যদি হৃদয়টি মেলে ধরে লোকোত্তরের আকূতি নিয়ে, তাহলে এই স্বরচিত কঞ্চুকের উন্মোচনে সে উত্তীর্ণ হয় সেই পরম সিদ্ধির কূলে যার দিকে শুরু হয়েছিল তার গোপন অভিসার এই অহন্তারই বিসৃষ্টিতে—যেমন পশুজীবনের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল চেতনার মানবজীবনে উত্তরায়ণের অস্ফুট আভাস। এই সিদ্ধির পরিচয় মেলে ব্যক্তিতে সর্বাত্মভাবের অনুভবে, যখন সংকীর্ণ অহন্তা রূপান্তরিত হয় লোকোত্তর অন্বয়ভাবের প্রমুক্তিতে। ব্যক্তির এই প্রমুক্তিতে তখন তুর্যাতীতের জ্যোতির দুয়ার অপাবৃত হয়, অখণ্ড সত্য আনন্দ ও কল্যাণের অপ্রমেয় শুদ্ধসত্তা নির্বারিত উৎসারণে ঝরে পড়ে বিশ্বের 'পরে, আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী পরিণামের ধারাকে দিব্য রূপায়ণে এগিয়ে নিয়ে চলে চরম সার্থকতার দিকে। মহাভবিষ্যের এই ভ্রূণকেই বিশ্বপ্রকৃতি আজও আপন গর্ভে গোপনে লালন করছে। সেই পরম আবির্ভাবের চিরপ্রত্যাশিত মুহূর্তটির জন্য গভীর ব্যাকুলতায় ছেয়ে আছে তার মায়ের হৃদয়।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মবিদ্যার সাধন

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

কঠোপনিষৎ ১।৩।১২

সর্বভূতে নিগূঢ় এই আত্মা অমনি প্রকাশ পান না, কিন্তু তাঁকে দেখতে পান অতিসূক্ষ্ম অগ্র্যা বুদ্ধি দিয়ে কেবল সূক্ষ্মদর্শীরাই।

—কঠ উপনিষদ (১।৩।১২)

তাহলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লীলায়ন কোন্ রূপ ধরে ফুটে ওঠে এ-জগতে? জীবের যে-অহং তাঁর আত্মবিভূতি, তার সংগে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ঘটে পরিণামের কোন্ ধারা ধরে—কি করেই-বা উত্তীর্ণ হয় তা সিদ্ধির চরমভূমিতে? এ-প্রশ্নের একটা সমাধান এখন আমাদের খুঁজতে হবে, কেননা এই যোগাযোগ আর তার পরিণামের ধারার 'পরেই নির্ভর করছে মানুষের দিব্য-জীবনের দর্শন ও সাধনা।

ইন্দ্রিয়ের দর্শনকে ছাড়িয়ে, জড়ীয় মনের আবরণ ভেদ করে, দৃষ্টিকে তারও ওপারে প্রসারিত করেই পাই আমরা অমর্ত্য দিব্যসত্তার ধারণা ও অনুভব। অন্নময় চেতনার আবেষ্টনে শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নিয়ে কারবার যতক্ষণ, ততক্ষণ বিশ্বে জড়ের খেলা ছাড়া আর-কিছুই ধারণা বা অনুভব হওয়া আমাদের সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষেরই মধ্যে আছে এমন-সব বৃত্তি, মনকে যারা পেঁছে দিতে পারে অতীন্দ্রিয় ধারণার দুয়ারে। অবশ্য দৃশ্যজগতের স্থূল তথ্য হতে তর্ক অথবা কল্পনার যোজনায় তাদের অনুমান সম্ভব। কিন্তু জড়জগতের আলম্বন বা জড়ীয় অনুভবের সাহায্যে তাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। চিত্তের ওইসব বৃত্তিই আমাদের অতীন্দ্রিয়জ্ঞানের সাধন; তাদের প্রথমটিকে আমরা জানি শুদ্ধবুদ্ধি বলে।

মনুষ্যবুদ্ধির দুটি প্রবৃত্তি—একটি ব্যামিশ্র বা পরতন্ত্র, আরেকটি শুদ্ধ বা স্ব-তন্ত্র। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানুভবের আবেষ্টনে নিজেকে ঘিরে রাখে যতক্ষণ, ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র। এ-অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ধর্মকেই সে মানে চূড়ান্ত সত্য বলে। প্রাতিভাসিক তথ্যের অনুশীলনই একমাত্র কাজ তার তখন, তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্যোন্যসম্বন্ধ প্রবৃত্তি পরিণাম ও প্রয়োজনের গবেষণা ছাড়িয়ে আর গভীরে তার দৃষ্টি যেতে চায় না। বুদ্ধির এ-প্রবৃত্তি

দিয়ে প্রাতিভাসিক সত্যই জানা যায় শুধু, বস্তু-সৎ বা পারমার্থিক সত্যের কোনও আভাস মেলে না তাতে। কেননা, সত্তার গভীরে ডুবে যেতে পারে এতখানি গুরুত্ব তার মধ্যে নাই—সে দিতে পারে শুধু বিভূতিরাজ্যের খবর-টুকুই। অথচ এই বুদ্ধিতেই দেখা দেয় তার শুদ্ধপ্রবৃত্তি, যখন ইন্দ্রিয়ানুভবের ভিত্তিতে গবেষণা শুরু করেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কোচকে পরাভূত করে চলে যায় সে তারও ওপারে—মনীষার স্বাতন্ত্র্য দিয়ে অধিকার করতে চায় ভাবসামান্যের সেই ধ্রুবলোক, যা প্রতিভাসের অধিষ্ঠানের সঙ্গেই নিত্যযোগে যুক্ত হয়ে আছে। শুদ্ধবুদ্ধি কখনও অপরোক্ষবৃত্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে প্রতিভাসের মর্ম ভেদ করে একেবারে অবগাহন করে অধিষ্ঠানের সত্যে। যে-ভাব তখন জাগে তার মধ্যে, তাকে ইন্দ্রিয়ানুভবের পরিণাম এবং তারই আশ্রিত বলে ভুল হলেও আসলে তা বুদ্ধিরই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব। কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির বিশিষ্ট স্বধর্ম তখনই প্রকাশ পায়, যখন ইন্দ্রিয়ানুভবের আদিবিন্দুকে একবার ছুঁয়েই তাকে সে পিছনে ফেলে যায় স্বত-উৎসারণের প্রবেগে। বুদ্ধির বিদ্যুৎবিসর্পী সে-অনুভবকে মনে হয় তখন ইন্দ্রিয়শাসিত অনুভবের একান্ত বিপরীত। শুদ্ধবুদ্ধির এই অতীন্দ্রিয় প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক তেমনই অপরিহার্যও—কারণ আমাদের প্রাকৃত অনুভব বিশ্বব্যাপারের সামান্য অংশই জুড়ে থাকে এবং এই স্বল্পপরিসরের মধ্যেও বাটখারার খুঁতে কেবলই হেরফের দেখা দেয় তার সত্যের ওজনে। তাই চেতনায় সত্যের রূপকে স্পষ্ট করতে হলে প্রাকৃত অনুভবকে ছাড়িয়ে যেতেই হয়, তার সকল দাবি অগ্রাহ্য করে দিতেই হয় তাকে দূরে ঠেলে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রমাদকে বুদ্ধি দিয়ে শোধন করবার আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেই তো মানুষ সৃষ্টজীবের মধ্যে সবার সেরা হয়েছে।

শুদ্ধবুদ্ধির পূর্ণবিকাশ আমাদের নিয়ে যায় জড় হতে অবশেষে জড়াতীতের জগতে। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানের অনুশীলনে যে-পরিচয় পাই জড়াতীতের, তা আমাদের অখণ্ড-প্রকৃতির সকল পিপাসা মেটাতে পারে না। শুদ্ধবুদ্ধি হয়তো তত্ত্বদৃষ্টির এইটুকু প্রকাশেই খুশী হয়ে ওঠে পুরাপুরি—এ তার নিখাদ সত্তার নিখুঁত সৃষ্টি বলে। কিন্তু বিশ্বের দিকে একজোড়া চোখ মেলে তাকানোই আমাদের স্বভাব। তাই সব-কিছুকেই আমরা যেমন দেখি ভাবরূপে, তেমনি দেখি বস্তুরূপে। এইজন্যই যে-কোনও ধারণা অনুভবে বাস্তব হয়ে না উঠছে যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের কাছে তা অপূর্ণ—এমন-কি চিত্তের বিশেষভূমিতে অলীকপ্রায়। কিন্তু সত্যের যে-প্রকাশ নিয়ে আমাদের এই গবেষণা, তার এলাকা প্রাকৃত অনুভবকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে-প্রকাশ স্বভাবতই 'অতীন্দ্রিয় কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য'। তাই আমাদের প্রয়োজন, চিত্তের এমন-কোনও অক্লিষ্টবৃত্তির অনুশীলন ও আপ্যায়ন যা আমাদের আত্মপ্রকৃতির

দাবি পুরোপুরি মেটাতে পারে। সে-দাবি যখন অরূপলোকে প্রসারিত, তখন তাকে মেটাতে চাই মনোময় অনুভবেরই সম্প্রসারণে।

আমাদের সকল অনুভবই ধরতে গেলে মনোময়; কারণ, ইন্দ্রিয়ের অনুভবকেও মনের ভাষায় তর্জমা না করে নিই যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের কাছে তার কোনও অর্থ হয় না বা মূল্য থাকে না। এদেশের দার্শনিকেরা মনকে বলেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কিন্তু সত্য বলতে একমাত্র মনই আমাদের ইন্দ্রিয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধগ্রাহী আর পাঁচটি ইন্দ্রিয় মন-ইন্দ্রিয়েরই বিশিষ্ট বৃত্তিমাত্র। সাধারণত বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়ে অনুভবের ইমারত গড়ে তুললেও মন তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। তাছাড়াও তার আছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি দিয়ে একটা অপরোক্ষ অনুভবের অবিমিশ্র জগৎ গড়বার সামর্থ্য। তাই বুদ্ধির মত মনোময় অনুভবেরও আছে একটা দ্বৈতপ্রবৃত্তি—কখনও তা ব্যামিশ্র ও পরতন্ত্র, কখনও-বা শুদ্ধ ও স্বতন্ত্র। যখন বহির্জগৎকে বা বিষয়কে জানতে চায় মন, তখন তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র; আবার যখন অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে বা বিষয়ীকে অনুভব করে সে, তখন তার শুদ্ধ প্রবৃত্তি। ব্যামিশ্র প্রবৃত্তিতে বহিরিন্দ্রিয়ের 'পরেই নির্ভর তার, তাদের সাক্ষ্য মেনেই সে গড়ে তোলে তার প্রত্যয়। কিন্তু শুদ্ধ প্রবৃত্তিতে তার কারবার নিজেকে নিয়ে—সেখানে বিষয়ের অনুভব হয় তাদাত্ম্যসংবিৎ দিয়ে। এমনি করেই আমরা জানি হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে। যেমন একটা চলতি অথচ খুব গভীর কথা আছে—ক্রোধস্বরূপ হয়ে যাই বলেই আমরা জানি ক্রোধ কাকে বলে। নিজের সত্তাকেও অনুভব করি ঠিক এমনি করে; তাদাত্ম্যসংবিতের রূপ এক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট। বস্তুত সকল অনুভবের নিগূঢ় স্বরূপ হল তাদাত্ম্যসংবিৎ। কিন্তু একথা ঢাকা পড়ে গেছে আমাদের কাছে, কেননা ব্যাবৃত্তি-বোধ দিয়ে নিজেকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি জগৎ থেকে। 'বিষয়ী'-রূপে আমাদের শুধু নিজেরই অপরোক্ষ-জ্ঞান আছে, তাই নিজের বাইরে সব-কিছুকে জানি আমরা 'বিষয়' বলে। ভেদবুদ্ধি দিয়ে নিজ হতে এমনি করে বিবিক্ত করেছি যাদের, তাদের মর্মে প্রবেশ করতে তাই আবার গড়তে হয়েছে ইন্দ্রিয়ের সাধন। এইজন্যেই তো তাদাত্ম্যসংবিতের অপরোক্ষ-চিন্ময় অনুভবের জায়গায় এল পরোক্ষজ্ঞানের বৃত্তি, আপাতদৃষ্টিতে যার ভিত্তি হল স্থূলবিষয়ের সন্নিকর্ষ আর মনের সমবেদন। আসলে এ কিন্তু অহংএরই কল্পিত একটা উপাধি। একে ধরেই চলেছে সে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত—একটা গোড়ার মিথ্যাকে আরও আনুষঙ্গিক মিথ্যার অলঙ্কারে সাজিয়ে, সত্যের স্বরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে আমাদের চেতনায়। তাই তো অহংএর মিথ্যা কল্পনাই কায়েম হয়েছে মানুষের জীবনে ব্যাবহারিক-সত্যের বিচিত্র সম্বন্ধের মুখোস প'রে।

মানস এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এই অভ্যস্ত ধারা হতে অনুমান হয়, জ্ঞানকে

এমনি করে কঞ্চুকের আবরণে সঙ্কুচিত রাখা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য নয়। প্রকৃতিপরিণামের একটা পর্বে মানুষের মন জড়-বিশ্বের সঙ্গে যোগ ঘটাতে কতকগুলি শারীরবৃত্তি এবং তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্য নিতে অভ্যস্ত। তার ফলে জ্ঞানবৃত্তির এই সঙ্কোচ। তাই আজ ইন্দ্রিয়ের পরোক্ষ সহায়ে সত্যের একটা অপূর্ণ আদল নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয় আমাদের। তবু বলব, প্রকৃতির এ-বিধান দুরতিক্রম্য অভ্যাসের গতানুগতিকতা শুধু। জড়ের শাসন মেনে নেবার চিরন্তন সংস্কার হতে কোনরকমে যদি মুক্তি দেওয়া যেত মনকে, তাহলে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অপরোক্ষ অনুভব শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক হত তার কাছে। মনের এই শক্তিরই সন্ধান পাই সম্মোহন এবং ওইধরনের মানসব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়ায়। প্রাণ যেখানে একটা সমতা ঘটিয়েছে জড় ও মনের মধ্যে ঊর্ধ্বপরিণামের ধারায় চলতে গিয়ে, সেই সীমিত পরিবেশেই আবির্ভূত হয়েছে আমাদের জাগ্রতচেতনা। তাই বিষয়ের ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ অপরোক্ষ অনুভব সাধারণত সহজ নয় তার পক্ষে। এইজন্যই এধরনের অনুভব সম্ভব হয় জাগ্রতভূমির প্রাকৃতমনকে ঘুম পাড়িয়ে অধিচেতন-ভূমির আসল মনকে জাগিয়ে তুলে। তখন মনের মধ্যে ফুটে ওঠে তার স্বরূপশক্তি। অদ্বিতীয় সর্বগত ইন্দ্রিয়রূপে সে তখন—ব্যামিশ্রপ্রবৃত্তির পারতন্ত্র্য দিয়ে নয়—শুদ্ধপ্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য দিয়ে অধিকার করতে পারে ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বিষয়কে। অবশ্য জাগ্রতচেতনাতে মনঃশক্তির এই সম্প্রসারণ একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা দুঃসাধ্য বটে। মনঃসমীক্ষণের একটা বিশেষ ধারা ধরে যাঁরা অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, এ-খবর তাঁদের জানা আছে।

অভ্যস্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে আরও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি আমরা ইন্দ্রিয়মানসের অকুণ্ঠ ঈশনা দিয়ে। এই যেমন, একটা-কিছু হাতে নিয়ে বাইরের সাহায্য ছাড়াই নিখুঁতভাবে তার ওজন বলে দেবার শক্তি। এখানে বস্তুর স্পর্শ আর চাপ প্রাথমিক আলম্বন শুধু—ইন্দ্রিয়ানুভব যেমন শুদ্ধবুদ্ধির আলম্বন। বাস্তবিক মন এখানে ওজনের জ্ঞান পায় স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে নয়, তার স্ব-তন্ত্র প্রতিভা দিয়েই তাকে সে আবিষ্কার করে। স্পর্শ লাগে শুধু বিষয়ের সঙ্গে যোগসাধনের কাজে। যেমন শুদ্ধবুদ্ধির বেলায় তেমনি ইন্দ্রিয়মানসের বেলাতেও, ইন্দ্রিয়ানুভব জিজ্ঞাসার আদিবিন্দু শুধু। মন সেখান হতে এমন ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে যেখানকার জ্ঞান কেবল অতীন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়প্রমাণের বিরোধীও অনেকসময়। কেবল যে বহির্জগতের উপরটা নিয়ে মানস-সম্প্রসারণের নাড়াচাড়া তা নয়। যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে একবার যোগ ঘটিয়ে মনের প্রাতিভ দৃষ্টি দিয়ে তার ভিতরকার সকল খবর জানাও কিছুই অসম্ভব নয়। এমনি করে, মানুষের কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিত চালচলন বা হাবভাবের কোনও অপেক্ষা না রেখেই—

এমন-কি এসব অপর্যাপ্ত এবং ভ্রমোৎপাদক আলম্বনের বিরুদ্ধসাক্ষ্য সত্ত্বেও—তার চিন্তা বা মনোভাবকে অপরোক্ষ উপায়ে গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ করা চলে। তাছাড়া আমাদের মধ্যে আছে আন্তর-ইন্দ্রিয় বা বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তির একটা জগৎ। তার বহুব্যাপ্ত সামর্থ্যের একটি অংশমাত্র ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনে ধরেছে স্থূল ইন্দ্রিয়ের রূপ। সেই সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের অতিসূক্ষ্ম মনোময় বৃত্তি দিয়ে চিরাভ্যস্ত জড়ময় পরিবেশের বাইরেও রয়েছে যেসব অনুভব ও রূপায়ণ, তাদেরও সন্ধান আমরা পেতে পারি। মানস-সম্প্রসারণের এই সম্ভাবনাকে প্রাকৃতমন দ্বিধা ও সন্দেহের চোখে দেখে—কেননা সাধারণ জীবনের অভ্যস্ত সংস্কারের কাছে ব্যাপারটা নিতান্তই খাপছাড়া। তাছাড়া মনের এই যোগৈশ্বর্যকে সচল করা যত কঠিন, তারও চেয়ে কঠিন তাকে গুছিয়ে-বাগিয়ে একটা সুষ্ঠু কার্যোপযোগী সাধনসম্পত্তির রূপ দেওয়া। তবুও তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। কেননা বিশৃঙ্খলভাবেই হ'ক অথবা সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক সাধনার ধারাতেই হ'ক, বহিশ্চর চেতনার ক্ষেত্রকে যখনই আমরা প্রসারিত করতে যাই, তখনই এ-বিভূতির প্রকাশ হয় অনিবার্য।

গীতায় যেসব গভীর সত্যকে বলা হয়েছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্', মনোভূমিতে তাদের অনুভবকে নামিয়ে আনা হল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনাতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হয় না। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রাতিভাসিক জগৎকে সম্প্রসারিত করে শুধু—তার পর্যবেক্ষণের সাধনগুলিকে আরও তীক্ষ্ন ক'রে। কিন্তু বস্তুর স্বরূপসত্য কোনও ইন্দ্রিয়বৃত্তির কাছেই ধরা দেয় না। অথচ 'বুদ্ধিগ্রাহ্য' কোনও তত্ত্ব কোথাও থাকলে তাকে অনুভব বা পরখ করবার কোনও-না-কোনও বাস্তব সাধন থাকবেই বুদ্ধির আধারে—বিশ্ববিধানের এ একটা মর্মচর স্বারসিক সত্য। আমাদেরই মনের মধ্যে আছে অতীন্দ্রিয় সত্যকে পরখ করবার একটি সাধন: সে হচ্ছে তাদাত্ম্যসংবিতের সেই ধারা যা আমাদের মধ্যে জাগায় স্বানুভবের একটা সামান্যপ্রত্যয়। নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অল্পবিস্তর সচেতন হয়ে অথবা সে-সম্পর্কে একটা-কিছু ধারণা হতে আমরা জানতে পারি কি আছে আমাদের মধ্যে। কিংবা সাধারণ সূত্রের আকারে বলা চলে, আধারের জ্ঞানেই নিহিত আছে আধেয়ের জ্ঞান। অতএব স্বানুভবের মনোময়ী বৃত্তিকে প্রাকৃতচেতনার বাইরে সম্প্রসারিত করে উপনিষদের আত্মা বা ব্রহ্মে পৌঁছতে পারি যদি, তাহলে বিশ্বাত্মা বা বিশ্বাধার ব্রহ্মে নিহিত রয়েছে যেসব তত্ত্ব, তাদের অপরোক্ষ অনুভবও আমাদের অগোচর থাকবে না। এই সম্ভাবনার 'পরে এদেশের বেদান্তসাধনার ভিত্তি: আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়েই বেদান্তী চায় জগৎজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে।

কিন্তু বেদান্ত আমাদের একটা কথা ভুলতে দেয় না কোনমতেই। মনের বিশিষ্ট অনুভব অথবা বুদ্ধির সামান্যপ্রত্যয় যত উঁচুতেই উঠুক না কেন,

সে কখনও চরম তাদাত্ম্যের স্বয়ম্ভূ অনুভব নয়—মনের মধ্যে অবিবেকের আকারে মনেরই সে একটা প্রতিভাস মাত্র। মন-বুদ্ধিকেও আমাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে। জাগ্রৎচেতনায় বুদ্ধির যে-লীলা, অবচেতনা আর অতিচেতনার মধ্যে সে যেন বাচখেলা শুধু। প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামে, অবচেতন অখণ্ড অব্যক্ত হতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উত্তরায়ণের প্রবেগে চলেছি আমরা অতিচেতন অখণ্ড-অব্যক্তের দিকে; এ-দুটি মেরুর মাঝে বুদ্ধি কাজ করছে তটস্থশক্তিরূপে। কিন্তু অবচেতন আর অতিচেতন দুইই এক সর্বময় অখণ্ড সত্তার দুটি বিভূতি। অবচেতনার ব্যাহৃতি হল প্রাণ, অতিচেতনার ব্যাহৃতি জ্যোতি। অবচেতনায় চিৎশক্তি স্পন্দে সমাহিত, কেননা স্পন্দই প্রাণের স্বরূপ। অতিচেতনায় সেই স্পন্দপ্রবৃত্তি আবার ফিরে এল জ্যোতির্লোকে; তখন বিদ্যা আর কণ্ঠুকে আবৃত নয় তার মধ্যে—চিন্ময় প্রাণ তখন বাঁধা পড়েছে পরা সংবিতের উদার আলিঙ্গনে। দুয়ের মাঝে অন্যোন্যবিনিময়ের সাধন তখন বোধিপ্রত্যয়, যার ভিত্তি বিষয় আর বিষয়ীর সামরস্যে অর্থাৎ তাদের সচেতন ও সক্রিয় তাদাত্ম্যবোধে। এটি ঘটে স্বয়ম্ভূসত্তার সেই নিরুপাধিক ভূমিতে, যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হয়ে মিশে গেছে জ্ঞানের মধ্যে। কিন্তু অবচেতনায় বোধির প্রকাশ কর্মস্পন্দনে, পরিণমনের প্রবেগে বা অর্থক্রিয়াকারিতায়। তাই তাদাত্ম্যসংবিৎ সেখানে পুরাপুরি বা অল্পবিস্তর ঢাকা পড়ে যায় স্পন্দবৃত্তির অন্তরালে। অতি-চেতনায় কিন্তু তার বিপরীত। সেখানে জ্যোতিই তত্ত্ব, জ্যোতিই ছন্দ। অতএব বোধি সেখানে ফুটে ওঠে নিজের নিরঞ্জন মহিমায় তাদাত্ম্যসংবিৎ হতে উদ্ভিন্ন প্রত্যয়রূপে, আর তার অর্থক্রিয়াকারিতা দেখা দেয় বোধিরই স্বতঃপরিণামের অপরিহার্য ছন্দোবিভূতি বা অনুষঙ্গরূপে—মৌলতত্ত্বের মুখোস প'রে নয়। এই দুটি ভূমির মাঝে তটস্থশক্তিরূপে চলে মন ও বুদ্ধির অবান্তর-লীলা এবং তার ফলে ঊর্ধ্বপরিণামের প্রেতিতে, ক্রিয়ার আবেষ্টনে মুহ্যমান জ্ঞান ধীরে-ধীরে ফিরে পায় অকুণ্ঠ স্বারাজ্যের শাশ্বত অধিকার। স্বানুভবের মনোময়ী বৃত্তি যখন আধার এবং আধেয়কে অর্থাৎ বিষয়ি-আত্মা এবং বিষয়-আত্মাকে যুগপৎ অনুবিদ্ধ ক'রে স্বপ্রকাশ তাদাত্ম্যসংবিতের জ্যোতির্মহিমায় উদ্ভাসিত হয়, তখন বুদ্ধিও রূপান্তরিত হয় বোধিপ্রত্যয়ের স্বয়ংজ্যোতিতে। অতিমানসের আবেশে যখন প্রাকৃত-মন পায় তার চরম সার্থকতা, তখন এই সম্বোধি হয় আমাদের বিজ্ঞানের পরমভূমি।

মনুষ্যচিত্তের এই পরিণাম-পরম্পরার 'পরেই গড়ে তোলা হয়েছিল প্রাচীনতম বেদান্তের যত সিদ্ধান্ত। এই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যেসব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন ঋষিরা, তাদের বিস্তার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। দিব্য-জীবনের সাধনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মনে হয় সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে ঋষিদের কতকগুলি মুখ্যসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রয়োজন।

কারণ, আজ আমরা যা গড়ে তুলতে চাইছি নতুন করে, ঋষিদের কোনও-কোনও ভাবের 'পরে রয়েছে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রাক্তন ভিত্তি। কিন্তু সব বিজ্ঞানের বেলাতেই বলবার প্রাচীন ভঙ্গিকে আধুনিক মনের উপযোগী করে খানিকটা নতুনভাবে ঢেলে সাজতেই হয়। তাছাড়া মানবচেতনায় উষার পরে নূতন উষা জাগে যখন, তখন প্রকাশের অভিনব ঐশ্বর্যের নীরব অভিনন্দনে নবীনের বুকেই মিলিয়ে যায় পুরাতনের আলো। প্রাচীন সম্পদকে ভোলা যায় না তবু। কেননা তাকে পুঁজি করে, অন্তত তার যতটুকু সম্ভব পুনরুদ্ধার করে নতুন ব্যবসা ফাঁদি যদি, তাহলেই চির-অচঞ্চল অথচ নিত্য-চঞ্চল সেই অশেষের কারবারে আমাদের লাভের অঙ্ক যে ফেঁপে উঠবে দিনে-দিনে, এ-প্রত্যাশা অসঙ্গত কি?

বিশ্বতত্ত্বের চরম বিশ্লেষণে বেদান্ত এসে পেঁছেছে সদ্‌ব্রহ্মে—যিনি অনন্ত নিরঞ্জন নির্বিশেষ অনির্বচনীয় সৎস্বরূপ। বিশ্বের সকল স্পন্দন ও রূপায়ণ একটা প্রতিভাস মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ-সৎ তার অধিষ্ঠানরূপে—এই হল বেদান্তীর অনুভব। এ-অনুভব যে আমাদের প্রাকৃতচেতনা অথবা ব্যাবহারিক-প্রত্যয়ের সকল সীমা এবং প্রামাণ্য ছাড়িয়ে গেছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়মানস শুদ্ধ নির্বিশেষসত্তার কোনও খবর রাখে না। ইন্দ্রিয়ানুভব বলতে পারে রূপজগতের স্পন্দনের কথাই শুধু। রূপ আছে, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে নয়; ব্যামিশ্র সংসক্ত সম্মূঢ় ও পরতন্ত্র হয়েই তার প্রকাশ। অন্তরে ডুবি যখন, ব্যাকৃত রূপের প্রয়োজন না থাকলেও স্পন্দন বা পরিবর্তের হাত হতে তখনও নিস্তার নাই আমাদের। তখনও দেখি, জড়ের স্পন্দন দেশে আর পরিবর্তের স্পন্দন কালে—বিশ্বসত্তার আশ্রয় হল এই। এমন কথাও বলতে পারি, এই তো সত্তার চরম পরিচয়, কেননা স্বরূপ-সত্তা তো মনেরই একটা বিকল্প—তার অনুপাতী তত্ত্ব-বস্তু কি খুঁজে পাওয়া যাবে কোনকালে? স্বানুভবের মধ্যে বা তার পিছনে নিদানপক্ষে নিস্পন্দ-নির্বিকার একটা-কিছুর আভাস পাই কদাচিৎ, যার অস্পষ্ট অনুভব বা কল্পনা আমাদের মধ্যে আনে এক অনির্বচনীয়ের স্পর্শ—জীবন-মরণের সকল দোলার ওপারে সকল কর্ম বিকার ও রূপায়ণের অতীতে। চেতনার এই একটি দুয়ার আছে আধারে, কখনও যা অপাবৃত হয়ে উন্মোচিত করে লোকোত্তর মহাসত্যের জ্যোতির্ময় দিগ্‌বলয়—তার একটি কিরণ কখনও আমাদের ছুঁয়ে যায় সে-দুয়ার বন্ধ হতে না হতে! অন্তরে নিষ্ঠা এবং বীর্য থাকে যদি, তাহলে ওই বিদ্যুন্ময় ইশারাটুকুই অবিচল শ্রদ্ধায় আঁকড়ে ধরে আবার আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি চেতনার আরেক লোকে—ইন্দ্রিয়মানসের সীমা ছাড়িয়ে বোধির জ্যোতিরঙ্গনের দিকে।

একটুখানি তলিয়ে দেখলে বুঝি, বোধির কাছ থেকেই আমরা নিই চেতনার

প্রথম পাঠ—কেননা আমাদের সকল মানসব্যাপারের পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে বোধির লীলা। বোধিই মানুষের চেতনায় নিয়ে আসে অজানার গহন হতে বাণীর সেই বৈদ্যুতী, যা মহত্তর জ্ঞানের প্রেতি জাগায় তার প্রাণে। তারপর বুদ্ধি আসে খতিয়ে দেখতে—ওই আলোকপসরার কতটুকু সে পুরতে পারবে আপন ট্যাঁকে। আমাদের সকল জানার ও সকল পরিচয়ের পিছনে, এমন-কি তাদেরও ছাপিয়ে রয়েছে এক দুর্গম রহস্য। তার আকর্ষণে অবর-বুদ্ধি ও প্রাকৃত-অনুভবের উজান বেয়ে চিরকাল চলেছি আমরা নোঙর ছিঁড়ে। তার প্রেতিতে অরূপের অনুভবকে মনের গোচর করতে চেয়েছি অকল্পিতের রূপায়ণে—ঈশ্বর অমৃত বা বৈকুণ্ঠের বাস্তব সংজ্ঞায় দিতে চেয়েছি সংজ্ঞাতীতের পরিচয়। বোধি ওই রহস্যের মায়াই ঘনিয়ে তোলে আমাদের মধ্যে। এই রহস্যবোধের সঙ্গে বুদ্ধির যে-বিরোধ, প্রাকৃত-অনুভবের যে-বৈষম্য, বোধি তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না—কেননা বোধি মহাপ্রকৃতির মর্ম হতে উৎসারিত বলে মহাপ্রকৃতিরই মত দুর্দমনীয় তার সংবেগ। বোধি সৎস্বরূপ, তাই সতের স্বরূপ সে জানে। স্বয়ং সম্ভূত এবং সৎ হতে উদ্ভূত বলেই, যা সতের শুধু বিভূতি এবং প্রতিভাস, তার শাসন মেনে চলতে সে পারে না। বোধি কেবল নির্বিশেষ সত্তার খবর দেয় না আমাদের, দেয় সদ্‌রূপেরও খবর। কারণ, এই আধারেই রয়েছে যে-বিন্দুজ্যোতির অধিষ্ঠান, আত্মসংবিতের সেই ক্বচিৎ-উন্মীলিত জ্যোতিঃপথের উৎস হতেই বোধির যাত্রা শুরু। তাই তার সামান্য-অনুভবের মধ্যেও থাকে বিশেষের ঘনীভূত প্রত্যয়। বোধির এই পশ্যন্তী বাণীকে প্রাচীন বেদান্তীরা প্রকাশ করেছিলেন উপনিষদের তিনটি মহাবাক্যে—'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এবং 'সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

কিন্তু মানুষের চেতনায় বোধি সাধারণত কাজ করে যবনিকার আড়াল হতে—আধারের অপ্রবুদ্ধ অনভিব্যক্ত অংশে। সেখানে জাগ্রতভূমির অপরিসর আলোকে যেসব সম্মূঢ় বৃত্তি তার বাহন হয়, তারা তার ব্যঞ্জনাকে পুরোপুরি ধরতে পারে না বলে বোধির সত্য ফুটতে পায় না সুসমঞ্জস ও সুব্যাকৃত রূপ নিয়ে। অথচ রূপের স্পষ্টতার দিকে আমাদের স্বভাবের ঝোঁক। আধারে অপরোক্ষ জ্ঞানবৃত্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে, বোধিকে বহিশ্চেতনার সদর-মহলে আসর জমিয়ে সেইখানে তার নায়কের আসনটি পাকা করে নিতে হয়। কিন্তু বহিশ্চেতনার আসর এখন বোধির নয়—বুদ্ধির দখলে। সে-ই আমাদের প্রত্যয় ভাবনা ও কর্মের নিয়ন্তা। তাই দেখি, প্রাচীন ঔপনিষদিক ঋষিদের বোধির যুগ পার হয়ে ক্রমে এল বুদ্ধির যুগ—শ্রুতির দিব্য ভাবাবেশের জায়গা জুড়ল দার্শনিকের তত্ত্ববিচার। অবশেষে তাকেও বেদখল করল বৈজ্ঞানিকের বস্তুসমীক্ষা। বোধির ভাবনা অতিচেতনার বার্তাবহ, তাই সে আমাদের চরম

জ্ঞানবৃত্তি। তার জায়গায় এল যে শুদ্ধবুদ্ধি, বোধির সে প্রতিভূ শুধু—বলতে গেলে আধারের অন্তরিক্ষলোকেই তার আনাগোনা। তারপর ব্যামিশ্র-বুদ্ধির অধিকার চলল কিছুদিন; আমাদের প্রাকৃতচেতনার নিম্নভূমির অধিবাসী সে। খুব উঁচুতে সে উঠতে পারে না। জড়ীয় ইন্দ্রিয়মনের প্রসার যতটুকু অথবা যন্ত্রযোগে যতখানি বাড়ানো যেতে পারে তাদের সীমানা, ততদূরই তার দৃষ্টি চলে—তার বেশী নয়। মনে হয়, এমনি করে জ্ঞানের অবরোহক্রমে আমরা ক্রমেই নেমে আসছি যেন। কিন্তু বস্তুত একে বলতে পারি প্রগতির একটা পরিক্রমা। কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবরবৃত্তিকে ঊর্ধ্ববৃত্তির দান যথাসম্ভব আত্মসাৎ করেই আধারে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সে-বিত্তকে—নিজের সাধন দিয়ে নিজস্ব ধরনে। কিন্তু এই প্রয়াসে অবরবৃত্তিরই অধিকার প্রসারিত হয় এবং অবশেষে ঊর্ধ্ববৃত্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ঔদার্য ও সহজ ছন্দ আপনাহতে ফুটে ওঠে তার মধ্যে। এমনি করে মানুষের বৃত্তিগুলি বোধি হতে শুদ্ধবুদ্ধি, আবার শুদ্ধবুদ্ধি হতে ব্যবহার—এই ক্রম ধরে প্রাক্তন ভাবকে আত্মসাৎ করে আপন খুশিতে পুষ্ট না হত যদি, তাহলে তার প্রকৃতির মধ্যে ঘটত সামঞ্জস্যের অভাব। হয়তো তার একটা দিক উগ্রভাবে প্রবল হয়ে অন্য দিককে দাবিয়ে রাখত অযথা শাসনের পীড়নে, অথবা পরস্পর বিযুক্ত থাকায় কোনও দিকই ফুটতে পেত না সমৃদ্ধ শ্রী নিয়ে। কিন্তু চেতনার প্রগতিতে ক্রম এবং স্বাতন্ত্র্য আছে বলে আধারে একটা সমতা দেখা দিয়েছে—জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন বিভাবের মাঝে একটা পূর্ণতর সৌষম্যের জেগেছে সূচনা।

প্রাচীন উপনিষদে এবং পরের যুগে দার্শনিক চিন্তার অভিব্যক্তিতেও এই ক্রমই আমাদের চোখে পড়ে। বোধির দীপ্তি এবং অধ্যাত্ম-অনুভব একমাত্র প্রমাণ ছিল বৈদিক এবং ঔপনিষদিক ঋষিদের কাছে। উপনিষদের যুগেও যে-বিচারপরিষদের কথা তোলেন আধুনিক পণ্ডিতেরা সময়-সময়, সে তাঁদের বোঝবার ভুল শুধু। উপনিষদে বাদানুবাদের প্রসঙ্গ আছে যেখানে, সেখানেও বিচার বিতর্ক বা ন্যায়ের সহায়ে সত্যনিরূপণের কোনও প্রয়াস নাই। শুধু বিভিন্ন ঋষির বোধি বা অনুভবের তুলনা আছে সেখানে। তার মধ্যে খণ্ডনের কোনও প্রচেষ্টা নাই—কেবল আছে জ্যোতি হতে উত্তরজ্যোতিতে উদয়ন, বোধির সংকীর্ণ ক্ষুদ্র বা গৌণ প্রত্যয় হতে উদারতর পূর্ণতর সারবত্তর প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হবার বিবরণ। একজন ঋষি প্রশ্ন করছেন আর একজনকে, 'তুমি কী জান?' বলছেন না 'তুমি কী ভাব?' বা 'যুক্তির ধারা ধরে কোন্ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছ তুমি?' উপনিষদের কোথাও বেদান্তের সত্যকে প্রমাণ করতে যুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়নি। বোধির ন্যূনতাকে পূরণ করতে হবে বোধিরই উৎকর্ষ-সাধনায়, তর্কবুদ্ধির হাকিমি অচল সেখানে—মনে হয় এই ছিল প্রাচীন ঋষিদের মত। . . . .

কিন্তু মানুষী বুদ্ধি বুঝতে চায় নিজের ধরনে, নইলে তার তৃপ্তি হয় না। তাই বোধির পরে যখন দেখা দিল 'বৌদ্ধ' জল্পনার যুগ, তখন এদেশের দার্শনিকেরা অতীত ভাবসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই সত্যের এষণায় করলেন একটা দ্বৈত-ধারার প্রবর্তন। শ্রুতি বা বোধিজাত প্রত্যয়ের নাম দিলেন তাঁরা আগম বা আপ্তবচন এবং তার প্রামাণ্যকে ঠাঁই দিলেন অনুমানেরও উপরে। এদিকে বুদ্ধির দাবিকেও অগ্রাহ্য করলেন না তাঁরা। কিন্তু বুদ্ধির অনুমিত তত্ত্বে শ্রুতি বা আগমের অনুকূল যা, শুধু তার প্রামাণ্যকে মেনে নিয়ে আর-সমস্তই প্রত্যাখ্যান করলেন নিষ্প্রমাণ বলে। এমনি করে তর্ক-সমীক্ষার যা প্রধান গলদ—অর্থাৎ শুধু শব্দজালকেই সার-সত্য ভেবে হাওয়ায়-হাওয়ায় লড়াই করা—তার জুলুম থেকে তাঁরা খানিকটা রেহাই পেলেন। বস্তুত 'বাগ্ বৈখরী শব্দ-ঝরী' দিয়ে তত্ত্ব-সমীক্ষা চলে না কখনও—কেননা শব্দ শুধু ভাবের বাহ্য প্রতীক বলে বারবার খুঁটিয়ে দেখতে হয় তার প্রয়োগকে, পদে-পদে ফিরিয়ে আনতে হয় তাকে পরিশুদ্ধ অর্থব্যঞ্জনার ভূমিতে। দার্শনিকদের বাদ আবর্তিত হত প্রথমত চরম সত্যের অপরোক্ষ অনুভবকে কেন্দ্র করে—বোধির প্রামাণ্যের সঙ্গে বুদ্ধির প্রামাণ্যের জুড়ি মিলিয়ে। কিন্তু বুদ্ধিতে যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তথাকথিত স্বারাজ্যপ্রতিষ্ঠার দিকে, ক্রমে সে-ই হল সর্বজয়া—অবশ্য বোধির আনুগত্যের বাহানাটুকু বজায় রেখেই। এমনি করে শ্রুতিকে প্রমাণ মেনেই দেখা দিল দার্শনিকদের সম্প্রদায়ভেদ। পরস্পরকে খন্ডন করতে শ্রুতিবাক্যকেই তাঁরা ব্যবহার করলেন অস্ত্ররূপে। বোধির সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ স্পষ্ট হয়েছে এইখানেই। বোধির আছে উদার সম্যক-দৃষ্টি—সব-কিছুকে সে দেখে সমগ্রের মধ্যে, কাজেই খুঁটিনাটিও তার কাছে অখন্ড-বৃহতেরই ছটা যেন। অতএব তার স্বাভাবিক ঝোঁক সমন্বয়ের এবং একবিজ্ঞানের দিকে। বুদ্ধি কিন্তু বিভজ্যবাদী। সে চলে বিশ্লেষণের দিকে—অনেক তথ্য জোড়া দিয়ে সমগ্রের ধারণা তার। স্বভাবতই সে-জোড়া-তাড়ার মধ্যে থাকে অনেক বিরোধ, অনেক বৈষম্য, অন্যোন্যবিরোধী অনেক যুক্তি। আবার বুদ্ধির ধর্ম হচ্ছে তর্কের নিখুঁত ছাঁচে একটা দর্শনকে ঢালাই করা। কাজেই পরস্পরবিরোধী বহুতথ্যের মধ্যে কাটছাঁট করে তার মতুয়ার সিদ্ধান্তের অনুকূল যা, তাকেই সে রাখে বাঁচিয়ে। এমনি করে প্রাচীন ঋষিদের সম্বোধির অখন্ডতা ক্রমে যখন টুকরা হয়ে ভেঙে পড়ল বুদ্ধির অভিঘাতে, তখন তার্কিকের কূট প্রতিভা আবিষ্কার করল ব্যাখ্যার নানা চাতুরী ও মীমাংসা-পরিভাষার জাল, প্রস্থানভেদের বিচিত্র তারতম্য—যা দিয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের মুশ্কিল আসান করে তত্ত্ববিদ্যার জল্পনাকে দেওয়া চলে স্বচ্ছন্দবিহারের অবাধ অধিকার।

তবু প্রাচীন বেদান্তের মূল ভাবগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে রইল বিভিন্ন

দর্শনে এবং মাঝে-মাঝে তাদের সমন্বয়-সাধনার প্রয়াসও চলতে লাগল অখণ্ড-বোধির উদার ভূমিকায়। তাই দর্শনের নানা প্রস্থানের পটভূমিতে জেগে রইলেন উপনিষদের পুরুষ আত্মা বা সদ্‌ব্রহ্ম। বুদ্ধি তাঁকে একটা ভাব বা চিত্তভূমিতে পর্যবসিত করতে চাইলেও তাঁর অনির্বচনীয়তার কিছু আভাস আজও বেঁচে আছে নানা দর্শনে প্রাচীন ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে। সম্ভূতির যে-পরিস্পন্দকে আমরা বলি জগৎ, তার সঙ্গে নির্বিশেষ অখণ্ড-সত্তার কি সম্বন্ধ; জীবের অহং সে-পরিস্পন্দের কার্য বা কারণ যা-ই হ'ক—কি করে আবার সে ফিরে যেতে পারে বেদান্ত-প্রতিপাদিত আত্মস্বরূপে ব্রহ্মভাবে বা অধিষ্ঠানতত্ত্বে—এই নিয়ে নানা জল্পনা ও সাধনার ভাবনাই ভারতবর্ষের চিত্তকে অধিকার করে আছে চিরকাল।

নবম অধ্যায়

সদ্ ব্রহ্ম

সদেব..........একমেবাদ্বিতীয়ম্

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।১

এক অদ্বিতীয়—সৎ স্বরূপ।

—ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬।২।১)

অহংসর্বস্ব ভাবনার সঙ্কীর্ণ-চঞ্চল লুব্ধতা হতে দৃষ্টিকে নির্মুক্ত করে সত্যসন্ধানীর অবিক্ষুব্ধ পক্ষপাতহীন জিজ্ঞাসা নিয়ে জগতের দিকে তাকাই যদি, তাহলে প্রথমেই অনুভব করি—এক মহাশক্তির অমেয় বীর্য, অনন্তসত্তার বৈপুল্য নিয়ে অন্তহীন স্পন্দনে অফুরন্ত প্রবৃত্তির উল্লাসে আপনাকে উৎসারিত করে চলেছে সীমাহীন দেশে, শাশ্বতকালের অবিরাম প্রবাহে। অপ্রমেয় অপ্রতর্ক্য তার সত্তা 'অয়মস্মি'র অকল্পনীয় লোকোত্তরভাবনায় অনন্তগুণে ছাড়িয়ে গেছে—শুধু আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই নয়—বিশ্বের যে-কোনও বৃহৎ অহং অথবা অহং-সমষ্টিকে। তার মানদণ্ডে কোটিকল্পব্যাপী বিসৃষ্টির বিপুল ঐশ্বর্য ক্ষণেকের ধুলাখেলা মাত্র, অনন্ত পরার্ধের অগণনীয় অঙ্কপাত করামলকের মতই নগণ্য তার কাছে। অথচ সহজপ্রত্যয়ের মূঢ়তা নিয়ে এমনি অসঙ্কোচে আমরা জীবনকল্পনার বিচিত্র মায়া বুনে চলেছি, যেন এই বিপুল বিশ্বস্পন্দন আমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে আমারই ইষ্টানিষ্টের দায় নিয়ে, আমারই মুখ চেয়ে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা-উচ্ছ্বাস, ভাবনা-কল্পনা একান্তভাবে আমাদেরই জীবন-রসায়ন যেমন, তেমনি তার চরিতার্থতাসাধনই যেন এই বিশ্বশক্তিরও একমাত্র কর্তব্য !...কিন্তু মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে এর দিকে তাকাই যখন, তখন দেখি এ-শক্তির বিলাস আত্মনেপদী—পরস্মৈপদী তো নয়। এর আছে একটা স্বকীয় বিপুল লক্ষ্য, সীমাহীন বিচিত্র-ভাবনার জটিল জাল, আত্মসম্পূর্তির অপরিমেয় আকূতি এবং উল্লাস, অভাবনীয় কল্পনার অমিত বৈপুল্য যা স্নিগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের আদর্শ-জল্পনার তুচ্ছতার দিকে।...কিন্তু শক্তির এই অপ্রমেয়তায় বিমূঢ় হয়ে, অহমিকার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজেদের অকিঞ্চিৎকরতাকেই বড় করে দেখলে চলবে না। কেননা মহাশক্তির স্বয়ম্ভূলীলার প্রতি অন্ধতাও যেমন অবিদ্যা, তেমনি জীবভাবের দৈন্যকে একান্ত করে তোলাও আরেকধরনের অবিদ্যা এবং তাতে বিশ্বব্যাপারের সত্যপরিচয়ে থেকে যায় অনেকখানি ফাঁক।

বিশ্বব্যাপী এই-যে সীমাহীন শক্তিস্পন্দ, সে তো আমাদের মনে করে না তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয়। মহৎ কীর্তিতে যতখানি উল্লাস তার, ততখানি অভিনিবেশ তার ক্ষুদ্রতম কর্মে—তেমনি সবদিক খুঁটিয়ে দেখা, শিল্পনৈপুণ্যের চরম প্রকাশ ঘটানো তারও মধ্যে : এ তো আমাদের বিজ্ঞানের রায়। মহাশক্তি বাস্তবিক মায়েরই মত সমদর্শন, পক্ষপাতশূন্য—গীতার ভাষায় 'সমং ব্রহ্ম' তিনি। একটা ব্রহ্মাণ্ডের আয়োজন ও বিধারণে যতখানি ফোটে তাঁর স্পন্দনের সংবেগ ও তীব্রতা, ঠিক ততখানি ফোটে একটা বল্মীকস্তূপেরও জীবননিয়ন্ত্রণে। আয়তন বা পরিমাণের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে মনে করি আমরা—ওটা বড়, এটি ছোট। কিন্তু তারতম্যের বিচারে, পরিমাণের বাহুল্যকে ছেড়ে যদি মানদণ্ড করি গুণের সংবেগকে, তাহলে বলব একটা বিশাল সৌরজগতের চেয়েও বড় তার দীনতম অধিবাসী একটা পিপীলিকা এবং মানুষ ক্ষুদ্রায়তন হয়েও ছাড়িয়ে গেছে সমগ্র জড়প্রকৃতির অপরিমেয় বৈপুল্যকে। কিন্তু এও আবার গুণলীলার মায়া। বাস্তবিক পরিমাণ বা গুণ কোনটা দিয়েই শক্তির তত্ত্ব পাওয়া যায় না, কেননা উভয়ে তারা শক্তিস্পন্দেরই বিভূতি মাত্র। তাদের অন্তর্গূঢ় শক্তির তীব্রসংবেগ দিয়ে বিচার করি যদি, তাহলে দেখি জগতের সর্বত্র সমভাবে নিবিষ্ট এই মহদ্-ব্রহ্ম। সবার যখন সমান ঠাঁই তাঁর সত্তায়, তখন কি বলা চলে না, তাঁর শক্তিও সমবিভক্ত সবার মধ্যে ?...কিন্তু এই সমবিভজনের কল্পনাও পরিমাণ-প্রত্যয়েরই মায়া। বস্তুত ব্রহ্ম অখণ্ডস্বরূপে সবার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হলেও আমরা তাঁকে খণ্ডিত দেখি—'বিভক্তম্ ইব'। বুদ্ধির সংস্কার হতে দর্শনকে নির্মুক্ত করে যদি তাকে বোধি দ্বারা জারিত এবং তাদাত্ম্যসংবিৎ দ্বারা ভাবিত করতে পারি, তাহলে দেখব, আমাদের মনোময়ী চেতনা হতে স্বতন্ত্র এই অনন্ত শক্তির চেতনা। নিরংশ হয়েও অংশের মধ্যে এ-শক্তি সমাবিষ্ট হয় যখন, তখন নিজেকে সে সমবিভক্ত করে না, কিন্তু অখণ্ডবীর্যে নিজের সমগ্র সত্তাকে যুগপৎ আবিষ্ট করে—যেমন সৌরজগতে, তেমনি একটা বল্মীকস্তূপে। ব্রহ্মের কাছে অংশ-নিরংশের কোনও ভেদ নাই। প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময়, ব্রহ্মস্বরূপ—অখণ্ড ব্রহ্মসদ্ভাব দ্বারা আবিষ্ট, প্রেষিত। ভেদ থাকতে পারে পরিমাণে এবং গুণে, কিন্তু আত্মস্বরূপ সর্বত্র এক। বিশ্বক্রিয়ার প্রকৃতি পদ্ধতি ও পরিণামে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, অথচ সবার মূলে আছে এক অনাদি শাশ্বত অন্তহীন শক্তির সমাবেশ। শক্তির যে-সংবেগ বল হয়ে ফুটেছে সবলের মধ্যে, সেই সংবেগই অক্ষুণ্ন সামর্থ্যে আত্মপ্রকাশ করছে দুর্বলের দুর্বলতায়। প্রকাশে স্ফুরিত হয় শক্তির যতখানি বীর্য, ততখানি স্ফুরিত হয় নিরোধেও। এমনি করে ইতির উচ্ছ্বাসে অথবা নেতির শূন্যতায়, বাণীর মুখরতায় অথবা নৈঃশব্দ্যের স্তব্ধতায় ফুটছে একই শক্তির অখণ্ডবিভূতি।

অতএব আমাদের প্রথম কর্তব্য : এই-যে অন্তহীন শক্তিস্পন্দন, সত্তার

এই-যে অমিতবীর্য রূপায়িত হয়েছে বিশ্ব-রূপে, তার সঙ্গে হিসাবের গোলটুকু চুকিয়ে ফেলা। আমাদের চলতি হিসাবে গলদ অনেক। সর্বময়ের সর্বস্ব আমরা, অথচ তাঁর মূল্য কানাকড়িও নয় আমাদের কাছে—যদিও নিজেকে জানি সবার চেয়ে বড় বলেই। এইখানে পাই সেই মূলা অবিদ্যার আভাস, যে আমাদের অহঙ্কারের প্রসূতি। এই অবিদ্যার প্ররোচনাতেই ব্যষ্টি-অহংএর ক্ষুদ্রবিন্দু নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলে মহাসিন্ধুর বিকল্পনায়। অথচ নিজের সীমার বাইরে ততটুকুই সে গ্রহণ করতে পারে যতটুকুর সঙ্গে আছে তার মনের সায়, অথবা পরিবেশের ধাক্কায় যাকে না মেনে তার নিষ্কৃতি নাই। ব্যষ্টি-অহং দার্শনিক সাজে যখন, তখনও তার দম্ভ যায় না। তখনও জোরগলাতেই সে প্রচার করে : বিশ্বের সত্তা তারই চেতনায়, তার চিত্তকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত বিশ্বের চক্র; বিশ্বের সকল তত্ত্বের যাচাই হবে তারই চেতনার মাপকাঠিতে, তারই মনঃকল্পিত আদর্শের মানদণ্ডে; সে-গণ্ডির বাইরে যা-কিছু, সেসমস্তই মিথ্যা কিংবা অলীক।......এই মনঃসর্বস্বতার জন্যই বিশ্বের সঙ্গে কোনকালে মানুষের হিসাব মেলে না এবং তাইতে জীবনসম্পদের পুরাপুরি ভাগও পায় না সে কোনদিন। প্রাকৃত মন ও অহংএর এই বেয়াড়া দাবির মূলে অবশ্যই একটা সত্যের সমর্থন আছে। কিন্তু সে-সত্যের স্বরূপ তখনই স্পষ্ট হয়, যখন মন তার জ্ঞানের সীমা জানতে পারে এবং সমর্পণের মাধুরীতে অহং তার বিবিক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠার সকল গুমর হারিয়ে ফেলে। যখন বুঝতে পারি : বিশ্বপরিণামের যে-ছন্দোলীলাকে জীবন বলি, সে ওই অনন্ত স্পন্দনেরই একটা বীচিভঙ্গ; জানতে হবে সেই অনন্তকেই, জাগ্রত চিত্ত নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট হতে হবে তারই মধ্যে, একান্ত নিষ্ঠায় তারই সম্ভূতিকে সার্থক করতে হবে এই আধারে—তখন হতে আমাদের সত্য করে বাঁচার শুরু। একদিকের হিসাব হল এই। আরেক দিকে আবার জানতে হবে : নিখিল শক্তিস্পন্দের সঙ্গে অবিনাভূত আমরা আত্মস্বরূপের পরিপূর্ণ মহিমায়, তার অধীন অথবা গুণীভূত নই কোনমতেই; আমাদের জীবনে ও কর্মে, ভাবে ও ভাবনায় সে-শক্তির যে বিচিত্র লীলা, তা দিব্য-জীবনেরই পরমা সিদ্ধির অপরিহার্য সাধন।

কিন্তু এই অনন্ত সর্বশক্তিময়ী সমষ্টিভূত মহাশক্তির স্বরূপ না জানলে গরমিল থেকেই যাবে আমাদের হিসাবে। এইখানে এক ফ্যাসাদ বাধে নতুন করে। শুদ্ধবুদ্ধি বলে, এবং মনে হয় বেদান্তও যেন সায় দেয় তাতে যে, আমরা যেমন মহাশক্তির একটা পরতন্ত্র বিভূতি, তেমনি মহাশক্তিও দেশ-কালের অতীত অক্ষয় অব্যয় নির্বিকার এক বিবিক্ত স্থাণুস্বরূপের অবর-বিভূতি। সে-স্থাণু শক্তিক্রিয়ার অধিষ্ঠান হয়েও নিষ্ক্রিয়, কেননা তিনি শক্তি-স্বরূপ নন, শুদ্ধ সৎ-স্বরূপ। বিশ্বে শক্তিরই লীলা দেখে যারা, সদ্‌ব্রহ্মের সত্তা তারা অস্বীকার করতেও পারে। হয়তো তারা বলবে : আমরা অখণ্ড অপ্রমেয়

কূটস্থসত্তার শাশ্বত স্থাণুত্ব ভাবি যাকে, আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির সে একটা বিকল্প, ব্যাবহারিক স্থাণুত্বের বিভ্রম হতে উদ্ভব তার; বস্তুত কিছুই স্থির নয় জগতে, সমস্তই নিয়ত স্পন্দমান; এই স্পন্দবৃত্তিতেই মনশ্চেতনা স্থাণুত্বের আরোপ করে, কেননা এ-বিকল্পটুকু না হলে শক্তিস্পন্দ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে একটা নিশ্চল ভিত্তির অভাবে। শক্তিস্পন্দের মধ্যেই যে দেখা দেয় এইধরনের স্থাণুত্ব-বিভ্রম, তাও প্রমাণ করা কঠিন নয়। বাস্তবিক জগতে স্থাণু বলে কিছুই তো নাই। যাকে মনে করছি নিস্পন্দ, সেও স্পন্দনেরই ঘনবিগ্রহ। সেখানে শক্তির ক্রিয়াই রূপায়িত হচ্ছে এমনভাবে, যাতে আমাদেরই চেতনায় ফুটছে তার স্থাণুত্ব—যেমন পৃথিবীকে আমরা ভাবি স্থির, চলন্ত ট্রেন মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গাতে আর ছুটে পালাচ্ছে আশপাশের গাছ-পালারা।...তাহলে নিস্পন্দ নির্বিকার কোনও সত্তাই কি নাই স্পন্দনের অধিষ্ঠান ও আশ্রয়রূপে? সত্তা শুধু শক্তির বিক্ষেপ—এই কি তার ঐকান্তিক পরিচয়? না শক্তিই সত্তার বিভূতি—এই কথাই সত্য?

স্পষ্টই বুঝতে পারি, শুদ্ধসত্তা বলে কিছু থাকে যদি, তাহলে শক্তির মত সেও হবে অনন্ত। সত্তা বা শক্তি, কারও যে ইতি থাকতে পারে কোথাও, একথা যুক্তি কল্পনা বোধি বা অনুভব কিছু দিয়েই প্রমাণ করতে পারি না আমরা। আদি বা অন্তের কল্পনা যেখানে, সেখানেই ব্যতিরেকমুখে আসে অনাদি-অনন্তের কল্পনা। বস্তুত আদি ও অন্ত এই দুটি বিন্দু দিয়ে প্রাকৃত মন একটা সীমা রচে মাত্র অসীমের মধ্যে। তাই, কিছুই ছিল না এর আগে এবং এর পরে কিছুই থাকবে না—এমন উক্তি কেবল যে যুক্তিবিরুদ্ধ তা নয়, বস্তুস্বভাবের বিরুদ্ধ একটা উৎকট কল্পনাও। সান্তের প্রতিভাসকে 'আবৃত' করে অনন্ত বিরাজিত রয়েছে তার অনপলাপ্য স্বায়ম্ভুব মহিমায়—এই হল সত্য।

কিন্তু এ-আনন্ত্যও দেশ ও কালের আনন্ত্য শুধু—তাই সীমাহীন পরিব্যাপ্তিতে, শাশ্বত প্রবহমানতায় তার প্রকাশ। তাকেও ছাড়িয়ে যায় শুদ্ধ-বুদ্ধি। দেশ ও কালের মর্মসত্যকে বর্ণরতিহীন জ্যোতিঃসম্পাতে উদ্ভাসিত করে সে বলে, দেশ-কাল আমাদেরই চেতনার বিভাব মাত্র, এই দিয়েই প্রাতিভাসিক অনুভবকে আমরা করি শৃঙ্খলিত। স্বরূপসত্তার অপরোক্ষদর্শনে দেশ বা কালের কোনও চিহ্নই থাকে না। ব্যাপ্তিবোধ যদিই-বা থাকে সেখানে, তবু সে-ব্যাপ্তি দেশের নয়, মনের। তেমনি প্রবাহবোধ থাকলেও তা মনেরই প্রবাহমানতা, কালের নয়। কাজেই বোঝা যায়, তখনকার ব্যাপ্তি ও প্রবাহ-বোধ, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন একটা-কিছুর প্রতীক মাত্র মনের কাছে। বস্তুত তা আনন্ত্যের অপরোক্ষ ব্যঞ্জনা, যার মধ্যে আমরা পাই একটি ক্ষণের অণুতে নিত্য-নবায়মান সর্বাধার কালবৃত্তির সংহতি, একটি দেশের বিন্দুতে সর্বতোব্যাপ্ত

সর্বাধার সংস্থিতির ঘনীভূত প্রত্যয়।...বিরুদ্ধ সংজ্ঞার এমন উৎকট সমাবেশেই অনির্বচনীয় অপরোক্ষানুভবের বিবৃতি নিখুঁত হয়। এতেই বুঝি, সে-অনুভবে অভ্যস্ত সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে মন এবং বাণী উত্তীর্ণ হয় এক পরমতত্ত্বে। তাদের কল্পিত সকল বিরোধের নিরূঢ় প্রত্যয় সেখানে পর্যবসিত হয় এক অনির্বচনীয় তাদাত্ম্যসংবিতে, যাকে প্রকাশ করবার জন্যই তাদের এই পঙ্গু প্রচেষ্টা।

সংশয়ী প্রশ্ন করবে তবু, অপরোক্ষ অনুভবের এ-পরিচয় সত্য কি ? এমনও কি হতে পারে না, শুদ্ধসত্তার ভাবনা বুদ্ধির একটা বিকল্পমাত্র। আমরা কেবল ভাষার চাতুরীতে গড়ে তুলি একটা অবাস্তব শূন্যতার আভাস। তারপর একাগ্রচিত্তের ভাবনায় তাকে সত্য করতে গিয়ে মনে হয়, মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল দেশ আর কাল !...কিন্তু প্রত্যক্-দৃষ্টিতে আবার সেই স্বরূপসত্তার দিকে তাকিয়ে বলি, না, এ সংশয় অমূলক। কিছু আছে প্রতিভাসের অন্তরালে—সে শুধু অনন্ত নয়, অনির্দেশ্য। প্রতিভাসের ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কোনও বিভাবকেই স্ব-তন্ত্র সত্তায় সত্তাবান বলতে পারি না। অনাদি অন্বয় সর্বগত অসামান্য শক্তিরূপেও সমস্ত প্রতিভাসকে পর্যবসিত করি যদি, তবুও তাকে পাই একটা অনির্দেশ্য প্রতিভাসেরই আকারে। গতি বা স্পন্দের ভাবনায় স্থিতি বা বিরামের সম্ভাব্যতা অবিচ্ছেদে জড়িয়ে আছে। তাই স্পন্দকে এক নিস্পন্দ সত্তার স্বতঃপ্রবৃত্তি না ভেবে উপায় নাই। শক্তির প্রবৃত্তি আছে ভাবতে গেলেই ভাবতে হয় তার নিবৃত্তি-রূপ। সে-নিবৃত্তিরই পরাকাষ্ঠা হল স্বরূপসত্তার শুদ্ধ ও সহজ প্রত্যয়। আমাদের খোলা আছে দুটি পথ : বিশ্বের অধিষ্ঠানকে কল্পনা করতে পারি—হয় অনির্দেশ্য শুদ্ধসত্তারূপে, নয়তো অনির্দেশ্য প্রবর্তিকা শক্তিরূপে। শেষের দর্শনই সত্য হয় যদি, অর্থাৎ শক্তির যদি কোনও স্থাণু নিমিত্ত বা অধিষ্ঠান না থাকে, তাহলে শক্তি হবে প্রবৃত্তি বা স্পন্দেরই পরিণাম ও প্রতিভাস—কেননা স্পন্দ ছাড়া আর-কিছুরই বাস্তবতা আমরা স্বীকার করিনি। তখন বিশ্বও হবে নিরাধার স্পন্দমাত্র—তার অধিষ্ঠানরূপে কোনও স্বরূপসত্তার কল্পনা নিরর্থক হবে। এই হল বৌদ্ধের শূন্যবাদ, যার মতে সত্তা শাশ্বত প্রতিভাসের একটা বিভূতি—'যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকম্।'...কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বলে, এ-দর্শনে তৃপ্তি হয় না আমার, কেননা এ আমার মৌল অনুভবের বিরোধী, অতএব মিথ্যা। ধাপে-ধাপে এতক্ষণ চলেছিলাম উপরপানে, এইখানটায় হঠাৎ যেন ধাপ ফুরিয়ে গেছে। তাই সমস্ত সিঁড়িটাই নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে—মহাশূন্যে !

অনির্দেশ্য অনন্ত দেশ ও কালের অতীত শুদ্ধ-সৎ বলে কিছু থাকলে তার স্বরূপ হবে নির্বিশেষ—কেননা পরিমাণ বা পরিমাণ-সমবায় দিয়ে তার ইয়ত্তানিরূপণ হবে না, তাকে গড়ে তোলা যাবে না গুণ বা গুণ-সমবায় দিয়ে।

নিখিল রূপের সমাহার বা তাদের আধারভূত রূপধাতুও বলা চলে না তাকে। বিশ্বের রূপ গুণ পরিমাণ—সব-কিছুর তিরোধানেও শুদ্ধ-সতের বিলোপ ঘটবে না। অমেয় নির্গুণ অরূপসত্তার ধারণা শুধু সম্ভব যে তা নয়—প্রতিভাসের আধাররূপে জেগে আছে এই নির্বিশেষ সত্তারই প্রত্যয়। তার রূপ গুণ বা পরিমাণ নাই এই অর্থেই যে, তাদের অতি-ষ্ঠা সে; অর্থাৎ আমাদের দেওয়া রূপ গুণ বা পরিমাণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে তারা তার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে। অথচ এই শুদ্ধ-সৎই আবার প্রতি-ষ্ঠা তাদের; অর্থাৎ তারই স্পন্দ-শক্তিতে বিসৃষ্ট হয় তারা রূপ গুণ ও পরিমাণের বৈচিত্র্যে। আবার এমনও বলা চলে না যে নিখিলের আধাররূপে আছে এক রূপ, এক গুণ ও এক পরিমাণ—তারই মধ্যে তারা পর্যবসিত হয় চরমপ্রত্যয়ে; কেননা এ-কল্পনারও কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। বস্তুত তাদের পর্যবসান ঘটে এমন একটা-কিছুতে যার বেলায় এসব সংজ্ঞা একেবারে অচল। অতএব বিশ্ব-স্পন্দের যা-কিছু নিমিত্ত বা প্রতিভাস, চরমে তা লীন হয় স্বকারণভূত তৎ-স্বরূপেই। সে-প্রলয়-দশাতেও অব্যক্তসত্তায় সত্তাবান তারা, কিন্তু তাদের অনির্বচনীয় রূপান্তরকে আর স্পন্দকালীন সংজ্ঞা দিয়ে পরিচিত করা যায় না তখন। এইজন্যই আমরা বলি, শুদ্ধসৎ নির্বিশেষ, তার স্বরূপ অচিন্ত্য, অবিজ্ঞেয়: অথচ নিখিল জ্ঞান-বৃত্তির অতীত পরমতাদাত্ম্যের অপরোক্ষ অনুভবে আমরা সমাহিত হতে পারি তার মধ্যে। যা নির্বিশেষ, তা নিস্পন্দ বা স্পন্দাতীত। অতএব স্পন্দ দেখা দেবে সবিশেষের বিসৃষ্টিতে। কিন্তু সবিশেষ বললেই বুঝতে হবে তার আধার আধেয় এবং স্বরূপ সমস্তই নির্বিশেষ। অতএব স্পন্দজগতের সকল বস্তুই তত্ত্বত তৎ-স্বরূপ। নির্বিশেষ ও সবিশেষের মধ্যে যে ভেদাভেদের সম্পর্ক, বেদান্ত আকাশকে করেন তার দৃষ্টান্ত : আকাশ সর্বভূতের আধার আধেয় এবং স্বরূপ; অথচ এতই স্বতন্ত্র তার প্রকৃতি যে, আকাশে লীন হলে তাদের প্রাতিভাসিক সকল বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়, যদিও তাদের সত্তার বিলোপ ঘটে না তাতে।

কোনও-কিছুর স্বকারণে লয় হবার কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতই আমরা কালাবচ্ছিন্ন চেতনার পরিভাষা ব্যবহার করি, সুতরাং তার বিভ্রম সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নির্বিকার পরমার্থসৎ হতে স্পন্দের উন্মেষ একটা শাশ্বত বিভূতি। কিন্তু আমাদের প্রাকৃতবুদ্ধি তাকে দেখে নিত্যপরম্পরিত কালিকপ্রবাহে বিবর্তমান। তাই কালাতীতের শাশ্বতভাবে যে অভিনবায়মান অনাদ্যন্ত ক্ষণবিন্দুতেই নিবিষ্ট হতে পারে, অতএব স্পন্দবিভূতির কালিক-প্রত্যয়ও যে স্বরূপত তা-ই—এ-তত্ত্ব আমাদের ধারণায় আসে না। এইজন্যই বিশ্বলীলায় আমরা দেখি আদি মধ্য ও অবসানের অন্তহীন আবর্তন শুধু।

স্পন্দবাদী তবু বলতে পারেন : এসব উক্তির প্রামাণ্য ততক্ষণ, যতক্ষণ

আমরা শুদ্ধবুদ্ধির শাসন মেনে চলি। কিন্তু বুদ্ধির রায়কে মানতেই হবে, এমন-কোনও বাধ্য-বাধকতা আছে কি? যা সৎ, তা-ই দিয়ে হবে সত্তার পরিচয় —মনের কল্পনা দিয়ে নয়। দেখছি দুটিমাত্র বস্তু আছে—পরাক্-দৃষ্টিতে দৈশিক স্পন্দ আর প্রত্যক্-দৃষ্টিতে কালিক স্পন্দ। দেশ এবং কাল সত্য—সত্য তাদের ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ। দেশের ব্যাপ্তিকে হয়তো কখনও ছাড়িয়ে যেতে পারি। বলতে পারি, এ একটা মনের সংস্কার শুধু—কেননা অখণ্ডের সমগ্রতাকে একটা কল্পিত দেশে পরিকীর্ণ না করে শুদ্ধসত্তাকে ব্যাপারিত করা মনের সাধ্যাতীত। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন পরিণামের ধারাবাহী কালস্পন্দকে তো আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি না—কেননা কালস্পন্দই যে আমাদের চেতনার উপাদান। যেমন আমরা, তেমনি এই জগৎও একটা অবিরাম স্পন্দপ্রবাহ। তার বর্তমান উপচিত হয়ে উঠছে অতীত-পরম্পরার সমাহারে এবং সেই বর্তমানই আমাদের চেতনায় ভাসছে ভবিষ্য-পরম্পরার আদিবিন্দু হয়ে। অথচ সে-আদিবিন্দুও ক্ষণভঙ্গ মাত্র। কেননা, যাকে বলব বর্তমান, ফোটার আগেই ঝরে পড়েছে বলে সে তো অসৎ সুতরাং অনির্বচনীয়। অতএব বিশ্বে আছে শুধু অখণ্ড শাশ্বত কালবৃত্তির পরম্পরা। আর তারই প্রবাহে ভেসে চলেছে চেতনার এক নিত্যোপচিত অথচ অখণ্ড সংবেগ।* তাই কালিকপ্রবাহে স্পন্দ ও পরিবৃত্তির শাশ্বত পরম্পরাই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। সম্ভূতিই সৎস্বরূপ।

বস্তুত, শুদ্ধবুদ্ধির অলীক কল্পনা এমনি করে বাধিত হচ্ছে সত্তার অপরোক্ষ স্বরূপোপলব্ধির দ্বারা—স্পন্দবাদীর এ-দাবি অযৌক্তিক। এক্ষেত্রে বোধির প্রত্যয়দ্বারা বুদ্ধি সত্য-সত্যই বাধিত হত যদি, তাহলে অন্তর্দৃষ্টির নিরূঢ় অনুভবকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধির একটা বিকল্পকেই সত্য বলে নিঃসঙ্কোচে দাবি করা আমাদের উচিত হত না। কিন্তু বোধির সাফাইসাক্ষ্য এক্ষেত্রে টেকে না। নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যেই বোধির সাক্ষ্যে কোনও ভুল হয় না। কিন্তু সম্যক্-অনুভবের সমগ্রতাকে যখন সে দেখতে পায় না গণ্ডির মায়ায়, তখন তারও ভুল অনিবার্য। বোধি আমাদের সম্ভূতিরূপ দেখে যখন, তখন নিজেকে আমরা অনুভব করি কালবৃত্তির শাশ্বতপরম্পরার মধ্যে চেতনার একটা

---

* সমগ্রভাবে স্পন্দবৃত্তি একটা অখণ্ড প্রবাহ। কাল বা চেতনার একটি ক্ষণকে তার প্রাক্তন এবং পরতন ক্ষণ হতে আচ্ছিন্ন করেও দেখা যায়; তেমনি শক্তির পরম্পরিত প্রবৃত্তির এক-একটি বিভাগকে একটা নূতন ঝলক বা নূতন বিসৃষ্টিও বলা চলে। কিন্তু প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা তাতেই নিরাকৃত হয় না, কেননা অবিচ্ছেদপ্রবাহ না মানলে কালের ব্যাপ্তি থাকে না, চেতনার পূর্বাপর-সঙ্গতিও সিদ্ধ হয় না। একটা মানুষ যখন হেঁটে ছুটে বা লাফিয়ে চলে, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যে আলাদা, তাতে সন্দেহ নাই। তবু পদক্ষেপগুলির একজন অখণ্ড কর্তা নিশ্চয়ই আছে এবং তারই প্রয়োজনাতে চলনটি হয় একটি অবিচ্ছেদ প্রবাহ—একথাও অনস্বীকার্য।

অবিচ্ছিন্ন স্পন্দ ও পরিবৃত্তির প্রবাহরূপে। বৌদ্ধের ভাষায় আমরা তখন নদীর স্রোত বা দীপের শিখা। কিন্তু বোধির এই প্রাকৃত দর্শনেরও পরে আছে এক চরম ও পরম সম্বোধির অনুভব। সে-অনুভব যখন বহিশ্চেতনার মূঢ় যবনিকা সরিয়ে দেয়, তখন দেখি এই সম্ভূতি পরিবৃত্তি ও পরম্পরা আমাদের স্বরূপসত্তারই একটা পর্যায় মাত্র; অর্থাৎ আমাদের মধ্যেও এমন-কিছু আছে, যা সম্ভূতি হতে স্ব-তন্ত্র এবং নির্লিপ্ত। এই স্থাণু অচল সনাতনের প্রতিবোধই সম্মুগ্ধ দৃষ্টি হতে সম্ভূতির চঞ্চল ছায়া অপসারিত ক'রে ফুটিয়ে তোলে ধ্রুবজ্যোতির শাশ্বত আভাস। শুধু তা-ই নয়, সে-জ্যোতিতে সমাহিত হয়ে আমরা বাস করতে পারি তারই দিব্য পরিবেশে এবং তারই ছটায় আমূল রূপান্তরিত করতে পারি আমাদের জীবন ও দৃষ্টির ধারা—বিশ্বস্পন্দে সঞ্চারিত করতে পারি আমাদের নবলব্ধ প্রবর্তনার ছন্দ। স্থাণুত্বের মধ্যে এই নিত্য-স্থিতিকেই শুদ্ধবুদ্ধি আমাদের সামনে ধরেছিল নিজের ভাষায় তর্জমা করে। কিন্তু যুক্তিতর্কের কোনও সাহায্য না নিয়ে কিংবা পূর্বকল্পিত কোন ধারণার অধীন না হয়েও এ-ভূমিতে পৌঁছনো যায়। অনুভব করা যায়, এ-তত্ত্ব শুদ্ধ সন্মাত্র-স্বরূপ, শাশ্বত অনন্ত অনির্দেশ্য, কালকলনার দ্বারা অস্পৃষ্ট, দেশপরিব্যাপ্তির দ্বারা অনবিচ্ছিন্ন, অরূপ অমেয় নির্গুণ, আত্মভূত ও নির্বিশেষ।

অতএব সদ্‌ব্রহ্ম একটা বাস্তব তত্ত্ব—বিকল্প নয় শুধু। বরং সকল প্রতিভাসের অধিষ্ঠানতত্ত্ব সে-ই। কিন্তু এ-ও ভুললে চলবে না, শক্তিস্পন্দ বা সম্ভূতিও একটা বাস্তব তত্ত্ব। সম্বোধির চরম অনুভব তার মধ্যে আনতে পারে নূতন ব্যঞ্জনা, তাকে ছাড়িয়ে যেতে বা স্তব্ধ করতে পারে—কিন্তু তার আত্যন্তিক বিনাশ ঘটাতে পারে না। তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রতিভাসের মূলে আমরা পাই দুটি তত্ত্ব—একটি শুদ্ধসত্তা আর-একটি জগৎসত্তা, একটি সন্মাত্র আর-একটি সম্ভূতি। দুটির একটিকে উড়িয়ে দেওয়া কিছু কঠিন নয়। জিজ্ঞাসার সমাধান তাতে সহজ হয় নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, চেতনাকে মন্থন করে তার বৃত্তিসমূহের মূল্যনিরূপণ এবং তাদের অন্যোন্য-সম্বন্ধের আবিষ্কার। জ্ঞানযোগের সার্থকতা সেইখানেই।

মনে রাখতে হবে, একত্ব এবং বহুত্বের মত স্থাণুভাব ও স্পন্দবৃত্তিও অকল্পনীয় নির্বিশেষের কল্পপরিচয় শুধু। বস্তুত ব্রহ্ম একত্ব ও বহুত্বের অতীত যেমন, তেমনি তিনি স্পন্দ-নিস্পন্দেরও বাইরে। স্পন্দহীন একত্বে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা তাঁর এবং সেই নাভিকে ঘিরেই বহুধাবৈচিত্র্যের নিরন্ত স্পন্দনে তাঁর অনির্বচনীয় আবর্তনের অপ্রমত্ত লীলা। জগদ্‌ভাব যেন নটরাজের উদ্দন্ড আনন্দতাণ্ডব—তার প্রতি চরণক্ষেপে শিবতনুর অনন্ত প্রতিরূপ বিচ্ছুরিত দিগ্‌বিদিকে। কিন্তু তাঁর অমিতাভ শুভ্রসত্তার দীপ্তি তবুও অম্লান অচঞ্চল—

কালত্রয়ে নির্বিকল্প নির্বিকার। আপ্তকামের কামনা চরিতার্থ শুধু ওই তাণ্ডবের উল্লাসে!

নির্বিশেষের স্বরূপ মনোবাণীর অগোচর। স্থাণুত্ব ও স্পন্দন, একত্ব ও বহুত্বের লাঞ্ছন ছাড়া তার ধারণা আমরা করতে পারি না—করবার প্রয়োজনও দেখি না কিছু। তাই নির্বিশেষের এই ভাবদ্বৈতকে আমরা অসংকোচে স্বীকার করব। শিব এবং কালী উভয়কে মেনেই জানতে চাইব, দেশ ও কালের অতীত যে-শুদ্ধসন্মাত্রকে মেয় অথবা অমেয় কিছুই বলা চলে না, তাঁর সেই অদ্বৈত স্থাণুভাবের সঙ্গে দেশ ও কালের ছন্দে ছন্দিত এই অমেয় স্পন্দলীলার কি সম্বন্ধ। শুদ্ধবুদ্ধি বোধি এবং প্রত্যক্ষ অনুভব কি বলে সদ্‌ব্রহ্ম সম্পর্কে, তা দেখলাম। এখন দেখতে হবে শক্তি অথবা স্পন্দ সম্পর্কে তাদের রায় কি।

গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে, শক্তি কি শুধু শক্তি, স্পন্দনের একটা মূঢ় বিক্ষেপ শুধু? না শক্তি হতে যে-চেতনা উন্মেষিত দেখছি এই জড়ের জগতে, সেই বেদান্তের ভাষায় শক্তি কি শুধু প্রকৃতি—ক্রিয়া ও পরিণামের একটা স্পন্দবৃত্তি? রূপ দিতে প্রাচীন ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন একে 'প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ' না প্রকৃতি স্বরূপত চিৎশক্তি—স্বয়ম্ভূসংবিতের সৃষ্টিবীর্য? এই প্রশ্নের সমাধানের 'পরেই সব-কিছুর নির্ভর এখন।

দশম অধ্যায়

চিৎ-শক্তি

অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৩

তাঁরা দেখতে পেলেন সেই দেবতার আত্মশক্তিকে নিজেরই চিন্ময়ী গুণলীলায় নিগূঢ়।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৩)

এষ সুপ্তেষু জাগর্তি।

কঠোপনিষৎ ৫।৮

এই তো তিনি, যিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মধ্যে।

—কঠ উপনিষদ (৫।৮)

দার্শনিকের দৃষ্টিতে নিখিল প্রাতিভাসিক জগৎ পর্যবসিত হয়েছে এক বিপুল শক্তি-স্পন্দনে। স্বানুভবের আকৃতিতে এক মহাশক্তিই নিজেকে রূপায়িত করেছে স্থূল-সূক্ষ্ম নানা রূপের বৈচিত্র্যে, জড়ত্বের নানা পর্যায়ে। সর্বভাবের প্রসূতি ও ধাত্রী এই অনাদ্যন্ত মহাশক্তির একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব-রূপ দিতে প্রাচীন ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন একে 'প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ' তমোভূত এক সমুদ্ররূপে—যার রূপবিবর্জিত স্তব্ধ বক্ষে বিক্ষোভের প্রথম শিহরনেই জেগে ওঠে রূপসৃষ্টির প্রেতি এবং তাহতেই উদ্‌গত হয় বিশ্বের অঙ্কুর।

শক্তি জড়ের আকারে রূপায়িত হলেই বুদ্ধির পক্ষে তার ধারণা সহজ হয়। কেননা, আমাদের বুদ্ধি গড়ে উঠেছে—জড়মস্তিষ্কের আশ্রিত মনে জড়ের সন্নিকর্ষে যে বিচিত্র সাড়া জেগেছে, তারই বুনানিতে। প্রাচীন ভারতের জড়বিজ্ঞানীরা জড়শক্তির আদিপর্বকে দেখেছিলেন আকাশরূপে, মহাশূন্যে সেই শক্তিরই শুদ্ধসম্প্রসারণ হল যার স্বরূপ। কম্পন তার বিশেষ গুণ, আমাদের চেতনায় ফোটে যা শব্দের আকারে। কিন্তু শুধু আকাশের কম্পন হতে রূপসৃষ্টি সম্ভব নয়। তার জন্য শক্তিসমুদ্রের নির্বাধ প্রবাহে চাই একটা প্রতিঘাত, যাতে তার বুকে জাগবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সংক্ষোভ, বিচিত্র-কম্পনের অন্যোন্যসঙ্গম, শক্তির সঙ্গে শক্তির অভিঘাতে ব্যবস্থিতসম্বন্ধের উন্মেষ এবং ক্রিয়াপরিণামের ব্যতিহার। এমনি করে জড়শক্তি আকাশভূত হতে পরিণত হল যে-ভূতে, প্রাচীনেরা তাকে বলতেন বায়ুভূত। শক্তির সঙ্গে শক্তির সম্প্রয়োগ তার বিশেষ গুণ। জড়জগতের সকল সম্বন্ধেরই মূলে আছে—

সম্প্রয়োগ। কিন্তু তাতেও রূপসৃষ্টি হয় না, মহাশূন্যে দেখা দেয় শুধু শক্তিবৈচিত্র্যের লীলা। এবার চাই রূপসৃষ্টির একটা আধার। আদ্যাশক্তি তাই তেজোভূত হয়ে পৌঁছল আত্মবিপরিণামের তৃতীয় পর্বে—আমাদের কাছে তার বিশিষ্ট রূপ ফুটল আলোকে তাপে দাহিকা শক্তিতে। এ-অবস্থায় ধর্ম ও ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে শক্তির ব্যাকৃতি দেখা দিলেও তাতে জড়রূপের স্থাবর কাঠিন্য ফুটল না। তাই শক্তিবিপরিণামের চতুর্থ পর্ব এল আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা সুনিয়ত আভাস নিয়ে তরলিত বিচ্ছুরণের আকারে—'অপ্' নামের মধ্যে যার ছবিটি ধরে রেখেছেন প্রাচীনেরা। সবার শেষে পঞ্চম পর্বে অপ্‌ত্র সংসক্তি হতে দেখা দিল পৃথিবীভূত বা কাঠিন্যধর্ম। এমনি করে পঞ্চভূতে সমাপ্ত হল শক্তিবিপরিণামের লীলায়ন।

জড়ের যত রূপ আমরা জানি, এমন-কি জড়পদার্থের সূক্ষ্মতম ব্যাকৃতি পর্যন্ত সমস্তই গড়ে উঠেছে পঞ্চভূতের সমবায়ে। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধেরও প্রতিষ্ঠা তারই 'পরে : আকাশের কম্পনকে গ্রহণ করে জাগে শব্দের বোধ; শক্তিকম্পনের জগতে সম্প্রয়োগ হতে জাগে স্পর্শের চেতনা; আলোক তাপ ও দাহিকা শক্তির দ্বারা স্ফুরিত ব্যাকৃত ও বিধৃত রূপের মধ্যে আলোর খেলা হতে ফুটল দর্শনেন্দ্রিয়; এমনি করে চতুর্থ ভূত হতে রসনা আর পঞ্চম ভূত হতে দেখা দিল ঘ্রাণ। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের স্বরূপই হল শক্তির সঙ্গে শক্তির আকম্পিত সম্প্রয়োগের একটা সাড়া। প্রাকৃত-মনের তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে এমনি করে পরিতৃপ্ত করেছিলেন প্রাচীন দার্শনিকেরা শুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে চরম শক্তিবিপরিণামের একটা ধারাবাহিক সম্বন্ধের বিবৃতি দিয়ে। নইলে সাধারণ মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারত না, যে-জগতের রূপ তার ইন্দ্রিয়ের কাছে এত নিরেট বাস্তব এবং স্থায়ী, বস্তুত তা একটা ক্ষণিক প্রতিভাস হতে পারে কি করে। অথবা যে-শুদ্ধশক্তি ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অতএব মনের কাছেও বলতে গেলে অনির্বাচ্য সুতরাং অশ্রদ্ধেয়, কি করে সে হবে বিশ্বের শাশ্বত বাস্তব তত্ত্ব!

কিন্তু এ-বিবৃতিতে চৈতন্যসমস্যার সমাধান হয় না। কেননা, শক্তিকম্পনের সম্প্রয়োগে সচেতন ইন্দ্রিয়বোধ কি করে জাগতে পারে, তার ব্যাখ্যা এর মধ্যে নাই। বিভজ্যবাদী সাংখ্যেরা তাই পঞ্চভূতের পরেও স্থাপন করলেন মহৎ এবং অহঙ্কার নামে আর দুটি তত্ত্ব, যারা বলতে গেলে বাস্তবিক অজড়। কেননা, এ-দুয়ের প্রথমটি শক্তিরই বিশ্বরূপ ছাড়া কিছু নয়, আর দ্বিতীয়টি ব্যষ্টি-অভিমানের বিসৃষ্টি শুধু। তবু সাংখ্যমতে এ-দুটির তত্ত্ব চেতনাতে সক্রিয় হয়—শক্তির অভিযোগে নয়, কিন্তু এক বা একাধিক নিষ্ক্রিয় চেতন-পুরুষের সান্নিধ্যবশত। পুরুষে প্রতিফলিত হয় প্রকৃতির ক্রিয়া এবং সেই প্রতিফলনই বিচ্ছুরিত হয় চেতনার বর্ণরাগে।

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিশ্বরহস্যের এই সাংখ্যসম্মত ব্যাখ্যাই আধুনিক জড়বাদের খুব কাছাকাছি। বিশ্বপ্রকৃতিতে শুধু যন্ত্রারূঢ় শক্তির মূঢ় আবর্তন—এ-চিন্তার ধারা ধরে ভারতবর্ষের দার্শনিক গবেষণা এর বেশী আর এগোয়নি। এ-সিদ্ধান্তে গলদ যতই থাকুক, এর মূল ভাবটি একরকম অবিসংবাদিত বলে এদেশে তার প্রচার হয়েছে ব্যাপক। কিন্তু চিদ্‌ব্যাপারের যে-ব্যাখ্যাই দিই, প্রকৃতিকে জড়-প্রবৃত্তিই বলি অথবা চিন্ময়ীই বলি, সে যে বস্তুত শক্তি-স্বরূপিণী তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশ্বের সব-কিছুর মূলে কাজ করছে বিচিত্র শক্তিস্পন্দের একটা রূপায়ণী বৃত্তি। অব্যাকৃত শক্তিরাজির অন্যোন্য-সঙ্গম ও সামঞ্জস্য হতেই রূপের সৃষ্টি। এমন-কি জীবের ইন্দ্রিয়চেতনা এবং কর্মপ্রবৃত্তিও বস্তুত কিছুই নয় একধরনের শক্তির অভিঘাতে আরেকধরনের শক্তির সাড়া ছাড়া। প্রত্যক্ষ অনুভবে জানছি, এ-ই জগতের রূপ। অতএব এই অনুভবই হবে আমাদের এষণারও ভিত্তি।

এ-যুগের বৈজ্ঞানিকও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন জড়কে বিশ্লেষণ করে—যদিও সংশয়ের শেষ রেশটুকু এখনও বেঁচে আছে কোথাও-কোথাও। দর্শন ও বিজ্ঞানের এই ঐকমত্যের সমর্থন মেলে বোধি এবং অপরোক্ষানুভূতিতেও। এ-সিদ্ধান্তে শুদ্ধবুদ্ধিও খুঁজে পায় তার স্বারসিক প্রত্যয়ের চরিতার্থতা। কেননা, বিশ্বব্যাপারকে যদি স্বরূপত চৈতন্যের লীলা বলে ব্যাখ্যাও করি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে, লীলার তাৎপর্য প্রবৃত্তিতে এবং প্রবৃত্তির অর্থই হল শক্তির স্পন্দন বা বীর্যের উল্লাস। স্বগত অনুভবের সাক্ষ্যও বলে, এই তো বিশ্বের নিরূঢ় স্বভাব। আমাদের সকল কর্মপ্রবৃত্তিই এক ত্রিগুণা মহাশক্তির লীলা—প্রাচীন দার্শনিকেরা যে-ত্রয়ীর নাম দিয়েছেন জ্ঞানা ইচ্ছা এবং ক্রিয়া-শক্তি। কিন্তু স্বরূপত এরা এক আদ্যাশক্তিরই ত্রিস্রোতা। এমন-কি স্থিতি বা কর্মনিবৃত্তিও মহাশক্তির গুণলীলার সাম্যাবস্থা অথবা সদৃশ-পরিণাম মাত্র।

শক্তিস্পন্দকেই বিশ্বের স্বরূপপ্রকৃতি বললে দুটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম প্রশ্ন, শুদ্ধসতের বুকে কি করে জাগল এই স্পন্দলীলা? যদি বলি, স্পন্দ একটা শাশ্বত তত্ত্ব—শুধু তা-ই নয়, স্পন্দই সত্তার স্বরূপ, তাহলে অবশ্য এ-প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু স্পন্দই একমাত্র তত্ত্ব, এ-সিদ্ধান্ত অপরিহার্য নয়; কেননা স্পন্দনের প্রেতি হতে নির্মুক্ত এক অধিষ্ঠানসত্তার সন্ধানও আমরা পেয়েছি। তাহলে অধিষ্ঠানসত্তার শাশ্বতী স্থিতিকে বিক্ষুব্ধ করে কি করে এল স্পন্দদোলা—কোন্ হেতু বা সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে? কোন্ রহস্যের সংবেগে অটল টলে পড়ল এমনি করে?

এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা এর উত্তরে বলেছেন, শুদ্ধসত্তায় শক্তি আছে অবিনাভূত হয়ে। শিব এবং কালীতে, ব্রহ্মে এবং শক্তিতে অভেদসম্বন্ধ—

অতএব এ-দুটিকে পৃথক করা যায় না কখনও। সত্তার অবিনাভূত শক্তি কখনও স্পন্দিত, কখনও নিস্পন্দ; কিন্তু নিস্পন্দ দশাতেও শক্তি নিঃসত্ত্ব নিরাকৃত বা ঊনীকৃত নয়, অথবা তার কোনও তাত্ত্বিক বিকার ঘটেনি। এ-সিদ্ধান্ত এতই যুক্তিযুক্ত এবং বস্তুস্বভাবের অনুগত যে একে স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা হয় না। শক্তি অনন্ত অদ্বয়-সত্তার বিজাতীয় কোনও তত্ত্ব—অখণ্ডের বাইরে থেকে তাতে আবিষ্ট ও আরোপিত; অথবা শক্তি একদা ছিল অসৎ, তারপর বিশিষ্টক্ষণে ঘটেছে সৎরূপে তার আবির্ভাব : এমন কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ বলেই অসম্ভব। এমন-কি মায়াবাদীকেও মানতে হবে, যে-মায়া ব্রহ্মে আত্মবিভ্রমের শক্তিরূপিণী, সেও শাশ্বত সন্মাত্রে আছে শাশ্বতী যোগ্যতা-রূপেই। অতএব প্রশ্ন ওঠে তার বিবিক্ত সত্তা নিয়ে নয়, শুধু তার উন্মেষ ও নিমেষ নিয়ে। প্রকৃতি-পুরুষের অনাদি সহভাব সাংখ্যবাদীও স্বীকার করেন। তাঁদের মতে প্রকৃতির গুণসাম্য ও গুণবিক্ষোভ পর্যায়ক্রমে দুইই সত্য।

এমনি করে শক্তি যদি হয় সত্তার অবিনাভূত, শক্তির স্বরূপে যদি থাকে পর্যায়ক্রমে স্পন্দ ও নিস্পন্দ দুয়েরই যোগ্যতা; অর্থাৎ আত্মসংহরণ ও আত্মবিচ্ছুরণ দুইই যদি হয় শক্তির স্বরূপপ্রকৃতি : তাহলে কি করে সম্ভব হল আদিস্পন্দের প্রেতি বা প্রবেগ, এ-প্রশ্ন আদপেই ওঠে না। কারণ, সহজেই বুঝতে পারি—শক্তির যোগ্যতা তাহলে হয় স্পন্দ ও নিস্পন্দের ছন্দঃ-পর্যায়ে আপনাকে ফুটিয়ে চলবে কালের তরঙ্গদোলায়; অথবা শাশ্বত আত্মসংহরণের সামর্থ্যে নির্বিকার সন্মাত্রে সমাহিত থেকেই মহাসমুদ্রের বুকে তরঙ্গবিক্ষোভের মত শুধু জাগিয়ে রাখবে বিশ্বের একটা স্পন্দলীলা। আবার এই বহিশ্চর লীলা হতে পারে আত্মসংহরণেরই সমান্তর অতএব শাশ্বত। কিংবা কালের কলনায় অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে থাকতে পারে তার উদয়-বিলয়ের ছন্দ। তখন আবৃত্তিনিত্যতা থাকবে তার, কিন্তু থাকবে না প্রবাহনিত্যতা।...অবশ্য এসব উক্তিই অপরিস্ফুট কল্পনার ছবি আঁকা শুধু।

শুদ্ধ-সত্তায় কি করে স্পন্দনের শুরু হয়, এ-প্রশ্নকে ঠেকাতেই জাগে 'কেন'র প্রশ্ন। মহাশক্তির মধ্যে স্পন্দলীলার যোগ্যতা থাকলেও সে কেন এমনি করে পরিণামের ছন্দে ফুটে উঠল ? সদ্‌ব্রহ্মের শক্তি রূপায়ণের সমস্ত বৈচিত্র্য হতে নির্মুক্ত থেকে আনন্ত্যের মহিমায় নিত্যসংহৃত হয়ে রইল না কেন নিজেরই মধ্যে ? অবশ্য শুদ্ধসৎকে যদি বলি অচেতন এবং চৈতন্যকে যদি মনে করি জড়শক্তির সেই পরিণাম, শুধু ভুল করে যাকে অজড় ভাবি—তাহলে কিন্তু এ-প্রশ্ন ওঠে না। কেননা পরিণামের ছন্দকে আমরা তখন স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি শক্তিরই স্বভাব বলে। স্বভাবতই যা শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ, তার হেতু আদিম প্রেতি বা অন্তিম লক্ষ্য খোঁজবার সঙ্গত কোনও কারণ তো নাই। শাশ্বত স্বয়ম্ভূসত্তার সম্পর্কে যেমন প্রশ্নই হতে পারে না—কি করে সত্তার

আবির্ভাব, কেনই-বা তার সম্ভাব; তেমনি কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না সত্তার স্বরূপশক্তি এবং তার স্পন্দলীলার নিরূঢ় প্রেতি সম্পর্কেও। হেতুপ্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা তখন ব্যাপৃত থাকবে শুধু শক্তির স্বতঃস্ফুরণের ধারা, স্পন্দ ও রূপায়ণের রীতি এবং পরিণামের ছন্দ নিয়ে। সত্তা ও শক্তি দুইই যখন তমোভূত—একটি শুধু তামসী স্থিতি আরেকটি তামসী প্রবৃত্তি, এবং দুইই অচেতন ও অপ্রবুদ্ধ—তখন বিশ্বপরিণামের মূলে কোনও হেতু বা আকূতি এবং তার চরমে কোনও সুনিশ্চিত লক্ষ্য কোনমতেই থাকতে পারে না।

কিন্তু সৎস্বরূপকে যদি চিন্ময় বলে মানি বা জানি, তাহলেই হেতুনিরূপণের সমস্যা জাগে। অবশ্য এমন চিন্ময় পুরুষের কল্পনা অসম্ভব নয়, যিনি স্বীয়া প্রকৃতির দ্বারা শাসিত এবং নিয়ন্ত্রিত—বিশ্বরূপে প্রকাশ বা শাশ্বত আত্মসংহরণে অপ্রকাশ কোনও-কিছুতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য নাই। এমন বিশ্বেশ্বরের কল্পনা আছে মায়াবাদে এবং কোনও-কোনও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে। তাঁদের মতে ঈশ্বর মায়া অথবা শক্তির পরতন্ত্র, পুরুষ মায়াকবলিত বা শক্তিশাসিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, আমাদের জিজ্ঞাসার শুরু যে অনন্ত পরমার্থ-সৎকে নিয়ে, তাঁর স্বরূপ ঈশ্বরের এমন কল্পনায় কখনও ফুটতে পারে না। একথা মানতেই হবে, ব্রহ্মই বিশ্বে নিজেকে রূপায়িত করেছেন ঈশ্বররূপে—'আত্মমায়য়া'। সুতরাং ব্রহ্ম ন্যায়ত শক্তি বা মায়ার প্রাগ্‌ভাবী স্ব-তন্ত্র অধিষ্ঠান, তাই মায়ার ক্রিয়ানিবৃত্তিতে ব্রহ্মই আবার তাকে নিলীন করেন আপন তুরীয় সত্তায়। চিন্ময় সত্তা যদি হয় নির্বিশেষ, আত্মব্যাকৃতি হতে স্ব-তন্ত্র, নিজের গুণলীলা দ্বারা অনুপহিত, তাহলে স্পন্দের স্বরূপযোগ্যতাকে রূপে বিবর্তিত করা না-করা সম্পর্কে নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্য তাঁর আছে—একথা অনস্বীকার্য। ব্রহ্ম প্রকৃতি-পরতন্ত্র হলে ব্রহ্মই বলা চলে না তাঁকে। বলতে হয়, তিনি আনন্ত্যের অন্ধতামিস্র যেন, ক্রিয়া তাঁর মধ্যে থেকেও ছাপিয়ে উঠেছে তাঁকে, শক্তির সচেতন আধার হয়েও তার তিনি কর্তা নন। যদি বলি, শক্তির শাসন তাঁর আত্মশাসন, কেননা শক্তি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি, তাহলে আমাদের প্রথম অভ্যুপগম টেকে না অতএব সিদ্ধান্তবিরোধ অনিবার্য হয়। কারণ, সত্তার স্বরূপ তখন পর্যবসিত হয় শক্তিতে—শক্তিরই নিস্পন্দ বা স্পন্দরূপে। কিন্তু তবু তাকে পরমা শক্তিই বলা চলে—পরমার্থসৎ নয়।

তাহলে এখন খুঁটিয়ে দেখতে হবে শক্তি ও চৈতন্যের মাঝে কি সম্বন্ধ। কিন্তু চৈতন্য বলতে আমরা কি বুঝি? সুপ্তি মূর্ছা বা অন্য কারণে মানুষের স্থূল ও বহিশ্চর ইন্দ্রিয়বোধের পথ যদি রুদ্ধ না হয়, তাহলে জীবনের বেশীর ভাগ জুড়ে তার মনের মহলে যে-জাগ্রৎদশাকে স্পষ্ট দেখতে পাই, আমরা সাধারণত তাকেই 'চৈতন্য' বলি। চৈতন্যের এ-সংজ্ঞা সত্য হলে তাকে বলতে

হয় জড়বিশ্বের একটা ব্যতিক্রম—নিত্যবিধান নয়, কেননা আমাদের মধ্যে চৈতন্য তাহলে একটা আগন্তুক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে এই অগভীর প্রাকৃত ধারণাই ছড়িয়ে আছে আমাদের চিন্তায় এবং সংস্কারে। কিন্তু দার্শনিক বিচারে এখন থেকে এ-দৃষ্টিকে পুরাপুরি বর্জন করে চলতে হবে। আমরা জানি, সুপ্তি মূর্ছা বা নেশার ঘোরে দেহ জড়বৎ অচেতন যখন, তখনও কে যেন ভিতরে-ভিতরে জেগে থাকে আমাদের মধ্যে। শুধু তা-ই নয়। এদেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা যে বলেছেন, যে-জাগ্রৎদশাকে আমরা জানি চৈতন্য বলে, সমগ্র চৈতন্যসত্তার সে একটা ভগ্নাংশ মাত্র—তাঁদের এ-উক্তিও মিথ্যা নয়। জাগ্রৎভূমি চেতনার বহিরাবরণ মাত্র। এমন-কি মনশ্চেতনারও সবটুকু তার এলাকায় পড়ে না। জাগ্রৎচেতনার পিছনেও আছে অধিচেতনা বা অবচেতনার একটা বৃহত্তর ভূমি, আমাদের সত্তার অধিকাংশই তার দখলে। তার তুঙ্গ-শিখর অথবা অতলগহনের পরিমাপ আজও মানবীয় সামর্থ্যের বাইরে রয়েছে। চৈতন্যের এই বিপুল প্রসারকে মেনে নিয়ে যদি আমাদের এষণা শুরু হয়, তবেই আমরা শক্তির স্বরূপ ও প্রবৃত্তির সত্যবিজ্ঞান গড়তে পারব। এই বিজ্ঞানই স্থূলতার সঙ্কোচ হতে, প্রতিভাসের বিভ্রম হতে আমাদের দৃষ্টিকে চিরনির্মুক্ত করবে।

জড়বাদী অবশ্য বলবেন, চৈতন্যের অধিকার যত প্রসারিতই হ'ক, তবু সে জড়েরই বিকার মাত্র। কেননা, স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে চেতনার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য —ইন্দ্রিয় চেতনার সাধন নয়, চেতনাই ইন্দ্রিয়ের পরিণাম। কিন্তু জড়বাদের এ-গোঁড়ামি ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে। তার ব্যাখ্যাকে আমরা এখন অগভীর অপর্যাপ্ত ও কষ্টকল্পিত বলেই জানি। আমাদের সমগ্রচেতনার সামর্থ্য যে দেহযন্ত্র নাড়ীতন্ত্র মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়কেও ছাড়িয়ে গেছে বহুদূর, চেতনার প্রাকৃতভূমিতেও এইসব শারীরযন্ত্র যে চৈতন্যবৃত্তির অভ্যস্ত সাধন মাত্র, জনক নয়—একথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। ঊর্ধ্বায়নের আকূতিতে চৈতন্যই মস্তিষ্ককে সৃষ্টি করেছে সাধনরূপে—মস্তিষ্ক সৃষ্টিও করেনি, ব্যবহারও করছে না চৈতন্যকে। শারীরযন্ত্র যে চেতনার একান্ত অপরিহার্য সাধন নয়, তার সপক্ষে অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের নজির আছে। হৃৎস্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ছাড়াও যে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়, অথবা চিন্তার জন্য মস্তিষ্ককোষের পরিচালন যে অনাবশ্যক অনেকসময়—এতো আমাদের অজানা নয়। অতএব, একটা যন্ত্রের কলাকৌশল হতে তার পরিচালক বাষ্প বা বিদ্যুতের কোনও ব্যাখ্যা অথবা পরিচয় পাওয়া যায় না যেমন, তেমনি দেহযন্ত্র দিয়েও চৈতন্যবৃত্তির হেতুনিরূপণ বা ব্যাখ্যা হয় না। উভয়ক্ষেত্রে শক্তিই প্রাক্তন, তার বাহন জড়যন্ত্র প্রাক্তন নয়।

এইথেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্তে পেঁছিই আমরা।

অসাড় নিষ্প্রাণতার মধ্যেও মনশ্চেতনার সত্তা যদি সম্ভাবিত হয়, তাহলে জড়-পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা বিশ্বব্যাপ্ত অবচেতন মন, কেবল উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে বাইরে তার আকৃতি বা ক্রিয়া স্ফুরিত হচ্ছে না—এ-সম্ভাবনা একেবারে অযৌক্তিক কি? জড়দশা কি চেতনার অভাব, না চেতনার সুপ্তি? বিশ্বপরিণামের দিক দিয়ে এ-সুপ্তি যদি হয় প্রবর্তনার আদিবিন্দু—তার অবান্তরব্যাপার না হয়ে, তাতেই-বা ক্ষতি কি? মানুষের সুপ্তিতেও দেখি, সে তো চেতনার স্তম্ভন বা অভাব নয় শুধু। সে তার অন্তঃসংহরণ—বহির্বিষয়ের অভিঘাতে স্থূলভাবে সাড়া না দিয়ে চেতনা নিজের মধ্যেই গুটিয়ে এসেছে সেখানে। বিশ্বের যা-কিছু বহির্জগতের সঙ্গে আজও প্রকাশ্য যোগাযোগের পথ খুঁজে পায়নি, তাদের সকলেরই কি এই সুপ্তিদশা নয়? শুধু এক চিন্ময় পুরুষই 'নিত্য জেগে আছেন, যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের মধ্যেও'—এই কি বিশ্বপ্রতিভাসের তত্ত্ব নয়?

শুধু তা-ই নয়। যাকে বলি অবচেতনা, সে আমাদের বহিশ্চর মনশ্চেতনা হতে আলাদা কিছু নয়। জাগ্রতের অন্তরালে সত্তার গহনে কাজ করলেও জাগ্রতেরই মত তার ধরন—কেবল তার অধিকার জাগ্রতের চেয়ে আরও ব্যাপ্ত, আরও গভীর। কিন্তু অধিচেতনার অধিকার অবচেতনার গণ্ডিকেও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। তার উৎকর্ষ এবং সামর্থ্যই যে বহুগুণিত তা নয়—আমাদের চিরপরিচিত জাগ্রৎমানস হতে তার ধারাই স্বতন্ত্র। অতএব এ-ধারণা অসঙ্গত নয় যে, আমাদের মধ্যে যেমন আছে অবচেতনা, তেমনি আছে অতিচেতনা। এই আধারেই চিন্ময়-বিগ্রহের মধ্যে আছে চিৎ-বৃত্তির এমন-একটা পরম্পরা, যা আমাদের পরিচিত মনোভূমির অনেক ঊর্ধ্বে। অধিচেতনা এমনি করে অতিচেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারে যদি মনের সীমানা ছাড়িয়ে, তাহলে সে কি মনেরও তলায় তলিয়ে যেতে পারে না অবচেতনার পাতালপুরে? বিশ্বজগতে, এমন-কি আমাদের এই আধারেই কি নাই চেতনার এমন অবরভূমি যা মনেরও নীচে, যাকে আমরা বলতে পারি প্রাণচেতনা এবং দেহচেতনা? তা-ই যদি হয়, তাহলে চেতনার অধিকারকে আরও প্রসারিত করে উদ্ভিদ ও ধাতুখণ্ডে নিগূঢ় শক্তিকেও আমরা চেতনা নাম দিতে পারি না কি? অবশ্য পশু বা মানুষের মানসের সঙ্গে সে-চেতনার সাদৃশ্য নাই; কিন্তু তা বলে চৈতন্য-গুণকে তাদেরই একচেটিয়া ভাববার কোনও সঙ্গত কারণও তো নাই।

চেতনার এই বিশ্বময় অনুস্যূতি শুধু যে সম্ভব তা নয়, নিরপেক্ষ বিচারে একে আমরা অবধারিত বলেই জানি। আমাদেরই মধ্যে দেখি, প্রাণচেতনার এমন-একটা লীলা চলছে দেহকোষে এবং জীবনযোনিপ্রযত্নে, যার ফলে মনের অগোচরে আমরা সায় দিয়ে চলেছি নানা সার্থক প্রবৃত্তিতে এবং আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র দ্বন্দ্বে। পশুর মধ্যে প্রাণচেতনার এই লীলা আরও সুস্পষ্ট

এবং সার্থক। উদ্ভিদের মধ্যেও বোধির প্রত্যয় দিয়ে তার পরিচয় পাই। উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জীবনস্পন্দনের বিচিত্র রহস্য একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। তাঁর গবেষণায় উদ্ভিদের চিত্তবৃত্তির কোনও সন্ধান আজ পর্যন্ত না মিললেও তার স্পন্দ যে চিৎস্পন্দই, সে নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অতএব মানতেই হয়, স্বানুভবের ধারা অতিচেতনাতে মনশ্চেতনা হতে ভিন্ন যেমন, মনের নিদ্‌মহলে প্রাণচেতনাতেও ঠিক তা-ই—যদিও তার সাড়া দেবার ধরন গোড়াতে হুবহু মনেরই মত।

পশুরও নীচে, উদ্ভিদে দেখি প্রাণের লীলা। চৈতন্যের লীলাও কি এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে? তাহলে কি প্রাণ ও চেতনা জড় হতে বিজাতীয় কোনও শক্তি, পরিণামের একটা বিশিষ্ট পর্বে জড়ে এসে আবিষ্ট হয়েছে—সম্ভবত আর-কোনও জগৎ হতে?* নইলে হঠাৎ এ-শক্তি কোথা থেকে এল জড়ের মধ্যে? প্রাচীন দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন, জড়াতীত এমন-সব জগৎ আছে, যারা এই জগতের প্রাণ ও চেতনাকে ধরে আছে অথবা ফুটিয়ে তুলছে নিজের চাপে—কিন্তু আবেশদ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করছে না কিছুই। কেননা আগে থেকেই যা সংবৃত্ত হয়ে নাই জড়ের মধ্যে, তার বিবৃত্তিও কখনও সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা যাকে মনে করি নিছক জড়, তার সামনে এসেই প্রাণ ও চেতনার মূর্ছনা যে স্তব্ধ হয়ে থমকে গেছে, একথা মনে করবার সঙ্গত কোনও কারণ নাই। দর্শন ও বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক রায় হচ্ছে—প্রাণের নিদানকথা অস্পষ্ট ও রহস্যাচ্ছন্ন। সম্ভবত ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি নিষ্প্রাণ পদার্থে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা নিস্পন্দ ও নিরুদ্ধ চেতনা। আমাদের মধ্যে চেতনার যা মূল উপাদান, অন্তত তার অব্যক্ত সূচনা আছেই জড়ের মধ্যে। ইতিপূর্বে যাকে বলেছি প্রাণচেতনা, উদ্ভিদে তার একটা অস্পষ্ট আভাস পাই বলেই তার কল্পনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু জড়ের চেতনা অসাড় নিস্পন্দ, তাই বোঝা কঠিন বলে তাকে কল্পনা করাও কঠিন। আর যা বুঝি না বা ভাবতে পারি না, তা উড়িয়েও দিতে পারি—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু চেতনাকে যদি নামিয়ে আনতে পারি মনুষ্যলোক হতে উদ্ভিদ-জীবনের গভীর গহনে, তাহলে এর পরেই প্রকৃতির পরিণামে হঠাৎ দেখা দিল একটা দুস্তর ফাঁক—একথাই-বা বিশ্বাস করি কি করে? বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র যদি দেখি একই

---

* লোকান্তর হতে নয় কিন্তু গ্রহান্তর হতে প্রাণ এসেছে এই পৃথিবীতে, এমন-একটা অদ্ভুত জল্পনা চলছে আজকাল। কিন্তু এ মীমাংসা মীমাংসাই নয় চিন্তাশীল দার্শনিকের কাছে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আদপেই জড়ের মধ্যে প্রাণ এল কি করে—বিশেষ-কোনও গ্রহের জড়-উপাদানে সঞ্চারিত হল কি করে, সে-প্রশ্ন নয়।

ধারার সুস্পষ্ট নিদর্শন, শুধু একটি ক্ষেত্রে দেখি—ধারা বিলুপ্ত নয়, কেবল অপরের তুলনায় তার চিহ্ন অস্পষ্ট—তাহলে সেখানে ধারার অস্তিত্বকে অনুমান করবার অধিকারও তর্কবুদ্ধির নিশ্চয় আছে। এমনি করে ধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতাকে যদি স্বীকার করি, তাহলে জগতে যেখানে শক্তির লীলা দেখব, সেখানেই নিঃসংশয়ে মানব চৈতন্যেরও অস্তিত্ব। অতএব, শক্তির সকল ব্যাকৃতিতে চেতন বা অতিচেতন পুরুষের সাক্ষাৎ অভিনিবেশ যদি নাও থাকে, তবু চেতনশক্তির আবেশ যে আছেই তাদের মধ্যে এবং তার দ্বারা যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদের বহিরঙ্গব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চেতনাকে এমনি করে সর্বানুস্যূত মানতে গেলে তার অর্থকে অনেকখানি প্রসারিত করে নিতেই হয়। তখন বলা চলে না, চেতনা আর চিত্তবৃত্তি সমার্থক। চেতনা তখন সত্তার স্বয়ম্প্রজ্ঞ স্বরূপশক্তি—চিত্তবৃত্তি তার মধ্যপর্ব মাত্র। চিত্তবৃত্তির নীচে চেতনা পর্যবসিত হয় জীবনযোনি-প্রযত্নে, এবং তার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয় অতিমানস ভূমিতে—আমাদের কাছে যা অতিচেতন। কিন্তু এক অদ্বৈতচৈতন্যেরই বিচিত্র কায়ব্যূহ নিখিল জুড়ে। ভারতীয় দর্শনে এই হল চিতের স্বরূপ, শক্তিরূপে যা অনন্তকোটি জগৎ সৃষ্টি করছে। এমনি করে আমরা পৌঁছই যে-অন্বয়তত্ত্বে, জড়বিজ্ঞানও তাকেই দেখেছে দৃষ্টির বিপরীত মেরু হতে—যখন মনকে জড় হতে পৃথক শক্তি না মেনে সে বলেছে, মন শুধু জড়শক্তির ক্রমিক পরিণাম। কিন্তু ভারতীয় দর্শন অনুভবের নিবিড়তম প্রত্যয় হতে বলেছে, মন ও জড় একই শক্তির বিভিন্ন পর্ব মাত্র, তারা এক অখণ্ডসত্তারই চিন্ময় স্বরূপশক্তির বিভিন্ন রূপায়ণ।

তবু প্রশ্ন হবে, বিশ্বশক্তি যে যথার্থই চিন্ময়ী, তার প্রমাণ কি? চেতনা থাকলেই তো দেখা দেবে কিছু-না-কিছু বুদ্ধির ব্যাপার, একটা সাভিপ্রায় প্রবৃত্তি, খানিকটা আত্মসংবিৎ। আমাদের অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তির আকারে না হ'ক, কোনও-না-কোনও আকারে তারা দেখা তো দেবেই।...কিন্তু পূর্বপক্ষের এ-শঙ্কা সর্বগত চিৎশক্তির বিরুদ্ধে না গিয়ে তাকে বরং সমর্থনই করে। তার উদাহরণ : পশুর মধ্যেও মেলে লক্ষ্যানুসারী প্রবৃত্তির এমন নিখুঁত পরিচয়, বৈজ্ঞানিকের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের এমন আশ্চর্য সমাবেশ, যা তার মানসিক সামর্থ্যকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। এমন-কি মানুষ তাকে বহু সাধ্যসাধনায় আয়ত্ত করেও অভ্রান্ত ক্ষিপ্রতায় ব্যবহার করতে পারে না পশুর মত। এই অতিসাধারণ একটি ব্যাপার হতেই বোঝা যায়, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গেও চলছে চিৎশক্তির এমন-একটা লীলা যা বুদ্ধির স্বচ্ছ তীক্ষ্ণতায়, সাভিপ্রায় প্রবৃত্তিতে, সাধ্য সাধন ও পরিবেশের সাকূত সচেতনতায় এমনই অনুপম যে, এ-যাবৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত মনঃশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশও হার

মানে তার কাছে। তেমনি জড়প্রকৃতিরও সকল ব্যাপারে দেখি, সেই এক প্রচ্ছন্ন পরা বুদ্ধিরই খেলা—'স্বগুণৈর্নিগূঢ়া'।

সারা বিশ্বে এমনি করে চলছে এক আকূতির লীলা। তার মধ্যে বুদ্ধির কত কসরত, কত খোঁজাখুঁজি, কত বাছাই-ছাঁটাই, কত মানিয়ে-চলা। যে চিন্ময় প্রেতি আছে এর মূলে, তার বিরুদ্ধে এই আপত্তি শুধু—প্রকৃতি বুদ্ধিমতীই হবে যদি, তবে তার মধ্যে বেপরোয়া অপচয়ের প্রবৃত্তি কি করে এত প্রবল হল? কিন্তু এ-আপত্তি শুধু মনুষ্যবুদ্ধির সংকীর্ণতা হতে প্রসূত। বিশ্বশক্তির বিপুল প্রবাহের 'পরে সে তার কুনো যুক্তির ছাপ রেখে যেতে চায় সংকীর্ণ ইষ্টসিদ্ধির খাতিরে। মহাপ্রকৃতির অভিপ্রায়ের একটিমাত্র দিক আমরা দেখি। তাই তার সঙ্গে গরমিল যার, তাকেই বলি শক্তির অপচয়। কিন্তু মানুষের সমাজেও তথাকথিত অপচয়ের লেখা-জোখা নাই। অথচ অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তির দৃষ্টিতে যা অপচয়, সে যে কোনও বিরাট ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল, সে-বিষয়েও আমরা নিঃসংশয়। প্রকৃতির আকূতির যেদিকটা আমাদের কাছে স্পষ্ট, তারও মধ্যে দেখি—অপচয় সত্ত্বেও, এমন-কি আপাত-অপচয়ের সুযোগ নিয়েই সে তার নিজের কাজ ঠিক হাসিল করে চলেছে। অতএব, প্রকৃতির যে-উদ্দেশ্যটা যবনিকার অন্তরালে, তার সাধনার ভার অসংকোচে তারই হাতে ছেড়ে দিতে পারি নাকি?

বাস্তবিক, পশুতে উদ্ভিদে জড়ে—যেখানেই বিশ্বশক্তির লীলা অব্যাহত, সেখানেই দেখি তার লক্ষ্যনিষ্ঠার একটা সংবেগ: আপাত-অন্ধ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে বিলম্বেই হ'ক বা সদ্য-সদ্যই হ'ক, ঠিক-ঠিক লক্ষ্যভেদ করবার আশ্চর্য একটা নৈপুণ্য। প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরাপুরি জানা না থাকলেও এ-ব্যাপারগুলিকে তো উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলে না কিছুতেই। জড় যতদিন আনখশিখ জুড়ে ছিল বৈজ্ঞানিকের কল্পনা, ততদিন বুদ্ধিকেই বুদ্ধির প্রসূতি মানতে নিষ্ঠায় বাধত তার—সেকথা না হয় বুঝি। কিন্তু এ-যুগে যদি কেউ বলে, মানুষের চেতনা বুদ্ধি সিদ্ধি সমস্তই এসেছে এক অন্ধ প্রমত্ত অপ্রবুদ্ধ অচেতনার প্রবেগ হতে, যার মধ্যে তাদের এতটুকু আভাস বা বীর্য প্রচ্ছন্ন ছিল না—তাহলে তার উক্তিকে মান্ধাতাযুগের একটা হেঁয়ালি ছাড়া কী বলব? দিবালোকের মতই স্পষ্ট একথা—মানুষের চেতনা মহাপ্রকৃতির চেতনার একটা রূপ মাত্র। এই চেতনা সংবৃত্ত হয়ে আছে মনোলোকের তলায়, মুকুলিত হয়েছে মনের মধ্যে—এখনও তার উৎকৃষ্টতর রূপায়ণ বাকী আছে মনেরও ওপারে। কারণ অনন্ত লোকের প্রসূতি যে-মহাশক্তি, তিনি চিন্ময়ী। লোকে-লোকে যে-সন্মাত্রের রূপায়ণ, তিনি চিন্ময় পুরুষ। গুহাহিত সম্ভূতি-বীর্যের পরিপূর্ণ রূপায়ণই তাঁর বিশ্বরূপের তাৎপর্য ও আকূতি—আমাদের প্রসন্ন-উদার বুদ্ধির এই তো প্রত্যয়।

একাদশ অধ্যায়

আনন্দরূপং যদ্ বিভাতি

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ
আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি
জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি
জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭; ৩।৬

কারণ কেই-বা থাকত বেঁচে, কেই-বা নিত নিশ্বাস—যদি এই আনন্দ আকাশ হয়ে আমাদের না থাকত ছেয়ে।

আনন্দ হতেই জন্মেছে এইসব ভূত, জন্মে আনন্দেই আছে বেঁচে, আবার আনন্দেই যায় তারা মিলিয়ে।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৭; ৩।৬)

মানলাম, সদ্‌ব্রহ্মই বিশ্বের আদি অবসান ও পরায়ণ, এবং সেই ব্রহ্মসত্তারই অবিনাভূত এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসংবিৎ চিৎস্পন্দরূপে নিজেকে বিচ্ছুরিত করে সৃষ্টি করছে অনন্ত লোক—বিচিত্র শক্তির বহুধা রূপায়ণে। তবু এ-প্রশ্ন থেকেই যায় : 'ব্রহ্ম অনন্ত নির্বিশেষ নিরঞ্জন অপ্রয়োজন অকাম হয়েও কেন চিৎশক্তিকে বিচ্ছুরিত করলেন বিশ্বরূপের বিসৃষ্টিতে ? তাঁর স্বরূপশক্তিই তাঁকে বাধ্য করছে সৃষ্টি করতে, স্পন্দ ও রূপায়ণের স্বরূপ-যোগ্যতা আছে বলেই রূপে স্পন্দিত না হয়ে পারেন না তিনি—সমস্যার এ-সমাধান পূর্বেই আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ স্বরূপ-যোগ্যতা থাকলেও তার দ্বারা তিনি সীমিত অবরুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি স্ব-তন্ত্র, অতএব সৃষ্টির যোগ্যতা থাকলেও তার দায় তাঁর নাই। স্পন্দবৃত্তি অথবা স্পন্দহীন নিত্যস্থিতি, সম্ভূতি অথবা আত্মনিরুদ্ধ অসম্ভূতি দুইই যদি তাঁর স্বেচ্ছাধীন হয়, তাহলে তাঁর এই স্পন্দ ও সম্ভূতিলীলার একমাত্র কারণ হতে পারে—আনন্দের অবারণ উচ্ছ্বাস।

অনাদি পরাৎপর শাশ্বত সন্মাত্রকে বেদান্তীরা দেখেছেন কেবল সত্তারূপে নয়, অথবা এমন চিন্ময় সত্তারূপেও নয় যার চিৎ একটা অন্ধশক্তির সংবেগ শুধু। তাঁদের অনুভবে, ব্রহ্ম চিন্ময় সত্তা হলেও আনন্দই তাঁর সত্তার তাৎপর্য, আনন্দই তাঁর চেতনার স্বরূপ। পরমার্থসন্মাত্র বলি যাকে, তার মধ্যে অসত্তা বা অচিতির অন্ধতমিস্রা অথবা শক্তির কুণ্ঠাবশত কোনও ন্যূনতা থাকতে পারে না—কেননা তাহলে আর পরমার্থতত্ত্ব বলা চলত না তাকে। ঠিক সেই কারণেই

বেদনাবোধ বা আনন্দের অভাবও থাকতে পারে না তার স্বভাবে। চিন্ময় সত্তার পরাকাষ্ঠা হল তার নিরঙ্কুশ আনন্দস্বভাব। এখানে উদ্দেশ্য আর বিধেয়ের একই তাৎপর্য। নিরঙ্কুশতা আনন্ত্য পরাকাষ্ঠা—সমস্তের মধ্যেই আছে শুদ্ধ আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা। এমন-কি ব্যাবহারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরেও যেখানে অতৃপ্তি অনুভব করি, সেখানেই সীমার সঙ্কোচ বা বাধা থাকে। তাই অবরুদ্ধকে নির্মুক্ত করে, সীমাকে অতিক্রম করে, বাধাকে পরাভূত করেই আমাদের তৃপ্তি। কারণ আর-কিছু নয়। মানুষের অনাদিসত্তায় আছে অকুণ্ঠ অনন্ত আত্মসংবিৎ ও আত্মশক্তির নিরঙ্কুশ পরাকাষ্ঠা। নিজেকে এমন করে পাবার অর্থই হল আত্মানন্দে বিভোর হওয়া, এবং তা-ই আমাদের স্বরূপ। ব্যাবহারিক জীবনের ক্ষুদ্রতায় এই আত্মবশ্যতার আমেজ লাগে যখন, তখনই আমরা পাই তৃপ্তির সন্ধান, পাই আনন্দের স্পর্শ।

ব্রহ্মের আত্মানন্দ কিন্তু তাঁর নির্বিশেষ আত্মসত্তার নিস্পন্দ স্থাণুতাদ্বারা খণ্ডিত হয় না কখনও। যেমন তাঁর চিৎশক্তির মধ্যে আছে আত্মরূপায়ণের নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত-বিচিত্র সামর্থ্য, তেমনি তাঁর আত্মানন্দের মধ্যেও আছে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের রূপে অন্তহীন আত্মরূপায়ণের নিত্যচঞ্চল সমুল্লাস, অফুরন্ত স্পন্দবৈচিত্র্যের অপরূপ লাস্যলীলা। আত্মস্বরূপের আনন্দস্পন্দকে অনন্ত রূপবৈচিত্র্যের উৎসারণে সম্ভোগ করাই তাঁর বিশ্বব্যাপিনী সৃষ্টিলীলার একমাত্র তাৎপর্য।

অথবা বলা চলে, বিশ্বে যা রূপায়িত হয়েছে, তা সৎ চিৎ আনন্দের অখণ্ড ত্রয়ী। বেদান্তীরা তাঁকেই বলেন সচ্চিদানন্দ। তাঁর চিৎস্বভাবে আছে বিসৃষ্টি অথবা আত্মরূপায়ণের এক দিব্য সামর্থ্য, যা তাঁর চিন্ময় স্বরূপসত্তাকে বিচ্ছুরিত করে রূপ ও প্রতিভাসের অনন্ত বৈচিত্র্যে এবং সেই বিচ্ছুরণের আনন্দকে সম্ভোগ করে 'শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। অতএব যা-কিছু এ-বিশ্বে আছে, তা অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সত্তায় সত্তাবান, তাঁর চেতনায় চিন্ময় এবং তাঁরই আনন্দে নন্দিত। যেমন বিশ্বের বৈচিত্র্যকে দেখেছি এক নির্বিকারসত্তার বিভঙ্গরূপে, এক অনন্তশক্তির খণ্ডপরিণামরূপে, তেমনি আবার দেখতে পাব এক সর্বগত একরস স্বায়ম্ভুব আনন্দই বিশ্বরূপে প্রবর্তিত করেছে তার আত্মসম্ভূতির রাসচক্র। যা-কিছু এ-জগতে আছে, তার মধ্যে চিৎশক্তি পরিনিহিত রয়েছে—স্বরূপের ধাত্রী ও স্বধর্মের প্রবর্তিকা হয়ে। তেমনি যা-কিছু আছে, তার মূলে রয়েছে সত্তারই আনন্দ—তার সঞ্জীবন ও স্বভাবরূপে।

প্রাচীন বেদান্তীরা এই স্বরূপানন্দের প্রেতিকেই দেখেছিলেন বিশ্বসৃষ্টির মূলে। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের দুটি প্রবল পূর্বপক্ষ হল, প্রথমত প্রাকৃত-মনের নিত্য-অনুভূত দুঃখ—বেদনা ও ইন্দ্রিয়বোধের রাজ্যে, এবং দ্বিতীয়ত তার নিত্যদৃষ্ট অনর্থ ও অধর্মের সমস্যা। প্রশ্ন হবে : এ-জগৎকে বলা হয়

সচ্চিদানন্দের বিভূতি। শুধু চিন্ময়সত্তার বিভূতি বললে আপত্তির কারণ ছিল না কোনও। কিন্তু তারও পরে বলা হয় তাকে অফুরন্ত আনন্দসত্তার উল্লাস। তা-ই যদি সত্য হবে, তাহলে জগৎ জুড়ে কোথা হতে এল এত শোক এত দুঃখ এত ব্যথা? এ-জগৎ যে দুঃখালয় এই অনুভবই তো প্রত্যক্ষ, একে স্বরূপসত্তার আনন্দে উল্লসিত দেখছি না তো কোথাও।...কিন্তু, জগৎ দুঃখময়—এটা অত্যুক্তি, এবং তার মূলে আছে দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয়। কোনও ভাবুকতার ভাঁওতায় না পড়ে, শুধু সত্য-নির্ধারণের খাতিরে জগতের দিকে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে তাকাই যদি, তাহলে দেখি, আপাতিক অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ কোথাও তীব্র হয়ে দেখা দিলেও সমগ্র বিশ্বের জীবনলীলায় দুঃখের চাইতে সুখেরই ভাগ বেশী। বাস্তবিক সুখের দশাই প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান, সাময়িক বিপর্যয়রূপে দুঃখ তাকে স্তম্ভিত বা অভিভূত করে রাখে মাত্র। সুখ স্বাভাবিক বলে দুঃখের পরিমাণ স্বল্প হলেও চেতনায় তা তীব্রতর হয়ে ফোটে এবং অনুভূত সুখের চাইতে কল্পিত দুঃখের বোঝাটা ভারি ঠেকে। সুখে অভ্যস্ত বলেই তার স্মৃতিকে আমরা আঁকড়ে থাকি না। এমন-কি উৎকট অথবা আত্মহারা উল্লাসের তীব্রতা দিয়ে চেতনার তন্ত্রীকে সবলে আঘাত না করলে সহজ সুখের দিকে ফিরেও তাকাই না অনেকসময়। সুখের এই নিখাদের সুরকেই আমরা বলি আনন্দ এবং তার পিছনে ছুটে মরি। জীবনের যে স্বাভাবিক স্বচ্ছ পরিতৃপ্তি বিশেষ-কোনও ঘটনা নিমিত্ত বা বিষয়ের অপেক্ষা না রেখে সবসময় চেতনার ক্ষেত্র জুড়ে আছে, তাকে মনে করি না-সুখ না-দুঃখরূপী একটা তটস্থ অবস্থা মাত্র। অথচ আনন্দের ওই স্বচ্ছ রূপটিকে মুছেও ফেলতে পারি না ব্যাবহারিক জীবন হতে, কারণ জীবনধারণের ওই আনন্দটুকু অব্যাহত না থাকত যদি, তাহলে প্রাণিমাত্রেই আত্মরক্ষার অমন প্রবল অভিনিবেশ দেখা দিত না। সহজ আনন্দের কাম্যতা সম্পর্কে সচেতন নই বলেই প্রাকৃত সুখ-দুঃখের হিসাবের খাতায় তাকে আমরা জমা করি না। সে-খাতায় লাভের ঘরে বসাই শুধু তীব্র-সুখের অংক, আর যত অস্বস্তি ও দুঃখকে ফেলি ক্ষতির কোঠায়। দুঃখের সামান্য অনুভূতিও তীব্র নিখাদে বেজে ওঠে চেতনায়, কেননা আধারের সহজ ছন্দ অথবা স্বাভাবিক জীবন-প্রবৃত্তির সে অনুকূল নয়। তাই আমরা তাকে অনুভব করি জীবনসত্তার অবমাননারূপে—আমাদের স্বভাব ও আকৃতির অমর্যাদা এবং তাদের 'পরে অনাহূত একটা উপদ্রবরূপে।

কিন্তু দুঃখ অস্বাভাবিকই হ'ক অথবা তার পরিমাণে যতই ইতরবিশেষ থাকুক, তাতে মূল দার্শনিক প্রশ্নের জবাব হয় না। দুঃখের পরিমাণ যা-ই হ'ক না কেন, পূর্বপক্ষী তার অস্তিত্বকেই মনে করে একটা সমস্যা। তার প্রশ্ন, সকলই যদি সচ্চিদানন্দ, তবে দুঃখতাপের অস্তিত্ব মোটেই সম্ভব হয়

কি করে? আসল সমস্যা হয়ে ওঠে আরও ঘোরালো, যখন তার সঙ্গে একটি অপসিদ্ধান্ত জোড়ে সে বিশ্ববহির্ভূত ঈশ্বরপুরুষের কল্পনারূপে এবং একটি উপসিদ্ধান্ত খাড়া করে অধর্ম ও অনর্থের অস্তিত্বরূপে।

তর্কটা তখন দাঁড়ায় এই। সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর অথবা বিশ্বস্রষ্টা চিন্ময়-পুরুষ। কিন্তু সেই ঈশ্বর এমন জগৎ গড়লেন কি করে, যার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের এত দুর্গতি ঘটাচ্ছেন তিনি—দুঃখকে মঞ্জুর করে, অনর্থকে প্রশ্রয় দিয়ে? ঈশ্বর শিবময় যদি, তাহলে কে দুঃখ এবং অনর্থের স্রষ্টা? দুঃখকে জীবের অগ্নিপরীক্ষা বলে ব্যাখ্যা করলেও ধর্মের দায় চোকে না। কেননা তাহলে ঈশ্বরকে বলতে হয় অধার্মিক অথবা ধর্মাতীত। সেক্ষেত্রে তাঁকে জগতের একজন চমৎকার কারিগর অথবা নিপুণ মনোবিদ্ বলে বাহবা দিতে পারি, কিন্তু প্রেমময় শিবময় আরাধ্যদেবতা বলে মানতে পারি না—পারি শুধু তাঁর শক্তির জুলুমকে নত হয়ে স্বীকার করতে, অথবা তাঁর খেয়ালী মেজাজকে কোনরকমে খুশী রাখতে। কারণ, পীড়নযন্ত্রে জীবকে যাচাই করবার কৌশল আবিষ্কার করতে পারে যে, হয় তার নিষ্ঠুরতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নয়তো ধর্মাধর্মবোধই তার নাই। আর তার ধর্মবোধ থাকেও যদি, তাহলেও সে-বোধ তার নিজেরই সৃষ্ট জীবের স্বাভাবিক মার্জিত বোধের চেয়েও খাটো।... ধর্মাধর্মের প্রশ্ন এড়াতে বলতে পারি, দুঃখ জীবের অধর্মপ্রবৃত্তির অপরিহার্য পরিণাম এবং স্বভাবসঙ্গত সাজা। কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় বর্তমান জীবনের সকল বৈষম্যের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তার জন্য ব্যাখ্যাতাকে আশ্রয় করতে হয় কর্ম- ও জন্মান্তর-বাদ, যার মতে এ-জন্মের দুঃখভোগে জীব পায় পূর্বজন্মের পাপের সাজা।...এতেও ধর্মাধর্মসমস্যার আমূল সমাধান হয় না। গোড়ার প্রশ্নটা তবু থেকেই যায় : যে-অধর্মপ্রবৃত্তির দরুন দুঃখভোগের শাস্তি জীবকে মাথা পেতে নিতে হয়, সে-প্রবৃত্তিই বা এল কোথা থেকে—কে সৃষ্টি করল তাকে, কেন করল? তাছাড়া স্পষ্টই যখন দেখছি অধর্মপ্রবৃত্তি বাস্তবিক একটা মানসিক ব্যাধি বা অজ্ঞানের ফল, স্বভাবতই তখন মনে হয়, যা শুধু মনের রোগ বা অবুঝের কাজ, তাকে দণ্ডিত করতে এমন ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া কখনও-বা এমন উৎকট আসুরিক নির্যাতনের অলঙ্ঘ্য বিধান সৃষ্টি করল কে? কর্মফলের তো একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নাই। তাই পরমদেবতাকে পুরুষবিধ কল্পনা করলে কর্মফলের বিধানকে তাঁর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। এইজন্যই বুদ্ধের শাণিত যুক্তি স্ব-তন্ত্র সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরপুরুষের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি। তাঁর মতে পুরুষবিশেষ হবার অর্থই হল অবিদ্যাকবলিত এবং কর্মাধীন হওয়া।

জগদ্ব্যাপারে দুঃখ ও অনর্থের অস্তিত্ব নিয়ে যে জটিল সমস্যা, তার মূলে আছে বিশ্ববহির্ভূত একজন ঈশ্বরপুরুষের কল্পনা। স্বয়ং বিশ্বরূপ তিনি

নন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ব্যবস্থা করে সে-ব্যবস্থায় অপরামৃষ্ট থেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের ঊর্ধ্বে এবং সেখান হতে দুঃখহত আয়াসক্লিষ্ট বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ ও শাসন করছেন তাঁর অপ্রতিহত ইচ্ছার প্রশাসনে। অথবা ইচ্ছার প্রশাসন যদি না থাকে তাঁর, এ-জগদ্ব্যাপারের মূলে যদি থাকে শুধু এক অনতিবর্তনীয় নিয়তির অকরুণ তাড়না, তাকে সুসহ করবার সামর্থ্য বা নৈপুণ্য তাঁর না-ই থাকে যদি—তাহলে মঙ্গলময় প্রেমময় তো দূরের কথা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেই-বা মানব তাঁকে কোন্ যুক্তিতে? বাস্তবিক, ঈশ্বরের ধর্মদায় আছে অথচ তিনি বিশ্ববহির্ভূত—এ-কল্পনায় জগতের সন্তাপ ও অনর্থের সমস্যা মেটে না। সন্তাপ ও অনর্থের সৃষ্টি কেন, এ-প্রশ্নের জবাবে তখন হয় আসল সমস্যাটাকে ধামাচাপা দিয়ে খাড়া করি একটা বাজে ওজর, নয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অখণ্ড ঈশ্বর-সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করি প্রতীচ্য দ্বৈধবাদীদের মত—তাঁর লীলার সাফাই বা কাজের জবাবদিহির জন্যে। কিন্তু এমন ঈশ্বর তো বেদান্তের সচ্চিদানন্দ নন। বেদান্ত সচ্চিদানন্দ বলছে যাঁকে, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—বিশ্বের যা-কিছু সমস্তই তিনি। অতএব দুঃখ ও অনর্থ থাকে যদি, তাহলে নিজেকে সৃষ্ট জীবে রূপায়িত ক'রে তিনিই হবেন তার ভোক্তা। একথা মানলে সমস্ত সমস্যাটার রং বদলে যায়। তখন আর এ-প্রশ্ন ওঠে না, ঈশ্বরে যে অনর্থ-সন্তাপ সম্ভবে না, অতএব তিনি স্বয়ং যার দ্বারা অপরামৃষ্ট, কেমন করে তাঁর সৃষ্ট জীবের ভাগ্যে তা বিধান করবেন তিনি? প্রশ্নটা তখন ঘুরে দাঁড়ায় এই আকারে : অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দের মধ্যে কি করে দেখা দিল নিরানন্দ, কোথা হতে এল তাঁর আত্মস্বরূপের একান্তবিরোধী এই প্রত্যয়?

এই যদি হয় প্রশ্নের ধরন, তাহলে ঈশ্বরের ধর্মদায়ের খটকা অর্ধেক চুকে যায়, সমস্যাটাকে তখন আর অসমাধেয় মনে হয় না। তখন নৈর্ঘৃণ্যের অভিযোগ আনাই চলে না ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। অপরকে আমি নিষ্ঠুর হয়ে দুঃখ দিলাম, সে-দুঃখের আঁচ আমার গায়ে লাগল না। অথবা কাল বয়ে গেলে পর করুণা বা অনুশোচনা উথলে উঠল যখন, তখন তাদের দুঃখের ভাগী হলাম—এ হল এক কথা। আর আমিই আমাকে দুঃখ দিচ্ছি, কেননা কেউ নাই জগতে আমি ছাড়া—এ হল আরেক কথা। তবু ধর্মদায়ের কথাটা একেবারে চোকে না। সেটা মোলায়েম হয়ে দেখা দেয় এইভাবে : যিনি আনন্দময়, নিশ্চয় তিনি কল্যাণময় ও প্রেমময়। তাহলে অনর্থ-সন্তাপ কি করে থাকতে পারে তাঁর মধ্যে, কেননা তিনি তো পরতন্ত্র বা যন্ত্রারূঢ় নন। তিনি স্ব-তন্ত্র এবং চিন্ময়, অতএব অনর্থ ও সন্তাপকে হেয়জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করবার স্বাতন্ত্র্যও তাঁর নিশ্চয়ই আছে। কথাটা এভাবে তুললেও একে অপসিদ্ধান্তই বলতে হবে, কেননা এর মধ্যে একদেশিদৃষ্টিকে ভুল করে দেওয়া হয়েছে একটা সমগ্রদৃষ্টির

আকার। আনন্দময়ের স্বরূপে যে প্রেম ও কল্যাণের কল্পনা আরোপ করেছি আমরা, তার মূল কিন্তু রয়েছে আমাদেরই দ্বৈতবোধের খণ্ডবৃত্তিতে। প্রেম ও কল্যাণকে আমরা জানি জীবের সঙ্গে জীবের অন্যোন্যসম্পর্করূপে। তবু সেই দ্বৈতস্পৃষ্ট সম্বন্ধকে বারবার আরোপ করছি এমন প্রসঙ্গে অখণ্ড-অদ্বয়ের সর্বাত্মভাব যার গোড়ার কথা। কিন্তু সমস্ত সমস্যাটাকে আমাদের বিচার করতে হবে একটা মূল সূত্র ধরে—ভেদাভেদের দৃষ্টি নিয়ে। গোড়ার কথাটা একবার পরিষ্কার হয়ে গেলে সমস্যার যেগুলি ডালপালা—যেমন জীবের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক—তার মীমাংসা খণ্ডবোধ ও দ্বৈতদৃষ্টি নিয়ে করলেও তখন আটকাবে না।

মানুষী দৃষ্টিতে মানুষের খটকার বিচার না করে অখণ্ডদৃষ্টির সমগ্রতা নিয়ে দেখি যদি, তাহলে স্বীকার করতেই হয়, জগদ্ব্যাপারে ধর্মাধর্মের প্রশ্নটা নিতান্তই গৌণ। চিরকাল মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সকল বিধানে খুঁজে এসেছে তার কল্পিত ধর্মসংহিতার অনুশাসন এবং এমনি করে স্বেচ্ছায়, শুধু জেদের বশে নিজেকে বিভ্রান্ত করছে। সংকীর্ণ মানবীয় সংস্কার নিয়ে নিজের মনগড়া আদর্শের মানদণ্ডে সব-কিছুকে বিচার করা, নিজের ক্ষুদ্র অহংকেই প্রতিবিম্বিত দেখা বিশ্বের সকল ব্যাপারে—এই তো হল মানুষের দুর্ভোগ। এইজন্যই তো সত্যজ্ঞান হতে সে বঞ্চিত, অখণ্ড দর্শন তার পক্ষে এত দুর্ঘট। জড়প্রকৃতির কোনও ধর্মদায় নাই। তার মধ্যে যে নিয়মের শাসন, সে শুধু চিরাচরিত অভ্যাসের একটা সমাহার—ভাল-মন্দের প্রশ্ন ওঠেই না তার বেলায়। সেখানে শক্তির নিরঙ্কুশ লীলা শুধু। শক্তিই গড়ছে, গুছিয়ে তুলছে, জিইয়ে রাখছে সব-কিছু। আবার শক্তিই ওলটপালট করে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সব—কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে, ভালমন্দের কোনও পরোয়া না করে, শুধু তার গুহাহিত সংকল্পের বশে, নিজেকে নিয়ে ভাঙাগড়ার একটা নীরব খেয়ালখুশির তাগিদে। তেমনি প্রাণপ্রকৃতিরও কোনও ধর্মদায় নাই—পশুর জগতে অন্তত। তবে কিনা প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে দেখা দেয় উন্নততর জীবের ধর্মপ্রবৃত্তির নিতান্ত কাঁচা একটা বনিয়াদ। বাঘ যদি শিকার ধরে খায়, তার জন্য তাকে আমরা দুষি না—যেমন ধ্বংস-তাণ্ডবের জন্য ঝড়কে দায়ী করি না অথবা অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে পুড়িয়ে মারলেও আগুনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাই না। বাঘে ঝড়ে বা আগুনে গোপন রয়েছে যে-চিৎশক্তি, অনর্থ ঘটিয়েছে বলে তারও কোনও আফসোস বা ধিক্কারবোধ নাই। দূষণ ও ধিক্কার হতে, বিশেষত আত্মদূষণ ও আত্মধিক্কার হতেই সত্যকার ধর্মবোধের শুরু। নিজেকে রেহাই দিয়ে শুধু অপরকে দুষি যখন, তখন ধর্মবোধের নজিরে আমরা তা করি না। যা অসুখকর বা অনিষ্টকর, তার প্রতি চিত্তের বিরাগ বা জুগুপ্সার উদ্বেলনকেই ধর্মানুশাসনের পরিভাষায় এমনি করে ব্যক্ত করি।

ধর্মবোধের নিদান হলেও এই জুগুপ্সা বা বিরাগকেই ধর্মবোধ বলা চলে না। বাঘ দেখে হরিণের যে-ভয়, অথবা আততায়ীর প্রতি বলদৃপ্তের যে-আক্রোশ, জিঘাংসুর প্রতি সে শুধু ব্যক্তিপ্রাণের আনন্দ-সত্তায় উদ্বেল জুগুপ্সার একটা ঢেউ। মানসিক প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এই জুগুপ্সাই সংস্কৃত হয়ে ধরে উৎকট ঘৃণা বিরাগ ও অননুমোদনের রূপ। অনিষ্টের আশংকা আছে যাতে, তাকে আমরা অনুমোদন করি না। আবার যা অহংকে তৃপ্ত করে, তাকে পছন্দই করি। এই পছন্দ না-পছন্দের ব্যাপারটা ক্রমে পরিণত হয় ভাল-মন্দের ধারণায়—প্রথমত নিজের ও নিজের সমাজের সম্পর্কে, তার পর পরের ও পরের সমাজের সম্পর্কে এবং অবশেষে কল্যাণের সামান্যত অনুমোদনে এবং অকল্যাণের সামান্যত অননুমোদনে। কিন্তু পরিণামের সমগ্র-ধারার মধ্যেই একটা মূল সুর বরাবর অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মানুষ নিজেকে ফোটাতে চায় ফলাতে চায় অর্থাৎ সে খোঁজে তার আধারে নিহিত চিৎশক্তির অকুণ্ঠ আপ্যায়ন। এই আনন্দের সুরে বাঁধা তার জীবনযন্ত্র। যা-কিছু আঘাত হানে এই ফুল-ফোটানো ফল-ধরানোর তপস্যায়, এই আত্ম-আপ্যায়নের পরিতৃপ্তিতে, তা-ই তার কাছে অনর্থ; এবং যা-কিছু এই আত্মরতিসাধনার অনুকূল সমর্থক ও পোষক, যা-কিছু একে উপচিত ও মহিমময় করে, তা-ই তার কাছে কল্যাণ। কেবল এই একটা ভেদ দেখা দেয় প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে—নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার ধরনটা তার বদ্‌লে যায়। ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে ক্রমেই নিজেকে সে ছড়িয়ে দেয় অপরের মধ্যে, এমন-কি নিখিল বিশ্বকেই একদিন সে বাঁধতে চায় তার উদার আলিঙ্গনে।

তাহলে কথাটা এই। ধর্মবোধ দেখা দেয় প্রকৃতিপরিণামের একটা বিশেষ পর্বে। কিন্তু সমস্ত পর্বের মধ্যেই অনুস্যূত রয়েছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আত্মরূপায়ণের প্রেতি। এই প্রেতি প্রথমত ধর্মহীন—যেমন জড়ে। তারপর ধর্মাভাসযুক্ত—যেমন ইতর প্রাণীতে। অবশেষে বুদ্ধিমান জীবে কখনও-বা ধর্মবিরোধী—যেমন, নিজে যে-দুঃখ আমরা সইতে নারাজ, অপরকে যখন সে-দুঃখ দেওয়া মঞ্জুর করি। মানুষী ভূমির নীচে যা-কিছু ঘটছে, তা যেমন ধর্মাভাসযুক্ত, তেমনি তার ঊর্ধ্বে এমন ভূমিও আছে যা ধর্মাতীত—অর্থাৎ ধর্মের অনুশাসন নিষ্প্রয়োজন সেখানে। একদিন এই ভূমিতেই আমরা পৌঁছব। মনুষ্যত্বের সাধনায় ধর্মবুদ্ধি ও ধর্মপ্রকৃতির একটা বিশেষ স্থান থাকলেও উত্তরায়ণের পথে এ একটা তটস্থ বৃত্তি মাত্র। অচিতির যে সর্বগত অবর-সৌষম্য প্রাণের অভিঘাতে ব্যক্তিগত বৈষম্যে পরিকীর্ণ হয়েছে, তার দ্বন্দ্ব হতে মনুষ্যত্বকে নির্মুক্ত করে সর্বাত্মভাবের সর্বগত উদার সৌষম্যে উত্তীর্ণ করবার সাধনরূপেই ধর্মবোধের যা-কিছু সার্থকতা। কিন্তু ওই উদারভূমিতে এসে যে পৌঁছেছে, তার পক্ষে এ-সাধনকে মর্যাদা দেওয়া অনাবশ্যক—এমন-কি

অসম্ভব। কারণ, যেসব গুণের অনুশীলন ও যেসব দ্বন্দ্বের প্রতিঘাত এর আশ্রয়, সহজেই তারা আপনাকে হারিয়ে ফেলে পরম-সামরস্যের ছন্দঃসুষমায়।

অতএব ধর্মাধর্মবোধের যত গৌরবই থাকুক, সে যদি হয় বিশ্বভাবনার এক পর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে চেতনাকে উত্তীর্ণ করবার সাময়িক সাধন মাত্র, তাহলে বিশ্বের সমগ্র রহস্যের সমাধান তাকে দিয়ে হতে পারে না—তাকে শুধু সমাধানের অন্যতম উপকরণরূপেই গণ্য করা চলে। তা যদি না করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল তথ্য বিকৃত হয়ে দেখা দেবে মিথ্যার ছায়াপাতে, পূর্বাপর বিশ্বপরিণামের সকল তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ হবে সংকীর্ণ বুদ্ধির ক্লিষ্ট বিচারে, বিশ্বব্যবস্থার মূল্যানিরূপণ করতে গিয়ে সীমিত কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন একটা অর্ধপক্ক দর্শনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। জগতের তিনটি স্তর —অ-ধর্ম্য বা ধর্মাভাসিত, ধর্ম্য এবং ধর্মাতীত। এই তিনটি বিভাবের মধ্যে অধিষ্ঠানরূপে অনুস্যূত রয়েছে যে-ভাব, শুধু তাকে দিয়েই বিশ্বসমস্যার সম্যক সমাধান হতে পারে।

দেখেছি, তিনটি ভূমিতেই অনুস্যূত এই এক ভাব : নিখিল সত্তার অবিনাভূত চিৎশক্তিতে রয়েছে আত্মরূপায়ণের আকূতি এবং তার চরিতার্থ-তাতেই তার আনন্দ। স্বয়ম্ভূসত্তার আনন্দস্বভাবেই ফুটল চিৎশক্তির আদি প্রবর্তনা, কেননা এই তার স্বরূপ আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। কিন্তু যে নবরূপায়ণের আকূতি রয়েছে তার মধ্যে, উত্তরায়ণের পথে তাকে সার্থক করবার প্রচেষ্টাতে দেখা দেয় দুঃখ-তাপের প্রতিভাস—যাকে মনে হয় চিৎশক্তির স্বারসিকী বৃত্তির বিরোধী যেন। সমস্যার মূল এইখানেই।

কি করে এর সমাধান হবে? বলব কি : সচ্চিদানন্দ বিশ্বের আদি ও অবসান নয়—এক মহাশূন্য জুড়ে আছে তার দুটি অন্ত। সে-শূন্যতা স্বয়ং অসৎ হয়েও অপক্ষপাতে আপন নাস্তিত্বের গহনগুহায় বহন করছে সত্তা ও অসত্তা, চেতনা ও অচেতনা, আনন্দ ও অনানন্দের সম্ভাবনা।...ইচ্ছা করলে আমরা এ-সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারি। কিন্তু শূন্যবাদ দিয়ে সব-কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আসলে আমরা কিছুই ব্যাখ্যা করিনি, সবাইকে ঘিরে এঁকে রেখেছি শুধু একটা বৃত্ত। যা অভাবমাত্র, সে-ই হল সর্বভাবের প্রসূতি—এ-উক্তিতে পাই বাস্তব বা কাল্পনিক স্বতোবিরোধের চূড়ান্ত পরিচয়। অতএব এ-ব্যাখ্যাতে বৃহৎ বিরোধ দিয়ে ক্ষুদ্র বিরোধকে ঠেকিয়ে রাখা হয় শুধু, তাতে তত্ত্বমীমাংসা না হয়ে স্বতোবিরোধটাই এসে চরমে ঠেকে। যা সর্বশূন্য, তা ফাঁকা অনস্তিত্বমাত্র, কোনও-কিছুর স্বরূপযোগ্যতা থাকাও তার মধ্যে সম্ভব নয়। আর সর্ববিধ স্বরূপযোগ্যতার প্রতি অপক্ষপাত রয়েছে যে-নির্বিশেষের তাকে বলি অব্যাকৃত। অসৎ-বাদে আমরা শূন্যের মধ্যে অব্যাকৃতকে স্থাপন করি মাত্র, কিন্তু সেখানে তার ঠাঁই হয় কি করে তার কোনও ব্যাখ্যা দিই না।

তাই শুদ্ধবুদ্ধি কিছুতেই এ-দর্শনে সায় দিতে পারে না, কেননা সর্বনিষেধের দ্বারা এক মহানিষেধে পৌঁছনো বস্তুত অতত্ত্বেরই উপাসনা। এ-উপাসনা বুদ্ধির একটা সাময়িক প্রয়োজন হলেও কখনও তার স্বভাবের গতি এদিকে নয়। অতএব অসৎ-বাদকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমরা ফিরে যাব অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্বীকৃতিতে এবং দেখব তাঁকে ভিত্তি করে বিশ্বসমস্যার পূর্ণতর সমাধান খুঁজে পাই কি না।

একটা ধারণা পরিষ্কার করে নিতে হবে গোড়াতেই। বিশ্বচেতনার কথা বলেছি যখন, তখন সে যে প্রাকৃতমানুষের মনোময় জাগ্রৎচেতনা হতে স্বতন্ত্র, তারও চেয়ে গভীর এবং উদার, এ-সম্পর্কে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না আমাদের। তেমনি যখন বলি শুদ্ধ-সত্তার সর্বগত আনন্দের কথা, তখন আমরা ব্যক্তি-চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস বা ইন্দ্রিয়তর্পণে যে প্রাকৃত সুখ, তাহতে স্বতন্ত্র তারও চেয়ে গভীর উদার ও স্বরূপানুগত একটা-কিছুর ইঙ্গিতই করি। সুখ হর্ষ আনন্দ প্রভৃতির পরিচিত সংজ্ঞা মানুষের চেতনায় একটা সংকীর্ণ ও নৈমিত্তিক স্পন্দনমাত্র। তাদের আশ্রয় ও নিদান হল চিরাভ্যস্ত কতগুলি সংস্কার, এবং একটা বিজাতীয় অধিষ্ঠান হতেই তাদের উদ্ভব। দুঃখ-শোক এর বিপরীত-বৃত্তি হলেও তাদেরও এই ধর্ম। কিন্তু সন্মাত্রের আনন্দ সর্বগত অপরিমেয় এবং স্বয়ম্ভূ, কোনও বিশেষ নিমিত্তের 'পরে তার নির্ভর নয়। সকল অধিষ্ঠানের পরম অধিষ্ঠান সে—যাকে আশ্রয় করেই চেতনায় ফোটে সুখ দুঃখ এবং তারও চেয়ে লঘু কত তটস্থবৃত্তির অনুভব। এই সন্মাত্রের আনন্দ যখন রূপায়িত হতে চায় সম্ভূতির আনন্দে, তখন শক্তিস্পন্দে সে স্পন্দিত হয় এবং তার বিচিত্র স্পন্দনে ঝঙ্কৃত হয় সুখ ও দুঃখের বাদী ও বিবাদী দুটি সুর। জড়ে এ-আনন্দ অবচেতন, উন্মনীতে অতিচেতন; শুধু মন ও প্রাণের মধ্যে নিজেকে এ চায় ফুটিয়ে তুলতে সম্ভূতির লীলায়নে, স্পন্দবৃত্তির উপচীয়মান আত্মসচেতনতায়। প্রথমে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অবিশুদ্ধ দ্বন্দ্ববিধুর প্রবৃত্তি—সুখ-দুঃখের দুটি মেরুর মাঝে ঢেউয়ের একটা দোলা। কিন্তু তার চরম লক্ষ্য হল নিজেকে উদ্ভাসিত করে তোলা শুদ্ধ-সত্তার স্বয়ম্ভূ নির্বিষয় অহেতুক পরমানন্দের দিব্যজ্যোতিতে। নরের মধ্যে থেকেই চলেছে যেমন সচ্চিদানন্দের উদয়ন বৈশ্বানর অনুভবের অভিমুখে, দেহ-মনের রূপায়ণেই যেমন অভিযান তাঁর অরূপ চেতনার লোকোত্তর ভূমিতে—তেমনি বিষয়-বিষয়ীর এই বিচিত্র চঞ্চল বর্ণরতির ভিতর দিয়েই আবার চলেছেন তিনি সর্বগত নির্বিষয় স্বয়ম্ভূ দিব্যরতির অনির্বচনীয় আস্বাদনের দিকে। আজ বিষয়কে খুঁজছি আমরা ক্ষণিক তৃপ্তি ও সুখের উৎসরূপে। কিন্তু স্ব-তন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ হব যখন, তখন আর বাইরে না খুঁজে নিজের মধ্যেই দেখতে পাব তাদের—শাশ্বত আনন্দের নিদানরূপে নয়, দর্পণরূপে।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানুষের মধ্যে চেতনা ফুটেছে মনোময় পুরুষরূপে জড়ের তমঃসম্পুটকে বিদীর্ণ করে। শুদ্ধ-সত্তার আনন্দ তটস্থ, অর্ধস্ফুট, অবচেতনার ছায়ালোকে দুর্লক্ষ্য তার কাছে। সে-আনন্দের উর্বর ক্ষেত্র তার মধ্যে ছেয়ে গেছে বাসনার বিষাক্ত আগাছায়—কী উচ্ছ্বসিত তার সমারোহ! সুখ-দুঃখের অভিঘাতে বিষ-বল্লরীর মঞ্জরীতে সে কী বর্ণচ্ছটা অহংবিধুর চেতনায়। চিৎশক্তির নিগূঢ় বীর্য নির্মূল করবে যখন বাসনার এই প্রমত্ত উপচয়—ঋগ্বেদের ভাষায়, অগ্নিদেব নিঃশেষে দগ্ধ করবেন পৃথিবীর বুকে উদ্ভিন্ন কামনার বন—তখন এই সুখ-দুঃখের মর্মমূলে নিহিত ছিল যে-প্রাণরস আনন্দের গোপন সঞ্চয়রূপে, তা উৎসারিত হবে—বাসনার নবরূপায়ণে নয়, স্বয়ম্ভূসত্তার স্বারসিকী তৃপ্তিরূপে। মর্ত্য সুখের পেয়ালা তখন রূপান্তরিত হবে অমরের সুধাপাত্রে। আর এ-রূপান্তরও অসম্ভব নয়। কেননা, মানুষের চেতনা-বেদনায় সুখ-দুঃখের এই-যে উদ্বোধন, বস্তুত এ তো সেই আনন্দসত্তারই গভীর দোলা। হ'ক সুখ, হ'ক দুঃখ—সেই মহাসিন্ধুর বাণীকেই তারা রূপ দিতে চায়—কিন্তু কুণ্ঠাহত হয়ে ফিরে যায় অহমিকা খণ্ডবোধ ও আত্ম-অবিদ্যার কুটিল অভিঘাতে।

দ্বাদশ অধ্যায়

আনন্দরূপং যদ্ বিভাতি

(সমাধান)

তদ্ধ তদ্বনং নাম। তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।

কেনোপনিষৎ ৪।৬

সে-বস্তুর আনন্দ হল নাম; তাকে আনন্দ জেনেই আমরা করব তার উপাসনা—খুঁজব তাকে।

—কেন উপনিষদ (৪।৬)

যদি বুঝতে পারি, ব্রহ্মসত্তার সর্বানুস্যূত অব্যভিচারী আনন্দের অতল পারাবারই বহিশ্চর প্রাকৃত-চেতনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে অনুকূল প্রতিকূল বা তটস্থ সংবেদনের ফেনিল বিক্ষোভে, তাহলে সেই সর্বগত আনন্দভাবনার মধ্যেই খুঁজে পাই আমাদের কল্পিত সমস্যার সুচারু সমাধান। এক অনন্ত অবিভাজ্য সত্তাই বিশ্বের সকল বস্তুর আত্মস্বরূপ। সেই সত্তার স্বরূপশক্তি স্ফুরিত হয় তার বিচিত্র স্বয়ংপ্রজ্ঞ স্বভাবের ক্ষয়হীন নিরন্ত সংবেগে। আবার সেই স্বয়ংপ্রজ্ঞার স্বরূপ ফোটে অব্যভিচারী আনন্দভাবের অনন্ত সমুল্লাসে। রূপে-অরূপে, অখণ্ড আনন্ত্যের শাশ্বত সংবিতে অথবা সান্ত খণ্ডতার বহুরূপী প্রতিভাসে এই আত্মারাম স্বয়ম্ভূসত্তার স্বরূপানন্দ রয়েছে নিত্য নিরঙ্কুশ। আমাদের চেতনা যখন বহির্বৃত্ত সংস্কারের দাসত্ব এবং স্বানুভবের বিশিষ্ট পর্যায়ের সঙ্কীর্ণ বন্ধন কাটিয়ে ওঠে, তখন আপাত-অচেতন জড়ের মধ্যেও সে যেমন আবিষ্কার করে অটল-অচল অনন্ত চিৎশক্তির নিরূঢ় আবেশ, তেমনি জড়ের আপাত-অসাড়তার মধ্যেও দেখতে পায়—তারই স্বভাবের সুরে বাঁধা এক অনন্ত চিন্ময় আনন্দের অক্ষোভ্য উল্লাস ছেয়ে আছে বিশ্বচরাচর। এই আনন্দ আত্মারামের আনন্দ, এই স্বরূপজ্যোতি সর্বগত আত্মস্বরূপের জ্যোতি। কিন্তু আমাদের বহিশ্চর প্রাকৃতচেতনায় বস্তুস্বভাবের যে-রূপ জাগে, তার কাছে এই স্বরূপানন্দ নিগূঢ় গুহাহিত অবচেতন। এ-আনন্দ যেমন অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে সকল আধারে, তেমনি নিবিড় হয়ে আছে সুখময় দুঃখময় বা উদাসীন সকল অনুভবে। ঘটে-ঘটে এমনি নিগূঢ় গুহাহিত ও অবচেতন থেকেই সে তার আত্মবীর্যে সবার আত্মভাবকে রেখেছে অপ্রচ্যুত। এই আনন্দই তো বিশ্বের অণুতে-অণুতে ফুটিয়ে তুলছে আত্মভাবের প্রতি সেই সর্বাতিভাবী

অভিনিবেশ, নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সেই অদম্য আকূতি—যা প্রাণের মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মরক্ষার নিসর্গবৃত্তিরূপে, স্থূলে ফুটেছে জড়ের অবিনশ্বর স্বভাবে। আবার মনের মধ্যে সে-ই জাগিয়েছে অমরত্বের বেদন, ঘটে-ঘটে অবিচ্ছেদ্য হয়ে যা জড়িয়ে আছে আত্মপরিণামের সকল পর্বে। এমন-কি আত্মহত্যার সাময়িক প্রবৃত্তিও অমৃতপিপাসারই একটা তির্যক প্রকাশ মাত্র। কেননা সেখানেও জীব সত্তার বিলোপ চায় না—সত্তার রূপান্তরই কাম্য বলে বর্তমান সত্তার প্রতি তার ওই জুগুপ্সা। অতএব আনন্দই আত্মভাব, আনন্দই সৃষ্টির রহস্য, আনন্দই ভবের প্রবর্তক, আনন্দই আত্মভাবের বিধৃতি, আনন্দেই ভবের নিবৃত্তি সৃষ্টির প্রলয়। তাই উপনিষদ বলেন, 'আনন্দ হতেই জন্ম নেয় সকল ভূত, আনন্দেই বেঁচে থেকে বেড়ে চলে তারা, আবার আনন্দের দিকেই তাদের মহাপ্রয়াণ।'

সৎ চিৎ আনন্দ—ব্রহ্মস্বরূপের এই পরিচয় বস্তুত একটি অখন্ড মহাভাব মাত্র। কিন্তু মনের কাছে সে ত্রয়ী, প্রাতিভাসিক জগতে অথবা খণ্ডিত-চেতনার প্রবৃত্তিতে সে বিভক্তবৎ। তাই তত্ত্বদর্শনের পরেও খন্ডবুদ্ধির সংস্কারবশে দেখা দেয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান এবং আবহমানকাল চলে তাদের কত খন্ডন-মন্ডন। সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের কাছে অখন্ডের সকল বিভাবই আনে এক তুরীয় মহাভাবের ব্যঞ্জনা, অতএব দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানে বিচিত্র ভঙ্গিতে বেজে ওঠে একই রাগিণী। অখন্ড অন্বয় সচ্চিদানন্দের অপরোক্ষ অনুভবই জগৎ সম্পর্কে এদেশে সৃষ্টি করেছে মায়াবাদ, প্রকৃতিবাদ ও লীলাবাদ। আপাত-দৃষ্টিতে তিনটি বিভিন্ন বাদ। কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে তারা অভিন্ন, কেননা বস্তুত তারা একই অখন্ড ভাবের তিনটি বিভাব মাত্র। জগৎসত্তাকে যখন জানি প্রতিভাসরূপে, অর্থাৎ অখন্ড অনন্ত নির্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মসত্তার প্রতিযোগি-রূপে শুধু, তখন যদি তাকে দেখি বলি বা অনুভবও করি মায়া বলে, সে কি অসংগত? কিন্তু মায়ার প্রাচীন অর্থ ছিল সর্বাধার প্রজ্ঞা বা সম্ভূতিসংবিৎ—যা জড়িয়ে থেকেই মিত সীমিত করছে সকল-কিছু, অতএব যার মধ্যে আছে কৃতিশক্তিরও পরিচয়। মায়া রচে আকৃতি, রচে পরিমাণ—অরূপের সে রূপকৃৎ। চিত্তের বিভাবনায় অবিজ্ঞেয়কে যেন সে করে জ্ঞানগম্য, দেশের বিভাবনায় অমেয়কে যেন করে সে মেয়। অর্থের অপকর্ষে ক্রমে মায়া প্রজ্ঞা দক্ষতা ও বুদ্ধি না বুঝিয়ে বোঝাতে লাগল চাতুরী বঞ্চনা বা বিভ্রম। আধুনিক দর্শনে মায়ার এই বিভ্রম বা ইন্দ্রজালের অর্থই চলছে।

এ-জগৎ মায়া। কিন্তু জগতের কোনও সত্তাই নাই, এ-অর্থে জগৎ মায়া নয়, মিথ্যা নয়। কারণ, জগৎ ব্রহ্মের স্বপ্নও যদি হয়, তবু স্বপ্নরূপেই তাঁর মধ্যে তার সত্তা থাকবে। চরমে মিথ্যা হলেও আপাতত তাঁর স্বপ্ন তো সত্যই তাঁর কাছে।...আবার একথাও বলা চলে না, জগৎ মিথ্যা, কেননা তার কোনও

শাশ্বত সত্তা নাই। সত্য বটে, বিশেষ-কোনও জগৎ এবং বিশেষ-কোনও রূপের প্রলয় ঘটতে পারে বা ঘটেও স্থূলত, মনোময় চেতনায় ব্যক্তদশা হতে অব্যক্তদশায় তারা লীনও হতে পারে। কিন্তু তাহলেও তত্ত্বের দিক দিয়ে রূপ বা জগৎ তো শাশ্বতই। ব্যক্ত হতে অব্যক্তে লীন হয়েও আবার তারা ব্যক্তদশায় ফিরে আসে। সুতরাং শাশ্বত সম্ভাব না থাকলেও শাশ্বত আবৃত্তি তাদের আছেই। ব্যষ্টি বিভাব এবং প্রতিভাসের দিক দিয়ে তাদের শাশ্বত বিপরিণাম যেমন, তেমনি সমষ্টিভাব এবং প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে তারা শাশ্বত অপরিণামী। এমন কথা নিশ্চয় করে বলতেও পারি না যে, শাশ্বত-চিন্ময় সন্মাত্রে বিশ্বের কোনও রূপ কি স্বভাবের কোনও লীলা স্বানুভবগোচর ছিল না বা থাকবে না—এমন কালও সম্ভব। বরং আমাদের সহজ বুদ্ধি এই কথাই বলে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ তৎ-স্বরূপ হতে আবির্ভূত হয়ে আবার তাতেই লীন হয়। অনন্তকাল ধরেই এই লীলা চলছে।

তবু জগৎ মায়ামাত্র, কেননা অনন্তসত্তার এই তো স্বরূপসত্য নয়। এ শুদ্ধ চিদাত্ম-স্বভাবের একটা বিসৃষ্টি। অবশ্য সে-বিসৃষ্টি অসতের ভূমিকায় অসৎ হতে অসতের বিসৃষ্টি নয়—স্বাত্মভাবের শাশ্বত সত্য হতে শাশ্বত সত্যের ভূমিকাতেই তার রূপায়ণ। সদ্‌ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্বই এ-জগতের আধার যোনি এবং উপাদান। এর রূপবৈচিত্র্য তৎ-স্বরূপেরই চিন্ময় সিসৃক্ষার অনুগত আত্মরূপায়ণের বিভঙ্গ—তাঁর স্বানুভবের ভূমিকায়। অবন্ধন সে রূপায়ণের লীলা—কেননা সে-রূপ ফুটতে পারে, না ফুটতে পারে, খেয়ালখুশিতে আর-কিছু হয়েও ফুটতে পারে। তাই এ-রূপের মেলাকে বলতেও পারি বটে অনন্ত চেতনার ভ্রান্তিবিলাস। কিন্তু সে হবে শুধু আমাদের অসহায় পঙ্গু-মনের বিভ্রান্ত ছায়াকে স্পর্ধাভরে বিসর্পিত করা তার 'পরে—যা মনেরও অতীত বলে অসত্য বা বিভ্রমের লেশমাত্র নাই যার মধ্যে। অতএব, শুদ্ধসত্তার স্বরূপধাতু যখন অনৃতস্পৃষ্ট হতে পারে না কখনও, আমাদের খণ্ডিত চেতনার সকল ভ্রান্তি ও বিকৃতির মধ্যেও যখন ফুটে ওঠে অখণ্ডচিন্ময় সন্মাত্রের সত্যাবিভূতির কিছু-না-কিছু আভাস, তখন জগৎ সম্পর্কে আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি—জগৎ তৎ-পদার্থের স্বরূপসত্য না হলেও তার মধ্যে আছে তার নিরঙ্কুশ বহু-ভাবনা ও অন্তহীন আপাতবিপরিণামের প্রাতিভাসিক সত্য। তাঁর স্বরূপগত অপরিণামী অদ্বয়ভাবের সত্য জগতে প্রকট নয় বলেই জগৎ মায়া।

এই গেল সদ্‌ব্রহ্মের প্রতিযোগিরূপে জগৎসত্তার বিচার। কিন্তু জগৎ-সত্তাকে আমরা আবার দেখতে পারি চৈতন্য ও চিৎশক্তির প্রতিযোগিরূপে। তখন আমাদের দৃষ্টি অনুভব ও বিবৃতিতে জগৎ হবে একটা শক্তিস্পন্দ—যার মূলে আছে কোনও নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রশাসন, অথবা অধিষ্ঠান বা

সাক্ষিচৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু কোনও দুর্জ্ঞেয় নিয়তির প্রবর্তনা। তখন জগৎকে বলি প্রকৃতির খেলা—লক্ষ্য তার দ্রষ্টা ও ভোক্তা পুরুষের তৃপ্তিসাধন। অথবা পুরুষেরই খেলা সে—শক্তির স্পন্দলীলায় নিজেকে উপরক্ত করে অবিবেকদ্বারা তার আস্বাদনই সে-খেলার সাধন। অর্থাৎ এ-জগৎ নিখিল-জননী মহাপ্রকৃতির লীলা। অনন্তরূপে আপনাকে রূপায়িত করে, অফুরন্ত রসাস্বাদের আকৃতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছেন তিনি কে জানে কার নিগূঢ় প্রবর্তনায়!

আবার জগৎসত্তাকে যদি জানি শাশ্বতসন্মাত্রের স্বরূপানন্দের ভূমিকায় রেখে, তাহলে তাকে দেখব বলব ও অনুভব করব লীলা বলে। নিখিলের 'বন্ধুরাত্মা' যে-চিরকিশোর, এ-বিশ্বলীলায় তিনিই 'শিশু ভোলানাথ'। তিনিই নটরাজ, তিনিই কবি, তিনিই স্রষ্টা—তাঁরই অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস হিল্লোলিত হয়ে চলেছে রূপে-রূপে। আত্মরূপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজের মধ্যেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি অক্লান্ত ছন্দোলীলায়। এ-আনন্দ মেলায় তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ।

এমনি করে অচল-অটল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শাশ্বত ভূমিকায় দেখলাম বিশ্বলীলার তিনটি সামান্য-রূপ—এদেশে যারা মায়াবাদ প্রকৃতিবাদ ও লীলা-বাদের অন্যোন্যবিরোধী দর্শনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বস্তুত তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নাই, কেননা সমগ্রভাবে দেখলে তারা পরস্পরের আপূরক এবং জীবন ও জগতের সম্যক্-দৃষ্টির পক্ষে তুল্যপ্রয়োজন। যে-জগতের অঙ্গীভূত আমরা, আপাতদৃষ্টিতে তাকে শক্তিস্পন্দরূপে দেখছি। কিন্তু সেই শক্তির প্রতিভাসকে ভেদ করে দৃষ্টি যদি তার মর্মমূলে অনুবিদ্ধ হয়, তখন সেখানে দেখি এক চিন্ময়ী সিসৃক্ষার ধ্রুব অথচ নিত্য-বিপরিণামী ছন্দোদোলা। সে-চিন্ময়ী নিজের মধ্যেই উৎক্ষিপ্ত প্রসর্পিত করে চলেছে তার অনন্ত শাশ্বত আত্মভাবের ঋতময় প্রতিভাস। আর ছন্দোদোলার আদিতে অবসানে, তার মর্মে-মর্মে আলুলিত সেই আত্মভাবেরই অফুরন্ত আনন্দলীলা—অন্তহীন রূপায়ণের নির্বারিত উল্লাসে চঞ্চল।...অতএব বিশ্বকে বুঝতে হলে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের এই দিব্যত্রিপুটীকেই করতে হবে আমাদের এষণার আদিবিন্দু।

শুদ্ধ-সত্তার অবিপরিণামী শাশ্বত আনন্দই স্পন্দিত হচ্ছে সম্ভূতির অনন্ত বিচিত্র আনন্দব্যঞ্জনায়—এই যদি হয় তত্ত্বদর্শনের মর্মকথা, তাহলে আমাদেরও সমস্ত অনুভবের অধিষ্ঠানরূপে জানতে হবে এক অখণ্ড-চিন্ময় সত্তাকে—যার স্বারসিক আনন্দের নিত্যযোগে বিধৃত ও সঞ্জীবিত তারা এবং যার স্পন্দলীলায় ইন্দ্রিয়বোধের জগতে দেখা দেয় সুখ দুঃখ ও ঔদাসীন্যের বিচিত্র অভিঘাত। ওই অক্ষোভ্য আনন্দসত্তাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার তাড়নে ঝঙ্কৃত মনোময়চেতনা তার প্রতিভূ মাত্র। ব্যাবহারিক

জীবনে মনকেই করা হয়েছে পুরোধা—বিশ্বের বহু-বিচিত্র অভিঘাতে খণ্ডিত-চেতনার যে সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া, তাকে ইন্দ্রিয়বোধের আদিম ছন্দোরূপে ধরে রাখবে সে—এই অভিপ্রায়ে। তার সাড়া নিখুঁত নয়, ব্যামিশ্র বৈষম্যে পদে-পদে ঘটছে তার ছন্দঃপতন—যদিও তারই মধ্যে রয়েছে গুহাহিত চিন্ময়সত্তার পরিপূর্ণ ছন্দঃসুষমার আয়োজন ও আভাস।...কিন্তু এও জানি, অখণ্ড-অদ্বৈতের বিচিত্র লীলায়ন সামরস্যের বেদনে একবার যদি ঝঙ্কার তোলে প্রাণের তন্ত্রীতে, তাঁর তুর্যাতীত সুরসপ্তকের বিশ্বব্যাপিনী মূর্ছনা একবার যদি অনুরণিত হয়ে ওঠে এই জীবনে, তখন বৃহৎসামের যে ঋতময় অখণ্ড পরিচয় আমরা পাব, মনোময় চেতনায় কখনও কি তার আভাস মেলে ?

সত্যদর্শনের এই ভূমিকা হতে অনস্বীকার্য কতগুলি সিদ্ধান্ত এসে পড়ে। প্রথম কথা : সত্তার গভীর-গহনে আমরা সেই অম্বয়স্বরূপ হই যদি, অখণ্ড সর্ব-চিৎ বলেই নিত্যস্ফূর্ত সর্বানন্দ আমরা, এই যদি হয় আমাদের মর্মসত্য—তাহলে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে ইন্দ্রিয়সংবেদনের যে-সুরকম্পন, সে শুধু আমাদের জাগ্রৎচেতনায় স্ফুরিত খণ্ডিতসত্তার একটা বহিরঙ্গ লীলা। এর পিছনে আমাদেরই মধ্যে গুহাহিত হয়ে আছে এমন এক 'মধ্বদ' সত্তা—জাগ্রৎচেতনার চেয়েও যে সত্য বৃহৎ এবং গভীর, জীবনের প্রতি অনুভবে যে তার মাধুরী পান করে। এই মধুর রসটুকুই মনোময় প্রাকৃতচেতনাকে গোপনে-গোপনে সঞ্জীবিত রেখেছে, তাই সম্ভূতির বিক্ষুব্ধ স্পন্দনে জীবনব্যাপী আয়াস সন্তাপ ও কৃচ্ছ্রতার অভিঘাতেও আপন লক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে যেতে পারে। আমরা 'আমি' বলি যাকে, গহন সমুদ্রের বুকে সে শুধু আলোর ঝিকিমিকিটুকু। তারও গভীরে রয়েছে অবচেতনা ও অতিচেতনার পরাবর বৈপুল্য, যা প্রাকৃতচেতনাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে বিশ্বের অভিঘাতে স্পর্শাতুর নিজেরই একটা বহিরাবরণরূপে এবং সে-চেতনার বিচিত্র বেদনাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করছে নিগূঢ় কোনও ইষ্টসিদ্ধির প্রয়োজনে। এই পরাবর চেতনা সত্তার গভীরে স্বয়ং গুহাহিত থেকে বাইরের মাত্রাস্পর্শকে গ্রহণ করে রসায়িত করছে এক সত্যতর গভীরতর অনুভবের সৃষ্টিবীর্যরূপে। আবার সেই গভীর হতেই উৎসারিত করছে তাকে বহিশ্চর চেতনায়—জ্ঞান বল ও চারিত্র্যের সংবেগে। কোন্ রহস্যলোক হতে ফোটে মনের এই ঐশ্বর্য, মন তা জানে না। কারণ, সে তো সত্তার সমীরণচঞ্চল বীচিভঙ্গ মাত্র, নিজেকে সংহত করে গভীরশায়ী হবার কৌশল তো সে আজও শেখেনি।

ব্যাবহারিক জীবনে এ-তত্ত্ব আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন। কদাচ-কখনও পাই তার চকিত আভাস, তার সম্পর্কে গড়ে তুলি একটা ধৃতি বা সংস্কার। কিন্তু গুহাশায়ী হতে শিখি যখন, পরাবরের এই গভীরতা নিত্যজাগ্রত থাকে তখন আমাদের চেতনায়। অনুভব করি, আত্মস্বরূপের এই তো সত্যতর পরিচয়—

এই প্রশান্ত প্রসন্ন গম্ভীর বীর্যময় যোগযুক্ত চেতনা তো জগতের কবলিত নয়; এ যদি 'মহান্ত বিভু'র স্বরূপখ্যাতি নাও হয়, তবু এ যে সেই অন্তর্যামীরই তনু-ভা। অনুভব করি তাঁকে অন্তরাত্মারূপে: আমাদের প্রাতিভাসিক বহিরাত্মার আধার ও নিয়ন্তা তিনি। শিশুর প্রমাদে ও বিক্ষোভে পিতা যেমন স্নেহে হাসেন, তেমনি আমাদের সুখ-দুঃখের চাঞ্চল্যের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি স্নিগ্ধ কৌতুকে।...প্রাকৃত গুণবিক্ষোভের সঙ্গে আমাদের যে-অবিবেক, তাকে নির্জিত ক'রে অন্তরাবৃত্ত হয়ে দিব্য-পুরুষের জ্যোতিরুদ্ভাসিত ছায়াতপের সুষমায় সমাহিত হতে পারি যদি—তাহলে সেই সমাধিসংস্কারকে আমরা বহন করে আনতে পারি মাত্রাস্পর্শের জগতেও। তখন অখন্ডচৈতন্যে গুহাহিত থেকে, দেহ-প্রাণ-মনের সুখ-দুঃখ হতে বিবিক্ত হয়ে তাদের গ্রহণ করতে পারি চেতনারই বহিরঙ্গ বৃত্তিরূপে। স্বভাবতই বহির্বৃত্ত বলে তাদের স্পর্শ বা প্রভাব স্বরূপসত্তার অন্তস্তলে আর পৌঁছয় না তখন। শাস্ত্রের অন্বর্থ সংজ্ঞায় তাই 'মনোময়' পুরুষেরও পরে 'আনন্দময়' পুরুষের কথা আছে। এই আনন্দময় পুরুষই 'বৃহৎ জ্যোতি'—সঙ্কুচিত মনোময় পুরুষ তাঁর অস্পষ্ট ছায়া এবং ক্ষুব্ধ প্রতিবিম্ব মাত্র। অতএব অন্তরেই খুঁজতে হবে আমাদের স্বরূপসত্য —বাইরে নয়।

দ্বিতীয় কথা: সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে যে-ঝঙ্কার উঠছে প্রতি-নিয়ত, সে তো শুধু বাইরের একটা ব্যাপার, আমাদের অসমাপ্তপরিণামজনিত অসম্যক্ একটা ব্যবস্থা মাত্র। অতএব একেই সংবেদনের পরম নিয়তি বলে মানতে আমরা বাধ্য নই। বাস্তবিক বিশিষ্ট বিষয়ের সন্নিকর্ষে রাগ-দ্বেষ-উপেক্ষাও যে বিশেষরূপে ব্যবস্থিত, একথা সত্য নয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের অভ্যাসে। সন্নিকর্ষবিশেষে সুখ অথবা দুঃখ পাই আমরা—যেহেতু আমাদের প্রকৃতি তাতে অভ্যস্ত, যেহেতু অনুশীলনের ফলে গ্রাহ্যের সঙ্গে গ্রহীতার এই সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ইচ্ছামত ব্যবস্থিত সাড়ার বিপরীত সাড়া দেবার যোগ্যতাও আমাদের আছে। যেখানে দুঃখ পাওয়াই রীতি সেখানে সুখ পাওয়া, অথবা সুখের জায়গায় দুঃখ পাওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়। এমন-কি যে-বহিশ্চেতনা এতকাল যন্ত্রের মত সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার সাড়া দিয়ে এসেছে, তাকে প্রত্যেক মাত্রাস্পর্শে নিত্যস্ফূর্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ সাড়া দিতেও অভ্যস্ত করতে পারি আমরা—সঞ্চারিত করতে পারি তার মধ্যে গুহাশায়ী আনন্দ-ময় পুরুষের সত্য ও বৃহৎ অনুভবের হ্লাদিনী দীপ্তি। ব্যাবহারিক জীবনের অভ্যস্ত সাড়ার গভীরে প্রসন্ন ও বিবিক্ত আনন্দ-সংবেদন একটা বৃহৎ সিদ্ধি হলেও, যোগযুক্ত চেতনার স্বচ্ছন্দ অনুভব তারও চেয়ে বৃহৎ গভীর এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মহিমায় পূর্ণতর। কারণ, তার মধ্যে শুধু যে আছে অটল থেকে গ্রহণ করা, আত্মস্থ থেকে অনুভবের অপূর্ণতাকে কেবল মেনে নেওয়া,

তা নয়। অপূর্ণকে পূর্ণে, অনৃতকে ঋতে রূপান্তরিত করবার বীর্যও আছে তার মধ্যে। তাই সেখানে মনোময় পুরুষের দ্বন্দ্ববিধুর অনুভবের জায়গায় ফুটে ওঠে চিন্ময় রসিকেরই বিশ্বরতির শাশ্বত ও নিরঙ্কুশ উন্মাদনা।

সুখ-দুঃখের সাড়া যে নিতান্ত আপেক্ষিক এবং অভ্যাসপ্রসূত, মানসিক ব্যাপারে তা খুবই সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের নাড়ীতন্ত্র নিয়মিত ব্যবস্থাতেই কতকটা অভ্যস্ত। এমন-কি এক্ষেত্রে অভ্যাসের রায়ই যে চরম, এমন ভ্রান্ত সংস্কারও তার আছে। তাই তার কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি জয় বা মান বস্তুতই সুখকর—চিনি যেমন মিষ্টি, এরাও তেমনি নির্ঘাত মিষ্টি। আবার তেমনি অসিদ্ধি দুর্দৈব পরাজয় বা অপমান বস্তুতই দুঃখকর তার কাছে—নিম যেমন তেতো, এরাও তেমনি নির্ঘাত তেতো। এদের স্বাদ বদলে দেবার কল্পনাও করতে পারে না সে—কেননা তার কাছে সে হবে একটা দৃষ্ট-বিরোধ, অনৈসর্গিক একটা রুচিবিকার। এমনি করে নাড়ীময় পুরুষ আমাদের মধ্যে পঙ্গু হয়ে আছে অভ্যাসের দাসত্বে। একইধরনের সাড়া ও অনুভবের ছককাটা মানুষের জীবন-ব্যবস্থার কোথাও বিপর্যয় না ঘটে, তার জন্যে সে প্রকৃতির হাতে-গড়া একটা সাধন মাত্র। কিন্তু মনোময় পুরুষ তার চেয়ে স্বাধীন, কেননা প্রকৃতি গড়েছে তাকে সাবলীল বৈচিত্র্যের আধার ক'রে—পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সে এগিয়ে যাবে বলে। পরবশতা তার ইচ্ছাধীন। যতদিন বিশেষ-একটা মানসিক অভ্যাসকে সে আঁকড়ে আছে অথবা নাড়ীতন্ত্রের শাসনকে স্বীকার করছে স্বেচ্ছায়, ততদিনই সে পরবশ। অতএব অপমানে ক্ষতিতে পরাজয়ে শোকাচ্ছন্ন হতে বাধ্য নয় সে। এদের সে দেখতে পারে পুরাপুরি উপেক্ষার দৃষ্টিতে—এমন-কি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার সঙ্গেই এদের সে বরণ করে নিতে পারে জীবনের আর সব-কিছুর সঙ্গে। তাই চেতনার উন্মেষের সঙ্গে মানুষ আবিষ্কার করেছে এই সত্য : দেহ ও নাড়ীতন্ত্রের শাসনকে যতই সে অস্বীকার করে, অন্নময় ও প্রাণময় কোশের ষড়যন্ত্র হতে যতই নিজেকে নির্মুক্ত করে, ততই অসংকুচিত হয় তার স্বাতন্ত্র্যের মহিমা। মাত্রাস্পর্শের সে আর দাস নয় তখন, সংবেদনের স্বাতন্ত্র্যে সে তখন স্বরাট্।

কিন্তু শারীরিক সুখ-দুঃখের বেলায় স্বারাজ্যের এই সহজ মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা আমরা তখন থাকি দেহ ও নাড়ীতন্ত্রের খাসমহলে। সেখানকার কর্তা যে, তার স্বভাবই হল বাইরের চাপ ও বাইরের অভিঘাতের শাসন মেনে চলা। তবু স্বারাজ্যের একটুখানি আভাস সেখানেও আমরা পাই। একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। একই স্থূল সন্নিকর্ষ সুখের অথবা দুঃখের হতে পারে অভ্যাসের ফলে—শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছেই নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বা তার বাড়তির বিভিন্ন পর্বে। কতবার দেখা গেছে, তীব্র উত্তেজনা অথবা উচ্ছ্বসিত উল্লাসের সময় মানুষ

অসাড় বা উদাসীন হয়ে যায় দেহের বেদনাবোধ সম্পর্কে, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় সেই বেদনাই হয়ত হত তার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ। অনেকসময় বেদনা সম্পর্কে সচেতনতা ফিরে আসে তখনই, অসাড় নাড়ীতন্ত্র আবার যখন সজাগ হয়ে মনকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার অভ্যস্ত বেদনাবোধের দায়। কিন্তু মনের এ-দায় তো অনতিক্রমণীয় নয়—এ তার অভ্যাস শুধু। সম্মোহনদশায় সম্মোহিত ব্যক্তির শরীরে ছুঁচ ফুটিয়ে বা ছুরি চালিয়ে তাকে ব্যথা পেতে নিষেধ করা হয় যদি, তাহলে শুধু-যে তখনই ব্যথা পায় না সে তা নয়, জেগে ওঠার পরও ব্যথা পাবার অভ্যস্ত সংস্কারকে তার স্বচ্ছন্দে দাবিয়ে রাখা চলে। ব্যাপারটা রহস্যময় মোটেই নয়। মানুষের জাগ্রৎচেতনাই অভ্যস্ত হয়েছে নাড়ীতন্ত্রের সংস্কারে। সম্মোহন-দশায় জাগ্রতের ক্রিয়াকে স্তম্ভিত করে সম্মোহক ফুটিয়ে তোলে অধিচেতনার গুহাশায়ী মনোময় পুরুষকে, যিনি ইচ্ছা করলেই দেহ ও নাড়ীতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকে নিজের বশে আনতে পারেন। সম্মোহনদ্বারা এমনি করে স্বারাজ্যের যে-অধিকার মেলে, তা কিন্তু বস্তুত অস্বাভাবিক পরতন্ত্র ক্ষিপ্র ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং সত্যকার স্বারাজ্য বলা চলে না তাকে। কিন্তু এই সাধনাই করা চলে স্বেচ্ছায়, স্বভাবের বশে, পর্বে-পর্বে —যার ফলে আধারে সত্যকার স্বারাজ্যপ্রতিষ্ঠা হয়, নাড়ীতন্ত্রের অভ্যস্ত সংস্কারের 'পরে সংক্রামিত হয় মনোময় পুরুষের আংশিক বা পরিপূর্ণ প্রশাসন।

দেহ-মনের পীড়াবোধ প্রকৃতির একটা কৌশল মাত্র। ঊর্ধ্বপরিণামের এক পর্বসন্ধিতে বিশেষ-কোনও লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যই শক্তির এই লীলা। কথাটা এই। ব্যক্তিচেতনার কাছে এ-জগৎ বহুমুখী শক্তিরাজির বিচিত্র জটিল একটা সংঘাত। এই জটিল আবর্তের মধ্যে জীব দাঁড়িয়ে আছে একটা সীমিত পিন্ডরূপে। আধারশক্তির সঞ্চয় তার সীমিত, অথচ তারই 'পরে প্রতিনিয়ত পড়ছে এসে অগণিত অভিঘাত—যা তার পিন্ডজগৎকে ক্ষত-বিক্ষত চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিশ্লিষ্ট করে দিতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। বিষয়সন্নিকর্ষে বিপদ বা অনিষ্টের আশঙ্কা আছে যেখানে, জীবের দেহ এবং নাড়ীতন্ত্র সেখান হতেই আঁৎকে পিছিয়ে আসে। এই পিছিয়ে-আসাটাই চেতনায় ফোটে পীড়াবোধ হয়ে। উপনিষদে যার নাম 'জুগুপ্সা', এ তারই অঙ্গীভূত। পিন্ডচেতনা যাকে মনে করে অনাত্মা প্রতিকূল বা অনাত্মীয়, তাহতে নিজেকে বাঁচানোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল জুগুপ্সার স্বরূপ। জুগুপ্সাই দেখা দেয় পীড়ার আকারে। অতএব, কাকে এড়াতে হবে অথবা এড়াতে না পারলেও ঠেকিয়ে রাখতে হবে, এ যেন তার দিকে প্রকৃতির ইশারা। তাই জড়জগতে প্রাণ না দেখা দিয়েছে যতক্ষণ, ততক্ষণ পীড়াবোধের কোনও নিশানা মেলে না, কেননা ততদিন প্রকৃতির ইষ্টসিদ্ধির জন্য যান্ত্রিক প্রবৃত্তিই যথেষ্ট। কিন্তু

যখনই জগতে দেখা দিল প্রাণের সুকুমার লীলা এবং জড়ের 'পরে তার শিথিল মুষ্টিবন্ধন, তখন হতেই বেদনাবোধের আবির্ভাব। আর সে-বেদনা বেড়ে চলল প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে। তাই যতক্ষণ দেহ আর প্রাণকে মন জড়িয়ে আছে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধনরূপে, ততক্ষণ বেদনাবোধ তার নিত্যসঙ্গী। মনকে তখন দেহ আর প্রাণের ক্লিষ্ট বৃত্তি মেনে চলতেই হয় এবং সেইজন্য অপূর্ণ অহন্তার সংবেগ ও আকূতিকে করতে হয় তার দিশারী। অতএব বেদনাবোধকেও প্রত্যাখ্যান করবার তার উপায় থাকে না। কিন্তু মন যদি হয় স্ববশ, অহংনির্মুক্ত, সর্বভূত এবং বিশ্বগত শক্তিলীলার সঙ্গে যোগযুক্ত, তাহলে দুঃখবোধের প্রয়োজনও তার কমে আসে এবং অবশেষে দুঃখসত্তার কোনও হেতুই অবশিষ্ট থাকে না। তখনও চেতনায় তার সংস্কারশেষ থাকে যদি, তাহলে অতীতের অনিয়ত ও অনিমিত্ত উৎপাতরূপেই সে থাকবে; অর্থাৎ দুঃখবোধ তখন অভ্যাসের অনাবশ্যক পরিশেষ। ঊর্ধ্ব-চেতনা পুরাপুরি দানা বাঁধেনি বলেই তার 'পরে অবর-সংস্কারের এই জুলুম। কিন্তু এ-জুলুমের পথও রুদ্ধ ক'রে তার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে হয়, তবেই জড়ের বশ্যতা ও অহন্তার সঙ্কোচ হতে চেতনার নির্মুক্তিতে তার স্বারাজ্যসিদ্ধির দিব্য নিয়তি সার্থক হতে পারে।

দুঃখবোধের বিলোপসাধন অসম্ভব কিছুই নয়, কেননা সুখ দুঃখ দুইই শুদ্ধসত্তার আনন্দস্বভাবের দুটি ধারা—একটি ধারা স্তিমিত, আরেকটি প্রতীপ। এ-বৈকল্যের কারণ : অখণ্ডচেতনা জীবের মধ্যে নিজেই নিজেকে করেছে খণ্ডিত—মায়ার পরিমিতিতে। তাই বিশ্বের স্পর্শে জীবের মধ্যে জাগে না সার্বভৌম রসোল্লাস, বিশ্বকে খণ্ড-খণ্ড করে আস্বাদন করে সে অহন্তার ক্লিষ্ট বৃত্তি দিয়ে। বিশ্বাত্মার কাছে মাত্রাস্পর্শ নাই, কেননা সকল স্পর্শই তাঁকে দেয় আনন্দকন্দের অনুভব—অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'রস' অর্থাৎ যা বস্তুর সার এবং স্বাদ দুইই। বিষয়ের সংস্পর্শে তার সারটুকু খুঁজি না আমরা—শুধু দেখি কিভাবে আলোড়িত করে সে আমাদের কামনা ও ভয়কে, লালসা ও বিরাগকে। তাই বিষয়ের রস আমাদের চেতনায় বিবর্তিত হয় দুঃখে শোকে উপেক্ষায় বা অপূর্ণ আনন্দের ক্ষণিকায়, অর্থাৎ সারগ্রাহিতার সামর্থ্য থাকে না তার মধ্যে। হৃদয় ও মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয় যদি এবং সেই অনাসক্তির বীর্য নাড়ীতন্ত্রেও সংক্রামিত হয়, তাহলে রসের এই অপূর্ণ তির্যক প্রকাশকে ধীরে-ধীরে অবলুপ্ত করে শুদ্ধসত্তার অব্যভিচারী আনন্দের বিচিত্র উল্লাসকে তার স্বারসিক সত্যস্বরূপে আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। বিশ্বোল্লাসের চিত্রধারা পান করবার সামর্থ্য কিছু-কিছু দেখা দেয়, যখন কাব্য ও কলার বিষয়বস্তুকে আমরা গ্রহণ করি সামাজিকের সহৃদয়তা নিয়ে। শোক ভয় ও জুগুপ্সার বিষয়েও আমরা

পাই এক অন্তর্গূঢ় রসরূপের আস্বাদন। তার কারণ, আমরা তখন অনাসক্ত, নির্লিপ্ত—ভাবি না নিজের কথা বা আত্মসংহরণের উপায়, শুধু ভাবি বিষয়বস্তু ও তার রসের কথা। সামাজিকের এই রসবোধ অবশ্য বিশুদ্ধ আনন্দসত্তার অবিকল প্রতিরূপ কখনও হতে পারে না, কেননা ব্রহ্মানন্দ কাব্যরসোত্তীর্ণ অতিমানস অনুভব। ব্রহ্মানন্দে শোক ভয় জুগুপ্সা বিলুপ্ত হয় আলম্বনসুদ্ধ, কিন্তু কাব্যরসে আলম্বন থাকে অক্ষুণ্ণ। তবু বিশ্বাত্মার আত্মরূপায়ণে যে-আনন্দ কলায়-কলায় উপচিত হয়ে উঠেছে, তার একটি ভূমির আংশিক ও অপূর্ণ পরিচয় পাই আমরা শিল্পরসেরও আস্বাদনে। এ আমাদের আত্ম-প্রকৃতির অন্তত একটা দিক উন্মুক্ত করে দেয় অহন্তানির্মুক্ত সেই বিশ্বাত্মভাবের প্রতি, যা দিয়ে অখিলাত্মা আস্বাদন করেন মানুষের খণ্ডিত-চেতনায় কল্পিত বৈষম্য ও বিপর্যয়ের মধ্যেই সৌষম্যের মাধুরী। তবু প্রমুক্ত চেতনার এ শুধু পূর্বাভাস। পরিপূর্ণ প্রমুক্তি আসবে তখনই, যখন মুক্তধারার অবাধ প্লাবনে আধারের সব-কিছু খুলে যাবে আলোর দিকে—আমাদের হৃদয়ের নাড়ীতে-নাড়ীতে উল্লসিত হয়ে উঠবে এক সর্বতঃসঞ্চারী রসবোধ, এক সার্বভৌম প্রজ্ঞাদৃষ্টি, বিশ্বের সম্পর্কে অনাসক্ত অথচ যোগযুক্ত একটা গভীর চেতনা।

আমরা দেখেছি, বিশ্বের অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে না পেরে চিৎশক্তি যখন পরাহত সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে, তখনই আমাদের মধ্যে জাগে বেদনাবোধ। তারও মূলে রয়েছে আমাদের অবিদ্যা। সৎ-চিৎ-আনন্দই যে আমাদের আত্মার স্বরূপ একথা ভুলে ক্ষুদ্র অহমিকার দীনতা দিয়ে নিজেকে যখন সঙ্কুচিত করি, তখনই বিশ্বকে গ্রহণ করবার সম্ভোগ করবার যথোচিত সামর্থ্যও আমরা হারিয়ে ফেলি। তাই দুঃখবোধের উচ্ছেদ করতে আমাদের প্রথম সাধনাই হবে জুগুপ্সার জায়গায় তিতিক্ষার প্রবর্তনা। জুগুপ্সায় আমরা প্রতিকূল সন্নিকর্ষ হতে ঘা খেয়ে পিছু হটেই এসেছি এতকাল, এইবার তিতিক্ষার বীর্য নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, জয় করতে হবে তাদের। তিতিক্ষার অনুশীলনে আমরা প্রথমে পৌঁছব একটা সমত্ববোধের ভূমিতে, অর্থাৎ সকল সন্নিকর্ষের প্রতিই জাগবে আমাদের সমান উপেক্ষা অথবা সমান প্রসন্নতা। তারপর এই সমত্ববোধকে দৃঢ়মূল করতে হবে আধারে—সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিকল অহংচেতনার আসনে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পরমানন্দময় চেতনার প্রতিষ্ঠাদ্বারা। এই ব্রাহ্মী চেতনা বিশ্ব হতে বিবিক্ত হয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ হতে পারে। তখন তার প্রশান্ত-সুদূর আনন্দধামে পৌঁছতে হলে চাই সব-কিছুতে সমান উপেক্ষা। তা-ই হল বৈরাগীর পথ। কিন্তু ব্রাহ্মী চেতনা আবার হতে পারে বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক। তখন তার সর্বানুস্যূত নিত্যসন্নিহিত আনন্দের অনুভব মেলে পূর্ণাহন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অহন্তার নিঃশেষ আত্মসমর্পণে

—এক সর্বগত সমরস প্রসাদের অধিগমে। বৈদিক ঋষিদের ছিল এই পথ। কিন্তু সুখের স্তিমিত বেদনা ও দুঃখের প্রতীপ সংস্পর্শে উদাসীন থাকাই স্বভাবত অধ্যাত্মসাধনার আদিপর্ব। সাধারণত আরও এগিয়ে গেলে আসে সমরস প্রসাদের ভাব। কিন্তু সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার তিনটি তারকে সদ্য-সদ্যই বাজিয়ে তোলা আনন্দের সুরে—অসম্ভব না হলেও মানুষের পক্ষে খুব সহজ নয়।

বেদান্তীর সম্যক্-দর্শন জগৎকে তাহলে এই দৃষ্টিতে দেখে। বিশ্বের মূলে আছে এক অখণ্ড অনন্ত সন্মাত্র—নিরঞ্জন আত্মসংবিতের উল্লাসে পরমানন্দময়। সেই শুদ্ধসত্তাই আত্মস্বরূপে অবিচ্যুত থেকে স্পন্দিত হল চিন্ময়ী মহাশক্তির লীলায়নে—মায়ার খেলায় জাগল প্রকৃতির পরিস্পন্দ। শুদ্ধসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রথমত সমাহিত আত্মসংহৃত—জড়বিশ্বের ভূমিকারূপে অবচেতন। তারপর সে-আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এক সমরস পরিস্পন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে—তাকে তখনও ইন্দ্রিয়সংবেদন বলতে পারি না। তারও পরে, মন ও অহংএর উন্মেষ এবং উপচয়ে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতন্ত্রীতে বেজে উঠল সে-আনন্দঝঙ্কার, যখন ঘটে-ঘটে সঙ্কুচিত চিৎশক্তি বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে অনাত্মীয় ও নিজের সীমিত সাধনার প্রতিকূল ভেবে শিউরে উঠল তার অভিঘাতে। অবশেষে ঘটল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নিত্যচেতন আবির্ভাব তাঁর আত্মবিভূতিতে—সর্বাত্মভাবের সংবেদনে, সামরস্যের সম্ভোগে, স্বপ্রতিষ্ঠার মহিমায়, স্বীয়া প্রকৃতির অবষ্টম্ভে। এই হল জগৎপরিণামের ধারা।

যদি প্রশ্ন হয়, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' সৎস্বরূপ, এই বিশ্বপরিণামে তাঁর আনন্দ কেন? তার উত্তরে বেদান্তী বলবেন, আনন্ত্যই যাঁর স্বরূপ, তাঁর মধ্যে তো সমস্তই সম্ভাবিত। আর সম্ভূতির বিপরিণামেই হ'ক অথবা অসম্ভূতির অপরিণামেই হ'ক, তাঁর সদ্ভাবের যে-আনন্দ, সে তো সার্থক হবে নিখিল সম্ভাবনার চরিতার্থতাতেই। সে বিচিত্র সম্ভাবনার একটি রূপ ফুটেছে এই বিশ্বে, আমরা যার অঙ্গীভূত। এখানে সচ্চিদানন্দ নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন যা নন তিনি তার মধ্যে এবং সেই বৈপরীত্যের গহনে চলেছে তাঁর নিজেকে ফিরে পাবার এষণা। অনন্ত সৎস্বরূপ যিনি, অসতের কুহেলিকায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবার তিনি ফুটে উঠলেন সান্ত জীবের প্রতিভাসে। তাঁর অনন্তচৈতন্য লুপ্ত হল অব্যাকৃত অচিতির বিপুল আঁধারে, আবার বহিশ্চর চেতনার সঙ্কীর্ণ পরিসরে উঠল তা ঝিলমিলিয়ে। তাঁর অনন্ত শক্তির স্বধা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পরমাণুর নির্ঋত ঘূর্ণ্যাবর্তে, আবার তা জেগে উঠল ব্রহ্মাণ্ডের টলমল মূর্তিতে। তাঁর আনন্দ মিলিয়ে গেল জড়ত্বের স্তিমিত অসাড়তায়, আবার তা বেজে উঠল সুখ-দুঃখ-মোহ রাগ-দ্বেষ-উপেক্ষার সুরসুষমাহীন বিচিত্র ঝঙ্কারে। তাঁর নিরবশেষ অখণ্ডতা

খণ্ডবৈচিত্র্যের বিপর্যয়ে গেল হারিয়ে, আবার তা দেখা দিল বিচিত্র শক্তি ও সত্তার সংঘর্ষে—যার মধ্যে পরস্পরকে কবলিত করে গ্রাস করে জীর্ণ করে চলল সেই অখণ্ডভাবকে ফিরে পাবার সাধনা। এমনি করে এই সৃষ্টির বুকেই একদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ফুটে উঠবেন তাঁর নিরাবরণ মহিমায়। জীবব্যক্তি হয়েও মানুষ এই জীবনেই রূপান্তরিত হবে বৈশ্বানর বিরাট পুরুষে। তার সংকীর্ণ মনশ্চেতনা সম্প্রসারিত হবে অতিচেতনার অদ্বৈত সমাহারে, যার মধ্যে সবাই ঠাঁই পাবে—নির্বিচারে। তার সংকীর্ণ হৃদয় উদার হয়ে বিশ্বকে বাঁধবে অফুরন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে, ক্ষুব্ধ বাসনার লোলুপতা বিশ্বরতির রসে হবে রসায়িত। তার সংকুচিত প্রাণচেতনা বিস্ফারিত হয়ে বিশ্বের সমগ্র অভিঘাতকে তুলে নেবে আপন বুকে, বিশ্বের আনন্দলীলার পাবে পরিপূর্ণ আস্বাদন। এমন-কি তার জড়দেহও আর নিজেকে বিশ্ব হতে বিযুক্ত ভাববে না—অখণ্ড সর্বগত মহাশক্তির বিপুল প্রবাহকে ধারণ করবে সে নিজেরই মধ্যে তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে। এমনি করে ব্যক্তি-আধারেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সর্বানুস্যূত অন্বয়সুষমা পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটে উঠবে তার স্বীয়া প্রকৃতির ছন্দে।

বিশ্বলীলার মর্মমূলে নিহিত রয়েছে যে-পরমসত্য, শুদ্ধসত্তার অখণ্ড সমরস আনন্দ তার স্বরূপ। সে-আনন্দের সামরস্য ফুটেছে প্রকৃতির অবচেতন সুপ্তিতেও—যখন তার মধ্যে ছিল না ব্যক্তি-চেতনার সূচনা। তারপর জীবকে কেন্দ্র করে অর্ধচেতন স্বপ্নের ধাঁধাঁয় নিজেকে খুঁজেছে সে এষণার বিচিত্র ছন্দে—তার মধ্যে কত বিকৃতি, কত রূপান্তর, কত বিপর্যয়। কিন্তু সে-এষণাতেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে সামরস্যের সেই আনন্দ। আবার ওই আনন্দেরই অবিকল্পিত অনুভব দেখি শাশ্বত অতিচেতনার স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায়—একদিন যার মধ্যে প্রবুদ্ধ জীবচেতনা একাকার হয়ে যাবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পরম সাযুজ্যে। ভাবের চোখে জড়বিশ্বের দিকে তাকাই যখন সংস্কারবিমুক্ত বিজ্ঞানের প্রাতিভদীপ্তি নিয়ে, তখন দেখি জগৎ জুড়ে এই তো অখণ্ডের আনন্দলীলা। এ-লীলায় তিনিই নট, তিনিই সূত্রধার—তাঁর সর্বৈশ্বর্যের আনন্দচ্ছটায় ফুটেছে বিশ্বের এই শতদল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেব-মায়া

তদিন্ ন্বস্য বৃষভস্য ধেনোর্
আ নামভির্মমিরে সক্ম্যং গোঃ।
অন্যদন্যদসুর্যং বসানা
নি মায়িনো মমিরে রূপমস্মিন্ ॥

মায়াবিনো মমিরে অস্য মায়য়া
নৃচক্ষসঃ পিতরো গর্ভমা দধুঃ ॥

ঋগ্বেদ ৩।৩৮।৭; ৯।৮৩।৩

তাইতো আজও তারা এই বীর্যবর্ষী দেবতা আর ধেনুরূপিণীর নাম দিয়ে দিকে-দিকে রূপায়িত করে চলেছে আলোকজননীর নিরূঢ় শক্তিকে; সে-শক্তির বিচিত্র বীর্যে ঢেকেছে তারা আপন তনু—এমনি করে মায়ীরা ফুটিয়ে তুলেছে রূপের মায়া এই সতের মধ্যে।

রূপ দিলেন সবাইকে এঁরই মায়ায় মায়াবীরা; বীর্যদীপ্ত দৃষ্টি যে-পিতাদের, এঁকেই ভ্রূণের মত তাঁরা নিহিত করলেন সবার মধ্যে।

—ঋগ্বেদ (৩।৩৮।৭; ৯।৮৩।৩)

যে-সন্মাত্রের মধ্যে স্বয়ম্ভূবীর্যের সংবেগে চিৎসত্তার নিরঙ্কুশ আনন্দে জাগে বিসৃষ্টির প্রবর্তনা, তিনিই আমাদের স্বরূপসত্য। আমাদের সকল ভাব ও ভঙ্গির অন্তর্যামী আত্মা তিনি—আমাদের সকল কৃতি সৃষ্টি ও সম্ভূতির তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। কবি শিল্পী অথবা সঙ্গীতকার কলারূপের সৃষ্টি করে যখন, তখন আত্মসত্তার কোনও অন্তর্গূঢ় বীজভাবকেই তারা রূপায়িত করে। অথবা কারু মনীষী বা রাজনীতিবিদ অন্তর্নিহিত ভাবকেই দেয় বস্তুরূপের আকার, অথচ এই ব্যাকৃতিতে তাদের কোনও স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। তেমনি এই বিশ্বসম্ভূতিও সেই শাশ্বত বিশ্বকবির আনন্দচিন্ময় আত্মরূপায়ণ। বাস্তবিক, সমস্ত বিসৃষ্টি বা সম্ভূতির তত্ত্বই তা-ই : বীজ হতে যা অঙ্কুরিত হল, বীজেই ছিল তা নিহিত—বীজ-সত্তায় ছিল তার প্রাক্-সত্তা, পূর্বসিদ্ধ ছিল তার আত্ম-বিভাবনার সংবেগ, সম্ভূতির আনন্দেই সঙ্কল্পিত ছিল তার ছন্দ। প্রাণপঙ্কের আদি-কণিকাতেই সত্তার গূঢ় সংবেগে প্রচ্ছন্ন ছিল জীবপিন্ডের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বস্তুত, অন্তঃসংজ্ঞা অন্তর্বত্নী বীজশক্তিই সর্বত্র বহন করে নিজের অন্তর্গূঢ় সরূপকে ফুটিয়ে তোলবার অদম্য আকূতি। কেবল জীব যেখানে আত্মবিসৃষ্টির কর্তা, সেইখানেই সে নিজের সঙ্গে কল্পনা করে সৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টির উপাদানের

একটা প্রভেদ। বস্তুত শক্তির সঙ্গে তার স্বরূপের কোনও পার্থক্য নাই। শক্তির সাধনরূপে কল্পিত ব্যক্তিচেতনাও যেমন সে নিজে, তেমনি সৃষ্টির উপাদান ও পরিণাম হতেও সে অভিন্ন। অর্থাৎ বিসৃষ্টির আপাতভিন্ন পর্বে-পর্বে আছে একই সত্তা, একই শক্তি, একই আনন্দের লীলা -বিভিন্ন পর্যায়ে ঘনীভূত হয়ে। প্রত্যেক পর্যায়ে তার বিবিক্ত অহং নিজেকে ঘোষণা করছে 'এই তো আমি' বলে, কিন্তু সর্বত্র তার আত্মশক্তিরই বিচিত্র গুণলীলা আত্মরূপায়ণের বিচিত্র উল্লাসে নিজেকে করছে মঞ্জরিত।

সন্মাত্রের বিভূতিও তো তার আত্মস্বরূপ ছাড়া আর-কিছুই হতে পারে না। এ তার লীলা, তার ছন্দ -তার আত্মসত্তা চিৎশক্তি ও আনন্দস্বভাবেরই স্ফূর্তি। তাইতো যা-কিছু ফোটে জগতে, সে-ই বহন করে সত্তার আকূতি। সে চায় সংকল্পিত রূপের স্ফুরণ, তার মধ্যে আত্মভাবের উপচয়। যে চেতনা ও শক্তি তার অন্তর্নিহিত, তাকে সে চায় পুষ্ট স্ফুরিত উপচিত ও অনন্তগুণে বর্ধিত করতে। বিশ্বের ঘটে-ঘটে রয়েছে আনন্দের প্রৈতি—অব্যক্ত হতে ব্যক্ত হওয়ায় আনন্দ, রূপায়ণে আনন্দ, চেতনার ছন্দোদোলায় আনন্দ, শক্তির মুক্ত-ধারায় আনন্দ। সেই আনন্দকে বাড়িয়ে উপচে তোলা—যেদিকেই হ'ক, যেমন করেই হ'ক; অন্তরের যে-ভাবই অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহের নিগূঢ় বাণীর বাহন হ'ক, তাকেই সার্থক করে তোলা আনন্দ-রসায়নে—এই তো সর্বভূতের একমাত্র আকূতি।

বিশ্বের যদি কোনও লক্ষ্য থাকে, পূর্ণতার কোনও এষণা যদি নিহিত থাকে তার মধ্যে, তাহলে কি ব্যষ্টিতে কি সমষ্টিতে তার রূপ হবে—আত্ম-সত্তাকে, অন্তর্গূঢ় শক্তি ও চেতনাকে, নিরূঢ় আনন্দস্বভাবকেই পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু ব্যক্তিচেতনা ব্যক্তিরূপের সংকীর্ণ বেষ্টনীতে বাঁধা পড়ে যদি, তাহলে তার পূর্ণরূপ কিছুতেই ফুটবে না। যে সান্ত, তার মধ্যে অখণ্ড পূর্ণতা কখনও ফোটে না এইজন্য যে, সান্তের তা স্বরূপ-কল্পনার প্রতিকূল। অতএব সান্তভাব ঘুচে অনন্তচেতনার উন্মেষেই ব্যক্তির একমাত্র সার্থকতা। আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় আনন্ত্যের অভিব্যক্তি ঘটে যদি, তবেই সে ফিরে পাবে তার স্বরূপসত্য। যিনি অনন্ত সত্তা অনন্ত চেতনা ও অনন্ত আনন্দ, তিনি যে তার আত্মস্বরূপ, তার সান্তভাব যে তাঁর পরমার্থসত্তার চিত্রবিভূতির লীলাকঞ্চুক মাত্র—এই পরমসত্যের অনুভবে তখন চরিতার্থ হবে তার এষণা।

অন্তহীন দেশ ও কালরূপে প্রসারিত তাঁর অমেয়সত্তার বিপুল পট-ভূমিকায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দের এই-যে বিশ্বলীলার কল্পনা, তার রহস্য বুঝতে হলে তার তত্ত্বরূপের অনুধ্যান করতে হবে আমাদের। সে-রূপকে আমরা এইভাবে তরঙ্গায়িত দেখি প্রচেতনার পর্বে-পর্বে। প্রথম পর্বে চিৎসত্তা সংবৃত্ত

ও আত্মসমাহিত হয়ে নিলীন হল স্বরূপধাতুর ঘনীভাবে—অনন্ত বিভজনের সম্ভাবনা নিয়ে, কেননা তা না হলে অখণ্ড-ভাবের মধ্যে খণ্ডতার লীলা সম্ভব হত না। দ্বিতীয় পর্বে, স্বতোনিরুদ্ধ চিৎশক্তি ফুটে উঠল রূপময় প্রাণময় ও মনোময় বিগ্রহরূপে। শেষ পর্বে, মনোময় বিগ্রহ মুক্তি পেল স্বরূপোপলব্ধির নির্বারিত স্বাতন্ত্র্যে—নিজেকে সে জানল বিশ্বলীলার অখণ্ড-অনন্ত সূত্রধাররূপে। আর সেই প্রমুক্তির উল্লাসে আবার সে ফিরে পেল সীমাহীন সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপপ্রত্যয়, মূঢ় দশাতেও যা ছিল তার আত্মসত্তার গুহাচর চিরন্তন সত্য। শক্তিস্পন্দের এই তিনটি ছন্দের জ্ঞানই বিশ্বরহস্যের একমাত্র কুঞ্চিকা।

বিশ্বপরিণামের এই ছন্দকে আমরা রূপায়িত দেখি প্রাচীন বেদান্তের শাশ্বত অনুভবে এবং সেই দর্শনের আলোকে পাই এ-যুগের প্রাতিভাসিক পরিণামবাদের সত্য পরিচয়। কালের কলনায় বিশ্বপরিণামের যে-লীলা দেখেছিলেন প্রাচীন ঋষি, আজ বৈজ্ঞানিকও শক্তি ও জড়ের তত্ত্বালোচনায় তারই অনচ্ছ পরিচয় পেয়েছেন। সে-পরিচয়কে সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণ করতে হলে আবার তাকে উদ্ভাসিত করতে হবে আমাদেরই ভাণ্ডারে সঞ্চিত বেদান্তের পুরাণ ও শাশ্বত সত্যের জ্যোতিতে। এমনি করে প্রাচ্যের পুরাণ-জ্ঞান আর প্রতীচ্যের নবীন জ্ঞানের অন্যোন্যসঙ্গমে ফুটবে তাদের পরস্পরের দীপ্ত পরিচয়। আজ জগতের ভাবধারা চলেছে যেন সেই যুক্তবেণীরই অভিমুখে।

তবু, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শুধু এই তত্ত্বের আবিষ্কারে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। বিশ্বমূল পরমার্থতত্ত্বকে চিনেছি আমরা, কিন্তু কি করে তিনি পরিণত হলেন এই প্রতিভাসে, তার ইতিহাস এখনও জানি না। সমাধানের চাবিকাঠিটি পেয়েছি, কিন্তু কোন্ তালায় তাকে ঘোরাতে হবে তা তো বলতে পারি না। পরমার্থতত্ত্বকেই শুধু জানলে হবে না, জানা চাই তার পরিণামের ধারাকেও। কারণ, ধারা যে আছে, 'যাথাতথ্যতঃ' অর্থের বিধান যে আছে জগতে সে তো স্পষ্ট দেখছি। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শক্তি অব্যবহিত হয়ে কাজ করছে না বিশ্বে, কেননা তিনি তো ঐন্দ্রজালিকের মত খেয়ালখুশির চূড়ান্তলীলায় লোক-বিসৃষ্টি করে চলেননি শুধু ব্যাহৃতির মন্ত্র আউড়িয়ে।

সত্য বটে, বিশ্ববিধানের বিশ্লেষণে দেখি শুধু বিক্ষিপ্ত শক্তিলীলার একটা সমতা এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট খাতে সে-লীলার প্রবহণ—কোনও ঋতের ছন্দে নয়, কেবল শক্তির যদৃচ্ছা প্রবৃত্তিতে অথবা অভ্যস্ত শক্তিপরিণামের গতানুগতিক ধারা ধরে। বিশ্বে নিয়মের এই তাৎপর্য। কিন্তু শক্তিকে কেবল শক্তিরূপে দেখলেই তার প্রকৃতি সম্পর্কে এই রায়কে চূড়ান্ত বলে মানা চলে, নইলে এ শুধু তার একটা গৌণ আপাতপরিচয়। শক্তিকে সত্তার আত্মসম্ভূতি বলে জানি যখন, তখন শক্তিপ্রবাহের নির্দিষ্ট ধারাকে সত্তার স্বরূপসত্যের

একটা প্রতিরূপ ছাড়া আর-কিছু বলতে পারি না। তখন মানতে হয়, সন্মাত্রেরই ঋতময় প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রবাহের নিরূপিত চলন এবং লক্ষ্য। আবার, চৈতন্যই যখন অনাদিসন্মাত্রের স্বভাব এবং তার শক্তিরও বীর্য, তখন সন্মাত্রের সত্যবিভূতিতেও আছে চিৎসত্তার স্বরূপপ্রত্যয়। অতএব শক্তি-প্রবাহের ধারা নিরূপিত হচ্ছে চৈতন্যে নিরূঢ় বিজ্ঞানশক্তির স্বতোদেশনায়, যা চিৎসত্তার স্বরূপপ্রত্যয়ের প্রেতি দ্বারা অনতিবর্তনীয় ঋতের পথে শক্তিকে পরিচালিত করবে। সুতরাং বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে রয়েছে যে-প্রবর্তনা, তা বিশ্বচেতনারই স্বতোদেশনার বীর্য, অথবা আনন্ত্যের আত্মসংবিতের সেই দিব্য সামর্থ্য যা নিজের কোনও সত্যবিভূতিকে প্রত্যঙ্ক ক'রে তার রূপায়ণের নিত্য-ধারার পথে সঞ্চারিত করতে পারে সিসৃক্ষার প্রবেগ।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, অনন্তচিন্মাত্র এবং তার লীলাপরিণামের মাঝে একটা বিশেষ শক্তি বা বৃত্তির খেলাকে আমরা মানতে যাই কেন? যাকে বলি আনন্ত্যের আত্মসংবিৎ, সে কি কামচারবশে এই রূপের মেলা সৃষ্টি করতে পারে না—যার ততদিনই আয়ু যতদিন না সে প্রলয়মন্ত্রে মিলিয়ে যায়? সেমিটিক শাস্ত্রেও তো এমন কামচারের কথা আছে। 'ঈশ্বর বললেন, ফুটুক আলো, আর অমনি আলো ফুটল।' কিন্তু 'ঈশ্বর বললেন আলো হ'ক'—একথা যখন বলি, তখন ধরে নিই, চিৎশক্তির এমন-একটা বৃত্তি আছে যা আলোকে বেছে নেয় আলো-নয়-যা তার থেকে। আবার যখন বলি, 'অমনি আলো হল' তখনও তার পিছনে থাকে চিৎশক্তিরই একটা দেশনা ও ক্রিয়ার কল্পন যা তার জ্ঞানশক্তির প্রতিরূপ। সেই ক্রিয়াশক্তিই করে আলোর বিসৃষ্টি জ্ঞানশক্তির অনুধ্যানের ছন্দে এবং আলো-নয়-যা তার মারণশক্তির হাজারো ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জিইয়ে রাখে তাকে। অনন্তচেতনার ক্রিয়া অনন্ত, অতএব তার শক্তিপরিণামও অনন্ত। তাই সম্ভূতির সেই নির্বিশেষ আনন্ত্যের মধ্যে সত্যবিভূতির একটি সবিশেষ কলাকে আবিষ্কার ক'রে তার ঋতের ছন্দে জগৎ গড়ে তোলা—তার জন্য চাই বিদ্যাশক্তির এমন-একটা 'ব্রত' বা নির্বাচনী বৃত্তি যা পরমার্থসতের আনন্ত্য হতে গড়ে তুলবে সান্তের প্রতিভাস।

বৈদিক ঋষিরা এই শক্তিকে বলতেন 'মায়া'। তাঁদের কাছে মায়া পরা সংবিতের সম্প্রজ্ঞানের বীর্য, যা অনন্ত-সন্মাত্রের অসীম বিশাল সত্য হতে সীমার রেখায় 'মিত' ক'রে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে নাম আর রূপের খেলা। এই মায়াতে স্বরূপ-সত্তার অটল সত্য দুলে ওঠে ক্রিয়াসত্তার ঋতের ছন্দে। অর্থাৎ দার্শনিকের ভাষায় বলতে গেলে, যে-পরমার্থসতের মধ্যে বিবিক্ত-সঙ্কুচিত না হয়ে সমষ্টি আছে সমষ্টিরই রূপে, এই মায়াতে সে ফুটে ওঠে প্রাতিভাসিক সত্তা হয়ে। তার মধ্যে সমষ্টি থাকে ব্যষ্টিতে এবং ব্যষ্টি থাকে সমষ্টিতে—সত্তার সঙ্গে সত্তার, চেতনার সঙ্গে চেতনার, শক্তির সঙ্গে শক্তির এবং আনন্দের

সঙ্গে আনন্দের লীলার দোলায়। প্রথমত ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির এই লীলাকে আড়াল করে রাখে আমাদেরই মনের লীলা বা মায়ার বিভ্রম। ব্যষ্টি তখন ভাবে, সমষ্টিতে সে থাকলেও সমষ্টি তো তার মধ্যে নাই। আর সমষ্টিতেও সে বিবিক্ত হয়ে আছে—সবার সঙ্গে একাকার হয়ে তো নয়। মনোলীলার এই প্রমাদ হতে দীর্ঘ সাধনায় যখন জাগি অতিমানসের লীলায় বা মায়ার সত্যে, তখন দেখি ব্যষ্টি আর সমষ্টি এক হয়ে জড়িয়ে আছে এক-সত্য আর বহু-প্রতিরূপের অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে। মনের এই-যে অবর মায়ার বঞ্চনা আমাদের এখন ঘিরে আছে, তাকে মেনেই আমরা তাকে ছাড়িয়ে যাব। কেননা, আঁধার সঙ্কোচ আর খণ্ডতায়, বাসনা সংঘর্ষ ও দুঃখতাপের বিক্ষুব্ধ বেদনায়, এও তো সেই পরমদেবতার লীলা। এ-লীলায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন তিনি তাঁরই আত্মজা শক্তির কাছে, তাই তার অন্ধতার গুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করতে তাঁর কুণ্ঠা নাই। কিন্তু আরেকটি মায়া আছে এই মনের মায়ার আড়ালে—তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে আমাদের। কেননা, এ-মায়া যে পরম-দেবতার লোকোত্তর লীলা—সত্তার অন্তহীন বিলাসে, প্রজ্ঞার ভাস্বর দীপ্তিতে, অবষ্টব্ধ শক্তির বিপুল ঐশ্বর্যে, অফুরন্ত প্রেমের উচ্ছ্বসিত উল্লাসে। এ-লীলায় শক্তির কবল হতে মুক্ত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি আত্মারামরূপে—তার জ্যোতিরুদ্ভাসিত সত্তায় সার্থক করেন তার সেই আকূতি, যার আবেগ তাঁর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল গোড়ার দিকে।

পর এবং অবর মায়ার মধ্যে এই সূক্ষ্ম দ্বৈতলীলার সমর্থন আছে ব্যক্তির ভাবে এবং বিশ্বের তত্ত্বেও। কিন্তু এদেশের দুঃখবাদী ও মায়াবাদী দার্শনিকেরা তা জানতে অথবা মানতে চান না। তাঁদের মতে মনোময়ী মায়াই (সম্ভবত তা অধিমানসেরই নামান্তর) জগৎ সৃষ্টি করেছে। তাই তার সৃষ্ট জগৎ হবে একটা অনির্বচনীয় প্রহেলিকা—চিৎসত্তার একটা স্থাবর অথচ জঙ্গম স্বপ্নবিকার, যাকে প্রতিভাস বা পরমার্থ কোনও কোঠাতেই নিশ্চয় করে ফেলা যায় না। কিন্তু মনকে স্রষ্টার আসন দেওয়া সম্যক্ দৃষ্টির পরিচয় নয়। অন্তর্যামিণী সৃষ্টিপ্রজ্ঞা আর সৃষ্টির জালে জড়িত প্রাকৃতচেতনা, দুয়ের মাঝে মন একটা তটস্থ বৃত্তি মাত্র। সচ্চিদানন্দই অবর স্পন্দলীলায় নিজেকে সংবৃত্ত করেছেন মহাশক্তির আপনভোলা জড়সমাধিতে—যেখানে নিজেরই খেলার মাঝে সে আত্মহারা। আবার সেই আত্মবিস্মৃতির আঁধার হতে ফিরে চলেছেন তিনি স্বরূপের জ্যোতির্লোকে। এই অবতরণ আর উত্তরণের লীলায় মন তাঁর অন্য-তম করণ মাত্র। সৃষ্টির অবরোহক্রমে মন একটা সাধন শুধু, সৃষ্টির নিগূঢ় প্রবর্তনা সে নয়। তেমনি আরোহক্রমেও সে একটা সংক্রান্তিদশা মাত্র—আমাদের স্বরূপের গঙ্গোত্রী বা বিশ্বসত্তার পরম আশ্রয় নয়।

যে-দার্শনিকেরা মনকেই জগতের স্রষ্টা বলে কল্পনা করেন, অথবা তাকে

মানেন বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীতের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থ বলে, তাঁদের মধ্যে দুটি পক্ষ। কেউ তাঁরা নির্বিশেষ-অধিষ্ঠানবাদী, কেউ বা বিজ্ঞানবাদী। নির্বিশেষ-অধিষ্ঠানবাদীদের মতে জগৎ কেবল মন, ভাব বা বিজ্ঞানের খেলা। তবে সে-বিজ্ঞানও অবাস্তব খেয়ালের ঢেউ শুধু, কোনও তাত্ত্বিক সত্তার সঙ্গে তার কিছু-মাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন-কি কোনও তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও তা নির্বিশেষ, অব্যবহার্য—প্রপঞ্চের সঙ্গে কোনও সাম্যই তার সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান-বাদীরা অধিষ্ঠানসত্য আর কল্পিতপ্রতিভাসের মাঝে একটা সম্বন্ধ আছে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে সে-সম্বন্ধ শুধু বিরোধ ও ব্যাবৃত্তির সম্বন্ধই নয়। এখানে আমি যে-দৃষ্টির কথা বলছি, সে কিন্তু বিজ্ঞানবাদেরই ধারা ধরে আরও এগিয়ে গেছে। এ-দৃষ্টিতে স্রষ্টৃবিজ্ঞান বস্তুত সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান অর্থাৎ তা চিৎশক্তির সেই দিব্য সামর্থ্য যা তত্ত্বের দ্যোতক, তত্ত্ব হতে জাত এবং তত্ত্বধর্মী—যা শূন্য কি অতত্ত্বের বিজৃম্ভণ নয়, বা অবস্তুর জাল বুনে চলেনি অসতের মধ্যে। এ এক চিন্ময় পরমার্থতত্ত্ব, যা নিজের অক্ষয় অক্ষোভ্য স্বরূপ-ধাতুকেই বিচ্ছুরিত করছে বিচিত্র বিপরিণামে। অতএব এ-জগৎ বিশ্বমনের একটা বিকল্প নয় শুধু। যা মনের অতীত, এ তারই আত্মরূপায়ণ। চিৎ-সত্তার ঋতের প্রকাশ এই রূপায়ণে, তা-ই হল তার প্রতিষ্ঠা। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার ঈশনাই ফুটেছে অতিমানসের 'ঋত-চিৎ'রূপে* যা লোকোত্তর ভূমিতে সদ্‌ভূত বিজ্ঞানরাজিকে বৃহৎসামের সুরসুষমায় গেঁথে নিচ্ছে—মন-প্রাণ-জড়ের ছাঁচে ঢালবার আগে।

চেতনার উত্তরায়ণের বেলায় দেখি, সদ্‌ভূত পরমার্থই আছে সকল সত্তার পিছনে অধিষ্ঠানরূপে—পরমপদে। মধ্যভূমিতে নিজেকে সে ফুটিয়ে তুলছে বিজ্ঞানময় সম্ভূতির আকারে, যার মধ্যে আছে তার স্বরূপ-সত্যের ছন্দঃসুষমা। সেই বিজ্ঞানই আবার অবরভূমিতে বিচ্ছুরিত করছে নিজেকে চিৎসত্তার বিচিত্র ছন্দোলীলায়—স্বরূপসত্তার প্রতিভাসরূপে। কিন্তু এই চিৎপ্রতিভাসের মধ্যে নিগূঢ় রয়েছে তার স্বরূপসত্তার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ। তাকে সে ফিরে পেতে চায় অখণ্ডরূপে—কখনও প্রচণ্ড এক উল্লম্ফনে, কখনও-বা বিজ্ঞানময় মধ্যভূমির সোপান বেয়ে সহজধারায়। এই আকূতি আছে বলেই মানুষের মনে জীবনের রূপ ফুটেছে পূর্ণতাহীন ছায়ার মায়া হয়ে, মনোময় পুরুষের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে এক লোকোত্তর পূর্ণতাসিদ্ধির নিরূঢ় অভীপ্সা। সে শুধু প্রতিভাসের মূলে বিজ্ঞানময় সৌষম্যকে আবিষ্কার করেই তৃপ্ত নয়, তাকেও ছাড়িয়ে সে আকুল হয়ে ছুটছে বিশ্বোত্তীর্ণের অকূল পানে। পরমার্থ—

---

* 'ঋত-চিৎ' কথাটি নিয়েছি বেদ থেকে; তার অর্থ 'বৃহৎ' বা আত্মসংবিতের অব্যাহত বৈপুল্যের মধ্যে স্বরূপ-সত্তার 'সত্য' এবং ক্রিয়া-সত্তার 'ঋতের' অকুণ্ঠ অনুভব।

বিজ্ঞান—প্রতিভাস, এই ত্রয়ীর ছন্দ আমাদের চেতনার সকল বৃত্তি, সমগ্র প্রকৃতি ও পরম নিয়তিতে। তাই একথা কিছুতেই বলা চলে না যে নিখাদ নির্বিশেষের সঙ্গে নিছক সবিশেষের একান্ত বিরোধই বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব।

শুধু মনের তত্ত্ব দিয়ে বিশ্ব-সত্তার সকল রহস্য বোঝা যায় না। একটা কথা খুবই স্পষ্ট। চৈতন্য অনন্ত হয় যদি, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রকাশ হবে অসীম জ্ঞান-বৃত্তিতে—আমরা যাকে বলি 'সর্বজ্ঞতা'। কিন্তু মনকে তো বলা চলে না জ্ঞানের বৃত্তি বা সর্বজ্ঞতার সাধন। মন হচ্ছে 'জিজ্ঞাসার' বৃত্তি। সবিকল্প মননের বিশেষ কতগুলি ধারা ধরে যতটুকু জ্ঞান সে আহরণ করতে পারে, তাকে প্রবৃত্তিসামর্থ্যের অনুকূলে ব্যবহার করাই তার ধর্ম। আহৃত জ্ঞানের সবটুকু তার দখলে থাকে না। স্মৃতির ভাণ্ডারে সে পুঁজি করে রাখে—সত্যকে নয়, সত্যের বিনিময়ে কতগুলি চলতি কড়ি। দিনের বেসাতিতে সেই পুঁজিটুকু নিয়েই তার নাড়াচাড়া। বাস্তবিক, মন 'জানে' একথা বলা চলে না। সে জানতে চায় মাত্র এবং কিছুই জানতে পারে না শুধু ছায়ার মায়া ছাড়া। বিশ্বের স্বরূপতত্ত্বকে নিজের ভূমিতে নিজস্ব ব্যবহারের প্রয়োজনে ভাঙিয়ে নেওয়া—এই তার শক্তির সীমা। কিন্তু অন্তর্যামিরূপে যে-শক্তি বিশ্বকে জানে, মন সে-শক্তি নয়। অতএব বিশ্বের প্রকাশ বা বিসৃষ্টির মূলে আছে মনেরও অতীত আর-কোনও শক্তির লীলা।

যদি বলি, ব্যক্তিমনের সংকীর্ণ উপাধি হতে নির্মুক্ত এক অনন্ত মনকে তো বিশ্বের স্রষ্টৃরূপে কল্পনা করা যায়?...তাহলে মনের যে-সংজ্ঞা দিই আমরা, অনন্ত মনে কিন্তু তার আরোপ চলবে না। উপাধিনির্মুক্ত মন হল উন্মনীলোকের তত্ত্ব, তাকে বলা যায় অতিমানসের সত্য। প্রাকৃতমনের ধর্মকেই অনন্তগুণিত করে অনন্তমনের কল্পনা করি যদি, তাহলে সে-মন সৃষ্টি করবে এক অন্তহীনা নির্ঋতি—যার মধ্যে শুধু যদৃচ্ছা অনিয়ম ও অন্ধ বিপরিণামের অকূল উত্তালতা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলবে এক অনুপাখ্য পরিণামের দিকে। আর তার মধ্যে সে অনন্তমন হাতড়ে বেড়াবে শুধু একটা অস্পষ্ট আকূতি নিয়ে। যে-মন অনন্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর, সে তো মন নয়—সে হল অতিমানসী সংবিৎ।

প্রাকৃতমন যেন আয়নার মত। তার মধ্যে ভাসে প্রাক্তন তত্ত্ব বা তথ্যের রূপ কি ছায়া। তারা আসে বাইরে থেকে—অন্তত মনের চেয়েও বৃহৎ তারা। যে-প্রতিভাস বাইরে আছে বা ছিল, মন নিজের মধ্যে পলে-পলে তার মূর্তি গড়ে। তাছাড়া তার আছে বাস্তবেরও বাইরে সম্ভাবিতের কল্পরূপ গড়বার সামর্থ্য। অর্থাৎ প্রতিভাসে আজও যা ফোটেনি কিন্তু একদিন ফুটতে পারে, তারও কল্পনা জাগে তার মধ্যে। কিন্তু লক্ষণীয়, যা ঘটবে তা যদি অতীত ও বর্তমানের নিশ্চিত পুনরাবৃত্তি না হয়, তাহলে তার ভবিষ্যরূপকে কল্পনায় ঠিকমত ফোটাতে সে পারে না। তবে যা হয়েছে আর যা হতে পারে, এ-দুয়ের সমা-

হারে একটা অভিনব রূপায়ণের আভাস দেওয়া—এ-সামর্থ্যও মনের আছে। কিন্তু এমনি করে সম্ভাবিতের সিদ্ধ আর অসিদ্ধ রূপের জোড় মেলাতে গিয়ে প্রচেষ্টা তার কম-বেশী সার্থক হয় কখনও, কখনও-বা হয় একেবারেই ব্যর্থ। এমনও দেখা যায়, কল্পনায় সে যা গড়েছিল, বাস্তবে তা ফুটল অন্যরূপে—তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে না গিয়ে চলল তা আরেক দিকে।

অনন্তমনেরও যদি এই ধর্ম হয়, তাহলে তার সৃষ্টি হবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার সংঘাতে ক্ষুব্ধ একটা অনিয়ত জগৎ। সে-জগৎ কেবলই সরে-সরে যাবে, কেবলই ভেঙে-ভেঙে পড়বে—স্রোতের টানে চলার মধ্যে কোথাও তার নিশ্চয়তার আভাস থাকবে না। যেন সে সৎও নয়, অসৎও নয়। কোনও নির্দিষ্ট নিয়তি বা ধ্রুব লক্ষ্য তার নাই, আছে শুধু ক্ষণিক লক্ষ্যের অন্তহীন পরম্পরা যার পর্যবসান বিদ্যার ঈশনা- বা দেশনা-হীন নির্লক্ষ্যের কোন্ অকূল পাথারে! এও একধরনের নির্বিশেষ-অধিষ্ঠানবাদ। এর স্বাভাবিক পরিণতি শূন্যবাদ মায়াবাদ কিংবা তার সগোত্র কোনও দর্শনে। এ-দর্শনে বিশ্ব কোনও তত্ত্বস্তু নয়, বিজাতীয় একটা-কিছুর আভাস বা প্রতিবিম্ব সে। আবার তাও আগাগোড়া একটা মিথ্যা আভাস, একটা বিকৃত প্রতিবিম্ব মাত্র। বিশ্বব্যাপারে ফুটছে শুধু মনের একটা ব্যাকুল প্রয়াস। নিজের কল্পনাকে রূপ দিতে চাইছে সে নিখুঁত করে, কিন্তু পারছে না—কারণ তার কল্পনার মূলে স্বরূপসত্যের অকুণ্ঠ প্রেতি নাই। তাই তার অতীতশক্তির মূঢ় প্রবাহ অসহায় বর্তমানকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে পরিণামহীন অব্যক্তের অকূল পারাবারে। এ নিরন্ত অভিযানে সে কূল পাবে—হয় আত্মঘাতে, নয়তো শাশ্বত নৈঃশব্দ্যের অতল গহনে।...এই তো শূন্যবাদ এবং মায়াবাদের স্বরূপকথা। যদি ধরে নিই, প্রাকৃতমন অথবা তার সগোত্র কোনও তত্ত্বই বিশ্বের পরমা শক্তি এবং বিশ্বকল্পনার আধার, তাহলে অবশ্য মায়াবাদ বা শূন্যবাদই হবে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের চরম পরিচয়।

কিন্তু অনাদি বিদ্যাশক্তিকে যখন প্রাকৃত মনঃশক্তির চেয়েও একটা বড় শক্তি বলে জানি, তখন দেখি বিশ্বতত্ত্বের এ-ব্যাখ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ অতএব অপ্রমাণ। দর্শনের একটা ধারারূপে সত্য হলেও এ কখনও সমগ্র সত্য নয়। প্রাকৃতবুদ্ধির বিচারে বিশ্বপ্রতিভাসের রীতি হয়তো এই। কিন্তু এ তো তার স্বরূপসত্য বা চরমতত্ত্বের নিরূঢ় বিধান নয়। কারণ দেহ-প্রাণ-মনের বিশ্বজোড়া খেলার পিছনেও এমন-কিছুর আভাস পাই, যা শক্তিপ্রবাহের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েনি বরং শক্তিকেই সে জড়িয়ে আছে শাস্তা হয়ে। 'অস্তিত্বের চক্রতলে বাঁধা পড়ে' তার অর্থ খুঁজে মরা—এই তো তার নিয়তি নয়। এ-জগৎ তার আপন ধাতুতে গড়া, অতএব সে তার সকল তত্ত্ব খুঁটিয়ে জানে। তাই নিজের ভিতর থেকে একটা-কিছুকে রূপ দেবার নিরন্ত প্রয়াসে অসহায়ভাবে সে ভেসে চলে না অতীত সংস্কারের দুর্নিবার বানের টানে। স্বরূপের যে পূর্ণ ছবি

ফুটে আছে তার চেতনায়, এইখানেই তার রূপায়ণ সিদ্ধ করে তোলে সে তিলে-তিলে।...বস্তুত জগৎ একটা সিদ্ধ-সত্যের প্রকাশ। এক দিব্য ক্রতুর প্রশাসন-দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, এক অনাদি স্বরূপদৃষ্টির সত্যবীর্যকেই সে ফুটিয়ে তুলছে রূপের ছন্দে। তাই ভাবকের চোখে এ-জগৎ এক দেবশিল্পীর অন্তবিহীন রূপোল্লাসের তিলোত্তমা।

যতক্ষণ মনের খেয়ালে প্রতিভাসের জগতে বাঁধা আছি, ততক্ষণ এই সর্বাতীত সর্বাধার অথচ নিত্য-অনুস্যূত অপরূপকে আমরা জানি শুধু অনুমানে—কখনও-বা আভাসে তার আবেশের অনুভব পাই। প্রকৃতির মধ্যে দেখছি প্রগতির কম্বুরেখা। তাহতে অনুমান করছি, একটা অপ্রমেয় সিদ্ধসত্যই পলে-পলে উপচে উঠছে পূর্ণতার ছন্দে। কারণ সর্বত্রই দেখি, ঋতের প্রতিষ্ঠা স্বরূপের সত্যে। অভিনিবিষ্ট হয়ে যখন তার প্রবৃত্তির নিদান আবিষ্কার করি, তখন দেখি ঋত বা বিশ্ববিধান এক অন্তরঙ্গ প্রজ্ঞার বিভূতি। সে-প্রজ্ঞা স্ফুরণোন্মুখ সত্তার মধ্যে ছিল নিরূঢ় এবং সত্তার স্বপ্রকাশের বীর্যে ছিল তার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা। এমনি করে প্রজ্ঞাই যদি ঋতের মধ্যে আনে প্রগতির প্রবর্তনা, তাহলে দিব্যদৃষ্টির অমোঘ নির্দেশকে অনুসরণ করেই যে সে-ঋতের প্রগতি, সেবিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। আরও দেখি, আমাদের বুদ্ধি প্রাকৃত-মনের খেয়ালে অসহায়ভাবে ভেসে যেতে চায় না—সে চায় মনের প্রশাসন। কিন্তু বুদ্ধিও তো চরমতত্ত্ব নয়—সেও এক বৃহত্তর চেতনার ছায়া প্রতিভূ বা বার্তাবহ মাত্র। অথচ সে-চেতনায় বুদ্ধির কোনও খেলা নাই। কেননা, সে-চেতনা সর্বময়—অতএব সব জানে বলে নিজকেও সে জানে। এইহতেই অনুমানে বুঝি, আমাদের বুদ্ধির উৎস যা, তা-ই এ-জগতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে লীলায়িত। অকুণ্ঠ প্রশাসনে এই প্রজ্ঞা নিজেই নিরূপিত করে তার ঋতের ছন্দ, কেননা কি ছিল, কি আছে এবং কি হবে—তার সকল তত্ত্ব সে জানে। ' আর এ-জানাও তার স্বভাব, কারণ এ তার শাশ্বত অনন্ত আত্মসংবিতেরই একটা ভঙ্গি। যে-সন্মাত্র অনন্তচৈতন্য-স্বরূপ এবং যে-অনন্তচৈতন্য অকুণ্ঠশক্তি-স্বরূপ, সে যখন জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ নিজেকেই প্রকট করে ছন্দঃসুষমায়, তখন তার চেতনার বিষয়কে আমাদের মনন দিয়ে জানি স্বয়ম্ভূ জগৎসত্তারূপে—যে-সত্তা তার স্বরূপের সত্যকে জেনেই তাকে ফুটিয়ে তোলে রূপের ফুলে।

কিন্তু যখন বুদ্ধিকেও স্তব্ধ করে তলিয়ে যাই নিজের মধ্যে—নিজের সেই গহনগুহায় যেখানে নিথর হয়ে গেছে মনের দোলন, তখনই ওই পরা সংবিৎ ঝিলিক হানে এই চেতনায়। হয়তো মনের চিরাভ্যস্ত সঙ্কোচ আর সংস্কারের বাধায় সে পুরাপুরি ফুটতে পায় না। তবু একবার ওই প্রকাশের ছোঁয়াচ পেলেই আমাদের সামনে একে-একে খুলে যায় জ্যোতির দুয়ার। তখন বুঝতে পারি, বুদ্ধির চঞ্চল ক্ষীণ দীপালোকে ছিল এই বৃহৎ জ্যোতিরই চপল ছায়া।

তখন দেখি, মনের ওপারে, তর্কবুদ্ধিরও এলাকা পেরিয়ে অতর্ক্য অপ্রমেয় আত্ম-জ্যোতির বিদ্যুৎ-আসনে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা আছে সমাসীনা।

চতুর্দশ অধ্যায়

অতিমানস—স্রষ্টৃরূপে

...ভেদান্
জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি।
বিষ্ণুপুরাণ ২।১২।৩৯

এসব দিব্যজ্ঞানেরই নিজরূপ।
—বিষ্ণুপুরাণ (২।১২।৩৯)

অতএব মনেরও ওপারে আছে এক দিব্যক্রতুময় চিন্ময় তত্ত্ব—অনন্তলোক যার বিসৃষ্টি। ওই স্বপ্রতিষ্ঠ অদ্বয়তত্ত্ব আর এই লীলাচঞ্চল বহুত্বের মাঝে আসন তার 'মধ্যমা বাক্' বা মধ্যস্থিতি রূপে। অমনীভাবের তত্ত্ব হলেও এ আমাদের একেবারে অনাত্মীয় নয়। আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোনও সত্তার অনধিগম্য ঐকান্তিক ধর্ম এ নয়। অথবা এ এমন-কোনও অগমদশা নয়, যেখান হতে প্রকৃতির দুর্বোধ ষড়্যন্ত্রে এই ভবসন্তানে আমরা জড়িয়ে পড়েছি—আর সেখানে ফিরে যাবার উপায় বা সামর্থ্য আমাদের নাই। প্রাকৃতচেতনার বহু ঊর্ধ্বে এ-তত্ত্বের আসন, কিন্তু তবু সে-তুঙ্গশিখর আমাদেরই স্বরূপের গঙ্গোত্রী এবং দুরারোহও তা নয়। শুধু অনুমানে বা আভাসেই তার সত্যকে জানি না, তাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার সামর্থ্যও আমাদের আছে। ক্রমিক আত্মপ্রসারণে অথবা তুরীয় চেতনার অতর্কিত বিজলীঝলকে কখনও-কখনও আমরা ওই লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই—তারপর হতে তার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকে জীবনে। আবার কখনও-বা প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন আমাদের কেটে যায় ওই অতিমানুষ অনুভবের জ্যোতির্লোকে। ফিরে যখন নেমে আসি, তখন ওপারের জ্যোতির দুয়ার হয়তো খোলাই থাকে, অথবা রুদ্ধ দুয়ার খোলবার সঙ্কেতটুকু আমরা বয়ে আনি মর্ত্যের উপকূলে। কিন্তু চিরদিনের আসন পাতা ওই ভূমিতে, যেখানে আছে সৃষ্ট জীব আর স্রষ্টা শিবের চরম ও পরম ধাম—সেই তো হবে মানুষের চিৎপরিণামের পরাকাষ্ঠা, যদি সে খোঁজে আত্মসম্পূর্তির পথ, আত্মবিলোপের নয়। কারণ, নিঃসংশয়ে বুঝেছি এবার, এই লোকোত্তর প্রতিষ্ঠাই হল সেই অনাদি পরমবিজ্ঞান, বৃহৎসামের সেই পরম সৌষম্য, সত্যের সেই চরম প্রকাশ, যার ছন্দে বাঁধা আছে এ-জগতে আমাদের দল-মেলার সাধনা এবং যার সিদ্ধি মনুষ্যপ্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়তি।

তবু সন্দেহ জাগে, এ কি কস্মিন্ কালে সম্ভব যে ওই ভূমির খবর মানুষের বুদ্ধির দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারে কেউ, অথবা মানুষের বোধ- এবং সাধন-গম্য কোনও উপায়ে ওই দেববীর্যকে জ্ঞানে ও কর্মে সঞ্চারিত করে সংসারটাকে টেনে তোলা যায় উপরপানে? অবশ্য সন্দেহেরও হেতু আছে। যতদূর জানা যায়,

মানুষের মধ্যে ওই দিব্যভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে এমন ব্যাপার শুধু-যে বিরল ও সংশয়িত তা-ই নয়। প্রাকৃত মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাচাই চললেও, তার সঙ্গে দিব্য ভাবের এতই ব্যবধান যে তাকে যাচাই করাও কখনও সম্ভব নয়। তাছাড়া মানবমানস আর দিব্য অতিমানসের স্বরূপে ও প্রবৃত্তিতে আপাতবিরোধ এতই দুরপনেয় যে, দুয়ের মাঝে কোনও যোগাযোগ কল্পনা করা বাস্তবিকই দুঃসাহসের কথা।

বস্তুত অতিমানসী চেতনার যদি মনের সঙ্গে কোনও যোগ না থাকত, কিংবা মনোময় পুরুষের সঙ্গে কোথাও তার সাযুজ্য না থাকত, তাহলে মানুষের কাছে তার কোনও বিবৃতি দেওয়া অসম্ভব হত। অথবা অতিমানস যদি প্রজ্ঞা-বীর্য না হয়ে প্রজ্ঞা-দৃষ্টি হত শুধু, তাহলে তার স্পর্শে আমাদের মধ্যে ফুটত কেবল উদ্‌ভাস্বর চিত্তের দিব্য অনুভব, কিন্তু জাগত না বিশ্বকর্মে তাকে সার্থক করবার জ্যোতির্ময় সামর্থ্য। অথচ অতিমানসী চেতনাকে আমরা জানি বিশ্বপ্রসবিনী বলে। অতএব সে শুধু প্রজ্ঞার স্থিতি নয়, তার শক্তিও বটে। শুধু জ্যোতির্ময় উন্মেষের দিব্যক্রতুই যে তার আছে তা নয়, বীর্য ও কৃতির দিকেও সে-ক্রতুর প্রবণতা আছে। আবার মন অতিমানসের বিসৃষ্টি যখন, তখন এই আদ্যা শক্তির –পরা সংবিতের এই ধর্মধুক্ মধ্যমা বাকেরই ক্রমিক সঙ্কোচ হতে তার উৎপত্তি। অতএব আত্মপ্রসারণরূপী প্রতিলোম-প্রবৃত্তির দ্বারা আবার সে ফিরে যেতে পারে তার পরম ধামে। কারণ অতি-মানসের সঙ্গে মনের একটা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে, অতএব অতিমানসের স্বরূপ-যোগ্যতাও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, যদিও ব্যাবহারিক ভূমিতে সংস্কারাচ্ছন্ন মনের বৃত্তি হয়েছে অতিমানস হতে বিভিন্ন—এমন-কি বিপরীত। তাই বুদ্ধির ভূমিতে থেকে তারই পরিভাষায় অতিমানসের একটা ধারণা করে নেওয়া সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্যের আলোচনাদ্বারা—এ-চেষ্টাও নিতান্ত অযৌক্তিক বা নিরর্থক হবে না। যে ভাব ও ভাষায় এ-বিবৃতি দিতে চাইব, নিশ্চয় তা পর্যাপ্ত হবে না। কিন্তু তবু তাদের জ্যোতির্ময় অঙ্গুলিসঙ্কেতে দূরের পথ খানিকটা যে দীপ্ত হবে, তাতে সংশয় নাই। তাছাড়া নিজের গণ্ডি পেরিয়ে মন কখনও চেতনার এমন উত্তরভূমিতে উঠতেও পারে, যেখানে অতিমানসের দীপ্তি বা শক্তির বিভূতি ছন্ন হয়ে আছে। সেইখানে চিৎপ্রভাস বোধি অথবা অপরোক্ষ-অনুভব দ্বারা মন অতিমানসের আভাস পেতেও পারে। কিন্তু একথাও মানতে হবে, অতিমানসে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার দীপ্তি ও শক্তি নিয়ে কাজ করবার পরমা সিদ্ধি আজও মানুষের আয়ত্তের বাইরে রয়েছে।

একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় এইখানে দাঁড়িয়ে, অতীতের কোনও আলোর ইশারা কি উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না ওই অজানা রাজ্যের দুর্গম রহস্য ? অন্তত একটা সংজ্ঞা, এষণার একটা আদিবিন্দু—এও কি খুঁজে পাব না

আমরা ?...চেতনার লোকোত্তর দিব্যবিভাকে আমরা নাম দিয়েছি অতিমানস। কিন্তু নামটি দ্ব্যর্থক। কেননা, মনে হতে পারে অতিমানস বুঝি প্রাকৃত মনেরই একটা উন্নত সংস্করণ—সাধারণভূমি ছাড়িয়ে মন সেখানে উঠে গেছে অনেক উঁচুতে, কিন্তু আমূল রূপান্তর ঘটেনি তার। অথবা এমনও মনে হতে পারে, যা-কিছু মনের ওপারে, তা-ই অতিমানস। তখন অর্থের অতিব্যাপ্তিতে অপ্রমেয় তত্ত্বও এসে পড়বে তার এলাকায়। তাই অতিমানসের সংজ্ঞাকে নিখুঁত করে বোঝাবার জন্য গৌণ ও আনুষঙ্গিক হলেও তার একটা বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

এইখানে রহস্যময় বেদমন্ত্র আমাদের সহায় হয়। কারণ, বেদের মন্ত্রে প্রচ্ছন্ন আছে অমৃত জ্যোতির্ময় অতিমানসেরই দীপনী—পশ্যন্তীর আলো ঝলক হানে তার মধ্যে বৈখরীর আড়াল হতে। সে-বাণীতে পাই অতিমানসের এই পরিচয়। অতিমানসী চেতনা চিদাকাশের সেই লোকাতীত বৃহৎ প্রসার, যেখানে সত্যের জ্যোতিতে অবিনাভূত হয়ে জড়িয়ে আছে ঋতের বিভূতি। সত্যেরই দিব্যদর্শন রূপায়ণ ছন্দ বাণী ক্রিয়া ও পরিস্পন্দ জ্বলে ওঠে সেখানে অকুণ্ঠ প্রত্যয়ের অনির্বাণ দীপ্তিতে এবং তা-ই আবার ঝরে পড়ে স্পন্দ ক্রিয়া ও বিভূতির ঋতময় পরিণামে—দেবতার অদব্ধ ব্রতের লীলায়নে। সম্ভূতি-সংবিতের বৃহৎ জ্যোতি এবং তার মধ্যে সত্তার সত্য ও সৌষম্যের বিপুল দীপ্তি—নির্ঋতি বা অব্যাকৃতের তমোঘন সুপ্তি নয়: সত্যের ঋতময় ক্রতুময় বিভূতিতে সত্তার সৌষম্যের অভিব্যক্তি—অতিমানসের বৈদিক বিবৃতির এই মনে হয় তাৎপর্য। দেবতারা স্বরূপত এই অতিমানসেরই বীর্য, এই অদিতি হতেই তাঁরা জাত, এই 'স্বে দমে' বা স্বধামেই তাঁরা নিষণ্ণ। প্রজ্ঞায় তাঁরা 'ঋতচিন্ময়', কর্মে তাঁরা 'কবিক্রতু'। কৃতি এবং বিসৃষ্টিতে উৎসারিত তাঁদের চিৎশক্তি বিধৃত আছে পূর্ণপ্রজ্ঞার অপরোক্ষ প্রশাসনে—যা জানে কৃত্যের স্বরূপ, বীর্য এবং ধর্ম। অতএব দেবতার অবন্ধ্য ক্রতু সার্থক হয় সে-প্রজ্ঞার শাসনে, অব্যাহত সিদ্ধির আয়োজনে কোথাও তার ছন্দোভঙ্গ হয় না। দিব্যদর্শনে যে-রূপ ফোটে, তাকে কর্মে মূর্ত করে তোলে সে অমোঘ এবং অনায়াস রূপায়ণের লীলায়। এই অতিমানসের মধ্যে জ্যোতি আর শক্তি, প্রজ্ঞার স্ফুরণ আর সংকল্পের ছন্দ অবিনাভূত হয়ে আছে এবং ধ্রুবসিদ্ধির নৈশ্চিত্যে তারা এসে মিলেছে সুষম হয়ে—বিমূঢ় এষণা বা আয়াসের কোনও অপেক্ষা না রেখে। বস্তুত অতিমানসী দিব্যপ্রকৃতির শক্তিতে আছে দুটি ছন্দ। তার বিসৃষ্টির মধ্যে আপনা হতে দেখা দেয় নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার এবং গুছিয়ে নেবার একটা সহজ নৈপুণ্য—যা উৎসারিত হয় তার স্বরূপের মর্মসত্য হতে। আবার সেই বিসৃষ্টিতেই অন্তর্গূঢ় থাকে এক দিব্যজ্যোতির স্বরূপশক্তি, যা তার মধ্যে সঞ্চারিত করে অনায়াস অথচ অকুণ্ঠিত আত্মঋতায়নের প্রেরণা।

এরই অনুষঙ্গে আরও-কিছু খুঁটিয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় বেদের মধ্যে, তাদেরও মূল্য কম নয়। ঋতচিন্ময় চেতনার দুটি মুখ্যবৃত্তির বর্ণনা করেছেন ঋষিরা। তার একটি 'চক্ষঃ', আর একটি 'শ্রবঃ'। অতিমানসী চেতনায় নিরূঢ় প্রজ্ঞাশক্তির অপরোক্ষবৃত্তি তারা—যাদের নাম দেওয়া যায় দিব্যদর্শন ও দিব্যশ্রুতি। মানুষের মনে প্রাতিভচেতনায় আর অনুপ্রাণনায় পড়ে তাদের সুদূরবিসৃপ্ত ছায়া। তাছাড়া অতিমানসের আরও দুটি বৃত্তিকে তাঁরা পৃথক করে দেখেছেন। একটি সম্ভূতিসংবিৎ বা সর্বগ্রাহী এবং সর্বগত চেতনা, যা প্রত্যক্-বৃত্ত তাদাত্ম্যসংবিতের কাছাকাছি; আর-একটি বিভূতিসংবিৎ, যার বৃত্তি বিসৃষ্টির অভিমুখে এবং যা হতে পরাক্-দৃষ্টির সূচনা। বেদের ইশারা এই পর্যন্ত। তাহলে প্রাচীন ঋষিদের আম্নায় হতে 'ঋত-চিৎ' শব্দটি আমরা নিতে পারি অতিমানসের বিকল্পে—তার অতিব্যাপ্তি বারণ করবার জন্য।

ঋষিদের বিবৃতি হতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অতিমানস চেতনা পরাবর দুটি ভূমির মাঝে যেন উত্তরণ ও অবতরণের সেতুস্বরূপ একটা মধ্যভূমি। অতিমানসকে ধরেই অবরবিভূতির বিসৃষ্টি হয়েছে পরতত্ত্ব হতে, অতএব তাকে ধরেই আবার সম্ভব হবে পরের মধ্যে অবরের উত্তরায়ণ। অতিমানসের ঊর্ধ্বে আছে বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অখণ্ড-অন্বয় চেতনা, বিবিক্তভাবের এতটুকু আভাস যার মধ্যে নাই। আর তার নীচে আছে মনের বিভজ্য সখণ্ড চেতনা, বিবিক্তভাব যার জ্ঞানের একমাত্র সাধন। একত্ব এবং আনন্ত্যের একটা অস্পষ্ট গৌণ অনুভব মাত্র তার পুঁজি—কেননা খণ্ডকে জোড়া দিয়েও সত্যকার অখণ্ডের অভঙ্গ অনুভব কখনও সে পায় না। দুয়ের মাঝে আছে অতিমানসের প্রপঞ্চোল্লাসময় সম্ভূতিসংবিৎ—সর্বগ্রাহী সর্বাবগাহী বিজ্ঞানের বীর্যে একদিকে যেমন সে ব্রাহ্মীস্থিতিরূপী তাদাত্ম্যসংবিতের আত্মজা, আর-এক দিকে তেমনি বিসৃষ্ট্যভিমুখী বিভূতিসংবিতের উল্লাসে মনোময় জগতের 'নানা' দর্শনের বা বিবিক্তবোধের জননী।

এমনি করে, ঊর্ধ্বে রয়েছে শাশ্বত অচল অব্যয় অন্বয় তত্ত্ব; নিম্নে আছে বহুর বিসৃষ্টি—শাশ্বত যার বিপরিণাম, ক্ষণিকের মেলায় একটা অপরিণামী ধ্রুববিন্দুর ব্যর্থ এষণায় যে চঞ্চল। আর দুয়ের মাঝে আছে সকল ত্রিপুটীর আধার, সকল দ্বিদলের নিলয়, সৃষ্টি-প্রলয়ের এক অক্ষমালা—যার মধ্যে একেরই বহুধাব্যঞ্জনা ফোটে বহুত্বের অদ্বৈতসম্পুটে। কেননা, একেরই মধ্যে যে আহিত রয়েছে বহুর বীর্য—বিশ্বের এই তো পরমতত্ত্ব। ব্রাহ্মী স্থিতি আর বিশ্বগতির মধ্যে এই তটস্থা ভূমিই সকল বিসৃষ্টি এবং ঋতায়নের আদি ও অন্ত—'আদিক্ষান্ত' মাতৃকার মালা, নিখিল ভেদবুদ্ধির আদিবিন্দু, আবার ঐক্যবুদ্ধিরও পরম সাধন, ভূত এবং ভব্য সকল সৌষম্যের উৎস- কৃতি- ও

সিদ্ধি-স্বরূপ। এই মহাবিদ্যার মধ্যে আছে যে এক-বিজ্ঞান, তার কুক্ষি হতে সে করে নিগূঢ় বহু-বিভূতির বিকর্ষণ। আবার বহুর নিরঙ্কুশ বিসৃষ্টিতেও আত্মহারা হয়ে হারায় না সে পরম-সাম্যের অদ্বৈতরাগিণী। মধ্যমা বাক্-রূপিণী এই 'গৌরী'ই কি জাগায় না আমাদের মধ্যে অনিরুক্ত অদ্বৈতের চরম অনুভবেরও ওপারে এক নিরুপাখ্য-সতের আভাস, মন যার কোনও আখ্যা দিতে পারে না ? শুধু অখন্ড-অদ্বয় বলে নয়, মনঃকল্পিত নির্বিশেষ বিশেষণেরও বিশেষ্য নয় বলেই যে-বস্তু দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত, একত্ব-বহুত্বের দ্বন্দ্বও যার মধ্যে নাই ? ওই তো সেই পরমার্থসতের পরম-নির্বিশেষ প্রত্যয়, যাকে আশ্রয় করে আমাদের চেতনায় ফোটে ঈশ্বরের অনুভব, ফোটে বিশ্বের বিজ্ঞান।

কিন্তু এসব কথার বিপুল ব্যঞ্জনাকে ধারণা করা বড় কঠিন। তাই আরও স্পষ্ট করেই বলছি। অদ্বৈততত্ত্বকে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ। কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যে আছে তিনটি বিভাব, তাদের মিলিয়ে পাই একটা ত্রয়ী বা দিব্যত্রিপুটী। আমরা বলি—সৎ, চিৎ, আনন্দ। তারপর বলি এ তিনটিই এক। এ হল মনের ধরন। কিন্তু এমন বিশ্লেষণ তো চলবে না অদ্বৈত চেতনায়। সেখানে সত্তাই চৈতন্য, দুয়ে কোনও ভেদ নাই; তেমনি চৈতন্যই আনন্দ, তাদের মধ্যেও ভেদ নাই।...স্বগতভেদটুকুও নাই যেখানে, সেখানে জগৎও থাকতে পারে না। অতএব অখন্ড সচ্চিদানন্দই যদি হয় পরমার্থসৎ, তাহলে জগৎ অসৎ—সে ছিলও না কোনকালে, তার কল্পনাও কখনও সম্ভব হয়নি। কারণ যে-চৈতন্য স্বরূপত অখন্ড, তার খন্ডনসামর্থ্যও নাই, কাজেই তাকে দিয়ে ভেদ ও খন্ডতার সৃষ্টি সম্ভব নয়। একেই বলে 'অজাতি-বাদ'। কিন্তু একে অসম্ভব-বাদও বলা চলে। অভাবনীয় বিরুদ্ধভাষণ অথবা পক্ষ-প্রতিপক্ষের অসমাধেয় বিরোধই সকল যুক্তির পরিণাম—একথা না মানলে এমন বাদে সায় দেওয়া চলে না।

আবার বিষয়ের খন্ডপরিণামকে সত্য বলে ধরে নিতে মনকে কোনও বেগ পেতে হয় না। সমষ্টির একটা পিন্ডবোধ অথবা সান্তের অনন্ত প্রসারের কল্পনা—এ কিছুই তার কাছে অসম্ভব নয়। খন্ডিত পদার্থের সমাহার এবং তার আধাররূপে সাদৃশ্যের বোধ, এ-ও তার আসে। কিন্তু চরম একত্ব অথবা পরম আনন্ত্য তার ধারণায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা বিকল্পবৃত্তি মাত্র। ও তো আঁকড়ে ধরার মত তত্ত্ববস্তুই নয় তার কাছে—ও-ই একমাত্র তত্ত্ব সে যে আরও দূরের কথা। অতএব মনের লীলাতে পাই অখন্ড চেতনার সম্পূর্ণ বিপর্যয়। দেখি, অখন্ড-অদ্বৈতের সত্যকে রুখে দাঁড়িয়ে সখন্ড-বহুত্বের সত্য—অখন্ডের মধ্যে সখন্ড কিছুতেই পৌঁছতে পারে না নিজের প্রলয় না ঘটিয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে মানতে হয়, তার সত্যকার কোনও অস্তিত্বই ছিল না কোনও কালে। অথচ অস্তিত্ব তার ছিল; নইলে অখন্ডকে জানল কে, প্রলয় হল

কার ?...আবার এসে পেঁছিলাম একটা অসম্ভব-বাদে। আবার দেখা দিল বিরুদ্ধভাষণের একটা উৎকট জুলুম, যা মনের মধ্যে বোধ জাগাতে চায় মনকে মূর্ছাহত করে। এতদূরে এসেও পক্ষ-প্রতিপক্ষের অনপনেয় বিরোধ তাই অনপনীতই রয়ে গেল।

অবরভূমির এ-সমস্যা মেটে, যদি মানি মন আছে চেতনার উদ্যোগপর্বে শুধু। মন বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণের সাধন মাত্র—তত্ত্বদর্শনের নয়। নিজের মধ্যে যে-অবিজ্ঞেয়ের আভাস সে পায়, তার অনিশ্চিত একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে সেই ছেঁড়াটাকেই পুরো বলা এবং সেই পুরোকে আবার টুকরা করে আলাদা-আলাদা চিন্তার খোপে ভরে নেওয়া এই হল তার কাজ। অতএব মন কেবল বস্তুর অংশ আর উপাধিকেই স্পষ্ট করে দেখে এবং তাদের তত্ত্বই জানে শুধু। অবশ্য সে-জানার ধরনও তার নিজস্ব। অখণ্ড, কতগুলি খণ্ডের সমবায় অথবা কতগুলি ধর্ম এবং উপাধির সমষ্টি—এই হল তার অখণ্ডের স্পষ্টতম ধারণা। অখণ্ডকে জানা অপর কারও খণ্ড বলে নয়, অথবা তার নিজেরও খণ্ড উপাধি বা ধর্মের সমাহার বলে নয়—মনের কাছে এ-অনুভব নিতান্তই আবছা। অখণ্ডকে ভেঙে আলাদা বস্তুর কোঠায় সে ফেলে যখন একটা বৃহৎপিণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রপিণ্ডের আকারে, মন তখনই খুশী হয়ে বলে ওঠে, 'এবার এর তত্ত্ব পেলাম।' অথচ কোনও তত্ত্বই সে পায়নি। যা পেয়েছে, সে তার নিজেরই বিশ্লেষণের খবর। বস্তুর খণ্ডভাগ আর খণ্ডধর্মই সে দেখেছে—অখণ্ডের তত্ত্ব পেয়েছে তাদের জুড়েই। মনের দোড় এই পর্যন্ত, এর পরের খবর তার কাছে অস্পষ্ট। এরও চেয়ে সত্য বৃহৎ ও গভীর জ্ঞান যদি চাই (জ্ঞানই চাই --মনের অব্যক্ত গহনে একটা তীব্র অথচ আকার-প্রকারহীন ভাবাবেশের সাময়িক আলোড়নে খুশী থাকতে না চাই যদি), তাহলে পথ ছেড়ে দিতে হবে আরেকটা চেতনার জন্য—যা মনকে পেরিয়ে গিয়েই তাকে ভরে তুলবে, অথবা হঠাৎ ডিঙিয়ে গিয়ে আগাগোড়া সব পালটে দিয়ে নতুন করে গড়বে তাকে। মনের সবার চাইতে উপরের থাক্ হল এই দিব্য বিপর্যয়ের ভিত্তিভূমি। তার পূর্ব পর্যন্ত মনের চরম সাধনা হল : জড়ের অন্ধ কারা হতে মুক্তি পেয়েছে যে-চেতনা তার আবছায়াকে স্পষ্ট করা তালিম দিয়ে, প্রবৃত্তির মূঢ় আবেগের 'পরে আলো ঢালা, বোধির চকিত আভাস এবং অনুভবের অস্পষ্টতাকে প্রদীপ্ত করে তোলা—যাতে উত্তরায়ণের জ্যোতিঃপথে নবচেতনার অভিযান সহজ হয়।...এমনি করে যে-মন চলতি পথের মাঝখানেই রয়েছে, কোথায় পাবে সে যাত্রাশেষের খবর ?

আরও একটা কথা। অদ্বৈত চেতনা বা অখণ্ড-অন্বয় তত্ত্ব তো এমন অসম্ভব একটা-কিছু নয়, যার সর্বশূন্য সর্বনাশা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে

সব কিছু আবার তলিয়ে যায় ওই অতল শূন্যতার মধ্যে। বরং একটা অনাদি আত্মসংহরণের শাশ্বতী স্থিতি সে, যার মধ্যে নিহিত আছে সব-কিছুই, কিন্তু এখানকার মত দেশে ও কালে তাদের প্রকাশ নাই। আত্মসংহরণের এই মহাবিন্দু সর্বতোভাবে অচিন্ত্য অপ্রমেয় পরমার্থসৎ-স্বরূপ—শূন্যবাদীর মন যাকে কল্পনা করে আত্মভাব ও বিজ্ঞানের চরম প্রতিষেধরূপে। আবার তুরীয়বাদী তাকেই কল্পনা করতে পারে সর্বাধাররূপে—তখন আমাদের সকল ভাব ও জ্ঞানের অব্যাকৃত পরম অয়ন সে। 'অগ্রে ছিলেন এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ'—বেদান্ত বলছে। কিন্তু ওই অগ্রবিন্দুর আগে ও পরে—এই মুহূর্তে—শাশ্বতকাল ধরে—কালেরও ওপারে আছে সেই নিরুপাখ্যসৎ, যাকে অদ্বৈতস্বরূপও বলতে পারি না। অথচ বলি, শুধু সে-ই আছে—আর-কিছুই কোথাও নাই! নির্বিকল্প চেতনায় প্রথমত জাগে তার সর্বাধার মহাবিন্দুঘন স্বরূপ, আমরা যাকে ধরতে চাই অখণ্ড-অদ্বয় তত্ত্বরূপে। দ্বিতীয়ত অনুভব করি তার বিচ্ছুরণের লীলা—যেন যা-কিছু সংহৃত ছিল সে-বিন্দুতে, পরিকীর্ণ চূর্ণালোকে ছড়িয়ে পড়ছে তা মনোগোচর বিশ্ব হয়ে। তৃতীয়ত দেখি, ঋত-চিৎরূপে তার অবিচ্যুত আত্মপ্রসারণের পরম ঐশ্বর্য, যা বিশ্ববিচ্ছুরণের আধার ও আশ্রয়রূপে চূর্ণভাবকে পর্যবসিত হতে দেয় না বাস্তব খণ্ডতায়। অন্তহীন বৈচিত্র্যকেও সে সংহত রাখে একের বৃন্তে, ক্ষণভঙ্গের চটুলতম নৃত্যের জন্য রচে অচল আসন, বিশ্বব্যাপী আপাতসংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যেও জিইয়ে রাখে ছন্দের সুষমা। এমনি করেই সে সহজ মহিমায় ফুটিয়ে তোলে বিশ্বের সহস্রদল কমল—মনের সৃষ্টি-প্রয়াস যে-ক্ষেত্রে নির্ঝাতির অসার্থক আবর্তে পাক খেয়ে মরত শুধু। একেই বলি অতিমানস, ঋত-চিৎ বা সদ্ভূত-বিজ্ঞান—যা নিজের স্বরূপ ও বিভূতি সম্পর্কে নিত্য সচেতন।

বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর ব্রহ্মসত্তার বিপুল আত্মপ্রসারণই অতিমানস। সদ্ভূত বিজ্ঞান দ্বারা পরম অদ্বয়তত্ত্ব হতে সে আবিষ্কার করে সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মহাত্রিপুটী। মহাভাবের মধ্যে এমনি করে সে বিভাব ফোটায়—কিন্তু বিভেদ জাগায় না। তার ত্রয়ীর প্রতিষ্ঠা—তিন হতে একের সমাহারে নয় মনের লীলায়; কিন্তু এক হতেই তিনকে সে ফুটিয়ে তোলে—কেননা বীজ হতে অর্থকে পর্বে-পর্বে ফুটিয়ে তোলাই তার স্বভাব। অথচ ফোটাতে গিয়েও তিনকে সে ধরে রাখে একেরই মধ্যে—কেননা প্রকাশেরও চিন্ময় আধার সে-ই। তিনটি বিভাবের একটিকে প্রধান করে কোনও দিব্যভাবের সার্থক ব্যঞ্জনা সে ঘটায় যখন, তখন আর-দুটি ভাব সংবৃত্ত বা বিবৃত্ত হয়ে থাকে সেই মুখ্য-ভাবের মধ্যে। অখণ্ডের মধ্যে বিভাবনার সূত্রপাত হয় এমনি করে। আবার এই রীতিতেই বিশ্বের সকল তত্ত্ব সকল সম্ভাবনা ফুটিয়ে তোলে সে ওই মহাত্রিপুটীর গর্ভ হতে। অতিমানসের যেমন আছে প্রচয় পরিণাম ও

স্ফুরণের সামর্থ্য, তেমনি আছে সঙ্কোচ সংবরণ ও প্রচ্ছাদনেরও সামর্থ্য। বলতে গেলে সমস্ত সৃষ্টিই যেন দুটি সংবরণের মাঝে একটা ছন্দোদোলা। তার একদিকে রয়েছে চৈতন্য—সব-কিছু যার মধ্যে সংবৃত্ত এবং যা হতে বিবৃত্তির একটি দোলা চলেছে নীচের দিকে জড়ের প্রত্যন্তে। আবার আর একদিকে জড়ের মধ্যেও সংবৃত্ত হয়ে আছে সব-কিছু—বিবৃত্তির আরেক দোলায় উপরপানে তারা চলেছে চৈতন্যের প্রত্যন্তে।

বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে আছে ঋত-চিতের যে-বিভাবনা, তার সমগ্র রূপটি তাহলে এই। বিশ্বের রূপায়ণে নিয়ত প্রচ্ছুরিত হচ্ছে কতগুলি তত্ত্ব শক্তি ও রূপ। কিন্তু অতিমানসের সম্ভূতিসংবিৎ তাদের মধ্যেও দেখতে পায় অখণ্ডসত্তার অন্তর্গূঢ় পরিশেষকে। অথচ বিভূতিসংবিৎ সেই পরিশেষকে প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু তত্ত্ব শক্তি ও রূপের বিশিষ্ট প্রকাশকে করে পুরোধা। এই জন্যেই দেখি, ব্রহ্মাণ্ডে যেমন আছে পিণ্ড, পিণ্ডেও তেমনি রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। তাই তো প্রত্যেক সত্ত্বের বীজসত্তা বহন করে অনন্ত সম্ভাবনার দ্যোতনা। অথচ চিৎপুরুষের জ্ঞানাশক্তি বা ঋতসংকল্পের দ্বারা বিধৃত হয়ে তা অনুসরণ করে রূপায়ণ ও পরিণামের একটিমাত্র ছন্দ। এ-লীলায়ন পরমপুরুষের আত্মবিসৃষ্টি বলেই তার মধ্যে আছে তাঁর দিব্য বিজ্ঞান-ধাতুর সংকল্প ও প্রশাসন। আত্মস্বরূপের স্বগত-সত্যদর্শনের বীর্যই নিহিত রয়েছে বীজ-সত্তায়। তাই সে-দর্শনের বীজ স্বতই অংকুরিত হয় স্বকৃৎ সত্যের স্বাতন্ত্র্য-লীলায়।—পুষ্টি রূপায়ণ ও প্রবৃত্তির স্বভাবছন্দে, তাঁর পূর্ব্য ব্রতের আমোঘ অনুশাসনে। অতএব নিখিল বিসৃষ্টির মূলে আছে চিৎস্বরূপের কবিক্রতু। তাঁর আত্মসমাহিত বিজ্ঞানের অমোঘ সত্যবীর্যকে এমনি করে তিনি বিচ্ছুরিত করে চলেছেন শক্তি ও রূপের বিভূতিতে।

সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের এই পরিচয় হতে ধরা পড়ে, মনশ্চেতনা ও ঋত-চিতের স্বরূপে তফাত কোথায়। মননকে আমরা ভাবি সৃষ্টিছাড়া, আচ্ছিন্ন, অবাস্তব, বস্তুর তত্ত্ব হতে বিবিক্ত একটা-কিছু। কেউ জানে না, কোথা হতে মনন এসে বিষয় হতে তফাত থেকে দখল করে পরীক্ষক, বোদ্ধা এবং বিচারকের আসন। সব-কিছুকে ভেঙে দেখা যে-মনের স্বভাব, অন্তত তার কাছে তো মননের এই পরিচয়। মনের প্রথম কাজ হল চারদিকে গণ্ডি টেনে বিষয়কে আলাদা করা। বিবেকের চেয়ে বিদারণের দিকেই তার ঝোঁক। তাই বস্তুর সত্য আর বস্তুর মননের মাঝে গভীর এক বিদারণরেখা টেনে দুয়ের মাঝে নাড়ীর যোগ সে ছিন্ন করে। কিন্তু অতিমানসে সমস্ত সত্তাই চিৎস্বরূপ, সমস্ত চেতনা সত্তারই চেতনা। তাই বিজ্ঞান বা ভাব সেখানে চেতনারই বিদ্যুৎগর্ভ স্পন্দন এবং সত্তার গর্ভেও সে ভ্রূণরূপে জাগিয়ে তোলে আত্মস্পন্দনের শিহরন। সৃষ্টিবিমুখ আত্মসংবিতের মধ্যে যা প্রলীন হয়ে ছিল, সৃষ্টিকুশল আত্মজ্ঞানের

আকারে তার যে-আদিব্যুত্থান, তাকেই বলি 'ভাব'। যা বস্তু-সৎ, এমনি করে তা-ই দেখা দেয় ভাব-সৎ হয়ে। ভাবের সেই বাস্তব সত্তাই তখন বিবর্তিত হয় আত্মচেতনার স্বয়ম্ভূবীর্যে। ভাবাধিরূঢ় সংকল্পের প্রবেগে আপনাকে সে ফুটিয়ে চলে—নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে নিহিত যে চিন্ময় অনুভব, তার অনির্বাণ দীপ্তিতে উন্মেষিত হয় তার আত্মরূপায়ণের কমলদল। সমস্ত সৃষ্টির, সকল পরিণামের মর্মসত্য এই।

সত্তা সংবিৎ এবং সংকল্প মনোজগতে যেমন পৃথক-পৃথক, অতিমানসে কিন্তু তেমন নয়। সেখানে তারা ত্রয়ীস্বরূপ—একই মহাস্পন্দের ত্রিস্রোতা পরিণাম। প্রত্যেকের আছে পরিণামের একটা বিশিষ্ট ধারা। সত্তা স্ফুরিত হয় সেখানে অধিষ্ঠানধাতুরূপে। সংবিৎ ফোটে বিদ্যাশক্তি হয়ে, রূপকৃৎ ভাবের স্বাতন্ত্র্যরূপে, সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ছন্দে। আর সংকল্প সঞ্চার করে আত্মসম্পূর্তির সংবেগ। কিন্তু ভাব বা বিজ্ঞান সেখানে বস্তু বা পরমার্থ-সতের স্বয়ংজ্যোতির ছটা। মনের চিন্তা বা কল্পনা বলা যায় না তাকে, কেননা তার মধ্যে আছে স্বতঃসম্ভূত আত্মসংবিতের লীলা। তাই তাকে বলি সম্ভূতবিজ্ঞান বা ভাব-সৎ।

অতিমানস বিজ্ঞানে জ্ঞান ও সংকল্প একেবারে অবিনাভূত, কোনও বিচ্ছেদের সম্ভাবনাই নাই তাদের মধ্যে। জ্ঞানের সঙ্গে সত্তা বা স্বরূপধাতুরও কোনও ভেদ নাই সেখানে, কেননা জ্ঞান সে-ভূমিতে সত্তার অবিনাভূত স্বরূপ-জ্যোতি। দীপশিখার শক্তি যেমন অগ্নির স্বরূপ হতে আলাদা নয়, তেমনি বিজ্ঞানের শক্তিও সত্তার স্বরূপধাতু হতে আলাদা কিছু নয়—কেননা সদ্ভূত-তত্ত্ব নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে বিজ্ঞান ও তার পরিণামের ভিতর দিয়েই। আমাদের মধ্যে ভাবের সঙ্গে জাগে তার অনুরূপ একটা সংকল্প, অথবা সংকল্পের সংবেগ হতে বিমুক্ত একটা ভাব। কিন্তু কার্যত আমরা ভাবকে দেখি সংকল্প হতে পৃথক করে এবং দুটিকেই আবার নিজের থেকে তফাত করি। আমি আছি; আমার সত্তায় ভাব একটা রহস্যময় আচ্ছিন্ন আবির্ভাব। তেমনি আমার সংকল্পও একটা রহস্য—একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে না হয়ে কতকটা তার কাছাকাছি। তবু আমার সংকল্প কখনও আমি নয়। আমিই তাকে আঁকড়ে ধরি আর সে-ই আমাকে আঁকড়ে ধরুক, সংকল্প আমার স্বরূপ নয় তবু। তাছাড়া সংকল্প, তার সাধন আর তার পরিণাম—এ তিনটিও আমার কাছে পৃথক-পৃথক। কেননা, স্পষ্টই দেখছি, আমার বাইরে আমা-হতে আলাদা একটা বাস্তব সত্তা রয়েছে তাদের। অতএব আমি, আমার ভাব বা আমার সংকল্প—এদের কারও মধ্যে নাই স্বতঃস্ফুরণের প্রবেগ। ভাব খসে পড়তে পারে আমার থেকে, সংকল্প হতে পারে ব্যর্থ, সাধনের অভাব ঘটতে পারে—এবং এ-তিনের কারচুপিতে আমি স্বয়ং হতে পারি অসার্থক।

কিন্তু খণ্ডভাবের এমন কুণ্ঠা অতিমানসের এলাকায় নাই—কেননা সত্তা জ্ঞান বা শক্তি কোনটার মাঝেই সেখানে স্বগতভেদ নাই, যেমন আছে মনের জগতে। স্বগতভেদ তো নাই-ই, সজাতীয় অথবা বিজাতীয় ভেদও নাই তাদের মাঝে। কারণ, অতিমানসই 'বৃহৎ'। তার প্রবৃত্তি একত্ব হতে, খণ্ডতা হতে নয়। সর্বগ্রাহিতাই তার মৌলিক ধর্ম, বিভাবনা তার গৌণ-বিলাস শুধু। অতএব সদ্‌ভূততত্ত্বের যে-সত্তাই তার মধ্যে ফুটুক, বিজ্ঞানে দেখা দেয় তার অবিকল প্রতিরূপ এবং সংকল্প হয় সে-বিজ্ঞানের একান্ত অনুগামী (কেননা শক্তি চেতনারই অখণ্ড বীর্য)। ফলে চিৎশক্তির পরিণামও হয় সংকল্পের অনুযায়ী। তাই অতিমানসের জগতে ভাবের সঙ্গে ভাবের, শক্তির সঙ্গে শক্তির অথবা সংকল্পের সঙ্গে সংকল্পের বিরোধ নাই কোনও—যেমন অহরহ দেখতে পাই মানুষের জগতে। অতিমানসে আছে এক বিরাট চেতনা, সকল ভাব যার দিব্যভাবনার অঙ্গীভূত অতএব যোগযুক্ত। আছে এক বিরাট ক্রতু, যার অমেয় আত্মশক্তির সমুল্লাসে বিধৃত রয়েছে নিখিল শক্তির বিকিরণ। একটি বিভাবকে সংহৃত করে আরেকটি বিভাবকে এগিয়ে দেয় সে—নিজেরই বিজ্ঞানময় ক্রতুর দিব্যদর্শী ছন্দোলীলায়।

বিশ্বের মূলে এই মহাভাবের অনুভূতি হতেই প্রচলিত সকল ধর্মে এসেছে সর্বজ্ঞ সর্বাধিষ্ঠান ও সর্বশক্তিমান ভগবানের ধারণা। অযৌক্তিক কল্পনা-বিলাস একে বলতে পারি না, কেননা কোনও সর্বাবগাহী দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে এর যেমন বিরোধ নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক সমীক্ষা ও অনুভবেও এর ইশারা পাই। জীবে-শিবে, ব্রহ্মে-জগতে অনপনেয় বিরোধকল্পনাই সকল প্রমাদের মূল। সেই প্রমাদের বশে, সত্তা চেতনা ও শক্তির মাঝে অর্থক্রিয়ার দরুন বিভাবের যে-ভেদ, তাকেই আমরা ফাঁপিয়ে করি স্বরূপের ভেদ। কিন্তু একথার আলোচনা পরে। আপাতত দেখতে পেলাম, পরাবরের মাঝখানে স্রষ্টৃরূপী অতিমানসকে মানবার প্রয়োজন কি। খানিকটা পরিচয়ও তার পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, এই দিব্য মহাভাবের মধ্যে বিশ্বনিখিল সত্তায় সংবিতে সংকল্পে ও আনন্দে অখণ্ড-সমাহিত হয়ে আছে। অথচ তার মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বিভাবনারও অন্তহীন সামর্থ্য। সে-বিভাবনা একত্বকে নষ্ট করে না, তাকে ফুটিয়ে তোলে আরও স্পষ্ট করে। সত্য সে-মহাভাবের স্বরূপধাতু। সে-সত্যের প্রকাশ বিজ্ঞানরূপে, এবং বিশ্বরূপে তার বিমর্শ। একই সত্যে তার মধ্যে বিধৃত রয়েছে জ্ঞান আর সংকল্প। আত্মসম্পূর্তির এক অখণ্ড সত্যে তাই উপচে পড়ছে স্বরূপের আনন্দ—কেননা আত্মসম্পূর্তিমাত্রেই আত্মসত্তার পরিতর্পণ। শাশ্বতকাল ধরে এমনি করে বিশ্বজোড়া ভাঙা-গড়ার লীলায় বেজে উঠছে এক স্বয়ম্ভূ নিত্যযুক্ত সৌষম্যের আনন্দ-ঝংকার।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঋত-চিৎ

যত্র...সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্‌...এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ৫, ৬

অতিচেতনার সুষুপ্তিতে অবস্থিত তিনি প্রজ্ঞানঘন হয়ে—আনন্দময়, আনন্দভোক্তা...ইনিই সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই সবার উৎস।
—মাণ্ডূক্য উপনিষদ (৫, ৬)

এই-যে সর্বমূল সর্বায়তন সর্বপ্রতিষ্ঠা অতিমানসের কথা বললাম, তাকে জানতে হবে পরমপুরুষের স্বভাব বলে। তাঁর নির্বিশেষ 'স্বয়ম্ভূ' স্বভাব এ নয়, এ তাঁর বিশ্বেশ্বর বিশ্বভাবন 'পরিভূ' স্বভাব। তাঁর এই স্বরূপকেই আমরা বলি ঈশ্বর। এমন ঈশ্বর অবশ্য পাশ্চাত্যের লোকাতত 'গড্‌' নন, কেননা 'গড্‌' বিশেষ করেই 'পুরুষবিশেষ' এবং সোপাধিক—এমন-কি তাঁকে বলা চলে মানুষেরই অতিপ্রাকৃত রাজাধিরাজ সংস্করণ। সৃষ্টিপর অতিমানস আর জীবের অহন্তার মাঝে একটা বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করেই পাশ্চাত্য কল্পনায় ঈশ্বরের এই নিতান্ত মানুষী কল্পপ্রতিমা গড়ে উঠেছে। দিব্য-পুরুষ যে 'পুরুষবিধ', সেকথাও ভুললে চলবে না আমাদের, কেননা নির্বিশেষ সন্মাত্র সত্তার অন্যতম বিভাব শুধু। দিব্য-পুরুষ যেমন সর্বময় 'সত্তা'মাত্র, তেমনি আবার অদ্বিতীয় 'সৎ'স্বরূপও তিনি; অদ্বিতীয় চিৎ-পুরুষ হয়েও তিনি পুরুষ বা পুরুষোত্তম।...যা-ই হ'ক, তাঁর এ-বিভাব নিয়ে আলোচনা আপাতত তোলা রইল। আমরা এখন ডুবতে চাই দিব্য-পুরুষের অপুরুষবিধ স্বরূপের মননে—এ-সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে করতে চাই মার্জিত এবং উদার।

নিখিল বিশ্বে ঋত-চিৎ সর্বানুস্যূত হয়ে আছে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে, যা দিয়ে অখণ্ডসৎ আপন অন্তহীন বহুত্বের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলেন বিচিত্র ছন্দোলীলায়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নইলে তাঁর বিসৃষ্টি হত নির্ঋতির মেঘচ্ছায়া, কেননা তাঁর অমেয় ব্যঞ্জনা-শক্তিতে কে তখন আনত ছন্দোমিতি ? প্রত্যক্‌-দৃষ্টির সৌষম্য নাই বিশ্বে, নাই ঋতের প্রশাসন, বীজের পরিণামে পূর্বনিহিত নাই বিজ্ঞানের অন্তর্যামী প্রেতি—এই যদি হত বিসৃষ্টির ধারা, তাহলে এ-জগৎ হত অব্যাকৃত অনিশ্চিতির একটা প্রমত্ত ফেনোচ্ছ্বাস। কিন্তু যে-প্রজ্ঞা বিশ্বের প্রসূতি, বিসৃষ্টিতে আছে তার আত্মবীর্যেরই রূপায়ণ—

অনাত্মবস্তুর সংঘটন নয়। তার স্বরূপসত্তায় নিহিত আছে প্রত্যেকটি অভিব্যঞ্জনার মর্মচর ঋত ও সত্যের অপরোক্ষ অনুভব। তার নিরূঢ় সংবিৎ জানে, বিচিত্র অভিব্যঞ্জনার বিক্ষিপ্ত দল কী নিগূঢ় যোগের ছন্দে মিলবে এসে কোন্ সৌষম্যের বৃন্তে। যে-বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভূ-কল্পনায় একটা বিশ্বের আবির্ভাব, বিশ্বের জন্মলগ্নেই তার হৃৎস্পন্দনে জাগে বৃহৎসামের ঋতসুষমা—বিশ্বমূলা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার পূর্বচিত্তি হতে যা সঞ্চারিত হয় বিশ্বের অণুতে-অণুতে। অতএব বিশ্বের পরিণামে সে-সুষমা তার অন্তর্নিহিত প্রেতির বেগেই হয় রূপায়িত। এই প্রজ্ঞাই জগতের ধর্মধৃক্, 'গোপা ঋতস্য'—নিখিল ধর্মের উৎসরূপিণী ও ধাত্রী। যদৃচ্ছার অনিয়ম নাই সে-ধর্মে, কেননা প্রত্যেক বস্তুর স্ব-ভাবের স্ফুরণ সে এবং সে স্ব-ভাবও বস্তুর বীজভাবে নিহিত সদ্ভূতবিজ্ঞানের অপ্রতিহত সত্যবীর্য। অতএব বিসৃষ্টির পূর্বক্ষণে তার সমগ্র পরিণামের ছন্দটি বিধৃত থাকে বিসৃষ্টিরই নিগূঢ় আত্মসংবিতে, এবং পরিণামের মধ্যে মুহূর্তে-মুহূর্তে তার স্বতঃপ্রবৃত্তির লীলায় সে হয় উৎসারিত। তাই সৃষ্টি-পরিণামের প্রতিমুহূর্তে ঘটে তার অন্তর্গূঢ় অনাদি স্বরূপসত্যের সুনিয়ত স্ফুরণ। সেই সত্যের প্রবেগই অমোঘবীর্যে নিয়ন্ত্রিত করে তার ভবিষ্য চরণক্ষেপ। এমনি করে পরিণামে পুষ্পিত ও ফলিত হয় তার বীজসত্তার অন্তর্নিহিত আকূতি।

স্বরূপ-সত্যের ছন্দে এমনি করে বিশ্বের যে পুষ্টি ও প্রগতি, তার মূলে আছে কালের কলনা, দেশের ব্যবস্থা এবং নিমিত্তের পরম্পরা। দেশে ব্যবস্থিত বস্তু-সমূহের সুনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে কালের পৌর্বাপর্য যুক্ত হয়ে দেখা দেয় 'নিমিত্ত'। দার্শনিকেরা বলেন, দেশ ও কাল আমাদের মনের কল্পনা, তাত্ত্বিক সত্য নয়। কিন্তু বিশ্বের সব-কিছুই যখন আত্মসংবিতের আধারে চিৎ-সত্তার আত্মরূপায়ণ, তখন দেশ-কালের ওই বৈশিষ্ট্যটুকুর বিশেষ সার্থকতা কিছুই নাই। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেশ ও কাল চিৎস্বরূপের আত্মব্যাপ্তির স্বানুভব—তাঁর পরাক্ ব্যাপ্তিই দেশ আর প্রত্যক্ ব্যাপ্তিই কাল। আমাদের মন এ-দুটি পদার্থকে দেখে পরিমাণের ভিতর দিয়ে। মন বিভজনধর্মী, খণ্ড-প্রবৃত্তিতেই তার স্বাচ্ছন্দ্য। তাই অপরিমিতকে পরিমিত করা মনের পক্ষে স্বাভাবিক। নিরবচ্ছিন্ন গতির প্রবাহকে ক্ষণভঙ্গে অবচ্ছিন্ন ক'রে, তার একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে সামনে-পিছনে মেলে দিয়ে মন পায় কালের কল্পনা। তাতেই সত্তার অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতা তার চেতনায় পরিমিত হয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঢেউয়ের খেলায়। আবার অবিভক্ত স্থিতির ব্যাপ্তিকে বিভাগের কল্পনায় পরিমিত করে তার একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মন দেখতে পায় দেশ। নিজের সেই অবস্থানবিন্দুর চারদিকেই বস্তুব্যবস্থাকে সে সাজিয়ে তোলে সম্বন্ধের জটিল জালে।

ব্যবহারিক জগতে, মনের কাছে কালের পরিমিতি হয় ঘটনায়, আর দেশের পরিমিতি জড়বস্তুতে। কিন্তু চিত্তের অসঙ্কীর্ণ অবস্থায়, ঘটনার প্রবাহ এবং বস্তুর সংস্থানকে উপেক্ষা করেই অনুভব করা চলে চিৎশক্তির সেই বিশুদ্ধ স্পন্দন—দেশ ও কালের যা স্বরূপ-ধাতু। তখন দেখি, দেশ আর কাল বিশ্ব-ব্যাপিনী চৈতন্য-শক্তির দুটি বিভাব মাত্র। তাদের ওতপ্রোত সম্বন্ধের টানাপ'ড়েনেই বোনা হয়েছে তার কর্মকর্তৃত্বের পটভূমিকা। আবার উন্মনী দশায় দেখি, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যবসিত এক অখণ্ডসত্তায়। ত্রিকাল সেখানে চেতনার আধেয়—আধার নয়। কোনও ক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাকে উন্মুখ হতে হয় না প্রসর্পণের জন্য। এ-অনুভবে কাল শুধু নিত্য বর্তমান। কোনও দেশবিন্দুতেও সে-চেতনার অধিষ্ঠান নয়, কেননা সকল বিন্দু ও স্থানের আধার সে-ই। তাই দেশও তার কাছে অখণ্ড প্রত্যক্-ব্যাপ্তি মাত্র। আকাশ চিদাকাশ, কাল মহাকাল সে-চেতনায়। এক অখণ্ডদৃষ্টির অপ্রচ্যুতসংবিন্ময় একাত্মপ্রত্যয়ে বিধৃত রয়েছে বিশ্বের স্পন্দলীলা—এ-অনুভবও আমাদের কখনও জাগে।...কিন্তু দেশ ও কালের তুরীয় সত্যের স্বরূপ কি, এ-প্রশ্ন নিরর্থক, কেননা সে-স্বরূপের ধারণা প্রাকৃতমনের সাধ্যাতীত। এমন-কি অখণ্ড-অদ্বয়তত্ত্ব যে ইন্দ্রিয়মনের সাহায্য ছাড়াও বিশ্বকে জানতে পারে, এটুকু মানতেও প্রাকৃতমন রাজি নয়।

কালের পরম্পরা ও দেশের খণ্ডতাকে পরম ঐক্যে সংহত করে অতিমানস কি করে তার অখণ্ডদৃষ্টির সর্বগ্রাহী প্রত্যয়ে জড়িয়ে আছে, আভাসে তার অনুভব পাই। এই অনুভবকে পূর্ণায়ত করে তোলাই আমাদের পুরুষার্থ। কালকলনা ও দেশব্যবস্থা, বিসৃষ্টির পক্ষে দুইই প্রয়োজন। কালের পরম্পরা বলে কিছু না থাকত যদি, তাহলে পরিবর্ত বা প্রগতিও সম্ভব হত না। পরিপূর্ণ সৌষম্যের নিত্য প্রকাশই তখন হত বিশ্বের নিত্যলীলা—এক শাশ্বত ক্ষণের বৃন্তে সংহত হত সৌষম্যের সকল দল, অতীত হতে ভবিষ্যের তরঙ্গ-দোলা থাকত না তার মধ্যে। কিন্তু বিশ্বে দেখছি আমরা উপচীয়মান সৌষম্যের নিত্যপরম্পরা—অতীতের তপস্যা হতে তাকে আত্মসাৎ করে বর্তমানের অভ্যুদয়। তেমনি বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে যদি খণ্ডিত দেশের ভাবনা না থাকত, তাহলে রূপে-রূপে বিচিত্র সম্বন্ধের এই নশ্বর লীলা, শক্তির সঙ্গে শক্তির এই অন্যোন্যসংঘাত—এও তো দেখা দিত না। বিশ্বের তখন সত্তা থাকলেও থাকত না স্ফুরত্তা। এক দেশহীন বিশুদ্ধ প্রত্যক্-চেতনা অন্তরাবৃত্ত প্রত্যয়ের অনড় মুষ্টিবন্ধনে গুটিয়ে রাখত বিশ্বের সকল সম্ভূতি—হিরণ্যগর্ভের কবিমানসে জগৎস্বপ্নের মত, কিন্তু আত্মবিসৃষ্টির পরাক্-ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে দিত না নিজেকে সবার মধ্যে রূপোল্লাসের অনন্ত ব্যঞ্জনায়। আবার কালই শুধু সত্য হত যদি, তার পরম্পরায় তাহলে ছন্দিত হত শুধু

সত্তারই বিশুদ্ধ স্ফূর্তি—যার মধ্যে তপশ্চিতের একটি পর্বের পর আরেকটি পর্ব দেখা দিত প্রত্যক্-চেতনার স্বচ্ছন্দ স্বাতন্ত্র্যের লীলায়—সুরের মূর্ছনা অথবা কবিকল্পনার বলাকার মত। কিন্তু বিশ্বলীলায় ফুটেছে সর্বাধার দেশের পরিব্যাপ্তিতে রূপ ও শক্তির বিচিত্র যোগাযোগ এবং কালের ছন্দে মালা গাঁথা চলেছে তাদের নিয়ে। দেখছি, বিশ্ব জুড়ে শক্তির অবিরাম লীলা, রূপায়ণের অন্তহীন পরম্পরা, ঘটনার অফুরন্ত বৈচিত্র্য।

অভিব্যঞ্জনার বহুমুখী সমাবেশ দেশ ও কালের বুকে বিচিত্র সামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিয়ে ব্যূহিত আছে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে। তাই কালের পরম্পরা আমাদের মনে দেখা দেয় সংঘাতে ও সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ বস্তুবিপরিণামের আকারে—অনায়াস পারম্পর্যের সাবলীল ছন্দে নয়। কিন্তু বাস্তবিক বস্তুবিপরিণামের অন্তরে আছে স্বত-উৎসারণের সহজতা—বাইরের সংঘাত ও সংঘর্ষ তার একটা বহিশ্চর গৌণবিভাব মাত্র। সব-কিছুর অন্তরে রয়েছে অখণ্ড স্বভাবের ঋতায়ন—সৌষম্যের সুরে বাঁধা। সেই ঋতের প্রশাসনে বাইরের অংশতঃ-বিপরিণামে দেখা দেয় সংঘর্ষের প্রতিভাস। অতিমানসী দৃষ্টি ওই সৌষম্যের বৃহৎ ও গভীর সত্যকেই দেখতে পায় সবার মধ্যে। কিন্তু মনের আছে বিবিক্ত বস্তুদৃষ্টি, তাই বৈষম্যই তার চোখে পড়ে সবার আগে। অথচ অতিমানস এক নিত্য-উপচীয়মান সৌষম্যের অঙ্গীভূত দেখে বৈষম্যকে—কেননা তার দৃষ্টিতে বিশ্বনিখিল বহুধারূপায়িত একেরই বিভঙ্গ শুধু। তাছাড়া মনের কাছে আছে একটিমাত্র খণ্ডদেশ ও খণ্ডকাল। তার মধ্যে সে দেখে অগণিত সম্ভাবনার তুমুল একটা বিপর্যাস—সার্থকতার বিচিত্র তারতম্যের আভাসে সঙ্কুল। কিন্তু অতিমানসী দৃষ্টিতে ভাসে দেশ ও কালের সমগ্র প্রসার। অতএব নির্ভুলভাবে সে দেখতে পায় মনঃকল্পিত সম্ভাবনা ছাড়া আরও বহু সূক্ষ্ম সম্ভাবনা। তার দর্শনে নাই অনিশ্চয়তা বা বিশৃঙ্খলার এতটুকু ছোঁয়াচ। কারণ, দেশ-কাল-নিমিত্তের যথাযথ পরিবেশে স্বভাবের কোন্ শক্তি বা কি নিয়তি কাজ করছে প্রত্যেক অভিব্যঞ্জনার মূলে, কি ধারায় কোন্ পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে তাকে, অতিমানসের দিব্যদৃষ্টিতে কিছুই তার গোপন নাই। অবিচল সমগ্র দৃষ্টিতে বস্তুদর্শন মনের ধর্ম নয়। কিন্তু লোকোত্তর অতিমানসের তা-ই স্বভাব।

আত্মরূপায়ণের সকল বিভূতি শুধু-যে ফুটে আছে অতিমানসের চিন্ময়ী দৃষ্টিতে, তা নয়। সবার মধ্যে ব্যাপ্ত-অনুস্যূত হয়েও আছে সে অন্তর্যামী স্বয়ংজ্যোতির দীপ্তি নিয়ে। তার সত্তা গুহাহিত হয়েও ভূতে-ভূতে শক্তির বিভূতিতে-বিভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট বিশ্ব জুড়ে। অতিমানসের স্বতঃস্ফূর্ত অকুণ্ঠ প্রশাসনেই নিরূপিত হচ্ছে বিশ্বের ব্যাকৃত শক্তি ও প্রবৃত্তি। নিয়মের শাসন সে-ই আনছে তার প্রবর্তিত বৈচিত্র্যের লীলায়। সিসৃক্ষার তেজকে

সংহত, বিচ্ছুরিত, বিপরিণামিত করছে সে-ই। আর নিখিলব্যাপী এই বিচিত্র কৃতির মূলে আছে তার স্বয়ম্ভূ প্রজ্ঞার প্রেতি, যা রূপবিসৃষ্টির আদিমক্ষণে, শক্তি-প্রচলনের ব্রাহ্মমুহূর্তে নিরূপিত করেছে বিশ্বদেবের প্রথম ধর্ম* - 'ধর্মাণি যা প্রথমান্যাসন্'। এই অতিমানসই গীতার ভাষায় 'সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি—ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'; উপনিষদ একেই বলছেন—'তদ্ অন্তরস্য সর্বস্য, তদ্ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'; এই 'পরিভূঃ কবিঃ'-ই 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'।

বিশ্বের সর্বভূতে—জড়ে-অজড়ে, চেতনে-অচেতনে—অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে এক পরমা প্রজ্ঞা ও শক্তি, বস্তুর সত্তা ও প্রবৃত্তিকে বিধৃত রেখেছে যা আপন প্রশাসনে। তার সম্পর্কে সচেতন নই আমরা, তাই কখনও তাকে ভাবি অবচেতন, কখনও-বা অচেতন; কিন্তু বাস্তবিক চেতনা তার 'গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্ট' হয়ে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। তাই বুদ্ধিযুক্ত না হলেও বুদ্ধির আপাতলীলা জগতের সকল বস্তুতেই আছে। উদ্ভিদ্ বা পশুর মধ্যে সে-বুদ্ধি স্তিমিত, অর্ধস্ফুট। কিন্তু সকল বুদ্ধিই গুহাশায়ী দিব্য অতিমানসের সদ্ভূত-বিজ্ঞানের দীপ্তি। ঘটে-ঘটে এই-যে অন্তর্যামী বুদ্ধির প্রশাসন, এ তো মনোময় নয়। এ সন্মাত্রেরই স্বয়ংপ্রজ্ঞ স্বরূপসত্য, যার মধ্যে আত্মসংবিৎ আছে আত্মসত্তার অবিনাভূত হয়ে। এই তো ঋত-চিৎ। মনের বিকল্পনার 'পরে তার সিসৃক্ষার নির্ভর নয়। প্রজ্ঞানুসারী তার বিসৃষ্টি যার মূলে আছে অনির্বাণ আত্মদর্শন ও স্বতঃসিদ্ধ অখণ্ডসত্তার অকুণ্ঠ বীর্যের প্রেতি। মনন ছাড়া মনোময়ী বুদ্ধির চলে না কেননা চিৎশক্তির সে একটা আভাসমাত্র। তাই তার ধ্রুব জ্ঞান নাই—আছে কেবল জিজ্ঞাসা। এক লোকোত্তর প্রজ্ঞার লীলাকে অনুসরণ করে সে কালবৃত্তির পরম্পরায় এইটুকু তার সাধ্য। কিন্তু সে-প্রজ্ঞা শাশ্বত অখণ্ড অব্যয়। কাল তার করামলকের মত, তাই তার দৃষ্টির একটি ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

এই তবে অতিমানস দিব্যচেতনার আদিপ্রবর্তনা। এ এক বিশ্বম্ভর সত্যদর্শন যা সর্বায়তন সর্বাধিবাস ও সর্বগত। দেশকালাতীত অবিচল স্বাত্মবোধরূপ প্রত্যক্‌চেতনায় বিশ্ব সমাহিত রয়েছে তার মধ্যে। তাই দেশে ও কালে বিশ্বের এই পরাক্‌-রূপায়ণ প্রতি পর্বে প্রবর্তিত হচ্ছে অতিমানসের সম্ভূতিসংবিতের ছন্দোলীলায়।

জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় অতিমানস চেতনায় ভিন্ন নয়, সেখানে মূলত তারা এক। প্রাকৃতমন এ-তিনটিকে দেখে আলাদা করে নইলে তার কারবার অচল হয়ে পড়ে। ত্রিপুটীর লয় যেখানে, সেখানে মনের কোনও সাধন নাই, নাই

---

* উক্তিটি বৈদিক। বিশ্ব জুড়ে দেবতাদের লীলা চলছে 'প্রথম ধর্মের' শাসন মেনে; এই ধর্ম বা ব্রত 'পূর্ব্য' অতএব 'পরম', তাই তা বস্তুর স্ব-ভাবের ধর্ম।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোনও ছন্দ—তাই মন সেখানে নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয়। সুতরাং মনের চোখে নিজেকে দেখতে গিয়েও ত্রিপুটীর এই ভেদ আমায় জাগিয়ে রাখতে হয়। সে-দেখায় প্রথমত আমি আছি—জ্ঞাতা হয়ে। দ্বিতীয়ত, যা দেখছি আমার মধ্যে, তাকে জানছি জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় বলে—সে আমিও বটে, আবার নয়ও বটে। তৃতীয়ত, আমার জানার মধ্যে আছে জ্ঞানের বৃত্তি, যা দিয়ে জ্ঞাতার সঙ্গে জুড়ছি জ্ঞেয়কে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, মননের এই ধারা নিতান্তই কৃত্রিম। শুধু ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই তার কল্পনা, অতএব সত্যের মর্মপরিচয় মেলে না তাকে দিয়ে। বস্তুত, যে আমি জানছি, সে তো জানছি চৈতন্যরূপেই; আমার জ্ঞানও সেই চৈতন্য অর্থাৎ আমিই —বৃত্তিরূপে; আবার জ্ঞেয় যা, তাও তো আমিই, কেননা একই চৈতন্যের একটা স্পন্দ বা বিপরিণাম সে। অতএব তিনটি মিলিয়ে পাচ্ছি একই সত্তা একই স্পন্দ—অবিভক্তেরই বিভক্তবৎ একটা প্রতিভাস। রূপে-রূপে ব্যবস্থিত-বৎ প্রতিভাত হয়েও বস্তুত সে অ-ব্যবস্থিত, অখণ্ডিত। এই অখণ্ড জ্ঞানের আঁচ শুধু পায় মন যুক্তি দিয়ে—তার ভিত্তিতে ব্যাবহারিক জীবনকে সে গড়তে পারে না।...কিন্তু এ তো গেল মনের কথা। অহংচেতনার বাইরে যা-কিছু দেখছি, তার বেলাতে আরও উৎকট হয়ে দেখা দেয় ত্রিপুটীর ভেদ। অভেদের একটা আঁচ পাওয়াও সেখানে মনের উপর বিষম জুলুম। আর সেই ভাবকে ধরে রেখে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা—সে তো মনের পক্ষে বিজাতীয় একটা ব্যাপার, যা একেবারেই তার সাধ্যাতীত। এ-ভাবকে মন মানতে পারে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবেই—যা দিয়ে তার খণ্ডবোধের স্বাভাবিক বৃত্তির শোধন-মার্জন চলবে শুধু। যেমন বুদ্ধি দিয়ে জানি, পৃথিবীই প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে এবং সে-জ্ঞানকে কখনও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের শোধনকার্যেও লাগাই। কিন্তু তা বলে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে—এই ইন্দ্রিয়বোধের উপর যে-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত, সাংবৃতিক সত্য হলেও তাকে উচ্ছেদ করবার কল্পনাও কি করতে পারি ?

কিন্তু এই অভেদভাব অতিমানসের সিদ্ধবীর্য, তার সকল প্রবর্তনার পরম অয়ন। মনের কাছে তা ক্বচিৎ-লব্ধ সাধনসম্পদ, তার দৃষ্টির স্বরূপসত্য নয়। বিশ্বের সমষ্টি আর ব্যষ্টিকে অতিমানস দেখে আত্মস্বরূপে—এক অখণ্ড-বিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ বৃত্তিতে। সে-অখণ্ডবৃত্তিই তার প্রাণ, বলতে গেলে তার স্বরূপসত্তার জীবনস্পন্দ। অতএব এই সর্বাবগাহী দৈবী-সংবিতের যে সত্য-সংকল্প, বিশ্বজীবনের নিয়তির শাস্তা অথবা নিয়ন্তা সে—শুধু এই বললেই যথেষ্ট হয় না। বলতে হয়, বিশ্বের পরিপূর্ণতাকে নিজের মধ্যে সে সিদ্ধ করে তোলে প্রজ্ঞাবৃত্তির অবিনাভূত অকুণ্ঠ বীর্যের সংবেগে যা তার আত্মসত্তার স্পন্দ মাত্র অর্থাৎ যার মধ্যে সত্তা জ্ঞান ও শক্তির বৃত্তি অখণ্ড, অবিকল্পিত।

কারণ পূর্বেই বলেছি, বিশ্বচিৎ আর বিশ্বশক্তি স্বরূপত এক—বিশ্বচেতনার বৃত্তিই স্ফুরিত হচ্ছে বিশ্বশক্তিরূপে। তেমনি দৈবী প্রজ্ঞা ও দিব্য সংকল্পও এক—কেননা এক অখণ্ড-সত্তারই স্বরূপস্পন্দ তারা।

অতিমানস অখণ্ড সর্বাধার, একত্ব হতে অপ্রচ্যুত হয়েই বহুত্বের সে আয়তন—এই সত্যের অনুভব স্পষ্ট হওয়া চাই আমাদের মধ্যে। নইলে বিভজ্যদর্শী মনের প্রমাদ হতে বুদ্ধিকে নির্মুক্ত করে বিশ্বের একটা সত্যধারণা কোনমতেই সম্ভব হবে না। বীজ হতে গাছ বেরিয়ে আসে, বীজের মধ্যে যে ছিল নিহিত; আবার গাছ হতে বেরিয়ে আসে বীজ। যে-বিসৃষ্টির চিরন্তন রীতিকে গাছ বলছি, তার মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম ও অপরিবর্তনীয় ধারার প্রবর্তনা আছে। কিন্তু গাছের জন্ম জীবন ও বংশবিস্তারকে মন দেখে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপাররূপে এবং সেই দৃষ্টি দিয়েই সে তার বিজ্ঞান রচনা করে। গাছকে সে ব্যাখ্যা করে বীজ দিয়ে, বীজকে গাছ দিয়ে : বলে, এই হল প্রকৃতির একটা নিয়ম। কিন্তু এ দিয়ে তত্ত্বের ব্যাখ্যা কিছুই হল না। আমরা এতে পেলাম শুধু প্রাকৃতিক একটা রীতির বিশ্লেষণ ও বিবৃতি, কিন্তু রহস্য তার রহস্যই রয়ে গেল আমাদের কাছে। মন যদি চিৎশক্তির একটা নিগূঢ় সংবেগকে মেনেও নেয় ব্যাকৃতির মূলাধার ও মর্মসত্যরূপে এবং রূপায়ণের সমগ্র ধারাকে বলে সেই শক্তির একটা বহিরঙ্গ প্রকাশ অথবা তার নিয়তিকৃত নিয়মের লীলা—তাহলেও ব্যাকৃতি তার কাছে একটা বিবিক্ত সত্তা মাত্র, তার স্বধর্ম এবং গতি-প্রকৃতি দুইই মনের অনাত্মীয়। এই বিবিক্ত-বুদ্ধি আছে পশুর মধ্যে এবং মানুষের মনশ্চেতনায়। সেখানে মন নিজেকেও ভাবে একটা বিবিক্ত পদার্থ বলে। সচেতন বিষয়িরূপে সে স্বতন্ত্র, তার বাইরে আর যা-কিছু সবই বিষয়রূপে তার থেকে বিবিক্ত। প্রাকৃত জীবনে এ-ভাগাভাগি প্রয়োজন, কেননা লোকব্যবহারের এই হল বনিয়াদ। কিন্তু মন একেই যখন একমাত্র সত্য বলে জানে, তখনই শুরু হয় অহন্তার যত প্রমাদ।

অতিমানসের ধারা অন্যরকম। গাছ এবং গাছের জীবন বিবিক্ত সত্তা হলে আপন স্বরূপে তারা ফুটতে পারত না—এমন-কি তাদের সত্তাই অসম্ভব হত। বিশ্বসত্তার অন্তর্গূঢ় সংবেগ হতে বিশ্বের এই ব্যাকৃতি : সত্তা এবং তার অন্যান্য বিভূতির সঙ্গে অন্যোন্যসম্বন্ধ হয়ে তার এই রূপায়ণ। বস্তুর স্বধর্মে যে-বৈচিত্র্য, তা মহাপ্রকৃতির সর্বগত স্বভাব ও স্বরূপের লীলা। সমষ্টি-পরিণামের ছন্দেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্যষ্টির বিশিষ্ট পরিণাম। বীজ দিয়ে গাছের তত্ত্ব অথবা গাছ দিয়ে বীজের তত্ত্ব বোঝা যায় না—কেননা দুয়ের তত্ত্ব নিহিত আছে বিশ্বভাবনায়, আর বিশ্বের তত্ত্ব আছে ঈশ্বরে। অতিমানস দ্বারা যুগপৎ বাসিত হয়ে আছে বীজ গাছ বা বিশ্বের যা-কিছু এবং ওই অখণ্ড-অন্বয় পরমবিজ্ঞানই তার প্রাণ যদিও তার মধ্যে আছে বিপরিণামের

ছন্দোদোলা। এই সর্বগ্রাহী অখন্ডবিজ্ঞানে সত্তার স্বতন্ত্র কোনও কেন্দ্র নাই আমাদের বিবিক্ত অহন্তার মত। কেননা আত্মসংবিতের মধ্যে সমগ্র সত্তাই সেখানে ভাসছে সমব্যাপ্ত সম্প্রসারণরূপে—তাই একত্বেও সে অন্বয়, বহুত্বেও অন্বয়, সর্বত্র সকল দশাতেই অন্বয়। এর মধ্যে সর্বভাব আর অন্বয়ভাবে ফোটে এক অখন্ড সদ্‌ভাবেরই পরম সামরস্য। ব্যক্তির সত্তাও যুগপৎ সর্বাত্মভূত ও ব্রহ্মভূত, অতএব পরম তাদাত্ম্যে একরস সেখানে—কেননা এই তাদাত্ম্যবোধই অতিমানস জ্ঞানের মর্মসত্য, অতিমানস আত্মপ্রত্যয়ের একটা নিত্য বিভাব।

সমরস একত্বের বিপুল সে-প্রসারে সৎস্বরূপের খন্ডভাব বা বিকিরণ নাই। আত্মপ্রসারণের সমব্যাপ্তিতে তার বিভুত্বকে সে ছেয়ে আছে অন্বয়রূপে, তার বহুধা-ব্যক্তিকেও বাসিত করেছে অন্বয়রূপে। তাই সর্বত্র সে অখন্ড-অন্বয় 'সমং ব্রহ্ম'। দেশে ও কালে সৎ-স্বরূপের এই-যে আত্মপ্রসারণ, ভূতে-ভূতে এই-যে তার নিরূঢ় অধিবাস, এও তো তার নির্বিশেষ অন্বয়স্বভাবের অন্তরঙ্গ লীলায়ন, তার নিরুপাধিক অখন্ডস্বরূপের বিভাবনা—যার মধ্যে কেন্দ্রও নাই পরিধিও নাই, আছে শুধু দেশহীন কালহীন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। অবিসৃষ্ট ব্রহ্মের এই-যে অতিসমাহিত একঘন প্রত্যয়, স্বভাবের বশে তা বিসৃষ্ট হবে সমব্যাপ্ত বিজ্ঞানঘন প্রত্যয়ে—এই অখন্ড সর্বগ্রাসী সর্বগ্রাহী সংবিতে, এই বিশ্বম্ভর অবিভক্ত অবিকীর্ণ অধিবাসে, এই লোকোত্তর অদ্বৈত-বিলাসে, বহুত্বের লীলাতেও যা অন্যূন, অপ্রচ্যুত। 'ব্রহ্ম সর্বভূতে', 'সর্বভূত ব্রহ্মে' এবং 'সর্বভূতই ব্রহ্ম'—এই হল সর্ববিৎ অতিমানসের ত্রিবিদ্যা গায়ত্রী। আত্ম-বিভাবনার এক পরমপ্রত্যয় ফুটেছে এই মহাত্রিপুটীতে। আত্মদৃষ্টির অসংকীর্ণ অনুভবে এই অবিবিক্ত পরমা বিদ্যাই হয় অতিমানসের বিশ্বলীলার মূলমন্ত্র।

কোথা হতে তাহলে এল মন, এল মন-প্রাণ-জড়ের ত্রয়ীতে অবর চেতনার এই লীলা—বিশ্বরূপে যাকে দেখছি আমরা? বিশ্বের সব-কিছুই যখন সর্ব-কৃৎ সর্ব-সম্ভব অতিমানসের কৃতি, তার সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপের অনাদিলীলা, তখন ঋত-চিতের সিসৃক্ষায় স্ফুরিত হবে এমন-কোনও বৃত্তি যা ঐ সৎ-চিৎ-আনন্দকেই ভেঙে অবরলোকে সৃষ্টি করবে মন প্রাণ ও জড়ের ধাতু। চিন্ময়ী সিসৃক্ষার একটা গৌণ বিভাবনায় এই বৃত্তির পরিচয় পাই। সে-বিভাবনা অতিমানসের পরাক্ গতিতে, তার প্রসর্পণের সামর্থ্যে, তার 'প্রজ্ঞানের' লীলায়—যার বেলায় সংবিৎ নিজের মধ্যে গুটিয়ে এসে উপদ্রষ্টৃ-রূপে সরে দাঁড়ায় তার সৃষ্টি হতে। আগে বলেছি সংবিতের সমব্যাপ্ত সমাধানের কথা। কিন্তু তার গুটিয়ে-আসা বলতে বুঝব একটা বিষমব্যাপ্ত সমাধান, যার মধ্যে আত্মবিভাজনের প্রথম উন্মেষ—অথবা তার আপাত-প্রতিভাসের প্রথম কল্পনা।

এই প্রজ্ঞানের লীলায় প্রথম দেখি, বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতা নিজেকে সংহৃত করে রেখেছেন তাঁর আত্মরূপায়ণের ছন্দোলীলায়। অবিরাম সেই রূপায়ণে ব্যাপৃত থেকে চিৎশক্তি একবার গুটিয়ে আসছে তাঁর মধ্যে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর থেকে। আত্মবিপরিণামের এই একটি ধারা হতেই এল ভেদের যত বিভঙ্গ এবং তারাই গড়ল বিশ্বের ব্যাবহারিক দৃষ্টি ও কর্মের বনিয়াদ। বিসৃষ্টির প্রয়োজনে এইখানে ফুটল বিজ্ঞাতা বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞানের এক দিব্য ত্রিপুটী। দেখা দিল শক্তি শক্তির সন্ততি ও বিভূতি—ভোক্তা ভোগ ও ভোগ্য—ব্রহ্ম মায়া সম্ভূতি—অবিকল্পিত অখণ্ডের এই ত্রিধা বিকল্পনা।

তারপর, বিজ্ঞানে সমাহিত এই চিন্ময় পুরুষ আত্মনিঃসৃত শক্তি বা প্রকৃতির উপদ্রষ্টা ও ভর্তা হয়ে রূপে-রূপে ফুটিয়ে তুললেন নিজের প্রতিরূপ। চিৎশক্তির সহচরিত হয়ে তিনি যেন তার বিভূতিতে নেমে এলেন এবং প্রজ্ঞানের উদ্ভব যে-আত্মবিভাজন হতে, তার পুনরাবৃত্তি করে চললেন শক্তির বিচিত্র প্রপঞ্চে। এমনি করে প্রত্যেক রূপে স্বীয়া প্রকৃতিকে অবষ্টব্ধ করে পুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং চেতনার সেই কল্পিত বিন্দু হতে আবার রূপে-রূপে দেখছেন নিজেরই প্রতিরূপ। একই আত্মা, একই দিব্য-পুরুষের অধিষ্ঠান সবার মধ্যে। বহু বিন্দুতে তাঁর বিকিরণ সংবিতের একটা ব্যাবহারিক প্রবৃত্তি শুধু, যার ফলে বিশ্ব জুড়ে দেখা দেবে ভেদের লীলা—অন্যোন্যজ্ঞান, অন্যোন্যসংগম, অন্যোন্যসংঘাত ও অন্যোন্যসম্ভোগের খেলা। তার মধ্যে স্বরূপগত অভেদের 'পরে ভেদের প্রতিষ্ঠা, আবার অভেদেরও উল্লাস বিচিত্র ভেদের রূপায়ণে।

সর্বগত অতিমানসের এই অভিনব স্থিতির মধ্যে দেখি প্রচ্যুতির একটা আভাস্—বস্তুর অদ্বয় স্ব-ভাবের সত্য হতে, অখণ্ডচেতনার সমগ্রতা হতে একটা অবস্খলন যেন। অথচ এই অব্যভিচরিত অদ্বয়ভাবের 'পরেই রয়েছে বিশ্ব-সত্তার একমাত্র নির্ভর। মনে হয়, আর-একটু নেমে এলেই এ-প্রচ্যুতি দাঁড়াবে অবিদ্যাতে, বহুত্বকে তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েই যার যাত্রা শুরু সত্যকার একের দিকে। তারই জন্যে চলার পথে একত্বের আভাস রচে সে অহন্তার প্রতিভাসে। বেশ বোঝা যায়, ব্যক্তিত্বের বিন্দুকে জ্ঞাতার অধিষ্ঠানকেন্দ্র বলে মানি যদি, তাহলেই দেখা দেবে মনোময় চেতনার যত বিচিত্র পরিণাম—ইন্দ্রিয়সংবেদনরূপে, বুদ্ধির বিলাসে, সঙ্কল্পের আকারে। কিন্তু পুরুষের লীলা যতক্ষণ অতি-মানস ভূমিতে, ততক্ষণ অবিদ্যার উদ্ভব হয়নি একথাও সত্য। তাই তখন ঋত-চিতের মধ্যে চলবে জ্ঞান ও কর্মের খেলা—অদ্বয়ভাবকে অনিরাকৃত করেই।

কারণ তখনও ব্রহ্ম নিজেকে জানছেন সর্বগত অদ্বয়রূপে, সব-কিছুকে দেখছেন অভিন্ননিমিত্তোপাদানের আকারে নিজেরই পরিণামরূপে। ঈশ্বর তখনও শক্তির লীলাকে স্বরূপের লীলা বলে জানেন, সর্বভূতকে অনুভব করেন

অন্তরে-বাইরে নিজের আত্মরূপায়ণ বলে। ভোক্তার মধ্যে তখনও চলছে আত্মসত্তারই সম্ভোগ—বহুভাবনার উচ্ছলনে। কেবল একটি জায়গায় এসেছে সত্যকার একটা পরিবর্তন : চেতনার ঘনীভাবে দেখা দিয়েছে একটা বিষমতা, শক্তির বিকিরণে একটা বৈচিত্র্য। চৈতন্যের স্বরূপে বা আত্মদৃষ্টিতে সত্যকার কোনও ভেদ বা খণ্ডতা দেখা দেয়নি, শুধু তার ব্যবহারে ফুটেছে বিশিষ্ট একটা ভঙ্গিমা। ঋত-চিৎ দাঁড়িয়েছে এসে এমন-একটা স্থিতিতে, মনোময় চেতনার ভূমিকা হলেও ঠিক আমাদের মন সে নয়। এবার এই সান্ধ্যলোকের তত্ত্ব বুঝতে পারলেই খুঁজে পাব মনের সেই আদিবিন্দু, যেখান থেকে সে ছিটকে পড়েছে খণ্ডতা ও অবিদ্যার অবরভূমিতে—ঋত-চিতের তুঙ্গ-বিশাল ঔদার্য হতে স্খলিত হয়ে। সুখের বিষয়, এই প্রজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝা আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন নয়—কেননা প্রাকৃতমনের প্রতিবেশী বলে তার একটা পূর্বাভাস দেখতে পাই প্রজ্ঞানের চলনে। কিন্তু অতিমানসের অনুভব ছিল কোন্ সুদূরে! এতক্ষণ বুদ্ধির অস্পষ্ট পরিভাষা দিয়ে তার অসম্পূর্ণ একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু এবার পরিচয়ের বাধা আর দুর্লঙ্ঘ্য হবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

অতিমানসের ত্রিপুটী

ভূতভৃৎ...মমাত্মা ভূতভাবনঃ।
অহমাত্মা...সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

গীতা ৯।৫, ১০।২০

আমার আত্মা—যা ভূতভৃৎ এবং ভূতভাবন...আমিই সর্বভূতাশয়স্থিত আত্মা।
—গীতা (৯।৫, ১০।২০)

ত্রী রোচনা দিব্যা ধারয়ন্ত।

ঋগ্বেদ ৫।২৯।১

তিনটি জ্যোতিঃশক্তি ধরে আছে জ্যোতির্ময় তিনটি দিব্যলোক।
—ঋগ্বেদ (৫।২৯।১)

প্রাকৃতমনের গণ্ডি ভেঙে মুক্ত জীব যখন অতিমানসের দিব্যলীলার শরিক হন, তখন এই পার্থিব ভূমির সকল তত্ত্ব সহজ হয়েই ধরা পড়ে তাঁর প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে। কিন্তু প্রজ্ঞানের স্বরূপ বোঝবার আগে ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞাত অথবা জ্ঞানগম্য রহস্যের একটা বিবৃতি দিয়ে নিই সংক্ষেপে, বুঝে নিই কেমন করে আত্মসত্তার চিদ্‌ঘন অনাদি একত্ব হতে আত্মমায়ায় বহুরূপে তিনি জগৎ হয়ে ফুটলেন।

আমাদের প্রথম সূত্র ছিল : যা-কিছু আছে, তা এক অখণ্ড সন্মাত্র—যাঁর স্বরূপ হল অখণ্ড চৈতন্য; আর চৈতন্যের স্ব-ধর্ম হল শক্তি বা ক্রতু। সে-সন্মাত্র আনন্দরূপ, সে-চৈতন্য আনন্দরূপ, সে-শক্তি বা ক্রতুও আনন্দরূপ। অখণ্ড সত্তা চৈতন্য এবং শক্তি বা ক্রতুর অব্যভিচরিত শাশ্বত আনন্দ শান্তিতে শয়ান রয়েছে নিজেরই মধ্যে কুণ্ডলিত হয়ে, অথবা সিসৃক্ষায় পরিস্পন্দিত হচ্ছে—এই হল ব্রহ্মের স্বরূপ। আমাদের প্রতিভাসনির্মুক্ত পরমার্থসত্তায় আমরাও ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম যখন স্বসমাহিত এবং নিস্পন্দ, তখন তাঁর মধ্যে—অথবা তিনিই—শাশ্বত অব্যভিচরিত স্বরূপানন্দ। আবার সিসৃক্ষায় স্পন্দিত যখন, তখন তাঁর মধ্যে—অথবা তাঁরই আত্মরূপায়ণে—উথলে ওঠে সত্তা চৈতন্য শক্তি ও ক্রতুর লীলাচঞ্চল আনন্দ। তাঁর সেই সম্ভূতির লীলাই বিশ্ব—আর সে-আনন্দই বিশ্বের হেতু প্রেতি এবং লক্ষ্য। ব্রাহ্মী চেতনায় এ-লীলা ও আনন্দ শাশ্বত, নিত্যযুক্ত। আমাদের যে-স্বরূপসত্তা মনোময় অহন্তার বিরূপতায় ঢাকা পড়েছে, তারও মধ্যে আছে এই লীলা ও আনন্দের শাশ্বত অব্যভিচরিত উল্লাস—কেননা আমাদের আত্মা ব্রহ্মের অবিনাভূত, স্বরূপত আমরা

ব্রহ্মই। অতএব দিব্যজীবনের অভীপ্সা আমাদের মধ্যে জাগে যদি, তবে তার চরিতার্থতা ঘটতে পারে শুধু ওই আবৃত স্বরূপের গুণ্ঠনমোচনে, মানস অহন্তা বা বিমূঢ় আত্মভাবের এই বর্তমান দীনতা হতে স্বরূপসত্তা বা আত্মমহিমার পথে উত্তরায়ণে, ব্রাহ্মী চেতনায় পরমতাদাত্ম্যের অপরোক্ষ অনুভবে। আমাদের মধ্যেই আছে এমন-এক অতিচেতন সত্তা, যা বিভোর হয়ে থাকে এই তাদাত্ম্যের আস্বাদনে—নইলে আমাদের সত্তাই সম্ভব হত না। অথচ প্রাকৃত মনশ্চেতনা যেন গ্রহের ফেরে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে সে-আনন্দের অধিকার হতে।

যখন বলি, সত্তার এক মেরুতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এবং আরেক মেরুতে সখণ্ড মানসের খেলা, তখন একটা অনপনেয় বিরোধ দেখা দেয় দুয়ের মাঝে। মনে হয়, দুটি কোটির একটিকে সত্য মানলে আরেকটিকে মিথ্যা বলতেই হবে, একটিকে সম্ভোগ করতে গিয়ে আরেকটিকে অবলুপ্ত করতেই হবে। অথচ আমরা এ-জগতের মনোময় জীব—আমাদের দেহ ও প্রাণের আধারে মনেরই রূপায়ণ। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনাকে যদি মুছে ফেলতে হয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে পেতে গিয়ে, তাহলে এই পৃথিবীতে দিব্যজীবন যাপনের কল্পনা হয় একটা মরীচিকা। তুরীয় ভূমির আনন্দ পেতে বা তার মধ্যে ফিরে যেতে তখন বিশ্বকে অলীক ভেবে আমাদের ছেড়ে যেতেই হবে।...অখণ্ড ব্রহ্ম আর সখণ্ড মনকে দুটি বিরোধী তত্ত্ব ভাবলে আর-কোনও পথ খুঁজে পাই না -সর্বনাশের এই পথটি ছাড়া। কিন্তু মধ্যবর্তী আরেকটা বস্তু এসে অখণ্ড আর সখণ্ডকে মিলিয়ে দেয় যদি দুয়ের মাঝে অন্যোন্যযোগের সূত্রটি আবিষ্কার করে, তাহলে এই দেহ-প্রাণ-মনের আধারেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সম্ভোগকে আর আকাশ-কুসুম বলতে পারি না।

মিলনের সেতু একটা আছেই। তাকেই বলছি ঋত-চিৎ বা অতিমানস। মনেরও ঊর্ধ্বে তার স্থান: তার সত্তা প্রবৃত্তি ও রীতির আশ্রয় হল বস্তুর অখণ্ড স্বরূপসত্য—প্রতিভাসের আপাত-খণ্ডতা নিয়ে তার কারবার নয় প্রাকৃতমনের মত। যে-সূত্র ধরে আমাদের এষণার শুরু, তাতে অতিমানস তত্ত্বের স্বীকৃতি মোটেই অতর্কিত নয়। কারণ সচ্চিদানন্দ যে দেশ-কালের অতীত নির্বিশেষ তত্ত্ব, সেকথা মানতেই হবে। কিন্তু জগৎ তো তা নয় : সে ব্যাপ্ত হয়ে আছে দেশে এবং কালে, তাদের মধ্যেই নিমিত্তের শাসনে স্পন্দিত হচ্ছে (অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে) বিচিত্র সম্বন্ধ ও সম্ভাবনার জাল-ছড়ানো পরিণতির ক্রমায়ণে। এই নিমিত্তের যথার্থ সংজ্ঞা হল ঋত বা 'দৈব্য ব্রত'। সে-ঋতের স্বরূপ ফোটে বস্তুর সত্য স্বভাবের স্বয়ংসিদ্ধ পরিণতিতে—পর্যায়িত পরিণামের মর্মমূলে বিজ্ঞান-স্বরূপের স্বতঃস্ফুরণে। অনন্ত সম্ভাবনার অব্যাকৃতি হতে বিশিষ্ট স্পন্দনের একটি নিরূপিত ছন্দকে আগে থাকতে বেছে নেওয়া—এই হল ঋতের কাজ। সব-কিছুকে এমনি করে পরিণতির দিকে যে নিয়ে চলেছে,

নিশ্চয়ই সে কবি-ক্রতু বা চিতি-শক্তি—কেননা বিশ্বের বিসৃষ্টি চিতি-শক্তির লীলা এবং চিতি-শক্তিই সত্তার স্ব-ভাব। কিন্তু এই কবি-ক্রতুর যে-প্রবৃত্তি পরিণতির ছন্দে প্রকাশিত, তা কখনও মনোময় হতে পারে না—কেননা মন তো ঋতের স্বরূপ জানে না, বা তার 'পরে তার কোনও শাসন কি অধিকার নাই। বরং মনকেই চলতে হয় ঋতের শাসন মেনে—তার একটা বিশিষ্ট পরিণামের ধারা হয়ে। তাছাড়া ঋতম্ভরা পরিণতির বহিরঙ্গনে প্রতিভাসের জগতেই মনের আনাগোনা, তাই সে বিশ্বলীলার নেপথ্যের খবর রাখে না। এইজন্য পরিণতির শেষ অঙ্কে সে দেখতে পায় খণ্ডভাবের খেলা শুধু. সত্যের মর্মে পৌঁছবার আকূতি তার বন্ধ্যা হয় বারেবারে। বিসৃষ্টি ও পরিণতির মূলে যে কবি-ক্রতু. বস্তুর অখণ্ড-স্বভাবের আবেশ থাকবে তার মধ্যে এবং সেই আবেশ হতেই বহুভাবকে সে বিচ্ছুরিত করবে। কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় অখণ্ডের আবেশ? বহুভাবনার শুধু একটি বিভাবকে সে হাতের মুঠায় পেয়েছে এবং সেও তার পুরা পাওয়া নয়।

অতএব মনের ন্যূনতাকে পূরণ করতে মনেরও ওপারে চাই একটা পরতর তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা। সে-তত্ত্ব যে সচ্চিদানন্দ, সে তো অসংশয়িত। কিন্তু তাঁর অনন্ত অব্যয় শুদ্ধ চৈতন্যের শাশ্বতী স্থিতিও সে নয়। অথচ ওই পরমা প্রতিষ্ঠা হতে অথবা তাকে মূলাধার করেই তাঁর সে-স্পন্দপ্রবৃত্তি উছলে পড়ছে তেজরূপে—বিশ্ববিসৃষ্টির সাধন হয়ে। সত্তার শুদ্ধবীর্য ফুটেছে চৈতন্য ও শক্তি এই দুটি স্বভাবের উল্লাসে। অতএব প্রজ্ঞা ও ক্রতুও হবে সেই বীর্যেরই রূপায়ণ, যখন দেশ ও কালের ভূমিকায় জগৎবিসৃষ্টির প্রেতি জাগবে তার মধ্যে। এই প্রজ্ঞা আর ক্রতু হবে অখণ্ড অনন্ত সর্বগ্রাহী সর্বাধার ও সর্বকৃৎ; স্পন্দনে যাকে রূপায়িত করবে. তাকে তারা শাশ্বত কাল ধরে নিজেরই মধ্যে ধারণ করবে। অতএব সন্মাত্র যখন বৈশিষ্ট্যাবগাহী অবচ্ছিন্ন আত্মসংবিতে পরিস্পন্দিত, তখনই তিনি অতিমানস। স্বরূপসত্যের বিশিষ্ট কতগুলি বিভাবের অনুভবকে তখন তিনি মূর্ত করে তুলতে চান—তাঁর দেশকালাতীত সদ্‌ভাবের দৈশিক ও কালিক সম্প্রসারণের ভূমিকায়। যা-কিছু তাঁর সত্তায় আছে, তা-ই ফোটে আত্মসংবিৎ হয়ে, ঋত-চিৎ হয়ে, সম্ভূতবিজ্ঞান হয়ে। আর আত্মসংবিৎ ও আত্মশক্তি যখন অভিন্ন, তখন সেই স্বরূপের বিজ্ঞানই দেশে ও কালে নিজেকে উপচে বা ফুটিয়ে তোলে অধৃষ্য ক্রতুর সংবেগে।

ব্রাহ্মী চেতনার এই পরিচয়। চিৎ-শক্তির স্পন্দবেগে তার মধ্যে হয় বিশ্ব-ভূতের বিসৃষ্টি। তাদের পরিণতি ঘটে সেই চেতনার আত্মপরিণামের ছন্দে, তার নিরূঢ় কবি-ক্রতুর সংবেগে—যার অমোঘ প্রেরণা বস্তুর স্বরূপসত্য বা সম্ভূতবিজ্ঞানের বীজভাবকে ফুটিয়ে তুলছে তিলে-তিলে। এমনি নিত্যচেতন যিনি, তাঁকেই বলি ব্রহ্ম। অবশ্যই তিনি সর্বগত সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর।

তিনি সর্বগত, কেননা বিশ্বরূপের বিসৃষ্টি তাঁর চিন্ময় স্বরূপের বিভূতি, দেশ-কাল তাঁর আত্মপ্রসারণ—সেই ভূমিকায় আত্মশক্তির স্পন্দবেগে তাঁর আত্ম-রূপায়ণ এই নিখিল জগৎ। তিনি সর্বজ্ঞ, কারণ তাঁর চিৎ-সত্তা বিশ্বভূতের আধার নিবাস এবং রূপকার। আবার তিনি সর্বেশ্বর, কেননা সর্বাধিবাস এই চৈতন্যই সর্বাধিবাস শক্তি এবং বিশ্বকর্মা দিব্যক্রতু। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা আর ক্রতুর বিরোধ নাই—যেমন আছে আমাদের প্রাকৃত চেতনায়, কেননা স্বরূপত তারা একই সত্তার অবিভক্ত স্পন্দ মাত্র অতএব ভেদলেশশূন্য। অন্যকোনও সঙ্কল্প শক্তি বা চৈতন্য তাদের ব্যাহত করতে পারে না বাইরে বা ভিতরে থেকে—কারণ অখন্ড অন্বয় তত্ত্বের বাইরে কোনও শক্তি কি চৈতন্যের কল্পনাও যে অসম্ভব। আর তার মধ্যে যে বিজ্ঞানশক্তির লীলা, সে তো তিনি ছাড়া কিছুই নয়। সে এক সর্বসমঞ্জসা প্রজ্ঞা ও সর্বনিয়ামক ক্রতুর খেলা শুধু। শক্তি ও সঙ্কল্পের মাঝে সংঘর্ষ আমরাই দেখি, কেননা খণ্ডিত বিশেষের রাজ্যে আছি বলে সমগ্রকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সে-সংঘর্ষকে অতি-মানস দেখে এক পূর্ব্য সৌষম্যের উদ্বেল উপাদানরূপে। ঘটনার উত্তালতা যতই প্রবল হ'ক, অতিমানসের দৃষ্টিতে তা কখনও সৌষম্যের ছন্দ হারায় না—কেননা সে-দৃষ্টিতে ভাসছে বিশ্বভূতের শাশ্বত এবং সমগ্র রূপ।

ব্রাহ্মী চেতনার স্থিতি বা প্রবৃত্তি যা-ই হ'ক, এই তার চিরন্তন পরিচয়। সত্তা তার স্বয়ংসিদ্ধ এবং আত্মনিরূঢ়িতে অব্যাহত। অতএব সে-সত্তার শক্তিও তার আত্মব্যাপ্তিতে অব্যাহত। তাই তার চারদিকে বিশেষ-কোনও স্থিতি বা প্রবৃত্তির সীমা টানা যায় না। প্রাতিভাসিক দৃষ্টিতে মানুষ দেশ ও কালের বেষ্টনীতে ঘেরা চৈতন্যের একটা বিশিষ্ট রূপ মাত্র। তাই একসময়ে একটি স্থিতি, একটি পর্যায়, অনুভবের একটিমাত্র মন্ডল—এই শুধু ফোটে তার প্রাকৃত চেতনায়। এর বাইরে কিছু জানবারও তার উপায় নাই: সুতরাং জীবনের একটি বিভাবকেই সে সত্য বলে মানে। একদিন যা সত্য ছিল, আজ সে অতীতের কোঠায় চলে গেছে: কিংবা একদিন যা সত্য হবে, আজও সে সামনে এসে হাজির হয়নি। অতএব তার চেতনায় কেউ তারা সত্য নয়। কিন্তু ব্রাহ্মী চেতনায় এমনতর বিশেষের বন্ধন নাই। যুগপৎ বহুরূপ হওয়া, অথবা একাধিক স্থিতিতে নিশ্চল থাকা শাশ্বত কাল ধরে, কোনটাই তার কাছে অসম্ভব নয়। তাই দেখি, অতিমানসের বিশ্বভাবিনী চেতনার মধ্যেও রয়েছে তিনটি স্থিতি বা ভূমি। তার প্রথম ভূমিতে আছে বিশ্বভূতের অব্যভিচারিত একত্বের ভাবনা। দ্বিতীয় ভূমিতে সে-একত্বে দেখা দেয় এমন-একটা বিভঙ্গ যা হয় একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে একের লীলায়নের আধার। সর্বশেষ ভূমিতে সে-বিভঙ্গ আরও কুটিল হয়ে ফোটায় ব্যষ্টিত্বের বিচিত্র পরিণাম, যা অবিদ্যার প্রভাবে আমাদের অবর-চেতনায় বিবিক্ত অহংএর বিভ্রমরূপে দেখা দেয়।

অতিমানসের আদ্যস্থিতিতে বিশ্বভূতের অব্যভিচরিত একত্বের ভাবনা আছে। আমরা দেখেছি, তার স্বরূপ কি। তাকে নিরুপাধিক অন্বয়চেতনা বলা যায় না—কারণ তা হল সচ্চিদানন্দের দেশকালাতীত আত্মসমাধান। সে নিরুপাধিক স্থিতিতে চিৎশক্তির কোনও সম্প্রসারণের লীলা নাই। বিশ্ব সেখানে থাকলেও আছে শাশ্বত যোগ্যতারূপে শুধু—কালকলিত বাস্তবতা নিয়ে নয়; অর্থাৎ বিশ্ব সেখানে ভব্য মাত্র, ভূত নয়। কিন্তু আমরা যার কথা বলছি, সে হল সচ্চিদানন্দের সমব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ—সর্বগ্রাহী সর্বাবেশী সর্বাশয় তার স্বরূপ। কিন্তু সর্ব সেখানে অখণ্ড—বহুত্বে খণ্ডিত নয়; কেননা তখনও তার মধ্যে ব্যষ্টিভাব দেখা দেয়নি। স্তব্ধ পরিশুদ্ধ চিত্তে অতিমানসের এই আলো ঝরলে পরে ব্যষ্টিত্বের সকল অনুভব হারিয়ে যায়, কেননা ব্যষ্টি-পরিণামকে বহন করবার মত চেতনার কোনও কুণ্ডলী তখন আধারে থাকে না। সর্বেরই স্বগতপরিণাম চলে সে-অতিমানসে—অখণ্ড-অন্বয় ভাবের ধৃতিতে। সমষ্টি 'ভাব' সেখানে ব্রাহ্মী চেতনার স্বরূপসত্তার অন্তরঙ্গ বিভূতি, বিবিক্ততার আভাসটুকুও তার মধ্যে নাই। মনে যেমন চিন্তা কি কল্পনার ঢেউ ওঠে—আমাদের থেকে পৃথক হয়ে নয়, কিন্তু চেতনার স্বাভাবিক রূপায়ণে—তেমনি যেন অতিমানসের এই আদ্যপীঠে জাগে বিশ্বের নাম আর রূপের স্পন্দ। এই তো আনন্ত্যের মহাব্যোমে দিব্যচেতনার বিজ্ঞান ও বিকল্পনার নিরঞ্জন লীলা। কিন্তু সে-লীলা আমাদের মনোবিকল্পের মত বস্তুশূন্য নয়—চিন্ময়ের সত্যসংকল্পের সে বিলাস-বিবর্ত। দিব্যপুরুষের এই স্থিতিতে চিৎপুরুষ আর চিন্ময়ী শক্তির মাঝে কোনও ভেদ নাই, কেননা চৈতন্যের তরঙ্গায়ণেই সেখানে শক্তির প্রকাশ। তেমনি, সব আধার চিন্ময় বলে সে-ভূমিতে জড় আর চিতের মাঝেও ভেদ নাই।

অতিমানসের মধ্যস্থিতিতে ব্রাহ্মী চেতনা আত্মস্পন্দ হতে বিজ্ঞানের মধ্যে সরে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকে অনুবিদ্ধ করে; তার সঙ্গে অন্বিত থেকে, তার সকল প্রবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত ও আবিষ্ট হয়ে নিজেকে সে নিজেরই রূপে-রূপে ছড়িয়ে দেয়। প্রতি নাম-রূপে নিজেকে সর্বসম কূটস্থ আত্মারূপে অনুভব করেও আবার নিজেকে সে চিদাত্মার কুণ্ডলী বলে জানে। ব্যষ্টি স্পন্দলীলার অনুমন্তা ও ভর্তারূপে তার বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে সে অন্য স্পন্দবৃত্তি হতে পৃথক করে বজায় রাখে। এইজন্যই সবার মধ্যে চিৎস্বরূপে এক হয়েও চিদাভাসে সে বিচিত্র। যে-চিৎকুণ্ডলী এই চিদাভাসের ভর্তা, তাকে বলি ব্যষ্টিব্রহ্ম বা জীবাত্মা; আর সর্বভূতাশয়স্থিত অখণ্ড সর্বগত ব্রহ্ম যিনি, তিনি বিশ্বাত্মা। দুয়ের মাঝে স্বরূপে ভেদ না থাকলেও অর্থক্রিয়ায় ভেদের আভাস আছে লীলার প্রয়োজনে; কিন্তু তাতে স্বরূপের তাদাত্ম্যবোধ লুপ্ত হয় না। বিশ্বভাবন বিশ্বাত্মা সকল চিদাভাসকেই নিজের স্বরূপ বলে জানেন, অথচ

প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবাইকে যুক্ত করেন বিবিক্ত সম্বন্ধের চিত্রলীলায়। তাঁর মধ্যে জীবাত্মা তার সত্তাকে অনুভব করবে একেরই চিদাভাস ও চিৎস্পন্দ-রূপে। সর্বগ্রাহী সংবিতের পরিব্যাপ্তিতে যেমন সে অন্বয়স্বরূপ ও নিখিল চিদাভাসের সঙ্গে পরমসাম্যের অনুভব পাবে, তেমনি খন্ডগ্রাহী সংবিৎ বা প্রজ্ঞানের প্রসর্পণে তার ব্যষ্টিলীলারও ভর্তা এবং ভোক্তা হবে সে -অন্বয়-স্বরূপ এবং তার সকল বিভূতির সঙ্গেই থাকবে তার স্বচ্ছন্দ ভেদাভেদের সম্বন্ধ। আমাদের পরিশুদ্ধ চিত্ত যদি অতিমানসের এই মধ্যাস্থিতির জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হয়, তাহলে জীবভাবের অধিষ্ঠান ও ভর্তা হয়েও আমরা এই আধারেই সর্বাধার সর্বভাবন সর্বভূতস্থ পরম অন্বয়ের অনুভব পেতে পারি—এমন-কি জীবভাবের বিশিষ্ট লীলাতেও আমাদের ব্রহ্মরস ও সর্বাত্মভাবের আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। অতিমানসের এই ভূমিতে সামরস্যের ছন্দ কোথাও ব্যাহত হয় না, কোথাও পরিবেশের কোনও পরিবর্তন দেখা দেয় না। তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ফোটে বহুভাবন একের সঙ্গে একীভূত বহুর রসোল্লাসে। যা-কিছু রং কি রূপের বদল, সে কেবল এই মহারাসের আয়োজনে।

অতিমানসের অন্ত্যাস্থিতিতে, স্পন্দলীলার অন্তর্যামী প্রভু হয়েও ব্রহ্মের চিদ্‌ঘন অধিষ্ঠান স্পন্দ হতে নির্লিপ্ত অনুমন্তা ও ভোক্তারূপে সরে দাঁড়ায় না, —কিন্তু তাকে যেন জড়িয়ে থাকে নিজেকে তার মধ্যে প্রসর্পিত করে। তাই এখানে তার লীলার ধরন বদলে যায়। জীবাত্মা এখানে বিশ্বাত্মা ও তাঁর বিভূতির সঙ্গে সম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে চিন্ময় ব্যবহারের ভূমিতে এমনভাবে নামিয়ে আনে যে, পরমসাম্যের অনুভব জীবাত্মার নিত্য সহচর হয়েও এবার তার সকল অনুভবের পর্যবসানরূপে ফুটে ওঠে ব্যষ্টিলীলার পর্বে-পর্বে। কিন্তু মধ্য-স্থিতিতে সাম্যের অনুভবই মুখ্য এবং স্বারসিক, বৈচিত্র্য তার লীলায়ন মাত্র। অন্ত্যাস্থিতিতে তাই দেখা দেয় জীবে-শিবে অদ্বৈতসম্পুটিত দ্বৈতের এক স্বারসিক আনন্দময় অনুভব—দ্বৈতের গৌণব্যঞ্জনার দ্বারা বিশিষ্ট অদ্বৈতের অনুভবই নয় শুধু। আর তার মধ্যে নেমে আসে দ্বৈত-প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক যা-কিছু বিচিত্র পরিণাম।

মনে হতে পারে, এই দ্বৈত-প্রবৃত্তির প্রথম পরিণাম হবে অবিদ্যার মধ্যে চেতনার অবস্খলন। কারণ, অবিদ্যাই তো বহুকে জানে পরমার্থ বলে, একত্ব তার কাছে বহু-ব্যক্তির একটা বিরাট সমাহার শুধু।...কিন্তু এ-আশঙ্কা অমূলক। অতিমানসের এই অন্ত্যাস্থিতিতেও জীবাত্মার অদ্বৈতচেতনা ম্লান হবে না। নিজেকে এখানেও সে জানবে অন্বয়-স্বরূপের চিন্ময় আত্মবিসৃষ্টির তরঙ্গরূপে। অর্থাৎ দেশ ও কালের পটে আত্মবিভূতির বিচিত্র মেলায় বিচিত্র ব্যঞ্জনার নিয়ন্তা ও ভোক্তারূপে যে অন্তহীন চিদ্‌ঘন বিন্দুতে নিজেকে তিনি পরিকীর্ণ করেছেন, জীবাত্মা আপনাকে জানবে তারই একটি বিন্দুরূপে।

একটা স্ব-তন্ত্র বা বিবিক্ত সত্তাও যে তার আছে, এ-অভিমান কোনকালেই তাকে ছুঁয়ে যাবে না। একত্বের অচল প্রতিষ্ঠায়ও আছে বিভেদের ছন্দোদোলা—এই তত্ত্বকেই স্বীকার করবে সে অখন্ড সত্যের দুটি মেরু বলে, একই দিব্য লীলায়নের মূলাধার ও সহস্রাররূপে। অখন্ডের রসকে পুরাপুরি পাবার জন্যেই সে চাইবে খন্ডরসের আস্বাদন।

অতিমানসের তিনটি স্থিতি একই সত্যের আস্বাদনের তিনটি ভঙ্গি মাত্র। এক স্বরূপসত্য কিন্তু সম্ভোগের তিনটি ধারা, অথবা আত্মার তিনটি বিভঙ্গে তার আনন্দময় অনুভব—এ-বিলাসের এই হল তত্ত্ব। আনন্দের রূপ হবে বিচিত্র, কিন্তু কখনও সে ঋত-চিতের ভূমি হতে স্খলিত হবে না, নেমে আসবে না অনৃত আর অবিদ্যার প্রদোষলোকে। অতিমানসের আদ্যাস্থিতিতে একত্বের রসে সান্দ্র হয়ে আছে যে-দিব্যভাব, মধ্য ও অন্ত্য স্থিতিতে বহুত্বের বিভাবনায় তারই চিন্ময় বিলাস শুধু। তবে আর তাদের মধ্যে অনৃত ও অবিদ্যার ছায়া কোথায় ? উপনিষদের বাণীতে আছে এই লোকোত্তর অনুভবের প্রাচীনতম প্রামাণিক বিবৃতি; সেখানেও পাই দিব্য-পুরুষের সম্ভূতি-লীলায় এই তিনটি স্থিতির সমর্থন। এককে বলি বহুর পূর্বভাবী; কিন্তু সে-পূর্বভাব কালের প্রাক্তনতা নয়। বিশেষ হতে সামান্যের দিকে চেতনার যে স্বাভাবিক ঝোঁক, তাহতেই পূর্বভাবের কল্পনা। ব্রহ্মানুভবের কোনও বিবৃতি বা বেদান্তের কোনও প্রস্থানই তাকে অস্বীকার করে না। সবাই বলে, বহুর শাশ্বত-প্রতিষ্ঠা একের 'পরেই, অতএব একই বহুর পূর্বভাবী। কালের কলনায় বহুকে মনে হয় অশাশ্বত, মনে হয় এক হতে বিসৃষ্ট হয়ে একেই তার প্রলয় —অতএব একত্বই বস্তুস্থিতি, বহুভাব অবাস্তব। কিন্তু এমন তর্কও করা চলে : কালিক প্রকাশ একটা শাশ্বতী স্থিতি যখন—অন্তত শাশ্বতী আবৃত্তি তো বটেই—তখন কালকলনার ওপারে একত্বের মত ব্রহ্মের বহুভাবও একটা শাশ্বত সত্য হবে না কেন ? নইলে কোথা হতে এল তার এই অনতিবর্তনীয় চিরন্তন কালিক আবৃত্তি ?

সকল দর্শন একই স্বরূপসত্যের দর্শন। তাদের মধ্যে খন্ডন-মন্ডনের প্রয়াস চলে শুধু দ্বৈতবুদ্ধির কারসাজিতে। মানুষের মন বিভজ্যদর্শী, তাই অখন্ড অধ্যাত্ম অনুভবের একটা দিকে জোর দেওয়া তার স্বভাব। সত্যের একটা বিভাবকেই খন্ডদর্শনের যুক্তি দিয়ে একমাত্র শাশ্বত সত্য বলে প্রচার করা—এই হতে অধ্যাত্মজগতেও দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক হানাহানি। কখনও বলি, অদ্বৈতচেতনাই একমাত্র সত্য; অথচ অদ্বৈতের বহুধা-বিলাসকেও মানি -মনের ভাষায় সত্যকার ভেদে তার তর্জমা ক'রে। এমনি করে অভেদে আর ভেদে বিরোধ ঘটে যখন, তখন মনের ভুলকে ভাঙতে কোনও বৃহৎ দর্শনের সত্যকে আশ্রয় করি না। বরং উল্টে বলি, বহুর বিলাস একটা মায়ার খেলা!

কখনও আবার একের লীলাকে বৃহৎ করে দেখি। তখন বলি, অদ্বৈতের বিশিষ্ট ভাবই সত্য—জীবাত্মা পরমাত্মার চিন্ময় বিভূতি। শুধু তা-ই নয়: এই বিশিষ্ট ভাবকেই ব্রহ্মের শাশ্বত স্বভাব মেনে নিরুপাধিক চৈতন্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতানুভবকে মিথ্যা বলি!...আবার কখনও ভেদের লীলা বড় হয়ে দেখা দেয়। তখন জীবাত্মা আর পরমাত্মায় শাশ্বত ভেদকে সত্য বলে জানি; অভেদজ্ঞানে ভেদ যে মুছেও যেতে পারে, এ-অনুভবের প্রামাণ্যকে তখন মানি না।...এমনি করে সত্য নিয়েও কত রেষারেষি চলে এসেছে। কিন্তু এবার যে-ভূমিতে অচল প্রতিষ্ঠার আসন পেতেছি, সেখানে অমন কাটছাঁটের কোনও প্রয়োজন তো নাই। আমরা দেখি, সব দর্শনেই সত্য আছে: কিন্তু তাকে ফাঁপিয়ে তোলার ঝোঁকেই দেখা দেয় খণ্ডন-মণ্ডনের মিথ্যা কোলাহল। তাই আমরা মানি তৎ-স্বরূপের নির্বূঢ় নির্বিশেষ স্বরূপ—যার মধ্যে মনঃকল্পিত একত্ব বা বহুত্বের কোনও উপাধি নাই। আরও মানি : তাঁর অন্বয়ভাবে বহুধাবিসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা যেমন, তেমনি তাঁর বহুভাবকে আশ্রয় করেই আবার ফিরে আসা যায় অন্বয়তত্ত্বে—দিব্য বিসৃষ্টিতে আস্বাদন করা চলে অন্বয়ের আনন্দ। সুতরাং এক আর বহু, অভেদ আর ভেদ, অদ্বৈত আর দ্বৈত—তাঁর এসব বিভাব নিয়ে তর্কের ধুলো ঝেঁটিয়ে তোলবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, ব্রহ্মের আনন্ত্যে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের নির্বারিত উল্লাস আছে। অতএব ভেদবুদ্ধির সীমাটানা শুষ্ক তর্কের কারায় তাকে বন্দী করব—এ কি শুধু আমাদের পণ্ডশ্রমই নয় ?

সপ্তদশ অধ্যায়

দিব্য পুরুষ

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥
ঈশোপনিষৎ ৭

যাঁর আত্মা হয়েছে সর্বভূত—কেননা বিজ্ঞান আছে তাঁর-কিই-বা মোহ
কিই-বা শোক থাকবে তাঁর, একত্ব দেখছেন যিনি সকল ঠাঁই ?
—ঈশোপনিষদ (৭)

এতক্ষণে অতিমানসের একটা ধারণা আমাদের হয়েছে। এইটুকু বুঝেছি, আমাদের প্রাকৃত জীবনের নির্ভর যে-মনশ্চেতনার 'পরে, অতিমানস তার বিপরীত কোটিতে। অতিমানসের এই ধারণা হতেই দিব্যভাব ও দিব্যজীবন সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট মনোভাব একটা সুব্যক্ত রূপের ব্যঞ্জনা পেয়েছে। নইলে ও-দুটি সংজ্ঞাকে আমরা বরাবরই ব্যবহার করে এসেছি কতকটা শৈথিল্যের সঙ্গে। ভেবেছি, যা অতিবৃহৎ অথচ প্রায় নাগালের বাইরে, এমন-একটা বস্তুর আকূতিকেই ও-দুটি শব্দের কুহেলিকায় প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু এবার অস্পষ্টতার অপবাদ দূর হয়েছে। দিব্যভাব ও দিব্য-জীবনকে দার্শনিক যুক্তির দৃঢ়ভিত্তির 'পরে দাঁড় করানোও এখন অসম্ভব নয়। মানুষ-ভাব আর মানুষ-জীবনকেই আমরা চিনি ভাল; তবু তার সঙ্গে দিব্যভাব আর দিব্যজীবনের সম্বন্ধটি আমাদের মনে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিঃসংশয়ে বুঝেছি, বিশ্বপ্রকৃতির স্বভাবছন্দের মধ্যেই আছে আমাদের চিরন্তনী আশা ও আকূতির সায়, কেননা আমাদের ঘিরে বিশ্বের যে অতীত পরিবেশ, ভবিষ্য উদয়নের দিকেই তার সুনিশ্চিত ইশারা। অন্তত বুদ্ধি দিয়েও বুঝেছি, যে-পরমার্থতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলি, কি তাঁর স্বরূপ, কি করে বিশ্বরূপে তাঁর আত্মবিসৃষ্টি। ব্রহ্ম হতে যা বেরিয়ে এসেছে, আবার যে ব্রহ্মেই তা ফিরে যাবে—এ নিয়েও আমাদের মনে আর-কোনও সংশয় নাই। এবার তাহলে একটা প্রশ্নের আরও স্পষ্ট জবাব দাবি করবার সময় এসেছে। প্রশ্নটি এই : ব্রহ্মই যদি হন জীবনের স্বরূপসত্য, তাহলে কি করে তাঁর দিকে জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেব ? আধারের কোন্ রূপান্তর সহজ হলে আমরা তাঁর মধ্যে সহজভাবে পৌঁছতে পারব—শুধু সত্তার গভীর গহনে সমাধি-সিদ্ধির নিঃসঙ্গ প্রত্যয় নিয়ে নয়, সবার রঙে রং-মেশানো এই জীবন ও প্রকৃতির অবিকৃত স্বরূপকে নিয়েই ? অবশ্য এখন পর্যন্ত আমাদের দর্শন কতকটা একাঙ্গী, কেননা প্রকৃতির সঙ্কোচের মধ্যে ব্রহ্মের অবতরণের দিকটাই

আমরা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি এতক্ষণ। কিন্তু আমাদের স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উত্তরণের লীলা—জীবে অভিনিবিষ্ট ব্রহ্ম যেখানে প্রকৃতির সংকোচ কাটিয়ে স্বমহিমায় ফিরে যেতে চাইছেন। এই গতির ভেদ হতেই এসেছে মানুষ আর দেবতায় জীবনছন্দের তারতম্য। দেবতাকে কখনও অবতরণের আয়াস স্বীকার করতে হয়নি, তাই উত্তরণের সাধনাও তাঁর অজ্ঞাত। কিন্তু যে-মানুষ তপস্যার বীর্যে মুক্তি অর্জন করেছে, অন্ধকারের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছে দেবত্বের স্বাধিকার, তার অনুভবে এসেছে অগ্নিদীপ্তি, চেতনার নবীন সম্পদ সে জয় করেছে অন্ধতমিস্রায় অবতরণের দুঃসাহসী স্বীকৃতি দিয়েই। কিন্তু তবুও এ-দুয়ের মাঝে স্বরূপসত্যের কোনও ভেদ নাই—শুধু আকার আর রঙের বদল ছাড়া। তাই এতক্ষণের আলোচনায় যেসব সিদ্ধান্তে পোঁছেছি, তাহতে আমাদের অভীপ্সিত দিব্য-জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করা অসম্ভব হবে না।

প্রশ্ন তাহলে এই। মনে করা যাক, চিৎ এখনও নেমে আসেনি জড়ের মধ্যে, জীবাত্মা জড়প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি, অতএব অবিদ্যারও করাল ছায়া দেখা দেয়নি। এ-অবস্থায় কোনও চিন্ময় দিব্য পুরুষের স্বরূপকথা কি হবে? কিই-বা হবে তাঁর চেতনার পরিচয়? অবশ্য এটুকু বুঝি : বস্তুর স্বরূপসত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা—অব্যভিচারিত অন্বয়ভাবের শাশ্বত প্রত্যয়ে। ব্রহ্ম-সত্তারই মত আপন অনন্তসত্তার অবিচল আয়তনে তাঁর স্থিতি। অথচ দেব-মায়ার লীলায়, ঋত-চিতের সংজ্ঞানময় ও প্রজ্ঞানময় দুটি উল্লাসে ব্রহ্মের সঙ্গে যুগপৎ অভেদ ও ভেদকেও তিনি আস্বাদন করেন; আবার অন্বয়স্বরূপের বহুধা-আত্মরূপায়ণের অন্তহীন বিলাসে, অন্যান্য দিব্য পুরুষের সঙ্গেও তিনি এই ভেদাভেদের আনন্দ সম্ভোগ করেন।...এই নিত্যসিদ্ধ চেতনা আমাদের কাম্য বলে তার স্বরূপকে আরও তলিয়ে বুঝতে চাই।

স্পষ্টই বোঝা যায়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অপ্রপঞ্চিত উল্লাসে নিত্যচ্ছন্দিত এই দিব্য পুরুষের চেতনা। অসম্ভূত সৎস্বরূপে তিনি অন্তহীন নিরঞ্জন সন্মাত্র। আবার সম্ভূতিরূপে অজর অমর প্রাণের তিনি প্রমুক্ত উচ্ছ্বাস। দেহের জন্ম মৃত্যু ও বিপরিণামদ্বারা তাঁর সত্তা অপরামৃষ্ট, কেননা তাঁতে অবিদ্যার ছায়া নাই, জড়ভূতের অন্ধ আবরণ নাই। আবার শক্তিরূপে তিনি অন্তহীন নিরঞ্জন চেতনা—শাশ্বত জ্যোতির্ময় প্রশান্তির অচল প্রতিষ্ঠায় নিত্যসংস্থিত। অথচ বিজ্ঞান ও চিৎশক্তির বিচিত্র বিলাসে উপচে পড়ে তাঁর অক্ষুণ্ণ স্বাতন্ত্র্য। তাঁর মধ্যে প্রমাদী মনের স্খলন নাই, নাই আয়াসক্লিষ্ট ব্যর্থ সঙ্কল্পের বঞ্চনা, কেননা অদ্বয়ভাবের সত্য হতে কখনও তিনি প্রচ্যুত হন না, দিব্য স্বভাবের স্বচ্ছন্দ সুষমা ও স্বরূপজ্যোতি কখনও তাঁর ম্লান হয় না। পরিশেষে, আনন্দস্বরূপে তিনি শাশ্বত আত্মরতির অব্যভিচারিত

নিরঞ্জন উল্লাসে সমুচ্ছল। কালকলনাতেও সে-আনন্দের প্রবাহ বিচিত্র ও মুক্তচ্ছন্দ। আমাদের মত তার মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ অতৃপ্তি ও সন্তাপের বিকৃতি নাই। কেননা, বুদ্ধির সঙ্কোচ দ্বারা, প্রমত্ত দুরাগ্রহের ব্যর্থতা দ্বারা, অন্ধ-বাসনার তাড়না দ্বারা সে-আনন্দ খন্ড-ক্লিষ্ট নয়।

দিব্য পুরুষের সংবিতে অনন্ত সত্যের কোনও বিভাব অনধিগম্য থাকবে না, বিচিত্র সম্বন্ধের জালে জড়িত হয়েও তার দিব্যস্থিতিতে সীমার সঙ্কোচ দেখা দেবে না। এমন-কি জীবত্বের প্রতিভাস এবং ভেদব্যবহারের লীলাকে পরিপূর্ণ স্বীকার করেও সে-সংবিৎ কখনও স্বরূপানুভব হতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হবে না। দিব্য পুরুষের আত্মসংবিৎ নিরন্তর পরা সংবিৎ দ্বারা অধিবাসিত থাকবে। পরা সংবিৎ আমাদের কাছে অনিরুক্ত সত্তার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম আছেন পরাৎ-পর হয়ে : তিনি অবিজ্ঞেয়, নিজেকে জানেন আমাদের জ্ঞানের ধারা ধরে নয়; বুদ্ধি ব্রহ্মের এই পরিচয় জানে শুধু, তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে সে পারে না। কিন্তু দিব্য পুরুষের নিবাস বস্তুর স্বরূপসত্যে, অতএব নিজেকে তিনি নিত্য অনুভব করেন পরা সংবিতের প্রকাশরূপে। তাঁর অক্ষরসত্তা তুরীয় সচ্চিদানন্দের অব্যাকৃত স্বরূপসত্তা। আবার তাঁর চিদ্বিলাস তৎস্বরূপের সচ্চিদানন্দময় বিভূতি। তাঁর বিজ্ঞানময় স্থিতি বা প্রবৃত্তির প্রত্যেকটি বিভাবকে তিনি অপ্রমেয়ের আত্ম-প্রমিতির একটা বিচিত্র প্রকাররূপে অনুভব করবেন। তাঁর বীর্য সংকল্প ও শক্তির প্রত্যেকটি স্থিতি বা বিভঙ্গে জানবেন তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা ও প্রজ্ঞার চিন্ময় বীর্যবিভূতিতে সেই পরমশিবের আত্মবিভাবনের স্ফূর্তি। তেমনি তাঁর আনন্দ প্রেম ও আত্মরতির প্রত্যেকটি স্থিতি বা তরঙ্গে তিনি পাবেন আত্মা-রামের চিন্ময় রমণোল্লাসের অনুভব। পরা সংবিতের এই সাযুজ্য দিব্য পুরুষের সংবিতে একটা চকিত দীপ্তি নয় শুধু। অথবা এমনও নয় যে, বহু আয়াসে একবার এই চরম ভূমিতে পেঁৗছে একে কোনরকমে তিনি আঁকড়ে আছেন। তাঁর সাধারণ স্থিতির 'পরে এ-যে একটা বিশেষণ সিদ্ধি বা চরম পরিণতির প্রলেপ, তাও নয়। ভেদে এবং অভেদে এ-সাযুজ্য তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ, তাঁর স্বারসিক অনুভব। জ্ঞানে কর্মে ভোগে অথবা সংকল্পে এ-অনুভব তাঁর কখনও ম্লান হয় না। কালাতীত অচলপ্রতিষ্ঠায় অথবা কালকলনার তরঙ্গদোলায়, দেশাতীত পরম সদ্‌ভাবে অথবা দেশাবচ্ছিন্ন সত্তার বিভূতিতে, হেতু-প্রত্যয়ের অতীত নিরুপাধিক নিরঞ্জন স্বভাবে অথবা হেতু-প্রত্যয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্যবহার্য স্থিতিতে তাঁর সাযুজ্যের অনুভব কোথাও গ্রস্ত কিংবা স্তিমিত হবে না। পরা সংবিতের এই নিত্যসাযুজ্য হবে তাঁর অন্তহীন স্বাতন্ত্র্য ও আনন্দের নিরন্ত নির্ঝর, তাঁর লীলাবিভূতিকে করবে স্বপ্রতিষ্ঠায় প্রমাদহীন, তাঁর দিব্যভাবের হবে পরম রসায়ন।

অখন্ড সচ্চিদানন্দের আত্মবিভাবনের যে-দুটি অবিনাভূত কোটিকে আমরা এক এবং বহু বলে জানি, সে-দুটি শাশ্বত-বিভাবকে দিব্য পুরুষের চেতনা যুগপৎ অধিকার করে আছে। বস্তুত দিব্য পুরুষের কেন, সর্বভূতেরই স্থিতির এই একটি ধারা। কিন্তু আত্মসংবিৎ আমাদের খণ্ডিত বলে এক এবং বহুতে আমরা অনপনেয় একটা বিরোধ দেখি। তখন দুয়ের মাঝে একটিকে আমাদের বেছে নিতে হয়। বহুর মেলায় থাকলে অখণ্ডের সমগ্র ও অপরোক্ষ সংবিৎ আমাদের মাঝে লুপ্ত হয় : আবার অখণ্ডে অবগাহন করলে বহুর চেতনাকে বাধ্য হয়ে নিরাকৃত করতে হয়। কিন্তু দিব্য পুরুষের চেতনায় এই দ্বন্দ্ব ও অসমুচ্চয়ের জুলুম নাই। নিঃশেষ আত্মসমাধান ও অন্তহীন আত্মপ্রসারণ কি আত্মবিচ্ছুরণ দুয়েরই সমুচ্চিত অনুভব তাঁর স্বভাব। তাঁর মধ্যে অখণ্ডের অদ্বৈতচেতনায় অনন্ত আত্মবিভাবনার সংবেগ যেন সম্পুটিত এবং অব্যাকৃত হয়ে আছে—যদিও স্ফুরত্তা তার নিত্য সম্ভাবিত। অথচ আমাদের মনশ্চেতনায় এ-বিভাব জাগায় শুধু অসৎ বা শূন্যের কল্পনা। কিন্তু এই অদ্বৈতানুভবের সঙ্গে দিব্য পুরুষের মধ্যে আছে অখণ্ডের চিদ্বিলাসের অনুভব—নিজের চিন্ময় সত্তা সংকল্প ও আনন্দের লীলায়নে বহুবিভাবনার অফুরন্ত উল্লাস। বহুর অব্যক্তভাবে একের অদ্বৈতপ্রত্যয় এবং একের আত্মপ্রসারে বহুর অভি-ব্যক্তি—সচ্চিদানন্দের এই দ্বিদল লীলার যুগপৎ আস্বাদনই তাঁর অদ্বৈতবোধের স্বরূপ। যে-অন্বয়তত্ত্ব বহুত্বের শাশ্বত প্রভব এবং স্বরূপসত্য, বহুর মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যভাবনার আকূতি নিরন্তর তাকে আকর্ষণ করছে নিজের ভূমিতে। আবার লোকোত্তরের মহাসংকর্ষণে বহু ছুটেছে একের সেই মহারাসমঞ্চে, যেখানে নিখিল ভেদলীলার শাশ্বত পর্যবসান ও আনন্দময় সার্থকতা। চিৎশক্তির এই উজান-ভাটার যুগললীলা দিব্য পুরুষের চেতনায় অখণ্ডৈকরস হয়ে ভাসছে। এই পরমদর্শনই ঋত-চিতের সম্প্রত্যয়, বৈদিক ঋষি যাকে বলেছেন, 'সত্যম্ ঋতং বৃহৎ'। সমস্ত বিরোধের এই পরমসমন্বয়ই যথার্থ 'অদ্বৈত'—যে-সংজ্ঞাশব্দের মধ্যে আছে অবিজ্ঞেয়ের বিজ্ঞানের উদারতম ব্যঞ্জনা।

দিব্য পুরুষ জানবেন : সত্তা সংবিৎ সঙ্কল্প ও আনন্দের এই-যে বৈচিত্র্য, এ সেই আত্মসমাহিত পরমাদ্বৈতের আত্মপ্রসারণ ও বিচ্ছুরণ—স্বভাবের উল্লাসে তাঁর উপচে পড়া। তাঁর আত্মবিপরিণামের এ-লীলা তো ভেদদ্বারা নিজেকে খন্ডিত করা নয়—এ-যে অন্তহীন অখন্ডতাকে আরেকরূপে ছড়িয়ে দেওয়া শুধু। আত্মস্বরূপে তিনি নিত্যসমাহিত অন্বয়রূপ: অথচ সেই স্বরূপের প্রসারণে বৈচিত্র্যের এই উল্লাস তাঁর। যা-কিছু তাঁর মধ্যে রূপায়িত হচ্ছে সে তো অন্বয়রূপেরই অন্তহীন সামর্থ্যের বিচ্ছুরণ। এমনি করে নামহীন নৈঃশব্দ্যের গহন হতে জাগছে বাক্ বা নামের ঝঙ্কার, অরূপের

স্বরূপ হতে ফুটছে রূপের লীলা, শক্তির নিমেষ হতে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সঙ্কল্প ও বীর্যের সংবেগ, আত্মসংবিতের কালকলনাহীন আদিত্যবিম্ব হতে ঝিকিয়ে উঠছে আত্মপ্রত্যয়ের রশ্মিরেখা, চিন্ময় অসম্ভূতির চিরন্তন প্রতিষ্ঠার বুকে দুলছে সম্ভূতির স্পন্দিত চেতনা, অনুদ্বেল আনন্দের শাশ্বত স্তব্ধতা হতে উৎসারিত হচ্ছে প্রেম ও হর্ষের অফুরন্ত জোয়ার। এ-লীলা নির্বিশেষেরই আত্মবিভাবনের দ্বিদল লীলা। তার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বিভূতিতে থাকবে একটা একান্তী প্রত্যয়, কেননা প্রত্যেক বিশেষ সেখানে নিজেকে নির্বিশেষের বিভূতিরূপে জানে। অথচ এই ঐকান্তিকতার মধ্যে অবিদ্যার ছোঁয়াচ থাকবে না, অতএব একটি বিশেষ অপর বিশেষকে অপূর্ণ বা অসগোত্র জ্ঞানে নিরাকৃত করবে না।

বিশ্বের পরিব্যাপ্তিতে দিব্য পুরুষ অতিমানস স্থিতির তিনটি পর্ব অনুভব করবেন—আমাদের মনঃকল্পিত তিনটি বিবিক্ত পর্বরূপে নয়, সচ্চিদানন্দের আত্মবিভাবনার একটি অখণ্ড ত্রিপুটীরূপে। তাঁর আত্মস্বরূপের সর্বায়তন অখণ্ড উপলব্ধির মধ্যে তারা বিবিক্ত হয়ে ধরা দেবে, কেননা অখণ্ড-গ্রাহী বৃহৎ পরিব্যাপ্তি হল ঋতচিন্ময় অতিমানসের স্বধর্ম। দিব্য পুরুষের কল্পদৃষ্টিতে অনুভবে বা ব্যক্তপ্রত্যয়ে এমনি করে সর্বভূত প্রতিভাত হবে আত্মারূপে। সে-আত্মা তাঁর আত্মা, সর্বভূতের আত্মভূত এক আত্মা, অথবা এক অখণ্ড আত্মভাব এবং সর্বগত আত্মবিভাবনা। বিভূতির বৈচিত্র্যেও তার খণ্ডতা নাই, কেননা আত্মসংবিৎ আর আত্মবিভূতির বিবিক্ত সত্তা সেখানে নাই। আবার তাঁর কল্পদৃষ্টিতে অনুভবে ও ব্যক্তপ্রত্যয়ে সর্বভূত দেখা দেবে এক অন্বয়স্বরূপের বিচিত্র চিন্ময় বিগ্রহরূপে। সে দিব্য অনুভবে প্রতি ভূত এক অখণ্ডসত্তাতে সত্তাবান, অখণ্ডের মধ্যেই তার বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা। ভূতে-ভূতে যে-অন্বয়স্বরূপের আনন্ত্যের অভিব্যঞ্জনা, তার মধ্যে প্রতি ভূতের অন্যোন্যসম্বন্ধ বিধৃত থাকবে অন্বয়স্বরূপের নিত্যযোগে, কেননা প্রতি ভূত তাঁর অন্তহীন আত্মরূপায়ণের চিদ্‌ঘন বিচ্ছুরণ। পরিশেষে তাঁর কল্প-দৃষ্টিতে অনুভবে ও ব্যক্তপ্রত্যয়ে প্রতি ভূত ভাসবে তার সনাতন বৈশিষ্ট্য নিয়ে—চিদ্‌ঘন ব্রহ্মবিন্দুর বিবিক্ত ভঙ্গি হয়ে। তখন প্রতি বিগ্রহে একই পরমদেবতার অধিবাস। অতএব বিগ্রহ মিথ্যা বা কল্পমায়া নয়, অখণ্ড সত্যের একটা মায়িক অংশ নয়, কিংবা এক অবিচল মহাসমুদ্রের ফেনোচ্ছল তরঙ্গলীলা নয় শুধু—কেননা এসমস্তই অপূর্ণদর্শী মনের জল্পনা মাত্র। দিব্যদৃষ্টিতে ব্যক্তির সত্তা অখণ্ডেরই অখণ্ড বিলাস। অনন্ত সত্যের পূর্ণ ব্যঞ্জনা তার সত্যে—বিন্দুতে সিন্ধুর প্রতিফলন নয় শুধু, সিন্ধুর পরিপূর্ণ আবেশ। এই বিশেষই তখন সেই পরিপূর্ণ নির্বিশেষ, কেননা সত্যের দৃষ্টি তার মধ্যে প্রতিভাসের মর্ম ভেদ করে পূর্ণস্বরূপের স্বমহিমাকে দেখতে পায়।

কিন্তু এই-যে তিনটি অনুভব, অতিমানসের সংপিণ্ডিত অদ্বৈতানুভবে এরা এক অখণ্ডৈকরস প্রত্যয়—এদের একটি হতে আরেকটিকে সেখানে বিবিক্ত করা চলে না। মানুষী ব্রহ্মানুভূতিতে তারা ধরে আত্মবিজ্ঞানের তিনটি রূপ। উপনিষদ প্রথমটিকে বলেছেন, 'যস্য সর্বভূতানি আত্মৈবাভূৎ'—আমাদের আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত। দ্বিতীয় অনুভবের সূত্র, 'সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব'—সর্বভূতকে দেখা আত্মার মধ্যে। আর তৃতীয় অনুভবে, 'সর্বভূতেষু আত্মানম্'—আত্মাকে দেখা সর্বভূতে। আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত—এই হল আমাদের সর্বাত্মভাবের ভিত্তি। আত্মার মধ্যে সর্বভূত—এই অনুভবে হয় ভেদের মধ্যেও অভেদদর্শন। আর সর্বভূতেই আত্মা আছেন—এই অনুভবে ঘটে বিশ্বে জীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা। তিনটি অনুভবকে আলাদা করে দেখানো হল বুদ্ধির প্রয়োজনে; কিন্তু স্বারসিক প্রত্যয়ে তারা অবিবিক্ত। আমাদের মনে খুঁত আছে, একটা-কিছুকে একান্ত বিবিক্ত করে আঁকড়ে ধরবার ঝোঁক আছে। তাই অখণ্ড আত্মোপলব্ধির যে-কোনও বিভাবকে সে আর-সবাইকে ছাপিয়ে বড় করতে পারে। এমনি করে উপলব্ধির অপূর্ণতা ও ব্যাবর্তকতায় পরমার্থ-সত্যের মধ্যেও লাগে মানুষের প্রমাদী মনের ছোঁয়াচ, অদ্বৈতের সর্বাবগাহী ভাবনাতেও জাগে বিরোধ ও অন্যোন্যপ্রতিষেধের কল্পনা। কিন্তু দিব্য পুরুষের অতিমানস চেতনা মনের বিকল্প হতে নির্মুক্ত—তার মধ্যে সর্বগ্রাহী অদ্বৈতপ্রত্যয়ের বৈপুল্য আছে, আছে আনন্ত্যের সমগ্র ধৃতি। অতএব তাঁর কাছে দিব্য অনুভবের এই ত্রয়ী একই পরানুভবের মহাত্রিপুটী মাত্র।

কল্পনা করা যাক, এই দিব্য পুরুষের চেতনা কোনও ব্রহ্মভূত জীবচেতনায় আবিষ্ট। তখন সেই জীব-ব্রহ্ম আত্মজীবনে এবং তথাকথিত অপর জীবের সঙ্গে বিবিক্ত ব্যবহারেও চেতনার মর্মমূলে সর্বযোনি অদ্বৈতের অখণ্ড সমগ্রতা অনুভব করবেন। আবার তাঁর চেতনার পরিমণ্ডলে থাকবে বিশ্বাত্ম-ভাবন অথচ সবিশেষ অন্বয়ভাবনা। বিশ্ব আর বিশ্বাতীতের দুটি দুয়ারই তাঁর কাছে খোলা থাকবে এবং তাদের ভূমিকা থেকে জীবত্বের লীলাকে আস্বাদন করা তাঁর একান্ত সহজ হবে। বেদে দিব্যভাবের এই তিনটি ভঙ্গিই দেবস্বরূপের ভাবনায় স্থান পেয়েছে। স্বরূপত দেবতারা এক, কেবল ঋষিরা তাঁদের বিভিন্ন নামে ডাকেন—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' কিন্তু 'সত্যম্ ঋতং বৃহতের' পরমা প্রতিষ্ঠা হতে যখন উৎসারিত দেখি তাঁদের ক্রতুর লীলা, তখন জানি অগ্নিই (অথবা অন্য-কোনও দেবতা) সকল দেবতা হয়েছেন—অখণ্ড থেকেই তিনি সব হয়েছেন। আরও জানি, নাভিতে সমর্পিত অরসমূহের মত সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে রয়েছেন—'স দেবান্ বিশ্বান্ বিভর্তি'। আবার জানি, বিশিষ্ট দেবতারূপে সবার মিত্র তিনি, বীর্যে প্রজ্ঞায় ছাপিয়ে গেছেন সবাইকে, তবু তিনি 'দেবানাম্ অবমঃ'—আছেন সবার নীচে,

দেবতাদের দূতরূপে। মানুষের 'পুরোহিত' তিনি, তিনি 'ক্রাণা' বা কর্মী। বিশ্বের স্রষ্টা তিনি, আমাদের পিতৃস্বরূপ, অথচ তিনি 'সহসঃ সূনুঃ' - আমাদেরই উৎসাহসের বীর্যে জাত। অর্থাৎ অনাদি অথচ প্রজাত অন্তর্যামী আত্মা বা ব্রহ্ম তিনি, তিনি সর্বভূতাধিবাস অদ্বয়স্বরূপ।

দিব্য পুরুষের ব্যবহারও দিব্য। সর্বাবগাহী আত্মসংবিৎ দ্বারা তিনি জানেন—ব্রহ্ম পরমাত্মা অথবা তাঁর আত্মরূপী জীবের সঙ্গে কি তাঁর সম্বন্ধ। সে-সম্বন্ধের বিলাসে আছে শুধু আত্মভাব সংবিৎ বিজ্ঞান শক্তি সংকল্প প্রেম ও আনন্দের ছন্দোলীলা। এ-লীলায় বৈচিত্র্যের শেষ নাই, কেননা দিব্য পুরুষের নির্মুক্ত চেতনায় আত্মারও সামর্থ্যের অন্ত নাই। তাই তাদাত্ম্য-ভাবের অব্যভিচারী অনুভবে সমন্বিত অনন্ত সম্বন্ধের নিরঙ্কুশ বৈচিত্র্যে তাঁর ভোগ সমৃদ্ধ হবে আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্ভাবিত কোনও সম্বন্ধকেই ছাঁটবার প্রয়োজন হবে না সেখানে। একদিক দিয়ে সে-ভোগ হবে আত্ম-সমাহিত আত্মারামের দিব্যসম্ভোগ, আর একদিকে সে বিশ্ববৈচিত্র্যে আত্মবিভাবনার বিচিত্র আস্বাদন -রূপে-রূপে বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে সেই বহুরূপে রমমাণ হবার অনির্বচনীয় উল্লাস। আবার ভেদভাবনায় সর্বভূতের বিবিক্ত অনুভবকে আত্মবৎ সম্ভোগ করা—এই হবে তাঁর আস্বাদনের আরেকটি ভঙ্গি। দিব্যরাত্রের এই বিপুল সামর্থ্য তাঁতেই সম্ভব। কেননা তিনি জানেন, তাঁর স্বকীয় কি পরকীয় অনুভব, অথবা অপরের সঙ্গে তাঁর অন্যোন্যসম্বন্ধ—এসব তাঁর আত্মস্বরূপে অখণ্ড পরমাত্মার রসোদ্‌গার, তাঁর নিরঙ্কুশ আনন্দের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। ভূতে-ভূতে এক সর্বাধিবাসই 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' -এইটুকুতে ভেদের আভাস। কিন্তু তাঁর অখণ্ড সম্ভূতিসংবিতের পরম অনুভবে সে-আভাসও মিলিয়ে গেছে। এই তাদাত্ম্যবোধেই দিব্য পুরুষের সকল অনুভবের প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর মধ্যে খণ্ডিত চেতনার দ্বন্দ্ব নাই—যা আমাদের চেতনায় অবিদ্যা ও বিবিক্ত অহমিকার স্বাভাবিক পরিণাম। আত্মায়-আত্মায় অন্যোন্যসম্বন্ধের বৈচিত্র্য তাঁর চেতনায় বেজে উঠবে এক দিব্যরাগিণীর সুষম ঝঙ্কারে—চিন্ময় লীলোচ্ছলতায় পরস্পরকে তারা ছেড়ে গিয়েও জড়িয়ে ধরবে, মিলিয়ে যাবে এক শাশ্বত সুরমূর্চ্ছনার অগণিত বীচিভঙ্গে।

দিব্য পুরুষের চেতনায় আত্মভাব বিজ্ঞান ও সংকল্পের বেলাতেও চলবে এই অন্যোন্য-আপ্যায়নের লীলা। তাঁর আনন্দময় অনুভবে স্ফুরিত হচ্ছে চিদানন্দময় আত্মভাবের উল্লাস শুধু। অদ্বৈতানুভবের ঋতময় প্রশাসনে তাঁর মধ্যে তাই প্রজ্ঞার সঙ্গে সংকল্পের বা উভয়ের সঙ্গে আনন্দের কোনও বিরোধ নাই। এমন-কি চেতনার এই ভূমিতে একটি পুরুষের বিজ্ঞান সংকল্প ও আনন্দের সঙ্গে আরেকটি পুরুষের বিজ্ঞান সংকল্প ও আনন্দের কোনও

সংঘর্ষ দেখা দেবে না। কারণ, আমাদের খণ্ডসত্তা যাকে সংঘর্ষ ও বৈষম্যের উত্তেজনা বলে জানে, তাঁদের অখণ্ডানুভববাসিত চেতনায় তা ফুটবে এক অনন্তসুরসঙ্গীতের বিচিত্র স্বরলীলা হয়ে—যার মধ্যে থাকবে শুধু মিলন-সুষমার ছন্দোলীলা।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে দিব্য পুরুষের সম্বন্ধ হবে পরমতাদাত্ম্যের সম্বন্ধ, কেননা বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক চৈতন্যকে তিনি আত্মচৈতন্যরূপে অনুভব করবেন। তাঁর স্বরূপব্যক্তিতে যে-ব্রহ্মতাদাত্ম্যের অনুভব, ঘটে-ঘটে ব্রহ্মানুভবে ফুটবে তার বিশ্বতোমুখ বিচ্ছুরণ। ব্রহ্মসংস্পর্শে তাঁর বিজ্ঞান হবে ব্রহ্মের সার্বজ্ঞ্যের লীলা, কেননা ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অজ্ঞান, ব্রাহ্মী চেতনায় তা স্বরূপবোধের বিশ্রান্তিতে জ্ঞানের সংহরণমাত্র—যাতে তাঁর আত্মবোধের প্রভাস হতে একটি রশ্মি বিকীর্ণ হয়ে আমাদের ভিতর দিয়ে তাঁকে খণ্ডবোধের আস্বাদন দেয়। তেমনি দিব্য পুরুষের সংকল্প হবে ব্রহ্মের সর্বৈশ্বর্যের লীলা, কেননা ব্রহ্ম শক্তি সংকল্প ও বীর্যস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অশক্তি ও অসামর্থ্য, তাঁর মধ্যে তা শক্তির অবিক্ষুব্ধ পুঞ্জভাবে সংকল্পের সংহরণ মাত্র। তার ফলে চিৎশক্তির বিশেষ-একটা বিভূতি আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে মিতবীর্যের বিশিষ্ট ছন্দে। এমনি করে দিব্য পুরুষের প্রেম ও আনন্দ ব্রহ্মের চিন্ময় রসোল্লাস, কেননা ব্রহ্ম প্রেম ও আনন্দস্বরূপ। আমাদের কাছে যা অপ্রেম ও নিরানন্দ, তাঁর কাছে তা আত্মরতির গহন সমুদ্রে হ্লাদিনী-শক্তির অবগাহন মাত্র। দিব্যসম্প্রয়োগের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি এই ভূমিতে আনন্দসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, এ তারই আয়োজন। এমনি করে সম্ভূতির চিত্রলীলায় দিব্য পুরুষের মধ্যে ঘটবে ব্রহ্মসদ্ভাবের উচ্ছল রূপায়ণ। আমাদের কাছে যা বিরতি মৃত্যু বা অত্যন্তনাশ, তাঁর অনুভবে সে শুধু সচ্চিদানন্দের শাশ্বত অধিষ্ঠানে প্রপঞ্চোল্লাসময়ী মায়ার বিশ্রান্তি বৈচিত্র্য বা সংহরণ মাত্র। অথচ অদ্বৈতের এই নিত্যানুভবে দিব্য পুরুষের চেতনা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে অভেদে-ভেদের বিলাস হতেও বঞ্চিত হবে না—সে হবে তাঁর অদ্বৈত-রতির আরেকটি বিভাব মাত্র। পুরুষোত্তমের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে রসিকের হৃদয়ে যে অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের অনির্বচনীয় রসোদ্‌গার জাগে, দিব্য পুরুষের চেতনায় তার সকল সম্ভাবনাই নিরর্গল থাকবে।

এখন প্রশ্ন এই : কোন্ পরিবেশে, কি সাধনের সহায়ে চরিতার্থ হবে দিব্য পুরুষের এই জীবনায়ন? ব্যবহার-জগতের সকল অনুভবের মূলে আছে বিশিষ্ট কতগুলি সাধনের মধ্যস্থতায় সন্ধিনী-শক্তির একটা রূপায়ণ। তাদের আমরা নাম দিয়েছি—ধর্ম, গুণ, ক্রিয়া বা বৃত্তি। যেমন ব্যবহারভূমিতে নামতে হলে মনোধাতুর ব্যাকৃতি চাই—ধর্মগ্রাহিতা, বিষয়াবেক্ষণ, স্মৃতি, সমবেদনা প্রভৃতি বিচিত্র মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিপরিণামে; তেমনি ঋত-চিৎ

বা অতিমানসেরও পুরুষে-পুরুষে সংযোগসাধনার জন্য চাই অতিমানস কতগুলি শক্তি বৃত্তি ও ক্রিয়ার উদ্ভাবন। নইলে বৈচিত্র্যের লীলা সম্ভবপর হবে না। দিব্যজীবনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আবার অতিমানসী বৃত্তির কথা তুলব। এখন শুধু দেখছি তার তাত্ত্বিক ভিত্তি কি, কিই-বা তার যথাযথ স্বভাব ও স্বধর্ম। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট, বিবিক্ত অহংবোধের ও ব্যাবহারিক চেতনায় খণ্ডবৃত্তির অভাব অথবা উচ্ছেদই দিব্যজীবনসাধনার মূলমন্ত্র -কেননা এরা আছে বলেই মানুষ মরণধর্মী এবং ব্রাহ্মী স্থিতি হতে বিচ্যুত। ইহুদী শাস্ত্রের ভাষায় ওই তো আমাদের "আদি দুরিত"—দার্শনিক যার তর্জমা করে বলবেন, এমনি করেই আমরা ভ্রষ্ট হয়েছি শুদ্ধ-চিতের সত্য ও ঋত হতে, তার অখণ্ড-অদ্বয় সৌষম্য হতে। অবিদ্যার অতল গহনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবাত্মার যে সংসার-অভিযান শুরু হল, দুঃখের অরণিমন্থনে মানুষের হৃদয়ে সমিদ্ধ হল যে অভীপ্সার বহ্নিশিখা—এই স্বরূপচ্যুতি সে-তপস্যারই অপরিহার্য সাধন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মন ও অতিমানস

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৪

তিনি জানতে পারলেন, মনও ব্রহ্ম।
—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।৪)

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
গীতা ১৩।১৭

অবিভক্ত তিনি, কিন্তু ভূতে-ভূতে বিভক্ত হয়ে আছেন যেন।
—গীতা (১৩।১৭)

সচ্চিদানন্দের ভূমিতে দিব্য পুরুষ যে অতিমানস লীলার অবিকল্প স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এতক্ষণ তার স্বরূপসত্যের একটা ধারণা করতে চেয়েছি। প্রাকৃত দেহমনের আধারে সচ্চিদানন্দের যে-বিগ্রহ স্ফুরিত হয়েছে, সেই মানুষী চেতনাতেও অতিমানসের প্রকাশ সম্ভব—এই আমাদের আশা। কিন্তু অতিমানস ভূমির যতটুকু আভাস পেয়েছি, তাতে মনে হয় না আমাদের অভ্যস্ত জীবলীলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক বা সমতা আছে। দেহ আর মনের দুটি ভুবনের মাঝে প্রাণের অন্তরিক্ষলোকে প্রাকৃত জীবনের উৎস ও আশ্রয়। তার মধ্যে কোথায় অতিমানসের স্থান? মনে হয় না কি, অতিমানস চেতনায় বিদেহ সত্ত্বের বিলাস শুধু—শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ আনন্দের উল্লাসে আত্মায়-আত্মায় মেশামেশি সে-লোকে। সেখানে রূপের স্থূল সীমা বা জড়-বিগ্রহের ভার নাই। সেখানে আত্মায়-আত্মায় ভেদের আভাস আছে, কিন্তু তা এখনও বিগ্রহের সীমাঙ্কিত হয়নি। চেতনা সেখানে আনন্ত্যের প্রমুক্ত উল্লাসে উচ্ছলিত, সান্ত রূপের কারাগারে বন্দী নয়। তাইতো শঙ্কা জাগে, জীবনের যে-একটিমাত্র রূপকে আমরা চিনি, দিব্যজীবনের আবির্ভাব কি তার সঙ্কীর্ণ পরিবেশে সম্ভব—যেখানে সীমার সঙ্কোচে দেহের রূপায়ণ, আর তার জালে জড়িয়ে আছে প্রাণ, তার কারাগারে বন্দী রয়েছে মন?

এ-জগৎ বস্তুত যে অনন্ত পরম সত্তা চিৎশক্তি ও স্বরূপানন্দের উল্লাস, আমাদের মনশ্চেতনা যার বিকৃত ছায়া মাত্র—এতক্ষণে তার একটা মোটামুটি ধারণা করতে চেয়েছি। বুঝতে চেয়েছি, কি এই দেবমায়া, এই ঋত-চিৎ, এই সম্ভূতবিজ্ঞান—যা দিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক পরমার্থ-সতের চিন্ময়ী মহাশক্তি প্রপঞ্চোল্লাসময় আত্মবিভাবনায় এই বিশ্বের কল্পনা করে, রূপ গড়ে, ঋতের ছন্দে তাকে লীলায়িত করে। পরম পরার্ধে আছে সৎ চিৎ আনন্দ ও দেবমায়ার নিত্যলীলা। কিন্তু এই দিব্য চতুষ্টয়ীর সঙ্গে দেহ-প্রাণ-মনরূপী

আমাদের নিত্যপরিচিত পার্থিব ত্রয়ীর কি সম্পর্ক, সে তো জানি না। দ্যুলোকে যেমন আছে 'দেবী মায়া,' ভূলোকে তেমনি আছে বুঝি 'অদেবী মায়া'; আমাদের সকল কৃচ্ছ্রসাধনা ও সন্তাপের সেই তো নিদান। কিন্তু কি করে ওই মায়া হতে এই মায়ার রূপায়ণ হয়? এ-রহস্যের মীমাংসা যতক্ষণ না হবে, দুয়ের মাঝে হারানো যোগসূত্রটি যতক্ষণ না খুঁজে পাব, ততক্ষণ বিশ্বও আমাদের কাছে রহস্যগুণ্ঠনে ঢাকা থেকে যাবে—অতএব উত্তরভূমির সঙ্গে এই অবর জীবনের মিলন কখনও সম্ভব কিনা, তা নিয়েও সংশয়ের অবকাশ থাকবে। জানি, সচ্চিদানন্দ হতে এ-জগতের বিসৃষ্টি, তিনিই এর অধিষ্ঠান। এ-ধারণাও আসে, জগন্নিবাস তিনি—বিশ্বের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আত্মা ও প্রভু তিনিই। এও দেখেছি, আমাদের ইন্দ্রিয়ে মনে শক্তিতে সত্তায় যে-দ্বন্দ্ববিধুরতা—সেও তাঁর আনন্দ, তাঁর চিন্ময় সংবেগ, তাঁর দিব্যভাবের মূর্ছনা। কিন্তু তবু মনে হয়, আমাদের এই জীবনদ্বন্দ্ব কি তাঁর লোকোত্তর তত্ত্বভাবের একেবারে বিপরীত নয়? যতক্ষণ এই বৈপরীত্যের হেতুচ্ছেদ না হবে, মায়ার অবর ত্রয়ীর জালে জড়িয়ে থাকব যতক্ষণ, ততক্ষণ কি দিব্যভাবের অকুণ্ঠিত সিদ্ধি সাধ্যের বাইরে থাকবে না? তার জন্য এই অবর সত্তাকে উত্তীর্ণ করা চাই উত্তরভূমিতে অথবা দৈহ্যসত্তার বিনিময়ে চাই নির্বিশেষ শুদ্ধসত্তা, প্রাণের বিনিময়ে চিৎশক্তির অবিমিশ্র বিলাস, ইন্দ্রিয়-মনের চেতনার বিনিময়ে আনন্দ ও প্রজ্ঞার পরিশুদ্ধ বিকিরণ। এমনি করে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা চাই চিন্ময় পরমার্থের মধ্যে। কিন্তু তাহলেই কি আমাদের এই পার্থিব অথবা সীমিত ভূমিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে সত্তার বিপরীত মেরুতে উত্তীর্ণ হতে হবে না—হয় নির্বিকল্প চিৎস্বভাবের কোনও ভূমিতে, কিংবা সম্ভাবিত কোনও সত্য-লোকে, অথবা দিব্য ভাব দিব্য বীর্য ও দিব্য আনন্দের দীপ্তিতে ঝলমল কোনও মহাভূমিতে?...তা-ই যদি সত্য হয়, তাহলে মানবতার গণ্ডি পেরিয়েই মানবজাতির পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হবে। পৃথিবীতে মানবচেতনার চরম পরিণাম তাহলে অগ্র্যা ধীর প্রলীয়মান সূক্ষ্মতায়। সেখান হতে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে হয় অরূপের স্তব্ধ প্রশান্তিতে, অথবা কোনও রূপাবচর ভূমির বিদেহ আনন্দে।

কিন্তু বস্তুত যাকে অদিব্য বলি, সেও তো সেই দিব্য চতুষ্টয়ীর স্পন্দ-পরিণাম। রূপের জগৎ গড়ে তুলতে ঠিক এই স্পন্দেরই প্রয়োজন ছিল। রূপের বিসৃষ্টি হয়েছে পরমদেবতারই সত্তা চিৎশক্তি ও আনন্দের আয়তনে—তার বাইরে তো নয়। এ রূপের লীলা ব্রহ্মের সম্ভূতিবিজ্ঞানের বিলাস, এ তো তার বহিরঙ্গ নয়। সুতরাং রূপের জগতে উত্তরজ্যোতির সত্য বিভূতি সম্ভব নয়—এ-কল্পনা একেবারেই অমূলক। যে-মনশ্চেতনা প্রাণলীলা ও রূপধাতুর 'পরে রূপজগতের একান্ত নির্ভর, তারা যে স্বরূপের বিকৃত রূপায়ণ

শুধু, এও সত্য হতে পারে না। সম্ভবত সত্য এই যে, ব্রহ্মের তত্ত্বরূপের মধ্যেই আমরা পাব দেহ-প্রাণ-মনের শুদ্ধ-রূপের সন্ধান তাঁর চেতনার গৌণ-বৃত্তিরূপে, তাঁর পরা শক্তির নিত্য সাধনসামগ্রীর অপরিহার্য অঙ্গরূপে। তা-ই যদি হয়, দেহ-প্রাণ-মনের দিব্য ভাবসিদ্ধি তাহলে তো অসম্ভব নয়। পার্থিবপরিণামের একটি যুগের বন্ধনীতে তাদের আকৃতি-প্রকৃতির যে-ইতিহাস বিজ্ঞান আজ সামনে ধরেছে, তারই মধ্যে জীবদেহে তাদের সকল সম্ভাবনার ইতি হয়ে গেছে—একথাই-বা বলি কোন্ সাহসে? দেহ-প্রাণ-মন বস্তুত দিব্যভাবের বিভূতি। দিব্যসত্যের চেতনা হতে কোনও কারণে বিবিক্ত হয়েই তাদের এই অদিব্য বৃত্তি দেখা দিয়েছে। একবার যদি মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যবীর্যের বিস্ফোরণে এ-আড়াল ভেঙে যায়, তাহলে তাদের বর্তমান কুণ্ঠিত প্রবৃত্তিতেও অভাবনীয় এক রূপান্তর আসতে পারে। অথচ সে-রূপান্তর অস্বাভাবিক হবে না, কেননা ঋত-চিতের পরিবেশে আছে তাদের স্বভাবছন্দের যে-শুদ্ধলীলা, ঊর্ধ্বপরিণামের অমোঘ ধারা ধরে তারই প্রকাশ হবে তখন এই মর্ত্য আধারে।

তাহলে মানুষের দেহে-মনে দিব্যভাবের প্রকাশ ও ধারণা শুধু-যে সম্ভব তা-ই নয়। দিব্যভাবের আবেশে ও ক্রমিক উপচয়ে দেহ-প্রাণ-মনের আমূল রূপান্তরও সাধিত হতে পারে তার সর্বজয়া শক্তিতে, শাশ্বত সত্যের পরিপূর্ণ প্রতিরূপ হয়েও তারা ফুটতে পারে। তখন শুধু ভাবে নয়, বস্তুতেও—দ্যুলোকের সাম্রাজ্যকে এই পৃথিবীর বুকে সিদ্ধরূপ দেওয়া চিৎশক্তির পক্ষে অসম্ভব হবে না। মানুষের অন্তরে দিব্যভাবের প্রতিষ্ঠাই তো জয়ন্তী চিৎশক্তির প্রথম অরুণচ্ছটা। এই মর্ত্য ভূমিতেই সে-আলো নেমে এসেছে বহু সিদ্ধচিত্তে দিব্যভাবের ন্যূনাধিক বিচ্ছুরণে। মানুষের বহির্জীবনেও তার প্রতিষ্ঠার দিব্য জয়শ্রীর উত্তরজ্যোতি যদিও অতীত যুগে ভবিষ্য কল্পনার দিশারী হয়ে নেমে আসেনি, তবু পার্থিব প্রকৃতির অবচেতনায় আজও স্তব্ধ হয়ে আছে তার ধ্রুবা স্মৃতি। তার ইশারা সেই মহাভবিষ্যের দিকে—ব্রহ্ম যেদিন জয়লাভ করবেন শুধু 'দেবেভ্যঃ' নয়—'মনুষ্যেভ্যঃ'ও। কে বলেছে এই পার্থিব জীবন হর্ষ-শোকে সঙ্কুল ও ক্লিষ্ট প্রয়াসে নিত্য বিপর্যস্ত হয়েই থাকবে—এই তার নিয়তি? কে বলবে অনুত্তরা সিদ্ধি এর চরম পরিণাম নয়, দিব্যপুরুষের আনন্দ ও মহিমা এই পৃথিবীর বুকেই মূর্ত হবে না?

এই সমস্যার সমাধান তাহলে এখন প্রয়োজন : পরমার্থত দেহ প্রাণ ও মনের স্বরূপ কি? দিব্য বিভূতির সম্যক স্ফূর্তিতে যখন মর্ত্যজীবন ধন্য হবে, প্রাকৃত বিবিক্তবোধ ও অবিদ্যার সকল বন্ধন খসে গিয়ে পরমসত্যের জ্যোতিরাবেশে সব-কিছু প্রভাস্বর হয়ে উঠবে, তখন দেহ-প্রাণ-মনের পরম তত্ত্ব এই আধারে কি রূপ ধরে ফুটবে—কোন্ মহিমার নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্য

নিয়ে ? দিব্যধামের সিদ্ধ মহিমা এখনও তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। মর্ত্য আধার এখনও তার উত্তরসিদ্ধির অভিযাত্রী শুধু। জড় হতে মনের অভিব্যক্তির প্রথম ধাপে রয়েছি বলে আমাদের মন স্ব-ভাবের নির্মুক্ত প্রকাশ এখনও খুঁজে পায়নি। আজও তাকে জড়িয়ে আছে রূপের-মাঝে-সংবৃত্ত চিৎসত্তার কুণ্ঠা ও দৈন্য। দিব্যজ্যোতির যে-ছায়া হতে জড়প্রকৃতিতে অন্ধ অন্নময়-চেতনার আবির্ভাব, তার মধ্যে সে-জ্যোতির আত্মসংহরণের অবর মায়া এখনও মনকে পঙ্গু করে রেখেছে। পূর্ণতার যে-আদর্শের দিকে আমাদের নিত্য প্রসরণ, যে চরম অভ্যুদয় এ-জীবনের দিব্য নিয়তি, তার অখণ্ড রূপটি স্বমহিমায় ফুটে আছে লোকোত্তর সম্ভূত-বিজ্ঞানের মধ্যে। তার সিদ্ধচেতনার আকর্ষণেই তো আমরা ধীরে-ধীরে দল মেলছি তার দিকে—তারই মধ্যে থেকে। পরমপুরুষের দিব্যবিজ্ঞানে চরম অভ্যুদয়ের সিদ্ধসত্তাই তো মানুষের মনশ্চেতনায় জাগায় তথাকথিত আদর্শের এষণা। আমাদের কল্পিত আদর্শ বস্তুত শাশ্বত বাস্তবেরই আ-ভাস। প্রাকৃত ভূমিতে আজও তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারিনি—এইটুকু তার ন্যূনতা। নইলে সে-আদর্শ এমন-কোনও 'অসৎ' পদার্থ নয়—দিব্য-পুরুষের শাশ্বত চেতনায় নাই যার শাশ্বত সিদ্ধরূপ, শুধু আমাদের কুণ্ঠিত কল্পনায় ভেসে উঠেছে যার অস্পষ্ট ছবি, অতএব যার রূপসৃষ্টি একমাত্র আমাদেরই দায় !

মনের পরিচয়ই তাহলে প্রথমে নেওয়া যাক, কেননা কুণ্ঠার নিগড়ে বাঁধা হলেও আজও মনই মানুষের জীবনের অধিনায়ক। মন স্বরূপত চিৎশক্তি। তবু তার ধর্ম—অমেয়কে মিত ক'রে, অখণ্ডকে খণ্ডিত ক'রে আবার সেই পরিমিত খণ্ডের প্রত্যেকটিকে বিবিক্ত অখণ্ডরূপে ধারণ করা, ব্যবহার করা। স্পষ্টই যা সমগ্রের একটা ভগ্নাংশ মাত্র, মনের বিকল্পদৃষ্টি ব্যবহারের জগতে তাকেও দেখে একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে—অখণ্ডের একটা অংশ বা বিভাবরূপে নয়: এবং এই দর্শনকেই সে তার ব্যবহারের ভিত্তি করে। মনের মধ্যে এ-সংস্কার এতই পাকা যে, একটা খণ্ডবস্তুকে তত্ত্ব নয় জেনেও তত্ত্বরূপে ব্যবহার না করে সে পারে না, কারণ তা না হলে মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বস্তুকে কিছুতেই আপন বশে আনতে পারে না। ভাবনা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা কল্পনার সৃষ্টিলীলা প্রভৃতি মনের যে-কোনও ব্যাপারের 'পরেই আছে এই মানস-ধর্মের শাসন। মন বিষয়কে ভাবে, প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করে যেন একটা বৃহৎ স্তূপ হতে কঠিন মুষ্টিতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে। ওই মুঠা-মুঠা বস্তু তার হিসাবের একক বা ধ্রুবমান—তাদের নিয়েই তার সৃষ্টি বা ভোগ। এমনি করে সকল কর্মে সকল ভোগে অখণ্ডকে নিয়ে মনের কারবার হলেও আসলে তারা বৃহত্তর অখণ্ডের একদেশ মাত্র। আবার এই তথাকথিত অখণ্ডকে খণ্ডিত ক'রে সেই খণ্ডগুলিকে বিশেষ-কোনও

প্রয়োজনে সে অখণ্ডের মর্যাদা দেয়। বিষয়কে নিয়ে তাই মনের হরণ-পূরণ যোগ-বিয়োগের যে-খেলা চলে, সে খণ্ড-গণিতের বাইরে যাবার সাধ্যও তার নাই। স্বধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে অখণ্ডের ধারণা করতে গিয়ে সে যেন দিশাহারা হয়ে যায়। খণ্ডের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে অখণ্ডকে ধরতে যাওয়া সে তো তার কাছে অস্পর্শ অনন্তের অতল গহনে তলিয়ে যাওয়া। তার মধ্যে সে দেখবে কি, ভাববে কি, ধরবে কি, সৃষ্টি আর ভোগের লীলা সেখানে তার কাকে নিয়ে চলবে? অনন্তকে ধরা-ছোঁয়া বা ভোগ করবার কথা মনের বেলায় ওঠেও যদি, বুঝতে হবে সে একটা কথার কথা—অনন্তেরই ছায়াছবি নিয়ে একটা খেলা শুধু। অনন্তের সে অস্পষ্ট ধারণায় আছে বৃহতের একটা আকারপ্রকারহীন অনুভব মাত্র—কোথায় তার মধ্যে দেশাতীত অনন্তের বাস্তব প্রত্যয়? আনন্ত্য সবসময় তার কাছে অব্যবহার্য, অসম্ভোগ্য। ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে তাকে ভোগ করতে গেলেই আবার দেখা দেয় সেই খণ্ড-করণের অনিবার্য প্রবৃত্তি, আবার শুরু হয় মূর্তি নিয়ে রূপ নিয়ে কথা নিয়ে মনের কারবার। বস্তুত অনন্তকে ধারণা বা ভোগ করা মনের পক্ষে অসম্ভব। সে শুধু পারে অনন্তের ছোঁয়ায় এলিয়ে পড়তে, তার দ্বারা আবিষ্ট ও ভুক্ত হতে। দিব্যভূমির অগম গহন হতে ঝরে পড়ছে পরমসত্যের জ্যোতির্ময়ী ছায়ার মায়া। সেই রভসে অবশ হয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলা—মন এইটুকুই শুধু পারে। অতিমানসের ভূমিতে না উঠলে আনন্ত্যের সত্য সম্ভোগ সম্ভব হয় না। এমন-কি তার বিজ্ঞানও সম্ভব নয়—মন যদি অসাড় হয়ে নিজেকে না সঁপে দেয় ঋতচিন্ময় পরমসত্যের পরা বাণীর শক্তিপাতের কাছে।

এই স্বারসিক সঙ্কুচিত প্রবৃত্তিই মনের স্বরূপ, তার স্বভাব ও স্বধর্ম এতেই প্রতিষ্ঠিত। দিব্যপুরুষের এই তো প্রশাসন তার 'পরে—পরা মায়ার পূর্ণলীলায় এইটুকু তার স্বাধিকার। এই স্বাধিকার তার স্বরূপসত্য দিয়ে নিরূপিত হয়েছে এবং সে-সত্য স্বয়ম্ভূ-সত্তের শাশ্বত আত্মভাবনার একটি ছন্দ। সেই ছন্দ হতেই মনের আবির্ভাব। অনন্তকে সে সান্তের সংজ্ঞায় তর্জমা করবে, তাকে মিত সীমিত খণ্ডিত করবে—এই তার কাজ। সত্য বলতে অনন্তের সমস্ত তাত্ত্বিক প্রত্যয়কে বিলুপ্ত করে দিয়ে আমাদের চেতনায় এই কাজই সে করছে। তাই তো মন হল মূলা অবিদ্যার আদিবিন্দু, কেননা বিভাগ ও বিক্ষেপের প্রবর্তক সে-ই। তাইতে কেউ-কেউ ভুল করে ভেবেছেন—মনই বিশ্বের প্রসূতি, দেবমায়ার সবটুকু শুধু মনের লীলা। কিন্তু দেবমায়ার মধ্যে বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই আছে। আমরা ভাবি, সান্তভাব বুঝি অবিদ্যার খেলা। কিন্তু একটা কথা খুব স্পষ্ট—সান্ত অনন্তেরই প্রতিভাস, তারই বিসৃষ্টি, তারই ভাবের রূপায়ণ। অনন্তের সত্তা এবং আয়তনে তাকেই প্রতিষ্ঠা

জেনে সান্তের প্রকাশ—অনন্তের স্বরূপশক্তির লীলায়নে। অতএব ব্রাহ্মী চেতনার এমন-একটা অনাদি বিভাব নিশ্চয় আছে, যার মধ্যে সামরস্যে বিধৃত রয়েছে সান্ত আর অনন্ত, দুয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধের সকল তত্ত্ব সেখানে ভাসছে এক পরম জ্ঞানে। অবিদ্যার সত্তা সে-চেতনায় সম্ভব নয়, কেননা সেখানে অনন্তের অপরোক্ষ অনুভবে সান্ত অনন্ত হতে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে বিচ্ছিন্ন হয়নি। অথচ তার মধ্যে আছে সঙ্কোচ-সাধনার একটা গৌণ লীলা, নতুবা বিশ্বের বিসৃষ্টিই সম্ভব হত না। সেই সঙ্কোচের বৃত্তিই ফোটে মনশ্চেতনায়—ভেঙে জোড়া দেওয়া যার স্বভাব। ফোটে প্রাণের লীলায়—যার মধ্যে নিত্য চলছে পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ে কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা। ফোটে জড়বস্তুর আণবিকতায়—অনন্ত বিভাজন আর স্বয়ংসংকলনের যুগ্মলীলা যার মধ্যে। অথচ এ-সবার মূলে আছে এক অখণ্ড তত্ত্বভাবের অনাদি স্পন্দন। পরমার্থচেতনায় এই-যে শাশ্বত কবি-ক্রতু ও পরম মনীষার গৌণ লীলা—যার মধ্যে রয়েছে আত্মসংবিৎ ও সর্বসংবিতের পূর্ণজ্যোতি, কৃতি যেখানে প্রজ্ঞার বিলাস, সান্তের বিসৃষ্টিতে আনন্ত্যের চেতনা মুহূর্তের জন্যও যেখানে অবলুপ্ত নয়—তাকে বলা যেতে পারে দিব্যমানস। স্পষ্টই বোঝা যায়, দিব্যমানস অতিমানসের স্বয়ম্ভূলীলার অবিনাভূত একটা গৌণ বিভূতি। তাই অতিমানসের সংজ্ঞান বা সম্ভূতি-সংবিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই ঋত-চিতের প্রজ্ঞান বা বিভূতিসংবিতের লীলায়নে তার প্রবর্তনা দেখা দেয়।

বিশ্বকে আমরা এক অখণ্ড সর্বস্বরূপের আত্মকৃতির পরিণাম বলে জানি। সে-কৃতির যেমন তিনি কর্তা এবং রূপকার, তেমনি তার ভর্তা এবং সাক্ষিরূপে প্রবর্তক ও জ্ঞাতাও। নির্মাণপ্রজ্ঞার বিষয় ও বিলাসরূপে আত্মকৃতিকে তাঁর চেতনায় ফুটিয়ে তোলা—এই হল প্রজ্ঞানের কাজ। কবি যেমন আত্মচেতনার সৃষ্টিকে সামনে রাখে স্রষ্টা ও সৃষ্টিশক্তি হতে বিবিক্ত একটা সত্তারূপে, এও কতকটা তেমনি যেন। অথচ কবির কল্পনা সর্বত্র তার আত্মরূপায়ণের লীলা মাত্র এবং কল্পক থেকে কল্পনাকে পৃথক করাও কোনমতে সম্ভব নয়। এমনি করে প্রজ্ঞানের প্রবর্তনায় পুরুষ আর প্রকৃতির বিবেকে ভেদের প্রথম সূচনা হয় এবং ক্রমে তা-ই পল্লবিত হয় বিশ্বরূপে। পুরুষ দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, তাঁরই দৃষ্টিতে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিধান; প্রকৃতি তাঁর প্রজ্ঞা ও চক্ষুরূপা, তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা ও সর্ববিধায়িকা শক্তি। দুয়েরই এক ভাব, এক সত্তা। তাঁদের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে যে-রূপ ফোটে, তারা ওই অদ্বৈতভাবের বহুধা রূপায়ণ। প্রজ্ঞারূপী পুরুষ নিজেই প্রজ্ঞাতারূপী নিজের সামনে ধরছেন সেই রূপের মেলা—তিনি নিজেই শক্তি, নিজেই 'শক্ত'। একে বলতে পারি প্রজ্ঞানের মধ্যকল্প। শেষ কল্পে, পুরুষ আত্মসত্তার চিন্ময় প্রসারে ছড়িয়ে পড়েও তার প্রতি বিন্দুতে প্রদ্যোতিত হন, প্রতি রূপে হন বিলসিত। অথচ বিন্দুঘন চেতনার অক্ষি দিয়ে

প্রতি ব্যষ্টি-ভূমিকায় থেকে যেন বিবিক্তভাবে সমষ্টিকে দর্শন করেন। এমনি করে প্রতি জীবাত্মায় নিহিত তাঁর প্রজ্ঞা ও সংকল্পের বিশেষ ছন্দোময় দৃষ্টি দিয়ে অপর জীবাত্মার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ তিনি নিরূপিত করেন।

এমনি করে খণ্ডভাবের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত অখণ্ডের অনন্ত ব্যঞ্জনা অসীম দেশ ও কালের ভাবনায় প্রসারিত হল। দ্বিতীয়ত সেই চিন্ময় স্বতঃ-প্রসারে অখণ্ডের সর্বগত মহিমা অগণিত চিদ্বিন্দুরূপে হল রোমাঞ্চিত—আমরা যাদের জানি সাংখ্যের 'বহুপুরুষ' বলে। তৃতীয়ত পুরুষের সেই বহুত্ব অদ্বয়ভাবের অখণ্ড ব্যাপ্তিকে রূপান্তরিত করল বহুধাখণ্ডিত ভোগা-য়তনের কল্পনায়। খণ্ড-আয়তনের এ-কল্পনা বস্তুত অপরিহার্য। কারণ বহুপুরুষের প্রত্যেকে স্বতন্ত্র জগতের অধিষ্ঠাতা নন। তাঁদের প্রকৃতি বিভিন্ন নয় বলে বিভিন্ন ভোগ্য জগতের সৃষ্টি হচ্ছে না তাঁদের জন্য। তাঁরা সবাই একই প্রকৃতির ভোক্তা, কেননা তাঁরা আত্মশক্তির বহুধা বিসৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত একই অদ্বয়স্বরূপের চিদ্বিভূতি। অথচ এক প্রকৃতিই ভোগ্য বিশ্বের জননী বলে পুরুষে-পুরুষে অন্যোন্যসম্বন্ধও অপরিহার্য। প্রতি রূপে অভিনিবিষ্ট পুরুষের অবিবেক ঘটে সেই রূপের সঙ্গে এবং তাইতে একটি রূপের মধ্যে নিজেকে সীমিত করে তাঁরই অন্যান্য রূপকে তিনি বিবিক্তভাবে দেখেন অপরাপর আত্মভাবের আধাররূপে। অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে ভাবান্বিত থাকলেও ক্রিয়ান্বিত তাঁর নাই, কেননা তাঁর অনুভবে সম্বন্ধ অধিকার গতি ও দৃষ্টির বৈচিত্র্যে সবাই তাঁরা পরস্পর বিভিন্ন। অথচ বিশেষ কালে বা বিশেষ দেশে এক অখণ্ড সদ্বস্তুর শক্তি চেতনা ও আনন্দকে তাঁরা ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলছেন। অবশ্য বলা চলে, ব্রাহ্মী স্থিতিতে পরিপূর্ণ আত্মসংবিৎ নিত্যজাগ্রত—অতএব বহুপুরুষের কল্পনায় সেখানে সত্যকার সীমার বন্ধন সূচিত হয় না, কেননা রূপের অধ্যাস তো পুরুষকে প্রাকৃত জীবের মত অমোচন শৃঙ্খলে বন্দী করে না সে-ভূমিতে। প্রাকৃত ভূমিতে দেহাত্মবোধের জালে জড়িয়ে গিয়ে ব্যষ্টি অহন্তার সঙ্কোচকে আমরা কোন-মতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। চেতনায় কালের একটা বিশিষ্ট প্রবাহ বয়ে চলেছে দেশের একটা বিশিষ্ট ভূমিকায়—সে-বিশেষের বন্ধন আমাদের অনতিক্রমণীয়। কিন্তু ব্রাহ্মী স্থিতিতে তো সীমারেখার কুণ্ডলী এমন দুরপনেয় নয়।...নয় সত্য, কিন্তু তবু একটা কথা আছে। বন্ধন সেখানে অবিদ্যাকল্পিত না হলেও সে তো বন্ধনেরই পূর্বাভাস। মুহূর্তে-মুহূর্তে একটা অবিবেকের খেলা চলছেই সেখানে, যদিও তার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্যের নিরঙ্কুশতা। কেননা, দিব্যপুরুষের অব্যভিচারী আত্মসংবিৎ কিছুতেই সেখানে বিবিক্তভাব ও কালকলনার আড়ষ্ট শৃঙ্খলে আমাদের মত বাঁধা পড়ে না।

তাই খণ্ডলীলার সূচনা হয়েছে সেখানথেকেই। আত্মভাবেরই খেলা সেখানে, তবু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভেদের যেন একটা আভাস। রূপের সঙেগ রূপের, সঙ্কল্পের সঙেগ সঙ্কল্পের, বিজ্ঞানের সঙেগ বিজ্ঞানের যোগাযোগ ঘটছে বটে। তাহলেও তারা যেন এক-একটা পৃথক ভাব, পৃথক শক্তি, পৃথক চেতনা। এখনও তারা যেন পৃথক। কেননা, দিব্য-পুরুষের মধ্যে মোহ নাই—সব-কিছুকেই তিনি এক অপ্রচ্যুত সদ্‌ভাবের বিভূতি বলে জানেন, সেই সদ্‌ভাবের সত্যে বিধৃত তাঁর সত্তা। অখণ্ড ভাবের নিত্যজাগ্রত চেতনা হতেও তিনি স্খলিত নন। মনের লীলা তাঁর মধ্যে অনন্ত বিজ্ঞানের গৌণবৃত্তি--আনন্ত্যের অপরোক্ষ অনুভবের ভূমিকাতেই বস্তুর বিশিষ্ট বোধের আভাস তাতে। অখণ্ড সমগ্রতাই যে বস্তুর স্বরূপ, তা জেনেও তাঁর মন সীমার বেষ্টনী রচে। অথচ তাতে সমগ্রতার বোধ ক্ষুণ্ণ হয় না, কেননা সে-বোধে প্রাকৃতমনের মত খণ্ডের সঙ্কলন ও সমাহারে গড়ে-তোলা বহু-সমন্বিত সমগ্রতার ভান নাই। অতএব সীমার বন্ধন দিব্য-পুরুষের চেতনায় বাস্তব নয়। পুরুষের মধ্যে আত্মবিশেষণের যে-সামর্থ্য আছে, আত্মস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকেই তিনি প্রয়োগ করেন সুবিবিক্ত রূপে ও শক্তির বিসৃষ্টিতে।

দিব্য-পুরুষের মন সঙ্কোচের কর্তা, অতএব স্ব-তন্ত্র। কিন্তু প্রাকৃত মন সঙ্কোচের কর্ম, অতএব পরতন্ত্র। দিব্য মন গুণাধীশ, গুণলীলাতেও তার স্বরূপদৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। কিন্তু প্রাকৃত মন গুণাধীন, নিজের গুণের জালে জড়িয়ে গিয়ে নিজেই সে নিজেকে প্রবঞ্চিত করে। অতএব দিব্য মন হতে প্রাকৃত মনের পরিণাম ঘটাতে হলে চাই একটা নূতন উপাদান, চিৎশক্তির একটা নতুনধরনের খেলা। এই নূতন উপাদানটি হল অবিদ্যা বা চেতনার আত্মাবরণী বৃত্তি, যা মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে অতিমানসের ক্রিয়া হতে—যদিও অতিমানসই মনের উৎস এবং এখনও আড়ালে থেকে তার নিয়ন্তা। অতিমানস হতে বিযুক্ত হয়ে মন তাই দেখে শুধু বিশেষকে, সামান্যকে নয়। বড়জোর সামান্যের একটা বিকল্প-প্রত্যয়ের 'পরে বিশেষকে সে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু সামান্য আর বিশেষ উভয়কেই আনন্ত্যের বিভূতিরূপে কখনও ধারণা করতে পারে না। এমনি করে দেখা দেয় সঙ্কুচিত প্রাকৃতমন, যার কাছে প্রতিভাসমাত্রেই সমষ্টির বিবিক্ত অংশরূপে একটা তত্ত্ববস্তু। কিন্তু সমষ্টির বোধও মনের মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্ত্যের বোধ জাগায় না, কেননা একটা সমষ্টিকে দেখে সে বৃহত্তর আরেকটা সমষ্টির বিবিক্ত অংশরূপে। এমনি করে ব্যষ্টির সমাহারে সমষ্টির কল্পনাকে ইচ্ছামত বাড়িয়ে চলেও অখণ্ডের অপরোক্ষ অনুভবে সে কোনকালেই পৌঁছতে পারে না।

মনও বস্তুত অনন্তের বিভূতি। তাই টুকরা করা আর জোড়া দেওয়ার

কাজও তার অন্তহীন। অখণ্ড সত্তাকে বহুধা-কল্পিত সমষ্টিতে খণ্ডিত করে তাদের আবার সে ভাঙে ক্ষুদ্রতর সমষ্টিতে। এমনি করে ভেঙে-ভেঙে পরমাণুতে পৌঁছে তাকেও ভেঙে করে সে অতিপরমাণু—কিন্তু তবুও ভাঙার ঝোঁক তার থামে না। পারলে অতিপরমাণুকেও গুঁড়িয়ে সে মিলিয়ে দিত শূন্যতায়! কিন্তু মন তা পারে না। কেননা, তার এই ভাঙনের লীলার অন্তরালে আছে অতিমানস বিজ্ঞানের আবেশ। অতিমানস জানে, প্রত্যেকটি সমষ্টি, এমন-কি প্রতিটি পরমাণু অখণ্ড সৎ-চিৎ-শক্তির একটা ঘনবিগ্রহ, তার আত্মপ্রতিভাসের একটা প্রতীক। সমষ্টিকে ভেঙে-ভেঙে অন্তহীন শূন্যতায় পর্যবসিত করে মনের যে-প্রলয়সাধনা, অতিমানস তাকে জানে বিন্দুঘন চিৎসত্তারই আত্মপ্রতিভাস হতে আত্মস্বরূপের আনন্ত্যের মধ্যে আবার ফিরে আসা বলে। বাস্তবিক, মন যে-পথ ধরেই চলুক, 'অণোরণীয়ান্' বা 'মহতো মহীয়ান্' যার দিকেই হ'ক তার অভিসার, শেষ পর্যন্ত সে নিজের মধ্যেই ফিরে আসে—নিজেরই অন্তহীন অখণ্ডতায়, নিজেরই শাশ্বত স্বরূপসত্তায়। এই তো অতিমানসের সিদ্ধ বিজ্ঞান। মনের বৃত্তি যখন সচেতনভাবে এই বিজ্ঞানের আবেশের মধ্যে নিজেকে সঁপে দেয়, তখন অমনীভাবের ওই রহস্যের ঢাকাও তার কাছে খুলে যায়। তখন সে জানে, অখণ্ডের মধ্যে বাস্তবিক খণ্ডভাব কোথাও নাই—আছে শুধু এক অবিভক্ত সত্তার মধ্যে অনন্তবিচিত্র বিন্দুঘন রূপায়ণের মেলা এবং সম্বন্ধের বিচিত্র ছন্দে তাদের অন্যোন্যবিলাস। খণ্ডভাব তার মধ্যে গৌণ একটা প্রতিভাস মাত্র—দেশ ও কালের ভূমিকায় অখণ্ডকে লীলায়িত করবার একটা অপরিহার্য কৌশল। কেননা, ভাঙতে-ভাঙতে যদি অণোরণীয়ান্ অতিপরমাণুতেও গিয়ে পৌঁছও, অথবা জুড়তে-জুড়তে পৌঁছও মহতো মহীয়ান্ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অকল্পনীয় বৈপুল্যে, তবু বলতে পারবে না কোথাও গিয়ে বস্তুর তত্ত্বরূপটিকে তুমি ধরতে পেরেছ। মনের তত্ত্বৈষণাকে পরাভূত করে সবার পিছন থেকে উঁকি দেবে অনির্বচনীয় এক মহাশক্তি—অণু হতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যার তরঙ্গলীলা শুধু। একমাত্র সে-ই বাস্তব। আর-সমস্তই তার স্বয়ম্ভূ জগন্মূর্তি, তার আত্মরূপায়ণের উল্লাস, তার অন্তহীন শাশ্বত চিদ্বিলাস।

কোথা হতে তবে এল এই সঙ্কোচন অবিদ্যা, অতিমানস হতে মনের এই অবস্খলন এবং তার ফলে বাস্তব খণ্ডলীলার এই আতুর কল্পনা ? অতি-মানসের এ কোন্ তির্যক বিলাস ?...এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর সম্ভব। জীবভূত ব্যষ্টিচেতনা যখন অন্যভূমির কথা ভুলে সব-কিছুকে শুধু নিজের ভূমি থেকে দেখে, অর্থাৎ বিন্দুঘন চেতনা যখন অন্যব্যাবৃত্ত হয়ে বিশিষ্ট দেশ ও কালদ্বারা সীমিত নিজের একটি বিভাবকেই তার সমগ্র আত্মভাব মনে করে—তখনই তার মধ্যে দেখা দেয় অবিদ্যার খেলা। জীব তখন ভুলে যায়, অপর

জীবও তার আত্মস্বরূপ, অপরের কর্মও তারই কর্ম। কালের একটি বিশেষ ধারায়, দেশের বিশেষ ভূমিকায় রূপের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সে জানে নিজস্ব বলে। এও যেমন সত্য, তেমনি অন্যান্য আধারে ও ভূমিতে স্ফুরিত সত্তা ও চেতনার সকল বিভাবই তার নিজস্ব—একথাও তো সত্য। কিন্তু তবুও সে একটি ক্ষণকে, একটি ক্ষেত্রকে, একটি রূপকে, বিশ্বগতির একটি ছন্দকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে আর-সবাইকে হারিয়ে ফেলে। অথচ অন্তরের অন্তগূর্ঢ় প্রেরণায় হারানো অখন্ডকে আবার সে ফিরে পেতে চায় ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুকে জুড়ে দীর্ঘায়ত দেশ-কালের কল্পনায় এবং তাদেরই ভূমিকায় একে-একে সাজিয়ে তোলে রূপের মেলা, দুলিয়ে দেয় গতির দোলা। এমনি করেই কিন্তু তার কাছে অখন্ড কালের সত্য, অবিভাজ্য শক্তি ও বস্তুর তত্ত্ব ঢাকা পড়ে যায়। এমন-কি, সব মন যে এক পরম মনের বিভিন্ন স্থিতি মাত্র, সব প্রাণ যে এক প্রাণগঙ্গোত্রীর সহস্র-ধারা, সব দেহ ও আধার যে আপাতস্থাণুত্বের বিচিত্র পিন্ডভাবের লীলায় এক অখন্ড শক্তি ও চেতনার ধাতুতে গড়া—এই সহজ সত্যটাকেও সে ভুলে যায়। কিন্তু সত্য বলতে কোথায় স্থাণুত্ব? সকল পিন্ডের মধ্যেই তো চলছে এক অবিরত স্পন্দনের ঘূর্ণ্যাবর্ত—যা রূপান্তরের আড়াল দিয়ে একটি রূপেরই আবৃত্তি করে চলেছে। কিন্তু মন চায় নিরূপিত আকারের আড়ষ্ট রেখায় বন্দী করে আপাতত নিশ্চল-নির্বিকার বহিরঙ্গ নিমিত্তের জালে সবাইকে জড়িয়ে রাখতে, নইলে যে তার কাজ চলে না। সে ভাবে, তার চাওয়া বুঝি এমনি করেই পাওয়াতে সত্য হল। কিন্তু বাস্তবিক জগৎ জুড়ে চলছে কেবল অবিরাম ভাঙা-গড়ার লীলা—তার মধ্যে কোনও রূপই তো তাত্ত্বিক নয়, বাইরের কোন নিমিত্তই তো নির্বিকার নয়। একমাত্র শাশ্বত সম্ভূত-বিজ্ঞান আছে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে। এই নিত্য-চঞ্চল ঘূর্ণির মধ্যে রূপের রেখা আর সম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে সে-ই বেঁধে রেখেছে অবিচল ঋতের ছন্দে। প্রাকৃতমন সেই ছন্দোনিষ্ঠার ব্যর্থ অনুকরণ করতে চায় নিত্যচঞ্চলের মধ্যে অচঞ্চলের আরোপ করে। বিশ্বের ওই তত্ত্বরূপই মনকে আবার খুঁজে পেতে হবে। তার খবর যে সে রাখে না, এমন নয়। কিন্তু সে-জ্ঞান লুকানো আছে চেতনার গভীর গুহায়, তার আত্মভাবের মণিকোঠায়। ব্যবহারের জগতে তার আলো-কে মনের নিজেরই অবিদ্যা আড়াল করে রেখেছে। কেননা, মনের বিভাজক বৃত্তি এখানে বিভক্ত স্থিতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই অতিমানসের ভূমি হতে স্খলিত হয়ে আপন সৃষ্টির জালে আপনিই সে জড়িয়ে গেছে।

দেহাত্মবোধের সঙ্গে-সঙ্গে অবিদ্যার ঘোর আরও ঘনিয়ে ওঠে। আমরা ভাবি, দেহই বুঝি মনের নিয়ন্তা—কেননা সবসময় দেহের সঙ্গেই তার মাখা-মাখি। স্থূল জগতে মনের বহিশ্চর চেতনার লীলা দেহের ক্রিয়াকে বাহন

করে চলছে, অতএব তাকে ছাড়িয়ে যাবার কল্পনাও সে করতে পারে না। নিজেকে দেহের আধারে উন্মিষিত করতে গিয়ে মস্তিষ্ক ও নাড়ীতন্ত্রের যে-জড়যন্ত্রটি গড়ে তুলেছে, তাকে নিয়ে সে এমনই মত্ত যে নিজের অসংকীর্ণ শুদ্ধবৃত্তির দিকে ফিরে তাকানোর অবসরটুকুও তার নাই। শুদ্ধমনের খেলা প্রাকৃতমনে তাই তলিয়ে গেছে অবচেতনার গহনে। কিন্তু দেহাত্মবোধ প্রকৃতি-পরিণামের পর্ববিশেষে জীবের অলঙ্ঘ্য নিয়তি হলেও, তাকে ছাড়িয়ে এক শুদ্ধ প্রাণময় মন বা প্রাণময় সত্তার কল্পনা অসম্ভব নয়। সে বিদেহ মন প্রত্যক্ষ অনুভব করবে, অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় দেহের পরে দেহ ধারণ করে সে চলেছে, প্রতি দেহে বিচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত হয়ে দেহের নাশেই মিলিয়ে যাওয়া তার নিয়তি নয়। বস্তুত দেহের জন্মের সংগে যে-মনকে জন্মাতে দেখি, সে তো জড়ের 'পরে মনের একটা স্থূল ছাপ শুধু। তাকে বলতে পারি দৈহ্য মানস, পুরাপুরি মনোময়-পুরুষও সে নয়। এই দৈহ্য মানস আসল মনের বহির্ভাগ মাত্র—যাকে আমাদের মনঃসত্ত্ব জড়জগতের অভিঘাতের দিকে মেলে ধরেছে। এই মর্ত্য আধারেই আছে আরেকটি মন আমাদের অবচেতনা বা অধিচেতনার আড়ালে, নিজেকে সে বিদেহ বলে জানে। প্রাকৃতমনের মত তার চলন এত স্থূল নয়। বহিশ্চর মনে যখনই দেখা দেয় কোনও বৃহৎ গভীর ও প্রবল বৃত্তির উল্লাস, তখন সাধারণত তার উৎস থাকে ওই মনেই। ওই গুহাশায়ী মনের অনুভব অথবা প্রভাব চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন, তখনই আমরা পাই অন্তর্যামী 'পুরুষের' প্রথম অনুভূতি।*

এই প্রাণময় মানস দেহের প্রমাদ হতে মুক্তি দিলেও মনের প্রমাদ হতে কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় না। এখনও তাকে ছেয়ে আছে অবিদ্যার সেই মৌলিক বৃত্তি, যার ফলে জীবব্যক্তি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিয়েই জগৎকে দেখে। তার কাছে বিষয়মাত্রেই বহির্বস্তু। দেশ-কালের যে বিবিক্ত চেতনাকে সে নিজস্ব বলে জানে, তার ভূমিকায় তারা ফুটে ওঠে অতীত ও বর্তমান অনুভবের বিশিষ্ট আকার এবং সংস্কারের রূপরেখায়। বিষয়ের এই পরিচয়কে সে সত্য বলে জানে। প্রাণময়-পুরুষ ভূতে-ভূতে তার আত্মস্বরূপের অপর বিভূতিকে চেনে শুধু তাদের বহির্ব্যক্ত ইশারাতেই। চিন্তায় কথায় কর্মে বা অনুভাবে নিজের যে-পরিচয়টুকু তারা বাইরে ফুটিয়ে তোলে, অথবা অন্নময়-কোশের অগোচর প্রাণের সূক্ষ্ম সংস্পর্শ থেকে বিকীর্ণ হয় যোগাযোগের যে-আভাসটুকু—অপরকে জানতে তার বাইরে প্রাণময়-পুরুষের আর-কোনও সাধন নাই। তেমনি নিজেকেও সে পুরাপুরি জানে না। কারণ, কালস্রোতে প্রবহমান জীবনপরম্পরায় একই শক্তি বিচিত্র বিগ্রহে মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার—একেই সে তার স্বরূপ বলে জানে। প্রাকৃত করণ-মন দেহ-বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত

* আমরা তাঁকে অনুভব করি 'প্রাণময় পুরুষ'-রূপে।

যেমন, তেমনি এই অবচেতন জঙ্গম-মনও বিভ্রান্ত হয়েছে প্রাণ-বুদ্ধিতে। প্রাণের মধ্যে সে আবিষ্ট ও সমাহিত—প্রাণদ্বারাই সে সীমিত, তারই সঙ্গে একাত্মক। অতএব এই মহলেও আমরা মন ও অতিমানসের সেই সন্ধিভূমিটি খুঁজে পাই না, যেখান থেকে দুয়ের মাঝে বিচ্ছেদের প্রথম আভাস দেখা দিয়েছে।

কিন্তু এই প্রাণচঞ্চল জঙ্গম-মনেরও পরে আছে প্রাণের আবেশ ও দুরাগ্রহ হতে মুক্ত আরেকটা স্বচ্ছতর ভাবময় মানস। সে জানে, দেহ আর প্রাণকে সে স্বীকার করেছে—তার ভাব ও সঙ্কল্পকে বীর্যের সমুল্লাসে মূর্ত করবে বলেই। এই মনই আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ 'মন্তা'। সে জানে কি তার তত্ত্বরূপ, তাই জগৎকে সে দেখে দেহ আর প্রাণের সত্য বলে নয়—মনের সত্য বলে। এই 'মনোময়-পুরুষকেই' অন্তরাবৃত্ত হয়ে দেখি যখন, তখন কখনও-কখনও ভুল করে তাকে নিরঞ্জন পুরুষ বলে ভাবি—যেমন জঙ্গম-মনকে ঘুলিয়ে ফেলি শুদ্ধ-জীবের সঙ্গে। ঊর্ধ্বভূমির এই মন অপর জীবকে জানে এবং বোঝে তার বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের বিভূতিরূপে। তাদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয় নিছক ভাবের অভিঘাত ও সংক্রমণে—শুধু প্রাণ ও নাড়ীতন্ত্রের সংবেদনে অথবা দেহের স্থূল ইশারাতে নয়। অখণ্ডভাবের একটা মনোময় রূপও তার ভাণ্ডারে আছে। তাছাড়া তার প্রবৃত্তি ও সঙ্কল্পের মধ্যে সৃষ্টি ও আবেশের একটা অপরোক্ষ সামর্থ্য আছে—প্রাকৃত স্থূল ব্যবহারে যার পরিচয় গৌণ এবং কুণ্ঠিত। সে-সিসৃক্ষার সংবেগ শুধু নিজের সত্তাতে নয়—অপরের প্রাণে-মনেও ছড়িয়ে পড়ে। তবু মনের সেই অনাদি প্রমাদ হতে এই শুদ্ধমানসও পুরাপুরি মুক্ত নয়, কারণ তার বিবিক্ত মানসসত্তাকেই বিশ্বের কেন্দ্র সাক্ষী ও ধাতা করে সে পৌঁছতে চায় তার স্বরূপসত্যের উত্তরভূমিতে। তার জগতে সে নিজে ছাড়া আর-সবাই তাকে ঘিরে ব্যূহ রচনা করে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্যের আহ্বান আসে যখন, তখন প্রাণ ও মনের বিকল্প হতে নিজেকে তার গুটিয়ে নিতে হয় অখণ্ডের তত্ত্বরূপে তলিয়ে যাবার জন্য। এতেই বোঝা যায়, এখনও মন আর অতিমানসের মাঝে অবিদ্যার যবনিকা সরে যায়নি। তাই তার ভিতর দিয়ে এপারে পৌঁছয় সত্যের একটা কল্প-রূপ—তার আত্মরূপ নয়।

অবিদ্যার এই আবরণ বিদীর্ণ হয়ে উত্তরজ্যোতির আলোকসম্পাতে যখন খণ্ডিত মন অভিভূত হয়ে পড়ে, অতিমানসের শক্তিপ্রবাহের কাছে নিঃশব্দ স্তব্ধতায় এলিয়ে পড়ে তার চেতনা, তখনই সে পায় সত্যদর্শনের অধিকার। তখন দেখি, এই মনেরই মধ্যে জেগেছে বিচারের জ্যোতির্ময় বৈশারদ্য—সম্ভূত-বিজ্ঞানের দিব্য আবেশের বাহন ও সাধনরূপে। তখনই বুঝতে পারি, জগতের স্বরূপ কি। সর্বতোভাবে তখন নিজেকে জানি পরের মধ্যে পরের

রূপে, পরকে জানি নিজের রূপে এবং সবাইকে জানি বিশ্বরূপে অখণ্ডেরই আত্মবিচ্ছুরণ বলে। ব্যক্তি-সত্তার যে-বিবিক্ততা ছিল সর্ববিধ সংকোচ এবং প্রমাদের মূল, তার কঠিন আড়ষ্টতা কোথায় মিলিয়ে যায়। অথচ দেখি, অবিদ্যাচ্ছন্ন মন যা-কিছু সত্য বলে জেনেছিল, তত্ত্বত তা সত্য হলেও তার মধ্যে সত্যের একটা বিকৃত প্রমাদদুষ্ট বিকল্পনাই ফুটেছিল। দেখি, এখনও খণ্ডভাব আছে, আছে ব্যষ্টিভাবনা—তেমনি চলছে আর্ণবিক বিসৃষ্টির লীলা। কিন্তু তাদের তত্ত্বরূপ আর আমাদের কাছে অনাবৃত নয়। আমরা কি তা যেমন জানি, তেমনি জানি তারাও কি। তখন বুঝি, মন ঋত-চিতের একটা গৌণ বৃত্তি, তার সিসৃক্ষার একটা সাধন—এই তার সত্য পরিচয়। দিব্য ঈশনার জ্যোতির্ময় পরিবেশের মধ্যে মনের স্বানুভব অপ্রমত্ত থাকে যতক্ষণ, যতক্ষণ তার মধ্যে বিবিক্ত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা জাগে না, শুধু নিমিত্তরূপে সেই ঈশনার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েই সে তৃপ্ত থাকে স্বার্থপর আত্মসম্পূর্তির প্রয়াস ছেড়ে—ততক্ষণ মনের স্বনুষ্ঠিত স্বধর্ম হয় জ্যোতির্মহিমায় ভাস্বর। সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সে তখন রূপ হতে রূপকে শুধু প্রাতিভাসিক ভেদের রেখায় পৃথক করে। স্বচ্ছন্দ নির্মুক্ত প্রবৃত্তির চারদিকে সে টেনে দেয় শুধু অতাত্ত্বিক সীমার বেষ্টনী, অথচ তার অন্তরালে স্বয়ম্ভূর বিশ্বব্যাপ্ত ঈশনা নিরঙ্কুশ ও নিত্যচেতন থেকে যায়। এক সর্বগত বিশ্বতশ্চক্ষু ও সত্যসংকল্পের বার্তাবহ হয়ে তার অমোঘ সত্যদর্শনের প্রশাসনকে সে ছড়িয়ে দেয় বিশ্বময়। এক ঋতময় চেতনা আনন্দ শক্তি ও ধাতুর ব্যষ্টিভাবনাকে সে ধরে আছে অন্তর্গূঢ় অথচ অব্যভিচরিত সমষ্টিভাবনার মধ্যে। অখণ্ডের ঋতম্ভরা বহুভাবনাকে সে রূপায়িত করে আপাত-খণ্ডলীলায়–যাতে ভূতে-ভূতে বিচিত্র সম্বন্ধ বিশেষের রূপরেখায় বিবিক্ত হয়েও আবার মিলিত হয় পরিপূর্ণ এক সৌষম্যের ঐকতানে। এক শাশ্বত একত্ব ও অন্যোন্যসংমিশ্রণের মধ্যে সে জাগিয়ে তোলে সংযোগ-বিয়োগের আনন্দবিলাস। এই মনের সহায়ে অখণ্ডস্বরূপ নিজেকে ব্যষ্টির আপাত-খণ্ডতায় লীলায়িত করেন এবং আপন অখণ্ডভাবকে অব্যাহত রেখে ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির বিচিত্র সম্বন্ধজালে নিজেকে পরিকীর্ণ করেন। অখণ্ডের এই খণ্ডলীলাই বিশ্বের তত্ত্ব। মন হল ঋত-চিন্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলীলা, এই বিশ্ববৈচিত্র্য তারই অনুভবে সম্ভব হয়েছে। আমরা যাকে অবিদ্যা বলি, সে তো নতুন কিছু গড়ে না, বা আত্যন্তিক মিথ্যাত্বেরও সৃষ্টি করে না—শুধু সত্যকেই সে দেখায় বিকৃত আকারে। বিজ্ঞানের উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের জ্ঞানবৃত্তিই ধরে অজ্ঞান বা অবিদ্যার রূপ—বিশ্বরূপে প্রকটিত পরমসত্যের লীলাসুষমাকে মূঢ় চেতনায় প্রতি-বিম্বিত করে যেন আপাতবিরোধ ও সংঘর্ষে সংকুল আড়ষ্ট-কঠিন একটা দুঃস্বপ্নের আকারে।

মনের প্রমাদের মূল তাহলে এই। আত্মসংবিৎ হতে অবস্খলিত হয়ে জীব তার ব্যষ্টিভাবকে ধারণা করে একটা স্বতন্ত্র সত্য বলে—অখণ্ডের বিভূতি বলে নয়। তাইতে সে ভাবে, তার বিশ্বের সে-ই বুঝি কেন্দ্র। ভুলে যায়, বিশ্বরূপেরই চিদ্‌ঘন স্ফুলিঙ্গ সে। এই আদি প্রমাদের স্বাভাবিক পরিণাম-রূপে তার মধ্যে দেখা দেয় অবিদ্যার বিশিষ্ট যত উপাধি। বিশ্বের বিপুল প্রবাহ তার খণ্ডচেতনাকে প্লাবিত করেও তার অহন্তার সংকীর্ণ খাতে বয়ে চলেছে যে-ধারায়, সে শুধু তাকেই চেনে। কাজেই তার মধ্যে প্রথমে দেখা দেয় আত্মভাবের সঙ্কোচ। সেই সঙ্কোচ আনে চেতনার এবং তজ্জনিত জ্ঞানের সঙ্কোচ—চিৎশক্তি ও সংকল্পের সঙ্কোচ। তাতেই তার বীর্য কুণ্ঠিত হয়, আত্মসম্ভোগের দীনতায় আনন্দ হয় স্তিমিত। ব্যষ্টিভাবনার সীমাঙ্কিত হয়ে তার চেতনায় বিশ্ব শুধু একটি রূপ নিয়ে ধরা দেয়। তাই তার বাইরে আর-কোনও রূপের খবর সে রাখেনা। এই অবচ্ছিন্ন ভাবনার জন্যে, যাকে সে জানে মনে করে, তাকেও ভুল করে জানে। কেননা, বিশ্বের সকল ভাবই যখন অন্যোন্যাশ্রিত, তখন অংশকেও ঠিকমত জানতে হলে অংশীর স্বরূপসত্যকে না জানলে তো চলে না। এইজন্যই পৌরুষেয় সকল জ্ঞানে প্রমাদের একটা ছোঁয়াচ থেকে যায়।...তেমনি আমাদের প্রাকৃত সংকল্প দিব্যক্রতুর অবন্ধ্য পূর্ণরূপটি চেনে না। সুতরাং তার সকল সাধনায় অল্পবিস্তর অসামর্থ্য ও বীর্যহীনতার ন্যূনতা দেখা দেয়। জ্ঞান ও সংকল্পের এই অনীশ্বর দীনতায় আত্মার স্বরূপানন্দ ও বিষয়ানন্দের পরিপূর্ণ উল্লাস ক্ষুণ্ণ হয়। তাই স্বতঃ-স্ফূর্ত আনন্দভাবনা দিয়ে কোনও-কিছুকেই আত্মসাৎ করতে পারি না বলে সন্তাপ হয় আমাদের নিত্যসহচর। অতএব নিজেকে-না-জানাই হল জীবনের সকল বৈকল্যের মূল। এই আত্ম-অবিদ্যাই যখন আত্মসঙ্কোচের ফলে অহমিকার রূপ ধরে, তখন প্রাকৃত চেতনায় সে-বৈকল্য আরও দৃঢ়মূল হয়।

অথচ অবিদ্যা এবং তজ্জনিত বৈকল্য সত্য ও ঋতের বিকৃতি মাত্র—আত্যন্তিক মিথ্যাত্বের বিলাস নয়। মন নিজেকে এবং নিজের কল্পিত খণ্ডভাবকে যখন সচ্চিদানন্দের সত্যলীলার বিভূতি ও সাধনরূপে না দেখে বিশ্বকে নিতান্তই খণ্ডতার একটা মেলা বলে জানে, তখনই অবিদ্যার এই বিভ্রম দেখা দেয়। স্বাধিকারভ্রষ্ট মন তার স্বরূপসত্যে ফিরে গিয়ে আবার ফুটে ওঠে ঋত-চিন্ময় প্রজ্ঞানের অন্তালীলায়। প্রজ্ঞানের দিব্যজ্যোতি ও সত্যবীর্যে যে সম্বন্ধের প্রপঞ্চ সে গড়ে তোলে, তা হয় সত্যেরই বিসৃষ্টি—বৈকল্যের বিভ্রম নয়। বৈদিক ঋষির প্রাঞ্জল বিবেকবাণীতে—সে-জগৎ চলে 'ঋজুনীত্যা', মর্ত্যের কুটিল 'ধূর্তি'কে আশ্রয় করে নয়। সে-জগতে আছে শুধু দিব্যভাবের সত্যলীলা—স্বয়ংজ্যোতির দিব্য পরিবেষে আত্মনিষ্ঠ চেতনা ক্রতু ও আনন্দের ছন্দোদোলা। কিন্তু প্রাকৃত জগতে আছে প্রাণ-মনের তির্যক সর্পিল গতি।

আত্মহারা জীব তার তত্ত্বভাবে ফিরে যেতে চায়। প্রমাদী চিত্তের কল্পিত সত্যে-মিথ্যায় ধর্মে-অধর্মে কুণ্ঠিত-বিকৃত হয়েছে যে-পরমসত্য, তার নির্মুক্ত দীপ্তিতে সে প্রমাদ-আঁধারের মরণ ঘটাতে চায়। কার্পণ্যোপহত প্রাণের বীর্যে ও দৌর্বল্যে শক্তিসাধনার যে অচরিতার্থ আয়োজন, তাকে সে রূপান্তরিত করতে চায় দিব্যসামর্থ্যের অমোঘ ঈশনায়। অতৃপ্ত হৃদয়ের হর্ষে ও বিষাদে যে ব্যর্থ আনন্দসাধনার আর্ত উত্তালতা ফুটে ওঠে, তাকে সে ফোটাতে চায় দিব্যরতির অফুরন্ত উল্লাসে। জগৎ জুড়ে জীবন-মরণের অন্ধ আবর্তনে রয়েছে যে অমৃতভাবনার ইঙ্গিত, তাকে মূর্ত করতে চায় সে মৃত্যুঞ্জয়ের শাশ্বত মহিমায়। উত্তরায়ণের পথে জীবের এই-যে শ্রান্তিহীন মন্থর অভিযান, পথের বাঁকে-বাঁকে অপ্রবুদ্ধ চেতনায় সেই না রচে অনৃতের অশাশ্বত কুটিল মায়া!

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রাণ

প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৩

প্রাণই সর্বভূতের আয়ু; তাই তাকে বলা হয় সর্বায়ু অর্থাৎ বিশ্বের জীবন।
—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৩)

মনের দিব্য স্বরূপ কি, ঋত-চিতের সঙ্গে কিই-বা তার সম্বন্ধ, এতক্ষণে তার একটা পরিচয় পেলাম। বুঝলাম, আমাদের মানুষভাবের উপাদান যে অপরা ত্রয়ী, তার প্রথমে রয়েছে মন। দিব্যচেতনার সে একটা বিশেষ কলা। অথবা তার বিসৃষ্টিলীলার সে-ই হল অন্ত্যাবিভূতি। মনকে দিয়েই পুরুষ রূপভেদ ও শক্তিভেদের প্রপঞ্চকে অন্যোন্যাবিবিক্ত করেন। তাতে যে ভেদাভাসের বিসৃষ্টি হয়, ঋত-চিন্ময় ভূমি হতে স্খলিত জীব তাকেই তাত্ত্বিক খণ্ডভাব বলে জানে। দৃষ্টির এই আদি বৈকল্য হতে দেখা দেয় প্রাকৃত ভূমির যত বিকল ভাবনা, যার জন্যে অবিদ্যাকবলিত জীব দ্বন্দ্ববিরোধের সংঘাতকেই স্বভাবের সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু মন যতক্ষণ অতিমানসের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে আর অনৃত ও বিপর্যয়ের প্রযোজক নয়—বিশ্বসত্যের চিত্রবিভূতির সে সূত্রধার।

এই দৃষ্টিতে দেখলে মনকেও বিশ্ববিসৃষ্টির সাধক বলে মানতে পারি। কিন্তু সচরাচর মন সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ না করে আমরা তাকে বিষয়-গ্রহণের সাধনরূপে জানি। জড়ের মধ্যে শক্তির লীলায় যা সৃষ্ট হয়েই আছে, মন তাকে শুধু অবশভাবে গ্রহণ করতে পারে। বড়জোর সৃষ্ট রূপের সংযোগ-বিয়োগের ফলে নূতন রূপসমাহার আবিষ্কার করা, সৃষ্টির এই অধিকারটুকুই তার আছে—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের কল্যাণে একটা ভাব আমরা আবার ফিরে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি, জড় অথবা শক্তির মধ্যেও এক অবচেতন মনঃশক্তির খেলা রয়েছে, যার নিশ্চিত রূপ ফুটে উঠছে প্রথমত প্রাণের বৈচিত্র্যে এবং পরে মনের বৈচিত্র্যে। উদ্ভিদ এবং প্রত্নযুগের পশুর জীবনে নাড়ীতন্ত্রের চেতনায় উন্মিষিত হয়েছে তার আদিরূপ। আর পশুজীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ও মানুষের মধ্যে মনশ্চেতনার ক্রমিক পরিণতিতে ফুটছে তার দ্বিতীয় রূপ। আগেই দেখেছি, জড় আর শক্তি আলাদা দুটি তত্ত্ব নয়—জড় শক্তিরই

উপাদানবিগ্রহ মাত্র। এবার তেমনি দেখতে পাব, জড়শক্তিও মনের তপোবিগ্রহ। জড়শক্তি বাস্তবিক বিশ্বক্রতুর একটা অবচেতন লীলা। মনে হয়, আমাদের মধ্যে এই ক্রতু বুঝি জ্যোতির্ময়, কিন্তু বস্তুত তা আলো-আঁধারের মিশ্রণ। তেমনি জড়শক্তিকে মনে হয় একটা অপ্রবুদ্ধ অন্ধকারের উত্তালতা বলে। তত্ত্বত বিশ্বক্রতু আর জড়শক্তি কিন্তু পরস্পরের অবিনাভূত। জড়বিজ্ঞানও গোড়া থেকেই এই একত্বের একটা অস্পষ্ট সহজ অনুভব পেয়েছে, যদিও বিশ্বকে উল্টা অথবা তলার দিক থেকে দেখা তার অভ্যাস। অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিশ্বকে দেখে উপর থেকে, তাই বহুদিন হতেই এ-তত্ত্ব তার কাছে প্রাঞ্জল ছিল। অতএব স্বচ্ছন্দে বলা চলে, শক্তিকে আপন প্রকৃতি বা প্রেতির বাহন করে এক অবচেতন বিরাট মন বা বুদ্ধিই এই জড়ের জগৎ সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এখন জানি, মন কোনও স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভূ তত্ত্ব নয়, সেও অতিমানস বা ঋত-চিতের অন্ত্যাবিভূতি মাত্র। অতএব যেখানে মন আছে, সেখানেই অতিমানসও থাকবে। অতিমানসই বিশ্ববিসৃষ্টির নিত্য ও সত্য প্রযোজক। প্রাকৃত জগতে মনশ্চেতনা তমসাচ্ছন্ন ও স্বধামচ্যুত, তবু তার বৃত্তিতে অতি-মানসের উদার পরিবেশের প্রচ্ছন্ন সংবেগ রয়েছে। সেই সংবেগের বশে মনোবৃত্তির অন্যোন্যসম্বন্ধের মধ্যে দেখা দেয় ঋতের ছন্দ, নিগূঢ় বীর্যের অনতিবর্তনীয় পরিণাম—নির্দিষ্ট বীজ হতে নির্দিষ্ট গাছটিকে সে-ই ফুটিয়ে তোলে। তাইতো তার অকুণ্ঠিত প্রশাসনে মূঢ় তমশ্ছন্ন নিশ্চেতন জড়শক্তির অন্ধলীলাও ঋতম্ভরা ছন্দঃসুষমার বাহন হয়—নইলে এ-জগৎ হত যদৃচ্ছা ও নির্ঋতির একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ততা শুধু। অবশ্য এই ঋতচ্ছন্দও আপেক্ষিক। এর পূর্ণ সুষমা ফুটে উঠত, মন যদি অতিমানস হতে তার চেতনাকে পরাঙ্মুখ না করত। বিভজ্যবৃত্ত মন ভেদের যে-সংঘাত, একই পরমসত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ববিধুর যে-বিরোধাভাস সৃষ্টি করে চলেছে, তারই স্বাভাবিক ছন্দঃপরিণাম ফুটেছে এই মানসলোকের ঋতায়নে। আত্মরূপায়ণের এই দ্বৈত বা খণ্ড-লীলার মূলে আছে ব্রাহ্মী চেতনার ঋতম্ভরা কল্পনার প্রবর্তনা। অখণ্ড ঋত-চিতের প্রশাসনে বিধৃত এই সত্যসংকল্পই সম্বন্ধবৈচিত্র্যের অনতিবর্তনীয় পরিণতিতে অথবা অবরব্রহ্মের সত্যে রূপায়িত হয়েছে—যার সিদ্ধকল্পনা রয়েছে ব্রহ্মের সম্ভূতিবিজ্ঞানে এবং যার বাস্তবরূপ তাঁর জীবঘন বিভূতিতে ফুটেছে। বিশ্বে সত্য বা ধর্মের প্রকাশ হয় এই ধারাতে। সত্তার গহনে যা বীজরূপে নিগূঢ় হয়ে থাকে, বস্তুর স্বরূপপ্রকৃতিতে যে-সত্যের কল্পনা নিরূঢ় থাকে, পরমপুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে বস্তুর যা স্ব-ভাব ও স্বধর্ম, তারই যথাযথ স্ফুরণ ও পরিশীলন ঘটে বিশ্বলীলায়। উপনিষদের অপরূপ মন্ত্র-বর্ণে আছে এই সত্যেরই ইঙ্গিত—বাঙ্ময় বিদ্যুতের ঝলক লাগে ঋষির এই ক'টি কথাতে : সেই স্বয়ম্ভূ কবি ও মনীষিরূপে সব-কিছু হয়েছেন সবঠাঁই

তাঁরই মধ্যে শাশ্বত কাল ধরে বিধান করেছেন সকল অর্থ—'যাথাতথ্যতঃ' অর্থাৎ তাদের স্বরূপসত্যের ছন্দে।*

অতএব, দেহ-প্রাণ-মনের যে-ত্রয়ী আমাদের বর্তমান নিবাসভূমি, তাকে ত্রিধা-বিকল্পিত বলে জানব—তার যথাভূত বাস্তব পরিণামকে মেনেই। তাই দেখি, যে-প্রাণ জড়ে গুহাহিত ছিল, সে-ই নিজেকে আবার উন্মিষিত করল মননধর্মী চেতনায়। কিন্তু মনশ্চেতনার এই স্ফুরণের অন্তরালেও 'মনু'র আবেশ ছিল। অতএব প্রাণে এবং জড়েও সে প্রচ্ছন্ন ছিল। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অতিমানস, যা আর তিনটি বিভূতির উৎস এবং নিয়ন্তা। সুতরাং মনের মত অতিমানসও একদিন এই আধারে উন্মিষিত হবে। বুদ্ধিকে বিশ্বতত্ত্বের মূলে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কেননা, বুদ্ধিই আমাদের মতে চিৎশক্তির পরম পরিণতি—তার আলোকে, তারই প্রশাসনে চলছে আমাদের কৃতি এবং সৃষ্টি। তাই আমরা ভাবি, বিশ্বের মূলে চৈতন্যের লীলা যদি থাকেও, তাহলে নিশ্চয় তার আকার হবে বুদ্ধির মত, অর্থাৎ আমাদের মনোময় চেতনাই হবে বিশ্বের ধাত্রী। কিন্তু বুদ্ধির প্রাকৃত অনুভব ও ব্যবহারেও তার উত্তরভূমির কোনও সত্যের বিভূতিই প্রতিফলিত হয়, বুদ্ধির সামর্থ্য দিয়ে যার ধারণা সীমিত। এই বিভূতির মধ্যে থাকবে চেতনার একটা উৎকৃষ্টতর রূপ, যা সেই উত্তরভূমির সত্যের ছটা। তাই সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টিয়ে বলতে হয় : অবচেতন মন বা বুদ্ধি নয়—গুহাহিত সংবৃত্ত অতিমানসই এই জড়বিশ্বের স্রষ্টা। মন চিৎশক্তিতে নিগূঢ় তার দিব্যক্রতুর সদ্যঃক্রিয় বিভূতিবিশেষ বলে প্রজাপতি মনুকেই অতিমানস সে-সৃষ্টির পুরোধা করেছে। আর জড়শক্তি বা বস্তুসত্তার গহনে প্রচ্ছন্ন আকূতিকে করেছে সে তার বিশ্ববিধায়িকা প্রকৃতি।

কিন্তু প্রাকৃত জগতে দেখি, শক্তির যে-বিভূতিবিশেষকে প্রাণ বলি, তাকে আশ্রয় করেই মনোধাতুর স্ফুরণ। তাহলে প্রশ্ন হবে, প্রাণের কি তত্ত্ব? অতিমানসের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক? সৎ-চিৎ-আনন্দের যে-মহাত্রিপুটী সম্ভূতবিজ্ঞান বা ঋত-চিতের সহায়ে বিশ্বসৃষ্টিতে লীলায়িত, তার সঙ্গেই-বা কোথায় তার যোগ? মহাত্রিপুটীর কোন্ বিভাব হতে তার উৎপত্তি? প্রাণের আবির্ভাবের মূলে কোন্ দিব্যসত্যের প্রেতি, অথবা কোন্ অদেবী মায়ার মূঢ় সংবেগ? 'জীবন একটা জঞ্জাল, একটা বঞ্চনা, একটা পাগলামি, একটা প্রলাপ—এর হাত থেকে নিষ্কৃতি খুঁজতে হবে আমাদের শাশ্বত সত্যের অচল-প্রতিষ্ঠায়' : শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই আর্তবিলাপে ক্ষুব্ধ হয়েছে গগনতল। কিন্তু সত্যি কি তা-ই—সত্যি কি বিশ্বের প্রাণলীলা একটা ছলনা

---

* কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।
—ঈশোপনিষদ্ (৮)

শুধু? তা-ই যদি হয়, তবে কেনই-বা এ-ছলনা? কিসের খেয়ালে শাশ্বত-পুরুষ এই অনর্থে, এই প্রলাপে, এই খ্যাপামিতে নিজেকে লাঞ্ছিত করলেন? অথবা ছলনাময়ী মায়ার ক্রূরলীলায় জীব সৃষ্টি করে এই অভিশাপে তাদের জর্জরিত করলেন? না এই প্রাণলীলার মূলে কোনও দিব্যভাবের প্রেরণা আছে, আছে শাশ্বত সত্তার কোনও আনন্দঝংকার—যা আত্মরূপায়ণের অবন্ধ্য আকৃতিতে এমনি করে দুলে উঠেছে দেশ-কালের লাস্যলীলায়, রোমাঞ্চিত হয়েছে বিশ্বের অগণিত লোকে পরিকীর্ণ কোটি-কোটি প্রাণরূপের অফুরন্ত উচ্ছলনে?

পৃথিবীতে জড়ের আধারে প্রাণের প্রকাশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি, এক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির বিভূতি বা পরিস্পন্দ এই প্রাণ। তারই দুর্বার স্রোতে সে জোয়ার-ভাটার খেলা শুধু—এই তার স্বরূপসত্য। সেই মহাশক্তির নিরন্ত লীলায়নে রূপের মেলা গড়ে উঠেছে। বীর্যধারার অবিচ্ছেদ সঞ্চারণে তাদের সে আপ্যায়িত করছে, অবিরাম ভাঙা-গড়ার শিল্পকলায় জিইয়ে রাখছে। এই তো জগৎ জুড়ে প্রাণের রূপ! এইতে কি মনে হয় না, জীবনের আর মরণের মাঝে যে-বিরোধকে স্বভাবের সত্য বলে জানি, আসলে তা আমাদের মনের ভুল—একটা অবাস্তব বিরোধের বিকল্প শুধু? প্রাকৃত ব্যবহারের ভূমিতে এ-বিরোধ বাস্তব হলেও অন্তর্গূঢ় সত্যের বিচারে তো একে মিথ্যাই বলব। বিশ্বব্যাপী অখণ্ডতার মধ্যে প্রাকৃতমন তার উপরভাসা দৃষ্টি নিয়ে এমন-কত বিরোধাভাসেরই না সৃষ্টি করছে। বস্তুত প্রাণের মুক্তধারায় মৃত্যু একটা আবর্তমাত্র—এই তার সত্য পরিচয়। উপাদানের ভাঙা-গড়া, রূপ বদলে রূপ বজায় রাখা—এই নিয়ে নিত্য চলছে প্রাণের খেলা। সে চায় পরিবর্তন, বৈচিত্র্য—তবেই তার রূপায়ণের লীলা সার্থক হয়। সেই লীলাতে ভাঙার কাজটাকে দ্রুত করে মৃত্যু এসে জোগান দেয়—প্রাণেরই প্রয়োজনে। তাই দেহের মরণেও তো প্রাণের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না—শুধু একটা আধার ভেঙে গিয়ে সেই মালমশলায় গড়ে ওঠে অন্য আধার। ক্রিয়াসারূপ্য প্রকৃতির ধর্ম বলে স্বচ্ছন্দে এমন কথাও বলা চলে : প্রাণশক্তি ছাড়া দেহের আধারে মন বা চেতনার শক্তি যদি নিহিত থাকে, তাহলে দেহের ধ্বংসে তার কখনও ধ্বংস হয় না—সে-শক্তিও এক আধার হতে ছাড়া পেয়ে দেহান্তর-সংক্রমণের বিশেষ-কোনও কৌশলে অন্য আধার গড়ে তোলে। এমনি করে সবার নবকলেবর হয়, কিছুই বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায় না।

অতএব নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, বিশ্ব জুড়ে আছে এক প্রাণ, এক মহাশক্তির জঙ্গমলীলা (জড়ের দিকটা তার স্থূলতম স্পন্দনমাত্র)—যা জড়-বিশ্বের এই বিচিত্র রূপের পসরা সৃষ্টি করে চলেছে। সে-প্রাণ শাশ্বত, অবিনশ্বর। আজ যদি বিশ্বের রূপায়ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়, তবু সে-প্রাণ

তেমনি অব্যাহত থাকবে, তার নূতন বিশ্ব গড়ে তোলবার সামর্থ্য থাকবে তেমনি অকুণ্ঠিত। উত্তরশক্তির প্রয়োজনে নিশ্চলতায় সংহৃত বা আত্মসমাহিত না হলে অফুরান চলবে তার বিসৃষ্টির লীলা। তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রাণকে বলব শক্তির সেই বিভূতি—যা গড়ছে রাখছে আবার ভাঙছে বিশ্বজোড়া এই রূপের হাট। প্রাণই ফুটছে মাটির পৃথিবী হয়ে, সেই মাটির বুকে তরু-লতা হয়ে। আবার যে জীবগোষ্ঠী বা তরু-লতা পরস্পরের প্রাণশক্তিকে আত্মসাৎ করে পৃথিবীতে বেঁচে আছে, তারাও সে-প্রাণেরই বিচিত্র বিভূতি। বস্তুত বিশ্বভূত জড়ের আধারে বিশ্বপ্রাণেরই রূপায়ণ। নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়োজনে জড়ক্রিয়াতেও প্রাণের ক্রিয়া সে প্রচ্ছন্ন রাখে—ক্রমে অবমানস ইন্দ্রিয়চেতনায় ও মনোময় প্রাণনে তাকে বিকশিত করে। কিন্তু তবু আত্ম-রূপায়ণের পর্বে-পর্বে সে বহন করে এক অখণ্ড প্রাণতত্ত্বেরই সৃষ্টির আকূতি।

আপত্তি হতে পারে, প্রাণ বলতে অখণ্ডতার একটা ছবি তো আমাদের মনের সামনে ফোটে না। বিশ্বশক্তির বিশেষ-কোনও পরিণামকে আমরা প্রাণ বলে জানি। তার পরিচয় পাই পশুতে ও উদ্ভিদে—কিন্তু ধাতুখণ্ডে প্রস্তরে বা বায়বীয় পদার্থে নয়। জীবকোষে প্রাণের ক্রিয়া মানলেও জড়পরমাণুর মধ্যে মানতে পারি কি?...অতএব যুক্তির ভিত্তিকে দৃঢ় করতে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, শক্তির যে-পরিণামবিশেষকে প্রাণ বলি, কি তার সত্যকার প্রকৃতি। আর সেই শক্তির যে-জড়লীলাকে বলি নিষ্প্রাণ, তার সঙ্গে তার তফাত কোথায়। শক্তির তিনটি লীলাভূমি দেখছি পৃথিবীতে : একটি পশুজগৎ, আমরা যার অধিবাসী; আরেকটি উদ্ভিদজগৎ, আর তৃতীয়টি জড়জগৎ—যাকে নিষ্প্রাণ বলে ধরে নিয়েছি। প্রশ্ন হবে, উদ্ভিদের প্রাণলীলা হতে আমাদের প্রাণলীলা তফাত হয়েছে কোন্ জায়গায়? প্রাচীনেরা যাকে ধাতুজগৎ বলতেন, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান যে রাসায়নিক জগৎ আবিষ্কার করেছে, সেই নিষ্প্রাণ পদার্থের সঙ্গে উদ্ভিদের পার্থক্য কোথায় ঘটেছে?

সাধারণত প্রাণের কথা বলতে আমরা পশুকেই লক্ষ্য করি—কেননা সে খায়-দায়, চলে বেড়ায়, নিশ্বাস নেয়, তার অনুভব আছে, ইচ্ছা আছে। গাছপালারও প্রাণ আছে—আমাদের কাছে একথাটা বাস্তব না হয়ে বরং রূপক-ঘেঁষা, কেননা উদ্ভিদের প্রাণনকে আমরা প্রাণধর্মের মর্যাদা দিতে পারিনি বলে চিরকাল তাকে ফেলে এসেছি জড়প্রক্রিয়ার কোঠায়। বিশেষত শ্বাসক্রিয়াকে প্রাণনের সঙ্গে আমরা সবসময় জড়িয়ে নিই। 'শ্বাসই প্রাণ'—এমন উক্তি সব ভাষাতেই আছে। কথাটা মিথ্যাও নয়, যদি তলিয়ে ভাবি 'বিশ্বপ্রাণের উচ্ছ্বাস (অথবা নিঃশ্বসিত)' বলতে বাস্তবিক কি বোঝায়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, শ্বাস নেওয়া স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা বা আহার সংগ্রহ করা প্রাণধর্ম হলেও তা-ই কখনও প্রাণের স্বরূপ নয়। যে নিগূঢ় আপ্যায়নী শক্তিকে

আমাদের সঞ্জীবনী বলে জানি, এইসব শারীরক্রিয়ায় তারই প্রজনন বা সঞ্চালন চলে। অথবা দেহের বিধারণ সম্ভব হয়েছে যে ভাঙা-গড়ার লীলায়, এরা তারই পোষক। কিন্তু এই জীবনযোনি-প্রযত্নকে বজায় রাখতে শ্বাস-প্রশ্বাস বা দেহপোষণের অভ্যস্ত আয়োজনকে একেবারে অপরিহার্য বলা চলে না। শ্বাস-প্রশ্বাস হৃৎস্পন্দন ইত্যাদিকে আমরা প্রাণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত বলে জানি। অথচ এসব ক্রিয়াকে সাময়িক স্তম্ভিত রেখে মানুষ এই দেহেই বাঁচতে পারে এবং তাও পুরাপুরি সজ্ঞানে—এরও তো চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। এমন-কি, উদ্ভিদের মধ্যে পশুর মত চেতনার সাড়া আজও প্রত্যক্ষগোচর না হলেও তাদের শারীরক্রিয়া যে আমাদেরই সগোত্র, আপাতপার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মূল গড়ন যে একই, বিচিত্র তথ্যের সমাহারে এ-তত্ত্বও সপ্রমাণ হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের বিচারহীন মিথ্যা সংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার পক্ষে এ-দুটি প্রমাণই যথেষ্ট নয়। তার জন্য বহিরঙ্গ লক্ষণের স্থূল যবনিকা ভেদ করে আমাদের পৌঁছতে হবে প্রাণতত্ত্বের গোড়ার কথায়।

এ-যুগের কোন-কোনও আবিষ্কার* হতে যে-তত্ত্বের সন্ধান মেলে, তার দীপ্ত আলোকে জড়াশ্রিত প্রাণের রহস্য অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এদেশেরই একজন প্রখ্যাত জড়বিজ্ঞানী, অভিঘাতে সাড়া দেওয়াই যে প্রাণসত্তার অবিসংবাদিত পরিচয়—এই তত্ত্বের 'পরে বিশেষ করে জোর দিয়েছেন। তাঁর আহৃত তথ্য উদ্ভিদের জীবনরহস্যের 'পরে বিশেষ আলোকপাত করেছে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল প্রবৃত্তির নিবিড় পরিচয় নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়। যেমন উদ্ভিদে তেমনি ধাতুখণ্ডেও তিনি আবিষ্কার করেছেন প্রাণনের সেই একই লক্ষণ—তারাও অভিঘাতে সাড়া দেয়। প্রাণের যে অনুপ ছন্দকে বলি জীবন আর প্রতীপ ছন্দকে বলি মরণ, তারও দোলা আছে তাদের মধ্যে। তথ্যের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে উদ্ভিদের মত তেমন জোরালো নয়, তাই প্রাণের প্রকাশ-ধারা যে দুয়ের মধ্যে অবিকল এক, তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া এখনও সম্ভব

---

* সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে এ-তত্ত্ব আহরণ করবার উদ্দেশ্য পার্থিব ভূমিতে জড়ের আধারে প্রাণের গতি-প্রকৃতির ধারা নিরূপণ করা নয়, কিন্তু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলা। বিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিদ্যার (শুধু বুদ্ধির জল্পনার 'পরেই হ'ক অথবা এদেশের মত অধ্যাত্মদর্শন কিংবা অধ্যাত্ম অনুভবের চরম প্রামাণ্যের 'পরেই হ'ক তাদের ভিত্তি) অধিকার যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি তাদের গবেষণার ধারাও স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে তত্ত্ববিদ্যার ঘাড়ে অথবা তত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো—দুইই সমান অযৌক্তিক। কিন্তু সকল অবস্থাতেই পুরুষ-প্রকৃতির মাঝে এমন-একটা সামরস্যের ব্যঞ্জনা আছে, যা উভয়ের অন্তর্নিহিত অখণ্ড সত্যের দ্যোতক। যুক্তিযুক্ত শ্রদ্ধার এ-রায়কে মানলে পরে, জড়জগতের সত্য যে বিশ্বে লীলায়িত মহাশক্তির রহস্যময় গতি-প্রকৃতিকে একটুখানি উজ্জ্বল করে তুলতেও পারে, এ-কল্পনা অসংগত হয় না। অবশ্য তাকে সত্যের পূর্ণজ্যোতি বলা চলে না, কেননা জড়বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া মহাশক্তির যে-লীলা অতীন্দ্রিয়, তাকে ধরাছোঁয়ার সামর্থ্যও তার নাই।

হয়নি। কিন্তু মনে হয়, তার উপযোগী অতিসূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে এ-বাধাও থাকবে না। ধাতু আর উদ্ভিদের মধ্যে যে প্রাণনের দিক দিয়ে আরও-অনেক সাম্য রয়েছে, তা প্রমাণ করা তখন কঠিন হবে না। সাম্য আবিষ্কার করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার অর্থ এও হতে পারে--প্রাণ-প্রকাশের ধারা দুয়ে স্বতন্ত্র, অথবা এখনও তা ধাতুতে হয়তো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবু প্রাণনের প্রথম স্পন্দনের একটুখানি আভাস তার মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। প্রাণের লক্ষণ যত অস্পষ্টই হ'ক, তার রেশটুকুও ধাতুখণ্ডের মধ্যে যদি থাকে, তাহলে তার সগোত্র অন্যান্য জড়পদার্থে কি মাটির মধ্যেও ভ্রূণরূপে তার বীজসত্তা নিয়ে তা সংবৃত্ত হয়ে থাকবে না কেন? বস্তুত, গবেষণা আরও গভীর হলে, হাতের কাছে সাধনসামগ্রী তৈরী না থাকার জন্যে অসময়ে তার মধ্যে আর আমাদের দাঁড়ি টানতে হবে না। তখন প্রকৃতির সারূপ্যলীলার 'পরে নির্ভর করে নিঃসংশয়ে একদিন আবিষ্কার করব, তার কৃতির ধারায় কোথাও ছেদ নাই। বাস্তবিক মাটি আর তার অন্তর্গত ধাতুর তাল, দুয়ের মাঝে কোনও কঠিন ভেদের রেখা টানা একেবারেই অসম্ভব। ধাতু আর উদ্ভিদের বেলাতেও তা-ই। এই সামান্য সূত্র ধরে এগিয়ে দেখি, মাটি বা ধাতু যে মূলভূত আর পরমাণুর সমাহারে গড়ে উঠেছে, তাদেরও মূলে রয়েছে এক অবিচ্ছেদ ধারা। এমনি করে অখণ্ড সত্তার পর্বানুক্রমে আদিপর্ব উদ্যত হয়ে আছে উত্তরপর্বের জন্যে, তার আ-ভাসকে ভ্রূণরূপে সে নিজের মধ্যে ধারণ করছে। সব ছেয়ে আছে এক অখণ্ড প্রাণ—কোথাও গূঢ় কোথাও প্রকট, কোথাও ব্যাকৃত কোথাও অব্যাকৃত, কোথাও সংবৃত্ত কোথাও বিবৃত্ত। কিন্তু আছে সে বিশ্ব জুড়ে—সব ছেয়ে, অবিনশ্বর হয়ে। ভেদবৈচিত্র্য শুধু তার রূপায়ণে আর ব্যাকৃতিতে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। বাইরের অভিঘাতে সাড়া দেওয়া প্রাণনের একটা বহিরঙ্গ লক্ষণ মাত্র। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আর চলাফেরাও তাই। গবেষণাগারে গবেষক বিশিষ্ট অভিঘাতের ফলে সুস্পষ্ট একটা সাড়া পেলেন। অমনি তিনি ধরে নিলেন, যে সাড়া দিল নিশ্চয়ই তার প্রাণ আছে। ধরা যাক, সাড়া দিয়েছে একটা উদ্ভিদ। কিন্তু অভিঘাতে সাড়া দেওয়া তার কি এই প্রথম? সারাজীবন ধরেই তো চারদিকের পরিবেশ হতে সে পেয়ে এসেছে পুঞ্জিত অভিঘাত, আর প্রতি মুহূর্তে তার উত্তরে দিয়ে এসেছে দুর্নিরীক্ষ্য বিচিত্র সাড়া। অর্থাৎ পরিবেশের শক্তির অভিঘাতে সাড়া দেবার মত শক্তির একটা ভাণ্ডার নিত্যসঞ্চিত রয়েছে তার মধ্যে। কেউ-কেউ বলেন, নাড়া পেলেই সাড়া দেওয়া থেকে প্রমাণ হয়, উদ্ভিদ কিংবা অন্যান্য জীবদেহে প্রাণশক্তি বলে একটা পৃথক শক্তি স্বীকার করবার কোনও প্রয়োজন নাই—কেননা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, জীবপ্রবৃত্তি জড়শক্তির একটা যন্ত্রলীলা ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু

বাস্তবিক উদ্ভিদকে অভিহত করার অর্থ—শক্তির বিশেষ-একটা সংবেগকে কোনও নির্দিষ্ট ধারায় তার মধ্যে সঞ্চারিত করা। তেমনি উদ্ভিদের সাড়া দেবার অর্থও হল—শক্তির সংবেগ যেন অন্য-একটা ধারায় বেদনা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে নাড়া পেয়ে। এমনি করে নাড়া খেয়ে সাড়া দেবার মধ্যে তার সত্তারই হৃদয়স্পন্দ ফোটে। শুধু তা-ই নয়। উদ্ভিদের টিকে থাকবার এবং বাড়বার আকৃতি হতে একটা অবমানস অন্ন-প্রাণময় কোশের পরিচয় পাই—যা তার অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির বিসৃষ্টি।...সব মিলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : বিশ্ব জুড়ে যেমন স্থূল-সূক্ষ্ম বিচিত্র রূপে উচ্ছ্বসিত এক বিপুল শক্তি-সংবেগের নিত্য স্পন্দন আছে, তেমনি প্রতি জড়বিগ্রহে বা বস্তুতে (হ'ক সে পশু উদ্ভিদ কি ধাতু) সঞ্চিত হয়ে আছে সেই শক্তিবেগের চাঞ্চল্য। এ-দুয়ের মাঝে অন্যোন্যবিনিময়ের লীলাকে আমরা সাধারণত প্রাণ বলে জানি। শক্তির এই বিকিরণে আমরা পাই প্রাণের তেজোময় রূপের পরিচয় এবং এই তেজের সক্রিয় আধারকেই বলি প্রাণশক্তি। মনের তেজোরূপ, প্রাণের তেজোরূপ, জড়ের তেজোরূপ—সমস্তই এক বিশ্বশক্তির বিচিত্র বিচ্ছুরণ মাত্র।

আমরা যাকে মনে করি মৃত, তারও মধ্যে প্রাণশক্তির সংহত বীর্য সুপ্ত রয়েছে, যদিও সুপরিচিত প্রাণবৃত্তি সেখানে স্তম্ভিত এবং তাদের অত্যন্ত-প্রলয়ও আসন্ন। যে মরে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলা কোন-কোনও ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব নয়। তাতে প্রমাণ হয়, আমরা যাকে প্রাণ বলি, দেহে তখনও তার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সে ছিল সুপ্ত: অর্থাৎ তার অভ্যস্ত ক্রিয়ার কোনও নিশানা ছিল না—ছিল না শারীরক্রিয়া, ছিল না নাড়ীসংবেদনের লীলা, বা জান্তব মনশ্চেতনার সুপরিচিত সাড়া। প্রাণ বলে আলাদা একটা-কিছু দেহ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং দেহটাকে চেতিয়ে তোলায় সুযোগ বুঝে আবার সে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে—এমন কল্পনা এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেননা, প্রাণ দেহকে একেবারে যদি ছেড়ে যায়, তাহলে দেহের সঙ্গে সকল যোগ নষ্ট হওয়ায় কি করে সে জানবে যে আবার তার দেহে ফেরবার সময় হয়েছে ? আবার কোন-কোনও ক্ষেত্রে—যেমন মূর্চ্ছারোগে—জীবনের সকল চিহ্ন সকল বৃত্তি স্তম্ভিত হয়ে গেলেও মন সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বতন্ত্র থাকে, যদিও দেহ দিয়ে সাড়া দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তার লুপ্ত হয়ে যায়। তখন এমন বলা চলে না যে মানুষটার দেহের মৃত্যু হলেও তার মন বেঁচে আছে, অথবা প্রাণ দেহ ছেড়ে পালিয়েছে কিন্তু মন তবু দেহকে আঁকড়ে আছে। স্বাভাবিক শারীরক্রিয়া স্তম্ভিত হলেও মন এখনও সক্রিয়—এই ব্যাখ্যাই এ-ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত।

তেমনি সমাধিরও বিশেষ-কোনও অবস্থায় শারীরক্রিয়া এবং বহিশ্চর মনের ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাদের কাজ শুরু হয়—কখনও

বাইরের পরিচর্যায়, অনেকক্ষেত্রে ভিতর হতে ব্যুত্থানের স্বাভাবিক প্রেরণায়। আসল ব্যাপারটা এখানে এই। সমাধিপরিণামের ফলে বহিশ্চর মনঃশক্তি অবচেতন মনে এবং বহিশ্চর প্রাণশক্তি অন্তশ্চর প্রাণে গুটিয়ে আসায়—হয় গোটা মানুষটাই তলিয়ে যায় অবচেতন ভূমিতে, নয়তো বহির্জীবনকে অবচেতনায় সংহৃত ক'রে অন্তশ্চেতনাকে সে অতিচেতন লোকে উৎক্ষিপ্ত করে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই : যে-শক্তি (স্বরূপ তার যা-ই হ'ক) প্রাণের সংবেগকে দেহের আধারে ধরে রাখে, তার বাইরের বৃত্তিকে স্তম্ভিত করেও ভিতরে-ভিতরে সে কিন্তু সমস্তটা দেহপিণ্ডই ছেয়ে থাকে। তারপর একটা সময় আসে, যখন স্তম্ভিত বৃত্তিকে ফিরে সে সচল করতে পারে না। কখনও দেহের মর্মতন্তু ছিন্ন হয়ে দেহটা অকেজো অথবা অভ্যস্ত ক্রিয়ায় অক্ষম হয়ে যায়। আবার কখনও তন্তুবিচ্ছেদ না ঘটলেও দেহের মধ্যেই বিস্রস্তির ক্রিয়া শুরু হয় অর্থাৎ প্রাণবৃত্তিকে সজাগ করে তুলবে যে-শক্তি, পরিবেশের বিচিত্র শক্তির হানাতেও সে আর সাড়া দেয় না। তাই এতকাল ধরে পুঞ্জিত অভিঘাতের ফলে শক্তির যে-অন্যোন্যবিনিময় চলছিল, তার নিবৃত্তিতে দেহেরও পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয়। কিন্তু তখনও দেহের মধ্যে প্রাণের লীলা চলছে। তবে প্রাণ লেগেছে গড়বার কাজে নয়—যে-ঘর সে বেঁধেছিল, তাকে ভাঙবার কাজে। ঘরের মালমশলা আবার তখন গিয়ে জমে আদিম-ভূতের ভাণ্ডারে এবং তা-ই দিয়ে শুরু হয় নতুন করে ঘর বাঁধবার আয়োজন। বিশ্বশক্তির যে-দিব্যক্রতু দেহপিণ্ডকে এতক্ষণ ধরে ছিল, এইবার মুষ্টি শিথিল করে সে সায় দেয় বিশরণের কাজে। এমনি করে ভিতর থেকে ধ্বংসলীলার শুরু না হলে দেহের সত্যকার মরণ হয় না।

প্রাণ তাহলে বিশ্বব্যাপী এক মহাশক্তির জঙ্গমলীলা। সে-শক্তির মধ্যে কোন-না-কোনও আকারে, অন্তত আধারতত্ত্বরূপেও মানসচেতনা এবং নাড়ী-সঞ্চারী প্রাণবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে। তাই এ-জগতে জড়ের আধারে তাদের আবির্ভাব ও ব্যাকৃতি সম্ভব হয়। এই বিশ্বশক্তির প্রাণলীলা স্বরচিত বিচিত্র মূর্তির মধ্যে ফুটে ওঠে অভিঘাত ও সাড়ার অন্যোন্যবিনিময়ে। প্রত্যেক মূর্তির মধ্যে শক্তির নিজেরই নাড়ীর নিত্যস্পন্দন রয়েছে। প্রত্যেক মূর্তির শ্বাসে-প্রশ্বাসে চলছে ওই একই উৎস হতে উৎসারিত অনিল অমৃতের অজপা। এক মহাশক্তিই প্রত্যেক মূর্তির আহার ও পুষ্টির বহুধাবৃত্ত সাধন। কখনও-বা পরোক্ষ উপায়ে তারা নিজেকে পোষণ ক'র অপর মূর্তির মধ্যে সঞ্চিত তেজকে আত্মসাৎ ক'রে, আবার কখনও চারদিকে বিচ্ছুরিত বিশ্বশক্তির বিচিত্র তরঙ্গকে সোজাসুজি শোষণ করে নেয়। এসমস্তই প্রাণের লীলা। কিন্তু আমরা তাকে ভাল চিনি, যখন বহিশ্চর বৃত্তির জটিলতায় তার ব্যূহভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই—বিশেষত আমাদের সুপরিচিত নাড়ীতন্ত্র যখন তার

শক্তির বাহন হয়। এইজন্যই উদ্ভিদে প্রাণ আছে, একথা স্বীকার করতে আমাদের বেগ পেতে হয় না, কেননা প্রাণের লক্ষণ তার মধ্যে অস্পষ্ট নয়। ব্যাপারটা আরও সহজ ঠেকে যখন দেখি—উদ্ভিদের দেহেও নাড়ীতন্ত্রের নিশানা আছে, অনেকটা আমাদেরই মত তার প্রাণনবৃত্তি। কিন্তু ধাতুতে মাটিতে কি ভূতাণুতে প্রাণ আছে, একথা আমরা মানতে নারাজ—কেননা প্রাণের বাহ্য লক্ষণের কোনও আভাস তাদের মধ্যে হয় দুর্নিরীক্ষ্য নয়তো আপাত-নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু জীব আর তথাকথিত অজীবের মাঝে এই বাইরের তফাতটুকুকে স্বরূপের ভেদ বলে গণ্য করা কি ঠিক? ধর আমাদের জীবন আর উদ্ভিদের জীবন। দুয়ের মাঝে তফাত কোথায়? দুটি বিষয়ে উদ্ভিদ থেকে আমরা আলাদা। প্রথমত, আমাদের চলাফেরার ক্ষমতা আছে—যদিও প্রাণনের নাড়ীর খবর তাতে মেলে না; দ্বিতীয়ত, আমাদের সচেতন বোধশক্তির দাবি আছে, কিন্তু যতদূর জানি উদ্ভিদের মধ্যে আজও সে-শক্তির বিকাশ হয়নি। আমাদের নাড়ীতন্ত্রে যে-সাড়া জাগে—সবসময় বা পুরামাত্রায় না হ'ক—একটা সচেতন ইন্দ্রিয়বোধের সাড়া মনের মধ্যে সে আনেই। যেমন মনের কাছে, তেমনি নাড়ীতন্ত্রে বা তার ঝঙ্কারে প্রহত দেহযন্ত্রের কাছে সে-সাড়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। মনে হয়, উদ্ভিদের মধ্যেও নাড়ীর বোধ যে আছে, তার নিশানা একেবারে দুর্লভ নয়। তার কতকগুলি সাড়াকে আমাদের ভাষায় তর্জমা করা যেতে পারে সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-জাগরণ, উচ্ছ্বাস-অবসাদ ও ক্লান্তির সংজ্ঞায়। নাড়ীতন্ত্রের ঝঙ্কারে উদ্ভিদের দেহও নিশ্চয় রণিত হয়ে ওঠে, কিন্তু মনশ্চেতনায় তার বোধ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবু একথা মানতেই হবে, বোধ সকল ক্ষেত্রেই বোধ—এখন মনের চেতনায় কি প্রাণের সাড়ায় যে-আকারেই সে ফুটুক না কেন। তাছাড়া সম্মুগ্ধ-বোধও চেতনারই একটা রূপ। স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যখন কোনও-কিছুর ছোঁয়াচ হতে নিজেকে গুটিয়ে আনে, তখন বেশ বোঝা যায়, আঘাতটা বেজেছে তার নাড়ীতন্ত্রে এবং তার মধ্যে এমন-কিছু আছে যা বাইরের ছোঁয়াচটা পছন্দ করে না বলেই গুটিয়ে আসে। এককথায়, উদ্ভিদের মধ্যেও অবচেতন একটা বোধশক্তি আছে—যেমন জানি আমাদের মধ্যেও আছে অবচেতনার এমন-কত ক্রিয়া। মানুষের বেলায় অবচেতন অনুভবগুলিকে অতীতের কবর খুঁড়ে উপরে টেনে তোলা যায়—নাড়ীতন্ত্রে তাদের কোনও রেশ বেঁচে না থাকলেও। চেতনার চেয়ে অবচেতনার রাজ্যই যে সুদূরপ্রসারী আমাদের মধ্যে, নিত্য-উপচীয়মান স্তূপাকার তথ্যের সাক্ষ্যে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। অতএব উদ্ভিদের মধ্যে একটা বহিশ্চর জাগ্রৎ মন অবচেতন অনুভবকে যাচাই করতে পারছে না বলেই প্রমাণ হয় না যে তার অনুভব

মিথ্যা। অথচ অবচেতনার রীতি মানুষ আর উদ্ভিদের মধ্যে হুবহু এক। রীতি যদি এক হয়, তাহলে মূলবস্তুটাও এক—অর্থাৎ মানুষে অবচেতন মন বলে কিছু থাকলে উদ্ভিদেও তা আছে। এও সম্ভব, ধাতুর মধ্যেও অতি অস্পষ্ট ভ্রূণের আকারে এক সম্মুগ্ধ-বোধময় অবচেতন মনের প্রাণলীলা আছে—যদিও নাড়ীতন্ত্রের ঝঙ্কারে রণিত হবার মত দেহযন্ত্র তার নাই। কিন্তু দৈহ্য অনুরণন না থাকলেও ধাতুখণ্ডে প্রাণনশক্তি থাকার কোনও বাধা হয় না—যেমন নাকি দৈহ্য চলৎশক্তি না থাকাতেও উদ্ভিদের মধ্যে তা অসম্ভব হয়নি।

চেতনা যখন অবচেতনার গহনে তলিয়ে যায়, অথবা অবচেতনা উঠে আসে চেতনার ভূমিতে, তখন বাস্তবিক কি ঘটে? এখানে সত্যকার বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হচ্ছে—বৃত্তির একদেশেই চিৎশক্তির পরিপূর্ণ অভিনিবেশে, তার অল্পাধিক অন্যব্যাবৃত্ত আত্মসংহরণে। আত্মসংহরণ বা আত্মসমাধানের কোনও-কোনও দশায় প্রজ্ঞানের বহির্বৃত্তি (আমরা যাকে বলি মনশ্চেতনা) আর যেন সচেতনভাবে কাজ করে না, কিংবা একেবারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও দেহ নাড়ীতন্ত্র ও আলোচনমনের ক্রিয়া চলতে থাকে—অসাড়ে অথচ অবিচ্ছেদে ও নিখুঁতভাবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির একটা ধারা ধরেই মন তখন সক্রিয় এবং প্রভাস্বর হয়—তার আর-সব অবচেতনার মধ্যে তলিয়ে যায়। লেখবার সময় লেখকের যেটুকু শারীরব্যাপার, তার বেশির ভাগ, কখনও-বা সবটাই থাকে অবচেতন মনের শাসনে। নাড়ীতন্ত্রের ইঙ্গিতে শরীর যেন তখন বিশেষ কতগুলি ভঙ্গিতে অচেতনভাবে নড়তে থাকে, আর মন সচেতন থাকে তার প্রত্যাসন্ন চিন্তা নিয়ে। এমনি করে গোটা মানুষটাই কখনও অবচেতনায় তলিয়ে যেতে পারে, অথচ কতগুলি অভ্যস্ত আচরণ থেকে বোঝা যায় তার মন তখনও সক্রিয়—এই যেমন স্বপ্ন-সঞ্চরণে। আবার কখনও সে অতিচেতন ভূমিতে উঠে যেতে পারে, অথচ তার দেহে অধিচেতন মনের ক্রিয়া চলতেই থাকে—যেমন কোনও-কোনও যোগসমাধিতে। এহতে স্পষ্টই বোঝা যায়, উদ্ভিদের বোধে এবং আমাদের বোধে এইটুকু তফাত যে, উদ্ভিদের মধ্যে বিশ্বরূপা চিৎশক্তি এখনও যেন জড়ত্বের ঘুম ভেঙে পুরাপুরি জেগে ওঠেনি। যে অতিচেতন-বিজ্ঞান বিশ্বকর্মের প্রবর্তক, প্রবর্তিত শক্তি উদ্ভিদ-চেতনায় তাথেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে আছে এবং কিছুতেই এই বিচ্ছেদের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কাজেই অবচেতনভাবে আজ সে তা-ই করে চলেছে, মূঢ় অভিনিবেশের মূর্ছাভঙ্গে মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে একদিন সচেতন হয়ে যা করবে। তখন আবার ওই হবে তার বিজ্ঞানাত্মার মধ্যে প্রবুদ্ধ হবার পরোক্ষ আয়োজন। এমনি করে পরিণামের পর্বে-পর্বে চলছে একই চৈতন্যলীলা, কিন্তু প্রতি পর্বে তার ভঙ্গি স্বতন্ত্র—কেননা চেতনার প্রকাশের দিক থেকে তার প্রয়োজনও স্বতন্ত্র।

একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দেখছি, জড়পরমাণুর মধ্যেও এমন-কিছু আছে, যা আমাদের মধ্যে এসে ইচ্ছা আর বাসনার আকার নেয়। বাইরে থেকে পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণকে ভিন্নগোত্র মনে হলেও, বস্তুত আমাদের অনুরাগ-বিরাগের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ রয়েছে। শুধু বলতে পারি, জড়ের মধ্যে এ-'বেদনা' অচেতন বা অবচেতন। এই ইচ্ছা আর বাসনার লীলা তত্ত্বত বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র ছেয়ে আছে—কেবল আমাদের চোখে তার রূপটি স্পষ্ট নয়। নইলে এক অবচেতন বুদ্ধিশক্তির অনুষঙ্গ –এমন-কি তার প্রকট রূপ বলে স্বচ্ছন্দে একে ব্যাখ্যা করা চলে। তাকে অবচেতন বলতে আপত্তি থাকলে বলব অচেতন অর্থাৎ একান্তই সংবৃত্তচেতন। কিন্তু তবু সে সারা বিশ্ব জুড়ে আছে। প্রতি জড়পরমাণুতে এই সংবৃত্ত বুদ্ধির বেদনা থাকলে জগতের সকল বস্তুতেই তা থাকবে—কেননা বস্তুমাত্রেই তো পরমাণু-পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। আবার পরমাণু যে-মহাশক্তির রূপান্তর, সে চিন্ময় বলে প্রতি পরমাণুই স্বরূপত একটি চিৎকণা। বেদান্তীর কাছে মহাশক্তি বস্তুতই চিৎ-তপঃ বা চিৎ-শক্তি অর্থাৎ চিৎস্বরূপের স্ব-গত চিন্ময় প্রবেগ। সেই শক্তিই ফুটে ওঠে উদ্ভিদের মধ্যে অবমানস-বোধময় নাড়ীতন্ত্রের সামর্থ্যে, বাসনার বেদনা ও সংবেগ নিয়ে আদিম প্রাণিদেহে, আত্মসচেতন বেদনা ও সংবেগ নিয়ে ঊর্ধ্বতন জীবের মধ্যে এবং মনোময় সংকল্প ও বিজ্ঞানের লীলায় সকল প্রাণীর সেরা মানুষের মধ্যে। প্রাণ যেন তপোঘনা বিশ্বশক্তির মহাতন্ত্রী—তার ঘাটে-ঘাটে বেজে উঠছে অচেতনা হতে চেতনা পর্যন্ত বিচিত্র সুরের লীলা। মহাশক্তির এ যেন অন্তরিক্ষলোক। তার বীর্য সুপ্ত-নির্মজ্জিত রয়েছে জড়ের গুহাশয়নে, নিজেরই শক্তির প্রবেগে অঙ্কুরিত হচ্ছে অবমানস চেতনায় এবং পরিশেষে মনঃশক্তির উন্মেষে পল্লবিত হয়ে উঠছে তার বিচিত্রবীর্যের বিপুল সম্ভাবনা।

প্রাণের উন্মেষের বহিরঙ্গ লীলাকেও যদি বিশ্বপরিণামের তত্ত্বালোকে বিচার করি তাহলে আর-কিছু না হ'ক অন্তত যুক্তির খাতিরেও এ-সিদ্ধান্তকে আমাদের না মেনে উপায় নাই। স্পষ্টই দেখছি, উদ্ভিদের মধ্যে যে-প্রাণ, পশু হতে তার সংহননের ধারা স্বতন্ত্র হলেও স্বরূপত সে তো একই শক্তি। উদ্ভিদেরও পশুর মতই আছে জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু, বীজের সহায়ে বংশবিস্তার, অবক্ষয়ে ব্যাধিতে অত্যাচারে মরণ, বাইরে থেকে পুষ্টির উপাদান আহরণ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, আলো ও তাপের 'পরে নির্ভর, বহুপ্রজনন বা বন্ধ্যাত্ব—এমন-কি সুপ্তি ও জাগরণ, উত্তেজনা ও অবসাদের ছন্দে জীবনায়ন, শৈশব প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের ক্রম-পরিণাম। তাছাড়া উদ্ভিদে জীবনীশক্তির মুখ্য উপাদান আছে, তাই প্রাণিমাত্রেরই সে স্বাভাবিক অন্ন। যদি মানি, তার মধ্যে নাড়ীতন্ত্র আছে, আছে অভিঘাতে সাড়া দেবার সামর্থ্য, অবমানস অথবা

অবিমিশ্র প্রাণময়-বোধের একটা আভাস কি ফল্গুধারা—তাহলে পশু আর উদ্ভিদের সারূপ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু বলব, উদ্ভিদ রয়েছে প্রাণ-পরিণামের অন্তরিক্ষলোকে—জীবজগৎ আর অজীব জড়জগতের মাঝামাঝি। কিন্তু এই মধ্যস্থিতিই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা, প্রাণ যদি বিশ্ব-শক্তির সেই সংবেগ হয়, জড় হতে অঙ্কুরিত হয়ে যা মনের লীলায় মঞ্জরিত হচ্ছে, তাহলে জড় আর মনের মাঝে এমন-একটি মধ্যলোকের সম্ভাবনাই তো প্রত্যাশিত। তা-ই যদি হয়, তাহলে মানতে হবে, প্রাণ জড়ের মধ্যেই সুপ্ত বা মগ্ন হয়ে ছিল—জড়ত্বের অবচেতন কি অচেতন তমোঘনতার গভীরে। কোথা হতে তার আবির্ভাব হল ? জড় হতে প্রাণের বিবৃত্তি মানতে গেলেই জড়ের মধ্যে তার প্রাক্তন সংবৃত্তি মানতে হয়। নইলে বলতে হয়, প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের এই অতর্কিত আবির্ভাব একটা অহৈতুক ইন্দ্রজাল। তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে হয় অসৎ হতে, কিংবা জড়ের কোনও প্রক্রিয়া-বিশেষ হতে (যদিও কোনও জড়প্রক্রিয়াতে তার এতটুকু আভাস নাই), অথবা প্রাণেরই সগোত্র কোনও জড়ভূত হতে। আবার এমনও কল্পনা করা চলে, প্রাণ এসেছে স্থূল বিশ্বের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত জড়াতীত কোনও ভূমি হতে। প্রথম দুটি সিদ্ধান্তকে কল্পনার খেয়াল ভেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে। শেষ সিদ্ধান্তটি যুক্তিসিদ্ধ কল্পনার অনুকূল ব'লে তবুও সম্ভবপর। তাছাড়া মরমীয়ার রহস্যদৃষ্টি বলে, জড়ভূমির ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনও প্রাণলোকের আবেশে পৃথিবীর বুকে ফুটেছে প্রাণের অরুণ ছটা। কিন্তু তবু, জড়ের মধ্যে প্রাণ জেগেছে জড়েরই অবশ্যম্ভাবী আদ্যচ্ছন্দরূপে—একথা মানতে বাধা নাই। কারণ, জড়ভূমির ঊর্ধ্বে প্রাণলোক আছে বলেই জড়ের আধারে প্রাণ ফুটবে না, যদি অচিতির মধ্যে আত্মরূপায়ণের পর্বে-পর্বে চিৎসত্তার যে-অবতরণ, প্রাণলোক তার সন্ধিভূমি বা আশয় না হয়। তাইতো চিৎসত্তার সমস্ত বীর্য বীজরূপে জড়ের মধ্যে নিহিত—পরিণামের ধারা ধরে আবার উন্মিষিত হবে বলেই। এমনি আত্মনিগূহন ছাড়া আত্ম-উন্মেষ কখনও সম্ভব নয়। জড়ের মধ্যে নিগূহিত প্রাণের সূচনা কখনও অব্যাকৃত বা অপরিণত, কখনও-বা নিষুপ্ত প্রাণ বাইরে কোনও লেখাই ফুটিয়ে তোলে না। কিন্তু তার সার্বভৌম অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে এইধরনের লক্ষণবিচারের খুব বেশী প্রয়োজন আছে কি ? যে-জড়শক্তির মধ্যে দেখি সঙ্কলন ব্যাকৃতি ও বিকলনের* লীলা,

* জীবপ্রকৃতির জন্ম পুষ্টি আর মরণ বাইরে থেকে দেখতে গেলে জড়প্রকৃতির সঙ্কলন ব্যাকৃতি ও বিকলনেরই শামিল, যদিও তার ভিতরের ক্রিয়া ও তাৎপর্য আরও সূক্ষ্ম এবং গভীর। রহস্য-দর্শনের রায় মানলে বলা চলে, চৈত্যপুরুষের জীবদেহ আশ্রয় করার ব্যাপারটাও বাইরে-বাইরে একই রকম। জন্মের পূর্বে চিৎকেন্দ্ররূপে জীব অন্নময় প্রাণময় এবং মনোময় কোশের উপাদান ও বৃত্তিসমূহকে প্রথমে আকর্ষণ ও সঙ্কলন করে নিজের মধ্যে। তারপর নবজন্মে তাদের ব্যাকৃত ক'রে জীবদ্দশায়

সেও কিন্তু ভূমিভেদে ওই একই মহাশক্তি—যে দুলছে প্রাণের ছন্দে বিশ্ব জুড়ে জন্ম পুষ্টি ও মরণের তরঙ্গে। এমনি করেই তো স্বপ্নসঞ্চারী অবচেতনায় নিগূঢ় থেকেও বুদ্ধির লীলায় সে প্রমাণ করে, জাগ্রত চেতনায় সে-ই মন হয়ে ফুটেছে। তার এই ধরন দেখে মনে হয়, প্রাণ ও মনের অনুন্মিষিত যত বীর্য, সমস্তই ভ্রূণরূপে তার গর্ভাশয়ে শয়ান রয়েছে, এখনও তারা বিশিষ্ট ব্যাকৃতি বা পরিণামের ধারা ধরে জেগে ওঠেনি।

পরমাণু হতে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্র তাহলে স্বরূপত এক অখণ্ড প্রাণের প্রকাশ। সত্তার যে প্রকৃতি ও পরিণাম অবচেতন হয়ে আছে পরমাণুর মধ্যে, পশুতে তা-ই পেয়েছে চেতনার মুক্তি। উদ্ভিদজীবন দুয়ের মাঝে পরিণামের একটা মধ্যপর্ব শুধু। বস্তুত প্রাণ চিৎশক্তিরই এক বিশ্বব্যাপী লীলা—অন্তরে-বাইরে থেকে জড়ের 'পরে চলছে যার নিগূঢ় শাসন। এই প্রাণই আকৃতি বা বিগ্রহের সৃষ্টি পুষ্টি ও ধ্বংস দ্বারা আবার তাদের নতুন করে গড়ে তোলে, নাড়ীতন্ত্রে সঞ্চারিত সঞ্চেতনী শক্তির উজান-ভাটায় চেতনার সাড়া জাগায় আধারে-আধারে। তার এই বোধনলীলার তিনটি পর্ব আছে। আদি-পর্বে, জড়ের নিষুপ্তিতে যেন কাঁপন ধরেছে পরিপূর্ণ অবচেতনার ঘোরে—একেবারে সম্মূঢ় যন্ত্রাবর্তনের মত। মধ্যপর্বে দেখা দিয়েছে একটা অস্পষ্ট অবমানস সাড়া—আমরা যাকে চেতনা বলি, তার সে কাছাকাছি। আর অন্ত্যপর্বে প্রাণিদেহে ফুটেছে মনশ্চেতনা, যেখানে বোধের অনুলিপি আঁকা হয় মনের পটে এবং তাহাতে ধীরে-ধীরে ইন্দ্রিয়মন ও বুদ্ধির বনিয়াদ গড়ে ওঠে। এই মধ্যপর্বেই সাধারণত আমরা জড় ও মন হতে বিবিক্ত প্রাণের পরিচয় পাই। কিন্তু বস্তুত প্রত্যেক পর্বে ছিল একই অখণ্ড প্রাণের লীলা—মনঃসত্তা ও জড়সত্তার সেতুরূপে। প্রতিপর্বেই সে জড়ের উপাদান এবং মনের আশয়। চিৎশক্তির লীলা হয়ে প্রাণ যে শুধু রূপধাতুকে গড়ে তুলছে তা নয়। অথবা শুধু মনের বৃত্তিরূপে রূপধাতুকে সে যে প্রজ্ঞানের বিষয় করছে, তাও নয়। বরং বলা চলে, প্রাণ যেন চিৎসত্তার তেজোময় বিচ্ছুরণ, যা রূপ-ধাতুর সাক্ষাৎ কারণ ও আধার হয়ে তবেই সচেতন মানস-প্রজ্ঞানের অবান্তর কারণ এবং আধার হয়েছে। চিৎসত্তার এই অবান্তরব্যাপাররূপেই প্রাণ বোধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সিসৃক্ষার সেই নিগূঢ় বীর্যকে মুক্তি দেয়, সত্তার স্বরূপ-ধাতুতে যার স্পন্দমান আকৃতি নিলীন ছিল। এমনি করে প্রাণের প্রভাবে সত্তার সেই প্রজ্ঞানের লীলা মুক্তি পায়, যা আমাদের মধ্যে ধরে মনের রূপ। প্রাণই আবার মনের মধ্যে এমন এক সাধনসংবেগ সঞ্চারিত করে, যার ফলে

পুষ্টি ঘটায়। অবশেষে মরণের সময় সংকলিত স্কন্ধকে বিকলিত ক'রে তাকে ছেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্তঃশক্তিসমূহকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে আবার তাদের সঙ্কলিত করে। এমনিভাবে জন্মজন্মান্তর ধরে চলে একই ধারার পুনরাবৃত্তি।

শুধু নিজের বৃত্তি নয়, প্রাণ ও জড়ের বিচিত্র রূপ নিয়েও তার কারবার চলে। জড় আর মনের যোগাযোগকে প্রাণই বজায় রাখে দুয়ের সেতু হয়ে। সে-যোগাযোগের সাধন হল জীবদেহের নাড়ীতন্ত্রে ছন্দিত প্রাণের অবিরাম বিদ্যুন্ময় প্রবাহ, যা রূপের শক্তিকে বোধে রূপান্তরিত করে যেমন মনের বিপরিণাম ঘটায়, তেমনি মনের শক্তিকে ইচ্ছায় রূপান্তরিত করে ঘটায় জড়ের বিকার। তাইতো প্রাণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি নাড়ীর এই সামর্থ্য। এদেশের দর্শনও একেই প্রাণশক্তি বলেছে। কিন্তু নাড়ীর সামর্থ্য শুধু পশুর দেহে প্রাণের রূপ। অথচ এই প্রাণ অখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে আছে সকল রূপে— এমন-কি পরমাণুর মধ্যেও। কেননা, বিশ্বের সর্বত্র তার স্বরূপ এক, সর্বত্র সে এক চিৎশক্তির লীলা। এক মহাশক্তিই তার আত্মবিভূতির রূপধাতুকে ধরে আছে ফুটিয়ে তুলছে বিপরিণামের বিচিত্র ছন্দ। সে-শক্তি মূঢ় বা অবচেতন নয়। বোধ ও মনের নিগূঢ় স্পন্দন জেগে আছে তার মধ্যে—যদিও রূপের মধ্যে তাদের প্রথম আভাস অন্তর্গূঢ়, স্ফুরত্তার আকূতিতে টলমল, কিন্তু চরম প্রকাশ স্বচ্ছন্দ। এই তো সর্বগত মহান্ প্রাণের অখণ্ড তাৎপর্য। জড়বিশ্বের সে-ই স্রষ্টা এবং অন্তর্যামী ধাতা।

বিংশ অধ্যায়

মৃত্যু কামনা ও অশক্তি

অগ্রে......মৃত্যুনৈবেদম্ আবৃতম্ আসীৎ। অশনায়া হি মৃত্যুঃ। তন্ মনো হকুরুত, আত্মন্বী স্যাম্ ইতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।২।১

প্রথমে সব-কিছু আবৃত ছিল মৃত্যুর দ্বারা; বুভুক্ষাই মৃত্যু; নিজের প্রয়োজনে সে সৃষ্টি করল মন—'আত্মবান্ হব আমি' এই ভেবে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।২।১)

স মর্ত্যং পুরুস্পৃহং বিদদ্ বিশ্বস্য ধায়সে।
প্র স্বাদনং পিতৃণাম্ অস্ততাতিং চিদায়বে॥

ঋগ্বেদ ৫।৭।৬

এই তো সেই বীর্য, মর্ত্য যাকে খুঁজে পেল, বহুবিচিত্র স্পৃহা তার বিশ্বকে জড়িয়ে ধরবে বলে; সকল অন্নের নেয় সে স্বাদ, আবার ঘরও বাঁধে জীবের তরে।

—ঋগ্বেদ (৫।৭।৬)

আগের অধ্যায়ে প্রাণকে দেখেছি অন্নময় ভূমি হতে। বুঝতে চেয়েছি কি করে সে জড়ের মধ্যে জাগল, কি ধারায় সেখানে চলল প্রাণনের লীলা। তার জন্য আমাদের এই নিত্যপরিণামী পার্থিবলোক হতেই তথ্য আহরণ করেছি। তাতে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে—প্রাণের আবির্ভাব যেখানেই হ'ক, যেমন পরিবেশে যে-ধারা ধরেই চলুক তার কাজ, তত্ত্বত সর্বত্র তার এক অখণ্ড স্বরূপ। প্রাণ বিশ্বব্যাপী সেই মহাশক্তি যা বিশ্বের রূপধাতুকে সৃষ্টি করছে, বীর্যাধানদ্বারা পুষ্ট করছে, আবার ভেঙে-চুরে নতুন করে তাকে গড়ছে। ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত এক চিৎ-তপস তার অনাদি স্বরূপ, বিগ্রহে-বিগ্রহে চলছে তার অন্যোন্যবিনিময়ের লীলা। আমরা আছি জড়ভূমিতে। মন সেখানে প্রাণের মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে অবচেতনার আচ্ছাদনে—যেমন অতিমানস অন্তর্গূঢ় রয়েছে অবচেতন মনের মণিকোঠায়। আবার প্রাণসংবেগের এই অব্যক্ত চেতনাও সংবৃত্ত মনের অবচেতনাকে নিয়ে জড়ের মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে। তাই মনে হয়, যেন জড়ের ভিত্তিতেই এখানে সবার শুরু। উপনিষদের ভাষায়, 'পৃথিবী পাজস্যম্'—পৃথিবীই যেন আমাদের খুঁটি। বিদ্যুৎ-ব্যূহরূপী পরমাণুর ব্যাকৃতিতে জড়বিশ্বের পত্তন। অথচ ওই পরমাণুতেই রয়েছে এক অবচেতন কামনা ইচ্ছা ও বুদ্ধির অব্যাকৃত আকূতি। জড়ের বুকে প্রাণের আভাস জাগে—নিজের মধ্যে বন্দী মনকে জীবদেহের সহায়ে সে চায় মুক্তি দিতে। আবার মনেরও আছে অতিমানসকে মুক্তি দেবার দায়—যে-অতিমানস

নিগূঢ় রয়েছে তার সকল বৃত্তির অন্তরালে। কিন্তু এ তো গেল এই লোকের কথা। এমন লোকও কল্পনা করতে পারি, যার গড়ন অন্যরকম। সেখানে আদিতে মন সংবৃত্ত নয়, আপন স্বধার বীর্যে সচেতন হয়েই সে রূপধাতুর নতুন লীলা ফোটাতে পারে—এখানকার মত অবচেতনার কুহেলিকায় স্খলিত-চরণে তার যাত্রা শুরু হয় না। এমন কামজগতের ধারা এ-জগৎ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও সেখানে মন আর রূপের মধ্যে প্রাণই শক্তিলীলার বাহন হবে। এমন-কি লীলাভঙ্গির পূর্ণ বিপর্যয়েও শক্তির স্বরূপের বিপর্যয় কোনখানেই ঘটবে না।

তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায়, মন যেমন অতিমানসের অন্ত্য বিভূতি, প্রাণও তেমনি চিৎ-তপসের অন্ত্য বিভূতি—যার বিসৃষ্টি ও বিশেষণ ঘটছে সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের প্রশাসনে। শক্তিস্বরূপ যে-চৈতন্য, তা-ই পরমার্থ-সতের স্বীয়া প্রকৃতি। এই চিন্ময় সন্মাত্র নিজেকে যখন জ্ঞানময় তপের সৃষ্টিলীলায় প্রকট করেন, তখন তাকেই বলি সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান অথবা অতিমানস। এই অতিমানস কবিক্রতুকে বলতে পারি চিৎ-তপসের স্বতঃস্ফুরণ—যাহতে অখণ্ডের বিচিত্র রূপের বিলাস ফোটে ঋতসুষমার ছন্দোলীলায়, আমরা যাকে জগৎ বা বিশ্ব নাম দিয়েছি। তেমনি মন এবং প্রাণও সেই চিৎ-তপস বা কবিক্রতুর রূপায়ণ। কিন্তু এদের মধ্যে চলছে তার রূপবৈশিষ্ট্যের বিবিক্ত লীলা। প্রত্যেকটি রূপ এবার নিজস্ব সীমার রেখায় ঘেরা, সংঘাত ও বিরোধের ভিতর দিয়েই ঘটছে তাদের অন্যোন্যাবিনিময়। তাই প্রতি আধারে পুরুষ এবার ফুটিয়ে তুলছে অপর হতে আপাত-ব্যাবৃত্ত একটি বিশিষ্ট মন এবং প্রাণ। কিন্তু বস্তুত তারা ব্যাবৃত্ত নয়, একরস তত্ত্বের বিচিত্র রূপায়ণে একই অখণ্ড চেতনা মন ও প্রাণের তারা লীলায়ন। কথাটা এই : আমরা জানি, সর্বসংজ্ঞানী ও সর্বপ্রজ্ঞানী অতিমানসের ব্যষ্টিলীলার চরম পর্বে দেখা দিয়েছে মন—যাকে আশ্রয় করে তার চেতনা প্রতি ব্যষ্টি-আধারে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যায় এবং বিশ্বের সকল সম্বন্ধকে সেই দৃষ্টির অধীন করে। তেমনি প্রাণকে বলতে পারি, চিৎপুরুষের স্বরূপশক্তির অন্ত্যাবিভূতি—বিশ্বব্যাপী অতি-মানসের সর্বধারক ও সর্বকারক দিব্যক্রতুর চিন্ময় বিলাস। এই প্রাণের লীলাতেই ব্যষ্টি আধারের পুষ্টি ও বীর্যাধান হয়, চলে তাদের গঠন এবং পুনর্গঠন। ভূতে-ভূতে একে ভিত্তি করেই চেতনবিগ্রহের সব প্রবৃত্তি স্ফুরিত হয়। প্রাণ বস্তুত ব্রহ্মের তপোবীর্য—ঘটে-ঘটে যেন সে বিদ্যুদাধারে নিত্য-উপচীয়মান রূপের বিদ্যুৎপুঞ্জ। বিকর্ষণের লীলায় সে যেমন প্রহত বিচ্ছুরিত হয় চারদিকের বস্তুরূপের 'পরে, তেমনি সঙ্কর্ষণের লীলায় আবার চারদিক হতে নিজের মধ্যে টেনে আনে বিচিত্র প্রাণের অভিঘাত, প্লাবিত-অনুষিক্ত হয় বিশ্বপরিবেশের অবিরাম ধারাবর্ষণে।

এইভাবে দেখলে প্রাণকে মনে হয় চৈতন্যের একটা তপোময় রূপ—সে যেন জড়ের 'পরে মনের ক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক অবান্তরব্যাপার মাত্র। এক অর্থে সে যেন মনের তপোবিভূতি—যা দিয়ে বিশ্বধাতু হতে মন রূপের বিসৃষ্টি ঘটায়, বোনে রূপের জাল। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে মন একটা বিবিক্ত পদার্থ নয়, তার পিছনে অখন্ড অতিমানসের আবেশ রয়েছে। বস্তুত অতিমানসই মনকে সৃষ্টি করেছে ব্যষ্টিভাবনার অন্ত্যপর্বরূপে। তেমনি প্রাণও একটা স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নয়—অখন্ড চিৎশক্তির প্রবেগ তার পিছনে, তার সকল প্রবৃত্তিতে প্রচ্ছন্ন আছে। বস্তুত বিশ্বের বিসৃষ্টিতে আছে একমাত্র চিৎশক্তির অবিনাভূত বিচ্ছুরণ। মন ও দেহের মাঝে প্রাণ হল চিৎশক্তির অন্ত্যবিভূতি। অতএব প্রাণের সকল পরিচয়েই তার আশ্রয়তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকবে। বাস্তবিক প্রাণের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির কোনও খবরই আমরা জানতে পারি না, যতক্ষণ না তার অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির স্বরূপটি আমাদের চেতনায় ভেসে ওঠে—কেননা প্রাকৃত প্রাণ ওই শক্তির বহিরঙ্গ বিভূতি ও সাধন মাত্র। প্রাণের এই নিগূঢ় সত্যরূপকে চিনলেই আমরা নিজেকে জানি ব্রহ্মের জীববিগ্রহ বলে, বিশ্বলীলায় তাঁর মনোময় ও অন্নময় সাধন বলে। তখন তাঁর দিব্যক্রতুকে বিজ্ঞানচক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করে এই জীবনেই তার সার্থক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারি। তখনই অবিদ্যাচেতনার কুটিল ধৃতিকে পরিহার করে প্রাণ ও মন চলতে পারে সত্যধৃতির নিত্য-উপচীয়মান অধ্বরগতির পথে। মনকে যেমন অতিমানসের সঙ্গে অবিদ্যার কল্পিত বিচ্ছেদ ভুলে সচেতন যোগে যুক্ত হতে হয়, তেমনি প্রাণকেও সচেতন হতে হবে তার অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির সম্পর্কে—জানতে হবে, এ-জীবনে কি তার আকৃতি, কি তার তাৎপর্য। আজ সে দিব্য আকৃতির কোনও সন্ধানই সে রাখে না, কেননা তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত শুধু বেঁচে থাকার প্রয়াসে—যেমন আমাদের মন ব্যস্ত আছে শুধু প্রাণ আর জড়কে নিজের রসে জারিত করবার কাজে। তাই প্রাণের সকল প্রবৃত্তি তার নিজের কাছেও তমোগূঢ়। দিব্য আকৃতির প্রশাসনকেই সে মেনে চলে, কিন্তু চলে অবিদ্যার আঁধারে আঁধা হয়ে—সিদ্ধবীর্যের প্রমুক্তিতে ভাস্বর হয়ে নয়, অথবা স্বয়ম্ভূর প্রজ্ঞা বীর্য ও আনন্দের স্বচ্ছন্দ লীলায় নয়। অথচ তা-ই কিন্তু তার দিব্য নিয়তি।

বস্তুত প্রাণ আমাদের মধ্যে মনের তমসাচ্ছন্ন খণ্ডনবৃত্তির অধীন বলে নিজেও খণ্ডিত এবং আঁধারে-ছাওয়া হয়ে রয়েছে। তাই মৃত্যু সংকোচ দৌর্বল্য সন্তাপ ও অন্ধপ্রবৃত্তি দ্বারা সে লাঞ্ছিত। তার এই লাঞ্ছনার মূলে আছে পাশবদ্ধ সঙ্কুচিত সৃষ্ট-মনের আড়ষ্টতা। পূর্বেই দেখেছি, আত্ম-অবিদ্যার পাশে জড়িত জীবাত্মার আত্মসংকোচ এই বিপর্যয়ের কারণ। অন্যব্যাবৃত্ত আত্মকুণ্ডলনের ফলে নিজেকে সে একটা স্বয়ম্ভূ বিবিক্ত ব্যক্তিসত্তা বলে জানে।

তাই বিশ্বলীলার শুধু সেই রূপটিই সে চেনে, যা কেবল তার ব্যষ্টিচেতনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা জ্ঞান শক্তি ও সম্ভোগের সীমিত ভাবনায় ফোটে। একথা সে ভুলে যায়, অখণ্ডের সে চিদ্-বিভূতি, অতএব তার সত্তা ছড়িয়ে আছে নিখিল বিশ্বে—বিশ্বের সকল চেতনা সকল জ্ঞান সকল ইচ্ছা সকল শক্তি ও সকল সম্ভোগে তার অব্যাহত আবেশ। তাইতো মনের কারায় বন্দী জীব-চেতনার এই সঙ্কীর্ণ শাসন মেনে আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রাণও তার স্বরূপ ভুলে নিজেকে বন্দী করে ব্যষ্টি প্রবৃত্তির নিগড়ে। তাকে ঘিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যে উদার প্রাণোচ্ছলন, তার প্রবেগ ও অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করতে সে পারে না। তাই নিজের বিবিক্তলীলায়, সঙ্কুচিত সামর্থ্যের দৈন্য নিয়ে অবশ হয়ে আপনাকে সে তার কাছে সঁপে দেয়। বিশ্বশক্তির যে বিপুল অন্যোন্যসংঘাত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিনিয়ত আলোড়িত করছে, তার মধ্যে ব্যক্তি-সত্তার কার্পণ্যোপহত স্বভাব নিয়ে প্রাণ প্রথমত অসহায়ভাবে সয়ে যায় তার প্রচণ্ড উদ্দাম শাসন। যা-কিছু তার 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে গ্রাস করে সম্ভোগ করে তাড়িয়ে ফেরে হাজার প্রয়োজনে, শুধু যন্ত্রমূঢ়ের মত সে সাড়া দেয় তার সকল অভিঘাতে। কিন্তু চেতনার পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে নিষুপ্ত সংবৃত্তির অসাড় অন্ধকার হতে ধীরে-ধীরে ব্যক্তিসত্তায় যখন ফোটে স্বয়ং-জ্যোতির অরুণিমা, তখন আত্মবীর্যের একটা অস্পষ্ট বোধ সঞ্চারিত হয় তার মধ্যে। তাই সে তখন প্রথমত নাড়ীতন্ত্র দিয়ে, তারপর মন দিয়ে বিশ্বের শক্তিলীলাকে আপন বশে আনতে চায়, তাকে খাটাতে চায় আপন সম্ভোগের প্রয়োজনে। এই বীর্যের উদ্বোধনে ক্রমে আত্মচেতনারও উদ্বোধন হয়। কেননা, প্রাণই শক্তি, শক্তিই বীর্য, বীর্যই ক্রতু এবং ক্রতু ঈশ্বরচৈতন্যেরই ঈশনার লীলা। ব্যক্তির মধ্যেও তাই প্রাণের গভীর গহনে ক্রমে এই বোধ জেগে ওঠে—সচ্চিদানন্দের সত্যসঙ্কল্পের যে অবন্ধ্য সংবেগ বিশ্বের শাস্তা, সে-ই তার স্বরূপ। অতএব তারও মধ্যে ব্যক্তিজগৎকে আপন শাসনে আনবার অভীপ্সা জাগে। আত্মবীর্যের অপরোক্ষ অনুভব এবং নিজের জগৎকে জেনে তার 'পরে অক্ষুণ্ণ বশীকার—এই তো ব্যষ্টিপ্রাণের উপচীয়মান নিত্য আকূতি। ব্রহ্ম যে বিশ্বরূপে নিজেকে ধীরে-ধীরে ফুটিয়ে তুলছেন স্বমহিমার পূর্ণতায়, জীবের ওই আকূতিতেই আমরা পাই তার মর্ম-পরিচয়।

সত্য বটে, প্রাণ বীর্যস্বরূপ এবং ব্যষ্টিপ্রাণের পুষ্টিতে ব্যষ্টিচেতনার বীর্যই পুষ্ট হয়। তবু ব্যষ্টিপ্রাণের খণ্ডভাব তার শক্তিকে দীন করে, তার ঈশনাকে করে কুণ্ঠিত। নিজের জগতের ঈশ্বর হবার অর্থই হল সর্বশক্তির ঈশ্বর হওয়া। কিন্তু চেতনা যেখানে খণ্ডিত ও ব্যষ্টিভূত, শক্তি ও সঙ্কল্পেও সেখানে দেখা দেবে ব্যষ্টিভাবের খণ্ডতা ও সঙ্কোচ। অতএব সে-চেতনার পক্ষে সর্বশক্তির ঈশান হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সর্বক্রতুই সর্বেশ্বর

হতে পারেন। ব্যষ্টিজীবের পক্ষে সে-পরমৈশ্বর্য যদি সম্ভবও হয়, তাহলেও তার জন্যে তাকে সর্বক্রতুর অতএব সর্বশক্তির পরম সাযুজ্য লাভ করতে হবে। নইলে ব্যষ্টি আধারে ব্যষ্টিপ্রাণ চিরকাল মৃত্যু কামনা ও অশক্তি এই তিনটি উপাধির লাঞ্ছনে কুণ্ঠিত হয়ে থাকবে।

ব্যষ্টিপ্রাণ মৃত্যুকবলিত হয় যেমন তার স্বভাবের বশে, তেমনি বিশ্বরূপা সর্বশক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধবৈশিষ্ট্যের ফলেও। বস্তুত ব্যষ্টিপ্রাণ বিশ্ব-তেজের একটা বিশিষ্ট ধারা। সে-তেজের শতরূপা প্রকৃতির একটি রূপই তার মধ্যে বিশেষ করে ফুটেছে। এমনি করে বিশ্বময় অগণিত রূপের মেলা—বিশিষ্ট দেশ কাল ও অধিকারের আবেষ্টনে : প্রত্যেকে তারা সেই পরম তেজের একটি রশ্মিরেখা—ফুটছে আছে কাঁপছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের বিশেষ ব্রতের উদ্‌যাপনে। দেহের মধ্যে সঞ্চিত প্রাণের যে-তেজ, তাকে প্রতিনিয়ত বিশ্বে ছড়ানো বাইরের তেজোরাশির অভিঘাত সইতে হচ্ছে। অহরহ নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের যেমন সে গ্রাস করছে, তেমনি আবার তাদের দ্বারা গ্রস্তও হচ্ছে। তাই উপনিষদের ভাষায় জড়মাত্রেই 'অন্ন'। 'অন্নভোক্তা অন্নাদ নিজেই আবার অন্ন'—এই হল জড়জগতের বিধান। দেহের মধ্যে যে-প্রাণ পিণ্ডিত, বাহ্যপ্রাণের অভিঘাতে প্রতিমুহূর্তে তার চূর্ণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাহ্যপ্রাণকে গ্রাস করবার সামর্থ্য যদি তার কুণ্ঠিত হয়, কিংবা অপর্যাপ্ত হয় তার পোষণ এবং আপ্যায়ন, অথবা বাহ্যপ্রাণের অন্ন যোগানোর সামর্থ্য কি প্রয়োজনের সঙ্গে তার নিজের অন্নগ্রহণের সামর্থ্যের যদি বৈরূপ্য ঘটে, তাহলেই ব্যষ্টিপ্রাণ আর আত্মরক্ষা করতে না পেরে বাহ্য-প্রাণের কবলিত হয়, অথবা নতুন করে নিজেকে না গড়তে পেরে ক্ষয়ে যায় বা গুঁড়িয়ে যায়। এমনি করে নতুন হয়ে ফোটবার জন্যেই মৃত্যুকে সে বরণ করে নেয়।

শুধু তা-ই নয়। উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে প্রাণ যেমন দেহের অন্ন, দেহও তেমনি প্রাণের অন্ন। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সঞ্চিত প্রাণের যে-তেজ, তা যেমন আধারের গঠন পোষণ ও নবায়নের সকল উপাদান জুটিয়ে আনে বাইরে থেকে, তেমনি প্রতিনিয়ত তার আপন ধাতুর সৃষ্টি ও সঞ্চয়কেও সে আত্মসাৎ করতে থাকে। এই দুটি বৃত্তির মাঝে সাম্যের যদি ন্যূনতা কি ব্যাঘাত ঘটে, অথবা বিচিত্র প্রাণের ধারার ঋতায়নে তালভঙ্গ হয়, তাহলেই দেখা দেয় ব্যাধি এবং ক্ষয়—শুরু হয় ভাঙনের লীলা। তাছাড়া প্রাণের আধারে সচেতন প্রভুশক্তির উপচয়, এমন-কি মনঃশক্তির সমৃদ্ধিও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্যকে অনেকসময় ব্যাহত করে। কারণ এ-অবস্থায় আধারে সঞ্চিত প্রাণের চাহিদা ক্রমে বাড়তে থাকায় প্রাণের আদিম পুঁজি থেকে বাড়তি চাহিদার যোগান দেওয়া অসম্ভব হয়। প্রকৃতির হিসাবে এমনি করে যে-বিপর্যয় ঘটে, নতুন

পুঁজি দিয়ে তাকে সামাল দেবার আগেই দেখা দেয় আয়ুঃক্ষয়কর নানা বিভ্রাট, আধার জুড়ে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। তাছাড়া প্রভুত্বের সূচনাতেই প্রাণের পরিবেশে একটা প্রতিক্রিয়া জাগে। কেননা, সেখানেও এমনসব শক্তি আছে যারা চায় আত্মসম্পূর্তি. অতএব অতর্কিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হয়ে তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমনি করে যেমন ভিতরে তেমনি বাইরের পরিবেশেও সমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, অতএব সেখানে আরও তুমুল একটা সংগ্রামের সূচনা হয়। প্রভুত্বকামী প্রাণের শক্তি যতই প্রবল হ'ক, তবুও অসীমের কোঠায় সে যদি না পেঁছয়, অথবা সৌষম্যের নূতন ছন্দে যদি না বাঁধতে পারে পরিবেশকে, তাহলে বাইরে-ভিতরে সকল বাধা ঠেলে জয়শ্রীকে আয়ত্ত করা সকলসময় সম্ভব হয় না। সুতরাং পরাভূত হয়ে একদিন তাকে ভেসে যেতেই হয় ভাঙনের স্রোতে।

তাছাড়াও একটা কথা আছে। প্রাণবিগ্রহের প্রকৃতি ও আকৃতিতে আছে এক অনাদি প্রয়োজনের তাগিদ—সান্তের ভূমিকায় সে অনন্তের আস্বাদন চায়। কিন্তু যে-বিগ্রহ এই আস্বাদনের সাধন হবে, তার কাঠামোটাই যখন পূর্ণভোগের সম্ভাবনাকে সীমিত করে, তখন তাকে ভেঙে-চুরে নূতন ভোগায়তন গড়ে তোলা ছাড়া প্রাণের আকৃতি সার্থক হবার আর তো কোনও উপায় নাই। পুরুষ খণ্ডিত দেশে-কালে আপনাকে কুণ্ডলিত ক'রে একবার যখন সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে, তখন আনন্ত্যকে ফিরে পেতে তাকে অনুবৃত্তি বা পারম্পর্যের যোজনা আশ্রয় করতেই হয়। ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে জুড়ে এক দীর্ঘায়িত ক্ষণসন্তানের মধ্যে সে সঞ্চয় করে তার কালিক অনুভব এবং তাকে বলে তার অতীত। সেই কালের মধ্যে থেকে সে সঞ্চরণ করে বিচিত্র দেশ বিচিত্র অনুভব বা বিচিত্র জীবনের পরম্পরায়—পর্বে-পর্বে গেঁথে তোলে তার শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের সঞ্চয়। তার অবচেতন বা অতিচেতন স্মৃতিতে এমনি করে অতীতের উপার্জন আশয়রূপে তিলে-তিলে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে। এই ধারায় চলতে গেলে কায়ের পরিবর্তন একান্তই আবশ্যক। কিন্তু পুরুষ যেখানে ব্যষ্টি-আধারে সংবৃত্ত হয়ে আছে, সেখানে কায়াবদলের অর্থ হল আধারের ধ্বংস বা বিশরণ—জড়বিশ্বে অনুস্যূত বিশ্বপ্রাণেরই অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে। বিশ্বপ্রাণ যেমন আধারের উপাদান যোগায়, তেমনি সে-উপাদানের 'পরে তার দাবিকেও শিথিল করে না। কেননা, অন্ন ও অন্নাদের অন্যোন্যবুভুক্ষায় সংক্ষুব্ধ জগতে শরীরী প্রাণকে বাঁচতে হবে লড়াই করে—আঘাত সয়ে, আঘাত দিয়ে। এইতেই দেখা দেয় বিশ্বপ্রাণের কল্পিত মৃত্যু-বিধান।

অতএব মৃত্যুর প্রয়োজন ও সার্থকতা এইখানে : প্রাণেরই একটা ভঙ্গিমা সে—তার প্রতিষেধ নয়। জগতে মৃত্যুর প্রয়োজন আছে, কেননা সান্ত জীব-

বিগ্রহের অমৃত-অভীপ্সা একমাত্র অন্তহীন কায়পরিবর্তন দ্বারাই সার্থক হতে পারে। আর সে-বিগ্রহে সংবৃত্ত সান্ত-মনের মধ্যেও আনন্ত্যের ভাবনা রূপ পায় একমাত্র অনুভবের শাশ্বত ক্ষণভঙ্গে। কিন্তু কায়াবদল যদি একই রূপাদর্শের অবিচ্ছিন্ন আবৃত্তি হয়—যেমন দেখি জীবন ও মরণ দিয়ে ঘেরা জীবের একটি জন্মের বেষ্টনীতে—তাহলে কিন্তু প্রাণের ভোগৈশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা পুরাপুরি মিটতে পারে না। কারণ, রূপাদর্শের বদল না হলে, অনুভবিতা মন দেশ-কাল-পরিবেশের নূতন পরিস্থিতিতে নূতন আধারের আশ্রয় না পেলে, স্বভাবতই দেশ-কালের ভূমিকায় অনুভবের যে-বৈচিত্র্য একান্ত প্রত্যাশিত ছিল, তার সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই জীবন জুড়ে মৃত্যুর প্রলয়তাণ্ডব, এইজন্য প্রাণই অন্নাদ হয়ে গ্রাস করছে প্রাণকে। কিন্তু মর্ত্যচেতনায় আমরা স্বাতন্ত্র্যহীন নিয়তিতাড়িত দ্বন্দ্ববিধুর দুঃখহত একটা আপাতপ্রতীয়মান অনাত্মসত্তার শাসনে জর্জরিত। তাই মরণরূপে রূপান্তরের এই শিবময় বিধানও আমাদের কাছে একটা অবাঞ্ছিত বিভীষিকা। মৃত্যু আমাদের সত্তাকে গ্রাস করে, বিচূর্ণ-বিধ্বস্ত করে, ছিনিয়ে নেয় মমতার বাঁধন ছিঁড়ে—তাই মৃত্যুর দংশনে এত জ্বালা। মৃত্যুর পরেও লোকান্তরে বেঁচে থাকব, এ-আশ্বাসেও সে-জ্বালাকে তাই সইতে পারি না।

কিন্তু এও দেখেছি, অন্ন ও অন্নাদের অন্যোন্যবুভুক্ষাতে জড়ের মধ্যে প্রাণের রূপ ফুটল। মৃত্যুর লীলা তারই একটা অপরিহার্য বিধান। উপনিষদ বলেন, প্রাণের লীলা 'অশনায়া মৃত্যুঃ' অর্থাৎ মরণের বুভুক্ষু রূপ এবং এই বুভুক্ষাই সৃষ্টি করেছে জড়ের জগৎ। প্রাণ এখানে নিজেকে ঢালছে জড়ভূতের ছাঁচে। কিন্তু জড়ভূতে রূপ ধরেছে অখণ্ডসত্তার অনন্ত বিভাজন ও সংকলনের পরিস্পন্দ। এই-যে অন্তহীন ভাঙা-গড়ার দুটি প্রবেগ, তার মহাসংগমে জন্ম নিয়েছে বিশ্বের জড়স্থিতি। তার মধ্যে ব্যষ্টিজীব ফুটল প্রাণের পরমাণু হয়ে। সে চায় বাঁচতে, বৃহৎ হতে—এই তো তার সকল আকূতির নিষ্কর্ষ। নিখিল জুড়ে প্রসারিত হ'ক উপচীয়মান অনুভবের সীমা, সব-কিছুকে হাতের মুঠায় এনে নিঃশেষে তার রসপানে মহাপিপাসার ঘটুক তর্পণ—এমনি করে দেহে প্রাণে মনে মনুষ্যত্বের গৌরবে আসুক জোয়ার, এই তো তার অন্তর্গূঢ় স্বরূপসত্তার অনাদি অমোচন অনুত্তরণীয় প্রেতি। কেননা, ব্যষ্টিভাবনায় খণ্ডিত হয়েও তার সত্তায় আছে সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী আনন্ত্যের নিগূঢ় সংবিৎ। সেই নিগূঢ় সংবিৎকে ব্যক্তবোধের দীপ্তিতে ফুটিয়ে তোলার প্রেতিই বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপের মধ্যে এনেছে কামনার উদগ্র প্রবেগ, প্রতি জীবে জ্বালিয়ে তুলেছে দেহবান আত্মার অনির্বাণ আকূতির শিখা। অতএব প্রাণের উপচীয়মান পুষ্টি ও প্রসার দ্বারা সে যে এই আকূতির চরিতার্থতা খুঁজবে, এ যেমন অপরিহার্য, তেমনি ধর্ম্য ও মাংগল্যও বটে।

কিন্তু অন্নময় জগতে এই আত্মসম্পূর্তির সাধনা সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র অন্নাদরূপে পরিবেশকে কবলিত করে, অপরকে বা অপরের বিত্তকে গ্রাস কি আত্মসাৎ করে। জগৎ জুড়ে তাই দেখা দিল মহাবুভুক্ষার সার্থক লীলা। কিন্তু যে অন্নাদ, তাকেও অন্ন হতে হবে। কেননা, অন্নময় জগতে প্রাণের লীলায় আছে অন্যোন্যবিনিময় ও ঘাত-প্রতিঘাতের অলঙ্ঘ্য বিধান এবং তার ফলে ব্যষ্টি-আধারের সীমিত সামর্থ্যের সুনিশ্চিত অবক্ষয় ও পরাভব।

অবচেতনার মধ্যে যা ছিল প্রাণের ক্ষুধা, মনশ্চেতনায় ফোটে তার সমৃদ্ধতর রূপান্তর। প্রাণময়-কোশের বুভুক্ষা মনোবাসিত প্রাণে জাগে কামনার আকৃতি হয়ে, বুদ্ধি- বা মনন-শাসিত প্রাণে সে দেখা দেয় সঙ্কল্পের প্রবেগরূপে। বিশ্বের শাশ্বত বিধানের বশে এই কামনার বেগ অনিরুদ্ধ হয় -যতদিন না ব্যষ্টিজীব পর্যাপ্ত শক্তিসঞ্চয়ের দ্বারা স্বারাজ্যের অধিকার পায় এবং অনন্ত-স্বরূপের উপচীয়মান সাযুজ্যবশত আপন বিশ্বের সাম্রাজ্যকে অধিগত করে। কামনাকে নিমিত্ত করেই চিন্ময় প্রাণ বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পায়। অতএব স্থাণুত্বের সাধনায় কামনার নির্বাণপ্রয়াস সেই দিব্যপ্রাণের মূঢ় নিরাকৃতি মাত্র। এ শুধু অসত্যের প্রতি অভিনিবেশ, অতএব অবিদ্যারই নামান্তর—কেননা ব্যষ্টিত্বের অত্যন্তাভাব অনন্তসমাপত্তির সদ্ভাব ছাড়া কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। তাই কামনার যথার্থ নিবৃত্তি হয়—যখন অনন্তের কামনাতে তার সম্প্রসারণ কিংবা পর্যবসান ঘটে। তখন অনন্ত-স্বরূপের সর্বাবগাহী পূর্ণৈশ্বর্যের আনন্দে ঘটে তার শাশ্বত আত্মসম্পূর্তি, তার যুগান্তব্যাপী আকৃতির সুচির-তর্পণ। আবার এর জন্য অন্যোন্যগ্রাসী বুভুক্ষার সঙ্কুল পথ ছেড়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় উৎসর্গের উদার পথে, আত্মদানের উপচিত আনন্দে সমুজ্জ্বল অন্যোন্যবিনিময়ের সাধনায়। জীব তখন অপর জীবের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে আবার তাদের ফিরে পায় নিজের মধ্যে। ছোট যেমন নিজেকে সঁপে দেয় বড়র কাছে, বড়ও তেমনি ছোটর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আর তাইতে উভয়ের মধ্যে উভয়ের চরিতার্থতা ঘটে। মানুষ যেমন নিজেকে দেবতার কাছে সঁপে দেয়, দেবতাও তেমনি নিজেকে বিলিয়ে দেন মানুষের মধ্যে। ব্যষ্টির অন্তর্গূঢ় সর্বস্বরূপ আপনাকে উৎসর্গ করেন সমষ্টিগত সর্বস্বরূপের কাছে এবং সেই চিন্ময় বিনিময়ে সমষ্টিভাবের সিদ্ধসত্তাকে নিজের সত্তায় ফিরে পান। বিশ্বজোড়া বুভুক্ষার বিধান এমনি করে ক্রমে প্রেমের বিধানে রূপান্তরিত হয়, খণ্ডতার রীতি পর্যবসিত হয় অখণ্ডতার বিধিতে, মৃত্যুর শাসন ধরে অমৃতচ্ছন্দের রূপ। জগৎ জুড়ে ওই যে কামনার বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য—এই তার প্রয়োজন, এই তার সার্থকতা, এই তার আত্মসম্পূর্তির চরম লীলা।

সান্ত চায় অনন্ত অমৃতে আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাই প্রাণ পরেছে মরণের মুখোস।

তেমনি প্রাণের ব্যষ্টি বিগ্রহে অবরুদ্ধ সন্ধিনীশক্তির সংবেগই ধরেছে কামনার রূপ। সে চায় সচ্চিদানন্দের অনন্ত আনন্দকে ফুটিয়ে তুলতে সান্তের ভূমিকায়—কালিক পরম্পরা ও দৈশিক আত্মপ্রসারণের ছন্দোময় প্রগতিতে। ব্রহ্মশক্তির যে-সংবেগ আমাদের মধ্যে কামনার মুখোস প'রে আছে, তা এসেছে প্রাণের তৃতীয় প্রতিভাস হতে—আমরা যাকে অশক্তি বলে জানি। স্বরূপত অনন্ত শক্তি হয়েও প্রাণ সান্ত আধারে ফুটতে চাইছে। অতএব সান্তের মধ্যে ব্যষ্টিভাবের প্রকটলীলায় তার সর্বেশনা পদে-পদে ব্যাহত হয়ে সীমিত সামর্থ্য ও কুণ্ঠিত অনীশতার রূপ ধরে। অথচ ব্যষ্টিজীবের প্রত্যেক কর্ম যত অশক্ত যত অসার্থক যত পঙ্গুই হ'ক, তার পিছনে আছে সর্বেশনাময়ী অনন্তশক্তির পরিপূর্ণ আবেশ—অতিচেতনা ও অবচেতনার নিগূঢ় দীপ্তি নিয়ে। ওই আবেশ ছাড়া বিশ্বের একটি নিশ্বাসও স্পন্দিত হয় না। তার বিশ্বগত সমষ্টিকর্মের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি কর্ম ও স্পন্দন—সর্বান্তর্যামী অতিমানসের সর্ববিৎ সর্বেশনাময় ঋতের শাসনে। কিন্তু ব্যষ্টিপ্রাণ নিজেকে অশক্ত ও সঙ্কুচিত বলে অনুভব করে। কেননা, চলতে গিয়ে প্রতি পদে অন্যান্য ব্যষ্টিপ্রাণের পুঞ্জিত পরিবেশের সঙ্গে তাকে লড়তে হয়। শুধু তা-ই নয়। সমষ্টিপ্রাণের শাসন ও অসহযোগের পীড়াও তাকে ততদিন সইতে হয়, যতদিন আত্মরতির সম্মূঢ় ছলনায় তার অপ্রবুদ্ধ চেতনা সমষ্টির শাশ্বত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই ব্যষ্টিপ্রাণের খণ্ড-লীলায় তার তৃতীয় উপাধি দেখা দেয়—সংবেগের স্তিমিত সঙ্কোচ বা অশক্তির আকারে। অথচ তার সত্তার গহনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মপ্রসারণ ও সর্বগ্রসনের প্রেতি, যা তার বর্তমান সংবেগ বা সামর্থ্যের সীমার মধ্যে কিছুতেই নিজেকে সঙ্কুচিত রাখবে না। এমনি করে, ভোগৈশ্বর্যের আকূতি আর ভোগৈশ্বর্যের সামর্থ্য, দুয়ের সংঘাতে জাগে কামনা। আকূতির সঙ্গে সামর্থ্যের বিষম-অনুপাত না থাকত যদি, ভোগের সামর্থ্য যদি সকলসময় ভোগ্য বস্তুকে হাতের মুঠায় পেত, অথবা বিনা আয়াসে নিশ্চিত সিদ্ধির নাগাল পেত, তাহলে কামনার এতটুকু আভাসও কোথাও ফুটত না, নিখিল জুড়ে থাকত শুধু স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যসঙ্কল্পের আকূতিহীন প্রশান্তি—আপ্তকাম ব্রহ্মের দিব্যক্রতুর মত।

ব্যষ্টি আধারের সামর্থ্য যদি হত অবিদ্যানির্মুক্ত মনের তেজোময় বিচ্ছুরণ মাঝখানে তবে এমনভাবে সীমার সঙ্কোচ বা কামনার প্রবেগ দেখা দিত না। কারণ, অতিমানসের সাযুজ্যবশত বিজ্ঞানের দৈবী সম্পদ রয়েছে যে-মনের, তার প্রত্যেকটি কর্মের অভিপ্রায় অধিকার ও অপরিহার্য পরিণাম সে জানে। অতএব আকূতিতে চঞ্চল অথবা আয়াসে ক্ষুব্ধ না হয়ে আপাতলক্ষ্যের সিদ্ধিতেও সে সুনিরূপিত অথচ সুনিশ্চিত সামর্থ্যের অব্যর্থ প্রয়োগ করে।

এমন-কি তার প্রয়াস বর্তমানকেও যদি ছাড়িয়ে যায়, আপাতসিদ্ধির সম্ভাবনাহীন কর্মভার যদি তাকে তুলে নিতে হয়, তবুও তার মধ্যে কামনা বা সঙ্কোচের দৈন্য দেখা দেয় না। কারণ, পরমদেবতার আপাত-অসিদ্ধিও তাঁর সর্ববিৎ সর্বেশনার লীলা। তিনি জানেন, কোন্ মুহূর্তে কোন্ পরিবেশে তাঁর বিশ্বকর্মের প্রেতি হবে অঙ্কুরিত, বিচিত্র দশাবিপর্যয়ে পল্লবিত এবং আপাত ও চরম সিদ্ধিতে ফলিত। দিব্য অতিমানসের সঙ্গে যোগযুক্ত বিজ্ঞানী মনেও এই সর্ববিৎ ও সর্বনিয়ামিকা ঈশনার আবেশ আছে। কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে ব্যষ্টিপ্রাণের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে শুধু ব্যষ্টিভাবনা ও অজ্ঞান মনের সীমিত বীর্য। সে-মন তার অতিমানস স্বরূপের বিজ্ঞান হতে স্খলিত হয়েছে, তাই বিশ্ববিধানের স্বাভাবিক নিয়মেই অশক্তি তার জীবনের নিত্যসহচর। কারণ, যে-শক্তি অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, সীমিত পরিবেশের মধ্যেও যে সে সর্বেশনার বাস্তব অধিকার পাবে, একথা অকল্পনীয়। তাহলে তার অনৃতময় অহমিকা সর্ববিৎ সর্বেশনার দিব্য কল্পনাকে প্রতিহত করে বিশ্বের ঋতময় বিধানকে বিপর্যস্ত করত—বিশ্বব্যাপারে যা একেবারেই অসম্ভব। অতএব সীমিত শক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও আয়াস দেখা দেয়, তার ফলে সচেতন অথবা অবচেতন বাসনার অনিরুদ্ধ সংবেগে তাদের পরিমিত সামর্থ্যের উপচয় ঘটে এই হল প্রাণধর্মের প্রথম পরিচয়। যেমন বাসনার রীতি, তেমনি এই বিক্ষুব্ধ আয়াসেরও রীতি। এ যেন সগোত্র শক্তিসমূহের মধ্যে একটা সচেতন মল্লযুদ্ধ—পরস্পরের শক্তি-পরীক্ষার দ্বারা পরস্পরের আনুকূল্যসাধন মাত্র। এ-দ্বন্দ্বের ফলে বিজেতা এবং বিজিত, অথবা ঊর্ধ্ব হতে নেমে আসে যে শক্তির ধারা এবং তার প্রতি-ক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে-নিম্নশক্তি—দুয়েরই হয় সমান পুষ্টি, সমান লাভ। এই দ্বন্দ্বই অবশেষে দিব্যভাবের আনন্দরভসোচ্ছলিত অন্যোন্যবিনিময়ে রূপান্তরিত হয়—সংঘাতের উন্মত্ত-নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ পরিণত হয় প্রেমের নিবিড়-ব্যাকুল আলিঙ্গনে। তবু দ্বন্দ্বসংঘাতেই মানবপ্রাণের বিজয়-অভি-যানের অপরিহার্য শিবময় সূচনা। মৃত্যু কামনা আর সংঘাত—খণ্ডিত প্রাণলীলার এই-যে ত্রয়ী, এ সেই বিশ্বজিৎ দিব্যপ্রাণের প্রথমকল্পিত ছদ্মরূপমাত্র।

একবিংশ অধ্যায়

প্রাণের উদয়ন

প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা মনসো ন প্রযুক্তি।......
অগ্নে দিবো অর্ণমচ্ছা জিগাসাচ্ছা উচিষে ধিষ্ণ্যা যে।
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্যস্য যাশ্চাবস্তাদুপতিষ্ঠন্ত আপঃ॥

ঋগ্বেদ ১০।৩০।১; ৩।২২।৩

চলে যাক বাণীর পথ দেব-গণের পানে অপ্-এর পানে যাক সে চলে মনের প্রযোজনায়! ...হে শিখা, দ্যুলোকের অর্ণবের পানে চলেছ তুমি, চলেছ দেবতাদের পানে; সংগত কর দিব্যধামবাসী দেবতাদের সূর্যের ওপারে রয়েছে যে অপ্-এরা, জ্যোতির্লোকে আর অবরলোকেও রয়েছে যারা, তাদের সাথে।

—ঋগ্বেদ (১০।৩০।১; ৩।২২।৩)

তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ত্ সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুঃ...
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি॥

ঋগ্বেদ ৯।৯৬।১৮, ১৯

তৃতীয় ধাম জিনে নেন সেই আনন্দময় মহেশ্বর; বিরাটের আত্মভাবের ছন্দে তাঁর পোষণ ও শাসন; শ্যেনের মত, শকুনের মত আধারে নিষণ্ণ হয়ে তাকে তুলে ধরেন—জ্যোতির বেত্তা তিনি তুরীয় ধামকে করেন প্রকাশ, সংসক্ত হয়ে থাকেন সেই সমুদ্রে, উত্তাল যে অপ্-এর ঊর্মিমালায়।

—ঋগ্বেদ (৯।৯৬।১৮, ১৯)

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্, সমূল্‌হমস্য পাংসুরে।
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ, অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে, বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

ঋগ্বেদ ১।২২।১৭, ১৮, ২০, ২১

তিনটিবার চরণক্ষেপ করলেন বিষ্ণু—নিহিত করলেন তাঁর পদকে অব্যাকৃত পাংশুজাল হতে তুলে ধরে; তিনটি পদক্ষেপ করলেন বিষ্ণু—নিখিলের রক্ষক তিনি অধৃষ্য; ওপার হতে ধরে আছেন তাদের ধর্ম যত। সেই তো পরম পদ, সূরিরা যাকে দেখেন সদা—দ্যুলোকে আতত চক্ষু যেন! তাকেই উদ্ভাসিত জাগ্রত বিপ্রেরা করেন সমিন্ধ—বিষ্ণুর যে পরম পদ, তাকেই।

—ঋগ্বেদ (১।২২।১৭, ১৮, ২০, ২১)

এতক্ষণে এইটুকু বুঝেছি : স্বয়ংজ্যোতির্ময় ব্রাহ্মী চেতনার আপাতদৃষ্ট আত্মপ্রতিষেধই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বনিয়াদ। ওই আত্মপ্রতিষেধের সঙ্গে সে-চেতনার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হল খণ্ডিত মর্ত্য মন দিয়ে -অজ্ঞান সঙ্কোচ ও দ্বন্দ্ববুদ্ধির জনক হলেও যাকে বলা যায় দিব্য অতিমানসের একটা স্তিমিত আ-ভাস। ঠিক এই ধারা ধরে জড়বিশ্বে প্রাণ ফুটেছে -জড়ের গহনে বন্দী

গুহাহিত বিভাজক মনের অবচেতন বিচ্ছুরণরূপে। মৃত্যু বুভুক্ষা ও অশক্তির জনক হলেও প্রাণকে জানি ব্রহ্মের অতিচেতন মহাশক্তির স্তিমিত আ-ভাস-রূপে—যে-শক্তির পরমা বিভূতি ফোটে অনন্ত অমৃতে, নিত্যতৃপ্ত উল্লাসে, অকুণ্ঠ ঈশনায়। অতিচেতনা হতে মর্ত্যচেতনার এই আ-ভাস নিরূপিত করে বিরাটের ব্রহ্মাণ্ডলীলার ধারা—আমরা যার অঙ্গীভূত। এই আ-ভাসের প্রশাসনে আমাদের ক্রমপরিণামের আদি মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিধৃত রয়েছে। প্রাণপ্রকৃতির প্রথম প্রকাশ দেখি খণ্ড-ভাবনায়, অন্ধশক্তিতাড়িত অবচেতন সঙ্কল্পের মূঢ় এষণায়—যাকে সংকল্প না বলে বলা চলে জড়শক্তির উত্তাল অথচ নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস। আধার ও পরিবেশের মাঝে যে অন্যোন্যবিনিময়ের যন্ত্রলীলা, প্রাণ যেন নির্বীর্য হয়ে অসাড়ে নিজেকে তার কাছে সঁপে দিয়েছে। মহাশক্তির এই অচিতি, এই অন্ধ অথচ দুর্ধর্ষ প্রবৃত্তি জড়বিশ্বের সেই রূপ নিয়ে ফুটেছে, জড়বিজ্ঞানীর সঙ্গে যার পরিচয় একান্ত। তাঁর মতে এই জড়ের দর্শনই বিশ্বের তত্ত্বদর্শন, বিশ্বের সকল ব্যাপার এরই অন্তর্গত। আমরা একে বলতে পারি অন্নময় চৈতন্য—অন্নময় জীবনের পরিনিষ্ঠিত রূপ। কিন্তু শুধু জড়-ক্রিয়াতেই তো প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়নি। তাই জড়লীলাকে অতিক্রম করেও ফোটে তার প্রকাশের একটা নতুন ধারা। প্রাণ যতই জড় আধারের নাগপাশ হতে নিজেকে নির্মুক্ত করে, সচেতন মনোলীলার দিকে যতই এগিয়ে চলে তার অভিযান, অভিনবের রূপটি ততই তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফোটে। একে বলতে পারি প্রাণপ্রকৃতির মধ্যবিভূতি। এতে আছে মৃত্যু ও অন্যোন্যকবলনের লীলা বুভুক্ষা ও সদ্যোজাগ্রত কামনার প্রবেগ, সঙ্কীর্ণ প্রসর ও সামর্থ্যের একটা পীড়িত অনুভব, আপনাকে ছড়িয়ে দেবার বাড়িয়ে তোলবার একটা ক্ষুব্ধ আয়াস, বিজিগীষা ও বিত্তৈষণার একটা প্রমত্ততা। একেই আমরা বলেছিলাম মৃত্যু কামনা ও সংঘাতের ত্রয়ী। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদে প্রকৃতিপরিণামের যে-পরিচয় মানুষের প্রথম জ্ঞানগোচর হল, এই কিন্তু তার ভিত্তি। বিশ্ব জুড়ে চলছে একটা বিপুল আয়াসের বিক্ষোভ—এই হল তার মূল কথা। মৃত্যুর মধ্যেও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার ক্ষুব্ধ প্রয়াস আছে—কেননা মৃত্যু প্রাণেরই একটা নেতিরূপ, যার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রাণ তার ইতিরূপের মধ্যে অমৃতত্বের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। তেমনি বুভুক্ষা ও কামনার মধ্যেও দেখি অকুণ্ঠ আত্মতর্পণের নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছবার একটা প্রচণ্ড দুরাগ্রহ—কেননা কামনার প্রমত্ততা দিয়ে প্রাণ চাইছে অতৃপ্ত বুভুক্ষার নেতিরূপ হতে নির্মুক্ত করে তার ইতিরূপকে অনন্তসত্তার নিরঙ্কুশ সম্ভোগের দিকে প্রচোদিত করতে। সামর্থ্যের সঙ্কোচ হতে তেমনি নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, ঈশনা ও সম্ভোগকে কবলিত করবার একটা দুর্দম আয়াস দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রাণ চায় নিজেকে পুরাপুরি পেতে, চায় পরিবেশকে জেনে নিতে—কেননা শক্তির

সঙ্কোচ ও দৈন্য হল প্রাণের নেতিরূপ, যা দিয়ে ইতিরূপের মধ্যে সে পূর্ণতাসিদ্ধির শাশ্বত সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলতে চায়। তাই জীবনসংগ্রাম টিকে থাকবার সংগ্রামই নয় শুধু, তার মধ্যে আছে সর্বগ্রসন ও সর্বসিদ্ধিরও একটা তপস্যা। কারণ, টিকে থাকবার সম্ভাবনা তখনই সুনিশ্চিত হয়, যখন পরিবেশকে আমরা অল্প-বিস্তর হাতের মুঠায় পাই। তার জন্যে নিজেকে কখনও মানিয়ে নিতে হয় তার সঙ্গে, কখনও-বা তোয়াজ করে হ'ক আর জুলুম করেই হ'ক তাকে খাপ খাওয়াতে হয় নিজের সঙ্গে। এইজন্যই সর্বগ্রসন বা বিত্তৈষণাও একটা প্রাণের দায়। সর্বসিদ্ধির এষণাও তেমনি একটা দায়, কেননা নিজের সিদ্ধরূপটি যতই পরিস্ফুট করে তুলব, ততই তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও হবে সুনিশ্চিত অর্থাৎ চিরকাল টিকে থাকবার দাবি তখনই খাটবে। ডার্‌উইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-বাদের মধ্যে এই সত্যের ইঙ্গিতই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

কিন্তু ডার্‌উইনীয় অভিব্যক্তিবাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে একটি সত্য ধরা পড়েনি। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের যে-যন্ত্রলীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জড়বিজ্ঞানী তার অবশ-ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন প্রাণের স্ববশ-স্ফুরণকে—দেখলেন না প্রাণের মধ্যে উন্মিষিত হয়েছে এমন-একটা নূতন তত্ত্ব, যার সার্থকতা হল অবশ যন্ত্রলীলাকে নিজের বশে আনায়। তেমনি ডার্‌উইনীয় মতবাদও প্রাণের মধ্যে যুযুৎসু ভাবটাকেই বড় করে দেখল। জীব-জগতে ব্যষ্টিপ্রাণের স্বার্থোন্ধতাই সত্য, আত্মরক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আততায়ী হয়ে আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তিই জীবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক—এই তার রায়। কিন্তু জড়প্রকৃতিতে ও ইতরজীবের প্রকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে প্রাণধর্মের যে-দুটি বিভূতি, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আরেকটা নূতন তত্ত্ব ও নূতন বিভূতির বীজ—যার অঙ্কুর জাগবে, যখন জড়ের আধারে সংবৃত্ত মন প্রাণতন্ত্রের ভিতর দিয়েই তার স্বধর্মে ফিরে যাবে। আজ প্রাণ যেমন ফুটে উঠছে মন হয়ে, তেমনি মন যেদিন অতিমানস হয়ে ফুটবে, সেদিন প্রাণলোকে আসবে আরেকটা মন্বন্তর। আজ জীবের টিকে থাকবার কিংবা নিত্যপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস পরাভূত হয়েছে মৃত্যুর শাসনে। তাই ব্যষ্টিজীব বাধ্য হয়ে স্থায়িত্বের সন্ধান করে জাতির মধ্যে, ব্যক্তির মধ্যে নয়। তার জন্য তার পরের সহযোগ এবং অন্যোন্যনির্ভর আবশ্যক হয়। নিজের প্রয়োজনেই তার অপরকে চাই—চাই স্ত্রী পুত্র-কন্যা বন্ধু-বান্ধব, চাই গোষ্ঠী, চাই সমাজ। এমনি করে পরস্পরের মেলামেশায়, সচেতন সঙ্ঘবন্ধন ও অন্যোন্যসংমিশ্রণে উপ্ত হয় যে নূতন ভাবের বীজ, তাহতেই একদিন ফোটে প্রেমের ফুল। একথা মানি, প্রেম প্রথমত একটা বড়রকমের স্বার্থ ছাড়া কিছু নয় এবং বহুকাল ধরে চলে এই স্বার্থের জুলুম—এমন-কি সমাজপরিণামের উচ্চতর কোটিতেও তার নিদর্শন আজও

বিরল নয়। কিন্তু মানসপরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে মন যত তার স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই সে জীবনব্যাপী ভালবাসা ও অন্যোন্যানির্ভরের সাধনা হতে বুঝতে পারে, ব্যষ্টির সত্তা নিখিল সত্তার একটা গৌণ বিভূতি মাত্র—বাস্তবিক ব্যক্তি বেঁচে আছে বিশ্বের অঙ্গীভূত হয়ে। একবার যদি মানুষ এ-সত্যের সন্ধান পায়—এবং মানুষের প্রকৃতি মনোময় বলে এ-সত্যের স্ফুরণ তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী—তাহলে তার দিব্য নিয়তি হয় অবধারিত, অনুত্তরণীয়। কারণ, এই ভূমিতে এসেই তার মনে জাগে উন্মনীভূমির আভাস। তারপর থেকে, তার প্রগতি যত-না অস্পষ্ট ও মন্থর হ'ক, ওই উন্মনীভূমিতে, ওই অতিমানসে, ওই অতিমানবতার চিন্ময় প্রতিষ্ঠায় একদিন যে তাকে পেঁছুতে হবে, তার প্রেতি দুর্মোচন রেখায় মুদ্রিত হয়ে যায় তার চেতনায়।

অতএব প্রাণপ্রকৃতির প্রকাশে যে তৃতীয় একটা পর্ব আছে, প্রাণের স্বভাবেই তার অনতিবর্তনীয় সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রাণের এই উদয়নের ধারাকে লক্ষ্য করলে দেখব, নিয়তির বশে প্রাণপরিণামের তৃতীয় পর্ব যদিও তার প্রথম পর্বের একান্ত বিরোধীরূপে দেখা দেয়, তবুও সে ওই আদিপর্বেরই পরিপূর্তি ও রূপান্তর ছাড়া আর-কিছুই নয়। প্রাণের আদিপর্ব শুরু হল বিভাজনবৃত্তির চরম লীলায়, জড়ত্বের আড়ষ্ট-কঠিন রূপাণু নিয়ে। তার প্রতিরূপ আমরা পাই পরমাণুতে, যা নিখিল জড়রূপের ভিত্তি ও প্রতীক। পরমাণু তার সহচরদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও বিযুক্ত থাকে, শক্তির সাধারণ প্রয়োগে তার মৃত্যু এবং প্রলয় ঘটানো কখনও সম্ভব নয়। তাই তাকে বলা চলে বিবিক্ত অহন্তার জড় প্রতীক, যা প্রকৃতির আত্মহারা-সংমিশ্রণের নীতিকে উপেক্ষা ক'রে নিজের সত্তাকে উদগ্র করে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে খণ্ডভাবের মত অখণ্ডভাবও প্রবল। বরং অখণ্ডভাবই তার তত্ত্ব, খণ্ডভাব তার একটা গৌণ বিভাব মাত্র। তাই, যন্ত্রলীলার মূঢ় তাগিদে হ'ক কিংবা আপন খুশিতে পরের প্ররোচনায় কি জবরদস্তিতেই হ'ক, প্রকৃতির যত খণ্ডরূপকে অখণ্ডভাবের কাছে একভাবে না একভাবে নিজেকে সঁপে দিতেই হয়। সুতরাং প্রকৃতি যদিও-বা আপন গরজেই আত্মহারা-সংমিশ্রণের প্রলয়লীলা হতে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পরমাণুকে সাধারণত বাধা দেয় না (কেননা তা নইলে রূপ-সংযোজনের একটা শক্ত কাঠামো বা নির্দিষ্ট রূপবীজ সে কোথায় পাবে), তবুও পুঞ্জভাবের বেলায় ওই সংমিশ্রণের রীতি মানতে পরমাণুকেও সে বাধ্য করে। তাই পরমাণুপ্রচয়ে দেখা দেয় জড়প্রকৃতির প্রথম পুঞ্জভাব। ওই হল তার অবয়বিগঠনের গোড়ার উপাদান।

প্রাণ যখন প্রস্ফুরণের দ্বিতীয় পর্বে পেঁছিয়, আমরা যাকে জানি প্রাণন বা 'জীবনযোনি প্রযত্ন' বলে, তখন তার মধ্যে ফোটে একটা বিপরীত ধারা। অর্থাৎ প্রাণময় অহংএর জড় আধারকে বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয় প্রলয়ের

শাসন। আকারের কাঠামো টুকরা হয়ে তখন ভেঙে পড়ে, যাতে একটি প্রাণবিগ্রহের উপাদানকে রূপান্তরিত করা যায় অন্যান্য বিগ্রহের মৌল উপাদানে। এই ভাঙা-গড়ার খেলার পূর্ণ পরিচয় আজও আমরা পাইনি, কেননা অন্নময়-প্রাণ ও জড়ের বিজ্ঞান আমাদের যতখানি আয়ত্ত হয়েছে, মনোময়-প্রাণ ও চিৎসত্তার বিজ্ঞান এখনও ততখানি দখলে আসেনি। তবুও মোটামুটি এইটুকু বোঝা যায় : শুধু জড়দেহের উপাদানই নয়, সূক্ষ্ম প্রাণময় কোষের যেসব উপাদান -আমাদের প্রাণ ও বাসনার সূক্ষ্মতেজ, আমাদের বীর্য প্রযত্ন ও সংবেগ—আমরা বেঁচে থাকতেই এবং মরলে পরেও এসমস্তই অপরের প্রাণধাতুতে সংক্রামিত হচ্ছে। প্রাচীন রহস্যবিজ্ঞান বলে : অন্নময় শরীরের মত আমাদের একটা প্রাণময় শরীরও আছে। মৃত্যুর পর তারও বিশরণ ঘটে এবং তার উপাদান দিয়ে অন্যান্য প্রাণময় শরীর গড়ে ওঠে। বেঁচে থাকতেও আমাদের প্রাণের তেজ অহরহ অপরের তেজের সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে। তেমনি মনোময় জীবনেও পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের লীলা চলছে। আমাদের মনোধাতু অনবরত ভেঙে পড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, আবার গড়ে উঠছে মনের সঙ্গে মনের সংঘাতে—অবিরাম চলছে তাদের আত্মসংমিশ্রণ ও অন্যোন্যবিনিময়। এমনি করে ভূতে-ভূতে অন্যোন্যবিনিময়, অন্যোন্য-সংমিশ্রণ ও একাত্মসম্মেলন—এই হল প্রাণের রীতি, প্রাণের স্বরূপধর্ম।

প্রাণক্রিয়ার দুটি ধারা তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা। তার একদিকে রয়েছে বিবিক্ত অহংএর টিকে থাকবার তাগিদ বা সংকল্প—নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সকল আঘাত বাঁচিয়ে জিইয়ে রেখে; আরেকদিকে রয়েছে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসন—নিজেকে তার মিলিয়ে দিতেই হবে অপরের মধ্যে। জড়জগতে প্রকৃতির ঝোঁক প্রথম ধারাটির 'পরে -কেননা সেখানে তার প্রয়োজন বিবিক্ত স্থাণুরূপের বিসৃষ্টি। এই তার সর্বপ্রথম ও সর্বকঠিন তপস্যা। কারণ যে-ভূমিতে আনন্ত্যের অখন্ডভাবের পরিব্যঞ্জনা এবং বিশ্বশক্তির অবিরাম নিত্যচঞ্চল স্পন্দনলীলা চলছে, সেখানে বিবিক্ত ব্যষ্টিভাবকে টিকিয়ে রাখা কি তার জন্যে স্থাণু আধার গড়া বস্তুতই একটা দুর্জয় সমস্যা। তাই ব্যষ্টিরূপ যখন পরমাণুর জীবনে স্থাণুভাবের একটা ভিত্তি পেল এবং পরমাণুপ্রচয়ের ফলে দেখা দিল অবয়বিসংস্থানের মধ্যে অল্পাধিক স্থায়িত্বের একটা সুনিশ্চিত সম্ভাবনা, তখন ভবিষ্যৎ প্রাণময় ও মনোময় ব্যষ্টিভাবের সেই হল বনিয়াদ। এমনি করে রূপের একটা শক্ত কাঠামো পেয়ে উত্তর-সাধনার সিদ্ধি সম্পর্কে প্রকৃতি যখন নিশ্চিন্ত হল, তখন প্রাণের চলন সে উলটে দিল। এইবার ব্যষ্টি-রূপকে ধ্বংস করে তারই বিস্রস্ত উপাদান দিয়ে প্রাণবিগ্রহের পুষ্টি শুরু হল। কিন্তু একেও প্রাণের অন্ত্য পরিণাম বলা চলে না। দুটি ধারার পূর্ণ সামঞ্জস্যে পরিণামের চরম পর্ব দেখা দেবে। তখন ব্যষ্টিচেতনাকে বজায় রেখেই

ব্যষ্টিজীব আত্মসংমিশ্রণ করবে অপরের সঙ্গে। অথচ তাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভারকেন্দ্রও যেমন বিচলিত হবে না, তেমনি উদ্বর্তনের সম্ভাবনাও অব্যাহত থাকবে।

এই সামঞ্জস্যসাধনাই প্রাণের সমস্যা। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে মনঃশক্তির আবির্ভাব ছাড়া এ-সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু প্রাণন আছে, কিন্তু চেতন-মনের আবেশ নাই—এতে কখনও সাম্য আসে না। এর ফলে সাময়িক ভারসাম্যের যে অনিশ্চিত ব্যাপার দেখা দেয়, তার পর্যবসান ঘটে দেহের মৃত্যুতে; অর্থাৎ ব্যষ্টিভাবের প্রলয়ে তার যত উপাদান বিশ্বভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অন্নময়-প্রাণের প্রকৃতি এই. ব্যষ্টি-আধারকে সে কিছুতেই অব্যাহত ও অবিকৃত ভাবে নিজেকে জিইয়ে রাখবার শক্তি দেবে না—আধারস্থিত পরমাণুদের মত। এ পারে শুধু মনোময়-পুরুষ, যার মর্মকোষে অধিষ্ঠিত রয়েছে অন্তরাত্মার চিদ্‌ঘন বিন্দুর স্ফুরত্তা। অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়ে সে-ই স্থিতির একটা অখন্ড প্রবাহ বইয়ে দিতে পারে। আধারের চ্যুতিতে যদি কখনও অন্নময়-স্মৃতির ছেদও দেখা দেয় তার মধ্যে, তবু মনোময়-পুরুষের স্মৃতি অব্যাহত থাকে এবং সেই স্মৃতিই ক্রমে পুষ্ট হয়ে দেহের জন্মমরণজনিত অন্নময়-স্মৃতির গ্রন্থিকেও অচ্ছিদ্র করতে পারে। আজও শরীরী মনের পূর্ণ পরিণতি রয়েছে বহুদূরে। তবু মনোময়-পুরুষ দেহের সীমায় বন্দী জীবনের এলাকা ছাড়িয়েও অতীত ও ভবিষ্যতের অনেকখানি খবর এখনও রাখে। সে জানে তার ব্যক্তিগত অতীতকে, জানে যে ব্যষ্টিজীবনের পরিণামপরম্পরা দ্বারা সংস্কৃত হয়ে ফুটেছে তার এই বর্তমান জীবন; এমন-কি এহতে যে ভবিষ্যৎ জীবনপরম্পরার সূচনা, তারও সে সন্ধান রাখে। ব্যষ্টির এই পরম্পরার ভিতর দিয়ে একটি সমষ্টি জীবনধারা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে অতীত হতে ভবিষ্যতে, যার মধ্যে তার অস্তিত্বের অনুবৃত্তি অনুস্যূত হয়ে আছে একটি অংশুর মত—তারও চেতনা তার আছে। ভব-প্রত্যয়ের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে জড়বিজ্ঞান বংশানুক্রম বলে জানে। কিন্তু মনোময়-পুরুষের অন্তরালে নিত্য উপচীয়মান জীবাত্মা তাকে জানে তার স্থিরসত্ত্বরূপে। মনোময়-পুরুষ এই জীবচেতনার বিভূতি, অতএব তাতেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যক্তিজীবন ও সমূহজীবনের স্থির প্রত্যয়। প্রাণের এ-দুটি বিভাবের সঙ্গম ও সৌষম্যের আধার সে-ই।

ব্যক্তি ও সমূহের মাঝে এই-যে নূতন সম্বন্ধ, তার বীর্য নিহিত রয়েছে আসঙ্গে—যার মূল সুর প্রেম এবং প্রেমের পূর্ণচ্ছটায় উদয়ন যার তাৎপর্য। অতএব প্রেমময় আসঙ্গই হল প্রাণপরিণামের তৃতীয় পর্বের নিয়ামক শক্তি। প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন আত্মচেতনাকে জিইয়ে রাখা চাই, তেমনি জাগ্রত-চিত্ত নিয়েই চাই আত্মবিনিময়ের বা নিজেকে বিলিয়ে কি মিলিয়ে দেবার

আকৃতি ও নিয়তিকে মেনে নেওয়া। এ-দুয়ের একটিকে বাদ দিয়ে জীবনে আর যা ফুটুক, প্রেম ফোটে না। পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ এমন-কি বাঞ্ছিতের মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের একটা স্বপ্নকে বহন করা মনোময়-পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক—সেদিকে তার ঝোঁকও আছে। কিন্তু সে-উৎসর্গসাধনার তাৎপর্য হল প্রাণের এই তৃতীয় ভূমিকেও ছাড়িয়ে যাবার প্রেতিতে।...বস্তুত তৃতীয় ভূমির সাধনায় আমরা ক্রমে ছাড়িয়ে উঠি—পরস্পরকে গ্রাস করে নিজে বাঁচবার উন্মত্ত প্রয়াসকে এবং সে-প্রয়াস দ্বারা যোগ্যতমের টিকে থাকবার মূঢ় ব্যবস্থাকে। কেননা এ-ভূমিতে টিকে থাকবার প্রয়াস সার্থক হয় পরস্পরের সহযোগিতায়। প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসম্পূর্তির সুযোগ পায় রেষারেষিতে নয় —মেশামেশিতে, আত্মবিনিময়ে, নিজেকে অপরের সংগে খাপ খাইয়ে। সমস্তটা জীবনই আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা সাধনা—এমন-কি অহংএর পুষ্টি ও উদ্বর্তন তার অপরিহার্য অংগও বটে। তবুও শুধু একার অহংটিকে নিয়ে সে-সাধনার সিদ্ধি সম্ভব হয় না। কেননা প্রাণপরিণামের এই তৃতীয় পর্বে ব্যক্তির প্রয়োজন বিশ্বকে—একটি অহং এখানে খোঁজে আরেকটি অহংকে। অপরকে নিজের মধ্যে টেনে আনবার এবং নিজেকে অপরের মধ্যে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষাও এই ভূমিতে স্বাভাবিক। ব্যক্তি এবং সমূহের মধ্যে টিকে থাকবার যোগ্যতা এখানে সবচাইতে বেশী তাদেরই—যারা আনন্দ ও ভালবাসার বিধানকে জয়ী করতে পেরেছে জগতে, পরস্পরের আনুকূল্য দয়া মায়া মৈত্রী ও একতাই যাদের জীবনের আদর্শ, অন্যোন্য-আত্মদানের ভিতর দিয়েই যারা মৃত্যুঞ্জয় হবার পথ খুঁজে পেয়েছে। তারা জানে ব্যক্তির আপ্যায়নে ব্যক্তির ও সমূহের পুষ্টি যেমন, তেমনি সমূহের আপ্যায়নেও ব্যক্তি ও সমূহের পুষ্টি —এই হল প্রকৃতির বিধান।

প্রাণপ্রকৃতির এই শিবময় পরিণামে মনঃপ্রকৃতিরই* উপচীয়মান প্রভাব সূচিত হয়। বোঝা যায়, অন্নময় আধারের 'পরে মনোময়-পুরুষের অনুশাসন ক্রমেই বিজয়ী হচ্ছে। প্রাণের চেয়ে মন সূক্ষ্ম বলে নিজের আহার সম্ভোগ ও পুষ্টির জন্যে অপরকে তার গ্রাস করতে হয় না। বরং যতই দেয়, ততই সে পায়, তার পুষ্টিও ততই অব্যাহত হয়। পরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে মিলিয়ে দিয়ে পরকেও সে নিজের রসে জীর্ণ করে। এমনি করে ক্রমেই তার অধিকার প্রসারিত হয়। অন্নময় প্রাণ অতিদানে যেমন নিজেকে ফতুর করে, তেমনি

---

* এখানে যে-মনের কথা বলছি, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তার প্রভাব সোজাসুজি পড়ে প্রাণপুরুষের 'পরে। শুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব নয়, কিন্তু তার যে-আভাসটুকু ফুটেছে জগতে, বস্তুত তা প্রাণেরই ধর্ম—মনের নয়। কিন্তু তারও প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্ভব হয়, যখন মন তাকে টেনে নেয় আপন জ্যোতির্লোকে। অন্নময় ও প্রাণময় আধারে যে-ভালবাসা দেখা দেয়, তা বুভুক্ষারই একটা চঞ্চল রূপ মাত্র।

অতি-আহারেও নিজের মরণ ডেকে আনে। মনের মধ্যেও এই ন্যূনতা থাকে, যতক্ষণ সে জড়ের বিধান মেনে চলে। কিন্তু স্বারাজ্যের অধিকার যতই নিরঙ্কুশ হয়, ততই এ-বন্ধন তার খসে পড়ে। তখন জড়ের সংকোচ কাটিয়ে উঠে তার দেওয়া এবং নেওয়া এক হয়ে যায়। এই তার উদয়নের স্বাভাবিক ছন্দ, কেননা ভেদে-অভেদের যে চিন্ময় বিধানে সচ্চিদানন্দের দিব্য প্রকাশ এই বিশ্বরূপে, মন স্বরূপত সেই ঋতম্ভরা লীলারই বাহন।

পূর্বেই বলেছি, প্রাণের স্বরূপস্থিতিতে অবচেতন সংকল্পের যে-মধ্যাবিভূতি রয়েছে, পরিণামের মধ্যপর্বে তা-ই দেখা দেয় বুভুক্ষা ও স্ফুট-বাসনার আকারে—যাকে বলা যায় 'মনসো রেতঃ' বা চেতন-মনের আদিবীজ। যখন আসঙ্গস্পৃহা ও ভালবাসার উপচয়ে তৃতীয় পর্বে প্রাণের উদয়ন ঘটে, তখনও কিন্তু কামনার বিলোপ হয় না—হয় তার পূর্ণতা ও রূপান্তর। আত্মদানের দ্বারা অপরকে ফিরে পাওয়া নিজের মধ্যে, এই হল ভালবাসার স্বভাব। কিন্তু অন্নময় প্রাণ দিতে চায় না, সে শুধু চায় নিতে। অবশ্য বাধ্য হয়ে কিছু-না-কিছু তাকে দিতে হয়—কেননা যে-প্রাণ দেবার দায় এড়িয়ে শুধু নিতে চায়, তাকে বন্ধ্যা হয়ে শুকিয়ে মরতে হয়। ইহলোকে কি লোকান্তরে এমন কৃপণ প্রাণের অস্তিত্ব কখনও সম্ভব নয়। তাই জড়ভূমিতেও প্রাণকে কিছু ছাড়তে হয়—কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। সেখানে সে অবশ হয়ে বিশ্ব-প্রকৃতির অবচেতন আকূতিকে মেনে চলে—ত্যাগের সচেতন সাধনায় তার সায় থাকে না। এমন-কি ভালবাসা জাগলেও, প্রথমত তার আত্মদানের রীতি হয় অনেকটা পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকূতির যন্ত্রলীলার মত। প্রেমও প্রথম বুভুক্ষার ধারা ধরে। তখন নিজেকে দেবার চাইতে পরের কাছে আদায় করাতেই তার তৃপ্তি—আত্মদান ও আত্মসমর্পণকে সে জানে শুধু বাঞ্ছিত বস্তুকে পাবার একটা অত্যাবশ্যক সাধন বলে। কিন্তু একে তো প্রেমের স্বরূপপ্রকৃতি বলতে পারি না। প্রেমের স্বরূপ ফোটে সমঞ্জসা রতিতে, যেখানে দেবার আনন্দ পাবার আনন্দের সমান—বরং তাকে ছাড়িয়ে যাবার দিকেই তার ঝোঁক। কিন্তু ছাড়িয়ে যাওয়াকে বলি সমর্থা রতির দিব্যোন্মাদ, যার প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে প্রেম ডুবে যেতে চায় পরমসাম্যের অন্তর্দশায়। তখন যে ছিল অনাত্মা, সে-ই হয় তার পরমাত্মা—তার অন্তরাত্মার চেয়েও মহত্তর ও প্রিয়তর। কিন্তু উন্মনী প্রেম যা-ই হ'ক, প্রেমের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র হল অপরকে পেয়ে অপরের মধ্যে পুরাপুরি নিজেকে পাওয়া। তখন অপরের ঐশ্বর্য বাড়িয়েই প্রেমের আপন ঐশ্বর্য বাড়ে, ভোগ করতে গিয়ে ভুক্ত হতে হয় তাকে—কেননা পরের আবেশ ছাড়া নিজেকে যে কখনও পূর্ণ করে পাওয়া যায় না।

এমনি করে প্রাণপরিণামের প্রথম পর্বে ফোটে—পরমাণুজগতের অসাড় অশক্তিহেতু আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা অভাব। জড়ব্যক্তি সেখানে সম্পূর্ণ অনাত্মার

করলে। দ্বিতীয় পর্বে ফোটে একটা ন্যূনতার চেতনা, আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা আকূতি; প্রাণ চায় আত্মা এবং অনাত্মা দুয়েরই বশীকার। এরই মধ্যে তৃতীয় পর্বের উন্মেষে প্রকৃতির রূপান্তরে দেখা দেয় এমন-একটা পূর্ণতা ও সৌষম্য, যা বিরোধাভাসের ভিতর দিয়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃতিকে। ক্রমে আসঙ্গ ও ভালবাসার সাধনায় অনাত্মাই দেখা দেয় 'মহান্ আত্মা' হয়ে। তখন তার অনুশাসন ও প্রয়োজনের কাছে সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করবার কোনও বাধা থাকে না এবং তার ফলে সমূহজীবনের ব্যক্তিজীবনকে আত্মসাৎ করবার উপচীয়মান আকূতিও তৃপ্ত হয়। আবার সেইসঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় অপরের জীবনকে জারিত করবার এবং তার দেওয়া বিত্তকে আত্মসাৎ করবার প্রবেগ, যার ফলে ব্যক্তিজীবনের সমূহজীবনকে সম্ভোগ করবার বিপরীত আকূতিও তৃপ্ত হয়। জীব আর জগতের এই যে অন্যোন্যসম্ভাবনের সম্বন্ধ, তার সম্যক্ অথবা সুনিশ্চিত স্ফূর্তি সম্ভব হতে পারে একমাত্র ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এবং সমূহে-সমূহে অনুরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠায়। এক দুশ্চর তপস্যা চলছে মানুষের জীবনে। একদিকে তার মধ্যে আছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা, তা-ই দিয়ে সে পায় নিজেকে; আরেকদিকে আছে আসঙ্গ প্রেম ভ্রাতৃভাব ও মৈত্রীর দাবি, যা মেনে তার নিজেকে দিতে হয়। এ-দুয়ের মাঝে তাকে সামঞ্জস্য ঘটাতে হয় যেমন, তেমনি দুটি বিরুদ্ধ আকূতির সমন্বয়ে সাম্য ন্যায় ও সৌষম্যের এক কল্পজগৎ সৃষ্টি করবার সাধনাতে তার সকল শক্তি নিয়োজিত করতেও হয়। তার এই প্রয়াসের মূলে আছে বিশ্ব-প্রকৃতির এক নিগূঢ় সমস্যাসমাধানের অনতিবর্তনীয় প্রেতি। সে-সমস্যা প্রাণের সমস্যা : জড়ের আধারে উন্মিষিত প্রাণের মর্মমূলে যে দ্বন্দ্বের সংঘাত নিহিত আছে, তার মধ্যে মিলনের সূত্রটি আবিষ্কার করাই তার সমাধান। সে-সমাধানের সাধনা করছে মন—প্রাণের উত্তরসাধকরূপে। কেননা, সে-ই শুধু জানে মহাপ্রকৃতির ঈপ্সিত সৌষম্যের পথের খবর, যদিও একমাত্র উন্মনী-ভূমিতেই সে-সৌষম্যের চরম সিদ্ধি ঘটতে পারে।

কারণ, যে-তথ্যকে ভিত্তি করে আমাদের এই এষণা, সে যদি সত্য হয়, তাহলে পথের শেষে সিদ্ধির উপান্তে তখনই মন পৌঁছতে পারবে যখন অমনীভাবের মহারহস্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলবে। এই উন্মনীই তো মনের স্বরূপসত্য—মন তার অবরবিভূতি ও সাধন মাত্র। একে আশ্রয় করে অখণ্ড অরূপের যেমন খণ্ডরূপে অবতরণ হয়, তেমনি একে ধরেই আবার সে উঠে যায় রূপ ও খণ্ডতার ব্যূহকে ভেদ করে আপন স্বরূপে। এতএব শুধু মনের ও হৃদয়ের প্রসারণে, শুধু আসঙ্গ আত্মবিনিময় ও প্রেমের বহিরঙ্গ সাধনায় কখনও জীবনসমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না। তার জন্য চাই এক লোকোত্তর তুরীয় ভূমিতে প্রাণের উদয়ন, যেখানে বহুর শাশ্বত একত্ব উপলব্ধ

হয় চিন্ময় তাদাত্ম্যবোধের নিবিড়তায়। সেখানে জাগ্রতজীবনের সকল প্রবৃত্তির আপ্যায়ন দেহের খণ্ডতাবোধে নয়, প্রাণবৃত্তির উদ্ধত বাসনা ও বুভুক্ষায় নয়, মনঃকল্পিত সমাহার ও সৌষম্যের অপূর্ণ সাধনায় নয়—এমন-কি এসবার সমবায়েও নয়। চিৎস্বরূপের অখণ্ড তাদাত্ম্যবোধ ও নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যেই সেখানে প্রাণের অতিমুক্তি ও জীবনের প্রতিষ্ঠা।

ষড়বিংশ অধ্যায়

প্রাণের সঙ্কট

তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৩

এই জন্যই তাকে বলা হয় সর্বায়ুঃ বা বিশ্বপ্রাণ।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৩)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জুনতিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

গীতা ১৮।৬১

ঈশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন সর্বভূতের হৃদয়দেশে—যন্ত্রারূঢ় সকল ভূতকে ভ্রামিত ক'রে তাঁর মায়ায়।

—গীতা (১৮।৬১)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ...সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১

সত্য জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানে যে, বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সঙ্গেই ভোগ করে সে কামনার সকল বিত্ত।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।১)

বিশ্বলীলার একটা বিশিষ্ট পর্বে চিৎ-শক্তির বিশেষ বিচ্ছুরণকেই আমরা প্রাণ বলে জানি। স্বরূপত সে-শক্তি অনন্ত নির্বিশেষ অব্যাহত—অখণ্ড-স্বভাবের নিত্যতৃপ্তিতে তার অবিচল প্রতিষ্ঠা; অর্থাৎ সে-শক্তি সচ্চিদানন্দেরই চিৎ-তপঃ। অনন্ত সন্মাত্রের নিরঞ্জন স্বভাব ও অখণ্ড শক্তির নিরঙ্কুশ আত্মপ্রতিষ্ঠা হতে আপাত-বিবিক্ত হয়ে যখন এই বিশ্বলীলা দেখা দিল, তখন তার মূলসূত্র হল অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের বিভাজনবৃত্তি। এক অখণ্ড শক্তির এই খণ্ডলীলা হতে জগৎ জুড়ে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও বিরোধের বিভ্রম—মনে হয় ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বভাব বুঝি এখানে নিরাকৃত। মন এই আপাত-নিরাকৃতিকে চিরন্তন তত্ত্ব বলে মেনে নেয়। অথচ বিশ্বচেতনার যে-দিব্যদ্যুতি গোপন রয়েছে মনের আড়ালে, সে কিন্তু তাকে জানে এক বহুবিচিত্র পরমার্থ-তত্ত্বের বিকৃত প্রতিভাস বলে। তাইতো এ-জগতে দেখি শুধু নানা বিরুদ্ধ সত্যের সংঘাত। সবাই তারা সার্থকতার পথ খুঁজছে এবং সে-অধিকারও তাদের আছে বলেই বিচিত্র সমস্যা ও বিপুল রহস্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দিকে-দিকে। সমস্যার সমাধান না করেও উপায় নাই, কেননা এই উত্তাল অনৃতের পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে এক অখণ্ড সত্যের যে-ঋতসুষমা, তাকে আবিষ্কার করতে পারলেই এ-জগতে সেই সত্যের স্বচ্ছন্দ ও নির্মুক্ত প্রকাশ ঘটবে।

মন সমস্যার সমাধান খুঁজেও পাবে। কিন্তু তাহলেও এ তো মনের একলার কাজ নয়। মনের সমাধানকে রূপ দিতে হবে জীবনে। চেতনায় যা ফুটবে, তাকে রূপ দিতে হবে কর্মেও। চেতনার শক্তিরূপ এই জঙ্গম জগৎ গড়েছে, সৃষ্টি করেছে এর যত সমস্যা। অতএব সে-শক্তিই এসব সমস্যার সমাধান করবে, জঙ্গম জগৎকে উত্তীর্ণ করবে অপরাজিতা সিদ্ধির সেই শাশ্বত-লোকে —যেখানে তার নিগূঢ় তাৎপর্য সার্থক হবে, মূর্ত হবে তার উন্মিষৎ-সত্যের কল্পনা। মনের সমাধান তাই প্রাণের সমাধানে সার্থক হওয়া চাই। বিশ্বে পর-পর প্রাণের তিনটি রূপ ফুটেছে। প্রথমত তার অন্নময় রূপ : সেখানে চলছে এক মগ্নচৈতন্যের লীলা—আত্মপ্রকাশের বহিরঙ্গ প্রবৃত্তিতে নিজেকে যে হারিয়ে ফেলেছে, আত্মশক্তির বিলাসে যার নিজস্ব পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই সেখানে দেখি শুধু প্রবৃত্তির স্পন্দন, শুধু শক্তির রূপায়ণ—কিন্তু অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের সন্ধান পাই না। তার পরে দেখা দিল প্রাণের প্রাণময় রূপ : চেতনার আধখানি ফুটেছে সেখানে আবরণের আড়াল থেকে—প্রকাশ পেয়েছে প্রাণের বীর্য, আধারের পুষ্টি প্রবৃত্তি ও অবক্ষয়ের লীলায়। আদিম কারাবন্ধন হতে অর্ধমুক্ত চেতনা অবরুদ্ধ বীর্যের আবেগে স্পন্দমান সেখানে—ধরেছে প্রাণবাসনার দুর্বার আকৃতির রূপ, তৃপ্তি অথবা বিদ্বেষের অভিঘাতে সে দুলছে। কিন্তু কোথায় তার মধ্যে আলোর স্পন্দন ? সে কি জানে তার আত্মসত্তার স্বরূপ, তার পরিবেশের রহস্য ? অসাড় শূন্যতা হতে ধীরে-ধীরে জাগে তার মধ্যে আলোর অস্পষ্ট আচ্ছন্ন আভাস...তারপর দেখা দেয় তৃতীয় ভূমিতে প্রাণের মনোময় রূপ : এবার চেতনা উন্মিষিত আধারের মধ্যে। জীবনসত্যের অনুভবকে সে রূপান্তরিত করে মনোময় বোধের আকারে, বাইরের অভিঘাতে জেগে ওঠে অপরোক্ষ দর্শন ও ভাবের সাড়া। চেতনার এই নবীন অভ্যুদয় ভাবকে জীবনের সত্য করে তোলে, অন্তরে আনে একটা যুগান্তর এবং তার অনুকূলে বাইরের জীবনকেও গড়তে চায় নতুন ভঙ্গিতে। এমনি করে মনের ভূমিতে এসে চেতনা তার শক্তির সম্মূঢ় প্রবৃত্তি ও রূপায়ণের কারাবন্ধন হতে মুক্তি পায়। কিন্তু তবু সে-মুক্তি তাকে প্রবৃত্তি ও রূপায়ণের 'পরে অকুণ্ঠ প্রশাসনের অধিকার দেয় না—কেননা এখনও শুধু ব্যষ্টিবিগ্রহে চেতনার প্রকাশ বলে তার মধ্যে তার সমগ্র প্রবৃত্তির একদেশ মাত্র ফুটেছে।

মানবজীবনের যত সমস্যা ও গ্রন্থি জটিল হয়ে উঠেছে এইখানে। স্বরূপত মানুষ মনোময় পুরুষ, মনশ্চেতনার সে শক্তিবিগ্রহ। বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বশক্তির অঙ্গীভূত হয়েও কেবল আভাসে সে তাদের অনুভব পায়। তার বিশ্বব্যাপ্ত প্রসারকে সে প্রত্যক্ষ জানে না, এমন-কি নিজেরও সমগ্র পরিচয় তার অগোচর। তাই জগতের প্রাণশক্তির পরে, এমন-কি নিজের জীবনের 'পরেও তার স্বচ্ছন্দ

ঈশনার অধিকার নাই—সর্বজয়া কল্পনার বাস্তব সিদ্ধি কুণ্ঠিত ও পরাভূত তার আধারে। জড়কে সে জানতে চায় জড়ময় পরিবেশকে আপন বশে আনবে বলে। তেমনি প্রাণকে জেনে সে চায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার স্বাতন্ত্র্য। পশুর মত তার মন আত্মচেতনার একটা ঝলক শুধু নয়—জ্ঞানের নিত্য উপচয়ে লেলিহান শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠছে তা দিনে-দিনে। তাই তাকে ঘিরে মনশ্চেতনার যে বিপুল রহস্য প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে, তাকে আপন বশে আনবার জন্যে সে মনের তত্ত্ব জানতে চায়। এমনি করে নিজেকে জেনে সে চায় স্বারাজ্যের মহিমা, জগৎকে জেনে চায় বৈরাজ্যের অধিকার। তার সত্তায় নিত্যনিবিষ্ট সন্মাত্রের এই তো প্রেতি, তার চিৎস্বরূপের এই তো প্রয়োজন। তার জীবন জুড়ে মহাশক্তির যে-উল্লাস, এই মহাসিদ্ধির দিকেই তো তার একাগ্র সংবেগ। এমনি করে তারই অভীপ্সায় সচ্চিদানন্দের গোপন আকূতি রূপ ধরেছে। নিজেকে প্রকাশ করেও গোপন রেখে এ-জগতে তাঁর যে-লুকোচুরি চলছে, তাঁর জীবলীলাতেই তার সার্থক পরিচয়। জ্ঞান ও সিদ্ধির এই অনির্বাণ অভীপ্সা কেমন করে সার্থক হবে, সে-সমস্যার সমাধানই মানুষের জীবনব্রত। কেননা, তার সত্তার মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এরই সংবেগ, এই তার 'হৃদি-সন্নিবিষ্ট' অন্তর্যামীর অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। যতদিন না মানুষ এ-সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে, যতদিন না ওই দুর্নিবার প্রেতি সার্থক হবে, তার এষণা ও সাধনারও ততদিন বিরাম হবে না। হয় নিজেকে বিরাটরূপে সার্থক করে তার অন্তর্যামীর চিরন্তন পিপাসা মেটাতে হবে, অথবা নরের আধারেই ঘটাতে হবে এমন নরোত্তমের আবির্ভাব—যার পক্ষে এ-পিপাসার পরিতর্পণ সুসাধ্য হবে। অর্থাৎ হয় মানুষকে নিজেই দেবমানব হতে হবে, অথবা অতিমানবকে এর জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে।

বিশ্বের নীতি ও নিয়তির মধ্যে আমাদের এ-কল্পনার সমর্থন আছে। কারণ, মানুষের মনশ্চেতনাতেই যে চিৎশক্তি জড়ের অন্ধকবল হতে ছাড়া পেয়ে প্রমুক্ত মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে, তা নয়। চিৎপ্রকাশের বিপুল অভিযানে এ একটা মধ্যপর্ব মাত্র। আজ মানুষ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেইখানে এসেই প্রকৃতির পরিণাম থেমে যেতে পারে না। তার সিসৃক্ষার সংবেগ হয় মানুষের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলবে এর উত্তরপর্ব, নয়তো তাকে ছাড়িয়ে চলবে তার অভিযান—যদি এগিয়ে যাবার সামর্থ্য মানুষের না-ই থাকে। আজ জীবনে যে-মনোলীলা সত্য হয়ে ফুটতে চাইছে, তার অভিযানও তো শেষ হবে না—যতদিন জীবনসত্যের পূর্ণমহিমায় এই আধারে সে জ্বলে না উঠছে। একে-একে সে তার যত আবরণ খসিয়ে ফেলবে, পূর্ণায়ত হয়ে জাগবে উদ্ভাস্বর চেতনার জ্যোতির্মহিমায় ও সার্থক বীর্যের অকুণ্ঠ উল্লাসে—এই তার নিয়তি। বিশ্বমূল সন্মাত্রের এই তো প্রকাশ-রীতি। তার স্ফুরণ বীর্যে, তার স্ফুরণ

জ্যোতিতে—কেননা শক্তি ও চৈতন্যই যে সত্তার স্বরূপ। এ-দুটি বিভাব সঙ্গত হয় তৃতীয় আরেকটি বিভাবে, যাকে জানি স্বয়ম্ভূসত্তার নিত্যতৃপ্ত আনন্দ বলে। এমনি করে শক্তি চৈতন্য ও আনন্দের তাদাত্ম্যসঙ্গমেই সত্তার পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই নিত্যসিদ্ধ ভাবোল্লাসে পেঁছনো আমাদেরও নিয়তি। কিন্তু পরিণামের ধারাবাহিকতায় মানুষের জীবন ফুটছে পর্বে-পর্বে। তাই সিদ্ধির চরমে পেঁছতে হলে আত্মার এষণাকে তার সাধনা করতে হবে—আবির্ভাবের পরমলগ্নে তার মধ্যে যে-আত্মা গুহাহিত হয়ে ছিলেন বীজরূপে। সেই আত্ম-আবিষ্কার দ্বারা মানুষ দলে-দলে ফুটিয়ে তুলবে জীবনযোনি চিৎশক্তির অন্তর্গূঢ় যত বীর্য তার আধারে নিহিত ছিল। সচ্চিদানন্দই মানুষের মধ্যে গুহাহিত এই চিদ্‌বীর্য। ব্যক্তিজীবন ও বিশ্ব-জীবনের বিশিষ্ট এক সামরস্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে তিনি মানব-আধারে ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। তাঁর সেই নিগূঢ় প্রেতিকে অনুসরণ করে মানুষ একদিন চেতনা বীর্য ও আনন্দের সার্বভৌম অখণ্ড অনুভবে প্রকাশ করবে অনির্বাচ্য অনুত্তরকে—বিশ্ব জুড়ে নিজেকে যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন রূপের মেলায়।

চৈতন্যই প্রাণের উপাদান। অতএব প্রাণের প্রকাশ সর্বত্র চৈতন্যের মৌলবিভাবকে অনুসরণ করে—কেননা সত্তার সকল ভূমিতেই চৈতন্য যেমন, শক্তির স্ফুরণ হয় তারই অনুরূপ। যেমন সচ্চিদানন্দে : চৈতন্য সেখানে অখণ্ড অনন্ত ক্রিয়াতীত রূপাতীত অথচ আত্মবিচ্ছুরণের ভর্তা ভোক্তা ও অন্তর্যামী মহেশ্বর। তেমনি শক্তিরও সেখানে অন্তহীন স্বাধিকার অখণ্ড বিভূতি অনুত্তর বীর্য ও আত্মসংবিৎ। আবার জড়প্রকৃতিতে চৈতন্য গূঢ় আত্মবিস্মৃত—যেন আপন শক্তির অন্ধ প্রমত্ত আবেগে ভেসে চলেছে (অথচ চৈতন্যই সেখানে বস্তুত শক্তিবাহিনীর সারথি, কেননা দুয়ের মাঝে এই সম্বন্ধই শাশ্বত)। তেমনি জড়ের মধ্যে শক্তিও অসাড় অচিতির একটা উন্মত্ত বিপুল তাণ্ডব—সে জানে না তার মধ্যে কি আছে। আকস্মিকতার দুর্নিবার তাড়নায় যদৃচ্ছার অনুকূল প্রশাসনে যন্ত্রবৎ তার সিদ্ধি—যদিও প্রতি পদক্ষেপে নির্ভুলভাবে সে তার অন্তর্গূঢ় ঋত ও সত্যের শাসন মেনে চলেছে, যার মূলে আছে তার অন্তর্যামী শাশ্বত চিন্ময় পুরুষের কবিক্রতু। আবার দেখি মনে : চৈতন্য সেখানে দ্বন্দ্ববিধুর, আধারে-আধারে সঙ্কীর্ণ, আত্মরত, অপর আধার সম্বন্ধে অজ্ঞান ও নিঃসম্পর্ক—জানে শুধু বস্তু ও শক্তির আপাত-খণ্ডতা ও সংঘাত, জানে না তাদের স্বরূপগত ঐক্য ও সৌষম্য। তেমনি শক্তিও তার মধ্যে ফুটেছে আমাদেরই অভ্যস্ত ও পরিচিত জীবনলীলায়। সেখানে প্রাণের ভূমিতে দেখা দিয়েছে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মূঢ় সংঘর্ষ, অপরের সম্পর্ককে অস্বীকার করে আত্মসম্পূর্তির অন্ধ আবেগ, বিচিত্র খণ্ডিত বিরুদ্ধ

শক্তির কৃচ্ছ্র সমাবেশ ও অন্যোন্যসংগ্রাম। তেমনি মনোভূমিতে আছে শুধু খণ্ডিত বিরুদ্ধ ও বিভিন্নমুখী ভাবনার মিশ্রণ সংঘাত সংগ্রাম ও অনিশ্চিত সমাহার—তার মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধের বিজ্ঞান কি স্বীকৃতি নাই। তারা জানে না, এক অন্তর্গূঢ় অদ্বৈতভাবনার বিচিত্র বিভূতি তারা, অতএব সেই ঐক্যের অনুভবে আছে তাদের সকল দ্বন্দ্বের পরম সমন্বয়। কিন্তু চৈতন্য যেখানে বহুত্ব এবং একত্ব দুটি ভাবনার আধার, বহুত্বের ভাবনা যেখানে একত্বের প্রশাসনে বিধৃত, বিশ্বের সত্য ঋত ও ব্রতের সঙ্গে ব্যক্তির সত্য ঋত ও ব্রত যে-চৈতন্যে সামরস্যের অপরোক্ষ অনুভবে একছন্দে গাঁথা, এক জানছেন বহুকে আত্মস্বরূপ বলে এবং বহু জানছে এককে নিজেদের স্বরূপ বলে—এই যেখানে চেতনার অখণ্ড প্রকৃতি, শক্তিও সেখানে তার অনুরূপ হয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলবে বিশ্বপ্রাণের ছন্দোলীলায়—যার মধ্যে একের প্রশাসনকে সচেতনভাবে মেনে নিয়েই বহুর বৈচিত্র্যকে সে প্রতি ব্যক্তির স্বভাব ও স্বধর্মের পরিশীলনে রূপ দেবে। সেই শক্তির আবেশে উন্মেষিত মহা-জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির নিষ্কাম আত্মরতি যোগযুক্ত হবে বিশ্বাত্মভাবনার সঙ্গে। অর্থাৎ বহু জীবে একই চিন্ময় পুরুষের অনুভব, বহু মনে একই চেতনার বিচ্ছুরণ, বহু জীবনে একই শক্তির উল্লাস, বহু হৃদয়ে ও আধারে একই আনন্দের মূর্ছন—এই অপরোক্ষ উপলব্ধিতে ব্যক্তির চেতনা প্রদীপ্ত হবে।

চিৎশক্তির এই চারটি বিভাবের মধ্যে প্রথমটি হল সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে সামরস্যের স্ফূর্তি হচ্ছে তাকেই আশ্রয় করে। সচ্চিদা-নন্দের মধ্যে চৈতন্য ও শক্তি অবিনাভূত, তদাত্মক। কেননা শক্তি সেখানে সত্তার চিন্ময় স্ফুরণ, অথচ সে-স্ফুরণে চিৎস্বরূপের প্রচ্যুতি ঘটছে না। তেমনি চৈতন্যও সেখানে সত্তারই জ্যোতির্ময়ী শক্তি—নিত্য প্রদীপ্ত যার আত্ম-সংবিৎ ও স্বরূপানন্দের অনুভব, নিত্য অকুণ্ঠিত যার এই অনুত্তর জ্যোতি ও স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্য। দ্বিতীয় বিভাবটি হল জড়প্রকৃতির রূপ। এমনিতর আত্মপ্রতিষেধ দ্বারাই সচ্চিদানন্দ জড়বিশ্বে আপনাকে বিভাবিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এখানে শক্তি আর চৈতন্যের পূর্ণ বিচ্ছেদ, অথচ অচিতির প্রমাদহীন প্রশাসনের বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রজাল আমাদের বুদ্ধিকে মুগ্ধ করে। তাই আধুনিক জড়বিজ্ঞান একেই বিশ্বদেবতার তত্ত্বরূপ ভেবেছে—যদিও এ তাঁর একটা মুখোস শুধু। তৃতীয় বিভাবটি ফুটেছে বিশ্ব-সতের প্রাণ ও মনের লীলায়। জড়ত্বের সুপ্তিঘোর কাটিয়ে তারা ধীরে-ধীরে জাগছে আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে। জড়তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে আত্মবিলোপ ঘটানো যেমন তাদের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের কল্পনাও তাদের চেতনায় অস্পষ্ট। তাই সহস্র সমস্যায় তাদের সাধনা সঙ্কুল। যে-জড়প্রকৃতির মধ্যে অচিতির শাসন অকুণ্ঠিত, তার বুকে কুণ্ঠিত শক্তির দৈন্য নিয়ে জাগল

চেতন মানুষ একটা হতবুদ্ধিকর প্রহেলিকার মত—তাইতে প্রাণ ও মনের সমস্যা হয়ে উঠল আরো ঘোরালো। তারও পরে আছে চিৎশক্তির চতুর্থ বিভাব, যার স্থিতি অতিমানস ভূমিতে। জীবনের পূর্ণসিদ্ধি সেইখানে, কেননা সেইখানেই সকল সমস্যার সমাধান হবে—জড়ত্বের মধ্যে বিলুপ্ত চিৎশক্তির আংশিক প্রতিষ্ঠায় আজ যারা প্রাণ ও মনের ভূমিতে সংকুল হয়ে দেখা দিয়েছে। অতিমানসের কাছে সে-সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে। তার যত-কিছু বীর্য জড়ের গহনে চিৎশক্তির মহাবিলুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, অথচ পরিণামের ধারাবাহিকতায় যাদের স্ফুরণ অবশ্যসম্ভাবিত ছিল, চিৎশক্তির পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় এই আধারে তাদের নির্মুক্ত প্রকাশ ঘটানো—অতিমানসের এই ব্রত। ওই তো সত্য মানুষের সত্য জীবন, যার দিকে চলেছে তার এই অসিদ্ধ জীবনে অচরিতার্থ মানবতার অক্লান্ত অভিযান। আমরা যাকে অচিতি বলে জানি, সে কিন্তু পুরাপুরিই এই পথের খবর রাখে। শুধু আমাদের ব্যক্ত-চেতনায় আছে তার দ্বন্দ্ববিধুর অস্পষ্ট স্বপ্নলেখা—অপরোক্ষ অনুভবের ক্বচিৎ-কিরণে, আদর্শের অতর্কিত ঝলকে, দিব্যশ্রুতির বিদ্যুৎবিকাশে যার দীপনী। তার স্ফুরণ দেখি সিদ্ধ ও কবির অন্তর্দৃষ্টিতে, ঋষির তুরীয় অনুভবে, ভাবকের দিব্যোন্মাদে, চিন্তাবীরের দর্শনপ্রতিভায়, মহামনীষী ও মহাপুরুষের দিব্যভাবনায়।

প্রাণ ও মনের যে-ভূমিতে আজ মানুষ পৌঁছেছে, চৈতন্য আর শক্তির অসামঞ্জস্যের দরুন তিনটি সংকট দেখা দিয়েছে সেখানে—এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। প্রথম কথা, মানুষ তার স্বরূপসত্তার সামান্য অংশই জানে। তার পরিচয় শুধু দেহ-প্রাণ-মনের বহিশ্চর ব্যাবহারিক সত্তার সঙ্গে। আবার তারও পুরাপুরি খবর সে রাখে না। তার মধ্যে চেতনার অব্যক্ত গহনে রয়েছে অবচেতন ও অধিচেতন প্রাণপ্রবৃত্তির উত্তালতা, অবচেতন দৈহ্যসত্তা। আত্ম-সত্তার এই বিপুল পরিধি তার অগোচর এবং শাসনের বাইরে। বরং তাকেই ওই অপ্রাকৃত সত্তার নিগূঢ় প্রজ্ঞার শাসন মেনে চলতে হয়। অসীম শক্তির মধ্যে সীমিত জ্ঞানের প্রকাশে এই সংকট দেখা দেয়। কারণ, সত্তা চৈতন্য ও শক্তি যদি এক হয়, তাহলে আত্মসত্তার যতটুকু আমার আত্মসংবিৎ দিয়ে গ্রাস করতে পেরেছি ততটুকুর 'পরেই আমাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ হবে। বাকীটুকু শাসিত হবে তার নিজস্ব চিৎশক্তি দ্বারা—যা আমাদের প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের নাগালের বাইরে। অথচ এই বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ শক্তি স্বরূপত এক অবিভাজ্য শক্তি ব'লে তার প্রবল ও বৃহৎ অংশই স্বভাবত শাসন করবে দুর্বল ও ক্ষুদ্র অংশকে। তাই জাগ্রৎ চেতনাতেও আমাদের অবচেতনা ও অধিচেতনার শাসন মেনে চলতে হয়: এমন-কি আত্মশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বেলাতেও আমরা যেন অন্তর্গূঢ় অচিতির ক্রীড়নক মাত্র।

এইজন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলতেন, মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র কর্তা ভাবে, কিন্তু বাস্তবিক তার কর্ম চলছে প্রকৃতির বশে—এমন-কি জ্ঞানীকেও নিজের প্রকৃতির শাসন মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি তো আমাদের অন্তর্যামী পরমপুরুষের চিন্ময় সিসৃক্ষা। আত্মনিগূহনের আপাত-লীলায় তার মধ্যে নিজেকে তিনি ঢেকেছেন নিজেরই প্রতীপ বৃত্তির অন্তরালে। তাই প্রাচীনেরা চিন্ময় সিসৃক্ষার এই প্রতীপ বৃত্তিকে বলতেন ব্রহ্মের মায়াশক্তি। তাঁদের ভাষায় : 'ভ্রামিত হচ্ছে সর্বভূত যন্ত্রারূঢ় হয়ে যেন তাঁরই মায়ায়, যিনি ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠিত আছেন সর্বভূতের হৃদয়দেশে'। অতএব একথা নিশ্চিত, মানুষ যদি মনের সীমা ছাড়িয়ে আত্মসংবিতের পরমচেতনায় ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তবেই সে নিজের আধারের 'পরে পুরা দখল পায়। কিন্তু অচেতনা বা অবচেতনার ভূমিতে থাকতে তা হয় না। এমন-কি এর জন্যে আধারের গহনে ডুব দিয়ে অচিতির দিকে তলিয়ে গিয়েও কোনও লাভ নাই। তাদাত্ম্যবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একমাত্র তখনই হয়, যখন আমরা অন্তরাবৃত্ত হয়ে হৃদয়গুহায় পাতা তাঁর আসনখানি ছুঁই এবং ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে উত্তীর্ণ হই অতিমানসের অতিচেতন ভূমিতে। কারণ ওই ভূমিতেই দিব্যমায়ার অধিকারে আছে ঋতভৃৎ সত্যের সেই পরমবিজ্ঞান, অদিব্য মায়ার শাসনে যার খেলা চলছে এই অবচেতনার মধ্যে—চিন্ময় আস্তিক্যের এষণাকে জড়ময় নাস্তিক্যের বুকে জাগিয়ে দিয়ে। বস্তুত অপরা প্রকৃতি এখানে ওই পরা প্রকৃতির সত্যসঙ্কল্প ও বিজ্ঞানকেই মূর্ত করে তুলছে। ব্রহ্মের মায়াশক্তি এই জগতের যত প্রাতিভাসিক সত্য সৃষ্টি করছে বটে, কিন্তু সে-শক্তি বিধৃত রয়েছে তাঁরই ঋতশক্তির প্রশাসনে। দুয়ের মূলে আছে একই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দেববীর্য, যা প্রতিভাসের মধ্যে তার অন্তর্গূঢ় পরমার্থতত্ত্বকে জানে এবং তার উত্তরায়ণের অভিযানকে একদিন যা সার্থক করবে ব্রহ্মসম্ভাবের পরমপ্রত্যয় দিয়ে। আজ যে-মানুষ একটা অর্ধস্ফুট আভাস এখানে, একদিন দিব্যমায়ার জ্যোতির্লোকে সে খুঁজে পাবে সত্যকার পুরা মানুষটিকে। সেখানে সে দেখবে নিজেরই নরোত্তম রূপ—যা আত্মসংবিতের পূর্ণ জ্যোতিতে প্রভাস্বর, যা পরম-সাম্যে তদ্গত রয়েছে সেই স্বয়ম্ভূপুরুষের সঙ্গে, নিজের বিশ্বরূপী আত্মপরিণামের নটলীলার যিনি সর্ববিৎ সূত্রধার।

নিজেকে মানুষ জানে না, এই তার প্রথম সংকট। তার দ্বিতীয় সংকট, দেহে প্রাণে এবং মনে বিশ্ব হতেও সে বিযুক্ত। তাই নিজের সম্পর্কে তার যতখানি অজ্ঞানতা, ততখানি কিংবা তারও চেয়ে বেশী অজ্ঞানতা তার অপরের সম্পর্কে। খানিকটা পর্যবেক্ষণ অনুমান ও সংস্কার এবং খানিকটা আবছা-গোছের সহানুভূতি দিয়ে অপরের একটা মনগড়া আদল সে খাড়া করতে পারে—কিন্তু তাকে জ্ঞান বলা চলে কি ? একমাত্র তাদাত্ম্যবোধেই জ্ঞান সম্ভব, কেননা

সত্তার আত্মসংবিৎই জ্ঞানের সত্য রূপ। সচেতনভাবে নিজেকে যতটুকু অনুভব করতে পারি, ততটুকু আমাদের স্বরূপজ্ঞানের সীমা—তার বাইরে সবই আঁধার। তেমনি নিজের বাইরে তাকেই সত্য করে জানি, অনুভবে যার সঙ্গে এক হতে পারি—সেখানেও তাদাত্ম্যবোধের সীমাই জ্ঞানের সীমা। জ্ঞানের সাধন যদি পরোক্ষ এবং অপূর্ণ হয়, তাহলে তার সিদ্ধিও তা-ই হবে। সে-জ্ঞান দিয়ে ব্যাবহারিক জীবনের কতকগুলি সংকীর্ণ লক্ষ্য প্রয়োজন ও সুযোগ চরিতার্থ হয়, জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার একটা অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত সৌষম্যের সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। এমন-কি অনেক আনাড়িপনা ও গোঁজামিল সত্ত্বেও মন এ-ব্যবস্থাকে নিখুঁত বলে মেনেও নেয়। তবু জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধে পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা দেয় একমাত্র তাদাত্ম্যবোধের ফলেই। এইজন্য জীবনকে পূর্ণ সার্থক করতে হলে অপরের সঙ্গে চাই তাদাত্ম্যের নীরন্ধ্র চেতনা—শুধু মমত্ববোধ দিয়ে অপরের দরদী হওয়া বা মন দিয়ে মন বোঝাই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কারণ এমনি করে আমরা অপরের সদরমহলেরই খবর জানি। কিন্তু সে-জ্ঞান কখনও পূর্ণায়ত হয় না বলে তার সাধনা ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয় উভয়ের অবচেতনা অথবা অধিচেতনা হতে উৎসারিত অজানা বিপ্লবের দুর্বার বন্যায়। তাদাত্ম্যের অনুভব সুপ্রতিষ্ঠ হয় একমাত্র বিশ্বচেতনার মধ্যে অবগাহনে, যেখানে স্বভাবত আমরা সবার সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি। কিন্তু বিশ্বাত্মভাবের চেতনা পূর্ণ বিকশিত হয়ে আছে অতিমানসেরই অতিচেতন ভূমিতে। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে অতিমানসের বেশির ভাগই অবচেতন, তাই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের সাধন দিয়ে তাকে আয়ত্ত করা যায় না। অপরা প্রকৃতির সকল বৃত্তি সংকীর্ণ অহন্তার জালে জড়িয়ে গেছে—বিবিক্ত ব্যষ্টিভাবের ত্রিগুণিত বন্ধনে সে বাঁধা। একমাত্র অতিমানস ভূমিতেই দিব্যচেতনার ঐক্যসূত্রে গাঁথা রয়েছে বৈচিত্র্যের মণিমালা।

তৃতীয় সংকট হল, প্রকৃতিপরিণামের পর্বে-পর্বে শক্তি ও চেতনার বিচ্ছেদ। প্রথম বিচ্ছেদ পরিণামশক্তির কীর্তি। জড় প্রাণ ও মন এই তিনটি পর্বের পরম্পরায় সে ফুটেছে—প্রত্যেক পর্বের বৃত্তি ও ধর্মকে স্বতন্ত্র রেখে। তাই দেখি, প্রাণের বিরোধ দেহের সঙ্গে : নিজের দুর্দম বাসনা ও প্রবৃত্তির তৃপ্তি-সাধনে জোর করে দেহকে সে নিয়োজিত করতে চায়, তার পঙ্গু সামর্থ্যের কাছে দাবি করে অজর অমর দিব্যদেহের ঐশ্বর্য। শৃঙ্খলিত উৎপীড়িত দেহ সে-জুলুম সয়ে প্রাণের অসম্ভব দাবির বিরুদ্ধে নির্বাক বিদ্রোহে ধূমায়িত হতে থাকে। মনের লড়াই দেহ আর প্রাণ দুয়েরই সঙ্গে : কখনও দেহকে সে তাড়না করে প্রাণের পক্ষ নিয়ে, কখনও-বা প্রাণোচ্ছ্বাসের সংযম দ্বারা দেহকে প্রাণের উত্তাল বাসনার দুর্নিবার প্লাবন হতে আগলে রাখে। আবার কখনও প্রাণকে কবলিত ক'রে তার শক্তিকে সে নিয়োজিত করতে চায় নিজের ইষ্ট-

সাধনায়—মানবজীবনে প্রাণের সহায়ে বুদ্ধি হৃদয় ও রসচেতনার বহুমুখী পরিতর্পণে খোঁজে নিজের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির পরম উল্লাস। শৃঙ্খলিত প্রাণ সে-জুলুম না সইতে পেরে যখন-তখন বিদ্রোহ করে বসে অজ্ঞান অবুঝ অত্যাচারী মনিবের বিরুদ্ধে। প্রাকৃত জীবনে অহরহ চলছে এই কুরুক্ষেত্র, মন তার সার্থক সমাধান খুঁজে পায় না। মর্ত্য দেহে ও প্রাণে অমর্ত্যের অভীপ্সা যদি লেলিহান হয়ে ওঠে, কি করে সে তার উত্তালতা শান্ত করবে? যুগ-যুগ ধরে শুধু আপাসরফার দীর্ঘ একটা পরম্পরা—এই তার একমাত্র পথ। নয়তো আর একটা পথ : সমাধানের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হয় জড়বাদীর মত মর্ত্যভাবের কাছে নতি স্বীকার করা, নয়তো অধ্যাত্মবাদী বৈরাগীর মত পার্থিব জীবনকে ধিক্কৃত করে অন্তরের নিভৃতে আবিষ্কার করা নিরায়াস জীবনের নন্দনকানন।...কিন্তু সমস্যার সত্যকার সমাধান হবে একমাত্র সেই উন্মনীতত্ত্বের আবিষ্কারে, অমৃতত্ব যার শাশ্বত ধর্ম; এবং সেই অমৃত-বোধদ্বারাই নির্জিত করতে হবে মর্ত্যভাবের সকল দৈন্য।

কিন্তু দেহ-প্রাণ-মনের অন্যোন্যসংঘর্ষেই শুধু নয়—শক্তি আর চেতনার বিচ্ছেদ ঘটেছে আরও গভীরে এবং তাইতে দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জীবনের এই পঙ্গুতা। দেহের সঙ্গে প্রাণ ও মনের বিরোধ তো আছেই, তাছাড়া তাদের নিজের মধ্যেও আত্মবিচ্ছেদের বীজ আছে। দেহে অধিষ্ঠিত অন্নময় পুরুষ সহজসংস্কারের বশে চলে—দেহের নিজস্ব সামর্থ্য তার সামর্থ্যের অনুরূপ নয়। তেমনি আধারস্থিত প্রাণশক্তির সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে গেছে সংবেগপ্রধান প্রাণময় পুরুষের সামর্থ্য, মনঃশক্তির সামর্থ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে বুদ্ধি- ও আবেগ-প্রধান মনোময় পুরুষের বীর্য। কারণ, প্রত্যেক আধারে অধিষ্ঠিত অন্তঃসংজ্ঞ পুরুষের নিজেকে পুরাপুরি পাবার একটা অভীপ্সা আছে। অতএব সবসময় তিনি বর্তমান আধারের সংকীর্ণ সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে চান। তাই আধারের অন্তর্নিবিষ্ট শক্তিকে কেবল তিনি সমুখপানে ঠেলে চলেন—অনভ্যস্ত পথে, অজানিতের অভিসারে। তাঁর এই নিরন্তর প্রেতিতে সাড়া দেওয়া শক্তির পক্ষে সহজ হয় না, বিশেষত যখন বর্তমানের দৈন্য হতে মুক্ত হয়ে বিপুলতার সামর্থ্যের মধ্যে নিজেকে তুলে ধরবার ডাক আসে। পুরুষের ত্রয়ীর সঙ্গে কোশের ত্রয়ীর এই দ্বন্দ্বে আধারশক্তি দিশাহারা হয়ে পড়ে। পুরুষের দাবি মেটাতে গিয়ে সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারের, সংবেগের সঙ্গে সংবেগের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, আবেগের সঙ্গে আবেগের তুমুল সংঘাত সে বাধিয়ে দেয়। একজনকে খুশী করতে আরেকজনকে সে বঞ্চিত করে এবং তাতে ব্যাপার যখন আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে, তখন অনুতপ্ত হয়ে কৃতকর্মের ত্রুটি শোধরাতে চালায় অবিশ্রান্ত গোঁজামিল আর আপাসরফা—কিন্তু কোনমতেই একসূত্রে সব-কিছুকে গেঁথে নেবার হদিশ পায় না! মনের মধ্যে যে-চিদ্বীর্য নিগূঢ়

আছে, এই বিক্ষোভ আর বিপর্যয়ের মধ্যে ঐক্যের ছন্দঃসুষমাকে আবিষ্কার করা ছিল তার কাজ। কিন্তু তার বিজ্ঞান আর সংকল্পের সামর্থ্যও যেমন সংকুচিত—তেমনি ও-দুয়ের মাঝে শুধু তারতম্য নয়, একটা রেষারেষিও আছে। বস্তুত ঐক্যের সূত্র নিহিত রয়েছে অতিমানসের উত্তরভূমিতে, কেননা সমস্ত বৈচিত্র্য তারই মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে অদ্বৈতচেতনার মর্মবৃন্তে। সেখানে সংকল্প বিজ্ঞানের অনুরূপ, অতএব দুয়ের মাঝে আছে পরিপূর্ণ সৌষম্য। চৈতন্য আর শক্তি সামরস্যের দিব্যমহিমায় নিত্যসংগত সেইখানেই।

মানুষ যত আত্মসচেতন হয়, মনের শক্তি যত সত্য হয়ে ওঠে তার মধ্যে, এই বিরোধ ও বৈষম্যের চেতনাও ততই তীব্র হয়ে তাকে পীড়িত করে। তখন সে চায়, তার দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে জ্ঞান সংকল্প ও বেদনার মধ্যে নেমে আসুক সৌষম্যের অপরাজিত ছন্দ, আধারের তন্ত্রে-তন্ত্রে বেজে উঠুক ঐক্যের রাগিণী। কখনও-কখনও একটা কাজচলাগোছের আপাসরফা দাঁড় করিয়ে এ-আকূতির নিবৃত্তি হয়। তার ফলে বিরোধের অবসানে সাময়িক শান্তিও হয়তো দেখা দেয়। কিন্তু রফামাত্রেই চলতিপথে থমকে দাঁড়ানো শুধু। আমাদের অন্তর্যামী কিছুতেই তাতে খুশী হতে পারেন না। তিনি চান পূর্ণ সৌষম্যের সেই সহস্রদলটি—যার মধ্যে আমাদের বহু-বিচিত্র সম্ভাবনার ঘটেছে ছন্দোময় সম্যক্ বিকাশ। এ-দাবিকে খাটো করলে সে হবে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া—তার সমাধান নয়। বড় জোর তাকে বলা চলে সাময়িক একটা সমাধান মাত্র—আত্মার উদয়ন ও আত্মপ্রসারণের নিরন্ত অভিযানে ক্ষণেকের একটা বিশ্রাম-ভূমি শুধু। পরিপূর্ণ সৌষম্যকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই মনের পরিপূর্ণ বিকাশ, প্রাণশক্তির নিখুঁত লীলায়ন, দৈহ্যসত্তার অনবদ্য ছন্দন। কিন্তু অপূর্ণতা যার গোড়ার গলদ, কি করে তার মধ্যে পূর্ণতার তত্ত্ব এবং বীর্য খুঁজে পাব? সংকোচ আর খণ্ডতা যে-মনের স্বধর্ম, অখণ্ড পূর্ণতার সন্ধান সে আমাদের দেবে কি করে? প্রাণ আর দেহও নিরুপায় এখানে, কেননা তারা খণ্ডন- ও বিভাজন-ধর্মী মনেরই বিভূতি এবং আয়তন। পূর্ণতার তত্ত্ব ও বীর্য নিহিত আছে অবচেতনায়—অবরমায়ার আবরণে আবৃত হয়ে, অসিদ্ধ পুরুষার্থের নির্বাক সূচনারূপে। অতিচেতনায় আছে তাদের নিত্যসিদ্ধ প্রকটরূপ—চেতনায় অবতরণের প্রতীক্ষায়। কিন্তু অবিদ্যার আবরণে আজও তারা আমাদের কাছে আড়াল হয়ে রয়েছে। অতএব সমন্বয়সাধনার বীর্য ও বিজ্ঞানকে খুঁজতে হবে ওই লোকোত্তর ভূমিতে—আমাদের এই প্রাকৃত ভূমিতেও নয়, অবচেতনাতেও নয়।

তেমনি, আত্মপরিণতির সংগে-সংগেই মানুষ তীব্রভাবে অনুভব করে, অজ্ঞান ও বৈষম্যের দ্বন্দ্ব কি করে জগতের সংগে তার সম্বন্ধকে বিকৃত করেছে। তীব্র অসহন এ-দ্বন্দ্ব, তাই এর সমাধান খোঁজে সে শান্তি সৌষম্য ঐক্য ও আনন্দের

সহজ সিদ্ধিতে। কিন্তু সে-সিদ্ধির সঙ্কেতও আসবে উপর থেকে। কারণ বিশ্বাত্মভাবকে এই চেতনাতেই সিদ্ধ করতে হলে চাই দেহ প্রাণ ও মন সবার প্রসারণ ও রূপান্তর। মন তখন নিজের সঙ্গে-সঙ্গে জানবে অপর মনেরও তত্ত্ব—পরস্পরকে না-জানার এবং ভুল করে জানার বিভ্রাট হতে সে মুক্ত হবে। তখন একত্বভাবনার ফলে নিজের সংকল্পের সঙ্গে অপরের সংকল্পের বিরোধ ঘটবে না, হৃদয়ের উন্মুক্ত অঙ্গনে নিজের ভাবের সঙ্গে এসে মিশবে সবার ভাব। প্রাণশক্তি তখন অপর প্রাণের বীর্যকে আপন বলে অনুভব করবে এবং নিজের মত করে তাদেরও সিদ্ধি খুঁজবে। দেহও তখন আর জগৎ হতে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখবার একটা কারাপ্রাচীর হবে না। এক সত্য ও জ্যোতির সিদ্ধবিধান তখন ছাপিয়ে যাবে—ঘরে-বাইরে যত ভ্রম ও প্রমাদ মিথ্যা ও কলুষ ছেয়ে আছে মানুষের হৃদয় মন প্রাণ ও আকৃতিকে। এমনি করে মানুষের সিদ্ধজীবন শুধু চিন্ময় ভাবনাতে নয়, প্রাকৃত ব্যবহারেও সবার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে—এমনি করেই জীবাত্মা তার বিশ্বাত্মভাবের নিরঙ্কুশ মহিমা ফিরে পেতে পারে। এই সর্বাত্মভাব অবচেতনায় আছে, আছে অতিচেতনায়। কিন্তু তার জন্যে উত্তরায়ণের পথেই চলতে হবে—এই হল বিধির বিধান। কারণ, যে অনাদি প্রেতি চেতনার বিচিত্র পরিণামকে আজ মনুষ্যলোকে উত্তীর্ণ করেছে, তার অভিযান অব্যক্তব্রহ্মের অভিমুখে নয়—যিনি নিগূঢ় হয়ে আছেন 'অপ্রকেত সলিলে, তম যেখানে গূঢ় হয়ে আছে তমের দ্বারা'।* সে ধাবিত হয়েছে সেই ব্যক্তব্রহ্মের অভিমুখে যিনি পরমব্যোমে অনন্ত জ্যোতির সমুদ্রে সমাসীন।†

এতদূর এসে আজ যদি মানবজাতি মহাপ্রস্থানের পথের ধূলায় লুটিয়ে না পড়ে, আকৃতিচঞ্চলা বেদনাবিধুরা বিশ্বজননীর যোগ্যতর সন্তানের হাতে যদি না তুলে দিতে হয় তাকে জয়শ্রীর উত্তরাধিকার, তাহলে উদয়নের এই জ্যোতিঃসরণি ধরে চলতেই হবে তাকে প্রেম ও দীপ্তবুদ্ধির প্রেরণা নিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে পরকে পাবার প্রাণময় আকৃতি বহন করে। কিন্তু তারও পরে উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে অতিমানসের অদ্বৈতভূমিতে, উন্মনীর আলোকে যেখানে সার্থক হয়েছে প্রাণ মন ও প্রেমের আরতি। মানুষের জীবন যেদিন অতিমানস অদ্বৈত-চেতনার লোকোত্তর অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হবে—যার মধ্যে তার সমগ্র সত্তার প্রতি তন্ত্র ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে 'একং সৎ' ও বিশ্বের পরমসামরস্যের সামঝঙ্কারে, সেই-দিন হবে তার পুরুষার্থের পরম সিদ্ধি, আসবে তার চিরাভীপ্সিত প্রমুক্তি। এই দিব্য জন্ম ও কর্মের সাধনাকেই আমরা বলেছি 'ব্রহ্মণঃ পথি বিততঃ' বিশ্ব-প্রাণের উদয়নীয়যজ্ঞের তুরীয় পর্ব।

---

* ঋগ্বেদ (১০।১২৯।৩)

† সূর্যের ওপারে রয়েছে যে-অপ্‌এরা জ্যোতির্লোকে, আর অবরলোকেও রয়েছে যারা।—ঋগ্বেদ (৩।২২।৩)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চৈত্য-পুরুষ

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা।

কঠোপনিষৎ ৪।১২, ৬।১৭; শ্বেতাশ্বতর ৩।১৩

পুরুষ—অন্তরাত্মা—অঙ্গুষ্ঠমাত্র যিনি।

—কঠোপনিষদ (৪।১২, ৬ ১৭); শ্বেতাশ্বতর (৩।১৩)

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

কঠোপনিষৎ ৪।৫

জীবনের মধুভোক্তা এই আত্মাকে জানে যে, ভূত ও ভব্যের ঈশান যিনি—তার আর জুগুপ্সা থাকে না এর পরে।

—কঠোপনিষদ (৪।৫)

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

ঈশোপনিষৎ ৭

কি-ই বা মোহ, কি-ই বা শোক তার—একত্বকে দেখছে যে সকল ঠাঁই ?

—ঈশোপনিষদ (৭)

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯

যে জেনেছে ব্রহ্মের আনন্দ, তার ভয় নাই তার কোথা থেকে।

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ (২।৯)

'প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ'।—এই উদয়নের প্রথম পর্বে প্রাণকে দেখেছি মূঢ় অচেতন অন্ধ একটা প্রবেগরূপে। জড়ের মধ্যে কুণ্ডলিত আকূতির নিগূঢ় স্পন্দনে সে স্পন্দিত, আচ্ছন্ন পরমাণুচেতনার গর্ভাশয়ে সে যেন ব্যক্তিত্বের ভ্রূণ। তার আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্য নাই, নাই জড়-পরিণামকে আত্মসাৎ করবার বীর্য—বিশ্ববিধানের একান্ত কবলিত ক্রীড়নক সে, এই তার নিয়তি। দ্বিতীয় পর্বে প্রাণ দেখা দিল আত্মসাৎ করবার উদগ্র কামনারূপে, কিন্তু তখনও তার সামর্থ্য কুণ্ঠিত। তৃতীয় পর্বে জাগল প্রেমের কোরক—যুগপৎ আত্মসাৎ আর আত্মদান করবার প্রবৃত্তিতে সমঞ্জসা রতি ফুটল তার মধ্যে। সেই কোরক তুরীয় পর্বে ফুটবে অতিমানস সরোবরে সহস্রদল কমল হয়ে : তার মধ্যে বিশ্বের মর্মে নিগূঢ় অনাদি আকূতি নিরঞ্জন সিদ্ধমহিমায় রূপায়িত হবে। উদয়নের মধ্য-পর্বে যে ক্ষুব্ধ কামনা দেখা দিয়েছিল, তার জ্যোতির্ময় পরিতর্পণ ঘটবে। দ্যুলোকের মহারাসমণ্ডে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের পরমসামরস্যে প্রেমের চিন্ময় আত্ম-বিনিময় লোকোত্তর সুগভীর তৃপ্তিতে নন্দিত হবে। গভীর অনুধ্যানের ফলে দেখতে পাব, পর্বে-পর্বে প্রাণের এই উদয়নে রূপায়িত হয়েছে পুরুষেরই ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকৃতিতে নিগূঢ় আনন্দের এষণা। এ-উদয়ন বিশ্বে অনুস্যূত

ব্রহ্মানন্দের উদয়ন। জড়ের গভীর গহনে তার অব্যক্ত সূচনা, তারপর রসাভাস ও রসবৈচিত্র্যের দীর্ঘ পরম্পরা অতিক্রম করে তার পরম পর্যবসান চিন্ময় স্বরূপানন্দের প্রদীপ্ত বর্ণচ্ছটায়।

বিশ্বের তত্ত্ব যে পেয়েছে সে জানে, কিছুতেই এ-লীলার অন্যথা হতে পারে না। এ-জগৎ সৎ-চিৎ-আনন্দেরই ছদ্মরূপ। যে ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির নিত্যস্থিতি ও বিলাস, আনন্দ তার স্বরূপ এবং সে-আনন্দ সর্বগত আত্মরতির আনন্দ। প্রাণ যখন ব্রহ্মের চিৎশক্তির তপোবীর্য, তখন তার সকল স্পন্দনের মূলে এক নিগূঢ় সর্বগত আনন্দের প্রেতি থাকবে। নিখিল প্রাণ-প্রবৃত্তির সে-ই হবে উৎস প্রবর্তক ও পরিণাম। অহংকারের খণ্ডলীলায় সে-আনন্দ যদি পরাভূত তিরস্কৃত হয়, এমন-কি সে যদি কখনও নিরানন্দ হয়েও দেখা দেয়—শাশ্বত আত্মভাব যেমন দেখা দেয় মৃত্যুর ছদ্মবেশে, চেতনা ফোটে অচিতি হয়ে, শক্তি আপনাকে সংবৃত্ত করে অশক্তির ছন্নলীলায়—তাহলেও ওই বিশ্বানন্দের আবেশ ছাড়া কোনও জীব পরিতৃপ্ত হতে পারে না, প্রাণের ধারায় উজিয়ে চলা কি ভাটিয়ে যাওয়া দুইই তখন তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা আনন্দ যে তার সত্তার অন্তর্গূঢ় অখণ্ডানন্দ—বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক সচ্চিদানন্দের সর্বগত সর্বানুস্যূত সর্বাধার অনাদি আনন্দ। তাই আনন্দের এষণাই বিশ্বপ্রাণের প্রথম প্রেতি, তার মর্মকথা। তাই তো বাসনার ব্যাকুলতা, ভোগের তর্পণ ও ঐশ্বর্যের সাধনা ছেয়ে আছে তার প্রবর্তনা।

আনন্দের এষণা প্রাণের স্বধর্ম। কিন্তু এ-আধারে কোথায় খুঁজে পাব সেই আনন্দরূপ? বিশ্বলীলার সাধনরূপে চিৎশক্তি প্রাণকে ফুটিয়েছে, অতিমানস ফুটিয়েছে মনকে। কিন্তু এ-আধারের কোন্ তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিশ্বে তাঁর আনন্দলীলা হিল্লোলিত? বিশ্বভাবন দিব্যপুরুষের চারটি বিভাব আমরা দেখেছি: তিনি সন্মাত্র, চিৎশক্তি, আনন্দরূপ এবং অতিমানস। এও দেখেছি জড়বিশ্বে অতিমানস সর্বগত অথচ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রত্যেক বাস্তব-প্রতিভাসে অন্তর্গূঢ় রহস্যশক্তির বিচ্ছুরণরূপে তার আবেশ, কিন্তু প্রাকৃত-পরিণামের লীলায় নিজের গৌণবিভূতি মনকে সে তার সাধন করেছে। তেমনি ব্রহ্মের চিৎশক্তি জড়বিশ্বে অনুস্যূত প্রচ্ছন্ন ও বিশ্বলীলায় নিগূঢ় স্পন্দনে স্পন্দিত হয়েও বিশেষ করে নিজের গৌণবিভূতি প্রাণের রূপে ফুটে উঠছে। এখনও পৃথক করে জড়ের তত্ত্ব আলোচিত হয়নি। তবুও বোঝা যায়, ব্রহ্মের সদ্‌ভাবও জড় বিশ্বপ্রতিভাসের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আকারে সর্বগত হয়ে আছে—সেখানে বিশ্বের উপাদান, রূপ-ধাতু বা সদ্‌ব্রহ্মের জড়রূপী আত্মবিভূতিতে তার প্রথম প্রকাশ। এমনি করে তাহলে ব্রহ্মের আনন্দও বিশ্বে সর্বগত হয়ে আছে। নিখিল প্রতিভাসের অন্তরালে নিগূঢ় তার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়, তবু কোনও আত্মবিভূতির ছদ্মলীলায় এই আধারেও সে রূপায়িত

হয়েছে। ওই ছন্নবিভূতির সহায়ে সে-আনন্দকে আবিষ্কার করে বিশ্বের কর্মে সার্থক করতে হবে, এই আমাদের জীবনব্রত।

এই আনন্দবিভূতিকে প্রাচীন ঔপনিষদিক অর্থে আমরা বলতে পারি 'পুরুষ'। আধারে এই পুরুষ জীবচেতনারূপে গুহাহিত হয়ে আছে। সে প্রাণ নয়, মন নয়—দেহ তো নয়ই। অথচ এ-তিনের মর্মকোষে নিগূঢ় যে-রসচেতনা আত্মরতির উল্লাস হয়ে প্রীতি জ্যোতি কান্তি ও শুদ্ধসত্ত্বের মাধুরীতে ফুটতে চাইছে, আমাদের হৃৎ-শয় পুরুষ তারই ঘনবিগ্রহ। বস্তুত পুরুষের দুটি রূপ আমাদের মধ্যে—যেমন প্রাকৃত আধারে প্রত্যেক বিশ্বতত্ত্বের রয়েছে যুগনদ্ধ রূপ। সত্য বলতে আমাদের দুটি মন। একটি সাধারণ বহিশ্চর মন, যা আমাদের পরিণময়মান অহংএর বিসৃষ্টি—যাকে আমরা জড়ের কবল হতে প্রমুক্ত চেতনার বহির্ভাসরূপে গড়েছি। আরেকটি আমাদের অধিচেতন মন, যা মনোময় ব্যবহার-জীবনের কুণ্ঠচার হতে নির্মুক্ত এক বিশাল বীর্যময় জ্যোতিষ্মান তত্ত্ব। যে বহিশ্চর মনোময় পুরুষবিধতাকে নিজের স্বরূপ বলে আমরা ভুল করি, এ-মন আছে তারও অন্তরালে সত্যকার মনোময় পুরুষরূপে। তেমনি এই আধারে আছে দুটি প্রাণ। একটি বহির্বৃত্ত, অন্নময় বিগ্রহের সঙ্গে জড়িত, প্রাক্তন জড়-পরিণামের সঙ্কোচ দ্বারা পীড়িত—একদিন জন্মেছিল, আজ বেঁচে আছে, আবার একদিন সে মরবে। আরেকটি প্রাণ এক অধিচেতন শক্তির সংবেগ—জীবন-মরণের বন্ধনী দ্বারা সে বেষ্টিত নয়। সে-ই আমাদের সত্যকার প্রাণময় পুরুষ। যে-প্রাণলীলাকে জীবনের সত্যরূপ বলে ভুল করি, তার পিছনে তার অধিষ্ঠান। এমন-কি এই দ্বৈতলীলা আমাদের অন্নময় সত্তাতেও আছে। এই স্থূলদেহের অন্তরে আছে এক ভূতসূক্ষ্মময় সত্তা—যা শুধু অন্নময় কোশের নয়, প্রাণময় ও মনোময় কোশেরও শাশ্বত উপাদান। ভুল করে যে-স্থূলবিগ্রহকে আত্মার সমগ্র ভোগায়তন ভাবি, অন্নময় পুরুষরূপে তারও সে অধিষ্ঠাতা। তেমনি আবার জীবচেতনারও রয়েছে দুটি রূপ। একটিকে জানি বহিশ্চর কামপুরুষ বলে—যে এষণা-বেদনায় নিত্য উদ্বেল, সুখসঙ্গ জ্ঞানসঙ্গ ও ঐশ্বর্যের আকূতিতে চঞ্চল। আরেকটি আমাদের অধিচেতন জীবসত্তা—প্রীতি জ্যোতি আনন্দ ও সত্ত্বশুদ্ধির দিব্যবীর্যে যে জ্যোতিষ্মান। সাধারণত আমরা যাকে জীবচেতনার মর্যাদা দিই, তারও অন্তর্গূঢ় ওই শুদ্ধসত্ত্বই তো আমাদের জীবাত্মার সত্য স্বরূপ। এই শুদ্ধ বিপুল জ্যোতির্ময় জীবচেতনার ছটা কারও বাইরে প্রতিফলিত হলে আমরা বলি, 'মানুষটার হৃদয় আছে'। আর বাইরে তার প্রকাশ স্তিমিত দেখলেই বলি, 'মানুষটা হৃদয়হীন'।

আধারের বহিরঙ্গ হয়ে ফুটেছে সঙ্কীর্ণ অহন্তার বিকার শুধু। কিন্তু অধিচেতন ভূমিতে পাই আমাদের ব্যষ্টিভাবের সত্য ও বৃহৎ ব্যক্তির মর্ম-

পরিচয়। এই বিপুল ব্যাপ্তি আধারে গূঢ়াহিত হয়ে আছে। অথচ এইখানে আমাদের ব্যক্তিচেতনাও রয়েছে বিশ্বচেতনার কাছ ঘেঁষে—তাকে ছুঁয়ে তার সঙ্গে নিরন্তর মাখামাখি হয়ে। তাই আমাদের অধিচেতন মনে বিরাট মনের বিশ্ববিজ্ঞানের আলো পড়ে, অধিচেতন প্রাণে সঞ্চারিত হয় বিরাট প্রাণের বিশ্বব্যাপী সংবেগ, অধিচেতন তনুতে লাগে অন্নময় বিরাটের বিশ্বব্যাপ্ত শক্তিব্যূহের দোলা। কিন্তু অধিচেতনা হতে বিবিক্ত হয়ে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের চারদিকে কতগুলি নিরেট দেয়াল গড়ে উঠেছে। বিশ্বপ্রকৃতি তাদের অতিকষ্টে অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে ভেদ করে—সুনিপুণ অথচ আনাড়ি কতগুলি স্থূল উপায়ে। অধিচেতনায় এ-ব্যবধান নিতান্ত ফিকা, তাই সেখানে তা একই সময়ে বিচ্ছেদ ও যোগাযোগের সাধন। আমাদের হৃৎশয় অধিচেতন পুরুষের 'পরেও তেমনি ঝরছে বিরাট পুরুষের জগদানন্দ—যে-আনন্দ উপচে ওঠে তাঁর স্বরূপসত্তায়, তাঁর ভূতভাবন জীবঘন বিভাবনায়, যে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের খেলা নিখিলব্যাপী তাঁর জীবলীলার বাহন তার উচ্ছলনে। অহংকারের অতিস্থূল প্রাকার দ্বারা কামপুরুষ জগদানন্দের এই উল্লাস হতে বিচ্ছিন্ন রয়েছে, যদিও সে-প্রাকারের মাঝে-মাঝে আছে জ্যোতির দুয়ার। কিন্তু বিরাটের আনন্দচ্ছটা সে-নির্গমপথে নামতে গিয়ে স্তিমিত ও বিকৃত হয়ে যায়, কিংবা দেখা দেয় বিপর্যয়ের ছদ্মবেশে।

অতএব মানতে হয়, এই বহিশ্চর কামময় জীবচেতনায় কখনও জীব-স্বরূপের সত্য পরিচয় মেলে না। এর মধ্যে দেখি শুধু জীবসত্ত্বের বিকৃতি, পাই বিশ্বযোগের একটা প্রতীপ অনুভব মাত্র। জীব যে তার সত্যস্বরূপ খুঁজে পায় না, তাকেই বলি ভবরোগ। সে-রোগের নিদান তার কুণ্ঠিত অনুভব। বহির্জগৎকে বাহুবন্ধনে বেঁধেও সে তার অন্তরাত্মার নিবিড় স্পর্শটুকু পায় না। জগতের বুকে খুঁজছে সে সত্তা চৈতন্য বীর্য ও আনন্দের রসঘন অনুভব, অথচ প্রতিনিয়ত তার চেতনা হয়ে উঠছে বিরুদ্ধ স্পর্শ ও প্রত্যয়ের কণ্টকশয়ন। ওই রসসান্দ্র অনুভবটি একবার পেলে এই শরশয্যাতেও তার জাগত সৎ-চিৎ-আনন্দ-বীর্যের মুগ্ধ শিহরন। সমস্ত আপাতবিরোধ অখণ্ডসত্যের বৃহৎসামে রণিত হয়ে উঠত এই মাত্রাস্পর্শের স্বরগ্রামের ভিতর দিয়ে। সেই সঙ্গে সে পেত জীবসত্ত্বের সত্য পরিচয় এবং সেই পরিচয়ে জানত তার আত্মাকে—কেননা জীবভাব তার আত্মস্বরূপের প্রতিভূ এবং তার আত্মাই বিশ্বাত্মা। কিন্তু অহংকারবিমূঢ় বলে এ-অনুভব হতে সে বঞ্চিত। মূঢ় অহমিকা তার সকল মনন হৃদয়ের সকল ভাব ছেয়ে আছে—এমন-কি ইন্দ্রিয়-বোধকে পর্যন্ত। তাই বিষয়সংস্পর্শে তার ইন্দ্রিয় নন্দিত হয়ে জগৎকে উল্লসিত বীর্যের নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে না। বিশ্বের স্পর্শে কখনও তার মধ্যে জাগে খুশি, কখনও বিরক্তি, কখনও তৃপ্তি, কখনও-বা অতৃপ্তি। তাই

তার সাড়াও হয় বিচিত্র। বিশ্বের দিকে কম্পিত আকূতি নিয়ে কখনও সে এগিয়ে যায় সতর্ক পদক্ষেপে, অথবা অধীর উদ্দামতায়। আবার কখনও জুগুপ্সায় ছিটকে পড়ে তার কাছ থেকে—ক্রোধে ত্রাসে মূঢ় বিরাগে বা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তিতে। জীবনকে এমনি করে ভুল বুঝে কামপুরুষই নিখিলের রসঘন অনুভবকে বিকৃত করে। তার ফলে সত্তার নিরঞ্জন স্বরূপানন্দ সুখ-দুঃখ-মোহের সাঙ্কর্যে ছড়িয়ে পড়ে চেতনায় বি-ষম হয়ে।

বিশ্বে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, সুখ-দুঃখ-ঔদাসীন্যের যে ব্যাবহারিক অনুভব, তার ঐকান্তিকতা বা স্বারসিক কোনও প্রামাণ্য নাই। গ্রাহক-চেতনার প্রত্যক্-বৃত্তি দিয়ে তাদের তারতম্য নিরূপিত হয়। তাই সুখ-দুঃখের অনুভবকে তারার নিখাদে চড়ানো যায় যেমন, তেমনি আবার নামিয়ে আনা যায় উদারার খরজে—এমন-কি তাদের আপাত-প্রতিভাসকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলাও চলে। এমনি করে সুখকে দুঃখে অথবা দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করা যায়। কেননা স্বরূপত তারা যে একই রসচেতনা, শুধু বোধে ও বেদনায় বেজে ওঠে ভিন্ন সুরে—এই না তাদের মর্মরহস্য। ঔদাসীন্যেরও তেমনি তিনটি রূপ আছে। কামপুরুষের চিত্ত কখনও অনবহিত কি অসামর্থ্যবশত অসাড় থাকে, তখন বিষয়রসের বোধ বেদনা ও পিপাসা সুপ্ত অথবা লুপ্ত থাকে তার মধ্যে। কখনও-বা রসের সংস্পর্শেও সে বহিশ্চর চিত্ত দিয়ে সাড়া দিতে চায় না। আবার কখনও ইচ্ছাশক্তির জোরে সুখ-দুঃখের অনুভবকে উৎখাত করে চিত্তে সে ফুটিয়ে তোলে অপরিগ্রহের নির্বর্ণতা। তিনটি ব্যাপারেই, রসবোধ উদ্রিক্ত থাকে অধিচেতনায় —শুধু থাকে না কামপুরুষের বহিশ্চেতনায় তাকে ব্যক্তরূপে ফুটিয়ে তোলবার ইচ্ছা আয়োজন বা সামর্থ্য।

আধুনিক মনোবিদের অবেক্ষা ও পরীক্ষার কল্যাণে আমরা এখন জানি, বহিশ্চেতন মন যে-স্পর্শযোগের খবর রাখে না, তারও অনুভব ও স্মৃতি অধি-চেতন মনে সঞ্চিত থাকে। তেমনি অধিচেতন পুরুষেরও রসানুভব নিত্য সজাগ রয়েছে। বহিশ্চেতন কামপুরুষ যাকে বিরক্ত হয়ে বা বিরস জ্ঞানে বর্জন করে অথবা তটস্থ অপরিগ্রহের ভানে উপেক্ষা করে, অধিচেতন পুরুষ সেই পিপ্পলের মধ্যেও আস্বাদন করেন স্বাদু রস। বস্তুত নিজেকে পুরাপুরি জানতে হলে এই পরাক্-চেতনার অন্তরালে ডুবতে হবে, কারণ এ তো আমাদের ব্যাবহারিক অনুভবের একটা চয়নিকা শুধু—চেতনার সকল সুর তো এর তারে-তারে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না। এর ত্রস্ত অপটু খণ্ডিত তর্জমায় বিপুল জীবনরহস্যের কতটুকুই-বা রূপ পায়? তাই পরাক্চেতনা পার হয়ে এষণাকে যদি অবচেতনার অতল গহ্বরে না তলিয়ে দিই, নিজেকে যদি না মেলে ধরি অতিচেতনার বৈপুল্যের দিকে, তাহলে প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ তা জানতেও

পারব না। আত্মবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করতে পরাক্‌চেতনার সঙ্গে-সঙ্গে জানতে হবে অবচেতনা ও অতিচেতনার রহস্য। কারণ, আমাদের সমগ্র জীবন এই তিনটি লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাই এই ত্রয়ীর পরিচিতিতেই তার অখণ্ডরূপ ধরা পড়ে। প্রাকৃত আধারে যা অতিচেতন, বিশ্বম্ভর বিশ্বাত্মার সঙ্গে তা এক হয়ে আছে—প্রাতিভাসিক বৈচিত্র্যের শাসন সে মেনে চলে না। তাই বস্তুর স্বরূপসত্য ও স্বরূপানন্দের সে পেয়েছে পূর্ণ অধিকার। আমরা যাকে বলি অবচেতনা, তার জ্যোতির্মুখ রূপ হল অধিচেতনা। কিন্তু অধিচেতনার আবেশে থেকেও বিশ্বানুভবের সাধনই সে, ভর্তা নয়। বিশ্বম্ভর বিশ্বাত্মার সঙ্গে কার্যত একাত্মক না হয়েও বিশ্বানুভবের ভিতর দিয়েই নিজেকে সে মেলে রেখেছে তাঁর দিকে। অধিচেতন পুরুষ বিশ্বের রসরূপটি অন্তরে-অন্তরে জানেন, তাই তার সকল স্পর্শেই তাঁর সমান রতি। আবার বহিশ্চর কামপুরুষের অনুভবের অর্থ ও অধিকারও তিনি জানেন, তাই সুখ-দুঃখ-ঔদাসীন্যের স্পর্শকে উপরে-উপরে স্বীকার করেও সমান আনন্দই ভোগ করেন সবার মধ্যে। অর্থাৎ আমাদের অন্তরপুরুষ সকল অনুভবেই উল্লসিত, সব-কিছু হতে জ্ঞান বল ও সুখ আহরণ করে রসের উপচয়ে ভরে তোলেন তাঁর মধুচক্র। এই অন্তরপুরুষের প্রচোদনাতে আমাদের কামচিত্ত দুঃখ-আঘাত সয়েও তার মধ্যে খুঁজে পায় সুখ, অভ্যস্ত সুখকে করে বর্জন, তার অর্থের ঘটায় রূপান্তর কি বিপর্যয়, উপেক্ষার সাধনায় অর্জন করে সমত্ববোধ অথবা বিশ্ববৈচিত্র্যের উল্লাসে সব-কিছুতেই পায় সমান আনন্দ। তার এ-সাধনার মূলে আছে সেই বিরাটের প্রেতি—যিনি বিচিত্র অনুভবের রসায়নে তার প্রকৃতিকে পুষ্ট করতে চান। এইখানেই মানবচেতনার বৈশিষ্ট্য। শুধু কামপুরুষ যদি তার প্রভু হত, তাহলে তাকে গাছপালা কি পাথরের মত স্থাণু হয়ে থাকতে হত। তাদের প্রাণ বহিঃসংজ্ঞ নয় বলে স্থাণুত্ব বা গতানু-গতিকতার আড়ষ্টতার মধ্যে অন্তর্যামী আজও এমন-কোনও সাধন খুঁজে পাননি, যা জাতি-ধর্মের বাঁধা পর্দা ছাড়িয়ে প্রাণের সুরকে মুক্তি দিতে পারে। কামপুরুষও আপন চালে চলতে পেলে ওদের মত চিরকাল শুধু একই খাতে পাক খেয়ে মরত।

প্রাচীন দার্শনিকদের মতে সুখ-দুঃখের অন্যোন্যসম্বন্ধ অনতিবর্তনীয়—সত্য-মিথ্যা, শক্তি-অশক্তি, জীবন-মরণের মত। তাই তাদের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ সম্পূর্ণ উপেক্ষা—অর্থাৎ নিঃসাড় হয়ে থাকা বিশ্বসত্তার অভিঘাতে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর পর্যালোচনায় বোঝা যায়, বিশ্বের বহিরঙ্গ তথ্যের 'পরে এ-মতের প্রতিষ্ঠা বলে সমস্যাসমাধানের পুরা সঙ্কেতটি এর মধ্যে মেলে না। অন্তরপুরুষকে বহিশ্চেতনার পুরোধা করে অহংশাসিত সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বকেও এক সমরস সর্বাবগাহী সবিশেষ-নির্বিশেষ আনন্দ-

চেতনায় রূপান্তরিত করা চলে। নিসর্গ-প্রেমিকের মধ্যে এমনিতর নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আবেশ আছে। তাই প্রকৃতির সকল রূপে তার সমান আনন্দ। তার মধ্যে ভয় বা জুগুপ্সা নাই, নাই সংস্কারবশে ভাল-লাগা আর না-লাগার মূঢ়তা। অপরের কাছে যা তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর, নগ্ন এবং অমার্জিত, জুগুপ্সিত এবং ভয়ংকর, তারও মধ্যে দেখে সে সুন্দরকে। এই চেতনার আবেশেই শিল্পী এবং কবি ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসের সন্ধান পায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসে, বহিঃসৌন্দর্যের রূপরেখায় অথবা মানসরূপের মাধুরীতে। প্রাকৃত জনগণ জুগুপ্সায় যাকে ছেড়ে যায় অথবা জড়িয়ে ধরে বর্ণরীতির আকর্ষণে, তারও সত্তার নিগূঢ় বীর্যে তারা খোঁজে সেই রসেরই আস্বাদন। সর্বত্র ইষ্টদর্শী ঈশ্বর-প্রেমিক, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বুদ্ধিজীবী, রসিক অথবা ভোগী—সাধনার ধারা পৃথক হলেও সবাই এই পথের সাধক। বস্তুত তাদের প্রজ্ঞা শ্রী আনন্দ অথবা ব্রহ্মভাবের এষণা সার্থক হবার এছাড়া আর কোনও পথ নাই। সর্বত্র দিব্যভাবের আরোপ হয় একান্ত দুঃসাধ্য, অথবা অনেকের কাছে অসম্ভব বা উৎকট ও জুগুপ্সিত মনে হয় এইজন্য যে, আমাদের আধারের অনেকখানি জুড়ে আছে ক্ষুদ্র অহমিকার নানা জুলুম, দেহের কিংবা মূঢ় হৃদয়ের সুখ-দুঃখের বেদনা, অথবা প্রাণবাসনার রতি-বিরতির সংঘাত। তাদের প্রমত্ততাকে ঠেকিয়ে রাখবার বীর্য বা সামর্থ্য কামপুরুষের নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন মূঢ় অহমিকা সাক্ষিভাবের নৈর্ব্যক্তিকতাকে জীবনসাধনার গভীরে নিয়ে যেতে ভয় পায়, যদিও বিজ্ঞান- কি শিল্প-সাধনায় তার প্রয়োগে তার কুণ্ঠা নাই। এমন-কি কোনও-কোনও অসিদ্ধ সাধকের জীবনে এই নৈর্ব্যক্তিকতা খানিকটা অভ্যস্ত হয়েও যায়, যদি তা বহিশ্চর জীবচেতনার যত্নলালিত বাসনার সঞ্চয়কে বা প্রাকৃতমনের সমর্থিত কামনার তর্পণকে আঘাত না করে। কেননা, ওই বাসনার কুন্ডলীর 'পরেই রয়েছে ব্যাবহারিক জীবনের একান্ত নির্ভর। অধ্যাত্মচেতনার অপেক্ষাকৃত নির্মুক্ত প্রকাশ যেখানে, সেখানেও সমত্ববোধ ও নৈর্ব্যক্তিকতার অংশকলা প্রয়োজন হয়, যা চেতনা ও সাধনার সেই ভূমিরই উপযোগী। কিন্তু তাতে অহংশাসিত ব্যাবহারিক জীবনের কোনও রূপান্তর ঘটে না।...সাক্ষিচেতনাকে নীচে নামিয়ে আনতে হলে চাই জীবনধারার আমূল পরিবর্তন। কিন্তু কামপুরুষের পক্ষে তা অসাধ্যসাধনের শামিল।

যে অন্তর্গূঢ় পুরুষ আমাদের জীবনসত্য ও জীবনাধার, তাঁকে বলেছি 'অধিচেতন' (Subliminal)। কিন্তু একটু গোল হতে পারে কথাটা নিয়ে—কেননা সে-পুরুষের অধিষ্ঠান আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার অবরভূমিতে নয়, যদিও Subliminal শব্দটির ব্যঞ্জনা সেইদিকে। মূঢ় দেহ-প্রাণ-মনের স্থূল কঞ্চুকের অন্তরালে হৃদয়ের মণিকোঠায় জ্বলছে চেতনার দীপকলিকা। এই অন্তর্গূঢ় জীবচেতনাই আমাদের মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতির নিত্যদীপ্ত অধ্যক্ষ

শিখা। অধ্যাত্মবোধের যে নিবিড় অচেতনা ছেয়ে আছে অপরা প্রকৃতিকে, তারও মধ্যে সে জেগে আছে অম্লান, অনির্বাণ। ব্রহ্মজ্যোতি হতে জাত এই জাতবেদা অবিদ্যার কুহরকে উদ্দ্যোতিত করে শয়ান রয়েছেন 'বর্ধমানঃ স্বে দমে'—উপচে চলেছেন আপন ঘরে এবং পরিশেষে অবিদ্যাকে বিদ্যায় রূপান্তরিত করছেন নিজের বীর্যে। ইনিই আমাদের গুহাহিত সাক্ষী ও শাস্তা, আমাদের অন্তর্যামী, সক্রেটিসের Daemon, ভাবকের অন্তর্জ্যোতি বা অন্তশ্চারিণী দিব্যবাক্। ব্রহ্মের অনির্বাণ চিৎকণরূপে ইনিই আছেন জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের মধ্যে অবিনশ্বর—মৃত্যু ক্ষয় বা বিকার দ্বারা অপরামৃষ্ট। অজ কূটস্থ আত্মা যদিও তিনি নন—কেননা কূটস্থ পুরুষ জীবচেতনার অধিষ্ঠাতা হয়েও বিশ্বচেতনা ও অতিচেতনার সংবিতে নিত্যদীপ্ত। তবু তিনি তাঁরই প্রকৃতি-স্থ প্রতিভূ ও প্রতিরূপ। চৈত্য-পুরুষরূপে তিনি সূক্ষ্ম-অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় পুরুষের ভর্তা এবং সাক্ষী, তাদের পুষ্টি ও উপচয়ের ভোক্তা। এ-তিনটি পুরুষের স্বরূপ যদিও আধারের মধ্যে আবৃত, তবু তাদের একটা সাময়িক প্রতিভাস বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের প্রাকৃত জীবভাব গড়ে তোলে। তাদের বহিরঙ্গ বৃত্তি ও স্থিতির সমাহারকে আমরা নিজের স্বরূপ বলে জানি। কিন্তু ওই গুহাশয় অধূমক জ্যোতিই চৈত্যপুরুষরূপে আধারে আবির্ভূত হয়ে উপক্ষিপ্ত করেন আমাদের জীবসত্ত্বকে—যা জন্ম হতে জন্মান্তরে বিপরিণাম উপচয় ও পুষ্টির ধারা বেয়ে চলে। জন্ম হতে মরণে, আবার মরণ হতে নবজন্মে চলেছে এই 'অহদ্ মুসাফির'—বারে-বারে প্রাকৃত কঞ্চুকের বিচিত্র সাজ বদলে। গোপনে-গোপনে মন প্রাণ ও দেহের 'পরেই চৈত্যপুরুষের প্রথম কাজ চলে আংশিক এবং পরোক্ষ উপায়ে—কেননা আত্মপ্রকৃতির এই দিকটাকে তার প্রথমে গড়ে তুলতে হয় আত্মস্ফুরণের সাধনরূপে। তাই দেহ-প্রাণ-মনের পূর্ণ-পরিণামের অপেক্ষায় দীর্ঘযুগ তাদের আবেষ্টনে তাকে বন্দী থাকতে হয়। কিন্তু তার এ-প্রতীক্ষাও ব্যর্থ হয় না—কেননা অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষকে ব্রাহ্মী চেতনার জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করাই তার ব্রত। অতএব অবিদ্যাভূমির সকল অনুভবের সারটুকু আহরণ করে তা-ই দিয়ে সে প্রকৃতির মধ্যে গড়ে তোলে চৈত্যসত্তার একটি কন্দ। অনুভবের অবশেষটুকু হয় তার ভবিষ্য সাধন-সম্পত্তির উপাদান—যতদিন না দেহ-প্রাণ-মনের সকল সাধন ভাস্বর হয়ে ওঠে পরমপুরুষের দিব্য নিমিত্তরূপে। এই নিগূঢ় চৈত্য-পুরুষই আমাদের স্বধর্মের যথার্থ বেত্তা—নীতিবাদীর কল্পিত গতানুগতিক ধর্মবোধের চেয়েও সত্য এবং নিগূঢ় তাঁর প্রেতি। কারণ, এই হৃৎশয় পুরুষই আমাদের নিত্য প্রচোদিত করছেন সত্য ঋত ও শ্রীর দিকে, প্রেম ও সৌষম্যের দিকে—ফুটিয়ে তুলছেন আধারের অন্তর্গূঢ় যত দৈবী সম্পদ। যতক্ষণ পর্যন্ত দিব্যপ্রকৃতির এষণা এই চেতনায় বরিষ্ঠ না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ সাধনার তাঁর

বিরাম নাই। এই চৈত্যপুরুষই সাধক, ঋষি ও কবি আমাদের মধ্যে। 'অর্চন্নন্ন স্বারাজ্যং'—স্বারাজ্যের পূর্ণদীপ্তিতে ভাস্বর ইনিই হিরণ্যবর্তনি হয়ে চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেন আত্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার দিকে—পরম সত্য পরম শিব ও পরমা শ্রী প্রীতি ও রতির দিকে, আমাদের উত্তীর্ণ করেন পরম ব্যোমে, অদ্বৈতভাবনিবিড় বিশ্বমৈত্রীর পরশমণি বুলিয়ে দেন চেতনায়। পক্ষান্তরে চৈত্যপুরুষের ভাব যেখানে অপরিণত বিকৃত ও দুর্বল, সেখানে হয় আধারের সূক্ষ্মতর অংশের বিকাশ হয় না, কিংবা তার সামর্থ্য ও প্রকাশ হয় কুণ্ঠিত—যদিও বাইরে থেকে মনে হয় সাধকের মন দীপ্ত এবং ওজস্বী, হৃদয়বাসনার আবেগ প্রবল অকুণ্ঠ এবং দুর্ধর্ষ, প্রাণশক্তি সর্বজয়া, কায়সম্পৎ সর্বতোভাবে অনুকূল এবং বাহ্যজীবনও ঐশ্বর্য আর জয়শ্রীতে ঝলমল। তখনই জীবনে শুরু হয় কামপুরুষের তাণ্ডব চৈত্যপুরুষের মুখোস প'রে। তার ইঙ্গিত ও অভীপ্সা, ভাব ও আদর্শ, কামনা ও আকূতিকে আমরা তখন অন্তরপুরুষের নির্দেশ এবং অধ্যাত্মজীবনের সম্পদ বলে ভুল বুঝি।* গুহাহিত চৈত্যপুরুষ যদি জীবনের পুরোধা হয়ে কামপুরুষকে নির্জিত করেন, প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের কঞ্চুকের আড়াল থেকে আধারকে অংশত না শাসন করে প্রকট মহিমায় তার পূর্ণ প্রশাসনের ভার নেন, তাহলে জীবনের সমস্ত অভীপ্সা আকূতি ও আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে সত্য ঋত ও শ্রীর চিন্ময় বিগ্রহে। তার ফলে, সমগ্র অপরা প্রকৃতির মোড় ফিরে যায় মানুষের পরম-পুরুষার্থের দিকে—মূঢ় মর্ত্যভাবের চরম পরাভবে চিন্ময় জীবনের মহাবিষুবের দিকে।

মনে হতে পারে, চৈত্যপুরুষকে জীবনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্তারূপে চেতনার পুরোভাগে স্থাপন করতে পারলেই বুঝি আমাদের স্বভাবের সকল এষণা চরিতার্থ হবে, আমাদের সম্মুখে দিব্যধামের জ্যোতির দুয়ার উন্মুক্ত হবে। এমনও মনে হতে পারে, এর পর ব্রাহ্মী স্থিতিতে অথবা পূর্ণসিদ্ধির দিব্যভূমিতে উত্তীর্ণ হবার জন্য ঋত-চিৎ বা অতিমানসের উত্তরলোক হতে শক্তিপাতের আর

---

* Psychic শব্দটি চলতি কথায় সাধারণত বোঝায় কামপুরুষের বৃত্তিকে, চৈত্য-পুরুষের ধর্মকে নয়। বিশেষত শব্দটির প্রয়োগ আরও শিথিল হয়, যখন চিত্তের বিভিন্ন ভূমির নানা অপ্রাকৃত ব্যাপারকে আমরা ওই আখ্যা দিই। এসমস্ত ব্যাপার বাস্তবিক অধিচেতন ভূমিতে অন্তর্মন অন্তঃপ্রাণ বা সূক্ষ্ম অন্তর্দেহের সঙ্গেই যুক্ত। চৈত্যপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাদের কোনও যোগ নাই। Spiritist-রা এমন কথাও বলেন, বিদেহ সত্তা মূর্ত হয়, আবার অমূর্ত-ভাবে মিলিয়ে যায়—এগুলি 'psychic' ঘটনা। ব্যাপারটা সত্য বলে প্রমাণিত হলেও তাকে চৈত্যপুরুষের লীলা বলা উচিত হবে না। তাহতে চৈত্য-সত্তার অস্তিত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে কোনও আলোকও পাওয়া যাবে না। একে বড় জোর বলা চলে অলৌকিক সূক্ষ্ম ভূতপ্রকৃতিরই একটা অসাধারণ বিভূতি। প্রাকৃত জগতে স্থূল আধারে আবির্ভূত হয়ে স্থূলকে সে নিজের অনুরূপ সূক্ষ্ম সত্তায় রূপান্তরিত করে, আবার তাকে রূপ দেয় স্থূলভূতের বিগ্রহে—ব্যাপারটা আসলে এই।

কোনও প্রয়োজনই থাকবে না। যদিও তৈজস রূপান্তর জীবনের পূর্ণ রূপান্তরসিদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ, তবু এতেই আধারের সর্বোত্তম চিন্ময় পরিণাম সাধিত হয় না। চৈত্যপুরুষ প্রকৃতি-স্থ ব্যষ্টিপুরুষ বলে আধারের নিগূঢ় দিব্যবিভূতির ধারণা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় এবং সে-অনুভবের জ্যোতির্ময় বীর্যকে তিনি চেতনায় স্ফুরিত করতেও পারেন। কিন্তু তবু আত্মার বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ মহিমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই উত্তরলোক হতে শক্তিপাতের ফলে একটা চিন্ময় রূপান্তর। অধ্যাত্মজীবনের বিশেষ-কোনও পর্বে চৈত্যপুরুষ স্বতন্ত্রভাবে সত্য-শিব-সুন্দরের একটা অন্তর্শ্চিন্তিত-স্বাভীষ্ট লোক সৃষ্টি করে তাতেই তৃপ্ত এবং সমাহিত থাকতে পারেন। কিংবা আরও-একটু এগিয়ে, নিস্পন্দভাবে বিশ্বাত্মার পরবশ হয়ে বিশ্বের সত্তা চেতনা বীর্য ও আনন্দকে দর্পণের মত গ্রহণ করতে পারেন—যদিও তাতে তাদের অখণ্ড সম্ভোগের অধিকার তাঁর মিলবে না। বিশ্বচেতনার সুনিবিড় আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে হৃদয়ে মনে ইন্দ্রিয়চেতনায় পর্যন্ত সে-আবেশের উন্মাদনাকে অনুভব করেও শুধু মুগ্ধ বিবশতায় তাকে তিনি ধারণই করতে পারবেন—কিন্তু অকুণ্ঠ ঈশনায় তার প্রবেগকে বহির্জগতে সঞ্চারিত করতে পারবেন না। অথবা বিশ্বোত্তর ভূমিতে আত্মার স্থাণুস্বভাবে সম্যক সমাহিত হয়ে, অন্তশ্চেতনায় জগৎ হতে বিবিক্ত থেকে ব্যষ্টিভাবের পরিনির্বাণে আবার তিনি ফিরে যেতে পারেন স্বরূপের অনাদি উৎসমূলে। সেখানে, অপরা প্রকৃতিকে দিব্য করে তোলবার যে-সাধনা ছিল বিধাতার কাছে পাওয়া তাঁর চরম দায়, তাকে সার্থক করবার কোনও সংকল্প বা শক্তিও তাঁর থাকবে না। কারণ আত্মা হতে ব্রহ্ম হতে প্রকৃতিতে চৈত্যপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, অতএব প্রকৃতি হতে আবার তিনি ফিরেও যেতে পারেন অক্ষরব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতায়—আত্মার পরম নৈঃশব্দ্য ও আধ্যাত্মিক স্থাণুত্বের চরম গহনে সমাহিত হয়ে। গীতার ভাষায় চৈত্যপুরুষ দিব্যপুরুষের সনাতন অংশ, সুতরাং আনন্ত্যের অতর্ক্য বিধান অনুসারে অংশ হয়েও অংশীর তিনি অবিনাভূত। এমন-কি তাঁর প্রকৃতি-স্থ আংশিক বিভাব বিবিক্ত আত্মানুভবের বহির্ব্যঞ্জনা মাত্র, অতএব স্বরূপত অংশ হলেও তিনি অংশীই। স্বরূপসত্তার এই অনুভবে তাঁর চেতনা শোষিত হয়ে যেতে পারে 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু জনু'—মহানির্বাণে তাঁর আপাতপ্রলয়ও ঘটতে পারে। আবার অবিদ্যাপ্রকৃতির তমঃপুঞ্জের মধ্যে একটি জ্যোতিঃকন্দ হয়েও (এইজন্যই উপনিষদে তিনি 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলে বর্ণিত), অধ্যাত্মচেতনার আপূরণে আপ্যায়িত করে নিজেকে তিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারেন—হৃদয়-মনের পরিব্যাপ্তিতে অনুভব করতে পারেন জগতের সাযুজ্য কিংবা তাদাত্ম্য। অথবা নিত্যসহচরের সন্ধান পেয়ে তাঁর অবিচ্ছেদ সান্নিধ্য কামনা করতে পারেন তিনি—পুরুষোত্তমের

পরমা প্রকৃতি হয়ে ডুবে যেতে পারেন প্রেমসেবোত্তরা গতির অন্তহীন মাধুরীতে। বলা বাহুল্য, সকল অধ্যাত্ম-অনুভবের মধ্যে ভাবকান্তিতে এই অনুভবই অনুত্তম। এমনি করে আমাদের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার বিপুল ও লোকোত্তর সিদ্ধি নানাভাবেই ঘটতে পারে। তবু এইখানেই মানুষের এষণার চরম ও পরম সার্থকতা নাও ফুটতে পারে। সত্যভাবক হয়তো এখানে দাঁড়িয়েও বলবেন, 'এহো বাহ্য—আগে কহ আর!'

কারণ, এসমস্ত মানুষের অধ্যাত্মমনের সিদ্ধি। মন এদের মধ্যে উন্মনী-ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েও, চিদাকাশের জ্যোতিরৈশ্বর্যে ঝলমল হয়েও নিজের সংস্কার ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রাকৃতমনের এলাকাকে সে বহুদূর পেরিয়ে গেছে লোকোত্তরের উপান্তভূমিতে, তবু তার খণ্ডনপ্রবৃত্তি দূর হয়নি। তাই শাশ্বত সন্মাত্রের একটি বিভাবকেই সে জানছে ঐকান্তিক বলে। ভাবছে, একটি খণ্ডবিভাবেই বুঝি তাঁর অখণ্ডস্বরূপের পর্যবসান, বুঝি তাঁর প্রত্যেকটি বিভাব নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ। অতীন্দ্রিয় অনুভবের রাজ্যেও মনের প্রচ্ছন্ন দ্বৈতসংস্কার বিরুদ্ধ-বিশেষণের পরম্পরা সৃষ্টি করতে পারে। পর্যায়-ক্রমে তার কল্পনায় ভেসে চলতে পারে ব্রহ্মের নৈঃশব্দ্য এবং ব্রহ্মের শক্তিচাঞ্চল্য, প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং মহেশ্বররূপী সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম, সত্তা এবং সম্ভূতি, দিব্য-পুরুষ এবং অপুরুষবিধ শুদ্ধ-সন্মাত্র। এই বিরোধাভাসের এক কোটিকে প্রত্যাখ্যান করে আরেকটি কোটিকে শাশ্বত স্বরূপসত্য জেনে সে তার মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারে। কখনও তার কাছে পুরুষই একমাত্র তত্ত্ব, কখনও-বা অপুরুষবিধ সন্মাত্রই শুদ্ধ সত্য। তার দৃষ্টিতে প্রেমিক কখনও নিত্যপ্রেমের ঘনবিগ্রহ, কখনও-বা প্রেমিকই বস্তু, প্রেম তার অঙ্গকান্তি মাত্র। ভূতে-ভূতে কখনও সে দেখে অপুরুষবিধ সন্মাত্রের পৌরুষেয় বিভূতি, কখনও-বা অপুরুষবিধ সত্তা তার কাছে শাশ্বত দিব্য-পুরুষের একটা ভঙ্গিমাত্র। এমনি করে মনের একটি বাতায়নপথে অনন্ত আকাশের সীমাহীন দর্শন অকল্পনীয় সার্থকতায় যখন সাধককে অভিভূত করে, তখন ওই একটি পথকেই পরম নিষ্ঠায় আঁকড়ে না ধরে সে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মমনের এই সঞ্চরণের ওপারেও আছে অতিমানস ঋতচিতের লোকোত্তর অনুভব। সেখানে যত দ্বন্দ্ব-বিরোধ লুপ্ত হয়ে যায়, আনন্ত্যের চরম ও সম্যক অনুভবে সকল খণ্ডভাব সংহত হয় এক সহস্রদল অখণ্ডের সুষমায়। একেই পুরুষার্থ বলে জানি। এইখান থেকেই অতিমানস ঋতচিতে অধিরূঢ় হওয়া এবং তার শক্তিকে নামিয়ে আনা এই আধারে—এই তো আমাদের মর্ত্যজীবনের সাধ্যাবধি। তৈজস-রূপান্তরের পরে তাই চাই চিন্ময়-রূপান্তর এবং তারও উত্তরণ উদয়ন ও পূর্ণ সমাহরণ চাই অতিমানস-রূপান্তরের সহায়ে—যার মধ্যে আমাদের উত্তরায়ণের চরম সীমা।

চিন্ময় নিত্যস্থিতি আর জগন্ময় সম্ভূতি, এ-দুয়ের মাঝে শুদ্ধ অবিদ্যার

ছলনায় একটা আপাতবিরোধ দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জীবনে। সৌষম্যের সত্যমন্ত্রে এ-বিরোধের সম্যক্ সমাধান করতে পারে একমাত্র অতিমানসী চিৎশক্তি—যেমন বিশ্বসম্ভূতির অনেক অসামকে সে রূপান্তরিত করেছে বৃহৎসামে। অবিদ্যার জগতে প্রকৃতি তার মনোময়ী প্রবৃত্তির অক্ষররূপে কল্পনা করে—অন্তরাত্মাকে নয়, তাঁর প্রতিভূ অহন্তাকে। আত্মকেন্দ্রিকতাকে ভিত্তি করে আমরা দ্বন্দ্ব বিরোধ ও অসঙ্গতিতে সংকুল জগৎজোড়া মাত্রাস্পর্শের জটিলতার মধ্যে গড়ে তুলেছি বিচিত্র অনুভব ও সম্বন্ধের একটা ব্যূহ। এই অহংএর দুর্গপ্রাকারের আড়ালে থেকে নিজেকে আমরা ঠেকিয়ে রেখেছি বিশ্ব এবং আনন্ত্যের অভিঘাত হতে। কিন্তু চিন্ময়-রূপান্তরে সে-প্রাকার যখন ভেঙে পড়ে, তখন সাধকের অহং বিলুপ্ত হয়—নুনের পুতুল গলে যায় এক নির্বিশেষ অনুভবের অকূল পাথারে, বিনাশের চোখ-ধাঁধানো আলোতে কোথায় মিলিয়ে যায় সম্ভূতির বর্ণচ্ছটা। তাই দিশাহারা চেতনা সূনৃতের ছন্দে তার বৃত্তিকে বাঁধবার আর অবকাশ পায় না। প্রায়ই তখন সাধকের আত্মচেতনা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়—ভিতরে সে চিন্ময়, কিন্তু বাইরে প্রাকৃত। সাধকের প্রত্যক্ অনুভবে থাকে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে সমাসীন ব্রহ্মানুভবের অচল প্রতিষ্ঠা, অথচ তার পরাক্ চেতনা করে চলে অভ্যস্ত সংস্কারের অন্ধ অনুবর্তন—'অবশঃ প্রকৃতের্বশাৎ'। তত্ত্বলাভের পরেও আধারে সঞ্চারিত প্রাক্তন বেগের প্রবর্তনা তাকে যন্ত্রের মতই আবর্তিত করে। এইহতে দেখা দেয় বিভিন্ন কোটির সাধক। ব্যক্তিভাবের সম্পূর্ণ প্রলয়ে অহং-তন্ত্র ভিতরে-ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়লেও বাহিঃপ্রকৃতির অব্যাহত গতিতে দেখা দেয় নানা আপাত-অসঙ্গতি—যদিও সাধকের অন্তশ্চেতনা থাকে আত্মজ্যোতিতে ভাস্বর। এমনি করে সাধক কখনও হন জড়বৎ—বাইরে অসাড় এবং নিষ্ক্রিয়, বাহ্যিক পরিস্থিতি বা শক্তির বশে চালিত কিন্তু নিজে চলৎশক্তিহীন, অথচ অন্তরে 'অন্তর্জ্যোতিরন্তরারামঃ'। কখনও ভিতরে পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকেও বাইরে তিনি বালবৎ। কখনও অন্তরে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিতে ডুবে থেকেও বাইরে উন্মত্তবৎ, চিন্তায় ও আচরণে উচ্ছৃঙ্খল। আবার কখনও অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব ও আত্মসমাহিত হয়েও ব্যবহারে তিনি পিশাচবৎ প্রমত্ত, সংস্কারহীন। কখনও বহিঃপ্রবৃত্তিতে অন্তরের ছন্দ প্রকাশ পেলেও অভ্যস্ত অহংএর সংবেগই তার বাহন হয় এবং উদাসীন দ্রষ্টারূপে সাধক শুধু প্রারব্ধক্ষয়ের প্রতীক্ষায় দেখে যান সংস্কারের খেলা। তখন দিব্যানুভবের বীর্য মনকে সচল করলেও অন্তরের অনুভবের সবখানি তার মধ্যে ফোটে না -চিন্ময় স্থিতি ও মনের চলনের মাঝে সুর বাঁধা হয়নি বলে। এমন-কি অন্তর্জ্যোতির সহজ দীপ্তিও যদি সাধক-জীবনের দিশারী হয়, তবু কর্মের ছন্দে তার প্রকাশের ধারায় দেহ-প্রাণ-মনের নানা কুণ্ঠা ও অপূর্ণতার ছাপ থাকতে পারে। সে-ক্ষেত্রে সাধকের দশা হয় অযোগ্য

মন্ত্রিসভার দ্বারা বিড়ম্বিত রাজার মত—কেননা অন্তরের বিজ্ঞানকে তখন তার রূপ দিতে হয় অজ্ঞানের প্রপঞ্চে। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও সত্যসংকল্পের পরমসাযুজ্য যে-অতিমানসের মধ্যে, একমাত্র তার অবতরণে আধারের অন্তরে-বাইরে চিৎস্বরূপের পরমসাম্যের প্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে। কেননা, অজ্ঞানের প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের সৌষম্যে রূপান্তরিত করবার দিব্য সামর্থ্য আছে কেবল অতিমানসেরই।

প্রাণ ও মনের প্রাকৃতসত্তাকে স্বরূপসত্তার সঙ্গে যোগযুক্ত করে যেমন তাদের চরম আপ্যায়ন ঘটে, তেমনি চৈত্যপুরুষেরও পরম অভ্যুদয় সাধিত হয় পরমব্রহ্মে নিহিত তাঁর দিব্য স্বরূপসত্যের সমাপত্তি অথবা সমাবেশে। উভয়ক্ষেত্রে অতিমানসের শক্তিই দিব্য-সম্প্রয়োগের দূতী—সামরস্যের পরিপূর্ণতাকে সে-ই পর্যবসিত করে নিরঙ্কুশ তাদাত্ম্যসংগমে। কারণ, অখন্ড-অদ্বয় সত্তার পরাবর কোটির মাঝে অতিমানসই 'অমৃতস্য সেতুঃ'। অতিমানসেই আছে অখন্ডভাবিনী দ্যুলোকের দ্যুতি, আছে সর্বার্থসাধিকা মহাশক্তি, আছে পরমানন্দের দিকে অপাবৃত জ্যোতির দুয়ার। ওই দ্যুলোকের দ্যুতি ও শক্তিদ্বারা সমুদ্ধৃত হয়েই চৈতন্যপুরুষ আবার সমাবিষ্ট হয় সদ্-ব্রহ্মের আনন্দ-গঙ্গোত্রীতে। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বকে পরাভূত ক'রে দেহ-প্রাণ-মনকে ভয় ও জুগুপ্সার কবল হতে চিরনির্মুক্ত ক'রে দিব্যধাম হতেই তখন মর্ত্যের মাত্রাস্পর্শকে রূপান্তরিত করে সে ব্রহ্মানন্দের বিদ্যুন্ময় শিহরনে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

জড়

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।২

অন্ন ব্রহ্ম—এই বিজ্ঞানে পেঁছিলেন তিনি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।২)

যুক্তি দিয়েও তাহলে আমরা এইটুকু বুঝেছি যে, প্রাণ এমন-একটা অনির্বাচ্য স্বপ্নমায়া বা অসম্ভাব্য একটা অনর্থকল্পনা নয়, যা ধরেছে বেদনাময় বাস্তবের রূপ। কিন্তু বস্তুত সে সর্ব-সৎ ব্রহ্মেরই বিপুল চিৎস্পন্দন। কোথায় তার প্রতিষ্ঠা, কি তার তত্ত্ব, তারও খানিকটা পরিচয় পেয়েছি। তাই চেয়ে আছি সেই অনাগত মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে, যখন তার অন্তর্গূঢ় মহাবীর্য চরম পরিণামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে দ্যুলোকের নন্দনমঞ্জরীতে। কিন্তু সকল তত্ত্বের অবম একটি তত্ত্বের সম্যক আলোচনা আমরা এখনও করিনি। সে হল জড়ের তত্ত্ব, যার 'পরে প্রাণ রচেছে তার পাদপীঠ, কিংবা যার বীজদলকে বিদীর্ণ করে বিশ্বে নিজেকে সে ফুটিয়েছে বহুশাখ বনস্পতির মত। এই জড়তত্ত্বের 'পরেই মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া, চেতনার মনোময়-পরিণামের ফলে যদি-বা দেখা দিয়ে থাকে প্রাণের এই বাসন্ত-পুষ্পোচ্ছ্বাস; অতিমানসের উদারলোকে স্বরূপসত্যের সন্ধানে মনের যে সম্প্রসারণ ও উদয়ন, বিশ্বে উপচিত প্রাণের ঐশ্বর্য যদি তার স্বাভাবিক পরিণতি হয়েও থাকে; তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই দেহের আধারে এই মাটির বুকেই ছড়ানো রয়েছে প্রাণের মূল। দেহের একটা গৌরব আছে, সে তো বলাই বাহুল্য। মনের জ্যোতির্ময় প্রগতিকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগী দেহ ও মস্তিষ্ক পেয়েছে কি গড়ে তুলেছে বলেই মানুষ পশুকে ছাড়িয়ে গেছে। তেমনি আবার উন্মনীলোকের জ্যোতিকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগী দিব্য দেহ কিংবা তার অনুরূপ দৈহ্য-সাধন যদি সে গড়ে তুলতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে থেকেই নিজেকে সে ছাড়িয়ে যাবে এবং শুধু অন্তরের বিবিক্ত লোকে নয়, এই প্রাকৃত জীবনেই পাবে দেবমানবতার নিরঙ্কুশ অধিকার। তা যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, বর্তমানের এই সান্ধ্যচেতনাতে পেঁছেই বিশ্বপ্রাণের উদয়ন ব্যর্থ

ব্যাহত হয়ে গেল। তাই মর্ত্যের মানুষ সচ্চিদানন্দকে লাভ করবে শুধু আত্মবিলোপের সাধনায়—এই দেহ-প্রাণ-মনের কঞ্চুক খসিয়ে আনন্ত্যের নিরঞ্জন মহিমায় ফিরে গিয়ে। অথবা বুঝতে হবে, নর নারায়ণের দিব্য নিমিত্ত নয়। চিন্ময়ী মহাশক্তির যে-প্রগতি পৃথিবীর আর-সকল ভূত হতে তাকে পৃথক করেছে, তারও একটা নিয়তিকৃত নিয়ম আছে। অতএব আজ যেমন মানুষ জগতের সবাইকে ছাড়িয়ে হয়েছে পুরোধা, তেমনি একদিন তাকেও ছাড়িয়ে আর-কেউ এসে তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে।

বাস্তবিক, আত্মার যত মুশকিল দেহকে নিয়ে। দেহই তার প্রগতির পথে চিরন্তন বাধা, দেহের জুলুমই তাকে বরাবর সইতে হয়েছে। তাই অধ্যাত্ম-সিদ্ধির ব্যাকুল সাধক দেহকেই ধিক্কার দিয়েছে চিরকাল—সবার চাইতে এই বস্তুটির 'পরেই যেন বিশেষ করে তার বিতৃষ্ণা।...দেহের এই মূঢ়ভার আর সে বইতে পারে না। এর অন্ধ সংসক্ত স্থূলতা যেন অন্তরের শ্বাসরোধ করে আনে পলে-পলে, বৈরাগ্যের উদার আকাশে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে তার মন। এই আপদ হতে বাঁচবার জন্যে দেহকে এবং দেহাত্মবুদ্ধির প্রতীক জগৎকে পর্যন্ত সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।...অধিকাংশ ধর্মেই জড় ধিক্কৃত, অভিশপ্ত। তাই বৈরাগীর নৈতিবাদ অথবা পার্থিবজীবনের প্রতি একটা অসহায় সাময়িক তিতিক্ষার ভাব—এই হল তাদের মতে সত্যধর্মের এবং আধ্যাত্মিকতার কষ্টিপাথর। কিন্তু প্রাচীন যুগের ধর্মে এত অসহিষ্ণুতা ছিল না। তার মননের গভীরতা বিশ্বের মর্মসত্যকে স্পর্শ করেছিল। কলিসন্তাপে সন্তপ্ত হয়ে সাধকের চিত্ত তখনও খিন্ন ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি, তাই দ্যুলোক আর ভূলোকের মাঝে বিচ্ছেদও এত প্রবল হয়নি। প্রাচীন ঋষিদের কাছে দ্যুলোক যেমন পিতা, পৃথিবীও তেমনি মাতা—অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি উভয়কেই তাঁরা সমানভাবে বেঁটে দিয়েছেন। কিন্তু অতীতের বাণীর রহস্য আমাদের কাছে আজ আচ্ছন্ন এবং অনবগাহ। সুতরাং অধ্যাত্মবাদীই হই আর জড়বাদীই হই, কৃপাণের আঘাতেই আমরা জীবনের গ্রন্থিমোচন করতে চাই। মর্ত্যজীবনের চরম পরিণতিকে তাই কল্পনা করি এক মহানিষ্ক্রমণরূপে—এখন সে-নিষ্ক্রমণ অনন্ত আনন্দ, অনন্ত বিনষ্টি বা অনন্ত নির্বাণ—যে-রূপ ধরেই আসুক না কেন!

অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের সঙ্গেই কিন্তু এই দেহবিতৃষ্ণা জাগে না। প্রাণের আবির্ভাব হতে এ-বিরোধের শুরু, কেননা সৃষ্টির গোড়াতেই দেখা দিয়েছে জড়ের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব। জড় যেন প্রাণ ও চেতনার মূর্ত প্রতিষেধ। প্রাণ প্রবৃত্তিতে চঞ্চল, জড় অসাড়। প্রাণের প্রবেগ চিন্ময়, জড়ের শক্তি মূঢ়, অচেতন। প্রাণ জীববিগ্রহ গড়তে চায় সংকলনবৃত্তি দিয়ে, জড় আণবিক বিকলনে সে-প্রয়াস ব্যর্থ করতে চায়। এমনি করে জড়ের বুকে প্রাণের আত্ম-

প্রতিষ্ঠার সকল আয়াস পর্যবসিত হয় আপাত-পরাভবে। প্রাণ তাই মরণমূর্ছায় বারবার ঢলে পড়ে জড়ের বুকে। মনের আবির্ভাবে এই দ্বন্দ্ব আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে—কেননা মনের ঝগড়া প্রাণ এবং জড় দুয়েরই সঙ্গে। তাদের সংকীর্ণতাকে কিছুতেই সে সইতে পারে না। জড়ের অসাড় স্থূলতা আর প্রাণের বিক্ষুব্ধ বেদনার নিত্যশাসনের বিরুদ্ধে বরাবর তার বিদ্রোহ। এই অবিরাম সংগ্রামের ফলে মনে হয় বিজয়লক্ষ্মী যেন মনের দিকে ঝোঁকেন, যদিও তাঁর অপূর্ণ ও অনিশ্চিত প্রসাদের অসম্ভব মূল্য দিতে হয় তাকে। স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় দেহ আর প্রাণকে মন শুধু-যে জয়ই করে, তা নয়; প্রাণের তৃষ্ণাকে, দেহের বীর্যকে অবদমিত নিগৃহীত এমন-কি বিনষ্ট ক'রে প্রাণকে পঙ্গু ও দেহকে বিকল করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। মনের এই আয়াসই ধরে প্রাণের প্রতি অরতি ও দেহের প্রতি বিতৃষ্ণার রূপ—উভয়ের প্রতি জুগুপ্সায় মানুষ নিষ্কলুষ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধর্মবোধের কল্পলোকের দিকে ছুটে যায়। উন্মনীভূমির আভাস পেয়ে মানুষ এই বিরোধকে আরও প্রবল করে। তখন মন শরীর আর প্রাণ লাঞ্ছিত হয় ভব দেহাত্মবোধ এবং মারের ত্রি-লাঞ্ছনে। ভব-ব্যাধির সকল নিদান মানুষ তখন খুঁজে পায় মনে। চিৎ আর অচিতের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে দেখা দেয় বলে, অচিৎ আর তার কাছে চিতের সাধন নয়। অতএব হৃৎশয় চিন্ময় পুরুষের বিজয় সুনিশ্চিত হয় তাঁর সংকীর্ণ আয়তনের প্রত্যাখ্যানে, দেহ-প্রাণ-মনের নিরাকৃতিতে, স্বরূপের আনন্ত্যে তাঁর আত্ম-সংহরণে।...এ জগৎ দ্বন্দ্বসঙ্কুল। সুতরাং তার সকল দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান হচ্ছে এই দ্বন্দ্বনীতিকেই চরমে তুলে অখণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা জগৎকে ছেঁটে ফেলা!

কিন্তু এই জয়-পরাজয় একটা আপাত-প্রতিভাস মাত্র। এতে সমস্যার সমাধান না করে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় শুধু। বাস্তবিক জড় তো প্রাণকে পরাভূত করতে পারেনি। এরই মধ্যে জড়ের সঙ্গে সে রফা করেছে মৃত্যুকে তার অগ্রগতির সাধন ক'রে। মনও তেমনি দেহ আর প্রাণকে নির্জিত করে সর্বজয়ী হতে পারেনি—তার বহু নিগূঢ় সম্ভাবনাকে বন্ধ্যা করে কতক-গুলিকে সে অর্ধেক ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে মাত্র। দেহ ও প্রাণের সম্যক অনুশীলনে সেসব কুঁড়ি ফুল হয়ে হয়তো ফুটত একদিন। জীব-চিৎও অচিৎ-ত্রয়ীর 'পরে বিজয়ী হতে পারেনি। শুধু তাদের দাবিকে অস্বীকার করে পিছু হটেছে সে আপন ব্রত থেকে—বিশ্বরূপ চিৎপুরুষের আদ্য প্রবর্তনার নিগূঢ় দায় থেকে। সুতরাং অচিৎকে অস্বীকার করলেই বিশ্বসমস্যার সমাধান হয় না—কেননা বিশ্বনাথের প্রবর্তিত চক্র তো আত্মোদ্বোধনের এই নেতি-সাধনাতেই এসে থেমে যায়নি। বস্তুত নেতিবাদ সূচিত করে ব্রতের সার্থক উদ্‌যাপনকে নয়—তার বর্জনকে। সচ্চিদানন্দই বিশ্বের আদি মধ্য ও অন্ত,

এই আমাদের মৌলিক দর্শন হলে বিরোধকে কখনও তাঁর স্বরূপের অনাদি ও শাশ্বত তত্ত্ব বলতে পারি না। বিরোধ আছে ব'লেই দেখা দিয়েছে সার্বভৌম সম্যক্‌সমাধানের তপস্যা, জেগেছে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের আকূতি। জীবনসমস্যার সমাধান হবে—প্রাণ যখন দেহকে আপন অকুণ্ঠ সৌষম্যের বাহন করে সত্যি-সত্যি জড়ের 'পরে জয়ী হবে, এ-দুটিকে তার আত্মপ্রকাশের স্ববশ সাধনে রূপান্তরিত করে দেহ আর প্রাণের 'পরে মনের হবে সত্য বিজয় এবং দেহ-প্রাণ-মনকে স্বচ্ছন্দ চিদাবেশে জারিত করে অচিতের 'পরে চিতের বিজয় ঘোষিত হবে। আর এই শেষের বিজয়েই প্রাণ ও মনের তপস্যার বাস্তব সিদ্ধি সম্ভব হবে। কি করে এই জয়শ্রী মূর্ত হবে আমাদের জীবনে, তার উপায় খুঁজতে গিয়ে জানতে হবে জড়ের তত্ত্ব—যেমন নাকি মূলা বিদ্যার এষণাতেই আমরা খুঁজে পেয়েছি প্রাণ, মন ও জীবচেতনার তত্ত্ব।

ধরতে গেলে জড় আমাদের কাছে অবাস্তব এবং অসৎ। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান জ্ঞান সংস্কার বা অনুভব হতে জড়ের সত্য পরিচয় আমরা পাই না। আমাদের আয়তনরূপে বিশ্ব জুড়ে এক সর্বময় সত্তা আছে, তার সংগে ইন্দ্রিয়-সংবিতের একটা বিশেষ সম্পর্ককে আমরা জড় বলে জানি। জড়কে শুধু শক্তির বিভূতিতে পর্যবসিত দেখে বৈজ্ঞানিক বিশ্বের একটা মূলতত্ত্বের সন্ধান পান। আবার দার্শনিক যখন দেখেন, জড় চেতনার একটা বাস্তব প্রতিভাস মাত্র এবং অখন্ড শুদ্ধ-চিন্মাত্র একমাত্র তত্ত্ব-বস্তু, তখন বৈজ্ঞানিকের চেয়েও পূর্ণ বৃহৎ ও নিগূঢ় সত্যকে তিনি হাতের মুঠায় পান। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় : শক্তি কেন জড়ের রূপ ধরল, কেন সে শুধু প্রবেগের শতমুখী ধারা হয়ে রইল না? যিনি চিৎ-স্বরূপ, তিনি কেন চিদ্‌বিলাসের নিবিড় আনন্দে বিশ্রান্ত না থেকে এই জড়ের খেলা খেলতে গেলেন? কেউ বলেন, এসমস্তই মনের লীলা। আবার কারও মতে, জড়রূপের অপরোক্ষ সৃষ্টি এমন-কি তাদের অনুভবও যখন মনের ধর্ম নয়, তখন এসমস্তই ইন্দ্রিয়বোধের খেলা। গ্রহণ-মন আপাত-অনুভব দ্বারা রূপসৃষ্টি ক'রে সামনে ধরলে গ্রহীতৃ-মন নাড়াচাড়া করে তাদের নিয়ে। কিন্তু জড় কখনও শরীরী ব্যষ্টি-মনের সৃষ্টি হতে পারে না। ক্ষিতিতত্ত্ব তো মানবমনের পরিণাম নয়, বরং মানবমনই যে তার পরিণাম। যদি বলি জগৎ তো আমাদেরই মনে, তাহলে সেটা হয় অতাত্ত্বিক জল্পনা শুধু। কেননা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগেও জড়জগৎ যেমন ছিল, পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, এমন-কি অনন্তের মধ্যে ব্যষ্টিমনের প্রলয় হলেও সে তেমনিই থাকবে। অতএব বাধ্য হয়ে মানতে হয়, এই মনের অন্তরালে আছে এক বিরাট মন*—আমাদের

---

* প্রাকৃতমনের সৃষ্টিসামর্থ্য আপেক্ষিক, কেননা অপরের সাধনরূপেই তার সৃষ্টি। যোগাযোগ ঘটানোর শক্তি অফুরন্ত হলেও তার রূপকলার আদর্শ আসে উপর থেকে।

কাছে যার বিশ্বরূপ অবচেতন এবং চিন্ময়রূপ অতিচেতন। নিজের আধার বা আয়তনরূপে সে-ই রূপের সৃষ্টি করেছে। স্রষ্টা যখন স্বভাবত সৃষ্টির প্রাগ্‌ভাবী হয়ে তাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন মানতে হয়, এক অতিচেতন মনই তার সার্বভৌম করণশক্তির সহায়ে নিজের মধ্যে জড়বিশ্বের ছন্দোদোলায় ফুটিয়ে চলেছে এই রূপের মেলা। তবু এও সম্যক্‌ সমাধান নয়। কেননা এতে জড়কে জানি শুধু চেতনার বিভূতি বলে, কিন্তু বিশ্বলীলার উপাদানরূপে কি করে জড়ের সৃষ্টি হল, তার কোনও জবাব পাই না।

একেবারে বিশ্বসত্তার মূলে গেলে হয়তো কথাটা পরিষ্কার হবে। শুদ্ধ-সন্মাত্র চিৎশক্তিরূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন তাঁর স্পন্দবিভূতিতে। সেই চিৎশক্তি আবার তার আত্মকৃতিকে তারই আত্মচেতনায় ফুটিয়ে তুলছে আত্মরূপায়ণের ছন্দে। শক্তি যখন 'একং সৎ' চিৎপুরুষের স্পন্দ মাত্র, তখন তার পরিণাম তাঁর আত্মরূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অতএব রূপধাতু দ্রব্য বা অচিৎ চিতেরই বিভূতি মাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে এই চিদ্‌বিভূতির যে বিশেষ রূপ ফোটে, তার মূলে আছে মনের খণ্ডনবৃত্তি, যাহতে বিশ্বপ্রতিভাসের পরিপূর্ণ ছকটি আমরা গুছিয়ে পেয়েছি। এখন জানি, প্রাণ চিৎশক্তির লীলা -জড়রূপে তার পরিণাম। রূপের গুহায় কুণ্ডলিত প্রাণ প্রথম দেখা দেয় অচেতন শক্তিরূপে। তারপর ধীরে-ধীরে নিজেকে বিকশিত ক'রে মনের আকারে সে শক্তির নিগূঢ় স্বরূপচেতনাকে ফুটিয়ে তোলে—যা শক্তির অব্যাকৃত দশাতেও তার অবিনাভূত ছিল। আরও জানি, অতিমানস বা চিন্ময় মহাবিদ্যার একটি অবরবিভূতি হল মন, এবং প্রাণ সে-অতিমানসেরই সাধনবীর্য। অতিমানস বা চিৎ-তপসের ভিতর দিয়ে নামতে গিয়ে চিৎশক্তির চিৎ ফোটে মন হয়ে, আর তার শক্তি বা তপঃ ফোটে প্রাণ হয়ে। মন তার অতিমানস স্বরূপসত্তা হতে বিচ্যুত হয়ে প্রাণকেও খণ্ডরূপ দেয়। শুধু তা-ই নয়, নিজেরই প্রাণশক্তিতে কুণ্ডলিত থেকে বিশ্বপ্রাণে সে অবচেতন হয়ে ফোটে। তার ফলে প্রাণের জড়লীলায় জগৎ জুড়ে একটা অন্ধশক্তির প্রবর্তনা প্রকাশ পায়। অতএব জড়ের মধ্যে এই-যে অচিতি অসাড়তা ও আণবিক বিকলন, তার মূলে রয়েছে বিশ্বম্ভর মনের বিভাজনী ও কুণ্ডলনী বৃত্তি। এমনি ক'রেই বিশ্বের বিসৃষ্টি হয়েছে। অতিমানসের আত্মবিসৃষ্টির চরম সাধন যেমন মন, এবং সেই মনের কল্পিত অবিদ্যার ক্ষেত্রে চিৎ-তপসের

সমস্ত সৃষ্ট রূপের প্রতিষ্ঠা হল অনন্তের মধ্যে—মন প্রাণ ও জড়ের ওপারে। এখানে ফোটে তার নতুন-গড়া—এবং বেশীর ভাগই বিকৃত করে গড়া—একটা আভাস শুধু। ঋগ্বেদ বলেন, তারা 'ঊর্ধ্ববুধ্ন নীচীনশাখ'—মূল তাদের উপরে, কিন্তু ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে নীচের দিকে। অতিচেতন মনকে বরং বলা চলে অধিমানস। চিৎশক্তির প্রস্তারে তার স্থান হবে অতিমানস চেতনার সমাশ্রিত কোনও ভূমিতে।

স্পন্দন যেমন প্রাণ, তেমনি আমাদের পরিচিত জড়ও চিৎসত্তার চরম স্পন্দ-পরিণাম। বিরাট মনের* নিগূঢ় ব্যাপারবশত অখণ্ড চিৎসত্তার মধ্যে যে স্বগত-ভেদের আভাসন, তা-ই হল চৈতন্যের জড়-বিভূতি। ব্যষ্টিমনের কাছে এই ভেদ একান্ত হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তাবলে তত্ত্বদৃষ্টিতে চিৎ শক্তি ও অচিতের অখণ্ডভাব লুপ্ত বা ব্যাহত হয় না।

কিন্তু অখণ্ড সন্মাত্রের এই প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক খণ্ডলীলা কেন? ...কারণ আর-কিছুই নয়। মনের মধ্যে যে বহুধাভবনের সংবেগ রয়েছে, তার চরম কোটিতে পৌঁছতে গেলে আত্মভেদ ও আত্মবিভাজনকেই করতে হয় মুখ্য সাধন। তাই বহুভাবনার জন্যে আধার সৃষ্টি করতে সে যখন প্রাণের মধ্যে নেমে এল, তখন বিশ্বগত সদাখ্যতত্ত্বকে তার দিতে হল স্থূল জড়ধাতুর রূপ—বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম-ধাতুর রূপ না দিয়ে। অর্থাৎ মনের আকূতিতে সদাখ্যতত্ত্ব ফুটল স্থাণু রূপধাতু হয়ে—বহুধা-বিচিত্র বস্তুলীলার আধাররূপে। অরূপ-ধাতুর মত এ শুদ্ধচেতনার শাশ্বত স্বরূপসত্তার আত্মগত বিভূতি মাত্র নয়—অথবা সূক্ষ্মস্পর্শগোচর চিন্ময় রূপায়ণের তরল ছন্দোময় উপাদানও নয়। মনের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষে জেগে ওঠে—আমরা যাকে বলি ইন্দ্রিয়বোধ। কিন্তু এখানে চাই একটা অস্পষ্ট পরাক্ বোধ—যা সন্নিকর্ষের বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হবে। অতএব শুদ্ধধাতুর জড়ধাতুতে অবতরণ তখনই সম্ভব হয়, যখন অতিমানসের ভিতর দিয়ে সচ্চিদানন্দ মনে ও প্রাণে বহুধা-ভবনের ঈক্ষা নিয়ে নেমে আসেন। তখন বিবিক্ত চিৎকেন্দ্র হতে বিষয়ের সংবেদন হয় তাঁর এই আত্মসম্ভাব-অনুভবের প্রথম উপায়। বিশ্বমূল চিন্ময়তত্ত্বে অবগাহন করলে দেখি, শুদ্ধ নিরঞ্জনধাতুই হয়েছে স্বয়ম্ভূ বিশুদ্ধ-চিন্ময় সত্তা, আত্মতাদাত্ম্যের স্বয়ংপ্রভা সংবিৎ যার স্বভাব। তখনও তার মধ্যে নিজেকে নিজের বিষয় করবার বৃত্তি জাগেনি। অতিমানসেরও মধ্যে এই আত্মতাদাত্ম্যের স্বগতসংবিৎ তার আত্মবিজ্ঞানের ধাতুরূপে এবং আত্মবিসৃষ্টির জ্যোতিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু ওই বিসৃষ্টির জন্যে শুদ্ধসত্তাকে নিজের কাছে সে উপস্থাপিত করে নিজের জ্ঞানা-শক্তির অবিনাভূত বিষয়-বিষয়িরূপে। তখন শুদ্ধসত্তা হয় এক পরা প্রজ্ঞার বিষয়, যার মধ্যে আছে সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের যুগল বৃত্তি। সংজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের মধ্যে দেখা—নিজের রূপে। আর প্রজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের পরিধির মধ্যে দেখা নিজের বিবিক্ত অংশরূপে—অর্থাৎ শুদ্ধসত্তার মর্মদৃষ্টি যে-চিৎকেন্দ্রে ফুটে উঠেছে সাক্ষী পুরুষের প্রজ্ঞানঘন বিন্দুরূপে, সেই দ্রষ্টার আসন থেকেই সে বিষয়কে দেখে।

---

* 'মনের' অর্থ ব্যাপক এখানে, অতএব অধিমানসের বৃত্তিও তার অন্তর্গত। অধিমানস অতিমানসী ঋত-চিতের অব্যবহিত; এখান হতেই আসে অবিদ্যা-কল্পিত সৃষ্টির আদি প্রবর্তনা।

অতিমানসের পরা প্রজ্ঞায় আছে এই সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের দ্বিদল-চণক। আমরা দেখেছি, প্রজ্ঞান হতে শুরু হয় মনের প্রবৃত্তি, যে-প্রবৃত্তির ফলে ব্যষ্টি প্রমাতা নিজের বিরাট সত্তার বিচিত্র বিভূতিকে অনাত্মরূপে দর্শন করে। কিন্তু দিব্যমনে—অব্যবহিত ক্ষণে অথবা বলতে গেলে যুগপৎ—জাগে আরেকটি প্রবৃত্তি কিংবা ওই প্রবৃত্তির একটা বিপরীত ধারা—যা অখণ্ডসত্তার সঙ্গে যোগযুক্তি দ্বারা প্রাতিভাসিক খণ্ডতার বিভ্রমকে নিরাকৃত করে। তাইতে ব্যষ্টি প্রমাতার জ্ঞানেও ভেদদর্শন মুহূর্তের জন্যেও ঐকান্তিক সত্য হয়ে ওঠে না। এই চিন্ময় যোগযুক্তিকে বিভজ্যবৃত্ত মনের মধ্যে আমরা পাই বহুধা-বিভক্ত আধার ও বিষয়ের চেতনার সন্নিকর্ষরূপে। বিভক্তচেতনার এই সন্নিকর্ষ আবার আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ইন্দ্রিয়বোধের আকার—যেখানে ভেদ-প্রত্যয়ের সঙ্গে নিগূঢ় হয়ে জড়িয়ে আছে অভেদের প্রত্যয়। আমাদের গ্রহীতৃ-মনের প্রবৃত্তি দাঁড়িয়ে আছে এই ইন্দ্রিয়বোধের উপর। এর মধ্যে যে তাদাত্ম্যসন্নিকর্ষ আছে, তা খণ্ডভাবের অধীন। কিন্তু তাকে ভিত্তি করে মন চলেছে উত্তরভূমির তাদাত্ম্যবোধের দিকে, যেখানে খণ্ডভাব তাদাত্ম্যের গৌণ বিভূতি মাত্র। অতএব আমাদের নিত্যপরিচিত জড়ধাতু স্বরূপসত্তার একটা রূপায়ণ, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সহায়ে মন চিন্ময় সত্তার সন্নিকর্ষ পায়। অথচ মন স্বয়ং সেই চিৎসত্তার একটা বিজ্ঞানময় স্পন্দ।

অথচ মনের যা স্বভাব, তাতে চিৎসত্তার স্বরূপধাতুকে সে জানে এবং অনুভব করে অখণ্ড বা সমগ্রভাবে নয়—কিন্তু বিভাজনবৃত্তির সহায়ে খণ্ড-খণ্ড করে। তাই অখণ্ড চিৎসত্তাকে সে দেখে আণবিক বিন্দুতে বিকীর্ণপ্রায় এবং ওই অনন্তকণিকার সমুচ্চয়ে গড়ে তুলতে চায় সমগ্রতার রূপ। অগণিত প্রেক্ষাবিন্দু ও তাদের সমুচ্চয়ের মধ্যে বিশ্বমন নিজেকে ঢেলে দিয়ে সন্নিবিষ্ট হয় তাদের অন্তরে। কিন্তু বিশ্বমন সম্ভূতবিজ্ঞানের নিমিত্ত মাত্র, অতএব তার স্বরূপশক্তিতে রয়েছে সিসৃক্ষার প্রবর্তনা। তাই স্বভাবের বশে তার সমস্ত প্রত্যয়কে সে রূপান্তরিত করে প্রাণের উচ্ছলনে—যেমন সর্ব-সৎ তাঁর সমস্ত আত্মবিভাবনাকে রূপান্তরিত করেন চিন্ময় সিসৃক্ষার বিচিত্র বীর্যে। এমনি করে বিশ্বমন বিরাটের ওই বিচিত্র প্রেক্ষাবিন্দুকে সহস্ররশ্মি বিশ্বপ্রাণের সংবেগরূপে ফুটিয়ে তোলে। তার প্রবর্তনায় জড়ের মধ্যে ওই বিন্দু ধরে পরমাণুর রূপ। অথচ সে-পরমাণু নিষ্প্রাণ বা নিশ্চেতন নয়—তারও মধ্যে নিগূঢ় আছে রূপকৃৎ প্রাণের লীলা, আছে মন ও সংকল্পের প্রশাসন, আছে তাদের রূপসৃষ্টির প্রেতি। এমনি করে বিশ্বমন গড়ে তোলে যে ভূতপরমাণু, স্বধর্মের বশে তাদেরও আবার সমুচ্চয় এবং সমূহন ঘটে। কিন্তু প্রত্যেকটি সমূহে বা পিণ্ডে নিগূঢ় থাকে রূপকৃৎ প্রাণের স্পন্দন, মন ও সংকল্পের প্রচ্ছন্ন প্রেতি এবং তাইতে তাদের মধ্যে দেখা দেয় বিবিক্ত ব্যষ্টিসত্তার একটা অবাস্তব

অভিমান। শুধু তা-ই নয়, মনোবীজ যদি সংবৃত্ত এবং অব্যক্ত থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে যন্ত্রমূঢ় শক্তির প্রবেগ নিয়ে ফোটে একটা অহমিকা—যা বহন করে নির্বাক অবরুদ্ধ অথচ দুর্ধর্ষ একটা অভিনিবেশ বা অব্যাহত আত্মভাবের আকূতি। আর মন যদি বিবৃত্ত এবং সুব্যক্ত হয়, তাহলে দেখা দেয় একটা আত্মসচেতন মনোময় অহমিকা—যার মধ্যে অভিনিবেশ জাগ্রত প্রমুক্ত এবং আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সক্রিয়।

অতএব জড় একটা অনাদি সিদ্ধসত্তা নয়, কিংবা তার একটা শাশ্বত অনাদি স্বধর্মও নাই। তত্ত্বদৃষ্টিতে, বিশ্বমনের প্রবৃত্তিবিশেষ ধরেছে পরমাণুর রূপ, জড়ও সন্মাত্রের বিসৃষ্টি। তার জন্য প্রয়োজন ছিল অনন্তস্বরূপের চরম বিভাজন অথবা অণুভাবের একটা আধার বা আদিবিন্দু। আকাশ হয়তো জড়ের অস্পর্শ-নীরূপ প্রায়-চিন্ময় আধার হয়ে আছে। কিন্তু প্রতিভাস হিসাবে ঠিক জড়ের কোঠায় তাকে নামিয়ে আনা যায় না। দৃশ্য আণব-পিণ্ড কিংবা অদৃশ্য অথচ ব্যাকৃত পরমাণুকে ভেঙে যদি অতিপরমাণুও করা যায়, এমন-কি তাকে সত্তার অণিষ্ঠ রজঃকণাতেও পরিণত করা যায়, তবু রূপকৃৎ প্রাণ ও মনের স্বধর্মবশে আমরা পাব আণবিক সত্তার একটা চরম কল্প। হয়তো সে স্থিতিধর্মী নয়, কিন্তু তবু তার প্রাতিভাসিক ধর্ম হবে শাশ্বত শক্তি-স্পন্দনের মধ্যে ক্ষণে-ক্ষণে নিজেকে একটা আকার দেওয়া। সে যে অণুভাবশূন্য একটা নির্ধর্মক শুদ্ধ ব্যাপ্তি বা অবকাশ মাত্র, এ-কল্পনা তখনও অচল। শুদ্ধ-ধাতু বা দ্রব্যসত্তার অণুভাববর্জিত অবকাশধর্ম—যার মধ্যে কোনও সমূহনের ব্যাপার নাই, সহভাবের অসংকীর্ণ প্রত্যয় থাকলেও যার মধ্যে নাই অন্তহীন দেশে অগণিত বস্তুসংস্থানের কল্পনা : এমন-একটা তত্ত্বকে বলা যায় শুদ্ধ সন্মাত্রের বিভাব—তার নিরুপাধিক দ্রব্যরূপ। কিন্তু এই ধর্মভাবশূন্য সত্তার বিজ্ঞান আছে অতিমানসেই—তার স্পন্দলীলার বাহনরূপে। কিছুতেই তাকে বিভাজক মনের সিসৃক্ষার সাধনরূপে কল্পনা করা যায় না, যদিও মনঃপ্রবৃত্তির অন্তরালে তার চেতনা জেগে থাকতেও পারে। জড়ের অতিগূঢ় স্বরূপতত্ত্ব সে-ই, যদিও যে-প্রতিভাসকে আমরা জড় বলি, সে কিন্তু তা নয়। মন প্রাণ জড় একাত্মক হয়ে যেতে পারে ওই শুদ্ধ সন্মাত্র এবং চিন্ময় অবকাশের সঙ্গে তাদের স্থাণুস্বভাবের স্বরূপজ্ঞানে, কিন্তু তাদের স্পন্দলীলায় সে-আত্মপ্রত্যয়কে ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে আনা আত্মানুভবে ও আত্মরূপায়ণে—এ তখনও সম্ভব নয়।

তাহলে আমাদের কাছে জড়ের তত্ত্ব এই দাঁড়াল। শুদ্ধ-সন্মাত্রে যে অন্তশ্চিন্ময় আত্মপ্রসারণের সহজ ধর্ম রয়েছে, বিশ্বলীলায় তা-ই ফোটে আধার-ধাতু বা চিদ্বিলাসরূপে। আর বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণের সিসৃক্ষার সংবেগে তা-ই দেখা দেয় আণবিক বিভাজন ও সমূহনের আকারে। আমরা তাকেই

জানি জড় বলে। কিন্তু প্রাণ ও মনের মত এই জড়ও শুদ্ধ-সন্মাত্র বা ব্রহ্মভূত —অতএব আত্মবিসৃষ্টির আবেগে স্পন্দমান। এও চিৎপুরুষের শক্তির একটা বিভূতি—মন যাকে দিয়েছে ভাবরূপ এবং প্রাণ দিয়েছে বস্তুরূপ। তার স্বরূপতত্ত্ব নিজেরই মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে চেতনারূপে। সে-চেতনা সংবৃত্ত, আত্মরূপায়ণের লীলায় পূর্ণগ্রস্ত, অতএব আত্মবিস্মৃত। জড়কে যতই মূঢ় যতই বোধহীন বলে মনে করি, তবুও তার মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে আছে যে-চেতনা, তার নিগূঢ় অনুভবে সে কিন্তু সন্মাত্রেরই রসোল্লাস। নিগূঢ় চেতনার কাছে নিজেকে সে ধরছে ইন্দ্রিয়সংবিতের বিষয়রূপে -তার অন্তর্গূঢ় দিব্যভাবকে প্রকটলীলায় ফুটিয়ে তুলতে। সত্তাকে জড়ের মধ্যে ফুটতে দেখছি রূপধাতু হয়ে, দেখছি নিগূঢ় আত্মচেতনার আত্মব্যাকৃতিরূপে সন্ধিনীশক্তির রূপায়ণ—দেখছি আনন্দ নিজের চেতনার কাছে নিজেকেই ধরছে সেখানে নিবেদনের ডালি করে। তাই জড়কেও সৎ-চিৎ-আনন্দ না বলে কি বলব? অতএব 'অন্নও ব্রহ্ম;' তাঁর মনোময় অনুভবে জড় ফুটেছে তাঁরই পরাক্ জ্ঞান ক্রিয়া ও আনন্দের রূপময় আয়তন হয়ে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জড়ের গ্রন্থি

নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ঋতং সপাম্যরুষস্য বৃষ্ণঃ ॥
কে ধাসিমগ্নে অনৃতস্য পান্তি ক আসতো বচসঃ সন্তি গোপাঃ ॥
ঋগ্বেদ ৫।১২।২,৪

পারছি না আমি যেতে নিজের জোরে বা দ্বৈত নিয়ে জ্যোতির্ময় পুরুষের ঋতের মধ্যে।...কারা অনৃতের প্রতিষ্ঠাকে রেখেছে আগলে? কারা আছে অসতী বাণীর রক্ষক হয়ে?

—ঋগ্বেদ (৫।১২।২,৪)

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চন আস ॥
তম আসীত্তমসা গূলহমগ্রে ঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্ মহিনাজায়তৈকম্ ॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥
ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১-৫

ছিল না অসৎ, না ছিল সৎ তখন, না ছিল অন্তরিক্ষ—না ব্যোম, না তারও পরে যা। কিসে ছিল ঢেকে সব? কোথায় ছিল? কার শরণে? কি ছিল সে অম্ভোধি—গহন গভীর? না ছিল মৃত্যু, না অমৃত তখন, না ছিল রাত্রি বা দিনের প্রচেতনা। নিবাত নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন স্বধার বীর্যে সেই এক; তারও পরে ছিল না তো আর-কিছুই। আঁধার ছিল আঁধারে নিগূঢ় হয়ে সবার আগে, অপ্রকেত সলিল ছিল এই যা-কিছু সব। তুচ্ছ্য দিয়ে বিশ্বভূ ঢাকা যখন ছিল, তপের মহিমায় তখন আবির্ভূত হলেন সেই এক। সেই এক প্রথম করলেন বিচরণ কাম হয়ে—যা ছিল মনেরই আদিবীজ। সতের বাঁধনিকে অসতে পেলেন নিবিড়ভাবে কবিরা—দিয়ে হৃদয়ের এষণা আর মনীষা। তির্যক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল রশ্মি এঁদের; কিন্তু নীচে ছিল কি? উপরেই-বা ছিল কি? ছিল রেতোধা যারা, ছিল মহিমারা; স্বধা ছিল নীচে, আর প্রযতি ছিল উপরে।

—ঋগ্বেদ (১০।১২৯।১-৫)

যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, সে যদি সত্য হয় (যে-তথ্যের আশ্রয়ে গবেষণা চলছে, তাহতে অন্য-কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়), তাহলে ব্যবহারের প্রয়োজনে এবং চিরাভ্যস্ত সংস্কারবশে মন চিৎ ও জড়ের মাঝে যে তীক্ষ্ম বিরোধের সৃষ্টি করেছে, তার স্বতঃসিদ্ধ কোনও বাস্তবতা থাকে না। এ-জগৎ অন্তহীন বৈচিত্র্যে লীলায়িত এক অখণ্ড চেতনার বিলাস—শুদ্ধ শাশ্বত অসামের মধ্যে বিকল সুরসাধনার অবিরাম প্রয়াস নয়, অথবা অনপনেয় বিরোধের একটা

চিরন্তন সংঘাত নয়। অন্তহীন বৈচিত্র্যে উৎসারিত এক অব্যভিচারিত অখন্ড-ভাব—এই তার আদি ও প্রতিষ্ঠা। তারপর আপাত সংঘাত ও খন্ডভাবের অন্তরালে সমন্বয়ের নিরন্তর প্রয়াসে সমস্ত অনৈক্যকে গেঁথে তোলা এক মহতী সম্ভাবনার জন্ম দিতে—এই তার মধ্যপর্বের সত্য পরিচয়। এই মধ্যলীলার মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে এক অখন্ড কবিক্রতুর অকুণ্ঠিত ঈশনা, যার সিদ্ধবীর্য একদিন পূর্ণোন্মেষিত হয়ে ফোটাবে বিশ্বজিৎ সৌষম্যের বিকচ কমল। সেই হবে বিশ্বলীলার অন্ত্যপর্ব। রূপধাতু এই চিৎশক্তির আত্মবিভূতি—তার এক কোটি জড়, আরেক কোটি চিৎ। দুয়ে বস্তুত কোনও ভেদ নাই। আমরা যাকে জড় বলে অনুভব করি, তার সত্ত্ব ও তত্ত্ব হল চিৎ। আর আমাদের অনুভবে যা চিৎ, তার রূপ ও কায় হল জড়।

অবশ্য ব্যবহারদশায় চিৎ আর জড়ের মাঝে প্রকান্ড একটা ফাঁক আছে এবং তারই 'পরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার পর্বে-পর্বে জগতীর ক্রমোদয়। পূর্বেই বলেছি, চিৎসত্তা যখন ইন্দ্রিয়ের কাছে নিজেকে বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে, তখনই সে ধরে রূপধাতু বা দ্রব্যের আকার। যে-কোনও ধরনের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে ভিত্তি করে ব্রহ্মান্ডসৃষ্টি এবং বিশ্বপ্রগতির লীলায়ন প্রবর্তিত হবে, এই হল তার প্রয়োজন। কিন্তু তাবলে জগদ্ব্যাপারের একটি মাত্র আধার আছে, ইন্দ্রিয় এবং রূপধাতুর মাঝে সন্নিকর্ষের একটি অনাদি-অব্যয় রীতিই আছে শুধু—এমন-কোনও নিয়ম নাই। বরং করণশক্তিরও ক্রমসূক্ষ্ম রূপ আছে, আছে ক্রমবিকাশের পরম্পরা। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় যাকে জড়ধাতু বলে জানে, তার চাইতেও বহুগুণ সূক্ষ্ম সুনম্য ও সাবলীল এমন রূপধাতুও আছে, শুদ্ধমন যার পরিমন্ডলে স্বভাবের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বিচরণ করে। যখন দেখি, একটা সূক্ষ্ম পরিমন্ডলে মনোময় রূপ ভেসে উঠছে, মনের সূক্ষ্ম লীলায়ন চলছে—তখন সূক্ষ্ম মনোধাতুও যে আছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। তেমনি জানি, এমন প্রাণধাতুও আছে, বিশুদ্ধ প্রাণস্পন্দের যা বাহন—সূক্ষ্মতম জড়ধাতু এবং তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তিপ্রবেগের চাইতেও যার লীলা সূক্ষ্মতর। চিৎকেও তেমনি বলতে পারি সন্মাত্রের শুদ্ধধাতু—কিন্তু রূপধাতুর মত সে অন্নময় প্রাণময় অথবা মনোময় করণশক্তির গ্রাহ্য নয়। এক শুদ্ধ চিন্ময় লোকোত্তর প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের জ্যোতিতে ভাসে তার রূপ—যেখানে অলৌকিক অনুব্যবসায়ের ফলে বিষয়ী নিজেই নিজের বিষয় হয়। অর্থাৎ যেখানে, যিনি দেশ-কালের অতীত, নিজেকে তিনি জানেন বিশুদ্ধচিন্ময় আত্ম-প্রসারণের প্রত্যক্‌কল্পনে—সর্বভূতের আদি নিমিত্ত ও উপাদানরূপে। এই হল বিশ্বের 'সন্মূল, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠা'—তার ওপারে একাত্মপ্রত্যয়সার পরমচেতনায় তলিয়ে গেছে বিষয়-বিষয়ীর ভেদপ্রত্যয়। রূপ- বা অরূপ- কোনও ধাতুর কথাই আর সেখানে ওঠে না।

অতএব মনের ভিতর দিয়ে এক চিন্ময় (মনোময় নয়) ভেদকল্পন হতে নেমে এসেছে চিৎ হতে জড় পর্যন্ত একটি ধারা। আবার তেমনি জড় হতে মনের ভিতর দিয়ে চিৎ পর্যন্ত চলেছে সে-ধারার উত্তরায়ণ। কিন্তু এই বিকল্পনে কখনও অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপহানি ঘটে না। সম্যক্-দর্শনে যখন বিশ্বের অনাদি তত্ত্বরূপ ফুটে ওঠে, তখন দেখি জড়ের তমোঘন স্থূল বিবর্তনের মধ্যেও পরমার্থসতের অদ্বয় মহিমা অপ্রচ্যুত এবং অবিকৃত রয়েছে। ব্রহ্ম বিশ্বের বিধৃতি ও অন্তর্যামী নিমিত্তই নন শুধু, তিনি তার উপাদানও। বরং তিনিই তার একমাত্র উপাদান। বেদান্তের ভাষায় এ-জগতের তিনি অভিন্ননিমিত্তোপাদান। তাই 'অন্নও ব্রহ্ম'—ধর্মে ও স্বরূপে অন্ন বা জড় ব্রহ্ম হতে কখনও ভিন্ন নয়। সৃষ্টিবিকল্পনে জড় যদি চিৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, তাহলে অবশ্য এই অভেদভাব সিদ্ধ হত না। কিন্তু দেখেছি, জড় ব্রহ্মসত্তার অন্ত্যা পরাক্-বিভূতি—তাকে আবৃত করে ব্রহ্ম অখণ্ড স্বরূপে তার মধ্যে অন্তঃস্যূত। এ-জগতের অসাড় ও আপাতমূঢ় জড়ের মধ্যেও সর্বদেশে সর্বকালে এক বিপুল প্রাণশক্তির আলোড়ন অন্তঃসংজ্ঞ হয়ে আছে। প্রাণ-শক্তির আপাত-অচেতন আন্দোলনের মধ্যে এক নিত্যস্পন্দিত অব্যক্ত মনের লীলা অনুস্যূত রয়েছে, যার নিগূঢ় প্রবৃত্তি প্রাণের বিচ্ছুরণে ব্যক্ত হয়েছে। আবার জীবদেহে অধিষ্ঠিত অবিদ্যাচ্ছন্ন অনিশ্চতবৃত্তি অভাস্বর মনের পিছনে রয়েছে তারই আত্মস্বরূপ অতিমানসের অটুট আশ্রয় এবং অকুণ্ঠ শাসন। এমন-কি যে-জড় এখনও মনোময় হয়ে ওঠেনি, তারও অন্তরে অতিমানসের আবেশ আছে। এমনি করে ব্রহ্মই নিখিল বিশ্বকে জারিত করে রয়েছেন, কেননা জড় প্রাণ মন অতিমানস সমস্তই শাশ্বত চিদ্রূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বৈভব মাত্র। তাদের মধ্যে শুধু তিনি নিবিষ্ট নন—তিনিই হয়েছেন এই সব, অথচ এর কোনটিই তাঁর পরা কাষ্ঠা নয়।

সবই এক, তবু কল্পনায় ভেদ এবং ব্যবহারে পার্থক্য আছে। তাই জড় যদিও বস্তুত চিৎ হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তবু ব্যবহারদশায় বিচ্ছেদের রেখাটা এতই উগ্রভাবে স্পষ্ট যে ভেদ সেখানে একেবারে বিপরীত ধর্ম হয়ে ফুটেছে। জড়াশ্রয়ী জীবনকে তাই মনে হয় অধ্যাত্মজীবনের একান্ত প্রতিষেধ বলে। এইজন্য জড়কে বেমালুম ছেঁটে ফেললেই সকল হাঙ্গামা অনায়াসে চুকে যায় - এই অনেকের মত। কথাটা সত্য। কিন্তু অনায়াসেই হ'ক আর আয়াসেই হ'ক, হাঙ্গামা চোকানোটাই তো সমস্যার সমাধান নয়। তবু জড়ই যে সকল সংকটের মূল, তা অনস্বীকার্য। বাস্তবিক জড়ের বাধাই আর-যত পথের বাধা ডেকে আনে। জড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই প্রাণ স্থূলে সংকুচিত পীড়া-গ্রস্ত মৃত্যুলাঞ্ছিত। মনও অন্ধপ্রায়—ডানা ছেঁটে শিকল-পায় তাকে দাঁড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে—মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দবিহারের স্বপ্ন থাকলেও তার সাধ্য

নাই! অতএব অধ্যাত্মপথের নিষ্ঠাবান যাত্রী যদি জড়ের পঙ্কিলতায় কুঞ্চিত-নাসিক হন, প্রাণের জান্তব স্থূলতাকে মনে করেন বীভৎস, অথবা নিজের মধ্যে কুণ্ডলী-পাকানো মনের শুধু ভাগাড়ের-দিকে-দৃষ্টিতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে সকল জঞ্জাল সবলে ছুঁড়ে ফেলে নিষ্ক্রিয় নৈঃশব্দ্যের সাধনায় ফিরে যেতে চান চিৎস্বরূপের অচলপ্রতিষ্ঠ কৈবল্যে, তাহলে তাঁর দিক থেকে বিচার করে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে কি? কিন্তু তাঁর এই কৈবল্যদর্শনই তো একমাত্র দর্শন নয়। অথবা বহু সিদ্ধ মহামানবের হিরণ্যদ্যুতিতে এ-দর্শন আলোকিত বলেই তো মনে করতে পারি না সর্বতোভদ্র সম্যক্ বিজ্ঞানের এ-ই চরম রূপ। অতএব বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের উত্তাপ হতে মনকে মুক্ত করে আমাদের দেখা উচিত, বিশ্বের এই দৈবাহিত বিধানের তাৎপর্য কি। জড়ের দুর্মোচন গ্রন্থি চিৎকে যদি নিরাকৃত করেই থাকে, তাহলেও তার প্রত্যেকটি সূত্রকে ধৈর্যসহকারে পৃথক করে গ্রন্থিমোচনের উপায় আমাদের খুঁজতে হবে—উগ্র আঘাতে গ্রন্থিছেদন করলেই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হবে না। কোথায় সংকট, কোথায় বিরোধ—আগে চাই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ। প্রয়োজন হলে বাধাকে লঘু না করে বরং বাড়িয়ে দেখেই তার উত্তরণের উপায় খুঁজতে হবে।

জড়ের সঙ্গে চিতের গোড়াকার বিরোধ এই। বলতে গেলে জড় অবিদ্যার ঘনবিগ্রহ। জড়ের মধ্যে চিৎ আত্মবিস্মৃত, নিজেকে সে নিজেরই কর্মজালে হারিয়ে ফেলেছে—গভীর অভিনিবেশে মানুষ যেমন শুধু-যে নিজের কথা ভুলে যায় তা নয়, নিজের সত্তাকে পর্যন্ত ভুলে ক্ষণেকের জন্য ক্রিয়মাণ কর্ম আর কৃতিশক্তির সঙ্গে এক হয়ে যায়। চিৎ-বস্তু স্বয়ংজ্যোতি, নিখিল শক্তি-লীলার পিছনে নিত্যজাগ্রত তাঁর আত্মসংবিৎ ও অকুণ্ঠ ঈশনা। কিন্তু জড়ের মধ্যে তিনি বিলুপ্ত—তিনি যেন অসৎ। কোথাও তাঁর অস্তিত্ব থাকলেও এখানে তিনি রেখে গেছেন একটা অচেতন অন্ধশক্তির মূঢ়তা শুধু—যে-শক্তি গড়ছে-ভাঙছে অনন্তকাল ধরে, কিন্তু জানে না কে সে, কি গড়ছে, কেন গড়ছে, যাকে গড়ল তাকে কেনই-বা ভাঙছে! কিছুই সে জানে না, কেননা তার মন নাই। কোনও দরদও তার নাই, কেননা তার যে হৃদয় নাই। হয়তো জড়-বিশ্বের এ-পরিচয় সত্য নয়, এই মিথ্যা প্রতিভাসের পিছনে কোথাও হয়তো আছে মন সংকল্প কি তার চাইতে বৃহৎ একটা তত্ত্ব। তবু অচিতির অমানিশা হতে জেগেছে চেতনার যে-খদ্যোতিকা, তার কাছে সত্য শুধু জড়বিশ্বের এই তামসী মূর্তি। জড়প্রকৃতির এ-মূর্তি মিথ্যা হলেও এ-মিথ্যার মত মর্মান্তিক সত্য বুঝি আর নাই। কেননা, এই মিথ্যা আমাদের প্রাকৃত জীবনের নিয়ন্তা, এরই নাগপাশে বাঁধা আমাদের সকল অভীপ্সা এবং সাধনা।

এই তো আমাদের করাল নিয়তি, জড়বিশ্বের এই তো নির্মম রুদ্রলীলা।

কি করে ওই নির্মন হতে জাগে এক বিরাট মন, অথবা অগণিত ব্যষ্টিমনের স্ফুলিঙ্গ—আলোকের কাঙাল আকৃতি নিয়ে ? কী অসহায় তারা একা-একা ! আত্মরক্ষার প্রয়াসে ব্যষ্টির ক্ষীণদীপ্তিকে সমবেত ও সংহত করে তাদের সে-অসহায়ভাব হয়তো কতকটা কাটে। কিন্তু বিশ্বব্যাপি বিপুল অবিদ্যার অন্ধতমিস্রাকে তারা কতটুকু আলোকিত করতে পারে ? এই হৃদয়হীন অচিতির গহন হতে তার কঠোর নিয়ন্ত্রণ মেনে জন্মেছে কত আকৃতিভরা হৃদয়—দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির অন্ধ নিশ্চেতন নির্মমতার ভয়াল নিষ্পেষণে তারা নিপীড়িত রক্তাক্ত, যে-নির্মমতা তাদেরই চেতনার স্পর্শে সচেতন হয়ে ধরে নৃশংস হিংস্রতার আতঙ্ককর রূপ !...কিন্তু এই বিভীষিকার অন্তরাল হতে উঁকি দেয় কোন্ রহস্যের প্রচ্ছন্ন আভাস ? বুঝি আত্মহারা চিতিশক্তিই এমনি করে নিজেকে ফিরে পেতে চায়। বিপুল আত্মবিস্মৃতির গহন হতে তার উন্মেষ—ধীরে-ধীরে, বেদনায় বিপ্লুত হয়ে—প্রাণের জ্যোতিরূপে। প্রথম দেখা দিল তার মধ্যে বোধের স্তিমিত সম্ভাবনা। তারপর সে-বোধ অর্ধস্ফুট—অনতিস্ফুট—পূর্ণস্ফুট হয়ে অবশেষে চাইল প্রাকৃত সংবিতের সীমা লঙ্ঘন করে দিব্য আত্মসংবিতে প্রভাস্বর হয়ে উঠতে—অনন্ত অমৃতের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে উল্লসিত হতে। কিন্তু তার প্রচেতনার অভিযান জড়ের প্রতীপ শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই অবিদ্যার নাগপাশকে ক্ষণে-ক্ষণে শিথিল করে তার পথ চলতে হয়। অথচ এই মূঢ় স্বতঃখণ্ডিত জড়শক্তিই রচে তার পথ এবং সাধন; তারই জন্যে প্রতি পদে অবিদ্যা ও সংকোচের কুণ্ঠায় তার সাধনা ব্যাহত হয়।

চিৎ আর জড়ে এই আরেকটা মৌলিক ভেদ। জড়ের মধ্যে পরবশ যন্ত্রের মূঢ়তা একেবারে চরমে পৌঁছেছে। তাই এতটুকু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেখানে জাগে, সেখানেই সে এনে হাজির করে পর্বতপ্রমাণ তামসিকতা। জড় যে স্বরূপত অসাড় ও নিস্পন্দ, তা নয়। বরং তার মধ্যে আছে অন্তহীন স্পন্দ, অকল্প্য শক্তি, নিরন্ত কর্মের নির্ঝর—তার স্পন্দলীলার বৈপুল্যে আমরা বিস্ময়মুগ্ধ। কিন্তু চিৎ স্ব-তন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ, আত্মকৃতির বশ না হয়ে তার নিয়ন্তা, বিধিতন্ত্রিত না হয়ে নিজেই বিধির বিধাতা। আর এই জড়-দানব বাঁধা পড়েছে যন্ত্রমূঢ় নিয়মের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে। নিয়মের কঠিন শাসন তার 'পরে কে চাপাল, তা সে জানে না। অকল্পিত বলেই এ তার কাছে দুর্বোধ। তবু যন্ত্রের মত এর অন্ধ অনুবর্তন করে চলেছে সে। যন্ত্রের মত সেও জানে না, কি উপায়ে কে গড়েছে তাকে, কিসের জন্যে। এই যান্ত্রিকতার মধ্যে যখন প্রাণ জেগে, স্থূল রূপ ও জড়শক্তির 'পরে নিজেকে চাপিয়ে স্বচ্ছন্দে সবার 'পরে প্রয়োজনের দাবি খাটাতে চায়; মন জেগে যখন জানতে চায় নিজের ও সবার স্বরূপ নিদান ও স্বধর্ম এবং লব্ধজ্ঞানের সহায়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও স্বতঃক্রিয়ার প্রবেগকে সঞ্চারিত করতে চায় সবার মধ্যে; তখন জড়প্রকৃতিও

খানিকটা ধস্তাধস্তির পর অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রাণ ও মনের শাসন কিছুদূর পর্যন্ত মেনে চলে, এমন-কি তাদের সমর্থক ও সহায়ও হয় যেন। কিন্তু তার পরেই জড়ের মধ্যে দেখা দেয় একটা প্রতিক্রিয়া, প্রগতিবিরোধী তামসিক নাস্তিক্যের একটা দুরাগ্রহ। এমন-কি, প্রাণ ও মনের অগ্রসর অভিযান যে অসম্ভব, তাদের অপূর্ণ সাধন যে কখনও সিদ্ধির চরমে উত্তীর্ণ হবে না—এমন-একটা ক্লৈব্যের বোধও সে তাদের মধ্যে এনে দেয়। প্রাণ চায় প্রসার, চায় আয়ু—এবং তা সে পায়ও। কিন্তু তার মধ্যে বিশ্বব্যাপ্তি ও অমৃতের পিপাসা যখন জাগে, তখন জড়ের লৌহমুষ্টি এসে তার কণ্ঠরোধ করে, সংকীর্ণতা ও মৃত্যুর নিষ্পেষণে পঙ্গু করে তার সকল সাধনা। মন চায় প্রাণের দোসর হতে, চায় তার সর্বজ্ঞান ও সর্বজ্যোতির নন্দন-কল্পনাকে সার্থক করতে। সত্য প্রেম ও আনন্দের নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে সে হতে চায় সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। কিন্তু প্রমাদে ভ্রান্তিতে তামসী প্রবৃত্তির স্থূল হস্তাবলেপে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আড়ষ্টতা ও নাস্তিক্যে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে তার সকল কল্পনা। চিরকাল তাই ভ্রান্তি জড়িয়ে থাকে তার জ্ঞানের সঙ্গে, আঁধার হয় তার আলোর পটভূমি ও নিত্যসহচর। তার সত্যের এষণা সার্থক হলেও হাতের মুঠায় এসে সে-সত্যের রং বদলে যায়। তখন আবার তাকে নতুন করে তার সন্ধানে ছুটতে হয়। প্রেম আছে, কিন্তু তার তর্পণ নাই। আছে আনন্দ, নাই তার সার্থকতা। দুয়েরই সঙ্গে বেড়ি হয়ে ছায়া হয়ে জড়িয়ে আছে যত তাদের প্রতিপক্ষ—ক্রোধ বিদ্বেষ ও উপেক্ষারূপে, দুঃখ শোক ও নির্বেদের আকারে। প্রাণ ও মনের আকুল আকৃতিতেও জড়ের অসাড় মূঢ়তা টলতে চায় না। তাই অবিদ্যা আর তার প্রমত্ত তামসশক্তিও কিছুতেই যেন পরাভব মানতে চায় না।

কেন এমন হয় খুঁজতে গিয়ে দেখি, এই তামস বাধার বীর্য নিহিত আছে জড়ের তৃতীয় ধর্মে। খণ্ডভাব আর সংঘাত একেবারে চরমে উঠেছে জড়ের মধ্যে, চিতের সঙ্গে এই তার তৃতীয় দফা মৌলিক বিরোধ। জড়প্রকৃতি তত্ত্বত একটা অখণ্ড সত্তা হলেও খণ্ডভাব তার সকল ক্রিয়ার আশ্রয়, তাকে ছেড়ে একচুল তার এদিক-ওদিক যাবার হুকুম নাই। কারণ অবয়বের সঙ্কলন, অথবা অন্যোন্যসত্র দ্বারা অবয়বের সমানয়ন, এইদুটি হল তার অবয়বযোজনার মুখ্য কৌশল। কিন্তু খণ্ডভাবের শাশ্বত লীলা দুয়েরই মধ্যে সুস্পষ্ট। প্রথমটিতে একত্বের সাধনার চেয়ে সংযোজনের সাধনা বড় বলে স্বভাবতই সেখানে আছে বিযোজনের নিত্য সম্ভাবনা এবং তার ফলে চরম প্রধ্বংসের অনিবার্যতা। দুটি কৌশলই মৃত্যুশাসিত। একটিতে মৃত্যু জীবনের সাধন, আরেকটিতে তার নিমিত্ত-পরিবেশ। উভয়ত্র, জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে বিভক্ত অবয়বের অন্যোন্যসংঘাতের 'পরে। প্রত্যেকটি অবয়ব যেমন নিজের প্রতিষ্ঠা খুঁজছে, তেমনি চাইছে নিজের পরিমণ্ডলকে বজায় রাখতে, বাধাকে আয়ত্তে আনতে

কি ধ্বংস করতে, অপরকে আহরণ করে অন্নরূপে কবলিত করতে। অথচ নিজে সে বিদ্রোহ করবে, সকল জুলুম এড়িয়ে যেতে চাইবে, ধ্বংসের সম্ভাবনাকে স্বীকার করবে না, অপরের অন্ন হতে চাইবে না কিছুতেই। প্রাণ জড়ের মধ্যে নিজেকে স্ফুরিত করতে গিয়ে এই খণ্ডভাবের সংঘাতকে তার সকল প্রবৃত্তির পীঠরূপে পায়। তাই এর জুলুমকে না মেনে তার উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে তাকে তখন মৃত্যু কামনা ও সঙ্কোচের শাসন স্বীকার করতে হয়। প্রাণের প্রথম অঙ্ক তাই সঙ্কুল হয়ে ওঠে বুভুক্ষা লিপ্সা ও জিগীষার অবিরাম প্রমত্ততায়। তেমনি, যখন জড়ের মধ্যে মন ফোটে, তখন তাকেও স্বীকার করতে হয় ওই মাটির ছাঁচ আর মাটির মালমশলার মূঢ় সঙ্কোচ। তাই তার চাওয়া কখনও নিশ্চিত পাওয়াতে সার্থক হয় না—তার সকল সঞ্চয়নে, কাজের সকল খুঁটিনাটিতে চলে ওই ভাঙা-গড়ার নিত্য সংঘাত। এইজন্যই মনোময় মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয় কখনও চরম নৈশ্চিত্যে নিঃসংশয় হয় না। ঘাত-প্রতিঘাত আর ভাঙা-গড়ার হিন্দোলাতে দুলবে তার যত সাধনা—এই বুঝি তার নিয়তি। সৃষ্টির ক্ষণিক পুষ্টি তলিয়ে যাবে বিনষ্টিতে, কোথাও ধ্রুব প্রগতির নিশানা থাকবে না—বারে-বারে এই মায়ার খেলাই চলবে তার জীবনের রঙ্গমঞ্চে।

জড়প্রকৃতির অবিদ্যা অসাড়তা ও খণ্ডভাব তার ওই মূঢ় খণ্ডিত তামস স্থিতির দুরাগ্রহে উন্মিষৎ প্রাণ ও মনের 'পরে চাপায় দুঃখ সন্তাপ ও অতৃপ্তির অসোয়াস্তি—এই বিপত্তিই তো সর্বনাশা। মনশ্চেতনা যদি একেবারে অবিদ্যা-চ্ছন্ন হত, তাহলে অবিদ্যা অতৃপ্তির বেদনা জাগাত না। অভ্যস্ত আচারের খোলার মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাস করত—তার নিজের মূঢ়তা কিংবা তাকে ঘিরে চেতনা ও জ্ঞানের যে অন্তহীন পারাবার, দুয়েরই সম্পর্কে সে নিঃসাড় থাকত। কিন্তু জড়ের মধ্যে স্ফুরন্ত চেতনা ঠিক এইখানটায় সজাগ হয়ে ওঠে। প্রথম সে জানে, এ-জগতের কিছুই সে জানে না, অথচ একে জেনে বশ করে তার সুখ। তারপর সে জানে, শেষ পর্যন্ত তার এ-জানাও সঙ্কীর্ণ এবং বন্ধ্যা, এতে যে সুখ ও শক্তি মেলে, সেও শীর্ণ এবং অনিশ্চিত। অথচ তার নিজের মধ্যে আছে অনন্ত চেতনা জ্ঞান ও স্বরূপসিদ্ধির সম্ভাবনা, যা তার জীবনে আনতে পারে অন্তহীন সর্বজয়ী আনন্দ। তেমনি জড়প্রকৃতির অসাড়তাও অতৃপ্তি ও অস্বস্তিতে প্রাণকে পীড়িত করত না, যদি একেবারে নিঃসাড় হয়ে থাকা তার স্বভাব হত। তখন হয়তো অর্ধচেতন প্রবৃত্তির সঙ্কোচ নিয়ে সে তৃপ্ত থাকত—জানতও না এক অমিত বিক্রম ও অমর জীবনের অঙ্গীভূত অথচ বিবিক্ত অংশ হয়েই সে বেঁচে আছে। তাই ওই অমৃত ও আনন্ত্যকে সম্ভোগ করবার সত্যকার কোনও প্রেতিও সে অনুভব করত না।...কিন্তু ঠিক এই প্রেতিই প্রথম থেকে নিখিল প্রাণকে আকুল করেছে। তার টলমল ভাব, তার আত্মরক্ষার এবং টিকে থাকবার প্রয়োজন ও প্রয়াস—এ-সম্পর্কে সে তীব্রভাবে সচেতন।

তাই নিজের সঙ্কোচ সম্বন্ধে ক্রমে সজাগ হয়ে স্থায়িত্ব ও বৈপুল্যের উন্মাদনায় সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে—শাশ্বত অনন্তের পথে ধাবিত হয় তার দুর্নিবার আকূতি।

মানুষের মধ্যে প্রাণ পরিপূর্ণ আত্মসচেতন হয়ে উঠলে এই অনিবার্য সংঘাত প্রয়াস ও অভীপ্সাও চরমে পৌঁছয় এবং সেইসঙ্গে জগতের বিক্ষোভ ও বেদনা তীব্র অসহন হয়ে ওঠে প্রাণের কাছে। মানুষ সীমার সঙ্কোচকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে দীর্ঘযুগ নিজেকে শান্ত রাখতে পারে, অথবা স্থূল জগৎকে বশে আনবার সাধনাতে আংশিক সিদ্ধিলাভও করে। হয়তো কোনও-কোনও ক্ষেত্রে তার উপচীয়মান জ্ঞান জড়প্রকৃতির অচেতন নিয়ম-নিষ্ঠার 'পরে অন্তরে-বাইরে বিজয়ী হয়, বিপুল তামসী শক্তির মূঢ়তাকে নির্জিত করে তার সীমিত অথচ সচেতন সঙ্কল্পের একাগ্র প্রবেগ। কিন্তু তবু সে অনুভব করে, তার পরমা সিদ্ধিও এ-ক্ষেত্রে কত অনিশ্চিত, কত অকিঞ্চিৎকর। তখন বাধ্য হয়ে তাকে তাকাতে হয় ব্যাকুল বেদনা নিয়ে সুদূর দিগন্তের দিকে। সসীম কি চিরতৃপ্ত থাকতে পারে কখনও, যদি সে জানে এরও পরে আছে এক বৃহত্তর সসীম, অথবা এক লোকোত্তর অসীম যার মধ্যে কখনও তার অভীপ্সার অভিযান নিঃশেষ হবে না? সসীমতা যদিই-বা কখনও তৃপ্তি মানে, আপাত-সসীম সত্ত্বের মধ্যে কিন্তু জ্বলে অতৃপ্তির নিত্যদাহ। কেননা ক্ষণে-ক্ষণে তাকে উন্মনা করে তোলে অনন্ত আত্মস্বরূপের তাত্ত্বিক অনুভব, গুহাহিত আনন্ত্যের অস্পষ্ট আভাস বা উদগ্র প্রেতির বেদন। অতএব সসীমে-অসীমে সমন্বয় না ঘটিয়ে তার নিষ্কৃতি কোথায়?—হয় অসীমকে সে অধিকার করবে, নতুবা তারই মধ্যে আত্মহারা হবে। যেমন করে হ'ক, যতটুকু হ'ক—এই সাযুজ্য ছাড়া আর কিসে তার তৃপ্তি? এমনিতর আপাত-সান্ত আনন্ত্যই মানুষের স্বরূপ বলে অনন্তের এষণা তার চরম সার্থকতায় একদিন পৌঁছবেই। সে-ই প্রথম 'পুত্রঃ পৃথিব্যাঃ', যার মধ্যে জেগেছে হৃৎশয় পুরুষের অস্পষ্ট চেতনা, জেগেছে অমৃতত্বের অব্যক্ত অনুভব ও পিপাসা। তাই অশ্রান্ত জিজ্ঞাসাই তার প্রাজনী, তার আত্মবলির যূপ—যতদিন না এই জিজ্ঞাসাকে সে রূপান্তরিত করতে পারে অনন্ত জ্যোতি আনন্দ ও বীর্যের গঙ্গোত্রীতে।

জড়ের বিমূঢ় অসাড়তায় অবলুপ্ত দিব্য চেতনা ও শক্তি, প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের এই-যে উদয়ন এবং ক্রমিক স্ফুরণ, এ হতে পারত বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসের মত আনন্দ হতে উত্তর আনন্দে, অন্তহীন অনুত্তম আনন্দে উত্তরণের একটা জ্যোতিরুৎসব—যদি জড়প্রকৃতির মূলে খণ্ডভাবের আড়ষ্ট কাঠিন্য না থাকত। বিবিক্ত ও সঙ্কীর্ণ দেহ-প্রাণ-মনের ব্যষ্টিচেতনায় জীব যখন বন্দী হল, তখনই তার আত্মপরিণামের স্বভাবছন্দও ব্যাহত হল। তখন তার দেহ হল রাগ দ্বেষ জিগীষা তিতিক্ষা বিক্ষোভ ও সন্তাপের একটা কুরুক্ষেত্র। কেননা,

চিৎশক্তির একটি ক্ষুদ্র আয়তন বলে প্রত্যেকটি দেহকে অপর আয়তন কিংবা বিশ্বশক্তির অভিঘাত আক্রমণ ও অনীপ্সিত সংঘর্ষের বিরুদ্ধে উদ্যত থাকতে হয়। যখন বাইরের চাপে সে ভেঙে পড়ে, অথবা ক্ষোভক এবং ক্ষুভিত চেতনার মধ্যে যখন ছন্দঃপতন হয়, তখনই তার মধ্যে জাগে অস্বস্তি এবং পীড়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সংঘাত, জিঘাংসা অথবা আত্মরক্ষার প্রয়াস। খন্ডভাব হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়মানসের ভূমিতেও নিয়ে আসে ওই একই সংঘাতের বেদনা। সেখানেও দেখা দেয় হর্ষ-শোক, অনুরাগ-বিরাগ, উত্তেজনা-অবসাদের দ্বন্দ্ব। এ-সমস্তই বাসনার ছাঁচে ঢালা। আর বাসনাকে উপলক্ষ্য করে জাগে উদগ্র প্রয়াসের ব্যাকুলতা। আবার প্রাণপাতী প্রয়াসের উত্তেজনাতে দেখা দেয় সামর্থ্যের জোয়ার-ভাটা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি ও লাভ-অলাভের দ্বন্দ্ব, অশক্তি সংঘর্ষ পীড়া ও অস্বস্তির একটা অবিরাম আলোড়ন। মনের জগতেও দেখি তা-ই। বিশ্বের চিন্ময় বিধান হল : সংকীর্ণ সত্য মিশবে বৃহৎ সত্যের মুক্তধারায়, ক্ষুদ্রশিখা মিলিয়ে যাবে বৃহৎ জ্যোতির বিপুলতায়, অপরা ইচ্ছা নিজেকে সঁপে দেবে পরা ইচ্ছার রূপায়ণী মায়ার কাছে, তৃপ্তির ক্ষুদ্র সাধনা উত্তীর্ণ হবে মহাপরিতর্পণের আনন্দলোকে। কিন্তু জড়প্রকৃতি মনোলোকেও জাগায় সত্য আর মিথ্যার, আলো আর আঁধারের, শক্তি আর অশক্তির সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। এখানেও দেখি, এষণা ও তার চরিতার্থতা যদি-বা আনে সুখ, লব্ধ-বিত্তের সম্ভোগ সেই সঙ্গেই নিয়ে আসে বিতৃষ্ণা ও অতৃপ্তির দুঃখ। নিজের বিকলতার সঙ্গে-সঙ্গে দেহ ও প্রাণের বিকলতাও মনকে পীড়িত করে প্রাকৃত জীবনের দৈন্য ও পঙ্গুত্বের ত্রিস্রোতায় তার চেতনা হয় বিপ্লুত। তার অর্থই হল আনন্দের নিরাকরণ -সৎ-চিৎ-আনন্দরূপী মহাত্রিপুটীর নিরাকরণ। এ-নিরাকরণ অনতিবর্তনীয় হলে জীবলীলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ, যে-জীবন চেতনা ও শক্তির বিচিত্র লীলায়নে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, সে তো অন্তরাবৃত্ত হয়েই থাকবে না শুধু—ওই লীলারসের মধ্যে সে খুঁজবে আত্মার তর্পণ। কিন্তু বিশ্বলীলায় সত্যকার কোনও তৃপ্তি না থাকলে এই মনে করেই তার মায়া ছাড়তে হবে যে, এ শুধু দেহে অবতীর্ণ চিৎসত্তার একটা নিষ্ফল সাধনা, একটা অতিকায় প্রমাদ, একটা অর্থহীন প্রলাপ!

দুঃখবাদী সকল দর্শনের গোড়ার কথাই এই। লোকান্তর অথবা লোকোত্তর ভূমি সম্পর্কে সুখবাদী হলেও পার্থিব জীবন সম্পর্কে তাদের দুঃখবাদ বস্তুত দুরপনেয়। অন্নময় জগতে মনোময় জীবের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই যে নিয়তি, এসম্পর্কে তারা নিঃসংশয়। তারা বলে : খন্ডভাব যখন জড়প্রকৃতির স্বধর্ম, আর আত্মসঙ্কোচ অবিদ্যা এবং অহমিকা দেহীমাত্রের মনোবীজ, তখন পৃথিবীতে থেকে আত্মার পরিতর্পণ অথবা বিশ্বলীলাতে দিব্য আকৃতি ও সিদ্ধির কোনও নিদর্শন আবিষ্কার

করবার প্রয়াস একটা আত্মপ্রবঞ্চনা শুধু। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপানন্দের সঙ্গে জীবসত্তা ও জীবচেতনার যোগযুক্তি সম্ভব একমাত্র চিন্ময় দিব্যধামে—এই মর্ত্যলোকে নয়, অথবা আত্মার প্রপঞ্চোপশম স্তব্ধতায়—তার মায়িক প্রবৃত্তিতে নয়। অনন্ত তাঁর আত্মস্বরূপে ফিরে যেতে পারেন, যদি সান্তের মধ্যে নিজেকে খোঁজার দুরাগ্রহকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ভ্রান্তি ও প্রমাদ জ্ঞানে। মানি, মনশ্চেতনার উন্মেষ হয়েছে জড়ের মধ্যে। কিন্তু তাতেই কি দিব্যসিদ্ধির কোনও সূচনা মিলবে ? কেননা, সত্য বলতে খণ্ডভাব তো ঠিক জড়ের ধর্ম নয়, বস্তুত সে মনেরই ধর্ম। জড় তো মনের একটা মায়া মাত্র, মন তার মধ্যে নিজেরই খণ্ডভাব এবং অবিদ্যার আরোপ করেছে। অতএব এই মনোমায়ার জগতে সকল এষণায় মন শুধু নিজেকেই ফিরে-ফিরে পাবে। আপন-গড়া খণ্ডভাবনার গ্রন্থীর মধ্যে চলবে তার আনাগোনা। তাদের ছাড়িয়ে চিৎসত্তার অখণ্ডতা অথবা চিন্ময়-ধামের দিব্য সত্যকে কোথায় সে খুঁজে পাবে এই মায়াপুরীতে ?

জড়ের খণ্ডভাব যে জড়সত্তায় অবতীর্ণ সখণ্ড মনের বিসৃষ্টি, সেকথা মিথ্যা নয়। কারণ সত্য বলতে জড়ের স্বরূপসত্তাই নাই। তাকে অনাদি একটা বিশ্ববিভূতি বলা চলে না। এক সর্ববিভাজক মনের কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে সর্ববিভাজক প্রাণশক্তিই এই জড়রূপকে ব্যাকৃত করেছে। শুদ্ধ-সন্মাত্রকে জড়ত্বের অবিদ্যা অসাড়তা আর খণ্ডভাবের বিকল্পনায় নামিয়ে এনে বিভাজক মন নিজেকে হারিয়ে বন্দী হয়েছে নিজের গড়া কারাগারে, নিজেরই রচা শিকল পরেছে নিজের পায়ে। তাই, বিভাজক মন সৃষ্টির আদিবীজ হলে, ভবচক্রের মধ্যে ঘুরে-ফিরে তাকেই আমরা চরমতত্ত্বরূপে পাব। সুতরাং মনোময় জীব প্রাণ আর জড়ের সঙ্গে যতই যুঝুক, তাদের হাতের মুঠায় এনেও আবার তাকে তাদেরই কবলিত হতে হবে। এমনি করে জয়-পরাজয়ের আবর্তনে বিশ্বচক্র অনন্তকাল ধরে আবর্তিত হবে। এই ব্যর্থতাই জীবের চরম ও পরম নিয়তি !...কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয়, যদি জানি—অনন্ত অমৃত চিৎস্বরূপই জড়ধাতুর ঘনকঞ্চুকে নিজেকে আবৃত করেছেন। অতিমানস সিসৃক্ষার লোকোত্তর বীর্যই ফুটছে তাঁর এই জড়ের লীলায়। মনের মধ্যে খণ্ডভাব জাগিয়ে জড়কে তিনি অক্ষুণ্ণ অধিকার দিয়েছেন বিশ্বের অবম তত্ত্বরূপে—শুধু বহুর মধ্যে এককে ফুটিয়ে তোলবার আয়োজনে। তাঁর সহস্রদল লীলার একটি দল এই চিন্ময় পরিণামের খেলা। তাই বিশ্বরূপের কঞ্চুকে নিজেকে যে ঢেকেছে, মনোময় পুরুষ না হয়ে সে যদি হয় শাশ্বত দিব্য-পুরুষের কবিক্রতু; প্রথমে প্রাণরূপে, তার পরে মনরূপে সে-ই যদি জড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে থাকে, আরও বিপুল সম্ভাবনা যদি এখনও গোপন থেকে থাকে তার মধ্যে —তাহলে আপাত-অচেতনা হতে চেতনার আবির্ভাবেই এই পরিণামের লীলা

শেষ হয়ে যাবে না, তার নিগূঢ় প্রেতি মহত্তর সার্থকতার পথ খুঁজবেই।...এই জড়ের মধ্যেই এক অতিমানস চিন্ময়পুরুষ আবির্ভূত হয়ে বিভাজক মনের বৃত্তিকে ছাপিয়ে দেহ-প্রাণ-মনের প্রবৃত্তিতে সঞ্চারিত করবেন উন্মনী-ভাবনার বীর্য—এ কি অসম্ভব কিছু? বরং বিশ্বপ্রকৃতির স্বধর্মের এই কি অপরিহার্য পরিণাম নয়?

পূর্বেই বলেছি, এই অতিমানস পুরুষই মানসিক খণ্ডভাবের গ্রন্থিমোচন করবেন। তাঁর কাছে মনের ব্যষ্টিভাব হবে সর্বাবগাহী অতিমানসের একটা সপ্রয়োজন অথচ গৌণ বৃত্তি মাত্র। তেমনি ব্যষ্টিপ্রাণের গ্রন্থিভেদ করেও তার ব্যষ্টিত্বকে তিনি মুক্তি দেবেন চিৎশক্তির সার্থক লীলায়নে—অখণ্ডের আনন্দোচ্ছল বহুভাবনার সমুল্লাসে। এমনি করে প্রাণ ও মনের গ্রন্থিভেদ যদি সম্ভব হয়, তাহলে তাঁর বীর্যে দৈহ্যসত্তার গ্রন্থিভেদও কি সম্ভব হবে না? এই দেহকেও কি তিনি মুক্ত করবেন না মৃত্যু খণ্ডভাব ও অন্যোন্যগ্রসনের শাসন হতে? এই ব্যষ্টিদেহই কি তখন এক অখণ্ড চিন্ময় দিব্যসত্তার সার্থক বিভূতি হবে না—সান্ত আধারে অনন্তের অফুরন্ত রসোল্লাসের দিব্য সাধন হবে না?...অথবা এমনও কি হতে পারে না, চিৎসত্তার নিরঙ্কুশ স্বারাজ্যসিদ্ধি রূপধাতুকে পাবে পূর্ণ-স্ববশ ভোগায়তনরূপে, অতএব জড়ের কঞ্চুকপরিবর্তনেও তার অমৃত চেতনা অম্লান রইবে—তার জগৎ হবে রতি শ্রী ও সাযুজ্যবোধের অন্তহীন ব্যঞ্জনায় উল্লসিত আত্মারামের এক দিব্যরূপান্তরের মহা-আধার হয়ে। অতএব এই মাটির বুকে থেকেই দিব্যমন ও দিব্যপ্রাণের মত এক দিব্যদেহও যে সে গড়ে তুলবে, এ কি অসম্ভব? 'দিব্য দেহ!'—শুনে হয়তো আমরা আঁৎকে উঠব বর্তমানের দিকে তাকিয়ে, মানুষের ভবিষ্য-সম্ভাবনার দীনতা কল্পনা করে। তাহলেও আত্মস্বরূপকে পূর্ণমহিমায় ফুটিয়ে তুলে, তার আনন্দ জ্যোতি ও বীর্যের অকুণ্ঠিত স্ফুরণে মানুষ কি দেহ-মন-প্রাণকেই দিব্যভাবের সাধনে রূপান্তরিত করবে না—যাতে রূপের মধ্যে অরূপের আবেশ সার্থক হবে একই আধারে নর-নারায়ণের যুগললীলায়?

পার্থিব-পরিণামের এই চরম সিদ্ধির একমাত্র প্রতিবাদ রয়েছে জড় ও জড়ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বর্তমান কল্পনাতে। ইন্দ্রিয় ও রূপধাতুর মাঝে, প্রমাতা-ব্রহ্ম আর প্রমেয়-ব্রহ্মের মাঝে আমাদের অধুনা-কল্পিত সম্বন্ধই যদি একমাত্র সত্য হয়, অথবা অন্য-কোনও সম্বন্ধ সম্ভব হলেও আজও এই জগতে তার প্রকাশ যদি অসম্ভব হয়, সিদ্ধির এষণায় লোকোত্তর ভূমিতে উত্তরণ ছাড়া আর-কোনও উপায় না থাকে যদি—তাহলে প্রচলিত সকল ধর্মের সঙ্গে সায় দিয়ে বলতেই হয়, একমাত্র লোকান্তরিত দিব্যধামে আছে আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার সম্যক্ চরিতার্থতা। কিন্তু এসব ধর্মই যে আবার বলে পৃথিবীতেই বৈকুণ্ঠ অথবা সিদ্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা। সে-কল্পনাকে তাহলে বলতে

হয় একটা আত্মবঞ্চনা শুধু !···আবার এও শুনি, 'এ-জগতে চলতে পারে কেবল অন্তরের প্রস্তুতি অথবা তাকে বিজয়ী করবার সাধনা এবং সিদ্ধি, অন্তরের নিরালায় বসে প্রাণ মন চেতনার বাঁধন খসিয়ে অনির্জিত ও অজেয় জড়ের মায়া হতে বিমুখ হতে হবে আমাদের, এই কার্পণ্যোপহত দুঃশীলা পৃথিবীর নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে আর কোথাও খুঁজতে হবে সত্তনুর উপাদান।'... কিন্তু এই অল্পের দর্শনকে কেনই-বা আমরা ভূমার সত্য বলে মানব ? জড়কে আজ যা বলে জানি, তা-ই কি তার পূর্ণ পরিচয় ?...নিশ্চয় নয়। জড়েরও সূক্ষ্মতর বিভূতি আছে। রূপধাতুর দিব্য পরিণামের আছে একটা ঊর্ধ্বগ পরম্পরা। অতএব এক লোকাতীত ধর্মের আবেশে অন্নময় আধারেরও রূপান্তর সম্ভব। পরতর ধর্ম হলেও সেই তার স্বধর্ম, কেননা তার অন্তরের গহনে এখনও নিগূঢ় হয়ে আছে ওই পরমধর্মেরই অব্যক্ত বীর্য।

ষড়বিংশ অধ্যায়

রূপধাতুর উৎক্রমণ

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। ...অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ।...অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।... অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।২-৫

এক অন্নরসময় আত্মা আছেন—তারও অন্তরে রয়েছেন আরেক প্রাণময় আত্মা, যিনি পূর্ণ করে আছেন তাকে—তারও অন্তরে আরেক মনোময় আত্মা—তারও অন্তরে আরেক বিজ্ঞানময় আত্মা—তারও অন্তরে আরেক আনন্দময় আত্মা।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।২-৫

ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥
যৎ সানোঃ সানুমারোহদ্ ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বম্।
তদিন্দ্র অর্থং চেততি... ॥

ঋগ্বেদ ১।১০।১-২

শতক্রতুকে বেয়ে ওঠে তারা বংশদণ্ডের মত। যখন সানু হতে সানুতে করে আরোহণ, তখন ফুটে ওঠে চোখের সামনে কত-যে রয়েছে করণীয়। ইন্দ্র আনেন সেই 'তৎ'এর চেতনা লক্ষ্যরূপে।

—ঋগ্বেদ (১।১০।১-২)

চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।
অপামূর্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি ॥
মর্যো ন শুভ্রস্তন্বং মৃজানো ঽত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্।
বৃষেব যূথা পরি কোশমর্ষন্ কনিক্রদচ্চম্বোরা বিবেশ ॥

ঋগ্বেদ ৯।৯৬।১৯,২০

আধারে নিষণ্ণ হন তিনি শ্যেনের মত, শকুনের মত—তুলে ধরেন তাকে; কিরণরাজি খুঁজে পান তাঁর ধারাসারে, কেননা চলেন যে তিনি আয়ুধ নিয়ে; অপ্‌এর সমুদ্র-ঊর্মিকে আঁকড়ে ধরেন তিনি—মহেশ্বর হয়ে প্রকাশ করেন তুরীয় ধাম। মর্ত্য যেমন তনুকে করে মার্জিত, যুদ্ধে তুরঙ্গ যেমন ছুটে চলে জিনে নিতে বিপুল ধন, তেমনি ঢালেন তিনি আপনাকে ঘোর গর্জনে সকল কোশের ভিতর দিয়ে—আবিষ্ট হন ওই আধার দুটিতে।

—ঋগ্বেদ (৯।৯৬।১৯,২০)

বিচার করে দেখলে জড়ের জড়ত্ব আমাদের কাছে সূচিত হয় তার নীরন্ধ্র ঘনত্ব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, উপচীয়মান প্রতিরোধশক্তি ও স্থির-কঠিন স্পর্শদ্বারা। রূপধাতু যতই একটা নিরেট প্রতিরোধের ভাব সৃষ্টি করে এবং তার ফলে চেতনার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে দেয় একটা অর্থক্রিয়াকারী স্থায়িত্ব, ততই আমরা তাকে বাস্তব এবং জড় বলে মনে করি। তেমনি রূপধাতু যদি সূক্ষ্মতর হয়, তার প্রতিরোধের শক্তি যদি হয় ক্ষীণ, ইন্দ্রিয়বোধের মুষ্টি যদি

শিথিল হয় তার 'পরে, তাহলে তার জড়ত্বও আমাদের চেতনায় ফিকা হয়ে আসে। প্রাকৃতচেতনার কাছে জড়ধর্মের এই-যে নিরিখ, তাহতেই ধরা পড়ে জড়সৃষ্টির মুখ্য প্রয়োজন কি। আঁকড়ে ধরবার মত স্থায়ী একটা মূর্তভাবের পসরা চেতনার কাছে মেলে ধরবার জন্য রূপধাতু জড়ের কোঠায় নেমে আসে—যাতে মন তার মধ্যে মানসপ্রবৃত্তির নির্ভরযোগ্য একটা অধিষ্ঠান পায়, এবং প্রাণ তার রূপায়ণের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব-সম্পর্কেও আশ্বস্ত হতে পারে। এইজন্যই প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীকে মেনেছিলেন জড়ের প্রতীক-রূপে—কেননা দ্রব্যের কাঠিন্য পৃথিবীতেই সবচাইতে স্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আসল ভিত্তি স্পর্শ কিংবা সন্নিকর্ষের উপর। রসন ঘ্রাণ শ্রবণ ও দর্শনরূপী অন্যান্য স্থূল ইন্দ্রিয়বোধেরও প্রতিষ্ঠা বিষয়-বিষয়ীর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর পরোক্ষ সন্নিকর্ষের 'পরেই। ব্যোম হ'তে ক্ষিতি পর্যন্ত রূপ-ধাতুর সাংখ্যসম্মত পাঞ্চভৌতিক পরিণামেও দেখি, অতিসূক্ষ্ম হতে ক্রম-স্থূলের দিকে তার অভিযান। তাই পঞ্চভূতের চূড়ায় আছে আকাশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পন, আর তার গোড়ায় নিরেট পার্থিবীর অতিস্থূল ঘনিমা। অতএব শুদ্ধধাতুর অবসর্পিণী ধারার শেষ পর্বে দেখা দেবে জড়—অচিৎ বিশ্ববিভূতির উপাদানরূপে। তার মধ্যে অরূপ-চিৎএর চাইতে অচিৎ-রূপের লীলাই হ'বে মুখ্য এবং সে-রূপের মধ্যেও ঘটবে ঘনীভাব ও প্রতিরোধ-শক্তির চরম বিকাশ, দেখা দেবে মূর্তভাবের স্থৈর্য ও অন্যোন্যব্যাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ ভেদ বিবিক্ততা ও খন্ডভাবের সে-ই হবে আদিবিন্দু। এই হল জড়বিশ্বের প্রকৃতি ও তাৎপর্য। তাকে বলতে পারি পরিনিষ্ঠিত খন্ডভাবের আদর্শ।

জড় হতে চিৎ পর্যন্ত রূপধাতুর আরোহক্রমে উৎসর্পণ যদি বিশ্বপ্রকৃতির একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তাহলে তার প্রতি পর্বে জড়ধর্মের হ্রাস হয়ে দেখা দেবে বিপরীত ধর্মের ক্রমিক উপচয়—যার চরম পর্যবসান হবে বিশুদ্ধ-চিন্ময় আত্মপ্রসারণে। অর্থাৎ পর্বে-পর্বে রূপের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হবে, রূপের বীর্য ও উপাদান ক্রমেই সূক্ষ্ম হয়ে তাদের অনম্য আড়ষ্টতা হারাবে, বিভিন্ন বিগ্রহের মধ্যে ক্রমেই সহজ হবে সামরস্য ও অন্যোন্যসংগম, স্বচ্ছন্দ হবে সমানয়ন ও আত্মবিনিময়ের সামর্থ্য, দেখা দেবে বৈচিত্র্য রূপান্তর ও একাত্মভাবনার বীর্য। রূপের মধ্যে স্থৈর্যের যে-আভাস ছিল, ক্রমেই তার স্থান অধিকার করবে স্বভাবের নিত্যতা। বিবিক্তভাব ও অন্যব্যাবৃত্তির যে মূঢ় অভিনিবেশ ছিল জড়ভূতের মধ্যে, অখন্ড অনন্ত তাদাত্ম্যানুভূতির চিন্ময় রসে তা হবে বিগলিত। স্থূল রূপধাতু আর বিশুদ্ধ চিন্ময়ধাতুর মাঝে মৌলিক বৈধর্ম্যের এই হবে সূত্র। একই চিৎশক্তির অন্যান্য পিন্ডভাবকে ক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে কি ছাপিয়ে উঠতে জড়ের মধ্যে চিৎশক্তি সংপিন্ডিত হয়।

কিন্তু চিন্ময় ধাতুতে শুদ্ধচৈতন্য অখণ্ডের সিদ্ধ অনুভবকে অব্যাহত রেখে, আত্মবোধের ভূমিকাতে ফুটিয়ে তোলে তার আত্মরূপায়ণের স্বাতন্ত্র্যলীলা, অথচ নিত্যসামরস্যজারিত আত্মবিনিময়ের ভাবনা হয় তার আত্মশক্তির বিচিত্রতম বিচ্ছুরণের প্রতিষ্ঠামন্ত্র। এই দুটি অন্ত্যকোটির মধ্যে রয়েছে এক অন্তহীন বর্ণচ্ছত্রের অপরূপ মায়া।

এসব আলোচনার গুরুত্ব তখনই ধরা পড়ে—যখন সিদ্ধমানবের দিব্য-জীবন ও দিব্য-মনের সঙ্গে আপাত-অদিব্য প্রাকৃতদেহ বা জড়সত্তার কি সম্বন্ধ থাকা সম্ভব তা বিচার করি। ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ হতে জড়বিশ্বের গোড়াপত্তন—আমাদের প্রাকৃতজীবনের মূলে রয়েছে এই তত্ত্ব। কিন্তু এ-সম্বন্ধও যেমন ঐকান্তিক নয়, তেমনি এ-তত্ত্বও অনতিবর্তনীয় নয়। রূপধাতুর সঙ্গে প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ অন্য আকারেও প্রকাশ পেতে পারে। তাতে জড়ের মধ্যে হয়তো দেখা দেবে অন্য নিয়মের খেলা—প্রাণ ও মনের আরও উদার বৃত্তির লীলা। এমন-কি এই দেহধাতুর পরিবর্তনে ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের প্রবৃত্তি আরও স্বচ্ছন্দ হবে। আমাদের জড়াশ্রয়ী জীবনে মৃত্যু ও খণ্ডতার পীড়া আছে, একই চিন্ময় প্রাণশক্তির বিভিন্ন বিগ্রহে আছে অন্যোন্য-প্রতিরোধ ও ব্যাবৃত্তির দ্বন্দ্ব। ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য এখানে সীমিত, জীবনের সাধনাও আয়ু পরিবেশ ও সামর্থ্যের সঙ্কোচে পীড়িত, মনের প্রবৃত্তি পঙ্গু তমসাচ্ছন্ন ব্যাহত ও পর্যুদস্ত। শুধু তা-ই নয়, পশুদেহোচিত এই সীমার সঙ্কোচ মানুষের উত্তরায়ণের পথেও তার করাল ছায়া ফেলেছে।...কিন্তু এই তো বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র ছন্দ নয়। এরও পরে আছে কত লোকাতীত ভূমি, কত ঊর্ধ্বলোকের পরম্পরা। প্রগতির স্বাভাবিক নিয়মে বর্তমান ন্যূনতার লাঞ্ছন হতে নির্মুক্ত হয়ে ধাতুপ্রসাদের দীপ্তি যদি মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে, তাহলে সেসব লোকের ঋতম্ভরা প্রবর্তনা এই স্থূল আধারেই সংক্রামিত হবে। তখন এইখানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে প্রকট হবে দিব্য মন ও ইন্দ্রিয়ের বীর্য, এই মানুষের দেহে চলবে দিব্যপ্রাণের প্রাকৃত লীলায়ন—এমন-কি এই পৃথিবীতেই একদিন প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক ছন্দে আবির্ভূত হবে দেবমানবের সত্ত্বতনু।...হয়তো একদিন মানুষের এই মর্ত্যদেহেরও ঘটবে দিব্যরূপান্তর; হয়তো সেদিন মাতা পৃথিবীই দেখা দেবেন হিরণ্যবক্ষা অদিতি হয়ে।

জড়ীয় বিশ্ববিধানেও দেখি, জড়বিভূতির একটা আরোহক্রম আছে, যা আমাদের নিয়ে যায় স্থূল হতে সূক্ষ্মে—সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতরে। কিন্তু কোথায় সে ক্রমসূক্ষ্ম আরোহ-সোপানাবলির চরম ধাপ—জড়ধাতু বা শক্তি-রূপায়ণের অতি-ব্যোম সূক্ষ্মতা ? তারও ওপারে কি আছে ?—মহাশূন্য ? পরম নাস্তিত্ব ?...কিন্তু পরমশূন্য বা সত্যকার নাস্তিত্ব বলে তো কোথাও কিছু নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় মন বা বুদ্ধিরও সূক্ষ্মতম ব্যাপার নিবৃত্ত হয়ে

ফিরে আসছে যেখান থেকে, তাকেই না বলি পরম শূন্য? এও সত্য নয় যে ব্যোমভূতই বিশ্বের শাশ্বত আদিপর্ব, তার ওপারে কিছুই নাই। আমরা জানি, জড়ধাতু আর জড়শক্তি শুদ্ধধাতু ও শুদ্ধশক্তিরই চরম পরিণাম—যার মধ্যে আত্মসংবিৎ ও আত্মৈশ্বর্যে চেতনা ভাস্বর হয়ে আছে, অচেতন সুষুপ্ত ও নিঃসাড় স্পন্দনে তার আত্মবিলুপ্তি ঘটেনি জড়ত্বের কবলিত হয়ে।...তখনই প্রশ্ন হয়, তাহলে জড়ধাতু আর শুদ্ধধাতুর মাঝখানটিতে কি আছে? কেননা সত্তার এক কোটি হতে আমরা তো তার অন্য কোটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি না, অচিতি হতে একেবারেই তো চলে যাই না চিতিস্বরূপে। সুতরাং অচিৎ-ধাতু আর অবিলুপ্ত-স্বচিৎ আত্মপ্রসৃতির মাঝে আরোহসোপানের একটা পরম্পরা থাকা উচিত এবং তা আছেও—যেমন আছে জড় আর চিতের মাঝে।

এই অন্তরিক্ষের মহাগহনে যাঁরা অবগাহন করেছেন, তাঁরা সবাই সমস্বরে বলেন, জড়বিশ্বের ওপারে তার সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে রূপধাতুর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর পরিণামের একটা পরম্পরা। ব্যাপারটা পড়ে রহস্যবিদ্যার এলাকায়, তাই বর্তমান প্রসঙ্গে তার আলোচনা জটিল এবং দুর্বোধ হবে। অতএব এ-বিষয়ে এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা না করে আমাদের অঙ্গীকৃত দর্শনের ধারা ধরে এইটুকুই বলতে পারি যে, রূপধাতুর উদয়নের সোপানমালায় যে-বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই : জড় প্রাণ মন অতিমানস ও তারও পরে সৎ-চিৎ-আনন্দের মহাত্রিপুটীর যে-আরোহক্রমের কথা আমরা জানি, রূপধাতুও চলেছে ঠিক তারই অনুসরণে। অর্থাৎ উদয়নের প্রত্যেক পর্বে ওই তত্ত্বগুলিকে আশ্রয় এবং আধার করে তাদেরই উৎসর্পিণী ধারায় আপনাকে সে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের বিশ্বব্যাপ্ত আত্মরূপায়ণের বিশিষ্ট বাহনরূপে।

জড়ের জগতে জড়ধাতু সবার প্রতিষ্ঠা। এখানকার ইন্দ্রিয়বোধ প্রাণন বা মনন সব নির্ভর করছে প্রাচীনদের ক্ষিতিতত্ত্ব বা পৃথিবীশক্তির 'পরে। সবাই ক্ষিতিতত্ত্ব হতে জাত হয়ে তারই শাসন মেনে চলছে। সর্বতোভাবে তার অনুকূলে চ'লে তারই অভিব্যক্তির সীমাম্বারা তাদের প্রগতি সীমিত হয়েছে। এমন-কি অপার্থিব কোনও সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গেলেও মাটির হিসাবকে এড়িয়ে যাবার উপায় নাই। দিব্যপরিণামের ধারাতেও মর্ত্যের প্রয়োজন ও দাবিকে জেনে এবং মেনেই সবাইকে প্রগতির পথে পা বাড়াতে হয়। তাই দেখি, পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়শক্তি স্থূল ইন্দ্রিয়গোলক নিয়ে কাজ করছে। প্রাণের বাহন হ'ল জড় নাড়ীতন্ত্র ও জীবিতেন্দ্রিয়। মন চলছে স্থূল দেহকে আশ্রয় করে। এমন-কি বিশুদ্ধ মননক্রিয়াও জড়াশ্রিত তথ্যকেই তার ক্ষেত্র ও উপাদানরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু মন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বভাবে এই সঙ্কোচ অপরিহার্য হয়ে নাই। কারণ, স্থূল ইন্দ্রিয়গোলক তো ইন্দ্রিয়বোধ সৃষ্টি করে

না। তারাই বরং বিশ্বগত ইন্দ্রিয়শক্তির বিসৃষ্টি ও সাধন—এ-জগতে ফুটেছে বিশিষ্ট বোধের একটা সপ্রয়োজন কৌশলরূপে। তেমনি নাড়ীতন্ত্র এবং জীবিতেন্দ্রিয় প্রাণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কিন্তু বিশ্বগত প্রাণশক্তিই এ-জগতে তাদের অভিব্যক্ত করে—প্রাণনের অপরিহার্য সুকৌশল সাধনরূপে। মস্তিষ্কও মননের স্রষ্টা নয়। বরং বিশ্বমনের সে বিসৃষ্টি এবং সাধন, তার কার্যসিদ্ধির কৌশলরূপে এখানে তার আবির্ভাব।...এই বিধান অপরিহার্য হলেও ঐকান্তিক নয়, কেননা তার মূলে বিশিষ্ট লক্ষ্যের দিকে একটা প্রবর্তনা রয়েছে। জড়বিশ্বে নিহিত আছে এক বিরাট দিব্যক্রতু। বিষয় ও ইন্দ্রিয়বোধের মাঝে সে স্থূলসম্পর্ক ঘটাতে চায়। অতএব চিৎশক্তির ঋতময় জড়বিভূতিকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করে তাই-ই দিয়ে সে চিৎসত্তার স্থূল বিগ্রহ রচে। তার এই মূর্তিভাবনা আমাদের প্রাকৃতজগতের গোড়ার কথা এবং তার ঈশনা দেখা দেয় সংকুচিত জড়প্রকৃতির অপরিহার্য বিধানরূপে—ওই দিব্যক্রতুর বিশেষ প্রয়োজনে। অতএব জড়জগতের নিয়তিকৃত নিয়মকে সন্মাত্রের অনাদি শাশ্বতধর্ম বলতে পারি না। চিৎ জড়ের জগতে ফুটতে চাইছে বলেই সৃষ্টির এই বিশিষ্ট বিধান দেখা দিয়েছে।

রূপধাতুর দ্বিতীয় পর্বের প্রবর্তক ও নিয়ন্তা হল প্রাণ ও আকূতি-চেতনা। মূর্তিভাবনার লীলা এখানে গৌণ। তাই জড়ভূমির ঊর্ধ্বে যে-জগৎ, তার প্রতিষ্ঠা হল এক সচেতন বিরাট প্রাণনের বীর্যে। প্রাণের এষণা ও বাসনার সংবেগ সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণে। অচেতন বা অবচেতন সংকল্পের অন্ধ আকূতি শক্তির জড়বিভূতিতে লীলায়িত হয় শুধু এই ভূলোকে—সেখানে নয়। সেখানে যত শক্তি রূপ ও বিগ্রহ, যত প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মননের লীলা, পরিণতি সিদ্ধি ও আত্মসম্পূর্তির যত বিভূতি, সবার মূলে আছে চিন্ময়-প্রাণের প্রশাসন। এমন-কি জড় বা মনকেও সেখানে প্রাণের ছন্দ মেনে চলতে হয়, কেননা প্রাণই সেখানে তাদের উৎস এবং প্রতিষ্ঠা—প্রাণের ধর্ম ও বীর্য, সঙ্কোচ ও সামর্থ্যই নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সঙ্কোচ অথবা প্রসার। এমন-কি প্রাণোত্তর কোনও সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে সেখানে মনও প্রাণময় আকূতির হিসাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। দিব্য-পরিণামের ধারায় প্রাণের প্রয়োজন ও দাবিকে জেনে এবং মেনেই তাকে প্রগতির পথ খুঁজতে হয়।

এমনি করে দিব্যধামের অভিমুখে চলেছে ঊর্ধ্বলোকের পরম্পরা। তৃতীয় পর্বের প্রবর্তনা ও নিয়ন্ত্রণ আসে মন হতে। রূপধাতু সেখানে অতিসূক্ষ্ম ও সুনম্য, তাই তার মধ্যে মনের কল্পন সদ্য রূপায়িত হয়ে ওঠে। তার আত্মপ্রকাশ ও আত্মসম্পূর্তির প্রেতি অব্যাহত প্রবৃত্তিতে সার্থক হয় রূপধাতুর আত্মনিবেদনে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়বোধের অন্যোন্যসম্বন্ধও তেমনি

সূক্ষ্ম ও সুনম্য সেখানে, কেননা সূক্ষ্ম মানসধাতু নিয়ে মনের কারবার বলে স্থূল বিষয়ের সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। মানসজগতে প্রাণ সম্পূর্ণ মনের অনুগত। ভূলোকে মানসপ্রবৃত্তি পঙ্গু, প্রাণবৃত্তি স্থূল সঙ্কীর্ণ অথচ উদ্ধত। তাই ওখানকার মনের নিরঙ্কুশ স্বারাজ্য বলতে গেলে এখানকার প্রাণ-মনের কল্পনারও অগোচর। মনই সে-লোকের লোকধাতু, অতএব অকুণ্ঠ তার শাসন, সর্বজয়া তার আকূতি—দ্যুলোকের প্রকাশলীলায় তার দাবিই সকল দাবির অগ্রগণ্য।...তারও ওপারে রয়েছে অতিমানসের আশ্রিত চিন্ময় তত্ত্বসমূহ—তারপরে অতিমানস—তারও পরে বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ চিৎশক্তি অথবা শুদ্ধ-সন্মাত্র। এই হল লোকধাতুর পরম্পরা। এমনি করে আমরা পাই বিশ্বের অপ্রাকৃত লোকসংস্থানের সন্ধান—প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যাদের বলতেন জ্যোতির্ময় 'ধামানি দিব্যানি', অমৃতের প্রতিষ্ঠা তাদের মধ্যে। পরবর্তী যুগের পৌরাণিক ধর্মে এদের সংজ্ঞা হল গোলোক বা ব্রহ্মলোক। এই তো 'বিষ্ণুর পরম পদ'—শুদ্ধসন্মাত্রের স্বরূপ-বিভূতির চিন্ময় পরমপ্রকাশ—মুক্তজীব যার মধ্যে সিদ্ধদশার চরম কোটিতে আস্বাদন করে শাশ্বতী ব্রাহ্মী স্থিতির আনন্ত্য এবং রসোল্লাস।

এই-যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন ও অনুভবের ঊর্ধ্বগধারা চলেছে জড়-রূপায়ণের সীমা ছাড়িয়ে, তার তত্ত্ব কিন্তু রয়েছে বিশ্ব জুড়ে এক বিচিত্র-জটিল সুরসঙ্গতির লীলায়নে। চেতনার যে সঙ্কীর্ণ আয়তনে আমাদের প্রাকৃত প্রাণ-মন তৃপ্তিতে শয়ান আছে, তার অপরিসর স্বরগ্রামের মধ্যেই সে সুর-মূর্ছনার অবসান ঘটেনি। সত্তা, চেতনা, শক্তি, রূপধাতু নামছে উঠছে এক মহাতন্ত্রীর ঘাটে-ঘাটে যেন : তার প্রত্যেক পর্দায় সত্তা ছড়িয়ে পড়ছে বিপুলতর আত্মব্যাপ্তিতে, ভূমানন্দে উল্লসিত চেতনা অনুভব করছে তার উদারতার মহিমা, শক্তির অন্তরে উপচে উঠছে আনন্দময় সামর্থ্যের তীব্রতর সংবেগ, রূপধাতু তার সত্ত্বকে করছে আরও সূক্ষ্ম লঘু সুনম্য ও সাবলীল। যে যত সূক্ষ্ম, তত বেশী তার বীর্য—অতএব সত্য বলতে সে তত বেশী বাস্তব। কেননা, স্থূলতার আড়ষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত বলে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা তার অধিক এবং সেইজন্য তার রূপায়ণেও অধিকতর ব্যাপ্তি সামর্থ্য ও সাবলীলতা দেখা দেয়। উত্তরায়ণের পথে এক-একটি গিরিসানুতে আরোহণ করে আমাদের অনুভব প্রসারিত হয় চেতনার বিস্তৃততর ভূমিতে, জীবনের বিপুলতর ঐশ্বর্যে।

কিন্তু পর্বে-পর্বে এই উত্তরায়ণের সঙ্গে আমাদের পার্থিব প্রগতির কি সম্পর্ক ? অবশ্য চেতনার প্রত্যেকটি ভূমি, প্রত্যেকটি লোক, রূপধাতুর প্রত্যেকটি স্তর, বিশ্বশক্তির প্রত্যেকটি ঝলক যদি পূর্বাপর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হত, তাহলে আমাদের প্রাকৃতভূমির 'পরে ঊর্ধ্বলোকের কোনও প্রভাবই পড়ত

না!...কিন্তু ঠিক উল্টা কথাটাই সত্য। চিৎস্বরূপের অভিব্যক্তি যেন একটা বিচিত্র বুনানি—তার অখণ্ড রূপটি ফুটিয়ে তুলতে প্রত্যেকটি তত্ত্বের ভাব ও ছন্দ সবার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে। আমাদের জড়জগৎও তাই বিশ্বের সকল তত্ত্বের চিত্র-পরিণাম, কেননা জড়বিশ্বের রূপায়ণে সকল তত্ত্বই জড়ের মধ্যে নেমে এসেছে—জড়ের প্রত্যেকটি কণাতে নিষিক্ত আছে তাদের বীর্য। তাই জড়ের প্রতি মুহূর্তের প্রত্যেক স্পন্দনে আছে তাদের নিগূঢ় শক্তির প্রেতি। জড় যেমন অবরোহের শেষ ধাপে, তেমনি সে আরোহের প্রথম ধাপেও। সমস্ত ভূমি, লোক, স্তর এবং ঝলকের বীর্য যেমন সংবৃত্ত হয়ে আছে জড়ের মধ্যে, তেমনি জড় হতে বিবৃত্ত হবার সামর্থ্যও রয়েছে তাদের। এইজন্যই তো শুধু জড়শক্তির লীলায়, জড়-উপাদানের সংযোগ-বিয়োগে, গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার বিসৃষ্টিতে জড়ের বিভূতি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তারও পরে তার মধ্যে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন, ফুটেছে মনের আলো। অতএব এরও পরে তার মধ্যে জাগবে অতিমানসের দীপ্তি—চিন্ময় সত্তার উত্তরজ্যোতি। তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বীর্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে জড়াতীত ভূমি হতে জড়ের 'পরে অবিরত চাপ পড়ছে—এই হল বিশ্বপরিণামের রীতি। এ নইলে জড়ত্বের আড়ষ্ট বন্ধনে চিরকাল তারা ঘুমিয়ে থাকত—যদিও সে একটা অসম্ভাব্য ব্যাপার, কেননা জড়ের মধ্যে পরতত্ত্বের স্থিতিই সূচিত করছে তার প্রমুক্তি। কিন্তু প্রমুক্তি অপরিহার্য হলেও তার জন্য উপর হতে একটা সজাতীয় অনুকূল শক্তির চাপ প্রয়োজন হয়।

অনিচ্ছুক জড়শক্তির কার্পণ্যবশত জড়ের মধ্যে প্রাণ মন অতিমানস ও সচ্চিদানন্দের একটা ক্ষীণশিখার প্রথম উন্মেষেই যে চিন্ময়-পরিণামের অবসান হবে, এও কিন্তু সত্য নয়। জড়ের মধ্যে ঊর্ধ্বশক্তি যতই ফুটবে, আত্ম-সামর্থ্যের চেতনায় তাদের আকূতি ও প্রবৃত্তি যতই তীব্র হবে, ততই ঊর্ধ্বলোক হতে তাদের 'পরে চাপও প্রবল অব্যাহত এবং অব্যর্থ হবে—কেননা এই চাপ বিশ্বভুবনের ওতপ্রোত সত্তার সঙ্গে মণির মালায় সুতার মত জড়িয়ে আছে। শুধু জড় হতেই যে এইসব পরতত্ত্ব সোপাধিক প্রকাশের শীর্ণতায় কুণ্ঠিত হয়ে উদ্ভিন্ন হবে, তা নয়। তারা উপর হতেও নেমে আসবে স্বরূপশক্তির দীপ্তচ্ছটা নিয়ে জ্যোতিরুৎসবের বিপুল সমারোহে। তখন জড় আধারে সেই শক্তির নিরঙ্কুশ লীলার জন্য মর্ত্য জীবও নিজেকে উন্মীলিত ও প্রসারিত করবে। চাই শক্তির উপযুক্ত আধার বাহন ও সাধন। পার্থিব-প্রকৃতিতে তারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মানুষের দেহে প্রাণে ও চেতনায়।

আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় আর স্থূল মন স্থূল দেহের সংকীর্ণ সামর্থ্যকে চরম বলে জানে। এরই মধ্যে যদি মানুষের দেহ-প্রাণ-চেতনার সকল সার্থকতা নিঃশেষিত হত, তাহলে প্রকৃতিপরিণামের আয়ুষ্কালও খর্ব হত—মানুষের

বর্তমান সিদ্ধিকে ছাপিয়ে কোনও মহত্তর সিদ্ধিতে পৌঁছনোর কল্পনা মিথ্যা হত। কিন্তু প্রাচীন রহস্যবেত্তারা জানতেন, আমাদের অন্নময় আধারেরও সবখানি জড়দেহ নয়—শুধু এই স্থূল পিণ্ডভাবই আমাদের রূপধাতুর একমাত্র পরিণাম নয়। প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা পাঁচটি পুরুষের কথা বলছে -অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও চিন্ময় বা আনন্দময়। প্রত্যেক পুরুষের উপযোগী রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট পরিণাম আছে—রূপকের ভাষায় প্রাচীনেরা যাকে বলতেন 'কোশ'। পরের যুগের বিজ্ঞানীরা দেখলেন পাঁচটি কোশ আবার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনটি শরীরের উপাদান—জীব যুগপৎ প্রত্যেক শরীরে বাস করেও প্রাকৃতচেতনায় শুধু স্থূল শরীরের একটা উপরভাসা খবর রাখে। কিন্তু মানুষের পক্ষে অন্যান্য শরীর সম্পর্কেও সচেতন হওয়া অসম্ভব নয়। স্থূলশরীরের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে চেতনায় যদি অন্নময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষের নির্মুক্ত প্রকাশ ঘটে, তাহলেই দেখা দেয় তথাকথিত যত অলৌকিক রহস্য। এসব রহস্য নিয়ে আজকাল জোর গবেষণা শুরু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তার ক্ষেত্র যেমন সঙ্কীর্ণ, গবেষণার পদ্ধতিতেও তেমনি চূড়ান্ত আনাড়িপনা -যদিও এই নিয়ে চালবাজি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এদেশের প্রাচীন হঠযোগী ও তান্ত্রিকেরা মানুষের দেহ ও প্রাণের অলৌকিক ব্যাপারগুলিকে রীতিমত বিদ্যায় ফলিত করেছিলেন। সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণ ও মনের ছয়টি চক্রের অনুরূপ এই স্থূল দেহের মধ্যেও তাঁরা পেয়েছিলেন ছয়টি প্রাণময় নাড়ীচক্রের সন্ধান। সেইসঙ্গে তাঁরা সূক্ষ্ম কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, যা দিয়ে চক্রে-চক্রে নিমীলিত 'পদ্ম'গুলিকে উন্মীলিত করা যায়। তখন মানুষ সূক্ষ্মলোকের উপযোগী সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজীবনের অধিকার পায়—এমন-কি দেহ ও প্রাণের যে স্থূল বাধা বিজ্ঞানময় ও চিন্ময় ভূমির অনুভবকে ব্যাহত করে রেখেছিল, তারাও তখন অপসারিত হয়। হঠযোগীরা বলেন (অনেক-ক্ষেত্রে তার প্রমাণও দিয়েছেন) যে, আধুনিক বিজ্ঞান যাদের প্রাকৃত প্রাণন-ব্যাপারের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে, এমন অনেক স্থূল অভ্যাসের অথবা শারীরক্রিয়ার দাসত্ব হতে নিজেকে তাঁরা মুক্ত করতে পারেন স্থূল প্রাণশক্তিকে স্ববশে এনে।

এইসব প্রাচীন দেহতত্ত্বের গবেষণা হতে জীবনের একটা মর্মসত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জড়-পরিণামের বর্তমান পর্বে শক্তি চেতনা ও আধারের যে-রূপই আমাদের মধ্যে ফুটুক, তা কখনও শাশ্বত নয়। তারও পিছনে এক বিপুল স্বরূপশক্তির নিগূঢ় আবেশ আছে—আমাদের জীবন যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বহির্ব্যক্তি মাত্র। স্থূলদেহকে সৃষ্টি করেই আমাদের রূপধাতুর সামর্থ্য নিঃশেষিত হয়নি। এ তো শুধু চিৎশক্তির মৃন্ময় পীঠ, তার মূলাধার, তার

প্রবর্তনার আদিবিন্দু। জাগ্রৎ চেতনার পিছনে যেমন আছে অবচেতন ও অতিচেতন ভূমির বিপুল প্রসার—যার অপ্রাকৃত দীপ্তি কখনও আমাদের চিত্তে ঝিলিক হানে—তেমনি স্থূল অন্নময় আধারের পিছনেও প্রচ্ছন্ন আছে রূপধাতুর আরও কত সূক্ষ্ম স্তর, যাদের বিপুল বীর্য ও নিগূঢ়চ্ছন্দে এই দেহপিণ্ড বিধৃত রয়েছে। যে-চিদ্‌ভূমিতে তারা রয়েছে, তার মধ্যে অবগাহন করলে প্রাকৃত জড়পিণ্ডেও আমরা তাদের বীর্য এবং ছন্দ নামিয়ে আনতে পারি, মর্ত্যজীবনের মূঢ় সংবেগ ও সংস্কারের স্থূল সঙ্কোচকে পরাভূত করে ফুটিয়ে তুলতে পারি ঊর্ধ্বলোকের পরিশুদ্ধ ও নিবিড় চেতনা। তা-ই যদি হয়, তাহলে পশুর মত জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্বশাসিত অচরিতার্থ প্রাণবাসনার তাড়নায় ক্ষুব্ধ-বিকল এই-যে আমাদের সাধারণ জীবন—যার মধ্যে পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য দুর্লভ কিন্তু একান্ত সুলভ ব্যাধি ও বিপর্যয়—তাকে অতিক্রম করেই এই পৃথিবীর বুকে সার্থক হবে এক মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা। যুক্তি-সিদ্ধ সত্যদর্শনের 'পরে সে-সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা। অতএব তাকে স্বপ্ন বা মরীচিকা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। এতকাল ধরে জীবনের ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত রহস্যের সম্পর্কে যা ভেবেছি জেনেছি কি অনুভব করেছি, এই অভাবনীয়ের সম্ভাবনার দিকেই তাদের সুস্পষ্ট ইশারা।

বাস্তবিক এ তো অযৌক্তিক কিছুই নয়। বিশ্বতত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা এমন ওতপ্রোত হয়ে আছে আমাদের আধারে যে, তাদের একটিকেও অনর্থজ্ঞানে বর্জন করে অপরকে প্রমুক্তির দিব্যচ্ছন্দে লীলায়িত করা যায় না। জড় হতে অতিমানসভূমিতে মানুষের উত্তরায়ণ সম্ভব হ'ল তার রূপধাতুতেও অনুরূপ ঊর্ধ্বপরিণাম দেখা দেবে। তখন এই দেহই রূপান্তরিত হবে বিজ্ঞানময় অথবা হিরন্ময় দেহে—অতিমানসী চেতনার যোগ্য আধার। সত্তার অবর বিভূতিসমূহকে জয় করে অতিমানস যদি দিব্যপ্রাণন ও দিব্যমননের নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের মুক্তি দেয়, তাহলে অতিমানসধাতুর বীর্যে জড়ত্বের সমস্ত সঙ্কোচ পরাভূত হয়ে এই দেহই কেন ধাতুপ্রসাদের মহিমায় জ্বলে উঠবে না ? তার অর্থ : শুধু-যে নিরঙ্কুশ চেতনার উন্মেষ হবে এই আধারে, অথবা স্থূল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপূর্ণ সঞ্চয়ের 'পরে নির্ভর ক'রে যে মন ও ইন্দ্রিয়চেতনা জড়ময় অহংকারের কারাগারে রুদ্ধ হয়ে আছে, তারাই যে শুধু মুক্তি পাবে—তা নয়। প্রাণশক্তিও জড়ের আড়ষ্টবন্ধন হতে ছাড়া পেয়ে স্ফুরিত হবে নবীন বীর্যে, দিব্যপুরুষের উপযুক্ত ভোগায়তনরূপে এই পার্থিব আধারে উন্মেষিত হবে এক নবীন জীবন, মৃত্যুঞ্জয় মানব এইখানেই অর্জন করবে পার্থিব অমৃতত্বের অধিকার। আর তা সে করবে বর্তমান দেহের প্রতি আসক্তি কিংবা তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে নয়, কিন্তু স্থূলদেহের নিয়তিকৃত নিয়মকে স্বাতন্ত্র্যের মহিমাতে অতিক্রম করে।...এ শুধু স্বপ্ন নয়,

এ সত্য। কেননা, দ্যুলোকের 'মধ্ব উৎসঃ' হতে, অনাদি স্বরূপানন্দের নিরন্ত নির্ঝর হতে 'অমৃতত্বের ঈশান' সেই পরমদেবতা অবিরাম এই মনোময় প্রাণভৃৎ মর্ত্যতনুতে ঢালছেন পবমান সোমের দিব্যধারা—যা প্রতি কোশের অণুতে-অণুতে সঞ্চারিত হয়ে এই অন্নময় আধারকে রূপান্তরিত করছে হিরণ্ময়ী সত্ত্বতনুতে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সত্তার সপ্ততন্ত্রী

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্ বি তত্নিরে কবয় ওতবা উ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৫

মন দিয়ে ধরতে পারি না, তাই তো শুধাই অন্তরে নিহিত দেবতাদের এই পদের কথা। একবছরের শিশুকে ঘিরে সাতটি তন্তু জড়িয়ে দিলেন কবিরা এই বুনানিতে।
—ঋগ্বেদ (১।১৬৪।৫)

সন্মাত্রের যে-সপ্তবিভূতিকে প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও সপ্তধা ব্যাকৃতিরূপে জানতেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় এতক্ষণে আমরা ধরতে পেরেছি চিৎশক্তির সংবৃত্তি ও বিবৃত্তির সকল ক্রম এবং তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমাদের ঈপ্সিত জ্ঞানের প্রথম সূত্র। আরও জেনেছি, এক বিশ্বোত্তীর্ণ এবং অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মহাত্রিপুটী ব্রহ্মের স্ব-ভাব এবং তা-ই বিশ্বের সকল বস্তুর নিদান ও আধার, আদিতে ও অবসানে তা-ই তাদের তত্ত্বরূপ। চৈতন্যের দুটি বিভাব—একটি তার ভা-রূপ, আরেকটি কৃতি-রূপ। একটি আত্মসংবিতের প্রতিষ্ঠা ও বীর্য, আরেকটি আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ও বীর্য। স্বরূপস্থিতিতে হ'ক অথবা স্পন্দবৃত্তিতে হ'ক, চৈতন্যের এই দুটি বিভাব ব্রহ্মসত্তায় অন্তর্গূঢ়। তাই বিসৃষ্টিতে সর্বেশনাময় আত্মসংবিৎ দ্বারা আত্মনিহিত বীজভাবকে যেমন তিনি জানেন, তেমনি আবার সর্ববিৎ আত্মশক্তির দ্বারা উৎপাদন ও শাসন করেন বিশ্বসম্ভূতির লীলায়নকে। সর্বসতের এই সিসৃক্ষার চিৎ-কন্দ নিহিত রয়েছে সম্ভূতবিজ্ঞান বা অতি-মানসের তুরীয় পর্বে। সেইখানে স্বয়ম্ভাব ও স্বয়ংসংবিতের সঙ্গে এক হয়ে আছে এক দিব্য প্রজ্ঞা এবং ওই প্রজ্ঞার ছন্দে গাঁথা এক সত্যসংকল্প—ধাতু এবং প্রকৃতিতে যা আত্মচেতন স্বয়ম্ভাবের জ্যোতির্ময় সিসৃক্ষার প্রাণচঞ্চল রূপ। এই প্রজ্ঞা ও সংকল্পের যুগললীলা স্বরূপসত্যের ঋতময় প্রশাসনে নিখিল বিশ্বের গতি রূপ ও ধর্মকে বিধান করছে—সর্বভূতের ভাবরূপকে অটুট রেখে।

একত্ব আর বহুত্বের দ্বিদলে এই বিশ্বলীলা একটা ছন্দের হিল্লোল যেন। এক অনাদি অখণ্ড চেতনার বিভূতিরূপে এ যেমন ভাব শক্তি ও রূপের অন্তহীন বিচিত্র পসরা, তেমনি এক শাশ্বত একত্ব এর স্বরূপ—যার বৃন্তে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রদল লীলাকমল ফুটে উঠেছে 'সন্মূল, সদায়তন ও

সংপ্রতিষ্ঠ' হয়ে। অতিমানসের মধ্যেও তাই দেখা দিয়েছে সংজ্ঞান আর প্রজ্ঞানের যুগল ছন্দ। অখণ্ডস্বরূপের প্রত্যয় হতে বহুধা-রূপায়ণের ভাবনায় পরিকীর্ণ হয় তার সংবিতের সহস্ররশ্মি। সে-আলোকে তার সংজ্ঞান তাদাত্ম্যানুভবের আবেশে বিশ্বকে বহুধা-বিচিত্র অন্বয় তত্ত্বরূপে অনুভব করে, আবার তার প্রজ্ঞান নিজের মধ্যে বিবিক্তরূপে দর্শন করে নিখিল পদার্থকে নিজেরই প্রজ্ঞা ও সংকল্পের বিষয়রূপে। তার অনাদি আত্মসংবিতে এই বিশ্ব এক সত্তা এক চৈতন্য এক দিব্যক্রতু এক স্বরূপানন্দের উল্লাসে স্তব্ধ —তার মধ্যে সমগ্র বিশ্বলীলা একটি অখণ্ড স্পন্দ মাত্র। অথচ সেই ভূমিকাতে ঋতম্ভরা কৃতির দৈবী মায়ায় চলছে এক হতে বহুতে, আবার বহু হতে একে অবরোহ এবং আরোহের খেলা। তার মধ্যে খণ্ডভাবের আভাস মাত্র আছে, এখনও তা অপরিহার্য বাস্তবে রূপ ধরেনি। তাকে বলা যেতে পারে একটা অতিসূক্ষ্ম স্বগতভেদের লীলা অথবা অখণ্ডের মধ্যে আত্মবিশেষণের একটা কল্পরেখা শুধু। অতিমানসই সে-দিব্যবিজ্ঞান, যাতে ব্রহ্মাণ্ডের বিসৃষ্টি বিধৃতি ও প্রশাসন। এ সেই অন্তর্গূঢ় পুরাণ প্রজ্ঞা, যাহাতে আমাদের বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই প্রসৃত।

আমরা এও জেনেছি : মন প্রাণ আর জড় লোকোত্তর দিব্যচেতনার একটা ত্রিধা বিকল্প। বিশ্বে অবিদ্যার আশ্রয়ে তাদের প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি, অখণ্ডের বহুধাবিচিত্র খণ্ডলীলায় তারা আপাত-আত্মবিস্মরণের একটা ভান মাত্র। অদিব্য হলেও স্বরূপত তারা দিব্য-চতুষ্টয়ের অবর বিভূতি। এই যেমন : মন অতিমানসের একটা অবর বিভূতি—খণ্ডভাবনার প্রয়োজনে ব্যবহারদশায় সে অন্তর্গূঢ় অখণ্ডতাকে ভুলেছে, যদিও অতিমানসের প্রদ্যোতনায় আবার সে অখণ্ডভাবের মধ্যে ফিরে যেতেও পারে। প্রাণও তেমনি সচ্চিদানন্দের তেজোবিভূতির অবর প্রকাশ। মনের খণ্ডকল্পনাকে আশ্রয় করে চিৎ-তপসের বিভূতিকে ফুটিয়ে তুলছে সে রূপে-রূপে—এই তার শক্তিলীলা। আবার আত্মসংবিৎ ও আত্মশক্তির এ-প্রতিভাসকে সিদ্ধ করতে সচ্চিদানন্দ যখন তাঁর আত্মসত্তাকে ঘনীভূত করেন দ্রব্যসত্তাতে, তখন তা-ই ধরে জড়ের রূপ।

তারও পরে দেহ-প্রাণ-মনের চিৎকন্দে দেখা দেয় চতুর্থ একটি তত্ত্ব—আমরা যাকে পুরুষ বলে জানি। তার দুটি রূপ : একটি ফুটেছে বাইরে কামপুরুষ হয়ে—রসের পিপাসায় নিরন্তর সে আকুল। আরেকটি আছে অনেকখানি বা পুরাপুরি তারই আড়ালে চৈত্য-পুরুষরূপে—চিৎ-পুরুষের সারগ্রাহী অনুভব সঞ্চিত হয় যার মধ্যে। এই তুরীয় মানুষ-তত্ত্বকে আমরা গ্রহণ করেছি সচ্চিদানন্দের আনন্দব্যক্তিরূপে—যদিও জগতের জীবপরিণামের ছন্দে আমাদের প্রাকৃতচেতনার ধারা ধরে তার প্রকাশ ঘটে। ব্রহ্মের সদ্-ভাব

স্বরূপত এক অনন্ত চৈতন্য ও তাঁর স্বধার বীর্য। তেমনি তাঁর অনন্ত চৈতন্যও স্বরূপত এক অন্তহীন বিশুদ্ধ আনন্দ মাত্র—স্বপ্রতিষ্ঠা ও স্বগত-সংবিৎ যার তত্ত্ব। বিশ্ব ব্রহ্মের 'আনন্দরূপং যদ্ বি-ভাতি'—এ তাঁর স্বরূপানন্দের উল্লাস। বিরাট্‌পুরুষ এই উল্লাসের সম্যক ভর্তা ও ভোক্তা। কিন্তু ব্যষ্টিপুরুষে অবিদ্যা ও খণ্ডভাবের প্ররোচনায় তা অধিচেতনা ও অতিচেতনার মধ্যে উপসংহৃত হয়ে আছে। তাই তাকে খুঁজে পেতে ও ভোগ করতে হলে উত্তারের পথে জীবচেতনাকে চলতে হয় বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনার সমুদ্রসঙ্গমের দিকে।

তাহলে আমরা সাতটির জায়গায় আটটি* বিশ্বতত্ত্ব পাই। যদি এইভাবে তাদের সাজাই—

সৎ	জড় (অন্ন)
চিৎ-শক্তি	প্রাণ
আনন্দ	পুরুষ
অতিমানস	মন

তবে তার প্রথম সারিটি হবে দিব্যচেতনা। আমাদের প্রাকৃতচেতনা হবে তার বিচ্ছুরণ—দ্বিতীয় সারিতে। এমনি করে আমাদের মধ্যে দিব্যচেতনার অবতরণ এবং দিব্যচেতনার মধ্যে আমাদের উত্তরণ—এই হল বিশ্বলীলার ছন্দ।

ব্রহ্ম তাঁর অতিমানস সিসৃক্ষাকে বাহন করে বিশুদ্ধ সদ্-ভাব হতে বিশ্ব-ভাবে নেমে আসছেন সংবিৎশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তির লীলায়। আমরাও তেমনি অতিমানসের প্রচেতনাকে আশ্রয় করে জড়ভাব হতে উঠছি ব্রহ্মভাবের দিকে প্রাণ পুরুষভাব ও মনের ক্রমিক উন্মেষে। পরার্ধ আর অপরার্ধ দুয়ের গ্রন্থি মন আর অতিমানসের সঙ্গমতীর্থে—সেখানে এক কঞ্চুকের আবরণ আছে। এই কঞ্চুকের বিদারণে মানুষের মধ্যে দিব্যজীবনের সিদ্ধবীর্য ফোটে। তখন অবরসত্তার লেলিহান অগ্নিশিখা বিপুল সংবেগে উত্তীর্ণ হয় যেমন দ্যুলোকের পরমব্যোমে, তেমনি পরসত্তার সোমধারা সপ্তসিন্ধুর কলকল্লোলে নেমে আসে এই চেতনাতে। এই মানুষই তখন মহাভৈরবরূপে সে-অলকানন্দাকে ধারণ করে তার জটাজালে, এই মাটির বুকে বইয়ে দেয় তার উদ্দাম প্রবাহ মহাসমুদ্রের সঙ্গমব্যাকুলতায়। এই মন তখন অতিমানসের মধ্যে খুঁজে পায় সম্ভূতিসংবিতের বিপুলতা, সর্বাত্মভাবের উচ্ছলিত আনন্দে পুরুষ ফিরে পায় তার দিব্যসম্ভোগের সামর্থ্য, চিৎশক্তির অকুণ্ঠ বিচ্ছুরণে প্রাণ পায় তার দিব্যবীর্যের স্বাধিকার, দিব্য সদ্‌ভাবের স্বচ্ছ

---

* সাধারণত সাতটি রশ্মির কথা বলেছেন বৈদিক ঋষিরা; কিন্তু আটটি, নয়টি, দশটি এমন-কি বারোটি রশ্মিরও উল্লেখ আছে বেদে।

আধাররূপে এই জড়দেহ চিন্ময় স্বাচ্ছন্দ্যে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। এই হল বিশ্ববিবর্তনের পরম তাৎপর্য। আজ প্রকৃতির যুগব্যাপী সাধনা মানুষের মধ্যে মঞ্জরিত হয়েছে। সে কি অস্তিত্বের অর্থহীন আবর্তনে এবং নিয়তির মূঢ়চক্র হতে ব্যক্তির ক্বচিৎ-মুক্তিতে পর্যবসিত হবে? চিৎ আর জড়ের মাঝে আজ মানুষই দাঁড়িয়ে আছে তটস্থ শক্তির বিপুল বীর্য ও বৃহৎসামের অনির্বাণ আকূতি নিয়ে। তার এই বিরাট স্বপ্ন কি হতাশ্বাসের রূঢ় আঘাতে ভেঙে যাবে? একদিন জেগে উঠে সে কি দেখবে—সমস্ত জীবন একটা মায়ার ছলনা, বিশ্বের সাধনা নিরর্থক একটা আয়াস মাত্র—অতএব বিশ্বের সম্পূর্ণ নিরাকৃতিতেই আছে একমাত্র সত্য এবং সান্ত্বনা?...কিন্তু এ তো শুধু আমাদের মনের মায়া। অখণ্ড দর্শনে চেতনার অনন্ত ব্যাপ্তিতে সমস্তই যে প্রাণময় চিন্ময় আনন্দময়—বিশ্বের প্রমুক্ত প্রাণের হিল্লোলে কোথায় বন্ধন? ব্যক্তির ক্বচিৎ-মুক্তির কল্পনা মনের নিরূঢ় পঙ্গুতাজন্য সংস্কার মাত্র। তাই বিশ্বকে পরিহার করে নয়, তার হিরণ্ময় রূপান্তরেই প্রকাশ পায় মানুষের সাধনবীর্য এবং তাতেই বিশ্বলীলার চরম ও পরম পর্যবসান।

কিন্তু মনন ও সাধনার যে অনুকূল পরিবেশে এই দিব্য রূপান্তর তাত্ত্বিক সম্ভাবনা হতে বাস্তব সম্ভূতির বীর্যে স্ফুরিত হবে, তার সম্যক আলোচনা করবার পূর্বে আমাদের অনেক-কিছুই ভাবতে হবে। সচ্চিদানন্দের বিশ্বরূপে অবতরণের তত্ত্বটি আমরা এতক্ষণ বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে সে-অবতরণ সার্থক হয়েছে কোন বিপুল ঋতায়নে, কি-ই বা তাঁর চিৎ-শক্তির প্রকটলীলার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, তার আলোচনা আমরা এখনও করিনি।····প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আলোচিত সাতটি বা আটটি তত্ত্বের প্রত্যেকটি বিশ্ব-বিসৃষ্টির সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে আছে, অতএব আমাদের মধ্যেও তারা রয়েছে ব্যক্ত কিংবা অব্যক্তরূপে। কেননা, বেদের ভাষায় এখনও আমরা 'একবছরের শিশু মাত্র'—পরা প্রকৃতির পূর্ণযুবক সন্তান হতে এখনও আমাদের ঢের দেরি। সৎ-চিৎ-আনন্দের পরা ত্রিপুটী সর্বভূতের উৎস ও প্রতিষ্ঠা—তাঁরই মধ্যেই তারা লীলায়িত। এই নিখিল বিশ্ব তাঁর স্বরূপসত্তার প্রকাশ এবং বিসৃষ্টি। বিশ্বের রূপরেখা ফুটেছে সর্বশূন্য অসৎ হতে এবং তার মধ্যে সে ভাসছে পরম নাস্তিত্বের বুদ্বুদরূপে—একথা অশ্রদ্ধেয়। এ-বিশ্ব হয় অনন্ত অরূপ-সতের বিলাস, নয়তো সেই সর্ব-সতেরই আত্মরূপায়ণ। বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে আমরা অনুভব করি, তার এ-দুটি রূপই যুগপৎ সত্য। অর্থাৎ অন্তহীন ছন্দোলীলায় সেই সর্বসৎই এই বিশ্বরূপ হয়েছেন—দেশ ও কালের দোলায় তাঁর আত্মপ্রসারণের চিন্ময় বিলাস দুলিয়ে দিয়ে। আধার ছাড়া ক্রিয়া অসম্ভব। তাই বিশ্বলীলার আধাররূপে স্ফুরিত হল তাঁর সন্ধিনীশক্তি—উপনিষদের

ভাষায় যা 'অমৃতস্য সেতুঃ লোকানাম্ অসংভেদায়।' আবার এই সন্ধিনীশক্তির মূলে রয়েছে এক অনন্ত সংবিৎশক্তির বিলাস—কেননা এক সর্বনিয়ামক বিশ্বম্ভর ক্রতু সে-শক্তির স্বরূপ, যা বিশ্বের সকল বিভূতিকে আত্মচেতনার পর্যায়রূপে গ্রহণ করে। বিশ্বক্রতুর এই গ্রহণ ও নিয়মন সম্ভব হত না, যদি তার বিশ্বসংবেদনের অধিষ্ঠানরূপে এক সর্বাবগাহী সম্ভূতিসংবিৎ না থাকত। শুদ্ধ-সন্মাত্রের আত্মবিভাবনারূপী যে বিচিত্র কলনাকে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব বলে জানি, এই সম্ভূতিসংবিৎ হতে তার উদ্ভব, তারই মধ্যে তার ধৃতি স্থিতি ও বিচ্ছুরণ।

শেষ কথা। চৈতন্য যখন সর্ববিৎ ও সর্বেশ্বর অকুণ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠার জ্যোতিতে প্রভাস্বর, আর এই জ্যোতির্ময় অত্মপ্রতিষ্ঠা যখন নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপবিশ্রান্তি বলে স্বভাবতই আনন্দরূপ—তখন এক বৃহৎ সর্বগত স্বরূপানন্দই বিশ্বভাবের নিদান স্বরূপ এবং তাৎপর্য। উপনিষদের ঋষি তাই বলেন, 'যদি এই সদানন্দের সর্বাবগাহী আকাশ না থাকত আমাদের আয়তনরূপে, এই আনন্দই যদি না হত আমাদের চিদাকাশ, তাহলে কে বাঁচত, কে-ই বা ফেলত নিঃশ্বাস?' এই আত্মানন্দ প্রাকৃত চেতনায় অব্যক্ত এবং অবচেতনায় নিগূঢ় হতে পারে। কিন্তু তবু সত্তার মর্মমূলে তার অধিষ্ঠান চাই, সমস্ত জীবন হওয়া চাই তার এষণায় তারই সম্ভোগের আকূতিতে চঞ্চল। তাই তো দেখি, বিশ্বের যে-কোনও জীব যতই নিবিড় করে নিজেকে পায় অবন্ধ্য সংকল্পে ও বীর্যে, প্রদীপ্ত জ্যোতিতে ও বিজ্ঞানে, উদার স্থিতিতে ও ব্যাপ্তিতে, উচ্ছ্বসিত প্রেমে ও আনন্দে—ওই গুহাহিত আনন্দসংবিতের স্পর্শ ততই তাকে উন্মনা করে। সত্তার উল্লাস, তত্ত্বদর্শনের আনন্দ, সিদ্ধ সংকল্প বীর্য ও সিসৃক্ষার উন্মাদনা, প্রেম-সামরস্যের আত্মহারা রসোদ্গার—বিশ্ব জুড়ে প্রাণ-প্রসারের এই রীতি। কেননা বিশ্বসত্তার মর্মমূলে, তার অনালোকিত তুঙ্গশিখরে কাঁপছে এই আনন্দবেদনার মুগ্ধ শিহরন। অতএব যেখানেই বিশ্বের রূপায়ণ, সেখানেই তার অন্তরে ও অন্তরালে আছে এই দিব্যত্রয়ীর লীলা।

কিন্তু অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ কেন প্রতিভাসরূপে আপনাকে বিসৃষ্ট করবে? আর যদিই-বা করে, সে কখনও বিশ্ব-রূপ ধরবে না—তার অন্তহীন অভিব্যঞ্জনায় কোনও ঋতের শাসন অথবা সম্বন্ধের যোগাযোগ থাকবে না। তাই মহাত্রিপুটীর সঙ্গে যুক্ত করতে হয় চতুর্থ একটি বিভাব—আমরা যাকে বলেছি অতিমানস অথবা দিব্য প্রজ্ঞা। প্রত্যেক বিশ্বে থাকবে এক দৈব বিজ্ঞান ও সংকল্পের বীর্য, যা অন্তহীন সম্ভূতির অব্যাকৃতিকে বিশিষ্ট সম্বন্ধে ব্যাকৃত করবে, বীজভাব হতে ফুটিয়ে তুলবে ফলিত পরিণাম, বিশ্ব-বিধানের বিপুল ছন্দঃসমূহকে করবে লীলায়িত, অনন্ত-অমৃত কবি ও শাস্তা-

রূপে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসন করবে দিব্যদৃষ্টির প্রদ্যোতনায়।* এই বীর্য সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপশক্তি। যা তার স্বয়ম্ভূসত্তায় নিহিত নাই, এমন-কিছু সে কখনও সৃষ্টি করে না। তাই বিশ্বের সকল ঋতময় বিধান অন্তর হতে প্রবর্তিত হয়। কেউ তারা আগন্তুক নয়; সমস্ত পরিণতিই আত্মস্ফুরণ মাত্র। বস্তুর বীজে তার স্বরূপসত্যের ভ্রূণ আছে। বস্তুর পরিণামে তারই নিগূঢ় সামর্থ্য স্ফুরিত হয়। বিধিমাত্রেই 'ব্রত' অর্থাৎ অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির একটি স্বাভীষ্ট ধারা, অতএব সমস্ত বিধিই ঐকান্তিক অর্থাৎ সত্তার অন্তহীন সম্ভূতির একটি মাত্র বিভূতি। প্রত্যেক বস্তুতে অনবশেষ সম্ভাবনা নিহিত আছে—নিরূপিত রূপ ও রীতিকে ছাপিয়ে। অন্তর্গূঢ় অন্তহীন স্বাতন্ত্র্যের বশে বিজ্ঞানের যে-আত্মসংকোচ, তাই বস্তুধর্মের বৈশিষ্ট্য হয়ে ফোটে। এই আত্মসংকোচের সামর্থ্য স্বভাবরূপে অসীম সর্ব-সতের মধ্যে নিহিত আছে। অনন্ত যদি অন্তহীন বৈচিত্র্যে নিজেকে রূপায়িত করতে না পারেন, তাহলে তাঁকে অনন্ত বলা চলে না। তেমনি নির্বিশেষের প্রজ্ঞা বীর্য সংকল্প ও বিসৃষ্টিতে যদি অন্তহীন আত্মবিশেষণের সামর্থ্য না থাকে, তবে তাকেই-বা কি ক'রে নির্বিশেষ বলে মানি ? এইজন্য বলি, বিশ্বের সমস্ত শক্তি ও সত্তায় এই অতিমানস ঋত-চিৎ বা সম্ভূতবিজ্ঞানরূপে অনুস্যূত রয়েছে। স্বয়ং অনন্ত হয়েও সান্তলীলার সে প্রযোজক—মহা বিশ্ববিভূতির ঋতময় বিচিত্র সম্বন্ধজালকে সে-ই নিরূপিত করছে, তাদের বিধৃতি ও যোগাযোগ ঘটছে তারই প্রশাসনে। বৈদিক ঋষিদের ভাষায়, অনন্ত সত্তা চিতি ও আনন্দ যেমন নামহীনের গুহ্য ও পরম নাম, তেমনি এই অতিমানসও তাঁর তুরীয় নাম* —তৎ-স্বরূপের অবতরণের পথে সে যেমন তুরীয়, তেমনি তুরীয় আমাদের উত্তরণের পথেও।

কিন্তু মন-প্রাণ-জড়ের অবর ত্রিপুটীও বিশ্বভাবনার পক্ষে অপরিহার্য—পৃথিবীতে অথবা জড়বিশ্বে নিত্যদৃষ্ট কুণ্ঠিত রূপ ও বৃত্তি নিয়ে নিশ্চয় নয়, কিন্তু তাদের জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মবীর্য অপরূপ লীলায়নে। কারণ, মন স্বরূপত অতিমানসের বৃত্তি। বস্তুকে সে মিত এবং সীমিত করে, একটি বিশেষ কেন্দ্র হতে দেখে বিশ্বলীলার ঘাতপ্রতিঘাত। এমন ভূমি অথবা লোক, কিংবা বিশ্বব্যাপারে এমন ব্যবস্থাও আছে, মন যেখানে সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে গেছে। হয়তো সেখানে মনকে গৌণবৃত্তিরূপে ব্যবহার করছে যে-পুরুষ, তার অন্য কেন্দ্র বা ভূমি হতেও দেখবার সামর্থ্য আছে—এমন-কি বিশ্বের পরবিন্দু হতে অথবা বিশ্বব্যাপ্ত আত্মবিকিরণের বৃহৎ ভাবনায় বিশ্বকে দর্শন করাও তার

---

* কবি, মনীষী, স্বয়ম্ভূ তিনি—পরিভূরূপে হয়েছেন সব-কিছু সকল ঠাঁই।
—ঈশোপনিষদ ৮

* "তুরীয়ং স্বিদ্"—তুরীয় একটা-কিছু; একে 'তুরীয়ং ধাম'ও বলা হয়েছে।

পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তবু দিব্যকর্মের বিশেষ প্রয়োজনে তার যদি একটা নিজস্ব ভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সামর্থ্য না থাকে, অমনীভাবের ভূমিতে যদি বিরাট আত্মবিবিকিরণের জ্যোতিরুচ্ছ্বাস থাকে শুধু, অনন্ত চিদ্-বিন্দুর বিচ্ছুরণে যদি না থাকে স্ব-তন্ত্র আত্মবিশেষণের অথবা আত্মসংহরণের সম্ভাবনা—তাহলে বিশ্বের বিসৃষ্টি সেখানে সম্ভব হয় না। আমরা সে-ভূমিতে পাই শুধু এক দিব্য-পুরুষের আত্মগত অন্তহীন ভাবনা—শিল্পী বা কবির স্ব-তন্ত্র অথচ অরূপ ভাবনার মত, যার মধ্যে বিশিষ্ট সৃষ্টির কোনও কল্পনা এখনও ফোটেনি। সত্তার অন্তহীন প্রসারে কোথাও-না-কোথাও এমন-একটা ভূমি থাকলেও আমরা তাকে 'বিশ্ব' বলতে পারি না। সে-নিরুপাখ্যের মধ্যে ঋতের যে-ছন্দই থাকুক, তাতে নিয়ম নাই, বাঁধুনি নাই। অতিমানসের এমন মুক্তচ্ছন্দ ঋতায়ন শুধু তখনই সম্ভব, যখন তার অব্যাকৃত জ্যোতির্বাষ্পময় প্রসরণে পরিণতির বিশিষ্ট ধারা, পরিমিতির রূপরেখা এবং অন্যোন্যসম্বন্ধের চিত্রলীলা দেখা দেয়নি। এই পরিমিতি ও ক্রিয়াব্যতিহারের জন্যই মনের প্রয়োজন হয়—যদিও সে-মন তখনও নিজেকে অতিমানসের গৌণ-বৃত্তি বলে জানবে, তার অন্যোন্যসম্বন্ধের ক্রিয়া তখনও মর্ত্যপ্রকৃতিতে অব-রুদ্ধ সীমিত অহন্তার আশ্রিত হবে না।

এমনি করে অতিমানসের সংকল্পে মন দেখা দিলে প্রাণ ফুটবে, ফুটবে রূপধাতুর ব্যাকৃতি। কারণ, শক্তি ও ক্রিয়ার সবিশেষ নিরূপণই প্রাণের ধর্ম—অগণিত নিয়ত চিৎকেন্দ্র হতে তেজোবিচ্ছুরণের ব্যতিহারকে নিয়ন্ত্রিত করা তার স্বভাব। অবশ্য চিৎকেন্দ্র নিয়ত হলেও দেশে অথবা কালে তারা নিয়ত নয়। জগতীচ্ছন্দের সহস্রদলকে যে-শাশ্বতপুরুষ ধরে আছেন, তাঁর হিরণ্য-জ্যোতিতে তারা ভাসছে নিত্যসহচরিত অনন্ত চিৎকণের সিদ্ধসত্তারূপে। আমা-দের পরিচিত বা কল্পিত প্রাণলীলার সঙ্গে এই দিব্য প্রাণলীলার কোনও সাদৃশ্য না থাকলেও দুয়ের মূলতত্ত্ব এক। প্রাচীন ঋষিরা একে বলেছেন 'বায়ু'। বিশ্বের সে-ই প্রাণধাতু বা দিব্যক্রতুর তেজোঘনরূপ—যা রূপে কর্মে চিত্তলীলায় বিশ্বময় নিজেকে ব্যাকৃত করছে। তেমনি স্থূলদেহের অনুভব হতে আমরা যে-রূপধাতুর কল্পনা করি, তাও যথার্থ নয়। কেননা রূপধাতুর প্রকৃতি আরও সূক্ষ্ম, তার আত্মবিভাজন ও অন্যোন্যপ্রতিরোধের বৃত্তি জড়-ভূতের মত আড়ষ্ট কঠিন নয়। তত্ত্বত দেহ আর রূপ চিৎশক্তির সাধন মাত্র—তার কারাগার নয়। তবু বিশ্বময় ক্রিয়াব্যতিহারে রূপধাতুর একটা বিশিষ্ট সংহনন একান্ত প্রয়োজন—এমন-কি সে-সংহনন যদি মনোময় তনুতে অথবা তার চাইতেও সুসূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় সত্ত্বতনুতে প্রকাশ পায়—যার বীর্য ও স্বাতন্ত্র্যের চিন্ময় বিলাস কামচারী মনের সূক্ষ্মতম লীলাকেও ছাপিয়ে গেছে—তাতেই-বা ক্ষতি কি।

অতএব যেখানে বিশ্ব আছে, সেখানে পরমার্থসতের ওই সপ্তরশ্মি বর্ণালির বিচ্ছুরণও আছে। তারা পরস্পর ওতপ্রোত হলেও, কখনও কোথাও প্রথমত একটি তত্ত্ব স্বপ্রধান হয়ে দেখা দেয়। তারপর আর যা-কিছু ফোটে, মনে হয় ওই প্রধানেরই তারা রূপায়ণ এবং পরিণাম—বিশ্বব্যাপারে কোনও স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা যেন তাদের নাই। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। মায়ার মুখোসে তত্ত্বের রূপ ঢেকে বিশ্বের এ একটা লুকাচুরির খেলা শুধু। যেখানে একটি তত্ত্বের প্রকাশ, জানতে হবে আর-সব তত্ত্ব তার পিছনে আছে—নিশ্চেষ্টভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে নয় শুধু, নিগূঢ় শক্তিসঞ্চারের ব্রতকে বহন করে। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে হয়তো সত্তার সাতটি তন্ত্র সুরমূর্ছনায় বেজে উঠেছে তীব্র অথবা কোমল ঝঙ্কারে। কোথাও হয়তো একটি তন্ত্রের ঝঙ্কার ছাপিয়ে উঠেছে আর-সবাইকে—সেখানে আর-সব সুর স্তিমিত, সংবৃত্ত। কিন্তু যা সংবৃত্ত তা বিবৃত্ত হবেই—এই হল বিশ্বের শাশ্বত বিধান। একটি তত্ত্বের মধ্যে আর-সব তত্ত্বকে সংবৃত্ত রেখে যে-ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের যাত্রা শুরু, সেখানেও একদিন সত্তার সপ্তধা বীর্য উন্মেষিত হবে, ঝঙ্কৃত হবে তার সাতটি নাম।* তাই এই জড়-বিশ্বকেও স্বভাবের বশে অন্তর্গূঢ় প্রাণ হতে ব্যক্ত প্রাণের লীলা ফোটাতে হয়েছে সংবৃত্ত মনকে বিবৃত্ত করতে হয়েছে ব্যক্তমনের রূপায়ণে। অতএব এই ধারাতেই অব্যক্ত অতিমানস হতে এর পরে তার মধ্যে জাগবে অতিমানসের ব্যক্তজ্যোতি, প্রচ্ছন্ন চিৎস্বরূপ উদ্ভাসিত হবে সৎ-চিৎ-আনন্দের ভাস্বর মহিমায়। শুধু এই প্রশ্ন : এই পৃথিবীই কি সেই জ্যোতিরুৎসবের রঙ্গ-ভূমি হবে? এই পৃথিবীতে কিংবা অন্য-কোনও পৃথিবীতে, এই যুগে কিংবা মহাকালচক্রের অন্য-কোনও আবর্তনে, এই মানুষই কি তার সাধন এবং আধার হবে? প্রাচীন ঋষিরা মানুষের এই মহৎ সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করতেন, একে তার দিব্য নিয়তি বলে জানতেন। আধুনিক মনীষী এর কল্পনাকেও মনের কোণে ঠাঁই দেন না—ঠাঁই দিলেও তাকে আড়াল করে দাঁড়ায় হয় নাস্তিক্য নয়তো সংশয়। তাঁর কল্পিত অতিমানব প্রাণময় অথবা মনোময় মানবের রাজসংস্করণ মাত্র—কেননা প্রাণ-মনের সীমার কুণ্ডলীকে ছাড়িয়ে তার ওপারে তাঁর দৃষ্টি চলে না। জগতের প্রগতি-অভিযানে এই মানুষের মধ্যে যখন বৃহৎ জ্যোতির দিব্য স্ফুলিঙ্গ সমিদ্ধ হয়েছে, তখন অভীপ্সাকে খর্ব অথবা নির্জিত না করে তাকে উদ্দীপিত করাই তো সুবুদ্ধির পরিচয়। মানুষের অন্তর্গূঢ় বিপুল সামর্থ্যের এই-যে কুণ্ঠাহত আপাত-প্রকাশ, তার সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা কেন রুদ্ধ থাকবে? জীবনের এ-পর্বকে

---

* প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই তত্ত্বসংবরণের যে প্রয়োজন আছে, তা নয়। একটি তত্ত্ব মুখ্য, আর-সব গৌণ, অথবা একটি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত আর-সব তত্ত্ব, এমন ছন্দও সম্ভব। সুতরাং বিশ্ববিসৃষ্টির ব্যাপারে পরিণামের ক্রিয়া একেবারে অপরিহার্য নয়।

কেন মনে করব না শুধু গুরুগৃহবাসের পর্বরূপে? দৃষ্টিকে যত প্রসারিত করব, অভীপ্সাকে যত উদগ্র করব, ততই বিপুলতর সত্যের নিরন্ত নির্ঝর নেমে আসবে এই আধারে—ঋতম্ভরা চিৎশক্তির এ-ই বিধান। কেননা অনাদিকাল হতে সে-সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের মধ্যে—ব্যক্ত প্রকৃতির ছদ্ম আবরণ হতে তার প্রমুক্তির অনির্বাণ আকূতি জ্বলছে এই আধারেরই অণুতে-অণুতে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অতিমানস মানস ও অধিমানস মায়া

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাং সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যশ্বান্।
দশ শতা সহ তস্থুস্তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যম্ ॥

ঋগ্বেদ ৫।৬২।১

ঋতের দ্বারা সংবৃত আছে এক ধ্রুব, এক ঋত, সূর্য যার মধ্যে বিমুক্ত করেন তাঁর অশ্বদের। দশ-শত (রশ্মি তাঁর) একত্র হল—সেই তো অদ্বিতীয় তৎ। দেবতাদের সকল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু দেখলাম আমি।

ঋগ্বেদ (৫।৬২।১)

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো,
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥

ঈশোপনিষৎ ১৫,১৬

হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা অপিহিত রয়েছে সত্যের মুখ, তাকে হে পূষা, কর অপাবৃত—সত্যধর্মের তরে, দৃষ্টির তরে। হে সূর্য, হে একর্ষি, ব্যূহিত কর তোমার রশ্মি যত, সমূহিত কর তাদের; তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তা-ই দেখব আমি...ওই—ওই যে পুরুষ—সেই তো আমি।

—ঈশোপনিষদ (১৫,১৬)

সত্যম্ ঋতং বৃহৎ।

অথর্ববেদ ১২।১।১

সত্য—ঋত—বৃহৎ।

—অথর্ববেদ (১২।১।১)

সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৬

তা হল সত্য এবং অনৃত দুই-ই। তা হল সত্য—এমন-কি এই যা-কিছু।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৬)

একটা বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে আমাদের আলোচনায়—এইবার তাকে স্পষ্ট করতে হবে। বিশ্বজগৎ কি করে অবিদ্যার অবরলোকে নেমে এল ? মন প্রাণ বা জড়ের নিরূঢ় স্বভাবে এমন কিছুই তো ছিল না, যা বিদ্যা হতে তাদের ভ্রষ্ট করবে। অবশ্য এটুকু বুঝেছি : বিশ্ব- ও তুরীয়-চেতনার অঙ্গীভূত হলেও অবিদ্যার মূলে আছে চেতনার খণ্ডভাব। তত্ত্বত তাদের অবিনাভূত হয়েও ব্যষ্টিচেতনা তার উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অতিমানস সত্যের

গৌণবৃত্তি হয়েও মন তা থেকে বিযুক্ত হয়েছে, আদ্যশক্তির বীর্যবিভূতি হয়েও প্রাণ হয়েছে স্বাধিকারচ্যুত, শুদ্ধ-সত্তের রূপায়ণ হয়েও জড় বিবিক্ত হ'য়ে রয়েছে। খণ্ডভাব আছে জানি। কিন্তু অখণ্ডের মধ্যে কি করে তার বিদাররেখা দেখা দিল, শুদ্ধ-সন্মাত্রে কি করে এল চিৎশক্তির এই আত্মসংকোচ বা আত্মবিলুপ্তির মায়া, সেকথা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। নিখিল বিশ্ব যখন চিৎশক্তির স্পন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তার পূর্ণ জ্যোতি ও অখণ্ড বীর্যকে কোনও উপায়ে আচ্ছন্ন করে তবেই অবিদ্যার এই প্রবেগ ও সার্থক পরিণাম দেখা দিতে পারে। কিন্তু বিদ্যা-অবিদ্যার আলোআঁধারিতে যে-গোধূলিলোকের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চেতনায়, অতিমানস সত্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তি আর জড় অচিতির অমানিশার মাঝে সেই-যে অনতিব্যক্ত সন্ধিচেতনা, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া অবশ্য এ-সমস্যার সমাধান হবে না। এখন সংক্ষেপে এইটুকু বলা চলে, চিৎপুরুষের বিশেষ-একটি স্থিতি এবং স্পন্দের 'পরে ঐকান্তিক অভিনিবেশই অবিদ্যার স্বরূপ। তার আড়ালে সত্তা আর চৈতন্যের বাকী অংশ ঢাকা প'ড়ে শুধু ওই একদেশী খণ্ডজ্ঞানই একান্ত হয়ে দেখা দেয়।

কিন্তু সমস্যার একটা দিকের আলোচনা এখনই করা দরকার। পূর্বে বলেছি, আমাদের মন অতিমানস ঋত-চিতের গৌণ প্রবৃত্তি হতে সৃষ্ট। অথচ প্রাকৃত মনের সঙ্গে অতিমানসের কী দুস্তর ব্যবধান! চেতনার এই দুটি ভূমির মাঝে যদি আরোহ-অবরোহের কোনও সোপানমালা না থাকে, তাহ'লে জড়ের মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে চিতের নেমে আসা, কিংবা উত্তরণের সংগোপন সোপান বেয়ে চিতের মধ্যে বিবৃত্ত জড়ের ফিরে যাওয়া—এই দুটি ক্রম শুধু সংশয়িত নয়, অসম্ভব হয়। প্রাকৃত মন অবিদ্যার বিভূতি—সত্যের সন্ধানে সে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার হাতে ঠেকছে শুধু মনোময় বিকল্প এবং তারই নানা ছবি—ভাবে, ভাষায়, সংস্কার আর ইন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট তুলির টানে। ওরা যেন কোন্ সুদূরের দুর্জ্ঞেয় জ্যোতির্লোকের ছায়াতপের মায়া!...কিন্তু সত্যের মধ্যে অতিমানসের স্বচ্ছন্দ ও বাস্তব প্রতিষ্ঠা। তার রূপায়ণ তত্ত্বের সত্য পরিণাম—খেয়াল নয়, ছবি নয়, অসিদ্ধ বিকল্পের ছায়া নয়। অবশ্য আমাদের মধ্যে মনের পরিণাম আজও শেষ পর্বে পৌঁছয়নি। অন্নময় ও প্রাণময় কোশের কুহেলিকায় আজও সে আচ্ছন্ন ও পঙ্গু হয়ে রয়েছে। এই প্রাকৃত মনের উৎসরূপী যে-শুদ্ধমন তত্ত্বরূপে জড়ের মধ্যে নেমে এসেছে, তার বিপুল বীর্যের সন্ধান আজও আমরা পাইনি। আপন ভূমিতে তার স্বাধিকারের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য, তার কৃতিতে দ্যুলোকের ঝলক, তার প্রেরণায় সূক্ষ্মচ্ছন্দের লীলা, অনাবরণ সত্যের দ্যুতিতে ঝলমল তার রূপা-য়ণ। কিন্তু তবু প্রাকৃত মন হতে স্বভাবধর্মে তার কোনও তাত্ত্বিক বৈলক্ষণ্য নাই। কেননা এ-মনও অবিদ্যাস্পৃষ্ট, ঋত-চিতের অবিনাভূত বিভাব এ নয়।

শুদ্ধ-সন্মাত্রের এই আরোহ-অবরোহের মাঝে নিশ্চয় কোথাও চিদ্‌বীর্যের একটা অন্তরিক্ষলোক—এমন-কি দিব্য সিসৃক্ষার একটা অনাদি সংবেগ আছে, যার ভিতর দিয়ে বিদ্যামন হতে অবিদ্যামনের সংবৃত্তির ধারা নেমে এসেছে, অতএব যাকে ধরে বিবৃত্তির উজান-বওয়া আবার সম্ভব হবে। নামবার বেলায় এমন-একটা অন্তরিক্ষলোক থাকা যেমন যুক্তিসিদ্ধ, তেমনি ওঠবার বেলাতেও তার প্রয়োজন পদে-পদে। অবশ্য প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামে অন্যোন্যবিচ্ছিন্ন পর্বভেদ অনেক আছে। এই যেমন, অব্যাকৃত শক্তি হতে জেগেছে জড়ের ব্যূহভাব, নিষ্প্রাণ জড় হয়েছে প্রাণে সঞ্জীবিত, অবচেতন বা অবমানস প্রাণ হতে ফুটেছে চেতনা বেদনা ও প্রবৃত্তির লীলা, মূঢ় পশুমন মঞ্জরিত হয়েছে মানুষের মধ্যে যুক্তি ও কল্পনায়—যে শুধু প্রাণের নয়, নিজেরও সাক্ষী ও শাস্তা, এমন-কি অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের সামর্থ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার সচেতন প্রয়াসও তার দুষ্কর নয়। এসব দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন লাফিয়ে চলেছে এক পর্ব হতে আরেক পর্বে। অথচ অতিব্যবহিত দুটি পর্বের মাঝেও আছে রূপান্তরের যে-সূক্ষ্ম-ক্রম, তাতেই পর্বভেদকে অসম্ভব কি অকল্প্য মনে হয় না। তাই অতিমানস ঋত-চিৎ আর অবিদ্যামনের মাঝে ব্যবধান দুস্তর হওয়া সম্ভব নয়।

দুয়ের মাঝে ক্রমভাবনার একটা অন্তরিক্ষলোক অসম্ভব না হলেও, স্বভাবতই কিন্তু তার স্থিতি হবে প্রাকৃত মনের এলাকা ছাড়িয়ে—কেননা ব্যাবহারিক জীবনে আজ পর্যন্ত তার কোনও আভাস আমরা পেয়েছি একথা তো বলতে পারি না। মানুষের চেতনা তার মন দিয়ে সীমিত। তাও মনের তন্ত্রীর সব পর্দা সে চেনে না। মনের তলায় যা অবমানস হয়ে আছে, কিংবা মনোধর্মী হয়েও যা তার অগোচর, স্বচ্ছন্দে তাকে সে অবচেতন বলে মেনে নেয়—এমন-কি নির্ভাঁজ অচেতনা হতেও তার তফাত বোঝে না। তেমনি, যা মনের ওপারে, মানুষের প্রাকৃত অনুভবে তা অতিচেতন—এমন-কি তাকে অনুভবশূন্য ভাবতেও তার দ্বিধা নাই। অথবা তার স্তব্ধ চেতনায় সে যেন অচিতির জ্যোতির্ময় তিমিরগুণ্ঠন। যেমন রং বা সুরের অনুভব মানুষের এতই সঙ্কীর্ণ যে বাঁধা কতকগুলি পর্দার উপরে-নীচে কিছুই ধরতে পারে না, ধরতে গেলে সব তার একসা ঠেকে—তেমনি তার মনের চেতনাও ঘাটবাঁধা, তার দুই প্রান্তে রয়েছে অসামর্থ্যের অবরোধ, তাকে ডিঙিয়ে উপরে ওঠবার কি নীচে নামবার কৌশল সে জানে না। পশু মানুষের সগোত্র এবং চেতনার পর্যায়ে ঠিক তার নীচের ধাপে। অথচ পশুচেতনার সঙ্গে তার যোগাযোগ কত সামান্য। পরিচিত মনোধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না বলেই, পশুর মন বা সত্যকার চেতনা নাই—এমন কথাও বলতে তার বাধে না। মনোময় চেতনার নীচে যে রয়েছে, তাকে সে বাইরে থেকেই দেখতে পায়, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো বা তার মর্মে অনুপ্রবেশ করা তার অসাধ্য। অতিচেতন ভূমিও তেমনি মানুষের কাছে বন্ধ-করা বইএর

মত—তার পাতাগুলি সাদা কি না তা-ই বা কে জানে !...চেতনার উত্তরভূমি সম্পর্কে সচেতন হবার কোনও উপায় নাই, এই কথাই শুরুতে মনে হয়। তা-ই যদি হয়, তবে আরোহের সোপানরূপে তাকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। অতএব বর্তমান মনোময় ভূমিতে এসেই মানুষের প্রগতির ইতি ঘটেছে। তার ঊর্ধ্বমুখী সকল প্রয়াসের 'পরে বিশ্বপ্রকৃতি এইখানেই যবনিকা টেনে দিয়েছে।...

কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি, এ-অবস্থাকে স্বভাবস্থিতি মনে করা আমাদের ভুল। এই প্রাকৃত মনের মধ্যেই আছে কত দিগন্তের হাতছানি, যার আহ্বানে মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, ছুটে যায় কোন্ অজানিতের প্রাচীমূলে। এরাই তো উত্তরভূমির সঙ্গে তার স্বয়ম্ভূ-চেতনার যোগসূত্র—এই তো তার ছায়াতপে ঢাকা দেবযানের পথ।...দেখেছি, মানুষের বোধি জ্ঞানের সাধনের কতখানি জুড়ে আছে। অথচ বোধি তো ওই উত্তরভূমিরই স্বভাবধর্মের প্রকাশ—ঝিলিক হানছে অবিদ্যা-মনের অন্ধকারায়। সত্য বটে, প্রাকৃত বুদ্ধি মাঝখানে পড়ে তার প্রকাশকে আমাদের চেতনায় অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই মানুষের মনো-জগতে বিশুদ্ধ বোধির দেখা পাওয়া এত দুর্ঘট। আমরা যাকে বোধি বলি, তা অপরোক্ষজ্ঞানের একটি স্বচ্ছবিন্দু হলেও দেখতে-না-দেখতে প্রাকৃত মনের সংস্কার তাকে ছেয়ে ফেলে। তাই সে মনোময় বা বুদ্ধিময় অনুভবপিণ্ডে স্বচ্ছ ভাবনার অতিসূক্ষ্ম একটি অঙ্কুররূপে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে লুকিয়ে থাকে। আবার কখনও ফুটতে-না-ফুটতেই বোধির ঝলককে গ্রাস করে দ্রুতবিসর্পী অনুরূপ কোনও মনোবৃত্তি—অন্তর্দৃষ্টি, ক্ষিপ্র অনুভব বা বিদ্যুদ্‌গতি মননের আকারে। আগন্তুক বোধির প্রেতি হতে জন্ম হলেও সে-ই তার গতিরোধ করে, অথবা সত্য-মিথ্যা একটা মনের বিকল্প দিয়ে তার স্বরূপ আচ্ছন্ন করে। এমনিতর মনের বঞ্চনাকে কিছুতেই বোধি বলা চলে না। তবু উপর হতে ওই যে আলোর ঝলক নামে, আমাদের প্রত্যেক মৌলিক চিন্তা অথবা যথাযথ দর্শনের পিছনে থাকে যে আচ্ছন্ন অর্ধচ্ছন্ন বা বিদ্যুচ্চমকের মত স্বপ্রকাশ একটা সম্বুদ্ধ প্রত্যয়, তাহতেই প্রমাণ হয়—মন আর উন্মনী-ভূমির মাঝে একটা সেতু আছে। বোধির ওই ক্ষণদীপ্তিতেই আমাদের সামনে খুলে যায় লোকোত্তরের 'দেবীঃ দ্বারঃ' বা জ্যোতির দুয়ার।...তাছাড়াও মনের মধ্যে অতিস্থিতির একটা প্রয়াস আছে—ব্যষ্টি-অহং-এর সঙ্কোচ কাটিয়ে বিশ্বকে নৈর্ব্যক্তিক একটা সামান্য-প্রত্যয়ের ভিতর দিয়ে দেখার প্রয়াস। নৈর্ব্যক্তিকতা বিশ্বাত্মার 'প্রথম ধর্ম'। যে সর্বগত সামান্যপ্রত্যয়ে একদেশী খণ্ডদৃষ্টির অবচ্ছেদ নাই, তা-ই হল বিরাটের অনুভব ও বিজ্ঞানের স্বধর্ম। অতএব এই বিরাট-স্বভাবের আবেশে সঙ্কুচিত মনের কুঁড়ি ধীরে-ধীরে ফুটতে চাইছে বিরাট-মনের সহস্রদল কমল হয়ে। কে যেন ঠেলছে তাকে উত্তরমানসের কল্পলোকে, দূর হতে ভেসে আসছে অতিচেতন বিশ্বমনের বাঁশির ডাক—যার মধ্যে এই অবরমনেরই স্বরূপজ্যোতির অনব-

গুণ্ঠিত প্রকাশ।...আবার উপর হতেও সংকুচিত মনের 'পরে শক্তির আবেশ নেমে আসে। আমরা যাকে প্রতিভা বলি, সে এই আবেশেরই ফল। অবশ্য প্রতিভার মধ্যে সে-আবেশ প্রচ্ছন্ন থাকে, কেননা এক্ষেত্রে উন্মনীভূমির জ্যোতিকে কাজ করতে হয় সীমার সংকোচ মেনে নিয়ে—মনের বিশেষ-কোনও একটা ভূমিতে। সেখানে তার বিশিষ্ট শক্তি ছন্দোবন্ধ বিবিক্ত কোনও রূপ পায় না, তাই প্রায়ই তার কাজ হয় এলোমেলো এবং খাপছাড়া—একটা অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রমত্ত প্ররোচনায়। শুধু তা-ই নয়, মনের রাজ্যে এসে প্রতিভার আবেশ হয় মনোধাতুর পরবশ এবং অনুরূপ, তাই তার সংকীর্ণ স্তিমিত সংবেগে সহস্রার পরা সংবিতের দিব্যজ্যোতির্ময় সামর্থ্য থাকে না।... তারও পরে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় ঐশী প্রেরণা, অলৌকিক দিব্যদর্শন অথবা প্রাতিভ অনুভব—যারা প্রাকৃতমনের অভাস্বর ও হীনবীর্য বৃত্তিকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায়। কোথা হতে তারা আসে, তা নিয়ে কি কোনও সংশয় আছে ?... পরিশেষে, ভাবক ও অধ্যাত্মচেতার ওই-যে লোকোত্তর অনুভবের অগণিত-বিচিত্র পসরা, তাকে কি কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে ? মানুষের সামনে কোন্ সুদূর অতীত হতে তারা জ্যোতির দুয়ার খুলে রেখেছে, যার ভিতর দিয়ে মর্ত্যচেতনা অশেষের দিগন্তে চলে যেতে পারে বর্তমান সংকোচের বাঁধন ছিঁড়ে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না আমাদের এই জ্যোতিরভিযান—শুধু জিজ্ঞাসার প্রেতিহীন অন্ধসংস্কারের মূঢ়তা কিংবা প্রাকৃতমনের প্রগতিহীন চক্রাবর্তনের দুরাগ্রহ ছাড়া। কিন্তু মানুষের যুগান্তব্যাপী সাধনা লোকোত্তরের কত সম্ভাবিতকে আমাদের ঘরের কাছে নিয়ে এসেছে, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার কত রহস্যের আবরণ উন্মোচিত করেছে আমাদের চেতনায়। ওই অনুত্তর বিজ্ঞানের দিব্য-সম্পদ পূর্বসাধকের সাধনাকে করেছে উত্তরসাধকের গুরু। আমাদের এই এষণায় সে-বিজ্ঞানের অবিকল্পিত বীর্যকে উপেক্ষা করব—এও কি সম্ভব বা সমীচীন ?

চেতনার ঊর্ধ্বভূমিতে উত্তীর্ণ হবার দুটি উপায় আছে। সহজ না হলেও তাদের একেবারে অসাধ্য বলা চলে না। প্রথম উপায় : চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত ক'রে, বহির্মুখ মন আর অধিচেতন অন্তরাত্মার মাঝের আবরণটিকে দীর্ণ করা। এ-কাজটি ধীরে-ধীরে করা যায়—সুকৌশল সাধনায় কিংবা বিপ্লবীর দুর্ধর্ষ প্রবেগ নিয়ে, কখনও-বা হঠধর্মীর অতর্কিত বলাৎকারে। শেষোক্ত পথটি নিরাপদ নয় বলাই বাহুল্য—কেননা অভ্যস্ত সংস্কারের গণ্ডির মধ্যেই মানুষের সঙ্কীর্ণ চিত্ত সুস্থ থাকে, হঠাৎ সে-গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবার বিপদ আছে নিশ্চয়। কিন্তু বিপদ থাকুক আর না থাকুক, গণ্ডি যে ছাড়ানো যায়, তাতে কোনও ভুল নাই। অন্তরাত্মার ওই গহন পুরীতে প্রবেশ করে এক অন্তর-পুরুষকে দেখতে পাই—এক অন্তশ্চর মন, অন্তশ্চর প্রাণ, অন্তশ্চর ভূতসূক্ষ্ম—আমাদের বহিশ্চর মন প্রাণ দেহের চেয়েও যার সামর্থ্য

বিপুল, শক্তি সাবলীল, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বিচিত্র। বিশেষত বিশ্বশক্তির সঙ্গে ভাবে ও কর্মে যোগযুক্ত হবার সহজ সিদ্ধি এই অন্তশ্চেতনার আছে। ব্যষ্টি দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্কোচকে পরিহার করে আত্মব্যাপ্তির নিরঙ্কুশ মহিমায় নিজেকে সে বিশ্বরূপ বলে অনুভব করতে পারে। আত্মপ্রসারণের ফলে বিশ্ব-মন ও বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে সম্যক সাযুজ্য—এমন-কি বিশ্বজড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য-বোধও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।...তবুও এ-সাযুজ্য মূলা অবিদ্যার সাযুজ্য।

এমনি করে অন্তর্লোকে অবগাহন করে দেখি, উন্মনীভূমির জ্যোতির দিকে উন্মীলন ও উত্তরায়ণের একটা সহজ সামর্থ্য অন্তরাত্মার আছে।— এই হল আমাদের অধ্যাত্মযোগের দ্বিতীয় পর্ব। সাধারণত তার ফলে আমরা এক স্থাণু নির্বিকার 'বিভুর্ব্যাপী' শান্ত আত্মার সাক্ষাৎকার পাই, যাঁকে জানি আমাদের অধিষ্ঠানতত্ত্ব ও সর্ববিধ প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি বলে। এইখানে সকল ব্যবহারের উপশমে. এমন-কি আত্মবোধেরও প্রলয়ে এক অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য তত্ত্ব-ভাবেও আমাদের পরিনির্বাণ ঘটতে পারে। কিন্তু এই শান্ত আত্মাকে শুধু আত্মস্বরূপ বলে না জেনে সর্বভূতাত্মভূতাত্মারূপেও উপলব্ধি করা যায়। তখন বিশ্বসত্তার স্বরূপসত্যরূপে আমরা তাঁর লোকোত্তর অনুভব পাই।...ব্যষ্টিভাবের নিঃশেষ পরিনির্বাণে এক কূটস্থ অনুভবের অপ্রকেত নৈঃশব্দ্যে আমরা যেমন নিত্যবিলীন হতে পারি, তেমনি বিশ্বলীলাকে অসঙ্গ পুরুষে অধ্যস্ত জেনে এক বিশ্বাতীত অবিচল অক্ষর-স্থিতিতেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারি।...কিন্তু এছাড়াও অতিপ্রাকৃত অনুভবের আরেকটি ধারা আছে, সর্বনিরোধ যার লক্ষ্য নয়। সে-ধারায় চলতে গিয়ে অনুভব করি, লোকোত্তর ভূমি হতে এক বিশাল জ্যোতিঃপ্রপাত জ্ঞান বীর্য আনন্দ বা অলৌকিক বিভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঝরে পড়ছে আমাদের শান্ত-আত্মার 'পরে। অথচ চিৎস্বরূপের যে লোকোত্তর ধামে তাঁর স্থাণু-স্বভাব এই বৃহৎ জ্যোতির উৎসরূপে স্তব্ধ হয়ে আছে, শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার সেই মহিমাতেও উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের অসম্ভব হয় না।...অনুভবের যে-ধারাই ধরি না কেন, অবিদ্যাচেতনার গণ্ডি ছাড়িয়ে আমরা যে অধ্যাত্ম-চেতনাতেই এমনি করে উত্তীর্ণ হই, একথা অবিসংবাদিত। কিন্তু সর্বনিরোধের বিপরীত যে-প্রচেতনার কথা এইমাত্র বললাম, তারও আবার দুটি ধারা থাকতে পারে। একটিতে চিৎশক্তির উপচীয়মান স্ফুরণকে আমরা অব্যাকৃত সামান্য-স্পন্দরূপে অনুভব করতে পারি। আরেকটি ধারায় রূপান্তরিত মনশ্চেতনা দিয়ে অনুভব করতে পারি চিন্ময় মনের একটা পর্বপরম্পরা। মন অবিদ্যার স্পর্শ হতে নির্মুক্ত হয়ে সেখানে দেখা দেয় শুদ্ধবিদ্যা বা সদ্বিদ্যার সাধনরূপে। এই শুদ্ধবিদ্যাকে অতিমানস না বললেও বলতে পারি তার প্রশাসনে বিধৃত এবং তার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা অলৌকিক ভূমি।

প্রচেতনার সাধনাতেই ঈপ্সিত রহস্যের সন্ধান আমরা পাই—পাই প্রাকৃতমন হতে অতিমানস-রূপান্তরের পথের খবর। দেখি, মনের ওপারে উত্তরায়ণের পথের সোপানমালা ধীরে-ধীরে উঠে গেছে, আর প্রতি পর্বে উপর হতে নেমে আসছে আরও বিপুল আরও গভীর জ্যোতি ও শক্তির নির্ঝর, চেতনার তন্ত্রে-তন্ত্রে তীব্রতর আঘাতে রণিত হচ্ছে মনের উদয়নের ছন্দ অথবা উন্মনীভূমি হতে এই মনের মধ্যে তৎ-স্বরূপের শক্তিপাতের বৈদ্যুতী।...প্রথমে অনুভব করি, কল্লোলিত সমুদ্রের বিপুল প্লাবনে নেমে আসছে এক স্বয়ম্ভূ-জ্ঞানের বন্যা, মননধর্মী হলেও আমাদের অভ্যস্ত মননের সঙ্গে যার কোনও সাদৃশ্য নাই। কারণ এই মননে বস্তুকে খুঁজে-খুঁজে ফেরা নাই, মনগড়া কল্পনার কোনও আভাস নাই, জল্পনা বা কষ্ট করে পাবার এতটুকু আয়াস নাই। এই দিব্য মননে জ্ঞানের ধারা উত্তর-মনের উৎস হতে স্বতো-নিঝরণে ঝরে পড়ে—যার মধ্যে আছে সত্যের সুনিশ্চিত লব্ধি, অন্তর্গূঢ় এবং পরাঙ্‌মুখ তত্ত্বের জন্যে ব্যাকুল এষণা নাই। আরও অনুভব করি, এই দিব্য মননের একটি ক্ষেপে জ্ঞানের বিপুল সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করবার এক অপ্রাকৃত সামর্থ্য আছে, আছে এক ঋতময় বিশ্বরূপ—যা ব্যষ্টি মননের মত সত্যানৃতের মিথুন নয়।...এই ঋতময় মননেরও পরে আছে এক বৃহৎ জ্যোতিঃ—তীব্রসংবেগে উপচিত বীর্য ও অপরাহত প্রেতিতে যা টলমল, এক ঋতময় দর্শনের ভাস্বর মহিমা—মনন যার উদার বক্ষে বীচিবিভঙ্গের লীলা মাত্র। বেদ একে বর্ণনা করেছেন ঋতের সূর্য বলে। বস্তুত সূর্যের উপমা এই ভূমিতে অপরোক্ষ-অনুভবে সত্য হয়ে দেখা দেয়। উত্তর-মনের লীলাকে যদি তুলনা করি তপনদ্যুতির প্রশান্ত প্রভাসের সঙ্গে তাহলে এই জ্যোতির্মনকে বলতে পারি উদ্ভাস্বর আদিত্যমণ্ডলে যেন পুঞ্জিত বিদ্যুতের প্রভাতরল বিচ্ছুরণ।...তারও ওপারে দেখি ঋতম্ভরা চিৎশক্তির এক বিপুলতর বীর্যের প্রকাশ—যেখানে দৃষ্টি অনুভব মনন বেদনা ও কৃতি সমস্তই ঋতময়, এক অন্তরঙ্গ ও অবিকল্পিত প্রত্যয়ে সমস্তই সমুজ্জ্বল। তাকে আমরা নাম দিতে পারি বোধি-মন। বুদ্ধির অতীত অপরোক্ষ অনুভবের সাধনকে আমরা বলেছি 'বোধি'; আমাদের প্রাকৃত প্রাতিভজ্ঞান এই স্বয়ম্ভূবিজ্ঞানের একটা ছন্দোলীলা। এই ঋতম্ভরা ঋতাবরী প্রজ্ঞার অরুণচ্ছটায় দীপ্ত হয়ে অবরমনের মধ্যেও কখনও-কখনও করণহীন সংবিত্তির এক ঝলক ফুটে ওঠে। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই প্রজ্ঞা এক বিপুলতর ঋতজ্যোতির বাহন, যে-জ্যোতির সঙ্গে আমাদের মনের সাক্ষাৎ যোগাযোগ নাই। ...আবার বোধি-মনেরও উৎসমূলে আছে এক অতিচেতন বিরাট মন—অতিমানস ঋতচিতের সঙ্গে যা নিত্যযোগে যুক্ত। সে বিরাট মনই বিশ্বের চিন্ময় মনোধাতু—অতিমানসের অনাদিপুঞ্জিত সংবেগরূপে নিখিল বিশ্বস্পন্দ ও মনোবীর্যের প্রশাস্তা, অন্তহীন সৃষ্টিব্যঞ্জনার সহস্রকিরণে প্রভাস্বর। প্রচলিত মনের সঙ্গে

তার তুলনা হয় না। তবুও তাকে বলতে পারি অধিমানস। রেতোধা অধিপুরুষের মত তার জ্যোতির্বিশাল পক্ষপুটে আবৃত করে রেখেছে সে বিদ্যা-অবিদ্যার এই অপরার্ধ—আবার যুক্ত করেছে তাকে ঋতচিতের বিপুল জ্যোতির্মহিমার সঙ্গে। আমাদের দৃষ্টি হতে পরম সত্যের মুখকে সেইসঙ্গে সে অপিহিত করেছে তার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ দিয়ে—অন্তহীন সম্ভূতির বিপুল ব্যঞ্জনায় রচেছে এক আলোর আড়াল, যা আমাদের তত্ত্বসন্ধানী মনের অধ্যাত্ম-এষণা ও পুরুষার্থ-সাধনার পক্ষে যুগপৎ প্রতিকূল এবং অনুকূল। এই অধিমানসই তাহলে মন ও অতিমানসের মাঝে আমাদের ঈপ্সিত রহস্য-গ্রন্থি। এই অধিমানস শক্তিই পরা বিদ্যা ও বিশ্বগত অবিদ্যার মাঝে যুগপৎ সংযোগ-বিয়োগের সাধন।

অধিমানস অবিদ্যার ক্ষেত্রে অতিমানস চেতনার প্রতিভূ—এই তার স্বভাব ও স্বধর্ম। অথবা এ যেন অতিমানসের সজাতীয় অথচ বিজাতীয় একটা তিরস্করণী, যার ভিতর দিয়ে পরোক্ষে তার ক্রিয়া অবিদ্যার 'পরে সংক্রামিত হতে পারে—নইলে পরজ্যোতির সাক্ষাৎ আবেশ গ্রহণ বা সহন করা তার সম্ভব হয় না। অধিমানসের এই ছটামণ্ডলের বিক্ষেপেই দিব্যজ্যোতির স্তিমিত বিচ্ছুরণে দেখা দিয়েছে অবিদ্যার আলোআঁধারি, দেখা দিয়েছে অচিতির সর্বগ্রাসী অন্ধকারের প্রতীপলীলা। অতিমানস তার সব সত্য অধিমানসে সংক্রামিত করে, কিন্তু তার রূপায়ণের ছন্দে ও বিজ্ঞানে থাকে ঋতময় দৃষ্টির সঙ্গে অবিদ্যার একটা অস্ফুট অথচ সপ্রয়োজন সূচনা। অতিমানস আর অধিমানসের মাঝে সূক্ষ্ম একটা বিভাজনরেখা আছে, যার জন্যে অধিমানসের সকল বিত্ত ও সকল দর্শন অতিমানস হতে স্বচ্ছন্দে সংক্রামিত হয়েও চলার পথে আপনা-হতেই একটু যেন বাঁক ধরে। অতিমানসের মধ্যে আছে বস্তুর স্বরূপসত্যের এক অখণ্ড প্রত্যয়—তার মধ্যে সমষ্টিভাবনার সঙ্গে নিবিষ্ট হয়ে আছে স্বগত-বৈশিষ্ট্যের বিভূতিবিজ্ঞান। তাই ব্যষ্টিভাবনাও সেখানে অন্যোন্যচেতনায় অসংভিন্ন এবং ওতপ্রোত। কিন্তু অধিমানসে সমষ্টিপ্রত্যয়ের এই অখণ্ডতা নাই। অথচ বস্তুর স্বরূপসত্যের জ্ঞান অধিমানসেরও আছে। ব্যষ্টিকে সেও জানে সমষ্টির ভূমিকায়। স্বগতবৈশিষ্ট্যের বিভূতির প্রযোজনাতেও তার অব্যাহত স্বাতন্ত্র্য আছে : কেননা তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান নির্বিশেষ সংবিৎকে ব্যাহত ও পরাভূত করে না। কিন্তু অধ্যাত্মচেতনায় যা অখণ্ড, ক্রিয়াতে তা-ই যেন তার কাছে অখণ্ডচেতনার সাক্ষাৎ শাসন হতে বিচ্যুত হয়—যদিও ওই চেতনার 'পরেই তার ক্রিয়ার নির্ভর। অখণ্ড-অন্বয়ের সম্ভূতিসংবিতে যে বিচিত্র বৈভবের মেলা নিরূঢ় হয়ে আছে, তার অন্তহীন সংযোগ-বিয়োগের নিরঙ্কুশ প্রতিভা হল অধিমানসের তপোবীর্য। এই দিব্যপ্রতিভা অনন্ত বৈভবের প্রত্যেকটিতে সঞ্চারিত করে একটি স্বতন্ত্র প্রেতি এবং তার ফলে একান্ত

স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনায় তারা যেন এক-একটি বিশেষ জগৎ গড়ে তোলে। অতিমানস চেতনায় পুরুষ আর প্রকৃতি একই সত্যের দুটি বিভাব মাত্র। এক অন্বয়তত্ত্বেরই সত্তা ও স্পন্দরূপে তারা অবিনাভূত, অতএব দুয়ের মাঝে কোনও বৈষম্য অথবা অঙ্গাঙ্গিভাব নাই। কিন্তু অধিমানস চেতনায় প্রথম দেখা দিল বিবেকের সুস্পষ্ট বিদাররেখা। সাংখ্যদর্শনে তা-ই পরিণত হল অনপনেয় বিভেদের গভীর ক্ষতে। প্রকৃতি আর পুরুষ সেখানে দুটি স্ব-তন্ত্র তত্ত্ব। পুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও বীর্যকে স্তিমিত ও পরাভূত করে প্রকৃতি তাকে আপন বশে আনতে পারে। তখন পুরুষ তার রূপ-ক্রিয়ার অনীশ্বর সাক্ষী ও গ্রহীতা শুধু। আবার পুরুষও তার বিবিক্ত স্বরূপাবস্থানে ফিরে যেতে পারে, প্রকৃতির অনাদি জড়ত্বের আবরণকে তিরস্কৃত করে সমাহিত থাকতে পারে স্বারাজ্যের স্ব-তন্ত্র মহিমায়। ব্রহ্মের সমস্ত বৈভব সম্পর্কেই এই কথা। এক আর বহু, সগুণ আর নির্গুণ, ক্ষর আর অক্ষর—সকল দ্বন্দ্বই অতিমানসে সু-ষম, কিন্তু অধিমানসে তারা বি-ষমপ্রায়। এক অন্বয়তত্ত্বের বিচিত্র বৈভব হয়েও অধিমানসে তারা পায় সমষ্টির স্ব-তন্ত্র কলারূপে নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার প্রেতি এবং এই বিবিক্ত প্রকাশের চরম পরিণামকে অবিকল্পিত একটা রূপ দেয়। তবু অধিমানসে বিবিক্তভাবের প্রতিষ্ঠা কিন্তু এক অন্তর্গূঢ় পরম-সাম্যের 'পরে। তাই বিভিন্ন বৈভবের মাঝে যত সংযোগ ও প্রস্তারের সম্ভাবনা, যত অন্যোন্যবিনিময় ও ব্যতিষঙ্গের লীলা আছে, তাদের সকলেরই বাস্তব রূপায়ণ সে-ভূমিতে নিরঙ্কুশ।

ব্রহ্মের প্রত্যেকটি বিভূতিকে দেবতা কল্পনা করে বলতে পারি, অধিমানস হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে কোটি-কোটি দেবশক্তি। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা জগৎ সৃষ্টি করবার অধিকার আছে, অথচ প্রত্যেক জগতেরও আছে অপর জগতের সঙ্গে ব্যতিষঙ্গ ও যোগাযোগের সামর্থ্য। বেদে দেবপ্রকৃতির নানারকম বিবৃতি আছে। 'একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এক সৎ, কিন্তু বিপ্রেরা বহু নামে প্রকাশ করেন তাকে, এই হল তার গোড়ার কথা। অথচ, প্রত্যেক দেবতা স্বয়ং যেন সেই সৎ-স্বরূপ, সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে, তিনিই 'বিশ্বে দেবাঃ'—এমন উপাসনাও আছে। তাছাড়া প্রত্যেক দেবতা বিবিক্ত—কখনও তিনি যুগ্মদেবতায় সম্মিলিত, কখনও-বা অপর দেবতার বিরুদ্ধাচারী, এমন কথাও আছে। অতিমানসে এই তিনটি পর্যায় বিধৃত রয়েছে এক অখন্ড সংবিতের সৌষম্যে। কিন্তু অধিমানসে তারা বিবিক্ত, অথবা বিবিক্ত তাদের লীলায়ন। প্রত্যেকের সৃষ্টি ও পরিণামের একটা নিজস্ব ধারা আছে, অথচ সুরসঙ্গতির বৃহৎ সুষমায় সম্মিলিত হবার সামর্থ্যও তাদের আছে।...যেমন তারা এক পরমার্থসতের অন্তহীন সদ্-বিভূতি, তেমনি এক অখন্ডচেতনার অনন্ত চিদ্বিলাসরূপে প্রত্যেকে তারা চলেছে নিগূঢ় বীজভাবের নিরঙ্কুশ

পরিণামের ছন্দে হিল্লোলিত হয়ে। এক অখণ্ড অথচ বিশ্বতোমুখ সম্ভূত-বিজ্ঞানেরই বহুধা-বিকিরণ ঘটছে। তার প্রত্যেকটি রশ্মি একটি স্ব-তন্ত্র বিজ্ঞানশক্তি, যার মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলবার বীর্য আছে। এক অখণ্ড চিৎশক্তি কোটি-কোটি শক্তিধারায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। প্রত্যেক ধারায় যেমন আত্মসম্পূর্তির অব্যাহত অধিকার আছে, তেমনি প্রয়োজন হলে অন্যান্য ধারাকে আপন শাসনে এনে বৈরাজ্যের প্রতিষ্ঠাও সে করতে পারে। .. আবার এক ভূমানন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আনন্দের অনন্ত-বিচিত্র প্রবাহে, যার প্রত্যেক ধারায় রয়েছে স্বারাজ্যের পরিপূর্ণতা কিংবা বৈরাজ্যের পরম সিদ্ধির সংবেগ।...এমনি করে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের মধ্যে অতিমানসের অধিমানস মায়া গুঞ্জরিত করে তোলে অন্তহীন সম্ভূতির সুরমূর্ছনা—যা অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রাগিণীতে অনুরণিত হ'য়ে ওঠে, অথবা এক বিপুল বিশ্বের মহারাগে ঝঙ্কৃত হয়—যে-বিশ্বের বিসৃষ্টি ও প্রবৃত্তি গতি ও পরিণতির মূলে থাকে ওই সম্ভূতিরই অনন্ত-বিচিত্র সুরের লীলা।

শাশ্বত সন্মাত্রের চিৎশক্তি যখন বিশ্ববিধাত্রী, তখন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতিতে ফুটবে সেই মূলা বিদ্যাশক্তির আত্মরূপায়ণের একটি বিশেষ ছন্দ। তেমনি, প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবে চিৎশক্তি যে-ভঙ্গিতে আপনাকে বিভাবিত করবে, জীবের জগৎ-দর্শন ও জীবন-দর্শনও হ'বে তার অনুরূপ। মানুষের মনোময় চেতনা জগৎকে দেখে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কল্পিত বহু-খণ্ডের একটা সঙ্কলন রূপে। সে-সঙ্কলনও আবার একটা সমগ্র সত্তার একদেশ শুধু। এই খণ্ডদর্শন দিয়ে মন যে-ঘর বাঁধে, তার মধ্যে সত্যের একটিমাত্র সামান্যবিভাবের স্থান হতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে আর-সবাইকে ঘরের বাইরে থাকতে হয়। কালে-ভদ্রে আশ্রিত কি অভ্যাগত হিসাবে যদি-বা কারও একটুখানি জায়গা হয়! কিন্তু অধিমানস চেতনায় আছে সমূহের প্রত্যয়, অতএব তার জ্ঞান খণ্ডিত নয়—সংবর্তুল। তাই আপাতভিন্ন বহু মৌলিক দর্শনই তার মধ্যে একটি সহস্রদল দর্শনের সুষমায় সংহত হতে পারে। মনোময় বুদ্ধির কাছে পুরুষ-বিশেষ আর নির্বিশেষের মাঝে অন্যোন্যবিরোধ আছে। তাই নির্বিশেষ সন্মাত্রের মধ্যে পুরুষবিশেষ বা পুরুষবিধতার কল্পনা তার দৃষ্টিতে অবিদ্যার বঞ্চনা বা সাময়িক বিকল্প মাত্র। অথবা পুরুষবিশেষ যদি বিশ্বমূল তত্ত্ব হয় তার কাছে, তাহলে নির্বিশেষকে সে জানে একটা আচ্ছিন্ন মানস-বিকল্প কিংবা বিসৃষ্টির উপাদান বা সাধন ব'লে। কিন্তু অধিমানস বুদ্ধি সেখানে দেখে, পুরুষ-বিশেষ ও নির্বিশেষ একই সন্মাত্রের বিভাজ্য বিভূতি। আত্মপ্রতিষ্ঠায় তারা স্ব-তন্ত্র হতে পারে যেমন, তেমনি তাদের বিভিন্ন ধারার সঙ্গমও ঘটতে পারে। স্বাতন্ত্র্য আর সঙ্গমের এই লীলায় সত্তা ও চেতনার যে বিচিত্র দশা অনুভবে জাগে, তারা কেউ অপ্রমাণ নয়, অথবা তাদের সহচারও অকল্পনীয় নয়।

নির্বিশেষ সত্তা ও চেতনা সত্য এবং সম্ভবপর। কিন্তু শুদ্ধ পুরুষবিশেষের সত্তা ও চেতনাও তা-ই। নির্গুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম অধিমানস চেতনায় অনন্তের সম ও সহচরিত বিভূতি। সগুণভাবকে বিভূতিরূপে গুণীভূত করে যেমন নির্গুণভাবের প্রকাশ হতে পারে, তেমনি সগুণভাবও ফুটতে পারে তত্ত্বরূপে—নির্গুণ তার স্বরূপের তখন একটা দিক মাত্র। চিৎসত্তার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশের দুটি বিভাবই মুখামুখি হয়ে আছে। যেসব তত্ত্ব মনোময় বুদ্ধির বিচারে অন্যোন্যব্যাবৃত্ত, অধিমানস বুদ্ধির দর্শনে তারা ব্যতি-ষক্ত ও সহচরিত। মন যেখানে বৈধর্ম্য দেখে, অধিমানস সেখানে দেখে আপূরণ। মন দেখে, অন্ন হতে জাত হয়ে অন্নেই সঞ্জীবিত সব, আবার অন্নে সবার লয়। তাই সে সিদ্ধান্ত করে, অন্নই শাশ্বত তত্ত্ব, অন্নই ব্রহ্ম। অথবা দেখে, প্রাণ কিংবা মন হতে জাত হয়ে প্রাণ বা মন দ্বারা সঞ্জীবিত সবাই, আবার বিশ্বপ্রাণ বা বিরাট মনে সবার লয়। তাই তার ধারণা হয়, এক বিশ্বম্ভর প্রাণশক্তি অথবা বিরাট মন বা শব্দব্রহ্ম হতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের বিসৃষ্টি। আবার যখন দেখে, সম্ভূতবিজ্ঞান কি চিৎস্বরূপের কবিক্রতু অথবা চিৎস্বরূপই জগতের আদিস্থিতি ও অবসান, তখন বিশ্বকে সে ধারণা করে বিজ্ঞানময় বা চিন্ময় বলে। এসব দর্শ-নের যে-কোনও একটি একান্ত হয়ে উঠতে পারে মনের কাছে, কিন্তু তার স্বাভা-বিক বিভজ্যদৃষ্টি একটিকে আঁকড়ে ধরলে পর আর-সবাইকে ছেঁটে দেয়। অথচ অধিমানস চেতনা দেখে, মূলভাবের অনুগত প্রত্যয়রূপে প্রত্যেকটি দর্শন সত্য। যেমন অন্নময় জগৎ আছে, তেমনি আছে প্রাণময় মনোময় এবং চিন্ময় জগৎ। আপন-আপন জগতে প্রত্যেক তত্ত্বই যেমন স্ব-তন্ত্র, তেমনি সবার সমাবেশেও তারা একটা নতুন জগৎ গড়তে পারে। এই মর্ত্যলীলায় চিন্ময়ী মহাশক্তির আত্মরূপায়ণের যে-ছন্দ ফুটেছে, তার প্রকাশ অচিতির আপাত-প্রতিভাসে—যার মধ্যে এক পরম চিৎসত্তা অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে। সত্তার সকল বিভূতি গোপন আছে ওই অচিৎ রহস্য-যবনিকার অন্তরালে। তাই তো অন্নময় বিশ্বে ফুটছে প্রাণ, মন, অধিমানস, অতিমানস ও সচ্চিদানন্দ—পর-বিভূতি অবর-বিভূতিকে আত্মসাৎ করছে প্রকাশের সাধনরূপে। তাই তো অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শাশ্বত কাল ধরে অন্নও চিদ্‌বিভূতি। অধিমানস দৃষ্টিতে চিৎশক্তির এই আত্মরূপায়ণের মধ্যে কোনও অপ্রাকৃত দুর্বোধ রহস্যময় পরিকল্পনা নাই। অধিমানসে যে ক্রতু ও সিসৃক্ষার প্রবর্তনা নিহিত রয়েছে, তার সামর্থ্যবশত সন্মাত্রের বহুবিচিত্র সম্ভাবনাকে যেমন সে পৃথক-পৃথক মর্যাদা দিয়ে রূপায়িত করে তোলে, তেমনি যুগপৎ অথচ বহুধা-বিকল্পনায় তাদের সমন্বয়কেও সে ছন্দিত করে। তাই তার শিল্পমায়ায় অখণ্ডসত্তার শুভ্রজ্যোতিতে দেখা দেয় অপরূপ এক ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা।

এমনি করে স্ব-তন্ত্র অথবা ব্যূহিত বহুবিচিত্র বিভূতির যুগপৎ বিভা-

বনাতেও অধিমানসের মধ্যে দেখা দেয় না—অন্তত এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি কোনও নির্ঋতি বা সংঘাত, ঋত এবং প্রজ্ঞা হতে কোনও অবস্খলন। অধিমানস সৃষ্টি করে সত্যকেই--বিভ্রম বা অনৃতকে নয়। তার একাগ্র তপস্যায় ও স্ব-তন্ত্র প্রবৃত্তির প্রমুক্ত ঋতায়নে রূপায়িত হয় সচ্চিদানন্দের কোনও সত্য বিভাব বীর্য বিজ্ঞান ও আনন্দ, এবং সে-স্বাতন্ত্র্যে দেখা দেয় তত্ত্বের সত্য পরিণাম। সে-পরিণামে কোনও অন্যোন্যব্যাবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা নাই, যাতে একটি বিভাবকে পরমসত্য মেনে আর-সকল বিভাবকে অবরসত্য জ্ঞানে নিরাকৃত করা হবে। অধিমানসভূমিতে প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতাকে জানেন ও মানেন, কোনও ভাবই কোনও ভাবের প্রতিকূল কি প্রতিষেধক নয়, প্রত্যেক শক্তিলীলাতে অপর শক্তির সত্য ও পরিণামের স্থান আছে, বিবিক্ত আত্মসম্পূর্তি বা বিবিক্ত অনুভবের কোনও আনন্দরূপই আনন্দের অন্য রূপকে ব্যাহত কি লাঞ্ছিত করে না। অধিমানস চেতনা বিশ্বসত্যেরই প্রকাশ, তাই তার মর্মে-মর্মে এক বিপুল অকুণ্ঠ ঔদার্যের ছন্দোদোলা। তার বিভাবনার তপস্যা যেমন সর্ব-তন্ত্র, তেমনি স্ব-তন্ত্র। সে যেন অতিমানসের একটা অবর কল্প, যদিও নির্বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে তার মুখ্য কারবার নয়। পরমার্থসতের অর্থক্রিয়াকারী সত্যবিভূতি অথবা শক্তির স্ফুরত্তা নিয়েই তার ব্যাপার। তাই নির্বিশেষ তত্ত্ব তার মধ্যে আ-ভাসিত হয় সিসৃক্ষা এবং অর্থক্রিয়ার জনকরূপে। এইজন্যে তার সম্ভূতি-সংবিৎকে অভঙ্গ না বলে বরং বলা চলে সংবর্তুল, কেননা তার সমষ্টিভাব বহু পিণ্ডের একটা পরিমণ্ডল কিংবা একাধিক বিবিক্ত স্ব-তন্ত্র তত্ত্বের একটা সমাহার বা সমাবেশ। অখণ্ডভাবকে যদিও সে বিশ্বের মর্মসত্য ও অধিষ্ঠান বলে মানে, নিখিল বিসৃষ্টিতে যদিও সে দেখে অখণ্ডভাবের পরিব্যাপ্তি, তবু অতিমানসের মত তাকে বিশ্বের মর্মচর নিত্যরহস্য ও অন্তর্যামী আধাররূপে, তার স্বভাব ও স্বধর্মের বৈচিত্র্যে বৃহৎসামের চিরন্তন উদ্গাতারূপে অনুভব করে না।

অধিমানস চেতনা সংবর্তুল। কিন্তু আমাদের মনোময় চেতনা বিবিক্ত-দর্শী বলে সামান্যজ্ঞান তার কাছে আচ্ছন্ন। দুয়ের তফাত স্পষ্ট চোখে পড়ে, যদি বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে অধিমানসের রায়কে তুলনা করি প্রাকৃত মনের রায়ের সঙ্গে। এই যেমন : অধিমানসের কাছে সকল ধর্মই সত্য, কেননা তারা এক শাশ্বত ধর্মের পরিণাম; সকল দর্শনই প্রামাণিক, কেননা আপন-আপন ভূমি হতে তারা একই বিশ্বের সত্য দর্শন; রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত নীতি ও রীতি এক বিজ্ঞানশক্তির ন্যায্য বিধান, অতএব প্রকৃতির তপস্যার একটা বিশেষ দিক হিসাবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত হবার অধিকার নিশ্চয় তাদের আছে। কিন্তু আমাদের খণ্ডদর্শী চেতনায় ঔদার্য এবং বিশ্বজনীনতার ভাবনা কচিৎ ফোটে। তাই এই ভাববৈচিত্র্যের মধ্যে সে দেখে শুধু অন্যোন্যবিরোধ। তার দৃষ্টিতে একটি ভাব সত্য হলে আর-সব ভাব মিথ্যা এবং প্রমাদগ্রস্ত। অতএব

একমাত্র সত্য হয়ে বাঁচতে গিয়ে আর-সব ভাবকে খণ্ডিত ও বিধ্বস্ত করতে সে বাধ্য—নিদানপক্ষে মানতে হবে, ওই একটি ভাব মুখ্যসত্য, আর-সব গৌণসত্য। মনোময় চেতনার দৃষ্টিতে প্রত্যেকেরই আত্মপ্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষের এমন দাবি আছে। কিন্তু অধিমানস বুদ্ধি কখনও এই একাঙ্গী দর্শনে সায় দেবে না। সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যষ্টির সকল বিভাবকে অপক্ষপাতে সে স্থান দেবে, প্রত্যেককে সমষ্টির অঙ্গরূপে আপন-আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমাদের মধ্যে চেতনা অবিদ্যার খণ্ডভাবনার রাজ্যে নেমে এসেছে। তাই আমরা বহুধা-ব্যাকৃতির আকৃতিতে স্পন্দমান সত্যের অনন্ত বা বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্ররূপ দেখতে পাই না। এইজন্যে একের অস্তিত্ব মানতে গিয়ে আমাদের যুক্তিতে অপরের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কেননা বিজাতীয় বা ভিন্নধর্মাক্রান্ত দুটি বস্তুকে যুগপৎ সত্য ও সমঞ্জস বলে স্বীকার করা মনের সহজ ধর্ম নয়। একটা অখণ্ড-উদার সম্ভূতিসংবিতের দিকে ভাবনার সহায়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া মনোময় চেতনার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাকে কর্মে ও জীবনে রূপ দেওয়া বলতে গেলে তার অসাধ্য। যে পরিণামী মন ব্যষ্টি আধারে অথবা ব্যূহের মধ্যে ফুটেছে, দৃষ্টি ও কৃতির বহুমুখী ধারাকে সে দিকে-দিকে ছড়িয়ে দেয়। তারা তখন চলতে থাকে কখনও পাশাপাশি হয়ে, কখনও ঠেলাঠেলি ক'রে, কখনও-বা খানিকটা মিলে-মিশে। তাদের বাছাই করে মন একটা সুরের স্তবক রচতে পারে, কিন্তু অখণ্ড সত্যের বৃহৎসামে পৌঁছতে কোনমতেই পারে না। অবিদ্যাপরিণামের মধ্যেও বিশ্বমনের আছে বিপুল সৌষম্যের একটা মূর্ছনা—সংবাদী-বিবাদীর সুকৌশল প্রস্তারে যা মনোরম। তার মধ্যে আছে অখণ্ডের এক অন্তর্গূঢ় লীলায়ন। কিন্তু এসবের পরিপূর্ণ মহিমা তার গভীর গহনে প্রচ্ছন্ন থাকে—হয়তো অতিমানস-অধিমানসের কোনও সন্ধিভূমিতে। পরিণম্যমান প্রাকৃতমনে আজও তাদের বীর্য সঞ্চারিত হয়নি, রহস্যসমুদ্রের মন্থনে আজও মূর্তিমতী সিদ্ধিরূপিণী কমলার আবির্ভাব ঘটেনি। অধিমানস জগৎ হল সৌষম্যের জগৎ। কিন্তু যে অবিদ্যার জগতে আমরা আছি, বৈষম্য আর সংঘাতই সেখানে করাল হয়ে উঠেছে।

অথচ এই অধিমানসের মধ্যেই মায়ার আদিরূপটি স্পষ্ট দেখতে পাই। এ-মায়া বিদ্যামায়া—অবিদ্যামায়া নয়। তবু অবিদ্যা শুধু সম্ভাবিত নয়, অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই মায়ার ব্যাপ্রিয়ায়। কারণ অধিমানসের তপস্যায়, বিশ্বের প্রত্যেকটি তত্ত্ব যদি স্ব-তন্ত্র ধারায় প্রবর্তিত হয় এবং স্ব-তন্ত্ররূপেই তাদের পূর্ণ পরিণাম সিদ্ধ হয়, তাহলে সেইসঙ্গে ভেদভাবের বিভাবনাও পূর্ণ এবং অব্যাহত হবে, অতএব তার পরিণামও নিশ্চয় চরমে পৌঁছবে। এই হল প্রকৃতির অবসর্পিণী ধারা। খণ্ডভাবকে একবার স্বীকার করলে এই ধারা ধরে চেতনা অবশেষে অবগাহন করে জড়ময় অচিতিতে—ঋগ্বেদের ভাষায় 'সেই

অপ্রকেত সলিলে যেখানে তুচ্ছ্য অর্থাৎ অন্তহীন অণুবিভাজন দ্বারা অপিহিত রয়েছে সব-কিছু' (১০।১২৯।৩)। অখণ্ড যদিও-বা আপন মহিমায় এই 'তুচ্ছ্য' হতে প্রজাত হন, তবুও তাঁর রূপ খণ্ডিত-বিবিক্ত সত্তা ও চেতনার কঞ্চুকে প্রথমত আবৃত থাকে। এই খণ্ডভাবের আবরণ আমাদের অপরা প্রকৃতি, এরই মধ্যে ব্যষ্টিকে জুড়ে-জুড়ে আমরা সমষ্টিতে পেঁছই। অতি মন্থর ও দুশ্চর এই উন্মেষের তপস্যা, যার মধ্যে মনে হয় 'সংগ্রামই বিশ্বের জনক'—হিরাক্লিটাসের এই উক্তিই বুঝি সত্য। স্পষ্ট দেখছি, প্রাকৃতভূমিতে প্রতিটি ভাব শক্তি বিবিক্তচেতনা ও জীবসত্ত্ব আত্ম-অবিদ্যার প্ররোচনাতেই অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। অখণ্ড রাগিণীর সাধনায় নয়, উগ্র স্ব-তন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারাই তারা খোঁজে আপন পুষ্টি এবং উপচয়। অথচ এই অবিদ্যার গহনে অন্তর্গূঢ় হ'য়ে আছে অখণ্ডের অজানা আবেশ, যা অবিরাম আমাদের প্রচোদিত ক'রে সৌষম্য ও অন্যোন্যনির্ভরের অস্পষ্ট-মন্থর সাধনার অভিমুখে—অসামের মধ্যে সামের, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের দুশ্চর তপস্যার প্রেতি আনে। কিন্তু ঐক্য ও সৌষম্যের এ-সাধনা তবেই সার্থক হতে পারে, যদি আমাদের মধ্যে বিশ্বসত্যের নিগূঢ় অতিচেতন বীর্যের উন্মেষ ঘটে, যদি পরমার্থসতের অখণ্ডৈকরস প্রত্যয় জাগে। ওই দিব্য অভিনিবেশের ফলে সত্তার অণুতে-অণুতে, তার আত্মরূপায়ণের তন্ত্রে-তন্ত্রে ঝঙ্কৃত হবে জ্যোতিষ্টোমের অমর মূর্ছনা। সে-সামসাধনা অসম্যক প্রয়াস, অপূর্ব কৃতি এবং নিয়তচঞ্চল প্রায়িক সিদ্ধির বৈকল্যে পরাহত হবে না। চিন্ময় মনের ঊর্ধ্বভূমি হতে এই আধারে ও চেতনায় নেমে আসবে অলকনন্দার দিব্যধারা, তারও ওপারে রয়েছে যা গুহাহিত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটবে আমাদের মধ্যে। তবেই-না বিশ্বলীলায় আমাদের এই অবতরণ দিব্য জন্মে ও দিব্য কর্মে সার্থক হবে।

অবসর্পিণী ধারা ধরে অধিমানস পেঁছয় এসে বিশ্ব-সত্য আর বিশ্ব-অবিদ্যার সঙ্গমরেখায়। এইখানে চিৎ-শক্তি অধিমানসের প্রত্যেকটি স্ব-তন্ত্র প্রবর্তনার মধ্যে বিবিক্ত-চেতনাকেই একান্ত করে তোলে—তাদের অন্তর্নিহিত অভেদচেতনা থাকে প্রচ্ছন্ন অথবা স্তিমিত। আর তার ফলে, অন্যব্যাবৃত্ত একাগ্র অভিনিবেশ দ্বারা অধিমানসের উৎসমূল হতে মানসকে বিচ্ছিন্ন করা তার সম্ভব হয়। এমন-একটা বিচ্ছেদ অধিমানস আর অতিমানসের মাঝে পূর্বেই ঘটেছে, কিন্তু তবুও সে যেন ছিল একটা আলোর আড়াল। অতএব অতিমানস হতে অধিমানসে সচেতন ভাবসংক্রমণের কোনও বাধা ছিল না—দুয়ের একটা জ্যোতির্ময় সাজাত্যবোধও ছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু এবার অধিমানস আর মানসের মাঝে দেখা দিল অস্বচ্ছ একটা যবনিকা। সুতরাং মনের মধ্যে অধিমানস প্রেতির সঞ্চরণও রহস্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হল। আপাতবিচ্ছিন্ন মানস তাই যেন স্বাতন্ত্র্যের একটা অভিমান নিয়ে চলে। তাই প্রত্যেক মনোময়

জীবে. মনের প্রত্যেক মূল ভাব শক্তি ও সংবেগে ফুটে ওঠে একটা বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বিভাবনা। অপরের সঙ্গে কখনও তার যোগাযোগ সম্মেলন বা সন্নিকর্ষ ঘটলেও, তার মধ্যে অদ্বৈতবাসিত অধিমানস প্রবৃত্তির বিশ্বতোমুখ ঔদার্য থাকে না। তাই সেখানে স্ব-তন্ত্র কতগুলি অবয়বের সংকলনে দেখা দেয় কৃত্রিম বিবিক্ত একটা অবয়বী মাত্র। মানসের এই প্রবৃত্তিকে ধরে বিশ্ব-সত্য হতে আমরা নেমে আসি বিশ্ব-অবিদ্যায়। অবশ্য বিশ্বমানস এই ভূমিতেও স্বগত অখণ্ডভাবের উদার অনুভব পায়—কিন্তু চিৎস্বরূপই যে তার উৎস এবং প্রতিষ্ঠা, এ-সংবিৎ আচ্ছন্ন থাকে। অথবা বৌদ্ধ চেতনার সামান্য-প্রত্যয় দ্বারা এ-তত্ত্বকে অনুভব করলেও ধ্রুবা স্মৃতিতে তাকে সে ধরে রাখে না। নিরঙ্কুশ আত্মকর্তৃত্বের অভিমান নিয়ে তার কাজ চলে। কর্মের উপকরণকে সে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করে—যে-উৎস হতে তারা উৎসারিত, তার সঙ্গে তার কোনও যোগযুক্তি থাকে না। মানসের বৃত্তিগুলিতেও পরস্পরের সম্পর্কে এবং সমষ্টি বিশ্বের সম্পর্কে এমনিতর অজ্ঞান থাকে—শুধু পরোক্ষ সন্নিকর্ষ ও যোগাযোগের ফলে ফুটে ওঠে জ্ঞানের একটুখানি আভাস। কিন্তু তাদের মধ্যে তাদাত্ম্যবোধের মৌল প্রত্যয় থাকে না, অতএব অন্যোন্যসঙ্গমজনিত সামরস্যের অনুভবও আর জাগে না। এমনি করে অবিদ্যার আঁধারেই চলে মনের তপস্যা। যদিও তার মূলে একটা প্রদীপ্ত বিজ্ঞানের প্রেতি আছে, তবুও সে-বিজ্ঞান খণ্ডিত—কেননা সে যেমন সত্য ও সম্যক্ আত্মজ্ঞান নয়, তেমনি সত্য ও সম্যক্ জগৎ-জ্ঞানও নয়। এই খণ্ডবোধ সঞ্চারিত হয় প্রাণের রজঃশক্তিতে ও সূক্ষ্মভূতের তমঃশক্তিতে এবং পরিশেষে ফুটে ওঠে স্থূল জড়বিশ্বের মধ্যে—যার উদ্ভব অচিতির বুকে চিতিশক্তির চরম নিগূহনে।

অথচ আমাদের অধিচেতন বা আন্তর মনের মত মানসভূমিতেও আছে যোগাযোগ ও ব্যতিষঙ্গের একটা বিপুলতর সামর্থ্য, মানস- ও ইন্দ্রিয়-সংবেদনের আরও প্রমুক্ত একটা স্বাচ্ছন্দ্য—যা প্রাকৃতমনের অগোচর। তাই অবিদ্যার প্রভাব এই মানসের 'পরে এখনও অখণ্ড নয়। সৌষম্যের একটা সচেতন সাধনা, ঋতময় সম্বন্ধের একটা অন্যোন্যসংসৃষ্ট যোগযুক্তি এখনও অসম্ভব নয়। প্রাণ-সংবেগের অন্ধ প্রমত্ততা কি জড়ত্বের অসাড়তা এখনও মনকে আচ্ছন্ন করেনি। এই মানসভূমিকে অবিদ্যার ভূমি বললেও অনৃত বা প্রমাদের ভূমি বলা চলে না—অন্তত অনৃত- বা প্রমাদ-গ্রস্ত হওয়া এখনও তার পক্ষে অপরিহার্য নয়। অবিদ্যা এখানে চেতনায় সংকোচ এনেছে, কিন্তু বিপর্যয় ঘটায়নি। একদেশী সত্যের সমাহারে জ্ঞান সীমিত ও সঙ্কুচিত হলেও তার মধ্যে সত্যের প্রতিষেধ বা ব্যভিচার নাই। বিবিক্তধর্মী জ্ঞানের ভিত্তিতে একদেশী সত্যের এমন সমাহার প্রাণ ও সূক্ষ্মভূতের লোকেও আছে, কেননা চিৎশক্তির যে অন্যব্যাবৃত্ত অভিনিবেশ হতে এই বিবিক্ত প্রবৃত্তির সৃষ্টি, তা

এখনও প্রাণ হতে মনকে অথবা জড় হতে প্রাণ ও মনকে বিচ্ছিন্ন বা আচ্ছন্ন করেনি। পূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দেয় অচিতির পূর্ণ অধিকারে, সেই 'তমোগূঢ় অপ্রকেত সলিল' হতে উদ্ভূত হয় অবিদ্যাশবল আমাদের এই জগৎ। সংবৃত্তির ধাপে-ধাপে এমনি করে নেমে এসেছে যে চেতনভূমির পরম্পরা, বস্তুত তারা চিন্ময়ী মহাশক্তিরই বিসৃষ্টি। প্রত্যেক ভূমিতে একটা আত্মকেন্দ্রিকতা আছে, আছে আপন-আপন বীজভাবের অনুবর্তন। মন প্রাণ বা জড় প্রত্যেক ভূমির মুখ্য তত্ত্ব যাই হ'ক না কেন, সে-ই আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে কাজ করে যায়। তবু তার কৃতি স্বরূপসত্যের বিসৃষ্টি—সে বিভ্রম নয়, সত্যানৃতের মিথুন বা বিদ্যা-অবিদ্যার সঙ্কর নয়। কিন্তু শক্তি ও রূপের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে চিৎশক্তি যখন চিৎ হতে শক্তিকে আপাত-বিচ্ছিন্ন করে, অথবা রূপ ও শক্তির বুকে আত্মহারা অন্ধ নিষুপ্তির ফলে চৈতন্যকে গ্রস্ত করে—তখন বহু আয়াসে সেই চৈতন্যকে তার স্বাধিকার ফিরে পেতে হয় খণ্ড-পরিণামের ত্রুটিত ধারা ধরে, যার মধ্যে প্রমাদ হয় নিয়তিকৃত, আর অনৃত হয় অপরিহার্য। তবুও তারা অনাদি অসতের বুকে মঞ্জরিত বিভ্রমের মরীচিকা নয়। বরং বলব, অচিতি হতে বিসৃষ্ট জগতের অভিব্যক্তিতে তারা ঋতের অপরিহার্য বিধান। কারণ, তত্ত্বত অবিদ্যা তো অচিতির অনাদি-গুণ্ঠন মোচন ক'রে পাওয়া-না-পাওয়ার দোলায় দুলে বিদ্যা-শক্তির আপনাকে ফিরে পাবার একটা নিরন্তর প্রয়াস। তাই অবিদ্যার পরিণামও স্বভাবচ্যুতির সত্য পরিণাম এবং বলতে গেলে স্বভাবসিদ্ধির সত্য সাধনাও চলে ওই পথ ধরেই। সৎ যেন গ্রস্ত হল অসতের মধ্যে, চিতি আপাত-অচিতির মধ্যে, স্বরূপের আনন্দ বিশ্বব্যাপ্ত এক বিপুল অসাড়তার মধ্যে—এই হল স্বরূপ-চ্যুতির প্রথম ফল। কিন্তু অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রেরণায় এই অ-ভাবের তমিস্রাকে বিদীর্ণ করে ফুটল ভাবের রশ্মিরেখা, সান্ধ্যচেতনার দ্বন্দ্ব নিয়ে দেখা দিল অপূর্ণ আদিম প্রকাশ। চৈতন্য খণ্ডিত হল প্রমা এবং অপ্রমায়, সত্যে এবং প্রমাদে। অখণ্ড সত্তার মধ্যে এল জীবন আর মরণের পর্যায়। আনন্দ বিধুর হল সুখ-দুঃখের বেদনায়। নিজেকে ফিরে পাবার দুশ্চর তপস্যায় এই দ্বন্দ্ব অপরিহার্য—কেননা অচিতির কবলিত থেকেই সত্য জ্ঞান আনন্দ ও অবিনাশী সদ্-ভাবের নিরঞ্জন অনুভব পাবার কল্পনায় একটা স্বতোবিরোধ আছে। বিশ্বপরিণামে প্রত্যেক জীব যদি চৈত্যসত্তার নিগূঢ় প্রেতিতে এবং প্রকৃতির মর্মনিলীন অতিমানসের অলক্ষ্য প্রবর্তনায় স্বচ্ছন্দ হয়ে সাড়া দিত, তাহলেই বর্তমান অবস্থার বিপর্যয় সম্ভব ছিল। কিন্তু এইখানে দেখা দেয় অধিমানসের বিধান—প্রত্যেক শক্তিলীলার মধ্যে আপন বীজভাবকে ফুটিয়ে তোলবার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যরূপে। অতএব অচিতি ও খণ্ডচেতনা যে-জগতের মূলতত্ত্ব, তার মধ্যে স্বভাবতই স্ফুরিত হবে তমঃশক্তির

স্বাতন্ত্র্য। অবিদ্যা তার আধার, অতএব অবিদ্যাকে সে জিইয়ে রাখতে চাইবে। অথচ স্বভাবের বশে সে-জগতে দেখা দেবে—জানবার-বোঝবার অবুঝ আয়াস হতে অনৃত ও প্রমাদ, বেঁচে থাকবার অন্ধ আকূতি হতে অন্যায় ও অনর্থের বিক্ষোভ, স্বার্থোন্মথিত ভোগলিপ্সা হতে সুখ-দুঃখ-সন্তাপের খন্ডলীলা। কিন্তু এই দেবাসুরের দ্বন্দ্ব বিশ্বপরিণামের একমাত্র তাৎপর্য নয়—এ তার উদয়নের অপরিহার্য আদিকান্ড মাত্র। জানি, অসৎ সতেরই সংবৃত্ত রূপায়ণ, অচিতি কিছুই নয় নিগূঢ় চিতিশক্তি ছাড়া, অসাড়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে আনন্দের অন্তঃশীল সংবেগ। অতএব এসব গুহাহিত সত্যের উন্মেষকেও ধ্রুব বলে জানি। তমোগূঢ় আনন্ত্য হতে বিসৃষ্টির এই প্রতীপ-লীলার মধ্যেই একদিন ফুটবে অধিমানস ও অতিমানসের ষোড়শকল মহিমা।

এই পরম সিদ্ধির পক্ষে দুদিক দিয়ে প্রকৃতি আমাদের অনুকূল। প্রথমত, অধিমানস অবরোহক্রমে জড়সৃষ্টির দিকে নেমে আসবার সময়ে নিজেরই এক-একটা পর্যায় গড়ে তুলেছে : যেমন বিশেষ করে বোধি-মানস—যার ঋতম্ভরা বৈদ্যুতীর তীক্ষ্ন দীপ্তি উদ্ভাসিত চেতনার বিপুল প্রসারে কত-যে অজানার মণিবিন্দু ঝিকিয়ে তোলে। এমনি করে অধিমানসের কত-না পর্যায় নিগূঢ় সত্যের এক-এক ঝলক ফুটিয়ে তোলে আমাদের হৃদয়ে।...উন্মেষিত অন্তরের অনুভাবে বিস্ফারিত বহিঃসত্তায় চেতনার ঊর্ধ্বলোক হতে নেমে আসে অনাহত বাণীর গুঞ্জরন। তখন ওই অধিমানস সম্পদের অনুশীলনে চিন্ময় দিব্যধামে আমরা সম্বুদ্ধ এবং অধিমানস নবজাতকরূপে আবির্ভূত হতে পারি—যার মধ্যে প্রাকৃত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংবিতের কুণ্ঠা নাই, যার চেতনা সম্ভূতি-সংবিতের উদার সামর্থ্যে সত্যের সত্তুতনুর অপরোক্ষ স্পর্শে রোমাঞ্চিত। বস্তুত পরম পরার্ধ হতে প্রজ্ঞার প্রভাস বারবার ঝিলিক দিয়ে যায় আমাদের মধ্যে, কিন্তু তার চকিত দীপ্তি হয় অপরিসর, অনিয়ত, স্তিমিত। আত্মার কুণ্ঠাকে পরাহত ক'রে তার সারূপ্য লাভ করা, এই আধারের সহজ প্রবৃত্তিতে লোকোত্তর সত্যবীর্যের স্বাধিকারকে ফিরে পাওয়া—এ-সাধনায় এখনও আমাদের সিদ্ধিলাভ হয়নি। কিন্তু সে-সিদ্ধির পক্ষে প্রকৃতির দ্বিতীয় আনুকূল্য এই : বোধিমানস, অধিমানস, এমন-কি অতিমানসও অন্তর্গূঢ় ও সংবৃত্ত হয়ে আছে আমাদের নিয়তিকৃত পরিণামের আধাররূপী অচিতির মধ্যে। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বমন বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বজড়ের পরিস্পন্দনে তাদের নিগূঢ় স্থিতি সহজ উন্মেষের বিদ্যুৎঝলকে বারবার ফুটিয়ে তুলছে গূঢ়তপা আত্ম-স্ফুরণের অবন্ধ্য পরিচয়। সত্য বটে, আজও তাদের তপস্যা প্রচ্ছন্ন, প্রাকৃত মন-প্রাণ-জড়ের আধারে আজও তাদের প্রকাশ কুণ্ঠিত ও বিকৃত। এ-জগৎ আজও অতিমানসের সাক্ষাৎ বিসৃষ্টি নয়—কেননা তাহলে অচিতি এবং অবিদ্যার আবির্ভাবই অসম্ভব হত, অথবা প্রকৃতিপরিণামের অপরিহার্য

মন্থরতার স্থানে দেখা দিত রূপান্তরের বিদ্যুৎবিসর্প। ব্যক্তি অথবা জাতির জীবনের যুগসন্ধিতে কখনও-কখনও আমরা তার আভাস পাই। তবুও জড়শক্তির লীলায়নে পদে-পদে যে ধ্রুব নিয়তির সন্ধান পাই, সেও অতিমানস সিসৃক্ষার বিভূতি। প্রাণ ও মনের কত বিচিত্র আকৃতি, অফুরন্ত সম্ভাবনা, অকল্পনীয় সমাহার—এও তো অধিমানসের লীলা। প্রাণ ও মন যেমন জড়ের গহন হতে ছাড়া পেয়েছে, তেমনি মনের গহন হতে নিগূঢ় দিব্যভাবের এইসব বিপুল বীর্যের স্ফুরণ হবে এবং দ্যুলোক হতে এই পার্থিব চেতনাতেই ঘটবে তাদের স্বরূপে অবতরণ।

অতএব এই মর্ত্য আধারেই অমর দিব্য-জীবনের উন্মেষে সার্থক হবে আমাদের বর্তমান অবিদ্যাজীবনের প্রমুক্তি ও উত্তরায়ণের সাধনা। এ যে সম্ভব শুধু তা-ই নয়—মহাপ্রকৃতির ঊর্ধ্ব-পরিণামী তপশ্চর্যার এই তো অপরিহার্য নিয়তি ও পরম সিদ্ধি।

প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যা ও অবিদ্যা—

চিন্ময় পরিণাম

পূর্বার্ধ

অনন্ত চেতনা এবং অবিদ্যা

অব্যাকৃত বিশ্বব্যাকৃতি এবং অনির্দেশ্য

অদৃষ্টমব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। ...স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ৭

যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়ই যাঁর সার, প্রপঞ্চের উপশম যাঁর মধ্যে—সেই শান্ত বিশ্বরূপই আত্মা; চাই তাঁরই বিজ্ঞান।

—মাণ্ডূক্য উপনিষদ (৭)

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্ আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনম্ অন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

গীতা ২।২৯

আশ্চর্যবৎ দেখে কেউ এ'কে, আশ্চর্যবৎ বলে তেমনি অপরে; আশ্চর্যবৎ এ'কে শোনেও আবার—তবু এ'কে জানে না কেউ!

—গীতা (২।২৯)

যে ত্বক্ষরম্ অনির্দেশ্যম্ অব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্॥
...সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

গীতা ১২।৩-৪

অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, সর্বত্রগ ধ্রুব অক্ষরের উপাসনা করে যারা সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্বভূতহিতে রত হয়ে, তারা পায় আমাকেই।

—গীতা (১২।৩-৪)

...বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

কঠোপনিষৎ ৩।১০-১১

বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে অব্যক্ত, অব্যক্তের পরে পুরুষ, পুরুষের পরে নাই কিছুই—তিনিই পরা কাষ্ঠা, তিনিই পরা গতি।

—কঠ উপনিষদ (৩।১০-১১)

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

গীতা ৭।১৯

বাসুদেবই সব যাঁর কাছে, এমন মহাত্মা সুদুর্লভ।

—গীতা (৭।১৯)

পরা সত্তায় অনুস্যূত, নিগূঢ় হয়েও সর্বান্তর্যামী এক চিৎ-শক্তির বিসৃষ্টি এই বিশ্বভুবন। সে-চিন্ময়ীই প্রকৃতির গুহ্য হতে গুহ্যতর রহস্য। কিন্তু জড়জগতে এবং আমাদের আধারে দেখি, বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তির দ্বৈতকে আশ্রয় করে তার কাজ চলছে। স্বয়ংপ্রজ্ঞ অনন্ত সন্মাত্রের অন্তহীন সংবিতে ক্রিয়াশক্তির মর্মে-মর্মে জ্ঞানাশক্তির স্ফুট বা অস্ফুট আবেশ থাকবে। অথচ এখান দেখি, বিশ্ববিসৃষ্টির আদিতে মহাপ্রকৃতির আধার কিংবা স্বভাবরূপে এক অবিকল্পিত অবিদ্যা বা তমসাচ্ছন্ন অচিতির খেলা। অচিতির অন্ধতামিস্র বিশ্বব্যাপারের গোড়ার পুঁজি। তারই এখানে-সেখানে দেখা দিল চেতনা ও জ্ঞানের খদ্যোতিকা—স্তিমিত-প্রচার জ্যোতিঃকণের ত্রস্ত স্ফুলিঙ্গ। তাদের পুঞ্জভাবে শুরু হল মন্থর চিন্ময়-পরিণামের দুশ্চর তপস্যা, আধারশক্তির আনুকূল্যে ধীরে-ধীরে চেতনার প্রবৃত্তি হল সুবিন্যস্ত ও সুকৌশল—অচিতির নিকষে চিতিশক্তির সোনার লিখন ক্রমেই উজ্জ্বলতর হল। তবু মনে হয়, এ যেন এষণাচঞ্চল অবিদ্যার কৃত্রিম সিদ্ধির সঞ্চয় শুধু। সে চায় জানতে, বুঝতে, সব রহস্যের ঢাকা খুলে ফেলতে—দুঃসাধ্য সাধনার মন্দাক্রান্তায় নিজেকে সে রূপান্তরিত করতে চায় বিদ্যাশক্তির দীপালিতে। এখানে প্রাণের প্রবৃত্তি যেমন কুণ্ঠিত এবং আয়স্ত, তেমনি চেতনারও। চারদিকে ছেয়ে আছে মরণের করাল ছায়া—তার মধ্যে তাকেই আশ্রয় করে চলেছে কৃচ্ছ্রতপা প্রাণের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টির আয়োজন। অণুজীবের পারিমাণ্ডল্যে তার রূপ ও শক্তির প্রথম উন্মেষ। তারপর অবয়বের ক্রমিক প্রচয়ে বিচিত্রজটিল কায়-সংস্থান ও প্রাণন-কৌশলের আশ্চর্য বিসৃষ্টি। তেমনি চলেছে চিতিশক্তির তপস্যা—এক অনাদি অচিতি ও বিশ্বব্যাপিনী অবিদ্যার অমান্ধকার তরলিত করে আলোকের কম্প্র-শঙ্কিত অভিযান ধ্রুবজ্যোতির দিকে।

অথচ এমনি করে বিদ্যার সঞ্চয় শুধু প্রতিভাসকে জানে—বস্তুর তত্ত্বকে বা অস্তিত্বের মূলাধারকে নয়। প্রাকৃত-চেতনার কাছে বিশ্বের মূল ধরা দেয় অব্যাকৃতি অথবা শূন্যতার মুখোস প'রে। প্রতিভাসের তত্ত্ব তার কাছে অবর্ণ অগোত্র অনাদিস্থিতি মাত্র। তার মধ্যে আছে শুধু অমূলক কার্য-পরম্পরার একটা সমাহার, যাকে বস্তু-স্বভাবের সার্থক পরিণাম বা প্রত্যক্ষ কোনও নিয়তিকৃত-নিয়মের ফল বলা চলে না। ওই অব্যাকৃতকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক শতরূপা বিসৃষ্টির অমিত বৈপুল্য—পরমার্থসতের সঙ্গে তার সুব্যক্ত ও সহজ কোনও সম্বন্ধ নাই। বিশ্বের তত্ত্বরূপ আমাদের প্রথম দৃষ্টিতে ফোটে অনিরুক্ত এমন-কি অনির্বাচ্য অনন্ত হয়ে। সে-আনন্ত্যের মধ্যে বিশ্বকে শক্তি অথবা সংস্থানের দিক দিয়ে মনে হয় একটা অনিরুক্ত নিরুক্তি অথবা সীমাহারা সান্ত বলে। বিরুদ্ধভাষণের অপবাদ মেনেও বিশ্বের তত্ত্ব সম্পর্কে এমন উক্তি আমাদের করতেই হয়। আর-কিছু না হ'ক, অন্তত এটুকু এতে প্রমাণ হয় যে

বস্তুর তত্ত্বসমীক্ষায় এবার বুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে আমরা এসে পেঁছেছি অনির্বচনীয়তার রহস্য-প্রাঙ্গণে।··তার পর জানি না, কোথা হতে সেই বিশ্বে দেখা দেয় সামান্য এবং বিশেষ উপাধির অগণিত বৈচিত্র্য! অথচ অনন্তের স্বভাবধর্মে তার প্রত্যক্ষ কোনও সমর্থন নাই, সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের বলতে হয় অনন্ত-স্বরূপের 'পরে একটা পরকৃত অথবা সম্ভবত স্বকৃত আরোপ মাত্র। উপাধিজননী শক্তিকে আমরা বলি 'প্রকৃতি'। কিন্তু বস্তুর স্বগত-সত্যের ঋতায়নদ্বারা যে-শক্তি বস্তুর স্বভাবকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে, 'প্রকৃতি' সংজ্ঞাটি অন্বর্থ কেবল তারই বেলায় নয় কি? তবুও স্বরূপসত্যকে আমরা কোথাও প্রত্যক্ষ করি না, কিংবা অভিব্যক্ত উপাধিসমূহের স্বভাবস্থিতির কোনও হেতু-নির্দেশও করতে পারি না। বিজ্ঞান আজ বিশ্বের জড়লীলার একাধিক সূত্র আবিষ্কার করলেও এখনও আসল প্রশ্নের 'পরে কোনও আলোকপাত করতে পারেনি। বিশ্বচরিতের আদিলীলা আজও আমাদের কাছে অতর্ক্য রহস্য। সে-লীলার প্রত্যক্ষগোচর পরিণামকে বাস্তব প্রয়োজনের দিক দিয়েই বিচার করতে পারি, তার প্রবৃত্তির অপরিহার্যতাকে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারি না। পরিশেষে, অনাদি অনিরুক্ত অথবা অনির্বাচ্যের আশ্রয়ে কি উৎস হতে কি করে উপাধির বিবর্ত দেখা দেয়, তাও আমরা জানি না—শুধু দেখি বৈচিত্র্যহীন অনুপাখ্যের ভূমিকায় রহস্যময় তাদের ঋতায়ন! বিশ্বের মূলে আছে এক আনন্ত্যের আয়তনে অগণিত সান্তের অবোধ্য সমাহার, এক অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড-লীলার অন্তহীন বীচিভঙ্গ, এক নির্বিশেষ অক্ষরের মধ্যে সীমাহীন বিশেষ ও ক্ষরধর্মের উপচয়। বিশ্বের আদি তাই স্বগতবিরোধের রহস্যগুণ্ঠনে ঢাকা। কে জানে কোন্ সঙ্কেতে সে-বিরোধের সমাধান?

প্রশ্ন হতে পারে, বিশ্বরূপের মূলে অনন্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা চাই কেন? অবশ্য অনন্তের বিকল্প আমাদের মনঃকল্পনার অপরিহার্য একটা সাধন। কেননা, দেশ-কাল অথবা স্বরূপসত্তার মধ্যে অস্তিত্বপ্রবাহের কোথাও একটা সীমা কল্পনা করা—যার এপারে-ওপারে অথবা সামনে-পিছনে কিছুই নাই—এটা মনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অনন্তের অনুকল্পে অসৎ বা শূন্যতার কল্পনা চলে বটে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, সে-কল্পনায় কেবল আনন্ত্যের অনবগাহ অতলতার ব্যঞ্জনাই আছে—যার মধ্যে ইচ্ছা করেই ঝাঁপিয়ে পড়তে আমরা চাই না। অনন্ত আর শূন্যের কল্পনায় এই তফাত শুধু—আগেরটিকে যদি মানি অনির্বাচ্য বলে, পরেরটিকে বলি ভাবকের নিরবশেষ অভাব-প্রত্যয় মাত্র। অথচ ভাবের উপলব্ধিকে হেতু-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুটির একটিকে আশ্রয় আমাদের করতেই হবে। যদি বলি, জড়বিশ্বের সান্ত-প্রতিভাসের সীমাহীন প্রসার আর তার অন্তহীন উপাধি-বৈচিত্র্য ছাড়া কোনও তত্ত্বই বাস্তব নয়, তাহলেও সমস্যার সমাধান হয় না। অন্তহীন সৎ বা অন্তহীন

অসৎ অথবা সীমাহীন সান্ত—সমস্তই আমাদের কাছে অনিরুক্ত কিংবা অনির্বাচ্য। বিশেষ-কোনও ধর্ম কি লক্ষণ দিয়ে বিশেষিত করতে পারি না বলে তাদের সোপাধিক স্বভাবেরও কোনও প্রয়োজন খুঁজে পাই না। বিশ্বের তত্ত্বভাবকে দেশ কাল অথবা দেশ-কালের দ্বিদল বলে ব্যাখ্যা করলেও রহস্যের আবরণ ঘোচে না। কেননা মনের পরকলার ভিতর দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকাই বলে আমাদের বুদ্ধি ওই বিকল্পগুলি বিশ্বতত্ত্বের 'পরে চাপায়, নইলে-যে বিশ্বরূপের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি মন খুঁজে পায় না। বুদ্ধির কল্পিত সংজ্ঞাগুলিকে বিকল্প না বলে যদি বাস্তবও বলি, তবু তাদের অনিরুক্ত-স্বভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না, এবং কি করে তাদের মধ্যে উপাধির বিবর্ত সম্ভব হয়, তারও কোনও সঙ্কেত মেলে না। নির্বিশেষ বস্তুস্বরূপ কোন্ দুর্বোধ উপায়ে বিশেষিত হল, বস্তুর বিচিত্র শক্তি গুণ ও ধর্ম কি করে স্ফুরিত হল, তাদের স্বরূপ কি তাৎপর্যই-বা কি, এসমস্তই আমাদের কাছে অনাদি রহস্যাবগুণ্ঠনে ঢাকা থেকে যায়।

এই অনন্ত অথবা অনিরুক্ত সত্তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বাস্তব হয়ে ফুটেছে শক্তিরূপে। সে-শক্তির স্বরূপও বিজ্ঞান জানে না, কেবল কাজ দেখে তার অনুমান করে মাত্র।...মহাশক্তির পরিস্পন্দে উদ্বেল তরঙ্গাবিক্ষেপে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে অগণিত অতিপরমাণুর চূর্ণমায়া। আবার তারা পরমাণুতে সংহত হয়ে রচে শক্তির বিচিত্র বিসৃষ্টির পীঠভূমি, যার মধ্যে আছে জড়োত্তর-পরিণামের দিগন্তালীন ইঙ্গিত।···এমনি করে ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠে ব্যাহৃত জড়ের জগৎ—ফোটে প্রাণ, জাগে চেতনা, ঘনিয়ে ওঠে প্রকৃতি-পরিণামের কত-যে অজানা রহস্যের ছায়া। গূঢ়চারিণী মহাপ্রকৃতির অনাদি প্রসৃতিকে আশ্রয় করে দেখা দেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিপরিণামের লীলা—আমরা তাদের খুঁটিয়ে দেখি, কৌশলে অনেককেই বাগ মানিয়ে কাজে লাগাই। কিন্তু তবু কারও মর্মচর গোপন কথাটির সন্ধান পাই না। এইটুকু জানি, তড়িৎ-অতিপরমাণুর বিভিন্ন সংখ্যা ও সংস্থান হতে বৃহত্তর তড়িৎ-পরমাণুর আবির্ভাবের উপযোগী একটা নৈমিত্তিক পরিবেশ দেখা দিতে পারে বটে (যদিও তাকে হেতু না বলে নিয়ত-পূর্ববর্তী 'প্রত্যয়' বা কারণসামগ্রী বলাই সমীচীন)। কিন্তু উদ্ভূত অণুর বিচিত্র স্বভাব গুণ বা শক্তি প্রকৃতির কোন্ নিগূঢ় প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য হতে দেখা দেয়, কারণ কি পরিবেশের কোন্ বিশেষ-ধর্ম হতে জাগে কার্য বা পরিণামের বিশেষত্ব—তার কোনও নিয়ম আমরা আবিষ্কার করতে পারি না। অদৃশ্য কতগুলি পরমাণুর বিশেষ-একটা সমাযোগ দৃশ্য অভিনব ধর্মবিশেষের নিদান কিংবা পরিবেশ রচল। কিন্তু এই রচনার মূলসূত্রটি কি, তার স্পষ্ট পরিচয় আমরা জানি না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন গণিতের একটা বিশিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত হয়ে জলের বিশিষ্ট আকার নিয়ে দেখা দেয়? গ্যাস

জলের উপাদান হলেও জল তো শুধু দুটি গ্যাসের সংমিশ্রণ নয়, কেননা উৎপাদকের ধর্ম হতে উৎপাদ্যের ধর্ম এখানে আলাদা। জলকে তাই একটা নতুন সৃষ্টি, পদার্থের একটা নতুন রূপ, জড়ধর্মের একটা অভিনব ব্যাকৃতি বলে মানতে হয়। বীজ হতে গাছ হয়। কি করে হয়, তা জেনে আমরা পরিণামের সে-ধারাকে কাজেও লাগাই। কিন্তু কেন বীজ হতে গাছই হবে, গাছের প্রাণ এবং রূপ কি করে বীজসত্ত্বে বা বীজশক্তিতে অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, তা তো জানি না। বীজের মধ্যে গাছের অন্তর্ভাবকে একটা প্রাকৃতিক তথ্য বললেও হেতুপ্রশ্নের দায় এড়ানো যায় না। সম্প্রতি জেনেছি, বংশানুক্রমের গোড়ায় রয়েছে 'জীন' ও 'ক্রোমোসোম'এর কারসাজি। শুধু শারীরিক বৈচিত্র্য নয়, মানসিক বৈচিত্র্যেরও মূলে আছে তারাই। কিন্তু অচেতন জড় উপাদান হয়েও কি করে তারা বিশিষ্ট মনোধর্মের আধার ও বাহন হল, তার তত্ত্ব আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। জড়বিজ্ঞানী জড়-পরিণামের রহস্য বোঝাতে গিয়ে বলেন : ইলেক্‌ট্রনের যোগাযোগে পরমাণু, তাহতে অণুর উৎপত্তি। জড় অণুর বিচিত্র সংস্থানবশত জীবকোষ ও শরীরগ্রন্থির উদ্ভব, রসক্ষরণ প্রভৃতি শারীর-ব্যাপারের আবির্ভাব। এমনি করে দূরবিসর্পী জড়পরমাণুর ব্যাপারই সেক্‌স্‌পীয়র বা প্লেটোর মস্তিষ্ক ও নাড়ীতন্ত্রকে উত্তেজিত ক'রে তাঁদের দিয়ে লিখিয়েছে Hamlet, Symposium বা Republic—অন্তত তাঁদের ভাবসৃষ্টির মূলে রয়েছে বস্তুকণারই লীলাচাঞ্চল্য। বৈজ্ঞানিকের যুক্তি আমরা সুবোধ বালকের মত শুনে যাই বটে—কিন্তু তবু বুঝতে পারি না, নিছক জড়স্পন্দ হতে অপরোক্ষভাবেই হ'ক অথবা পরম্পরাক্রমেই হ'ক কি করে দেখা দিল সাহিত্য বা দর্শনের ওই উত্তুঙ্গ ভাবলোক ! নিমিত্ত আর নৈমিত্তিকের মাঝে ব্যবধানটা এক্ষেত্রে এতই দুস্তর যে, প্রকৃতি-পরিণামের ধারাকে হাতের মুঠায় এনে কাজে লাগানো দূরের কথা, তার চলনের আগাগোড়া ইতিহাসটা আজও আমাদের অগোচর রয়ে গেছে। ব্যাবহারিক জগতে জড়বিজ্ঞানের সূত্রগুলির প্রামাণ্য নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে, প্রকৃতির বহিরঙ্গ-ব্যাপারকে অনেক ক্ষেত্রে আয়ত্তেও আনতে পারে তারা—কিন্তু তার মর্মরহস্যের কোনও সন্ধান দিতে পারে না। বস্তুস্বভাবের চরম জিজ্ঞাসার উত্তর তাদের কাছে নাই। মনে হয়, শেষপর্যন্ত জড়বিজ্ঞানের সূত্রও এক বিশ্ব-মায়াবীর মায়ামন্ত্র যেন। তার ফল প্রতিক্ষেত্রেই নিখুঁত অমোঘ এবং স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু তার নিদানকথা দুর্বোধ রহস্যে ছাওয়া।

এই একটা ধাঁধাই নয় শুধু। দেখছি, অনিরুক্ত আদ্যশক্তি দিকে-দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে নিরুক্ত ব্যাকৃতি-সামান্যের পরম্পরা। প্রত্যেকটি ব্যাকৃতির অগণিত অনুব্যাকৃতির তুলনায় তাকে অব্যাকৃত-সামান্য বললে দোষ হয় না। রূপধাতুর একটি বিশিষ্ট বিভাবের 'পরে প্রত্যেকটি ব্যাকৃতির নির্ভর এবং তাকে

আশ্রয় করে তার সবিশেষ রূপায়ণ। সে-রূপায়ণেরও লেখা-জোখা নাই—একটা মূলধাতুর অমেয় বীর্য কখনও-কখনও বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে বৈচিত্র্যের অন্তহীন সমুল্লাসে। কিন্তু স্বরূপত প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য মনে হয় অকল্পিত—অব্যাকৃত-সামান্যের স্বভাবকে তারা কোনমতেই মেনে চলে না। একই তড়িৎশক্তি হতে দেখা দিল তার ধনাত্মক ঋণাত্মক ও তটস্থ বিভূতি; আবার প্রত্যেকটি বিভূতি যুগপৎ কণাধর্মী ও তরঙ্গধর্মী। বায়বীয় শক্তি-ধাতুর ব্যাকৃতি ঘটল বহু-বিচিত্র বায়ব-পদার্থে। কঠিন শক্তি-ধাতু রূপান্তরিত হল ক্ষিতিতত্ত্বে—তার মধ্যেও মৃত্তিকা শিলা ধাতু ও খনিজ পদার্থের কত রকমারি। এক প্রাণ হতে উদ্ভিদ্‌জগতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তরু-লতা পুষ্প-পল্লবের অন্তহীন বাসন্ত সমারোহ। প্রাণিজগতে দেখা দিল জীবলীলার কত বৈচিত্র্য—জাতি উপজাতি ও ব্যক্তির কত বৈশিষ্ট্য। তেমনি রাজৈশ্বর্যের মেলা নেমে এল মানুষের প্রাণে ও মনে—অগণিত চিত্ত-আকৃতির ধারা বেয়ে চলল বিশ্বপরিণামের অসমাপ্ত নাট্যলীলার কোন্ চরম অঙ্কের দিকে যার রহস্য এখনও অন্তর্গূঢ় এবং অনুদ্ঘাটিত আমাদের কাছে। অথচ সর্বত্রই দেখছি একটা নিয়মের খেলা। আদি-ব্যাকৃতির মধ্যে আছে স্বভাবধর্মের একটা সমতা, এবং মৌলিক ধাতু-প্রকৃতির এই সমতাকে আশ্রয় করেই সামান্য ও বিশেষ অনুব্যাকৃতির মাঝে বৈচিত্র্যের একটা নিরর্গল উচ্ছ্বাস। জাতি অথবা উপজাতিতেও, সাধর্ম্যের বিধানকে আশ্রয় করেই দেখা দিয়েছে অগুন্তি বৈধর্ম্যের পরিকীর্ণতা—অবশেষে ব্যক্তির মধ্যে ফুটেছে তার চূড়ান্তরূপ। কিন্তু সামান্য-প্রকৃতির মধ্যে কোথাও এমন-কিছু খুঁজে পাই না, যাকে বিকৃতির এই বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী করা চলে। শুধু দেখছি, মূলে আছে এক নির্বিকার সাম্যের অনুত্তরণীয় নিয়তি, আর শাখাপ্রশাখায় অফুরন্ত বৈচিত্র্যের রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু কে এই নিয়তির নিয়ন্তা? নির্বিশেষকে কে বিশেষিত করল? অনিরুক্তির মধ্যে নিরুক্তি এল কোথা হতে? তার নিগূঢ় সত্য বা তাৎপর্য কি? কার তাড়নায় বা প্রেরণায় সম্ভূতি-বৈচিত্র্যের এই প্রমত্ত উচ্ছ্বাস—যার কোনও অর্থ নাই কি লক্ষ্য নাই, শুধু সিসৃক্ষার আনন্দ বা সৌন্দর্যকে সার্থক করা ছাড়া?...কোনও মন আছে কি এর পিছনে—এষণা-ব্যাকুল কল্পনাকুশল কোনও মনের লীলা, কোনও নিগূঢ় সংকল্পের প্রবর্তনা?...হয়তো আছে। কিন্তু জড়প্রকৃতির আদিভাবনায় কোথায় তার আভাস?

এ-সমস্যা সমাধানের প্রথম কল্পে মানতে পারি বিশ্ব জুড়ে এক স্বকৃৎ যদৃচ্ছার অবন্ধন প্রবৃত্তিকে। বিশ্বপ্রতিভাসরূপিণী প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন দেখি নিয়মের অলঙ্ঘ্য শাসন, আরেকদিকে তেমনি দেখি খেয়ালখুশির অবোধ্য প্রমত্ততা। এ-দুটি বিপরীত প্রবৃত্তির মাঝে সামঞ্জস্য ঘটাতে এমনিতর স্বতোবিরুদ্ধ একটা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি? বাধ্য হয়ে তাই বলতে হয়: এ-জগতে চলছে এক অচেতন ও অনিয়ত শক্তির উদ্দাম লীলা—

কোনও নিয়মের শাসন নাই তার মধ্যে শুধু যদৃচ্ছাবশে যা-খুশি-তাই সৃষ্টি করবার অন্ধ প্রেরণা ছাড়া। নিয়ম সেখানে দেখা দেয় কেবল প্রবৃত্তির একই ছন্দের অন্তহীন পুনরাবৃত্তির ফলে, আর তা টিকে থাকে—এমনিধারা একটা অভ্যাসের ছন্দ ছাড়া বিশ্বের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার কোনও উপায় নাই বলেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ-ই প্রকৃতির রীতি।...কিন্তু তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে মানতে হয় : বিশ্বের মূলে কোথাও স্তব্ধ হয়ে আছে এক সীমাহীন সম্ভূতির উদ্যত বিপুলতা অথবা অগণিত সম্ভাবনার অপ্রমেয় গর্ভাশয়—যাহতে এক আদ্যাশক্তির স্বতোবিচ্ছুরণে চলছে অনন্ত ভূতপ্রকৃতির বিসৃষ্টি। সে-বিশ্বযোনি অনির্বচনীয়া অচিতিরূপিণী, তাই বুঝে উঠতে পারি না তাকে সৎ না অসৎ বলব। অথচ এমনিতর একটা মূলপ্রকৃতির অধিষ্ঠান ছাড়া শক্তির ক্রিয়া ও বিভাবনা কি করে সম্ভব, তাও বুঝি না। কিন্তু বিশ্বপ্রতিভাসের আরেকটা দিকে তাকাই যখন, তখন খেয়ালখুশির পরিণামে ঋতম্ভরা-প্রবৃত্তির অভ্যুদয়কেও যুক্তিযুক্ত বলে কিছুতেই মানতে পারি না। সম্ভাবনার স্বৈরাচারকে মেনেও দেখি, নিয়ম বা ঋতের দিকে প্রকৃতির একটা অনতিবর্তনীয় প্রবণতা রয়েই গেছে। তাইতে মনে হয়, বিশ্বের মর্মমূলে আছে অদৃষ্ট এক স্বভাবসত্যের অমোঘ প্রশাসন—যে-সত্যের বহুধা-বিসৃষ্টির বীর্য আত্মরূপায়ণের বিচিত্র সম্ভাবনাকে বিচ্ছুরিত করছে দিকে-দিকে এবং সেই হিরণ্যরেতার কল্পবীজকেই মহাশক্তির কামকলা মূর্ত করে তুলছে রূপে-রূপে।...এহতে জাগে আরেকটা সিদ্ধান্তের কল্পনা : বিশ্বের মূলে আছে এক যন্ত্রমূঢ় নিয়তি—প্রাকৃতিক নিয়মের যন্ত্রাচারে আমরা তার প্রকাশ দেখি। হয়তো সে-নিয়তির পিছনে আমাদের পূর্বকল্পিত অন্তর্গূঢ় স্বভাব-সত্যের প্রবর্তনা আছে, তারই স্বয়ম্ভূ প্রশাসনে চলছে বিশ্বের এই নিত্যদৃষ্ট লীলায়ন। কিন্তু শুধু নিয়তির নিয়মতন্ত্র দিয়ে অন্তহীন বিশ্ববৈচিত্র্যের স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার জন্য নিয়তির মধ্যে কি পিছনে চাই একত্বভাবনার সহচারিত অথচ তার গুণীভূত বহুত্বভাবনার একটা স্ফুরন্ত প্রবেগ। তখন প্রশ্ন হবে, এই একত্ব বা বহুত্বের ধর্মী কে? নিয়তিবাদ তার কোনও জবাব জানে না। তাছাড়া অচিৎ হতে চিতের আবির্ভাব কি করে হল, নিয়তিবাদ দিয়ে তার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। কেননা অচিতির নিয়মতন্ত্রই যদি বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব হয়, তাহলে তার মধ্যে স্ববিরোধী চিৎশক্তির স্থান কেমন করে হবে? যদি বলা যায়, নিয়তির শাসনে অচিৎ হতে চিতের উন্মেষ হয়—তাহলে বাধ্য হয়ে মানতে হবে, চিৎশক্তি প্রথম হতেই স্ফুরণের অপেক্ষায় প্রচ্ছন্ন ছিল অচিতির মধ্যে, উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে এবার সে বেরিয়ে এসেছে আপাত-তমিস্রার সম্পুট বিদীর্ণ করে।...নিয়তিকৃত-নিয়মের সমস্যাকে অবশ্য চুকিয়ে দিতে পারি এই বলে যে : প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম বলে কিছু নাই, ও আমাদের

মনের একটা সপ্রয়োজন বিকল্প শুধু—কেননা নিয়মের আঁট না থাকলে বাইরের জগতের সঙ্গে তার কারবারই চলে না। আসলে বিশ্বে কেবল এক মহাশক্তির খেয়ালখুশির খেলা আছে অণু-পরমাণুর ঝাঁক নিয়ে। সে-খেলার বিশেষপরিণাম আমাদের অদৃশ্য, শুধু তার সামান্যপরিণামের ফলে দেখি বিচিত্র বিশেষণের আবির্ভাব—যার মূলে আছে পরমাণুর সমষ্টিক্রিয়ার মধ্যে একই ছন্দের পৌনঃপুনিকতা মাত্র। এমনি করে নিয়তি হতে আবার ফিরে এলাম যদৃচ্ছাতে। সুতরাং যদৃচ্ছাই আমাদের জীবনের তত্ত্ব। কিন্তু তাহ'লে মন বা চেতনার তত্ত্ব কি ? অচিতি হতে আবির্ভূত হলেও তার ধারা এতই স্বতন্ত্র যে, অচিতির সৃষ্ট জগতে তাকে জায়গা করে নিতে হয় নিজেরই সপ্রয়োজন ঋতকল্পনাকে সৃষ্টির 'পরে আরোপ ক'রে। অথচ সৃষ্টির বাঁধন হতেও তার মুক্তি নাই ! এ-সিদ্ধান্তে তাই দুটি বিরোধ আছে। প্রথমত, অচিৎ-মূল হতে চিতের আবির্ভাব; দ্বিতীয়ত, অচেতন যদৃচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট জগতের চরম অঙ্কে শাণিত যুক্তি ও ঋতময় কল্পনা নিয়ে মনের দীপালি। এমন অতর্কিত আবির্ভাব সম্ভাবিত হলেও তাকে মানতে আরও সুষ্ঠু সমাধানের দাবি যদি করি, তাকে নিশ্চয় অসঙ্গত বলা চলে না।

বস্তুত বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্য পথেও হতে পারে। এমনও বলা চলে, চিৎশক্তির সিসৃক্ষাতেই এক আপাত-অচিৎ মূল হতে বিশ্বের বিসৃষ্টি। এই বিশ্ব এক লোকোত্তর মন বা ক্রতুর কল্পনা ও ব্যাকৃতি। আপন সৃষ্টির আড়ালে সে-মন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। সবার আগে নিজের সামনে টেনে দিয়েছে সে অচেতন শক্তি ও জড় রূপধাতুর এই তিরস্করণী, যা যুগপৎ তার ছদ্ম-আবরণ এবং সিসৃক্ষার সাবলীল উপাদান দুইই—শিল্পীর রূপাদর্শকে ফুটিয়ে তোলবার উপযোগী একান্ত-অনুগত মূল উপকরণের মত। যা-কিছু দেখছি চারদিকে, সে কি তবে বিশ্ব-বিবিক্ত কোনও পরমদেবতার কল্পনাবিলাস ? জগতের ওপারে আছেন এক পরমপুরুষ—সর্বজ্ঞান ও সর্বেশনায় প্রদীপ্ত তাঁর মন ও ক্রতু। জড়বিশ্বকে তিনিই বেঁধেছেন গণিতের অনতিবর্তনীয় নিয়মে, সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের অপরূপ শিল্পমায়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বের অপূর্ব রূপমাধুরী, সংবাদী-বিবাদী সুরের বিচিত্র যোজনায় নানা বিরোধের সমাবেশ ও সংমিশ্রণে গড়ে তুলেছেন অনির্বচনীয় এক চমৎকার—যার বুকে বিশ্বব্যাপী অচিতির ছন্দোদোলায় চলছে চেতনার আত্মলাভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরামহীন তপস্যা। সে-পরমদেবতা যে ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর, তাতে বিস্ময়ের হেতু কি আছে ? যে-স্রষ্টা বিশ্ব হতে বিবিক্ত, বিশ্বের বিসৃষ্টিতে তাঁর সত্তার অপরোক্ষ প্রত্যয় বা লক্ষণ আবিষ্কার করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। শুধু সবজায়গায় দেখছি একটা লোকোত্তর বুদ্ধির সুস্পষ্ট ছাপ—দেখছি আইনের বাঁধন, শিল্পীর পরিকল্পনা, ভাবনার সূত্রজাল, সাধ্যের সঙ্গে সাধনের বিস্ময়কর

সামঞ্জস্য, উদ্ভাবনী-শক্তির অফুরন্ত ব্যঞ্জনা—এমন-কি কল্পনা কোথাও উদ্দাম হয়ে ছুটলেও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ঠিক রাস ধরে আছে তার পিছনে! এই দেখেই না মনে হয়, বিশ্বের এই ঋতায়নের অন্তরালে আছে কোনও ঋতভৃৎ দেবতার অনুশাসন।...আবার এমনও হতে পারে, স্রষ্টা সৃষ্টি হতে একান্ত বিবিক্ত না হয়ে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছেন তার মধ্যে। তাহলেও কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তাঁর পরিচয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। হয়তো সে-পরিচয় ধরা পড়বে, যখন অচিতির পরিণামে চিৎশক্তির উন্মেষ উত্তরায়ণের এমন-একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছবে যেখানে অন্তর্যামীর স্বরূপস্থিতি আর চেতনার অগোচর থাকবে না। চিৎ-পরিণামের এই অতর্কিত বিভূতিকে অসম্ভবও বলা চলে না, কেননা এতে বস্তুর স্বরূপহানির কোনও আশঙ্কা নাই। যে দিব্য-মন অপ্রতিহত বীর্যের অধীশ্বর, সে নিশ্চয় তার সৃষ্টজীবের মধ্যে নিজের স্বরূপশক্তির আবেশও ঘটাতে পারে।...এ-সিদ্ধান্তের শুধু এই গলদ যে, সৃষ্টির তাৎপর্যকে এর মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না। সব চলেছে একটা খেয়ালখুশির খেলায় যেন—কে জানে তার কি লক্ষ্য! বিশ্ব জুড়ে অজ্ঞান সংঘাত ও বেদনার অন্ধ তাড়না; কি ছিল তার প্রয়োজন, কোথায় তার চরম পরিণাম কোন্ সার্থক নিয়তির উদ্‌যাপনে? বলবে, এ লীলা? কিন্তু দিব্য-পুরুষের চিন্ময় লীলায় এত-সব অদিব্য জঞ্জালের ঝামেলা কেন? যদি বল, জগতে যা-কিছু দেখছ, সবই ঐশ্বরভাবনার বিলাস। তাহলে পালটা জবাবে আমরাও বলতে পারি, ভাবনার আরও-খানিকটা উৎকর্ষ দেখতে পেলে তাঁর তারিফ করতে পারতাম। আর, সবচাইতে খুশী হতাম, এমন দুঃখহত দুর্বোধ জগৎসৃষ্টির ভাবনা তাঁর যদি একেবারেই না থাকত। যে-ঈশ্বরবাদেই জগৎ-জোড়া ঈশ্বরের কল্পনা, তাকেই এসে ঠেকতে হয় এই সমস্যায় এবং তাকে পাশ-কাটানো ছাড়া তার উপায় থাকে না। কিন্তু স্রষ্টা যদি বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও আবার বিশ্বাত্মক হন, একাধারে যদি হতে পারেন নট এবং নাট্য—তাহলেই এ-সমস্যার সমাধান সম্ভব। তখন বিশ্বকে এক অনন্তস্বরূপের আত্মরূপায়ণের লীলা বলে জানব—যার মধ্যে তাঁর অন্তর্গূঢ় অন্তহীন সম্ভাবনাকে তিনি ফুটিয়ে চলেছেন ঋতময় বিশ্বপরিণামের ছন্দে লয়ে।

এ-অভ্যুপগম সত্য হলে মানতে হবে, জড়শক্তির অন্তরালে বিশ্বব্যাপী এক অন্তহীন সংবৃত্ত চিৎশক্তি অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে। নিজের পরাক্‌বৃত্ত বীর্য-দ্বারা সে গড়ে তুলছে নিত্যপরিণামিনী বিসৃষ্টির বিচিত্র সাধন, জড়বিশ্বের সীমাহীন সান্ততায় ফুটিয়ে তুলছে আত্মরূপায়ণের বিপুল ঐশ্বর্য। জড়শক্তির আপাত-অচেতনাও জড় বিশ্বধাতু গড়বার অপরিহার্য নিমিত্তরূপে তার কাছে সার্থক হয়েছে। আপাতবিরুদ্ধ সত্ত্ব হতে নিজেকে বিবৃত্ত করবে বলেই চিৎশক্তি অচিতির গহনে সংবৃত্ত হতে চায়। জড়ত্বের মধ্যে এমনি করে তার

চরম আত্মনিগূহন ঘটেছে। অতএব বিশ্ব যদি অনন্তের আত্মরূপায়ণ হয়, তাহলে একে বলব তার আত্মস্বভাবের সত্য বা বীর্যের প্রকাশ -জড়ত্বের ছদ্মরূপে। এই সত্য ও বীর্যের বি-কৃতি অথবা বাহনসমূহই বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড এবং মৌল বিভূতিরূপে দেখা দেবে। আবার তার সখণ্ড বিভূতিসমূহ হবে অখণ্ড বিভূতিরই অন্তর্গূঢ় সত্য ও বীর্যের যথাযোগ্য বি-কৃতি অথবা বাহন। মূলে এমনিতর স্বরূপসত্যের অভিনিবেশকে স্বীকার না করলে, প্রকৃতির খণ্ড-বিভূতিকে মনে হবে অপ্রকেত অব্যাকৃতের গুহাশয়ন হতে উৎসারিত অনির্বচনীয় বৈচিত্র্যের মায়া বলে। অনন্তচৈতন্যের মধ্যে অগণিত বিচিত্র সম্ভাবনার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য আছে। জড়প্রকৃতিতে তা-ই ধরে আমাদের নিত্যদৃষ্ট অচেতন যদৃচ্ছার রূপ। কিন্তু যদৃচ্ছার অচেতনাও একটা আপাত-প্রতিভাস মাত্র—কেননা জড়ের মধ্যে চেতনা সম্পূর্ণ সংবৃত্ত হয়েই অচেতনার অবভাস জাগায়, আপন অস্তিত্বকে ঢেকে রাখে আত্মনিগূহনের অবগুণ্ঠনে। আবার আনন্ত্যের স্বগত সত্য ও বীর্য অবন্ধ্য ক্রতুর প্রবর্তনায় যখন নিজেদের রূপায়িত করে, তখন যদৃচ্ছার জায়গায় প্রকৃতিতে দেখা দেয় যন্ত্রমূঢ় নিয়মের শাসন। কিন্তু তার যান্ত্রিকতা প্রতিভাস মাত্র, সেও অচিতির একটা মায়া। এমনি করে বিশ্বের মূলে চিৎশক্তিকে স্থাপন করলেই বোঝা যায়, জড়ের জগতে অচিতির শিল্পচাতুরী কেন গণিতের নিয়ত শাসন মেনে চলে, কেন তার মধ্যে নিখুঁত পরিকল্পনা, সংখ্যার সার্থক বিন্যাস, সাধ্যের সঙ্গে সাধনের নিখুঁত সামঞ্জস্য, নিত্য-নূতন কলাকৌশলের এত প্রাচুর্য—এককথায় সুনিপুণ গবেষণা ও স্বচ্ছন্দ ইষ্টসাধনার এমন সমারোহ। তখন আপাত-অচিতি হতে কি করে চিতিশক্তির আবির্ভাব হয়, সে-ধাঁধারও জবাব মেলে।

বাস্তবিক এই অভ্যুপগমকে সপ্রমাণ করতে পারলে প্রকৃতির সকল দুর্বোধ রহস্যেরই একটা অর্থ ও সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণত মনে হয়, তেজোধাতুই বুঝি রূপধাতুর স্রষ্টা। কিন্তু বস্তুত চিৎশক্তিতে সত্তার মত, রূপধাতুও তেজোধাতুতে অন্তর্নিবিষ্ট। তেজ যেমন শক্তির বিভূতি, তেমনি রূপধাতুও অন্তর্গূঢ় সন্মাত্রের বিভূতি। কিন্তু রূপধাতু চিন্ময় যত-ক্ষণ, ততক্ষণ জড়-ইন্দ্রিয় তার উদ্দেশ পায় না—তাই সিসৃক্ষার তেজ তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে জড়ের আকার দিয়ে।··সংখ্যা পরিমাণ ও সংস্থান আশ্রয় করে বস্তুর গুণ ও ধর্মের প্রকাশ কি করে হয়, তাও এবার বুঝতে পারি। সংখ্যা পরিমাণ ও সংস্থান হল সন্মাত্র-ধাতুর বৈভব, আর গুণ ও ধর্ম হল সন্মাত্রে অন্তর্নিবিষ্ট চেতনা ও তার শক্তির বৈভব। অতএব রূপধাতুর ছন্দো-ময় চলনে তাদের সক্রিয় অভিব্যক্তি কিছুই অসঙ্গত নয়।...বীজ হতে বৃক্ষের আবির্ভাব-রহস্যও এখন অন্যান্য প্রাকৃত ব্যাপারের মতই সুস্পষ্ট। আমরা যাকে বলেছি সম্ভূত-বিজ্ঞান, সকল বীজেরই অন্তরে সে অন্তর্যামী হয়ে অধি-

ষ্ঠিত। বীজের ব্যাকৃত রূপে এবং সেই রূপের মধ্যে সংবৃত্ত গূঢ়-চৈতন্যে অন্তঃশীল হয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে অনন্ত-সংবিতের অভীষ্ট রূপের স্বগত দিব্য-দর্শন, স্ফুরন্ত কায়ের আকৃতিতে স্পন্দমান তার স্বরূপসত্তার প্রবেগ—যা তেজোধাতুর গহনে স্বরচিত কুণ্ডলন হতে উন্মিষিত হতে চাইছে অভিনবের রূপায়ণে। এই অন্তর্গূঢ় চিৎ-সংবেগই স্বভাবের ছন্দে বীজ হতে ফুটে ওঠে বৃক্ষের রূপে।··আরও বুঝি, প্রাণিদেহের 'জীন' ও 'ক্রোমোসোম' জড়-অণু হয়েও কেমন করে জনক হতে সন্ততিতে মনোবীজ-সংক্রামণের বাহন হতে পারে। এখানেও জড়ের পরাক্-প্রবৃত্তিতে চলছে প্রকৃতির একই খেলা—আমাদের প্রত্যক্-অনুভবে যার নিবিড় পরিচয় পাই। নিজেরই মধ্যে দেখছি, অবচেতন জড়দেহ নিয়ত বহন করছে মনোময় চেতনার একটা আবেশ—তিলে-তিলে সঞ্চয় করছে অতীতের কত স্মৃতি ও অভ্যাস, প্রাণ-মনের কত সংস্কারের গ্রন্থি, স্বভাবের কত ছাঁদ। আবার কোনও রহস্যময় উপায়ে জাগ্রৎ-চেতনায় তাদের উৎক্ষিপ্ত ক'রে প্ররোচিত অথবা নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের দৈনন্দিন কর্ম-প্রবৃত্তিকে।

ঠিক এই সূত্র ধরে বুঝতে পারি, আমাদের শারীরক্রিয়া মনের বৃত্তিকেও কি করে শাসন করে। বাস্তবিক, শরীর তো অচেতন জড়পদার্থ নয় শুধু—এক অন্তশ্চেতন তেজোধাতুর সে একটা রূপময় বিগ্রহ। তারও মধ্যে চেতনার নিগূঢ় আবেশ আছে, অন্তঃসংজ্ঞ হয়েই সে এক ব্যক্ত-চেতনার প্রকাশের আয়তন হয়েছে—যে-চেতনা আমাদের জড়বিগ্রহের তেজোধাতুতে উদ্‌ভিন্ন হয়েছে স্বতঃসংবিতের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। শারীরক্রিয়া এই মনোময় গুহাশায়ী পুরুষের প্রবৃত্তির অপরিহার্য সাধন। দেহযন্ত্রে গতিসঞ্চার করেই, দেহে অন্তর্গূঢ় অথচ উন্মিষন্ত চিৎ-পুরুষ তাঁর চিত্ত ও সংকল্পের ব্যাকৃতিকে সঞ্চালিত করেন এবং তার ফলে জড়ের আধারে তাঁর আত্মরূপায়ণ সম্ভব হয়। মনের মায়া জড়ের কায়ে রূপান্তরিত হবার সময় জড়বিগ্রহের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের প্রভাবে মনোবিগ্রহেরও অল্পাধিক বিকার ঘটে। অমূর্তকে মূর্তিতে রূপায়িত করতে গেলে জড়ের এই স্ব-তন্ত্র কৃতির প্রভাব স্বীকার করে নিতেই হবে। দেহযন্ত্র তাই কখনও-কখনও যন্ত্রীর উপরেও কর্তৃত্ব করে। চিত্ত এবং সংকল্পের সক্রিয় শাসন কি বাধা উদ্যত হবার পূর্বেই, শুধু অভ্যস্ত সংস্কারের সংবেগদ্বারা গুহাশায়ী চেতনার মধ্যে সে সৃষ্টি করে অতর্কিত প্রতিক্রিয়ার বিক্ষেপ অথবা আভাস। এসব সম্ভব হয়—দেহেরও একটা স্বতন্ত্র 'অবচেতন' চেতনা আছে বলে। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে আমাদের আত্মরূপায়ণের এও একটা রূপ। এমন-কি শুধু দেহযন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে মনে হতে পারে, দেহই বুঝি শাসন করছে মনকে। তবে সত্যের এটা বহিরঙ্গ পরিচয় মাত্র। তার অন্তরঙ্গ পরিচয় বলবে, মনই বস্তুত দেহের নিয়ন্তা। এইদিক

দিয়ে দেখলে, আরও গভীর একটা সত্য জেগে ওঠে আমাদের ভাবনায় : দেহ আর মন দুয়েরই শাস্তা হচ্ছে এক চিন্ময়-সত্তা—রূপধাতুর কঞ্চুককে সে-ই করেছে বাসিত। আবার দেহ আর মনের অন্যোন্যসম্বন্ধেরও একটা বিপরীত ধারা আছে। এও দেখি, মন তার আজ্ঞা ও সংজ্ঞা দুইই দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে, অভিনব প্রবৃত্তির সাধনরূপে তাকে গড়ে তুলতে পারে। এমন-কি তার চিরাভ্যস্ত দাবি বা হুকুমের ছাপ এমনভাবে এঁকে দিতে পারে দেহের 'পরে, যাতে মনের সচেতন সঙ্কল্পের অপেক্ষা না রেখেই স্বাভাবিক সংস্কারবশে দেহ অবশভাবে তাকে তামিল করে চলবে। শুধু কি তা-ই ? দেহের 'পরে মনের ঈশনা চরমে পৌঁছয়, যখন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম ও সামর্থ্যকে অভিভূত ক'রে মন আপন খুশিতে তাকে চালিয়ে নিতে শেখে। মনের এ-ক্ষমতা ক্বচিৎ-দৃষ্ট হলেও একেবারে নিষ্প্রমাণ নয়—আর কতদূর প্রসার যে তার হতে পারে, তাও কেউ জানে না।...দেহ-মনের অন্যোন্যসম্বন্ধের মাঝে প্রচ্ছন্ন এইধরনের বহু দুর্বোধ রহস্য সুবোধ হয়ে ওঠে, যখন জানি এক অন্তর্গূঢ় চেতনার আবেশে জীবধাতু তার উত্তরসাধক মনোধাতুর কাছ থেকে প্রেরণা পায় ; ওই চেতনাই দেহে নিবিষ্ট থেকে তার রহস্যময় নিগূঢ় সংবেদন-দ্বারা দেহের 'পরে মনের দাবি অনুভব করে এবং দেহাধিষ্ঠিত উন্মিষিত চেতনার সকল শাসন মেনে চলে।...তারপর শেষ কথা এই : চিৎশক্তিকে বিশ্ব-মূল বলে মানলে পরে, এক দিব্যমন ও সত্যসঙ্কল্পের প্রবেগেই যে এই বিশ্বের বিসৃষ্টি—এ আর অযৌক্তিক মনে হয় না। সৃষ্টির মধ্যে যেসব গোলোকধাঁধাকে বিচারশীল মন স্রষ্টার খেয়ালখুশি বলে মানতে নারাজ, তাদেরও একটা যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে তখন। কেননা, এই দৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎসর্পিণী ধারায় আমরা দেখি অচিতি হতে চিতিশক্তির মন্থর উদয়নের একটা কৃচ্ছ্র-তপস্যা। সে-তপস্যা কঠিন হলেও সমস্ত বিরোধের পরাভবে জয়শ্রীর প্রসাদলাভও তার ধ্রুব নিয়তি—কেননা মন্থর পরিণামের কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়েই চিতিশক্তি একদিন তার স্ব-ভাবের বিপুল সত্য প্রকট করবে।

কিন্তু সন্মাত্রের তত্ত্বকে জড়ের দিক থেকে খুঁজতে যাই যদি, তাহলে পূর্বোক্ত অভ্যুপগমের কোনও নিশ্চিত সমর্থন পাই না। শুধু তা-ই নয়, জড়কেই চরমতত্ত্ব বললে প্রকৃতির স্বরূপ ও লীলার কোনও ব্যাখ্যা সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। অনাদি অচিতির গুণ্ঠন অন্ধতামিস্রায় সব ঢেকে দিয়েছে—তার আড়ালে লুকিয়ে আছে বিশ্ববিসৃষ্টির মর্মচারিণী প্রেতি। মনের সাধ্য কি, সে-যবনিকা ভেদ করবে ! প্রাতিভাসের স্বরূপ এবং বীর্য গুহাহিত হয়ে আছে ওই তমোগহনে—বাইরে ফুটছে শুধু মহাপ্রকৃতির জড়লীলা। তাই নিঃসংশয় তত্ত্বজ্ঞানের জন্য চেতনার ঊর্ধ্ব-পরিণামের ধারা ধরে আমাদের চলতে হয়—পৌঁছতে হয় আত্মজ্যোতির মহাবৈপুল্যের সেই

শিরোবিন্দুতে, যেখানে বিশ্বের অনাদিরহস্য স্বত-উদ্‌ঘাটিত। চেতনার এই ঊর্ধ্বায়নও নিঃসংশয়িত। কেননা, গুহাশয়ী অনাদি-চিতিশক্তির মর্মগহনে প্রথম হতে যা নিগূঢ় ছিল, পর্বে-পর্বে তাকে ফুটিয়ে তোলবার তপস্যা চলেছে প্রাকৃত-চেতনায়—তার উৎক্রান্তির ইতিহাস এই আত্মোন্মীলনেরই ইতিহাস।⋯ স্পষ্টই দেখছি, প্রাণের রাজ্যেও চরমতত্ত্বের এষণা ব্যর্থ হবে। কারণ, প্রাণের ব্যাকৃতিতে চেতনা অবমানস হয়ে রয়েছে—আমরা মনোময় জীব বলে তার মধ্যে দেখি অচেতনা কি বড়জোর অবচেতনার লীলা। অতএব বর্তমান প্রাণভূমিকে বাইরে থেকে নাড়াচাড়া করে তার মর্মরহস্যের কোনও সন্ধান পাই না যেমন পাই না জড়ের। তারপর প্রাণের মধ্যে যখন মন ফোটে, তখন তারও প্রাথমিক পরিচয় প্রকাশ পায় জৈব-প্রবৃত্তিতে—দেহ ও প্রাণের নানা বুভুক্ষা ও দুরাগ্রহের পরিতর্পণে, সংজ্ঞা বেদনা কামনা ও প্রেতির সংবেগে। অধ্যাস হতে নিজেকে মুক্ত রেখে সাক্ষিভাবে এদের দর্শন করা তার সম্ভব হয় না। মানুষের মনেই সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে বোঝবার জানবার নির্মুক্ত সংজ্ঞানের ঔদার্য দিয়ে গ্রহণ করবার একটা আকূতি। তাই এই মনকে আশ্রয় করেই আত্ম-জ্ঞান ও জগৎ-জ্ঞানের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু মনও প্রথম বিশ্বের বহিরঙ্গনেরই খবর নেয়—প্রকৃতির মধ্যে তার নজরে পড়ে শুধু তথ্য আর প্রক্রিয়া এবং তাহতে চলে তত্ত্বের অনুমান, সিদ্ধান্তের প্রকল্প তর্ক ও জল্পনা। চেতনার রহস্য জানতে হলে নিজেকে তার জানা চাই—আত্ম-সত্তা ও আত্ম-পরিণামের তত্ত্বকে বোঝা চাই নিবিড় করে। কিন্তু পশুর জীবনে উন্মিষন্ত চেতনা যেমন জীবন-যোনি-প্রযত্নের কবলিত, মানুষের মনশ্চেতনাও তেমনি জড়িয়ে গেছে নিজেরই মননের জালে। অবিরাম বয়ে চলেছে চিন্তার প্রবাহ, তাথেকে মনের একমুহূর্ত ছুটি নাই। এমন-কি তার স্বাতন্ত্র্যও নাই। তার যুক্তি ও জল্পনার সকল আড়ম্বরের আড়ালে রয়েছে নিজেরই মেজাজ ঝোঁক সংস্কার ও আশয়ের প্রবেগ, রুচি- ও পক্ষপাত-দুষ্ট নানা প্রবর্তনা, প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। তার তথাকথিত জাগ্রত-বুদ্ধির প্রবৃত্তি ও পরিবেশ গোপনে নিয়ন্ত্রিত করে তারাই। অতএব সত্যের নির্দেশ মেনে মননকে নিয়ন্ত্রিত করবার স্বাতন্ত্র্য আমাদের নাই—আমরা তাকে চালাই আত্মপ্রকৃতিরই অনুশাসনে। কতকটা অনাসক্তভাবে মনন হতে সরে দাঁড়িয়ে মনঃশক্তির খানিকটা গবেষণা আমরা করি বটে। কিন্তু তাতে আমাদের কাছে ধরা পড়ে শুধু মনের চলনটাই —মনের বিশিষ্ট-বৃত্তির উৎস কোথায়, সে-খবর থেকে যায় জানার বাইরে। এমনি করে মনস্তত্ত্বের বহু সিদ্ধান্তই আমরা খাড়া করি, কিন্তু তবু আমাদের আত্ম-স্বরূপ আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকৃতির মর্মসত্যের উপর থেকে অন্ধকারের যবনিকা অপসৃত হয় না।

যোগপন্থায় মনকে প্রশান্ত করলে পর অন্তরাবৃত্ত চক্ষুর কাছে অন্তর-

রহস্যের আবরণ একে-একে খুলে যায়। প্রথম দর্শনে দেখি, মন একটা সূক্ষ্ম পদার্থ—তাকে সামান্য-ব্যাকৃতি অথবা অব্যাকৃত-সামান্য দুইই বলা চলে। অর্থাৎ একাধারে সে প্রকৃতি ও বিকৃতি দুইই। মনঃশক্তির ক্রিয়ায় দেখা দেয় তার বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণ—ভাবনা বেদনা ইচ্ছা প্রযত্ন সামান্য-প্রত্যয় বিশেষ-দর্শন রস ও ভাব প্রভৃতি বিচিত্র চিত্তবৃত্তির আকারে। কিন্তু এই শক্তিই আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে তলিয়ে যেতে পারে আচ্ছন্ন অসাড়তায়, অথবা সমাহিত হতে পারে অবিচল নৈঃশব্দ্যে এবং স্বয়ম্ভূ-চেতনার প্রশান্তবাহিতায়।...তারপরে দেখি, মন তো মনের ব্যাকৃতির উৎস নয়। মনঃশক্তির এক বিপুল প্লাবন বাইরে থেকে তার উপরে আছড়ে পড়ে কখনও নবীন কল্পনায় রূপ ধরছে, কখনও বিশ্বমনের প্রাক্‌সিদ্ধ কোনও কল্পরূপকে ফুটিয়ে তুলছে, কখনও-বা অপর মনের ছায়াকে সংক্রামিত করছে তার 'পরে। আর মন তাদের সবাইকে গ্রহণ করছে আপন ব'লে।...আরও গভীরে দেখি, আমাদের মধ্যে গুহাহিত হয়ে আছে রহস্য-নিবিড় এক অধিচেতন মন—তাহতে উৎসারিত হচ্ছে বিচিত্র মনন দর্শন সংকল্প ও বেদনার প্রবেগ।...তারও পরে দেখি চেতনার উত্তরভূমিতে এক পরতর মনের শক্তি উদ্বেল হয়ে উঠছে, ঝরে পড়ছে এই আধারে।...সবার শেষে দেখি মনোময়-পুরুষকে, মনোধাতু ও মনঃশক্তিকে যিনি ধরে আছেন। তাঁর আবেশ বিধৃতি ও অনুমতি ছাড়া তাদের সত্তা এবং ক্রিয়া সম্ভবই হত না। এই মনোময়-পুরুষকে প্রথম দেখি 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ' সাক্ষিরূপে। কিন্তু তা-ই যদি তাঁর স্বরূপের সবখানি হত, তাহলে মনের ব্যাকৃতিকে বলতাম পুরুষের 'পরে প্রকৃতির প্রাতিভাসিক-প্রবৃত্তির একটা অধ্যারোপ, অথবা পুরুষের কাছে উপস্থাপিত প্রকৃতির একটা বিসৃষ্টি। বিচিত্র ভাবনা-বেদনার কল্পমায়া গড়ে প্রকৃতি তাঁর সামনে ধরছে, আর উদাসীন হয়ে তিনি চেয়ে আছেন তার দিকে। কিন্তু পরে বুঝি, মনোময়-পুরুষ নিশ্চল উপদ্রষ্টার ভূমিকা হতে সরেও দাঁড়াতে পারেন। স্বয়ং চিত্তবৃত্তির উৎস হয়ে তাদের গ্রহণ কি বর্জন করা, এমন-কি তাদের বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা ও অনুমন্তা হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তখনই জানি, সত্তার অন্তর্গূঢ় মনোধাতুই ধরেছে মনোময়-পুরুষের রূপ। আত্মরূপায়ণের আকৃতিতে টলমল তার স্বরূপসত্তা, মনঃশক্তি তারই চিতিশক্তির বিভূতি। অতএব পুরুষের তত্ত্বভাব হতেই যে মনোময় ব্যাকৃতির বিসৃষ্টি, এ-সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয়।...কিন্তু এইখানে একটা গোল বাধে। আরেকদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের ব্যষ্টিমনকে মনে হয় বিশ্বমনের একটা ব্যাকৃতি মাত্র। বিশ্বমনে যে চিন্তার ঢেউ উঠছে, যে ভাবের স্রোত বইছে, যে সংকল্পের আভাস বেদনার আন্দোলন রূপায়ণ ও রূপবোধের আকূতি জাগছে—ব্যষ্টিমন তার ধারণ গঠন ও সঞ্চালনের যন্ত্র শুধু। অবশ্য তারও সাধনাসিদ্ধ একটা নিজস্ব রূপ আছে—যা তার বিশিষ্ট রুচি ও ঝোঁকের,

ব্যক্তিগত মেজাজ ও ধাতের বাহন। তাই বিশ্বমনের প্রেরণাও আধারে স্থান পায় তখনই, যখন ব্যক্তিমনের বিশিষ্ট আত্মরূপায়ণের সঙ্গে তা খাপ খায় অর্থাৎ পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি যখন তাকে আপন বলে মেনে নেয়। এমনি করে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে বলে গোড়ার ওই প্রশ্নটা অমীমাংসিতই থেকে যায় : এই-যে চিত্ত-পরিণামের লীলা, এ কি মনোময়-পুরুষের কাছে বিশ্ব-ব্যাপ্ত কোনও শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত একটা প্রাতিভাসিক সৃষ্টি মাত্র? না পুরুষের অনিরুক্ত অথবা অনির্বাচ্য স্বভাবের 'পরে মনঃশক্তির আরোপিত একটা প্রবৃত্তির আন্দোলন? না এ-সমস্তই আত্মার অন্তর্গূঢ় স্পন্দস্বভাবের একটা সিদ্ধরূপ—হিল্লোলিত হয়ে উঠছে মনের বুকে? এপ্রশ্নের জবাব পেতে হলে তলিয়ে যেতে হবে বিশ্বচেতনার গভীর গহনে—যার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের অখন্ড তত্ত্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে প্রাকৃত-অনুভবের সংকীর্ণ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে।

ব্যষ্টিমনের পরে, এমন-কি অবিদ্যাশবলিত বিশ্বমনেরও ওপারে আছে বিশ্বচেতনার সেই ভূমি—আমরা যাকে বলছি অধিমানস। সেইখানে গেলে কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে? অধিমানসের মধ্যে বিশ্বসত্যের একটা অব্য-বহিত অকুণ্ঠিত আদ্য-প্রত্যয় আছে। অতএব তার মধ্যে হয়তো পাব বিশ্বের আদিচ্ছন্দের কুঞ্চিকা, মহাপ্রকৃতির প্রথমা প্রেতির কোনও অন্তরঙ্গ পরিচয়। একটা কথা অবশ্যই স্পষ্ট : সেখানে ব্যষ্টি ও বিশ্ব দুইই এক লোকোত্তর পরমার্থসতের আত্মবিভূতি, অতএব ব্যষ্টিজীবের প্রাণ-মন অর্থাৎ তার প্রকৃতি-স্থ পুরুষসত্তা যে বিরাট্পুরুষের অংশ-কলা এবং এমনি করে পরোক্ষ অথবা অপরোক্ষভাবে অনুত্তরেরই যে সে আত্মবিভূতি—এও অনস্বীকার্য। হয়তো অনুত্তরের এই জীববিভূতি উপহিত ও অর্ধচ্ছন্ন—তবু ওই তার মর্মসত্য। কিন্তু এও দেখছি, জীব নিজেও সে-বিভূতির অন্তত আংশিক নিয়ন্তা। বিরাট বা অনুত্তরের যে-কলাকে তার প্রকৃতি গ্রহণ ক'রে জীর্ণ ও ব্যাকৃত করতে পারে, তার দেহ-প্রাণ-মনের আধারে তা-ই শুধু রূপায়িত হয়। অনুত্তরের বিভূতিকে বা বিরাটের অন্তর্গূঢ় সত্যকেই সে প্রকাশ করে, কিন্তু সে-প্রকাশের ভাষা তার নিজস্ব—সে তার আত্মপ্রকৃতিরই ব্যঞ্জনা। কিন্তু বিশ্বপ্রতিভাস সম্পর্কে মূল জিজ্ঞাসার উত্তর অধিমানস-বিজ্ঞান দিয়েও হয় না। আমাদের প্রশ্ন ছিল এই : মনোময়-পুরুষের গড়া এই-যে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান মনন ও অনু-ভবের জগৎ, এ কি তার সত্যকার কোনও আত্মরূপায়ণ, তার চিন্ময় স্ব-ভাবের কোনও সত্যের স্বতোব্যাকৃতি—সেই সত্যেরই সম্ভাবিত স্ফুরত্তার একটা অপরিহার্য পরিণাম? না এ শুধু বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিসৃষ্টি বা বিকল্পের উপরাগ তার 'পরে?—তা-ই যদি হয়, তাহলে সে-জগৎকে পুরুষের নিজস্ব বা আশ্রিত বলা চলে এই অর্থে যে, পুরুষের বীর্যবিশেষ দ্বারা রূপায়িত প্রকৃতির

'পরেই তার বৈশিষ্ট্যের নির্ভর। অথবা, মনোজগৎ কি বিশ্ববিকল্পনার একটা খেলা—অনন্তের শাশ্বত নিরঞ্জনসত্তার অনুপাখ্য শূন্যতার ভূমিকায় অবন্ধন খেয়ালের ক্ষণিকা শুধু ?...সৃষ্টিরহস্যের এই তিনটি ব্যাখ্যাই প্রামাণ্যের সমান দাবি নিয়ে মনের কাছে আসে। মন বুঝে উঠতে পারে না কার দাবিকে নৈশ্চিত্যের মর্যাদা দেবে—কেননা প্রত্যেকের পক্ষে তর্কবুদ্ধির ওকালতি আছে, আছে বোধি ও অনুভবের নজির। অধিমানসে এসে এ-সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কেননা, অধিমানসী দৃষ্টিতে প্রত্যেক সম্ভাবনার আত্মরূপায়ণের স্বতঃসিদ্ধ সামর্থ্য আছে—অতএব প্রত্যেকেরই আত্মভাবকে প্রত্যয়াধিরূঢ় করবার, আত্মবিভাবনার সংবেগে অনুভবের জগতে মূর্ত হয়ে ওঠবার স্বচ্ছন্দ অধিকারও আছে।

অধিমানসে, এমন-কি মনের সকল উত্তরভূমিতেই অতিসূক্ষ্ম দ্বৈত-প্রত্যয়ের একটা আবর্তন আছে। তার একদিকে রয়েছে নিরঞ্জন আত্মস্বরূপের নৈঃশব্দ্য—নির্গুণ নির্বিশেষ স্বয়ম্ভূ অলক্ষণ স্বপ্রতিষ্ঠ ও আপ্তকাম। আরেকদিকে রয়েছে অনন্তবিভাবনী এক বিজ্ঞানশক্তির বিপুল স্পন্দন, এক অপ্রমেয় চিতিশক্তির নির্বারিত সিসৃক্ষা—অজস্রধারায় নিজেকে যে ঢালছে বিশ্বের অন্তহীন রূপায়ণে। আপাতদৃষ্টিতে অন্যোন্যবিরুদ্ধ হলেও এ-দুটি প্রত্যয়ের মাঝে একটা সাপেক্ষত্ব বা আপূরণের ভাব আছে—এই মনে করে প্রথম তাদের সহচার কল্পনা করি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সহচার উত্তীর্ণ হয় সগুণ ও নির্গুণের সামানাধিকরণ্যে—নির্গুণ-ব্রহ্ম অপুরুষবিধ অনির্বাচ্য অব্যবহার্য অনাদি-চিন্ময় পরমার্থতত্ত্ব, আর সগুণ-ব্রহ্ম অনাদি-চিন্ময় পরমার্থ-তত্ত্ব হয়েও অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিল নিরুক্তি ও ব্যবহারের শাশ্বত নিদান আধার ও ভর্তা। নির্গুণের মধ্যে যদি স্বানুভবের চরম কোটিকে সমাহিত করি, তাহলে পৌঁছই পরম-নির্বিশেষের প্রপঞ্চোপশম শূন্যতায়—শুদ্ধ-সন্মাত্রের অনির্বাচ্য পরাবর পরম অয়নে। আবার সগুণের মধ্যে যদি অনুভবের চরম উল্লাস খুঁজি, তাহলে পাই দিব্য-পুরুষের এক পরা কোটি—এক অনুত্তর সর্বগত পুরুষবিশেষের পরম ধাম, যিনি যুগপৎ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ, নিখিল-প্রপঞ্চের যিনি শাশ্বত ভর্তা, যাঁর সত্ত্বতনুর একটি অণু লক্ষকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যাঁর আত্মজ্যোতির একটি কিরণলেখায় অনুপাখ্যসত্তার অণুতম অমৃতকলায় উদ্দ্যোতিত হয়ে ওঠে অনন্ত প্রপঞ্চের অগণিত মণিবিন্দুর দীপালি।...আনন্ত্যের এই দুটি বিভাব মনের কাছে অন্যোন্য-বিরোধী দুটি পর্যায়। কিন্তু অধিমানসী চেতনায় উভয়েই সমানভাবে সত্য, উভয়ে একই পরমার্থসত্ত্বের দুটি পরম বিভাব। অতএব এ-দুয়ের পিছনে কোথাও এক 'মহতো মহীয়ান্' অনুত্তরের বৈপুল্য আছে, যার পরম আনন্ত্যে এ-দুটি বিভাবের শাশ্বত উৎস ও আধার। কিন্তু তার স্বরূপ কি ? অন্যোন্য-

বিরোধের উভয়কোটিই যার মধ্যে সত্য, সে কি এক অনির্বাচ্য অনাদিরহস্য নয় —যার এতটুকু প্রত্যয়, এতটুকু আভাস মনেরও অগোচর ? হয়ত কিছু আভাস তার পাই—পরম অনুভবের অবর্ণনীয় ক্ষণভঙ্গে। তার অপ্রমেয় বীর্য ও বিভূতির একটুখানি ইশারা আছে বুঝি পরাৎপর নেতি- ও ইতি-প্রত্যয়ের অবিচ্ছেদ পরম্পরায়। অনির্বচনীয়ের ওই ছায়াপথ ধরেই আমাদের উত্তরায়ণের অভিযান—কখনও 'অস্তি'র আহ্বানে কখনও-বা 'নাস্তি'র স্তব্ধতায়, কখনও আবার দুয়েরই যুগনদ্ধ প্রত্যয়ের অভঙ্গ ব্যঞ্জনায়। কিন্তু তবু শেষপর্যন্ত মনোভূমির উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেও দেখি, অধরা তেমনি অধরাই থেকে গেল —তাকে জানবার কোনও আশ্বাসও কোথাও অবশিষ্ট রইল না।

কিন্তু পরব্রহ্ম বস্তুতই যদি অনির্বাচ্য হন, তাহলে তাঁর প্রকাশ কি বিসৃষ্টি অথবা বিশ্বের উৎপত্তি—কিছুই তো সম্ভব হয় না। অথচ দেখছি বিশ্ব আছে। তাহলে কে সৃষ্টি করল নির্বিশেষের এই আত্মপ্রতিষেধ, কে ঘটাল এই অঘটন, রচল স্বগতভেদের এই নিরুত্তর প্রহেলিকা ? যে রচেছে, তাকে শক্তি বলে মানতেই হবে। আর ব্রহ্মই যখন সর্বপ্রভব অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব, তখন শক্তিও তাঁহতেই উৎসারিত—তাঁর সঙ্গে তার নিশ্চয় একটা সংযোগ বা আশ্রয়ের সম্বন্ধ আছে। কেননা শক্তি যদি ব্রহ্ম হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত একটা তত্ত্ব হয় অর্থাৎ অনুপাখ্যের শাশ্বত শূন্যতায় ব্যাকৃতির লিখন ফুটিয়ে তোলা যদি এক বিশ্বকৃৎ কল্পনার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন— একথা বলা সঙ্গত হয় না। বাধ্য হয়ে তখন বিশ্বের মূলে মানতে হয় সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদের সগোত্র একটা দ্বৈতের লীলা। বিশ্বের বিধাতা যে, সে যদি হয় শক্তি, এবং ব্রহ্মেরই একমাত্র শক্তি—তাহলে ব্রহ্ম হতে তাকে বিবিক্ত কল্পনা করতে গেলে 'ব্রহ্মের সত্তা এবং তাঁর সত্তার শক্তি পরস্পরের প্রতিষেধক, দুয়ের মাঝে অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধই সত্য' এই অসম্ভব যুক্তিতে আমাদের পৌঁছতে হয়। ব্রহ্মকে আমরা বলছি সমস্ত ব্যবহার ও বিশেষণের অতীত। অথচ মায়া বিশ্বকৃৎ কল্পনারূপে তাঁতেই যত ব্যবহার ও বিশেষণ আরোপিত করছে; সুতরাং মায়ার কল্পিত এই আরোপের সাক্ষী ও ভর্তা হতেই হবে ব্রহ্মকে।—কিন্তু তার্কিক বেদান্তীর কাছে এ-সিদ্ধান্তও অচল। ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধকে যদি মানতে হয়, তাহলে তাকে 'সদসদ্‌ভ্যামনির্বচনীয়ম্‌' একটা অপ্রতর্ক্য রহস্য বলেই ধরে নিতে হবে। এ-সম্বন্ধকে স্বীকার করবার এত বাধা যে, সে যদি বিশ্বরহস্যের অপরিহার্য চরম তত্ত্ব না হত, মানুষের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম-অনুভবের চূড়ান্ত প্রত্যয়রূপে সে যদি জোর করে আমাদের স্বীকৃতি আদায় করে না নিত, তাহলে হয়তো তাকে পাশ কাটিয়েই আমরা যেতে পারতাম। কিন্তু তারও তো উপায় নাই। কেননা বিশ্বকে মায়াকল্পিত বলে মানলেও, প্রত্যক্‌চেতনার কাছে তার অস্তিত্ব আছে একথা স্বীকার

করতেই হবে। কিন্তু প্রত্যক্-চেতনা অদ্বিতীয় সন্মাত্রেরই চেতনা। সুতরাং বাধ্য হয়ে বিশ্বকে বলতে হবে অনির্বাচ্য-সতেরই প্রত্যক্-অনুভবের ব্যাকৃতি। আবার যদি বলি, মায়ার ব্যাকৃতি একটা সত্য বিসৃষ্টি, তাহলে প্রশ্ন হবে—কোন্ প্রকৃতির ব্যাকৃতি সে, কি তার স্বরূপ-ধাতু? শূন্য বা অসৎ তার উপাদান—এ সম্ভব নয়। কেননা, ব্রহ্ম ছাড়া আর-কোনও তত্ত্বের কল্পনা করবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা ধরে নিয়েছি, এক অনির্বাচ্য নির্বিশেষই পরমার্থতত্ত্ব। এখন তার পাশে যদি শূন্যকে দাঁড় করাই আরেকটা তত্ত্বরূপে, তাহলে সে কি দ্বৈতবাদেরই আর-একটা ভঙ্গি হবে না?...অতএব সিদ্ধান্ত হয়, পরমার্থতত্ত্বকে কোনমতেই অবিকল্পিত অনির্বাচ্য-স্বভাব বলা চলে না। যা-কিছু বিসৃষ্ট হয়েছে, সে তার আধার এবং উপাদান দুইই। আর পরমার্থ-সৎ যার উপাদান, সেও তত্ত্বত সদ্-বস্তুই। শাশ্বত সত্যস্বরূপ ও অনন্ত সন্মাত্র যিনি, তাঁহতে তত্ত্বের ভান নিয়ে একটা বিরাট অমূল অতত্ত্বের আবির্ভাবই সম্ভব শুধু—একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রহ্ম অবশ্য অনির্বাচ্য—কেননা প্রতীত কোনও বিশেষণ বা সম্ভাবিত বিশেষণের সমাহার দিয়েও তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। কিন্তু তাবলে আত্মবিশেষণেরও সামর্থ্য তাঁর নাই, এ-অর্থে নিশ্চয় তাঁকে নির্বিশেষও বলা চলে না। তাত্ত্বিক আত্মবিশেষণ-বিসৃষ্টির যোগ্যতা নাই পরমার্থসতের, অথবা তাঁর পক্ষে স্বয়ম্ভূ আনন্ত্যের আধারে তাত্ত্বিক আত্মরূপায়ণ কি আত্মস্ফুরণ অসম্ভব—একথা স্বীকার করব কেমন করে?

অধিমানস-ভূমি হতে তাহলে এ-সমস্যার নিশ্চিত চরম সমাধান পাচ্ছি না। সমাধান খুঁজতে এবার যেতে হবে অধিমানসের ওপারে, অতিমানস-প্রত্যয়ের গভীর গহনে। অতিমানস ঋত-চিতের যুগপৎ দুটি বিভাব আছে। একদিকে সে যেমন শাশ্বত-আনন্ত্যের স্বগতসংবিৎ, তেমনি সেই সংবিতে নিরূঢ় আত্ম-ব্যাকৃতির দিব্য সামর্থ্যও বটে। প্রথম বিভাবটি তার অধিষ্ঠান ও পরমপদ: আর দ্বিতীয় বিভাবটি তার সত্তার বীর্য, তার স্বয়ম্ভাবের স্ফুরত্তা। স্বগত-সংবিতের কালাতীত শাশ্বত প্রত্যয়ের ভূমিকায় তার আত্মস্বরূপের সত্যরূপে যা-কিছু ভাসে, তার চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি তাকেই প্রকট করে শাশ্বত কালের কলনায়। অতএব অতিমানস অনুভবে ব্রহ্ম অবিকল্পিত অনির্বাচ্য তত্ত্ব বা সর্ববিশেষণের প্রতিষেধ নন। আনন্ত্যের স্বরূপ-প্রত্যয় অক্ষর-সত্তার নিরঞ্জন স্ব-ভাবে আপ্তকামের অখণ্ডমহিমায় স্তব্ধ হয়ে আছে, তার সকল বীর্য নিঃশেষিত হয়ে গেছে অপরিণামী শাশ্বত স্ব-ভাবের নির্বিকল্প আত্মসমাহিত চেতনায় ও অপ্রচ্যুত স্বয়ম্ভাবের অনুদ্বেল আনন্দে—এইমাত্র ব্রহ্মের সমগ্র তত্ত্ব নয়। সত্তার আনন্ত্যের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে শক্তিরও আনন্ত্য। অতএব ব্রহ্মে যদি শাশ্বত প্রশম ও বিশ্রান্তি থাকে, তাহলে সেইসঙ্গে থাকবে শাশ্বত কৃতি

ও বিসৃষ্টিরও সামর্থ্য। কিন্তু তাঁর কৃতি হবে আত্মনিষ্ঠ, শাশ্বত অনন্ত আত্মস্বরূপের উপাদান হতেই হবে তাঁর বিসৃষ্টি—কেননা তাঁর বাইরে বিসৃষ্টির উপাদান বলে কিছুই থাকতে পারে না। তাঁকে ছেড়ে আর-কোথাও সৃষ্টির আধার আছে—এ-দর্শন একটা বিকল্প মাত্র। বস্তুত সৃষ্টি সম্ভব তাঁকে নিমিত্ত এবং উপাদান করেই—তাঁর সত্তার বহির্ভূত কিছুকে আশ্রয় করে নয়। তাঁর অনন্ত বীর্যকে অবিকল্পিত স্থাণুত্বে অথবা নির্বিকার উপশমে সমাহিত শক্তি-রূপেই শুধু কল্পনা করতে পারি না; তার মধ্যে নিশ্চয় সত্তা ও তপোবীর্যের অন্তহীন সামর্থ্যও থাকবে—অনন্ত চেতনায় অবশ্য সম্পুটিত থাকবে স্বারসিক স্বয়ম্প্রজ্ঞার অফুরন্ত সত্য বিভাবনা। সত্যের সে-বিভাবনা ক্রিয়াপর হলে, আমাদের প্রত্যয়ে তারা সম্ভূত শক্তির বিচিত্র বিভাসরূপে দেখা দেবে, অধ্যাত্ম-বোধে ফুটবে সত্যেরই পরিস্পন্দের বহুধাস্ফুরিত বীর্য হয়ে, রসচেতনায় ধরা দেবে তার স্বরূপানন্দের বিচিত্র সাধন ও বিভঙ্গরূপে। সৃষ্টি তখন হবে আত্ম-রূপায়ণ মাত্র অর্থাৎ অনন্তের অন্তহীন সম্ভাবনার ঋতম্ভরা বিভাবনা। কিন্তু প্রত্যেক সম্ভাবনার পিছনে আছে সত্তার সত্য, সদ্রূপের তত্ত্বভাব—কেননা সত্যের অধিষ্ঠান ছাড়া ভাবের কল্পনাই অসম্ভব। অতএব প্রকাশের লীলায় সদ্রূপেরই একটি অনাদিতত্ত্ব আমাদের প্রত্যয়ে ধরবে পরাৎপর দিব্য-পুরুষের অনাদি-চিন্ময় বিভাবের রূপ এবং তাহতে উৎসারিত হবে তার নিরূঢ় যত সম্ভাবনা, অন্তর্গূঢ় যত উচ্ছলন। তারাই আবার সৃষ্টি করবে অর্থাৎ অব্যক্ত আশয় হতে উৎক্ষিপ্ত করবে নিজের সার্থক রূপায়ণ, আত্মবীর্যের বিভূতি ও স্বগত ক্রিয়া-পরিণাম—এককথায় তাদের আত্মসত্তাই ফুটিয়ে তুলবে তাদের স্বরূপ এবং স্বভাব।...সৃষ্টিব্যাপারের এই হবে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। কিন্তু সৃষ্টিব্যাপারের অখণ্ড রূপটি আমাদের মন চেনে না, সে দেখে শুধু ভূত-অর্থে ভব্য-অর্থের রহস্যময় রূপায়ণ। এর পিছনে যে পূর্ণসত্যের একটা তাগিদ আছে, ভব্যকে সমর্থ ক'রে ভূতে রূপান্তরিত করবার অনতিবর্তনীয় একটা প্রেতি আছে—তা আমাদের অনুমান কি কল্পনায় এলেও নিশ্চিত অনুভবের এলাকায় আসে না। প্রাকৃত-মন দেখে ভূতার্থকে, ভব্যার্থ তার কাছে গবেষণার বস্তু। সৃষ্টির পরিস্পন্দ ও রূপায়ণের মূলে আছে যে অদৃষ্ট নিয়তির নিগূঢ় প্রবর্তনা, তার দিব্যদর্শন হতে সে বঞ্চিত। কেননা বিশ্বভূতের পুরোভাগে রয়েছে বহুমুখী শক্তির অনুকূল সঙ্গমদ্বারা বিচিত্র পরিণামের একটা বহিরঙ্গ প্রশাসন মাত্র। এক বা একাধিক অন্তরঙ্গ নিয়ামক কোথাও যদি থেকে থাকে, অবিদ্যার যবনিকায় তারা আমাদের কাছে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু অতিমানসী দৃষ্টির কাছে বীজপ্রদ পিতার রূপ সুব্যক্ত—এমন-কি তাঁর নিরূঢ় প্রেতিই তার দর্শন ও অনুভবের মর্মসত্য। অতিমানসী বিসৃষ্টির লীলায়নে ভব্যার্থের সঙ্গে ভূতার্থের সম্বন্ধ কল্পনার বিষয় নয়—এক অখণ্ড-সমাহারের অবিচ্ছেদ্য স্পন্দ-

বৃত্তিরূপে তারা নিজেরই মধ্যে সেখানে বহন করছে তাদের আদি-প্রবর্তনার অনতিবর্তনীয় প্রবেগ। অতএব তাদের সমগ্র বিসৃষ্টি ও পরিণামকে জড়িয়ে সেখানে পাই সত্যের সেই অখণ্ডরূপ—সর্ব-সৎএর পূর্ব্য ব্রতরূপে তাঁর সার্থক রূপায়ণে ও বীর্যবিভূতিতে যাকে তারা ফুটিয়ে তুলছে বিশ্বভাবনায়।

অধ্যাত্ম-অনুভবের চরম নিবিড়তায়, অবিকল্পিত প্রত্যয়ের পরম ব্যঞ্জনায় ব্রহ্মকে আমরা বোধিচেতনায় প্রত্যক্ষ করি শাশ্বত-অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দরূপে। অধিমানস এবং মানস প্রত্যয়ে এই অখণ্ড ত্রিপুটীকে তিনটি স্বয়ম্ভূ-বিভাবে বিশ্লিষ্ট এমন-কি বিবিক্ত করাও অসম্ভব নয়। তাই সেখানে কখনও শাশ্বত অহেতুক আনন্দের অবিমিশ্র অনুভবে নেমে আসতে পারে সর্বনাশের অনুপম মাধুর্য—চেতনা বিহ্বল-মূর্ছিত, সত্তা অবলুপ্তপ্রায় হয়ে যেতে পারে তার আবেশে। তেমনি কখনও নির্বিশেষ-চৈতন্যের শুভ্র-জ্যোতির্ময় পরম রিক্ততা, কখনও-বা চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত পরমার্থসতের নিরুপাখ্য শূন্যতা তাদাত্ম্যবোধের প্রলয়ঙ্কর স্তব্ধতা এনে দিতে পারে আমাদের মধ্যে। অতিমানস প্রত্যয়ে কিন্তু এই তিনটিতে এক অখণ্ড-ত্রিপুটী রচিত হয়, যদিও তার মধ্যে একটি বিভাব পুরোধা হয়ে আপন চিন্ময় বিভূতিকে ফুটিয়ে তুলতেও পারে। কেননা, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতগুলি মৌল বিভাবের অথবা স্বগত আত্মরূপায়ণের সমাহার আছে—অথচ সমগ্রভাবে তারা এক নির্বিশেষ অন্বয়ত্রিপুটীতে অনুবৃত্ত রয়েছে।...দিব্য-পুরুষের স্বরূপা-নন্দের মৌল-বিভূতি হল ভাব উল্লাস ও কান্তি। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তাঁর আনন্দ এই ধাতুতে গড়া, এই তার স্বভাব। ভাব উল্লাস ও কান্তি ব্রহ্মসত্তায় আরোপিত বহিরঙ্গ উপাধি মাত্র নয়, অথবা তাঁর অনুমত পরকীয় ধর্মের বিসৃষ্টিও নয়। তারা যেমন তাঁর স্বরূপসত্য—তেমনি তাঁর চৈতন্যের সহজ-ধর্ম, তাঁর সন্ধিনী-শক্তির বীর্য। তেমনি তাঁর নির্বিশেষ-চৈতন্যের মৌল বিভূতি হল প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্প। অনাদি চিৎশক্তির সত্য এবং বীর্য তারা—তারই স্ব-ভাবে নিরূঢ় হয়ে আছে। আবার নির্বিশেষ সন্মাত্রের চিন্ময় মৌল-বিভূতিতে এই নিরূঢ় স্ব-ভাবের ব্যঞ্জনা আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারা তাঁর আত্মপ্রকাশের অবিকল্পিত অধিষ্ঠান, তাঁর স্ববিমর্শের সিদ্ধ উপাদান—আমরা যাকে জানি আত্মা ঈশ্বর ও পুরুষরূপী ত্রিপুটী-শক্তি বলে।

ব্রহ্মের আত্মবিভাবনার ধারা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে দেখি, তাঁর এইসব বৈভব বা ঐশ্বর্যের প্রত্যেকটির আদ্যচ্ছন্দে আবার একটি করে ত্রিপুটী আছে। তাঁর জ্ঞান ফোটে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ত্রিধারায়। প্রেম দেখা দেয় আশ্রয়-বিষয়-রতির ত্রিভঙ্গে। ঈশনা লক্ষ্য ও সিদ্ধিতে সার্থক হয় তাঁর সত্যসঙ্কল্প। ভোক্তা ভোগ্য ও ভুঞ্জনের ত্রিবেণীতে ফোটে তাঁর উল্লাসের নিরবচ্ছিন্ন অনাদি উদ্বেলন। আত্মস্বরূপের প্রকাশেও দেখা দেয় এমনিতর ত্রিপুটীর অব্যভিচরিত বিভাবনা

—বিষয়ী-আত্মা ও বিষয়-আত্মার মাঝে স্বগত-সংবিৎ হয় বিষয়-বিষয়ীর সামরস্যরূপী সেতু-আত্মা। নির্বিশেষ আনন্ত্যদ্বারা অধ্যুষিত হয়ে আছে তাঁর বহুভঙ্গিম এই আত্মবিভাবনা—যাকে বলতে পারি তাঁর চিন্ময়ী মূলা প্রকৃতি। এই মূলা প্রকৃতি হতে ব্যাকৃত হয়—সত্তার আশ্রয়ে সম্বন্ধতত্ত্বের সার্থক ব্যঞ্জনা, চিৎ-শক্তির চিত্র-পরিণাম, সৎ-চিৎ-আনন্দ ও শক্তির অপরূপ রূপোল্লাস, অসীমের ঋতাবরী চিন্ময়ী মহাশক্তির বিশ্বতোমুখী ছন্দোময় প্রবৃত্তি ও আত্ম-রূপায়ণের অকুণ্ঠিত প্রেরণা। তার ফলে সম্ভূতির অন্তস্তল হতে উৎসারিত ও আকারিত হয় ভূতার্থের বিগ্রহ। অতিমানসের একরস-প্রত্যয়ে বিধৃত রয়েছে স্বাভিব্যক্তির এই স্বতঃসিদ্ধ সামর্থ্য—অখণ্ড সত্যের আশ্রয়ে খণ্ডসত্যসমূহের নৈসর্গিক ব্যঞ্জনা সেখানে এক মহাসমন্বয়ের ছন্দ খুঁজে পেয়েছে। অতি-মানসের মধ্যে আরোপ নাই, নাই সৃষ্টির স্বৈরাচার, খণ্ডভাবনার পরিকীর্ণতা বা স্বতোব্যাহত বৈধর্ম্য কি বৈষম্য। এসব দেখা দেয় অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের মধ্যে। মনোভূমিতে আমাদের আত্মচেতনা সীমিত ও সঙ্কুচিত। তাই বস্তুত যা অবিভক্ত তাকে বিভক্তবৎ দর্শন করা এবং বিভক্ত জেনেই তার তত্ত্বানুসন্ধান করা, তাকে হাতের মুঠায় এনে ভোগ করা অথবা তাকে কবলিত করবার চেষ্টায় তারই কবলিত হওয়া—এই তার নিয়তি। অথচ মনের এই অবিদ্যাধূমায়িত চেতনার পিছনেই জ্বলছে চৈত্যপুরুষের অভীপ্সার আগুন। তিনি চান সেই সত্য জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব—যা ওই অবিদ্যাচ্ছন্ন মনোবৃত্তিরও অধিষ্ঠান। আবার চৈত্যপুরুষের এই আকূতি যে মনের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে, এও তার নিয়তি। যে পরমার্থ-সতে জগতের সত্য প্রতিষ্ঠা, জীবের চেতনা যে-অখণ্ডচৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, যে পরমা শক্তির মহাকুণ্ডলী ভূতে-ভূতে কুণ্ডলিত শক্তির উৎস, যে-আনন্দের হিল্লোল হৃদয়ে-হৃদয়ে দোলায় বেদন-দোলা—তার সমূহপ্রত্যয়ের মধ্যে অবগাহন করবার আকুলতা জাগে এই মনেই এবং তার অনুভবও সে পায় নিজের অতলগহনে তলিয়ে গিয়ে। চেতনার এই-যে সঙ্কোচ এবং প্রসার, নিজেকে হারিয়ে আবার যে তাকে এমনি ক'রে খুঁজে পাওয়া—এও চিৎপুরুষেরই স্ববিমর্শের লীলা, তাঁর আত্মবিভাবনার উল্লাস। কখনও-কখনও স্বরূপ-সত্যের বিরোধিরূপে প্রতিভাত হলেও, সীমিত চেতনার প্রত্যেক ব্যাপারে এক দিব্য-প্রতিভার অন্তর্গূঢ় অথচ অতি-বাস্তব দ্যোতনা আছে। তাদের সীমার সঙ্কোচও অনন্তেরই একটা সত্য-বিভূতি অথবা ভব্য-রূপ প্রকাশ করে। মনের কুণ্ঠিত পরিভাষায় এই হল অতিমানস-প্রত্যয়ের যথাসম্ভব পরিচয়। বিশ্বের সর্বত্র এক অখণ্ড-সত্যের দর্শনকে সে-প্রত্যয় এমনি বাঙ্ময়ে আমাদের কাছে বিবৃত করবে—সৃষ্টির রহস্য, বিশ্ব ও ব্যক্তির জীবনায়নের তাৎপর্য বাণীর বীণায় এই ঝঙ্কারেই রণিত হবে।

অথচ ব্রহ্ম যে নির্বিশেষ অনিরুক্তস্বভাব—এও অনস্বীকার্য, কেননা আমাদের অধ্যাত্ম-অনুভবেই এ-ধারণার সমর্থন রয়েছে। বিশ্বভূতকে অতি-মানস-দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই নির্বিশেষ অধিষ্ঠানের কথা ভুললে চলবে না, কারণ ব্রহ্মভাবনার এও আরেকটা দিক। বিশেষ-কোনও উপাধি বা উপাধির সমুচ্চয় দিয়ে ব্রহ্মকে যেমন সীমিত কি বিশিষ্ট করা যায় না, তেমনি আবার নির্বিকল্প সন্মাত্রের অনির্বাচ্য শূন্যতাতেও তাঁকে পর্যবসিত করা যায় না। বরং তাঁকে বলা চলে সকল বিশেষের আধার এবং উৎস। অনিরুক্ত-স্বভাবই তাঁর সত্তার আনন্ত্য ও শক্তির আনন্ত্য উভয়ের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য আশ্রয়। ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিতে বিশেষ-কোনও রূপায়ণ তাঁর নাই বলেই, অনন্তরূপে সর্বময় হয়ে তিনি প্রজাত হতে পারেন। ব্রহ্মস্বরূপের এই অনির্বাচ্যতা আমাদের চেতনায় ফুটে উঠে নিরোধ-সিদ্ধিজাত নেতি-প্রত্যয়ের চরম বিশেষণের পরম্পরায়। তার ফলে আমরা পাই নির্গুণ ব্রহ্মকে —যিনি অক্ষয় অব্যয় স্থাণু আত্মা, অলক্ষণ নিরঞ্জন 'একং সৎ', অপুরুষবিধ নিষ্কল নিষ্ক্রিয় পরম-নৈঃশব্দ্য, অবিজ্ঞেয় অনির্বচনীয় অসৎ। আবার এদিকে তিনি সর্ববিধ বিশিষ্ট-ধর্মের উৎস এবং নিষ্কর্ষ। তাঁর সম্ভূতি-স্বভাবের এই সত্যই আমাদের চেতনায় ফোটে অশেষকল্যাণগুণবাহী ইতি-প্রত্যয়ের চরম বিশেষণের দীপালিতে—অনিরুক্ত-স্বভাব হয়েও নিরুক্তির উচ্ছলতায় সেখানে তাঁর কার্পণ্য নাই। কারণ এও সত্য : আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত, সগুণ ব্রহ্মই 'একং সৎ' থেকেও বহুরূপে হয়েছেন প্রজাত। অনন্ত অনুপম পুরুষবিধ তিনি---নিখিল পুরুষ ও পৌরুষেয়-সত্ত্বের উৎস এবং আশ্রয় তিনিই ভূত-ভাবন, তিনিই শব্দব্রহ্ম—বিশ্বের সকল কর্ম ও প্রবৃত্তির শাস্তা ও বিধাতা। তাঁকে জানলেই সব জানা হয়। তাঁর ইতি-প্রত্যয়ের সঙ্গে আছে নেতি-প্রত্যয়ের সাযুজ্য—কারণ অতিমানস অনুভবে অখণ্ড অন্বয়তত্ত্বকে অন্যোন্যব্যাবৃত্ত দুটি পক্ষে খণ্ডিত করা কখনও সম্ভব নয়। এমন-কি দুটি দর্শনকে দুটি পক্ষ বলাও বাড়াবাড়ি। কেননা, পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে বলে তাদের সহভাব অথবা একীভাব পরমভাবেরই শাশ্বত সত্য—তাদের নিরূঢ় বীর্যের অন্যোন্যসঙ্গমেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অনন্তের আত্মবিভাবনার ঐশ্বর্য।

আবার সগুণ-নির্গুণকে পৃথকভাবে অনুভব করাও একটা নিছক বিভ্রম বা অবিদ্যার বিজৃম্ভণ নয়—কেননা অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে তারও একটা বিশেষ প্রামাণ্য আছে। অবরোহের ধারা বেয়ে জড়ভূতে বিসৃষ্টির পর্যবসান হল, আবার আরোহক্রমে অচিতি হতে শুরু হল তার উত্তরায়ণের অভিযান। এই আরোহ-অবরোহের লীলায় ব্যক্ত-সামান্য অথবা অব্যক্ত-প্রকৃতির ছন্দে মহা-শক্তির হৃদয়ে নিরন্তর যে-আন্দোলন, আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় সেই হৃৎ-স্পন্দনের প্রতিবিম্ব পড়ে পরমার্থ-সতের সবিশেষ আর নির্বিশেষ দুটি

বিভাবে। আমাদের কাছে যে-বিভাব নেতিবাচক, তার মধ্যে আছে অনন্তের আত্মবিশেষণের সঙ্কোচ হতে নির্মুক্ত অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের ব্যঞ্জনা। তার অনুধ্যান ও উপলব্ধিতে আমাদের অন্তর্গূঢ় চিৎস্বভাবের বাঁধন খসে যায়, প্রমুক্তির অনুভবে আমরাও পাই অতীন্দ্রিত ঈশনার অধিকার। নির্বিকার আত্মস্বরূপের প্রত্যয়ে একবার সমাহিত হলে কি তার স্পর্শ নিয়ে এলে, অন্তরের অন্তরে প্রকৃতিকল্পিত উপাধির সব গ্রন্থি শিথিল হয়ে খসে পড়ে। এই হল নিত্যে প্রতিষ্ঠার অনুভাব। অথচ লীলার দিক দিয়ে ওই সিদ্ধ স্বাতন্ত্র্য চেতনায় মাহেশ্বরী সৃষ্টির অবন্ধন সামর্থ্য ফুটিয়ে তোলে। আবার সে-সৃষ্টির উল্লাসকে প্রত্যাহৃত ক'রে প্রমুক্ত সত্যধৃতি ব্যাহৃতিমন্ত্রে উৎসর্পিণী সৃষ্টির নবায়নে স্তরে-স্তরে আপনাকে বিকসিত করতে পারে। নির্বিশেষ রিক্ততার এই স্বাতন্ত্র্য চিৎস্বরূপের ঋতময়ী সম্ভূতির অনন্ত বৈচিত্র্যকে দেয় সার্থকরূপ। অবন্ধন বলেই তিনি আত্মকল্পিত নিয়তি বা ঋতায়নের বন্ধন-জালের কুশলী শিল্পী। নির্বিশেষ নেতি-প্রত্যয়ের অনুধ্যান ও অনুশীলনে ব্যক্তির মধ্যেও বিশ্বরূপের এই লীলা-স্বাতন্ত্র্য সংক্রামিত হয়। তাই আত্ম-বিভাবনার এক পর্ব হতে উত্তর পর্বে উত্তীর্ণ হবার কৌশল তার অধিগত হয়। অতএব মানস হতে অতিমানস অভিযানের বেলায়, মহাপরিনির্বাণের গহন অনুভবে মনোময়ী চেতনা ও অহন্তার প্রলয়ে চিত্তবিমুক্তির পরমা প্রশান্তিকে আস্বাদন করা অতিমানসী সিদ্ধির শুধু অনুকূল নয়—বলতে গেলে অপরিহার্য সাধন। চেতনার যে উত্তুঙ্গ অন্তরিক্ষলোক থেকে ব্যক্তসতের আরোহ ও অবরোহের সোপানমালা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়, যে-ব্যাপ্তিচেতনা সাধকের মধ্যে লোক হতে লোকান্তরে উত্তরণ ও অবতরণের স্বচ্ছন্দ অধিকার এনে দেয় —তাকে পেতে হলে নিরঞ্জন আত্মস্বরূপের নৈঃশব্দ্যে অবগাহনই তার একমাত্র ভূমিকা। পরমার্থ-সতের আদিবিভাব ও আদ্যশক্তির যে-কোনও একটিকে বিবিক্ত তাদাত্ম্যভাব দ্বারা সম্পূর্ণ অধিগত করবার সামর্থ্য অনন্তের চেতনায় নিরূঢ় হয়েই আছে। কিন্তু একটি ভাবকে চরম ও পরম মনে করে চিত্তের সমস্ত ভাবনাকে তার মধ্যে গুটিয়ে রাখবার সংকীর্ণ প্রয়াস সে-অনুভবে নাই— যেমন আছে প্রাকৃত-মনের মধ্যে, কেননা তাতে অনন্তের বিচিত্র বিভাব ও শক্তির অখণ্ড অনুভবের সাধনা ব্যাহত হয়। এই বিবিক্ত অথচ অবিরুদ্ধ অনুভব অধিমানস-প্রত্যয়ের স্বরূপ। সে চায় অনন্তের প্রত্যেকটি বিভাবকে প্রত্যেকটি শক্তিকে ভব্যার্থের প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনাকে স্ব-তন্ত্র সিদ্ধির মর্যাদা দিতে। কিন্তু অতিমানসী চেতনায় যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ভূমিতে ফোটে নিখিলের অখণ্ড একত্বের চিন্ময় অনুভব, যে-কোনও বিভাবের পূর্ণতম সিদ্ধিতেও থাকে ওই অদ্বৈতানুভবেরই নিবিড় ব্যঞ্জনা। প্রত্যেকটি ভূমির স্বারসিক আনন্দ বীর্য ও সার্থকতার অখণ্ড সংবিৎ সেখানে অব্যাহত রয়েছে

বলে নেতি-ভাবনার পরিপূর্ণ স্বীকৃতিতেও ইতি-ভাবনার সত্য নিরাকৃত হয় না। এই সর্বাধার একত্বের চেতনা অধিমানসেও আছে, নইলে ভাব হতে ভাবান্তরে সংক্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য তার থাকত না। ব্যাবহারিক মনের জগতে সর্ববিভাবের একত্ববিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে চেতনার মধ্যে দেখা দেয় অন্যোন্যবিবিক্ত ইতি-প্রত্যয়ের মূঢ় অভিনিবেশ। কিন্তু সেখানেও মনের অবিদ্যার মধ্যে, তার ঐকান্তিক অভিনিবেশের আড়ালে অখণ্ড-ভাবের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই বোধিজাত গহনপ্রত্যয়ের আকারে অথবা ঐতদাত্ম্যের ভাবনা ও বেদনায় কখনও-কখনও তার আভাস ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু চিন্ময় মনে এ-অনুভব সাধকের নিত্য সহচর।

পরমার্থ-সতের মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্বগত ব্রহ্মের সমস্ত বিভাবের মর্মসত্য। এমন-কি যে-অচিতির বিভূতি বা বীর্যকে শাশ্বত চিন্ময় তত্ত্বের প্রতিষেধ অথবা একান্তবিরোধী প্রত্যয়রূপে কল্পনা করি, তাও বিশ্বচেতন স্বয়ম্প্রজ্ঞ অনন্তস্বরূপের স্বগত-সত্যের একটা অভিব্যক্তি। বিচক্ষণের দৃষ্টিতে আনন্ত্যের যে-শক্তি চেতনাকে আত্মবিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়ে আত্ম-সংবৃত্তির সম্মূঢ় কুণ্ডলী রচে, তা-ই অবিদ্যা। তার গভীর গহনে কিছুরই প্রকাশ নাই, অথচ অপ্রতর্ক্য সত্তা নিয়ে আছে সবই এবং যে-কোনও মুহূর্তে অনির্বচনীয় অব্যক্তের সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠতেও পারে। চেতনার উত্তুঙ্গ ভূমিতে, এই অন্তহীন বিরাট যোগনিদ্রা আমাদের মধ্যে জাগায় অনুত্তর অতিচেতনার প্রভাস্বর প্রত্যয়। আবার সত্তার আরেক কোটিতে দেখি, নিজের মধ্যে আত্মস্বরূপের বিরোধী ভাবনাকে অবভাসিত করবার সামর্থ্যরূপে চিতের মধ্যে এই তমিস্রা অসত্তার অতল গহন হয়ে দেখা দিয়েছে অচেতনার অব্যক্ত অমানিশারূপে—যার মূর্ছিত অসাড়তায় সংবিতের অন্তিম স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত। অথচ সৎ-চিৎ-আনন্দের সকল বিভূতির উন্মেষও এতেই সম্ভাবিত। কিন্তু সে-সম্ভাবনা রূপ নেয় অল্পে-অল্পে—ভ্রূণের বিলম্বিত লয়ে। ধীরে-ধীরে সে আত্মরূপায়ণের দল মেলে—তার মধ্যে আত্মস্বভাবের প্রতিকূলতাও অসম্ভব নয়। এক অন্তর্গূঢ় সর্বসত্তা সর্বানন্দ ও সর্ববিদ্যার বিলাস হয়েও সে মেনে নেয় আত্মবিস্মৃতি আত্মসংকোচ ও আত্মবিরোধের শাসন : এবং অবশেষে তাকে পরাভূত করে হয় সর্বজয়ী। জড়বিশ্বের নিখিল জুড়ে এই অচিতি ও অবিদ্যার লীলাই আমরা দেখি। একে চিৎ-সত্তার একান্ত প্রতিষেধ বলতে পারি না—বরং শাশ্বত অনন্ত সন্মাত্রের অন্যতম বিভূতি ও সাধন বলেই মানি।

এইবার দেখতে হবে বিশ্ব-ভাবের অখণ্ড-দর্শনে বিশ্বের চিন্ময়-বিধানের কোন্ বিশেষ পর্বে অবিদ্যার স্থান। আমাদের সকল অনুভবই যদি একটা অধ্যারোপ বা ব্রহ্মে কল্পিত একটা অবাস্তব খেয়াল হয়, তাহলে বিশ্ব

বা জীবের জীবন স্বভাবতই হবে একটা অবিদ্যার খেলা। তখন সত্যকার বিদ্যার স্থান হবে একমাত্র ব্রহ্মের অনির্বাচ্য স্বগত-সংবিতে। যদি বলি : কালাতীত-সত্তার সাক্ষী চেতনার ভূমিকায় বিশ্ব কালাবচ্ছিন্ন প্রাতিভাসিক বিসৃষ্টি; সৃষ্টি কোনও তত্ত্বভাবের স্ফুরণ নয়—এ শুধু স্বতঃপরিণামিনী প্রকৃতির স্বৈরলীলা—তাহলেও তো তাকে অধ্যারোপই বলতে হবে। সৃষ্টিকে জানতে গিয়ে আমরা তখন জানব শুধু অচিরস্থায়ী সত্তা ও চেতনার একটা সাময়িক বিকল্পনাকে। তাকে কিছুতেই তত্ত্বদর্শন বলব না, বলব শাশ্বত-অনুভবের আকাশে ভেসে-যাওয়া সন্দিগ্ধ সম্ভূতির একটা ছায়াদর্শন মাত্র। কিন্তু বিশ্ব যদি ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হয়, ব্রহ্মসত্ত্বের আবেশ যদি হয় তার আত্মভাবের হেতু, ব্রহ্মের সর্বাবগাহিতা যদি হয় তার উপাদান—তাহলে বিশ্বও তো ব্রহ্মেরই মত সত্য। তখন জীবভাব ও জগৎভাবের সংবিৎও স্বরূপত অনন্ত আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের চিন্ময় বিলাস। অবিদ্যা তখন সেই চিদ্বিলাসের একটা গৌণবৃত্তি—একটা আচ্ছন্ন অথবা সঙ্কুচিত প্রত্যয়। আপাতদৃষ্টিতে একটা উন্মিষন্ত জ্ঞানের অপূর্ণ ও খণ্ডিত লীলাই চোখে পড়বে তার মধ্যে, যদিও তার অন্তরে ও অন্তরালে থাকবে পরিপূর্ণ আত্ম-সংবিৎ ও সর্বসংবিতের নিগূঢ় আবেশ। অবিদ্যার এ-প্রবৃত্তি হবে একটা সাময়িক প্রতিভাস মাত্র—একে কিছুতেই বিশ্ব-ভাবনার নিমিত্ত এবং উপাদান বলা চলবে না। অবিদ্যার অনতিবর্তনীয় চরম সার্থকতা ঘটবে চিৎস্বরূপের নির্মুক্ত উদয়নে। সে-উদয়ন বিশ্ব হতে বিশ্বোত্তর আত্মসংবিতের অবি-কল্পতায় নয়, কিন্তু এই বিশ্বেরই মধ্যে আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের সম্যক পরিস্ফুরণে।

আপত্তি হতে পারে : অতিমানস-প্রত্যয়ই বা কেন সত্যের চরম পরিচয় হবে ? মানস ও অধিমানস ভূমি হতে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের অনুভবের মধ্যে অতিমানসী চেতনা তো একটা অন্তরিক্ষলোক মাত্র। তারও পরপারে রয়েছে চিৎ-প্রকাশের অনুত্তুঙ্গ কত ভূমি, যার মধ্যে বহুভাবনায় একত্বের সমাবেশই সত্তার মর্মপরিচয় নয়। বরং আত্মসমাহিত তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ের অবিকল্প অখণ্ডতাই সেখানে সত্তার স্বরূপ।...কিন্তু অতিমানস ঋতচিতের অকুণ্ঠ প্রচার সে-ভূমিতেও রয়েছে, কেননা অতিমানস সচ্চিদানন্দেরই স্বরূপশক্তি। সে-ভূমির বৈশিষ্ট্য ফোটে উপাধির সাবলীলতায়। অর্থাৎ উপাধি সেখানে মোটেই ভেদের প্রযোজক নয়, কিন্তু অন্যোন্যসঙ্গমজনিত সামরস্যে তারা প্রত্যেকে সান্ত হয়েও সীমাহারা। কেননা মৌল-বিভাবের অভঙ্গ-সমগ্রতায়, প্রত্যেকের মধ্যে সবার যেমন তেমনি সবার মধ্যে আছে প্রত্যেকের সমাবেশ—আছে এক অনাদি তাদাত্ম্যসংবিতের পরাকাষ্ঠা, চেতনার অন্যোন্যভাবনা ও অন্যোন্যসঙ্গমের এক পরমকোটি। আমাদের পরিচিত জ্ঞানব্যাপারের অস্তিত্ব

সেখানে থাকবে না—তার কোনও প্রয়োজন হবে না বলেই। কেননা সেখানে চেতনার অপরোক্ষবৃত্তি সন্মাত্রের স্বরূপেই ফুটবে—অন্তরঙ্গ তাদাত্ম্যভাবনায় নিবিড় হয়ে, নিরূঢ় আত্মসংবিৎ ও সর্বসংবিতের বাহনরূপে। অথচ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিলাসও সেখানে ক্ষুন্ন হবে না। চিদ্‌বৃত্তির বিচিত্র লীলায়নে, আনন্দের অন্যোন্যসঙ্গমে, স্বরূপশক্তির অন্যোন্যসম্পর্কে উচ্ছল থাকবে এইসব চিন্ময়ী ভূমির উত্তুঙ্গ শিখর—নির্বর্ণ অব্যাকৃতির শূন্যতায় শুদ্ধ-সন্মাত্রের নিরালম্বপুর হয়েই থাকবে না।

তবু হয়তো শুনব : যা-ই হ'ক, লোকবিসৃষ্টির ঊর্ধ্বে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের পরমধামে শুদ্ধ-সন্মাত্র শুদ্ধ-চৈতন্য ও শুদ্ধ-আনন্দের স্বগত-সংবিৎ ছাড়া আর-কিছুই তো থাকতে পারে না। অথবা, সত্য বলতে সৎ-চিৎ-আনন্দের এই মহাত্রিপুটীও হয়তো পরম-আনন্ত্যের অনাদি-চিন্ময় আত্ম-বিশেষণের একটা ত্রিস্রোতা শুধু। সুতরাং অন্যান্য বিশেষণেরই মত অনির্বাচ্য নির্বিশেষের মধ্যে তাদেও কোনও সত্তা থাকবে না।...কিন্তু আমরা বলি : এরাও বস্তুত পরমার্থ-সতের স্বরূপসত্য এবং সেই নির্বিশেষের মধ্যেই রয়েছে তাদের পরম তত্ত্বভাবের সিদ্ধসত্তা—যদিও তাদের স্বরূপ সেখানে অনির্বচনীয়, এমন-কি অধ্যাত্মচিত্তের তুঙ্গতম উপলব্ধির ব্যঞ্জনাতেও তাদের অনুপাখ্য মহিমা ব্যক্ত হয় না। সত্য বলতে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তহীন শূন্যতার রহস্যগহন বা নেতিভাবনার চরম সমাহার মাত্র নন। আবার, অনাদি সর্বগত পরমার্থ-সতের কোনও-না-কোনও স্বরূপশক্তির প্রেষণা যার মূলে নাই, কোথাও কোনকালেই তার বিসৃষ্টিও সম্ভব হতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর—মায়া প্রকৃতি ও শক্তি

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্।

গীতা ১৩।১৬

সর্বভূতে অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত হয়ে আছেন তিনি।

—গীতা (১৩।১৬)

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।১

ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।১।১)

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

গীতা ১৩।১৯

প্রকৃতি আর পুরুষ দুইই জেনো অনাদি ও শাশ্বত।

—গীতা (১৩।১৯)

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।১০

মায়াকে জানতে হবে প্রকৃতি আর মায়াধীশকে মহেশ্বর।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪।১০)

দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
বিদাম দেবম্ ... ॥
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥
একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১,৭,৮,১১

বিশ্বভুবনে এই সেই পরমদেবতার মহিমা, যার দ্বারা ভ্রামিত হচ্ছে এই ব্রহ্মচক্র। জানতে হবে তাঁকেই, যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার পরম দেবতা। পরা তাঁর শক্তি এবং বিচিত্র অথচ স্বাভাবিক তাঁর জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া। সর্বভূতে গূঢ় হয়ে আছেন এক দেবতা—সর্বব্যাপী তিনি, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিখিলকর্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী চেতা কেবল ও নির্গুণ।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১,৭,৮,১১)

অতএব বিশ্বের মূলে আছেন এক পরমার্থসৎ, যিনি শাশ্বত অনন্ত ও নির্বিশেষ। অনন্ত ও নির্বিশেষ বলেই তাঁর স্বরূপ অনির্বাচ্য। মন সান্ত ও বিশেষদর্শী, তাই বিশিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে তাঁর ধারণা করতে পারে না। তাঁকে প্রকাশ করতে গিয়ে মনঃকল্পিত বাণী মূক হয়ে যায়। 'নেতি নেতি' বলেও তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, কেননা তিনি ছাড়া আর কি আছে যে তাঁর মধ্যে

কারও প্রতিষেধ চলতে পারে? আবার 'ইতি' দিয়েও সে-অশেষকে আমরা শেষ করতে পারি না, কেননা কোনও বিশেষণেই তাঁর সম্যক নিরূপণ হয় না। কিন্তু এমনি করে জানতে না পারলেও, তাঁকে একেবারে সর্বতোভাবে অজ্ঞেয়ও বলতে পারি না। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ; অথচ তিনি অবাঙ্‌মানসগোচর হলেও প্রত্যক্‌পুরুষের তাদাত্ম্যবোধে তাঁর অনুভব স্বতঃসিদ্ধ—কেননা এই পরমার্থসৎই আমাদের অন্তরাত্মার স্বরূপ ও স্বসংবেদ্য অনাদিতত্ত্ব।

নির্বিশেষ আনন্ত্যহেতু মনের কাছে অনির্বাচ্য হয়েও, পরমার্থসৎ আমাদের প্রাপঞ্চিক চেতনায় নিজেকে ব্যাকৃত করেন তাঁর স্বরূপসত্যের বিশ্বাত্মক অথচ বিশ্বোত্তীর্ণ বিভূতি দিয়ে। বিশ্বের মূলে এই সত্য-বিভাবনার আবেশ রয়েছে। আমাদের সামান্য-প্রত্যয়ে পরমার্থসতের স্বরূপসত্য যেসব মৌল-বিভাবের আকারে ফুটে ওঠে, আমরা তাতেই সর্বগত ব্রহ্মের পরিচয় ও অনুভব পাই। তাদের স্বরূপ ধরা পড়ে বুদ্ধির কাছে নয়, অধ্যাত্মচেতার বোধির কাছে—চেতনার স্বরূপধাতুতে নিরূঢ় স্বারসিক প্রত্যয়ে। চিত্তের সামান্য-প্রত্যয়ে যদি ভাবের দ্যোতনা উদার ও সাবলীল হয়, তাহলে এই চিত্তেও তার আভাস ফুটতে পারে বটে। তখন সুস্পষ্ট বিশেষণের কঠিন নিগড়ে যে-ভাষা ভাবের সূক্ষ্মতা এবং ঔদার্যকে কুণ্ঠিত করতে চায় না, তার স্বচ্ছন্দ ব্যঞ্জনাশক্তি ওই নির্মুক্ত ভাবের বাহন হতে পারে। বৃহতের অনুভব বা ভাবনাকে ঠিকমত ফুটিয়ে তোলবার জন্য নতুন ভাষা গড়তে হবে—যার মধ্যে একাধারে রূপ পেয়েছে তত্ত্বদর্শনের গভীরতা এবং কবিমানসের রূপায়ণী প্রতিভা, কল্পনার জীবন্ত ব্যঞ্জনা বহন করছে অপরোক্ষ-অনুভবের নিখুঁত অর্থপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ইশারা। বেদ আর উপনিষদের মধ্যে এমন ভাষার পরিচয় পাই—ভাবের ঘনবিগ্রহরূপে যা অতিসূক্ষ্ম ও সারবৎ বিশ্বতোমুখীনতায় বজ্রমণির মত সংহত। সাধারণ দর্শনের বুলিতে আমরা শুধু দূরান্তের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিই, আচ্ছিন্ন সামান্য-প্রত্যয় দিয়ে গড়ি সত্যের একটা আবছা রূপ। বুদ্ধির কাছে হয়তো তার যথেষ্ট সার্থকতা আছে, কেননা, তর্ক দিয়ে তত্ত্ব বুঝতে গেলে এইধরনের ভাষা আমাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু সামান্যের ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট-প্রত্যয়ের অন্তরঙ্গ অনুভবে দীপ্ত না হলে তো সত্যের বাণী-রূপ ফুটবে না। তাই বুদ্ধিতে তখন লোকাতত ন্যায়ের পদ্ধতি বর্জন করে শ্রৌতমীমাংসার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এমনিতর দর্শন ও মনন দ্বারাই সকল বিরোধের সমন্বয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ রহস্যের অনির্বচনীয়তাকে আমরা ধারণা করতে শিখি। তা না করে সান্তের ন্যায়কে যদি অনন্তের নিরূপণে প্রয়োগ করি, তাহলে সর্বগত ব্রহ্মকে ধরতে গিয়ে আমরা আঁকড়ে ধরব ভাবের একটা কুহেলিকা অথবা অহল্যা বাণীর পাষাণী প্রতিমাকে শুধু—বুদ্ধির সূচীমুখে ফুটবে তত্ত্বের যে তীক্ষ্ণ-কঠিন রূপরেখা, তার মধ্যে থাকবে না প্রমুক্ত প্রাণের

ছন্দ। প্রমাণ যদি প্রমেয়ের অনুরূপ না হয়, তাহলে প্রমা অর্জন করতে গিয়ে আমরা সৃষ্টি করব শুধু জল্পনার ধোঁয়া এবং তা-ই দিয়ে পাব জ্ঞানাভাসকে—জ্ঞানের সত্যকে নয়।

ব্রহ্মের সত্য-বিভাব এমনি করে আমাদের চেতনায় ফোটে শাশ্বত-অনন্ত নির্বিশেষ সত্তার স্বয়ম্ভাব স্বয়ংসংবিৎ ও স্বরূপানন্দের মহিমা নিয়ে; এই সর্বগত পরমার্থ-সত্যই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও অন্তর্যামী আয়তন। এই স্বয়ম্ভূ-সত্তা আবার আত্মস্বরূপের এক দিব্য-ত্রিপুটীতে নিজেকে প্রকাশ করেন—ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যায় যাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মের আত্মভাব পুরুষভাব ও ঈশ্বরভাব। ব্রহ্মের এই তিনটি সংজ্ঞার মূলে রয়েছে বোধিজাত গভীর প্রত্যয়। অতএব তাদের মধ্যে যেমন ভাবনার অবিকল্পিত ব্যাপ্তি আছে, তেমনি আছে ব্যঞ্জনার সাবলীলতা—যার জন্যে একদিকে যেমন তাদের বাচ্যার্থ অস্পষ্ট নয়, তেমনি তাদের ব্যঙ্গ্যার্থও কুণ্ঠিত নয় বুদ্ধিবৃত্তির অতিসঙ্কোচে। এই পরমব্রহ্মকে পাশ্চাত্যদর্শনে বলা হয় absolute বা নির্বিশেষ তত্ত্ব। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েও সর্বগত—কেননা সমস্ত বিশেষণেই তাঁর রূপায়ণ বা পরিস্পন্দ, অতএব তিনি অসম্ভূতি হয়েও সর্বসম্ভূতি। নির্বিশেষ-ব্রহ্মের আলিঙ্গনে সকল বিশেষ বাঁধা পড়েছে, তাই উপনিষদ বলেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'অন্নং ব্রহ্ম প্রাণো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম'। প্রাণের অধিপতি বায়ুকে সম্বোধন করে বলেন, 'ত্বং বায়ো প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি'। মানুষ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রত্যেককে ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূতরূপে দর্শন করে বলেন 'ত্বং স্ত্রী পুমান্ কুমার উত বা কুমারী—জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি—নীলঃ পতঙ্গঃ—হরিতো লোহিতাক্ষঃ!' ব্রহ্মই সর্বভূতে চিতিরূপে সংস্থিত হয়ে নিজেকে জানছেন। শক্তিরূপে তিনিই দেবতার বীর্য, অসুরের বল, মানুষের রয়ি, পশুর প্রযত্ন, প্রকৃতির লীলা ও রূপায়ণ। ভূতে-ভূতে তিনিই 'অন্তর্হৃদয়ে আকাশ আনন্দঃ'—যাঁকে ছেড়ে জীবের প্রাণ বাঁচে না, চেষ্টা চলে না। অন্তর্যামিরূপে 'সর্বেষাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' তিনি—নিজেরই অধিবাসিত রূপে-রূপে ফুটে উঠছেন প্রতিরূপ হয়ে। সর্বভূত-মহেশ্বররূপে চেতনের মধ্যেও চেতন তিনি। আবার অচিতিরও তিনি গুহাহিত চৈত্য—অপরা প্রকৃতির বশে অবশ যারা, তাদেরও প্রশাস্তা। কালের অতীত তিনি, আবার তিনিই কাল। দেশাতীত তিনি, অথচ অনন্ত দেশ ও তার আধেয় তাঁরই ব্যাপ্তির বৈভব। বিশ্বের নিমিত্তরূপে তিনিই কার্য ও কারণের পরম্পরা। তিনিই মন্তা ও তার মনন, তেজস্বী ও তার তেজ, দ্যূতকার এবং তার ছলনা। নিখিল তত্ত্ব বিভাব ও প্রতিভাস—সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নির্বিশেষ বিশ্বোত্তীর্ণ অনুচ্ছিষ্ট—বিশ্বোত্তর সত্তারূপে বিশ্বের ভর্তা, বিশ্বাত্মকরূপে সর্বভূতের আধার। আবার ভূতে-ভূতে তিনিই আত্মা। জীবের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ তাঁরই 'অংশঃ সনাতনঃ'—

তাঁর জীবভূতা পরা প্রকৃতি। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তাঁরই সত্তাতে সবার সত্তা—কেননা বিশ্বের সব-কিছু ব্রহ্ম। আত্মা এবং প্রকৃতিতে যা-কিছু দেখছি, ব্রহ্মের তত্ত্বভাবেই তার তত্ত্ব। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সব হয়েছেন তাঁর যোগমায়ায়—তাঁর আত্মরূপায়ণী চিৎশক্তির অকুণ্ঠ সামর্থ্যে। চিদ্ঘন পুরুষরূপে চিন্ময়ী আত্মপ্রকৃতিকে অবষ্টম্ভ করে তিনিই আপনাকে ব্যক্ত করলেন রূপে-রূপে। আবার শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ সর্বজ্ঞ মহেশ্বররূপে তিনিই আপনাকে ফুটিয়ে তুললেন কালের কলনায়, বিশ্বচক্রের হলেন নিয়ন্তা।...এমনি করে অফুরন্ত ব্যঞ্জনায় অশেষ অর্থের প্রকাশ তাঁর এই স্তোমরাজিতে। মন তার একটি দিক বেছে নিয়ে তাকেই ঐকান্তিক ভেবে আর সব-কিছু ছেঁটে ফেলতে পারে—কিন্তু সে হবে মনেরই বিকল্প মাত্র। তাঁর সম্যক-জ্ঞান পেতে হলে আমাদের দাঁড়াতে হবে তাঁর বিশ্বতোমুখী অভিব্যঞ্জনার অখণ্ড-দর্শনের 'পরেই।

এক শাশ্বত অনন্ত নির্বিশেষ স্বয়ম্ভূ-সত্তা স্বতঃ-সংবিৎ ও স্বরূপানন্দই বিশ্বরূপে অন্তর্গূঢ় ও পরিব্যাপ্ত থেকেও বিশ্বোত্তীর্ণ হয়ে রয়েছেন—আমাদের অধ্যাত্ম-অনুভবের এই হল আদিম প্রত্যয়। কিন্তু এই পরমার্থ-সৎ একদিকে যেমন পুরুষ-সমাখ্যার অতীত অতএব নিরুপাখ্য, তেমনি আবার তিনি পুরুষবিধও বটে। যেমন তিনি সন্মাত্রস্বরূপ, তেমনি শাশ্বত অনন্ত নির্বিশেষ সত্ত্বতনুও তিনি। নির্বিশেষ সর্বগত ব্রহ্মের মধ্যে যেমন পাই আত্মা পুরুষ ও ঈশ্বরের ত্রিপুটী, তেমনি তাঁর চিৎশক্তিকেও দেখি মায়া প্রকৃতি আর শক্তির ত্রয়ীরূপে। ব্রাহ্মী চেতনার যে-স্বরূপশক্তি আপন ব্যাকৃতিকে ভাবলোকে রূপকল্পনায় সার্থক করছে, তাকে বলি মায়া। আবার সাক্ষি-পুরুষের অনিমেষ দৃষ্টির প্রেষণায় আত্মপরিণাম দ্বারা ভাবকে বস্তুরূপে আকারিত করছে যে, তাকে বলি প্রকৃতি। আর দিব্য-পুরুষের যে চিন্ময় বীর্য যুগপৎ ভাব-সৃষ্টি ও বস্তু-কৃতির লীলা-নটী, সে-ই হল শক্তি।··ব্রহ্মের ওই তিনটি বিভাব আর এই তিনটি শক্তিই সমগ্র বিশ্বসত্তা ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিষ্ঠা এবং আয়তন। তাদের অখণ্ড একরস প্রত্যয়ে ঘটে বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্ব ও বিবিক্ত-জীবত্বের মধ্যে আমাদের কল্পিত যত ভেদ ও বৈষম্যের অবসান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, বিশ্বপ্রকৃতি আর আমাদের জীবস্বভাব—এই তিনের সম্পুটিত প্রত্যয়কে আমরা অখণ্ড-অন্বয়ের এই ত্রিপুটীতে খুঁজে পাই। বিবিক্ত দর্শনে, পরব্রহ্মের নির্বিশেষ অনুভবে যেমন সবিশেষ বিশ্বের সমাধান সম্ভব হয় না, তেমনি পরমার্থসতের দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় একাকিত্বের সঙ্গে আমাদের জীবস্বভাবের বাস্তবতাও অসমঞ্জস হয়। কিন্তু বস্তুত ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েও সকল বিশেষে যুগপৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর নির্বিশেষ স্বভাব যেমন সকল বিশেষণ হতে স্ব-তন্ত্র, তেমনি সকল বিশেষণের প্রতিষ্ঠা আয়তন শাস্তা এবং উপাদানও বটে—কেননা সর্বগত ব্রহ্মসত্তার বাইরে আর-কিছুরই সত্তা তো সম্ভাবিত নয়।

এমনি করে আত্মবিভাবনাতেও তিনি অপ্রচ্যুত-স্বভাব, এই তাঁর অনির্বচনীয় রহস্য। কি করে তা সম্ভব হয়, তাঁর দ্বিধা-বিলসিত বিভাব ও শক্তির অখণ্ডিত অনুশীলনের ফলেই তার তত্ত্ব বুঝতে পারি।

সম্যক্-দর্শনের অনুপাহিত একরস-প্রত্যয়ের আলোকে ব্রহ্মের স্বয়ম্ভূ-সত্তা ও স্বকৃৎ-শক্তির লীলা যখন দেখি, তার মধ্যে বিচ্ছেদের কোনও আভাস তখন থাকে না—অখণ্ড স্বভাবের নিঃসংশয়তা চেতনায় ফুটে ওঠে নিটোল হয়ে। কিন্তু যত সমস্যা ভিড় করে আসে—তর্কবুদ্ধির বিশ্লেষণ যখন শুরু হয়। কেননা আনন্ত্যের নির্মুক্ত অনুভবকে তর্কের ছকে বন্দী করবার চেষ্টা করলে এ-দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী। সত্যের রূপ বিচিত্র-জটিল। তর্কের সহায়ে তার সংগতি-সাধনা করতে গেলে, হয় যদৃচ্ছাক্রমে অঙ্গহানি ঘটাতে হবে, নয়তো তার বিপুল ব্যঞ্জনাকে তর্কের অসাধ্য বলে মানতেই হবে। দেখছি, অনির্বাচ্য নিজেকে যুগপৎ ব্যাকৃত করছেন অনন্তে ও সান্তে, কূটস্থ অক্ষর অবিকৃত-পরিণামে হয়ে চলেছেন ক্ষর ও সর্বভূতময়, এক আপনাকে ঈক্ষণ করছেন অগণিত বহু-ভাবনায়। পুরুষ-সমাখ্যার অতীত যিনি—শুধু পুরুষ-বিধতার স্রষ্টা ও ভর্তা তিনি নন, স্বয়ং তিনি পুরুষবিশেষ। আত্মার স্বীয়া প্রকৃতি আছে, অথচ প্রকৃতি হতেও বিবিক্ত তিনি। অ-সম্ভব সন্মাত্র সম্ভূতিতে উচ্ছ্বসিত হয়েও স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সম্ভূতি হতে পৃথক্ থাকেন। বিশ্বের ব্যাপ্তিচৈতন্য ঘনীভূত হয় জীবচৈতন্যে, আবার বিজ্ঞানঘন জীবচৈতন্য বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বাত্মভাবনার মহিমায়। ব্রহ্ম নির্গুণ অথচ অনন্ত গুণের সামর্থ্য তাঁর আছে। বিশ্বকর্মের কর্তা ও ঈশ্বর হয়েও তিনি অকর্তা, প্রকৃতিলীলার উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। এসমস্ত রহস্যই আমাদের ব্যাবহারিক বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতেও কি রহস্যের শেষ আছে? চিরকাল একভাবে ঘটতে দেখি, তাই প্রকৃতির লীলাকে আমরা নির্বিচারে স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। কিন্তু অতিপরিচয়ের গুণ্ঠন মোচন করে একবার যদি তার সকল খেলা তলিয়ে বুঝতে চাই, তাহলে দেখি, তার সব না হ'ক্ অনেকখানিই পড়ে প্রাতিহার্যের কোঠায় বা মায়াবিনীর অবোধ্য মায়ার পর্যায়ে। স্বয়ম্ভূ-সত্তা আর তাতে আবির্ভূত বিশ্বজগৎ দুইই একটা অপ্রতর্ক্য রহস্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সান্তের ব্যাপারে আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টি একটা সংগতি ও সুস্পষ্ট বিধান খুঁজে পায় বলে আমরা ভাবি, প্রকৃতির সর্বত্র বুঝি যুক্তির শাসন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই পদে-পদে অযৌক্তিকতার সংগে, বা যা যুক্তির এলাকায় পড়ে না কি তাকে ছাড়িয়ে যায় তার সংগে আমাদের ঠোকাঠুকি লাগে। জড়ের মহল হতে প্রাণের মহলে এবং সেখানে হতে মনের মহলে যতই এগিয়ে চলি, ততই দেখি অসংগতি ও অনিরুক্তির মাত্রা বাড়ছে বই কমছে না। সান্তকে যদি-বা যুক্তির আমলে খানিকটা আনতে পারি, অণুকে কিছুতেই নিয়মের

বাঁধন পরাতে পারি না। আর বিভু তো থেকেই যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিশ্বকর্মের পরিচয় কি তাৎপর্য একেবারেই আমাদের বুদ্ধির ওপারে। আত্মা ঈশ্বর বা চিৎসত্তা বলে কিছু থাকলেও জগৎ ও জীবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি, তার কোনও হদিস আমরা পাই না। ঈশ্বর প্রকৃতি আর জীবের গতি-প্রকৃতি দুর্বোধ রহস্যের আড়ালে ঢাকা রয়েছে। যবনিকার একপ্রান্ত তুলে যদি-বা কিছু অনুমান করতে পারি, তার সমগ্র রহস্য তবু তেমনি অপ্রতর্ক্য থেকে যায়। মনে হয়, বিশ্ব জুড়ে এই-যে মায়ার লীলা, এ যেন কোন্ অপ্রমেয় ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল। কে জানে এ তার প্রজ্ঞার বিলাস না কুহকের খেলা —কেননা প্রজ্ঞা হলেও আমাদের প্রজ্ঞার সে সগোত্র নয়, আর কুহক হলেও আমাদের কল্পনা দিশাহারা তার কাছে। এই বিশ্বকে যে চিৎ-স্বরূপের বিসৃষ্টি বলি অথবা বলি তাঁর আত্মরূপায়ণের ছন্নলীলা—আমাদের বুদ্ধিতে তিনি মায়াবী-রূপে প্রতিভাত, আর তাঁর শক্তি বা মায়া সৃষ্টিকুশল একটা ইন্দ্রজাল। কিন্তু ইন্দ্রজাল বিভ্রম অথবা তত্ত্বের চমৎকার দুইই সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বে এ-দুটি অনির্বচনীয় ব্যাপারের কোন্‌টি রূপ ধরেছে, কি করে তার উদ্দেশ পাব ?

বস্তুত এই হতবুদ্ধিকর কল্পনার মূল রয়েছে বিশ্বোত্তীর্ণ অথবা বিশ্বাত্মক স্বয়ম্ভূসত্তায় নিরূঢ় কোনও বিভ্রম বা খেয়ালের ছলনায় নায়। এর জন্য দায়ী আমাদের বুদ্ধির বৈক্লব্য। অনুত্তরের বহু-ভাবনার মূল সূত্র কি, কিংবা তাঁর কর্মের ছক ও ধারা, তার কোনও আভাসও আমরা পাই না। স্বয়ম্ভূ-সৎ অনন্তস্বরূপ, অতএব তাঁর স্থিতি ও গতির মধ্যে আছে আনন্ত্যের ছন্দ। কিন্তু আমাদের চেতনা সংকীর্ণ, আমাদের বুদ্ধির নির্ভর সান্ত তথ্যের 'পরে। সুতরাং সান্ত বুদ্ধি ও চেতনা দিয়ে মাপব অনন্তকে এ-কল্পনাই কি অযৌক্তিক নয় ? অল্প কি করে ভূমার পরিচয় পাবে ? সাধনদৈন্যে উপহত অনীশ্বর কার্পণ্য কি করে বুঝবে সে উচ্ছল ঋতায়নের ঐশ্বর্য ? অবিদ্যাচ্ছন্ন অল্পজ্ঞ বুদ্ধির প্রদোষচ্ছায়া কি করে সর্ববিৎ সর্বজ্ঞের কল্পনাকে বুঝবে ? আমাদের সমস্ত যুক্তি-বিচার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জড়প্রকৃতির সান্তলীলার ভূয়োদর্শনের উপর। একটা সীমিত প্রবৃত্তির অপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও অনিশ্চিত তত্ত্বনিরূপণ তার ভিত্তি। এই ভূয়োদর্শন হতে সামান্য-প্রত্যয়ের যে-পুঁজিটুকু জমে, তাকে দিয়ে বিশ্বতত্ত্বের আঁচ পেতে চাই আমরা। যা-কিছু সে-প্রত্যয়ের বিরোধী, আমাদের বুদ্ধি তাকেই লাঞ্ছিত করে মিথ্যা অযৌক্তিক অথবা অবোধ্য বলে। কিন্তু বস্তুতত্ত্বেরও বিভিন্ন ক্রম বা স্তর আছে। অতএব এক স্তরের প্রত্যয় মাপ বা আদর্শ অন্য স্তরে না-ও খাটতে পারে। আমাদের স্থূলদেহ গড়ে উঠছে অতিপরমাণু পরমাণু অণু কোষ প্রভৃতি আণবিক অবয়বের সমাহারে। কিন্তু এই অবয়বের বিধান দিয়ে মানুষের স্থূল শারীরক্রিয়ারও সকল

রহস্য বোঝা যায় না—তার প্রাণ-মন-চেতনার পরিস্পন্দনে যে জড়াতীত লীলার প্রকাশ তার রহস্য বোঝা তো দূরের কথা। দেহের মধ্যে সান্ত কতকগুলি অবয়ব তাদের নিজস্ব ধর্ম প্রবৃত্তি ও রীতি নিয়ে গড়ে উঠেছে। দেহ নিজেই একটি সান্ত অবয়বী—গড়ে উঠেছে ওইসব সান্ত অবয়বের সমাহারে, তাদের ব্যবহার করছে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও প্রবৃত্তির সাধনরূপে। এমনি করে তার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বকীয় একটা সত্তা—যার সামান্যধর্ম অবয়বধর্মের 'পরে আর একান্ত নির্ভরশীল নয়। তারও পরে আছে প্রাণ ও মনের সান্ত বিগ্রহ—বিবিক্ত এবং সূক্ষ্মতর তাদের প্রবৃত্তি। তার জন্য দেহের 'পরে নির্ভর করেও আপন ধর্ম হতে তারা প্রচ্যুত হয় না—কেননা আমাদের প্রাণময় ও মনোময় বিগ্রহের সংবেগে এমন-কিছু অতিশয় আছে, যা জড়দেহের ব্যাপারকে ছাড়িয়ে গেছে। আর প্রত্যেক সান্তবিগ্রহের তত্ত্বভাবে অথবা অধিষ্ঠান-সত্তায় আছে অনন্তের একটা আবেশ—যা তার ওই সান্ত আত্ম-রূপায়ণের ধাতা ভর্তা ও শাস্তা। এইজন্য সান্তের তত্ত্ব বা ক্রিয়া-মুদ্রা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে তার অন্তর্যামী অথবা অধিষ্ঠানরূপী গুহাচর অনন্তের তত্ত্ব না জানলে চলে না। আমাদের সান্ত জ্ঞান ধারণা ও আদর্শের নিজস্ব একটা প্রামাণ্য থাকলেও বস্তুত তারা অপূর্ণ এবং আপেক্ষিক। দেশে ও কালে যা খণ্ডিত, তার তথ্য আহরণ ক'রে নিয়ম রচে সেই নিয়মের শাসন অখণ্ডের ক্রিয়া-মুদ্রার 'পরে আরোপ করব আমরা কোন্ ভরসায়? দেশ ও কালের অতীত অনন্তসত্তার 'পরে তো সে-নিয়ম খাটেই না—অনন্ত দেশ কি অনন্ত কালের 'পরেই যে তা খাটবে, তাও কি বলা চলে? আমাদের প্রাকৃত আধার বাঁধা পড়েছে যে বিধি ও পরিণামের অনুশাসনে, আমাদের গুহাশায়ী পুরুষ তো তাকে মেনে চলতে বাধ্য নন। তাছাড়া যে-বস্তু তর্কের আমলে আসে না, মানুষের তর্কপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধি তাকে নিয়ে বিপদে পড়ে। প্রাণ এমনই একটি বস্তু। তাকে বশে আনতে তর্কবুদ্ধি কেবল জুলুম চালায়। তাকে মিত ও নিয়মিত করতে যে কৃত্রিম বিধি-নিষেধের গুরুভার সে তার 'পরে চাপায়, তা প্রাণকে হয় স্তব্ধ বা আড়ষ্ট করে, নয়তো আচার এবং সংস্কারের কঠিন নিগড় পরিয়ে পঙ্গু করে, কিংবা সব-কিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে তার মধ্যে জাগায় বিদ্রোহ—যা ধসিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় তার 'পরে গড়া বুদ্ধির যত আলগা ইমা-রতের কেরামতি। এক্ষেত্রে দরকার ছিল একটা নিসর্গবৃত্তি কিংবা বোধির প্রত্যয়। কিন্তু বুদ্ধির ভাণ্ডারে ওই বস্তুটিরই অভাব। শুধু তা-ই নয়। বোধি যদি আপনা হতেই মনের কাজ গুছিয়ে দিতে আসে, বুদ্ধি তার কথা সবসময় কানেও তোলে না।...কিন্তু যা বুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে, তাকে বুঝতে কি তাকে নিয়ে কারবার করতে গিয়ে তর্কবুদ্ধি পড়ে আরও ফাঁপরে। অপ্রতর্ক্য তত্ত্বের জগৎ চিন্ময়। সেখানে যে সূক্ষ্ম বিপুল সুগম্ভীর বিচিত্র ভাবের

খেলা, বুদ্ধি তার মেলায় আপনাকে হারিয়ে ফেলে। এ-রাজ্যের দিশারী বোধি আর অন্তরের অনুভব, কিংবা তারও চেয়ে গভীর কোনও প্রত্যয়—বোধি যার নিশিত ধারা অথবা অবর্ণ-দ্যুতির একটা তীব্র ঝলকমাত্র। প্রতি-বোধের পরম দীপ্তি বস্তুত নেমে আসে অপ্রতর্ক্য ঋতচিৎ হতে, অতিমানস দিব্যদর্শন ও দিব্যজ্ঞান হতে।

তাবলে আনন্ত্যের গতি-প্রকৃতির অযৌক্তিকতার ইন্দ্রজালও বলতে পারি না—বরং বুঝি, তার প্রবৃত্তিতে একটা মহত্তর অতীন্দ্রিয় যুক্তির প্রশাসন আছে। সে-যুক্তি সহজেই মন-বুদ্ধির অধিকার ছাড়িয়ে গেছে, তাই তাকে বলতে পারি চিন্ময় অতিমানস-প্রত্যয়ের অলৌকিক যুক্তি। ন্যায়ের বিধানও তার মধ্যে আছে, কেননা অনতিবর্তনীয় সম্বন্ধের সিদ্ধ কল্পনা ও যোগযুক্তির অভাব নাই সেখানে। অতএব আমাদের সীমিত বুদ্ধির কাছে যা ইন্দ্রজাল, তার মর্মে নিরূঢ় রয়েছে আনন্ত্যের দিব্য ন্যায়। সে ন্যায় ও যুক্তিতে আছে লোকোত্তর প্রবৃত্তির বৈপুল্য বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা, তাই লৌকিক ন্যায়কে সে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টিরও অগোচর সমগ্র-তথ্যের পরিপূর্ণ সমাহারে সে-দিব্যন্যায়ের প্রবৃত্তি। অতএব তার সিদ্ধান্ত আমাদের আরোহ- বা অবরোহ-ন্যায়ের কাছে অকল্পনীয়—কেননা অনুমানের ভিত্তি দুর্বল বলে আমাদের ন্যায়ের সিদ্ধান্ত কোনকালেই অবধারিত সত্যতার দাবি করতে পারে না। ঘটনার বিচার করি আমরা পরিণাম দেখে—তার নিতান্ত-বহিরঙ্গ উপাদান পরিবেশ ও হেতু-প্রত্যয়ের অগভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা। কিন্তু প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে অন্যোন্যসঙ্গত শক্তিসংবেগের একটা জটিল জাল যা স্বভাবতই আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর—কেননা শক্তি-মাত্রেই আমাদের কাছে কার্যানুমেয়। কিন্তু অনন্তস্বরূপের চিন্ময় দৃষ্টিতে শক্তিসঙ্গমের কোনও পর্বই তো অদৃশ্য নয়।··বিচিত্র শক্তির কোনও-কোনও বিভাব ভূতার্থ-রূপে আরেকটি অভিনব ভূতার্থের উপাদান অথবা নিমিত্তের ভূমিকায় ব্যাপৃত—কেউ-বা ভব্যার্থরূপে প্রাক্‌সিদ্ধ ভূতার্থের সন্নিহিত হয়ে তাদের উপকারক। কিন্তু যে-কোনও কার্য্যের কারণ-সামগ্রীর মধ্যে সহসা নতুন একটা সম্ভাব্যতা আবির্ভূত হতে পারে, যার অদৃষ্টসংবেগ কারণ-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অকল্পিতের কল্পনাকে সার্থক করবে। অথচ এসমস্তের পিছনে রয়েছে এক অনির্বচনীয় প্রেতি, যাকে ভূতার্থে পর্যবসিত করবার জন্যই ভব্যার্থের ওই আকূতি। আবার একই শক্তিসংস্থানের পরিণাম বিচিত্র হতে পারে, যদিও প্রত্যেকটি পরিণামের পিছনে পূর্বাপর উদ্যত হয়ে ছিল অনুমন্তার একটা নিগূঢ় দেশনা। কিন্তু আমাদের চোখে দেখা দিল সে অতর্কিত বিপ্লবের ক্ষিপ্র সন্নিপাতরূপে—এক মুহূর্তেই দিব্য ঈশনার অমোঘ প্রশাসনে ঘটে গেল আমূল একটা বিপর্যয়!...আনন্ত্যের এই অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত বুদ্ধির

ধারণায় আসে না। কেননা যে-অবিদ্যাবৃত্তির সে সাধন—যেমন সংকীর্ণ তার দৃষ্টি, তেমনি তার জ্ঞানের ভান্ডারে শুধু অনতিনিশ্চিত ও অশ্রদ্ধেয় তথ্যের অপ্রচুর সমাবেশ। তাছাড়া প্রাকৃত বুদ্ধির অপরোক্ষ-সংবিতের কোনও সাধন নাই। এইখানেই বোধির সঙ্গে তার তফাত। বোধি অপরোক্ষ-সংবিতের ধর্ম—কিন্তু বুদ্ধি জ্ঞান-ক্রিয়ার একটা পরোক্ষ ব্যাপার মাত্র। তথ্যের অপূর্ণ সমাহার ও অস্পষ্ট লিঙ্গ হতে কোনরকমে অজ্ঞাত তত্ত্বের একটা পরিচয় খাড়া করা সে-জ্ঞানের কাজ। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি যাকে ধরতে পারে না, অনন্ত-সংবিতের কাছে তা স্বতঃপ্রকাশ। আর সে-আনন্ত্যের মধ্যে সংকল্পের কোনও সংবেগ থাকলে তা প্রবর্তিত হয় এই পূর্ণজ্ঞানেরই প্রেতি নিয়ে—অতএব তাকে বলতে পারি স্বপ্রকাশ অখণ্ড-সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধ-পরিণাম। প্রাকৃত পরিণামশক্তির মত আপন সৃষ্টির বাধায় তার গতি ব্যাহত নয়, অথবা খেয়ালী ইচ্ছাশক্তির মত মহাশূন্যের বুকে সে অবন্ধন কল্পনার বিজৃম্ভণ ফুটিয়ে চলেনি। এ-সংকল্প অনন্তস্বরূপেরই সত্যসংকল্প—সান্তের ব্যাকৃতিতে এমনি করে তিনি এঁকে চলেছেন তাঁর স্বরূপসত্যের রূপরেখা।

অতএব একটা কথা খুবই স্পষ্ট : এই অনন্ত সংবিৎ ও সংকল্পের কোনও দায় নাই প্রাকৃত সংকীর্ণবুদ্ধির যুক্তি মেনে অথবা তার পরিচিত ধারা ধরে চলবার। খণ্ডিত ও সীমিত কল্যাণের সাধনা আমাদের যে-ধর্মবুদ্ধির ব্রত, তার শাসনে অথবা আমাদের কৃত্রিম ব্যাবহারিক সংস্কারের মুখ চেয়ে চলতেও সে বাধ্য নয়। তাই সে চিন্ময় সংকল্পের সিদ্ধবীর্য এমন-কিছু ঘটিয়ে তুলতে পারে এবং তোলেও—আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি যাকে বলবে অযৌক্তিক এবং অধর্ম্য। অথচ সমষ্টির চরম কল্যাণে এবং বিশ্বগত কোনও নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে তা হয়তো অপরিহার্য। যে পরিবেশ প্রয়োজন ও প্রেতির একদেশী দর্শন দ্বারা আমরা একটা ঘটনাকে অযৌক্তিক কিংবা হেয় বলে কল্পনা করি, মহা-প্রকৃতির কোনও নিগূঢ়তর প্রেতি এবং বিপুল পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিক থেকে তা যুক্তিযুক্ত এবং উপাদেয় হতে পারে। প্রাকৃত বুদ্ধি তার খণ্ডদর্শন দিয়ে কৃত্রিম কতগুলি সংস্কার রচনা করে তাদের জ্ঞান ও কর্মের সাধারণবিধির পর্যায়ে তুলে ধরে। সে-বিধির আমলে যা আসে না, মনের কারসাজি দিয়ে হয় তাকে সে জোর করেই আপন খোপে পোরে, নয়তো একেবারেই ছেঁটে ফেলে। কিন্তু অনন্ত-সংবিতের মধ্যে এমনতর অ-ড়ষ্ট বিধির শাসন নাই। সেখানে আছে বৃহৎ স্বভাব-সত্যের অবন্ধন লীলা, যার সিদ্ধকল্পনায় ঘটনার স্বাভাবিক পরিণাম আপনাহতেই ফুটে ওঠে—অথচ কারণ-সামগ্রীর বিচিত্র সংস্থানের অনুরূপ তারও মধ্যে দেখা দেয় স্বভাবছন্দের বৈচিত্র্য। কিন্তু আমাদের সংকীর্ণ বুদ্ধি এই আনুরূপ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সাবলীলতাকে বুঝতে পারে না বলে মনে করে, মহাপ্রকৃতিতে বুঝি কোনও ঋতের শাসন নাই। তেমনি,

আনন্ত্যের তত্ত্ব ও তার প্রবৃত্তির মুক্তচ্ছন্দকে সীমিত সত্তার বিধান দিয়ে আমরা ধারণা করতে পারি না—কেননা সান্তের পক্ষে যা অসম্ভব, পরমার্থ-সতের বিপুল স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে তা-ই দেখা দিতে পারে স্বতঃসিদ্ধ সহজ-স্থিতি এবং স্বাভাবিক প্রেতিরূপে। মনের খণ্ড প্রত্যয় আর অখণ্ড সংবিতের মাঝে তফাত এইখানেই। মন অভঙ্গকে গড়ে অনুভবের ভগ্নাংশ জুড়ে-জুড়ে—কিন্তু অনন্ত-সংবিতের দর্শনে ও বিজ্ঞানে আছে সমগ্র ভাবনার একটা স্বারসিক প্রত্যয়। অবশ্য যুক্তির মূল্য আছেই। যতক্ষণ যুক্তিই আমাদের সম্বল, ততক্ষণ তাকে বাদ দিয়ে অপুষ্ট অর্ধপক্ব বোধির আশ্রয় নেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নয়। কিন্তু তাহলেও আনন্ত্যের সাবলীল ক্রিয়া-মুদ্রার দিকে তাকিয়ে যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে যথাসম্ভব সাবলীলতা নিয়ে আসা, অথবা জিজ্ঞাসিত তত্ত্বের বৃহত্তর ভূমির ও বিভূতির ইশারা সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা—এও তো আমাদের সাধনা হওয়া উচিত। অসীম তৎস্বরূপে আমাদের সীমিত বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ দর্শনকে আরোপ করা কি চলতে পারে? অনন্তের একটি অন্তে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করে তাকেই যদি অখণ্ডদর্শনের মর্যাদা দিই, তাহলে আমাদের অনুভব হয় সেই অন্ধদের হস্তিদর্শনের মত—যারা হাতির এক-এক অঙ্গ ছুঁয়ে সিদ্ধান্ত করেছিল গোটা জানোয়ারটারই আকার বুঝি ওইরকম! অনন্তের যে-কোনও একটি বিভাবের অনুভবকে নিশ্চয় প্রামাণিক বলব। কিন্তু তাহতে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে তাঁর ওই একটিমাত্র রূপ। একটি রূপকে আঁকড়ে ধরে অনন্তের আর-সব রূপকে প্রত্যাখ্যান করা, মতুয়ার বুদ্ধির দোহাই দিয়ে অধ্যাত্ম-অনুভবের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা—এ কি সঙ্গত? অনন্তের মধ্যে যেমন আছে স্বরূপস্থিতির অপ্রমেয়তা, তেমনি আছে সীমাহীন সমষ্টির বৈভব, আছে বহু-ভাবনার বৈচিত্র্য। তাঁকে সত্য করে জানতে হলে এসবারই খবর থাকা চাই। সমষ্টিকে না দেখে ব্যষ্টিকে দেখা, অথবা তাকে শুধু ব্যষ্টির সঙ্কলন বলে জানা—এ যেমন বিদ্যা, তেমনি অবিদ্যাও বটে। আবার শুধু সমষ্টিকে দেখে ব্যষ্টির দিকে চোখ বুজে থাকাও বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই—কেননা তুরীয়ের আবেশ আছে বলেই ব্যষ্টি যে সমষ্টিকে ছাড়িয়েও যেতে পারে, একথা ভুললে তো চলবে না। ব্যষ্টি-সমষ্টির প্রতিষেধ দ্বারা বিশুদ্ধ স্বরূপদর্শন যদিও তুরীয়ের মধ্যে আমাদের চেতনাকে শরবৎ তন্ময় করতে পারে, তবু তাকে বিজ্ঞানের অন্ত না বলে বলব উপধা—কেননা এরও মধ্যে আছে অবিদ্যার প্রকাণ্ড একটা ছলনা। সম্যক দর্শন আমাদের লক্ষ্য। সে-দর্শনের মধ্যে থাকবে সর্বদর্শী বুদ্ধির সাবলীলতা, যা নিখিল বিভবের অবিযুক্ত প্রত্যয়ের ভিতর দিয়েই খোঁজে তাদের অখণ্ড সমাহারের তত্ত্ব।

পরমার্থ-সৎকে নির্বিকল্প আত্মস্বরূপ জেনে তাঁর স্থাণুত্বের নৈঃশব্দ্যে আমরা সমাহিত হতে পারি—কিন্তু তাতে অনন্তের সম্ভূতির সত্য আড়াল হয়ে

পড়ে। তেমনি, শুধু ঈশ্বররূপে তাঁকে জানলে সম্ভূতির সত্য জানা যায় বটে, কিন্তু বাদ পড়ে তাঁর শাশ্বত স্বরূপস্থিতি ও অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের প্রত্যয়। আমরা তখন পাই তাঁর লীলোচ্ছল সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব, কিন্তু তাঁর নির্বিকল্প নিরঞ্জন সচ্চিদানন্দ স্বভাবের পরিচয় পাই না। তেমনি পুরুষ-প্রকৃতি বা চিৎ-জড়ের বিবেকসিদ্ধিতেও অসঙ্গ পুরুষের ভাবনায় উভয়ের সামরস্যকে আমরা ভুলে যেতে পারি। এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে ব্রহ্মবিৎ গুরুর সেই শিষ্যের গল্প : হাতি আসছে, মাহুত বলছে পালাও। কিন্তু শিষ্যও ব্রহ্ম, হাতিও ব্রহ্ম –সুতরাং সে পালাবে কেন? হাতি শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তাকে. শিষ্য অবাক হয়ে ভাবল, এ কী হল? গুরু বললেন, বাপু, তুমিও ব্রহ্ম সবাই ব্রহ্ম, সে তো সত্য কথা। কিন্তু মাহুত-ব্রহ্ম যখন পালাতে বলল হাতি-ব্রহ্মের সামনে থেকে, তখন তার কথা শুনলে না কেন? অনন্তস্বরূপের লীলা বুঝতে গিয়ে আমাদের এই শিষ্যের মত দশা না হয়! অখণ্ড-সত্যের একটা বিভাবের 'পরে জোর দিয়ে বিচারে এবং আচারে তার অনন্তবিভাবের আর-সব দিক ছেঁটে ফেলা মারাত্মকধরনের ভুল। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—অন্তরাবৃত্তচক্ষুর এই দর্শনও যেমন সত্য, তেমনি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—উন্মীলিত দৃষ্টির এই পরিব্যাপ্ত প্রত্যয়ও তো সত্য। আমি আছি এ-ও যেমন বাস্তব, তেমনি অপরের থাকাটাও বাস্তব। আবার আমার আত্মা ও অপরের আত্মার মধ্যে একই বিশ্বাত্মার আবেশ এবং উভয়ের ওপারে তৎস্বরূপের অধিষ্ঠান—এও তো অতিবাস্তব। অনন্তস্বরূপের একত্ব বহুত্বের বিভাবনাতেও অপ্রচ্যুত থাকে। তাই তাঁর ক্রিয়া একমাত্র সর্বদর্শী পরা বুদ্ধিরই গোচর। সে-বুদ্ধি অভেদপ্রত্যয়ের ভূমিকাতে দেখে স্বগতভেদের বৈচিত্র্য—আবার ভেদের প্রত্যেকটি দলকেও দেয় স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা। তাই সে জানে, প্রতি ভূতে রয়েছে যেমন স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্মের নিজস্ব একটা রূপায়ণ, তেমনি সমষ্টির লীলাতেও তাদের যথাযোগ্য একটা স্থান আছে। অনন্তস্বরূপের জ্ঞানে ও কর্মে বেজে ওঠে স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্যের এক অদ্বৈত রাগিণী। অতএব ঋতময় আনন্ত্যের সে-সুরসঙ্গতির মধ্যে ক্রিয়াসাম্যই রয়েছে সর্বত্র—একথা বলাও যেমন ভুল, তেমনি তার ক্রিয়াবৈষম্যের মূলে ঋতম্ভরা অদ্বৈতসুষমার আবেশ নাই—একথাও অশ্রদ্ধেয়। বৃহৎ সত্যের এই সৌষম্যকে যদি আমাদের ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলতে যাই, তাহলে শুধু নিজের আত্মার উপর অথবা শুধু পরের আত্মার উপর ঝোঁক দেওয়া—দুইই অসঙ্গত হবে। একমাত্র সর্বভূতাত্মভূতাত্মার ভাবাদ্বৈতের 'পরেই হবে একাধারে ক্রিয়াদ্বৈত এবং অনন্ত-বিচিত্র অথচ অখণ্ড-সুষম ক্রিয়াবৈষম্যের প্রতিষ্ঠা —কেননা আনন্ত্যের স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়নের এই তো ধারা।

আনন্ত্যের অতর্ক্য ন্যায়ের অনুগামী শুদ্ধবুদ্ধির ঔদার্য এবং সাবলীলতা নিয়ে যদি বিচার করি, তাহলে দেখি নির্বিশেষ সর্বগত ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে

আমাদের বুদ্ধির কল্পিত যে-বিরোধ, তার আশ্রয় শুধু মনের বিকল্প-বৃত্তিতে। অতএব সে-বিরোধ বাগ্-বৈখরীর বিরোধ, তত্ত্বের নয়। প্রাকৃত বুদ্ধি একদিকে কল্পনা করে—ব্রহ্ম যখন নির্বিশেষ, তখন অবশ্য তিনি অনির্বাচ্য। অথচ বাইরে সে দেখতে পায় সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বের বহুধা-ব্যাকৃতি—কেননা বিশ্বের কারণ এবং আধার আর কি হতে পারে ব্রহ্ম ছাড়া? আবার ব্রহ্মকেই যখন সে মেনেছে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্ব বলে, তখন বিশ্বের এই ব্যাকৃতি নির্বিশেষ অনির্বাচ্য ব্রহ্মস্বরূপ ছাড়া কিছুই হতে পারে না—একথাও বাধ্য হয়ে তাকে মানতে হয়। এই আপাতবিরোধের কল্পনাতেই বুদ্ধির ধাঁধা লাগে। কিন্তু বিরোধ মিটে যায়, যখন বুঝি : অনির্বাচ্যতার তাৎপর্য শুধু নেতিতে বা সর্ব-নিষেধে নয়—কেননা তাতে আনন্ত্যের 'পরে চাপানো হয় অশক্তির বৈকল্য। কিন্তু অনির্বাচ্যে আছে ইতিরই সম্প্রত্যয়, আছে নিজের উপাধিদ্বারা সীমিত না-হবার স্বারসিক স্বাতন্ত্র্য। অতএব বাইরের কোনও অনাত্মীয় উপাধিদ্বারা সীমিত হবার সম্ভাবনা তার নাই—কেননা তার মধ্যে অমন অনাত্ম-বস্তুর সদ্ভাব বা উদ্ভবও যে অকল্পনীয়। অতএব আনন্ত্যের মধ্যে আছে প্রমুক্ত স্বাতন্ত্র্য—আপন অন্তহীন বিকল্পনে যা অব্যাহত ও অনিরুদ্ধ, আত্মবিসৃষ্টির প্রতিকূল প্রভাব দ্বারা অনিগৃহীত। বস্তুত অনন্তের আত্মবিভাবনাকে সৃষ্টিও বলা যায় না—কেননা তার মধ্যে আছে শুধু তাঁর আপন তত্ত্বভাবের স্ফুরণ। বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বের বীজভাবে তিনিই তদাত্মক হয়ে আছেন, আর সমস্ত তত্ত্ববস্তু এক পরমতত্ত্বের বীর্যবিভূতি। নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্রষ্টাও নন, সৃষ্টও নন—যদি প্রচলিত অর্থে সৃষ্টি বলতে বুঝি 'নির্মাণ'। তত্ত্বদর্শীর সংজ্ঞানুসারে পরমার্থ-সতের যা স্বরূপধাতু এবং স্বরূপস্থিতি, তার রূপায়ণ এবং পরিস্পন্দকে সৃষ্টি বলতে পারা যায়। অথচ অভাবপ্রত্যয়ের দিক থেকে নয়, ভাবপ্রত্যয়ের দিক থেকে একটা বিশেষ অর্থে তাঁকে আমরা অনির্বাচ্যই বলব। তাঁর সে অনিরুক্ত স্বভাব হবে অন্তহীন স্ব-তন্ত্র আত্ম-ব্যাকৃতির অপরিহার্য সাধন, তার প্রতিষেধ নয়। অনিরুক্তির এই অতিমুক্তি যদি তাঁর মধ্যে না থাকত, তাহলে ব্রহ্মতত্ত্ব হত একটা শাশ্বত নিয়তিকৃত বিভাবনা, অথবা অব্যাকৃত হয়েও সম্ভাবিত স্বগত ব্যাকৃতির একটা নিয়ত সমষ্টি মাত্র। ব্রহ্ম যে সকল সীমা ছাড়িয়ে আছেন—এমন-কি নিজের সৃষ্টির বাঁধনও যে পরেননি তিনি : তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যকেই একটা উপাধি, একটা আত্যন্তিক অশক্তি, অথবা আত্মব্যাকৃতির স্বাতন্ত্র্যের অভাব বলে কল্পনা করা সঙ্গত কি? বরং এমনি করে নির্বিশেষ অসীমকে নেতির বিশেষণে সীমিত করবার প্রচেষ্টাই কি স্বতোবিরোধের দোষে দুষ্ট হবে না? ব্রহ্মতত্ত্বের দুটি মর্মরহস্য—একটি তাঁর স্বরূপস্থিতিতে, আরেকটি তাঁর লীলায়নে বা আত্মবিসৃষ্টিতে। এ-দুয়ের মাঝে তো সত্যকার কোনও বিরোধ নাই। যে-বীজসত্তায় অন্তহীন স্ফুরত্তার

অনিয়ন্ত্রিত সামর্থ্য আছে, সেই তো পারে অনন্ত ব্যক্তিতে আপনাকে রূপা-য়িত করতে। অতএব নিত্যে আর লীলায় কোনও অসামঞ্জস্য বা অন্যোন্য-প্রতিষেধ নাই—তারা পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। নিত্য আর লীলা এক অনন্ত অদ্বয়-তত্ত্বের 'পরে দ্বৈতের আরোপ—মানুষের বুদ্ধিতে এবং মানুষের ভাষায়।

বিকল্পহীন সহজ দৃষ্টি নিয়ে যদি তত্ত্ববস্তুর দিকে তাকাই, তাহলে সর্বত্র দেখি সমন্বয়ের এক ছন্দ। তত্ত্বদর্শনের এক প্রান্তে জাগে আনন্ত্যের নির্বর্ণ সংবিৎ—তার মধ্যে গুণ ধর্ম বা লক্ষণের কোনও উপরাগ নাই; আবার আরেক প্রান্তে দেখি, সেই অনন্তই অগণিত গুণে ধর্মে ও লক্ষণে উচ্ছ্বসিত। দুটি প্রত্যয়ের মধ্যেই ফোটে তাঁর অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের ব্যঞ্জনা—তার প্রতিষেধ নয়। অবর্ণের অনুভব বর্ণরাগের ঐশ্বর্যকে প্রতিষিদ্ধ করে না—বরং সে-ই হয় তার অপরিহার্য সাধন, অলক্ষণ নৈর্গুণ্যের ভিত্তিতেই সম্ভব হয় গুণে ও লক্ষণে অন্তহীন আত্মরূপায়ণের নিরঙ্কুশতা। চিৎ-সত্তার স্বগত বীর্যের বিশেষ-একটা প্রকাশকে আমরা 'গুণ' বলি। অর্থাৎ সত্ত্বের চেতনা তার বীজভাবকে প্রকট করবার সময় ব্যাকৃত আত্মশক্তির 'পরে স্বভাবের ছাপ দিয়ে যে-পরিচয় দেয় তার, তা-ই হল গুণ বা চারিত্র। যেমন শৌর্য একটা গুণ বা আত্মভাবের বীর্য। তাতে আত্মচেতনার বিশেষ-একটা ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে আমার আধারশক্তির বিশিষ্ট রূপ এবং তা আমারই ক্রিয়াশক্তির বিশেষ-একটা অভি-ব্যক্তিতে সার্থক হয়েছে। তেমনি ওষুধের আরোগ্যশক্তি একটা ধর্ম: অর্থাৎ ওষুধের বনজ কিংবা খনিজ উপাদানের মর্মসত্তায় নিহিত শক্তিবিশেষই তার রোগপ্রতিষেধক ধর্মের রূপ ধরেছে। আবার এই শক্তিবিশেষের মূলে আছে তার অন্তর্নিহিত সংবৃত্ত-চৈতন্যে প্রচ্ছন্ন সদ্‌ভূত-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা। স্ফুরন্ত সত্তার মূলে যে-ভাব নিগূঢ় ছিল, বিজ্ঞান তাকেই ফুটিয়ে তুলছে বাইরে—তা-ই এখন দেখা দিয়েছে সত্তার অন্তর্গূঢ় শক্তির বীর্যবিভূতিরূপে। এমনি করে বস্তুর যত ধর্ম গুণ বা লক্ষণ সমস্তই সত্তার চিদ্বীর্য—নির্বি-শেষের স্ফুরত্তার বিশেষ-একটা ভঙ্গি। তৎ-স্বরূপের মধ্যে সব-কিছু নিগূঢ় হয়ে আছে, তাঁর মধ্যে আছে সব-কিছুকে বিসৃষ্ট অর্থাৎ বিচ্ছুরিত* করবার অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য। তবুও নির্বিশেষকে শৌর্যগুণ বা আরোগ্যশক্তি দিয়ে বিশেষিত করতে পারি না—বলতে পারি না, এই তাঁর লক্ষণ বা ব্যাবর্তক ধর্ম। এমন-কি বহুগুণের একত্র সমাবেশকেও নির্বিশেষ আখ্যা দিতে পারি না। আবার এও বলা চলে না, নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব একটা নিঃসত্ত্ব অভাববস্তু মাত্র—তার মধ্যে

---

* 'সৃষ্টি' শব্দের মৌলিক অর্থই তা-ই; বেদে সৃজ্ ধাতুর অর্থ, আধারে যা অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে, নির্মুক্ত প্রবাহে তাকে বইয়ে দেওয়া।

ভাববিশেষকে বিচ্ছুরিত করবার সামর্থ্য নাই। বরং ব্রহ্মেই আছে সমস্ত সামর্থ্যের নিঃশেষ সমাহার, বস্তুর গুণ ও ধর্মের সকল বীর্য তাঁর মধ্যে সমবেত। মন একবার বলে, 'যা-কিছু দেখছি, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এসবের কিছুই নন, অথবা এরাও নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ নয়'; আবার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে মানতে হয়, 'ব্রহ্মই এইসব হয়েছেন, তৎস্বরূপের ব্যতিরিক্ত কোনও সত্তা এদের নাই—কেননা তৎস্বরূপ সন্মাত্র, তৎস্বরূপই সর্বসৎ'। এমনি করে বিরুদ্ধভাষণের ধাঁধায় পড়ে তার সকল বিচার ঘুলিয়ে যায়। কিন্তু স্পষ্টই দেখছি, এ-ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে শুধু ভাবনার অতিসঙ্কোচে ও ভাষার কারসাজিতে। নইলে তত্ত্ব-দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে বিরোধ কোথায়? ব্রহ্ম শৌর্যগুণ বা আরোগ্যশক্তি মাত্র অথবা শৌর্যগুণ বা আরোগ্যশক্তিই ব্রহ্ম—এ-দুইটিই বাতুলের উক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাবলে শৌর্যকে অথবা আরোগ্যশক্তিকে আত্মরূপায়ণের বিশিষ্ট ভঙ্গিরূপে ফুটিয়ে তোলবার সামর্থ্যও ব্রহ্মের নাই—এমন উক্তিও কি বাতুলতা নয়? সান্তের ন্যায় যখন আর পথের প্রদীপ হয় না, তখন অপরোক্ষ নির্মুক্ত দৃষ্টির সন্ধানী আলো ফেলতে হয় সত্তার মর্মগহনে—অনন্তের ন্যায়ে কি আছে তা ধরবার জন্যে। তখনই অনুভব করি, যিনি অনন্তস্বরূপ, তিনি গুণে শক্তিতে বিভূতিতে সর্বতোভাবেই অনন্ত—অথচ গুণ শক্তি ও বিভূতির বিরাট সঙ্কলন দিয়েও তাঁর আনন্ত্যকে নিঃশেষিত করা যায় না।

আমরা মানি, ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর নির্বিশেষ সন্মাত্র—যা-ই তাঁকে বলি না কেন, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। বিশ্বোত্তীর্ণরূপে তিনি এক, আবার বিশ্বাত্মকরূপেও এক। অথচ বিশ্বে দেখছি বহু ভূত, প্রত্যেকের মধ্যে এক বিবিক্ত আত্মা বা চিৎসত্তা, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এক প্রকৃতি। বস্তুর চিন্ময় তত্ত্বভাব যখন অদ্বিতীয়, বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয়, এই বহুধা-ব্যাকৃতিও স্বরূপত ওই অদ্বয়তত্ত্ব। অতএব একেরই সত্তা বা সম্ভূতি বহুরূপে—এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য। তবু প্রশ্ন হয়: যা সখণ্ড ও সবিশেষ, তা কি করে অখণ্ড নির্বিশেষ হবে? মানুষ পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ কি করে ব্রহ্ম হবে? কিন্তু আপাত-বিরোধের এই কল্পনায় মনের ভুল হয়েছে দু'জায়গায়। ব্রহ্মের একত্বকে মন বিচার করে গণিতের 'এক' সংখ্যা দিয়ে। সে 'এক' স্বভাবত অন্যব্যাবৃত্ত ও সঙ্কোচধর্মী। হিসাবে সে দুয়ের চাইতে ছোট, তাই তাকে দুই করতে হলে হিসাবমত ভাঙতে জুড়তে বা গুণ করতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মের একত্ব তো তা নয়। সে হল দ্বৈতহীনতার অনুভব ও আনন্ত্যের সর্বানুস্যূত আয়তন—অতএব তার মধ্যে শত সহস্র লক্ষ কোটি পরার্ধেরও স্থান হয়। জ্যোতিষের কল্পিত অথবা তারও অকল্পিত রাশির বৈপুল্য দিয়ে তাকে বেড়ে পাওয়া যায় না—কেননা উপনিষদের ভাষায় 'ব্রহ্ম চলেন না, অথচ তাঁকে ধরতে পিছু-পিছু ছুটেও দেখবে, তিনি আছেন তোমার আগে।' তাই তাঁর সম্পর্কে বলা চলে,

অন্তহীন বহুত্বের সম্ভূতিস্বরূপ না হলে অদ্বয় অনন্ত হতেন তিনি কি করে? কিন্তু তাঁর বহুবিভাবনার এ অর্থ নয় যে, তাঁর একত্ব বহুধর্মী অথবা বহুর সমাহারে কল্পিত। বরং তাঁর একত্বে আছে অনন্ত-বহুত্বের বিভাবনা। যেমন বহুত্বকল্পনা দিয়ে তাঁর বিশেষণ বা পরিচিতি সম্ভব নয়, তেমনি সান্ত একত্বের বিকল্প দিয়েও তাঁকে সীমিত করা যায় না। বস্তুত চিৎ-জগতে সংখ্যা-বহুত্বের কল্পনা একটা বিভ্রম মাত্র, কেননা সেখানে পুরুষের বহুত্ব থাকলেও বহু-পুরুষের মধ্যে অন্যোন্যব্যাবৃত্তির সম্বন্ধ নাই। তত্ত্বত বহু-পুরুষ অন্যোন্যাশ্রিত এবং ব্যতিষক্ত। অদ্বয়তত্ত্ব বা সমষ্টি-বিশ্ব—কাউকে তাদের যোগফল বলা চলে না। বহু-পুরুষ অদ্বয়তত্ত্বের আশ্রিত এবং তার সত্তায় সত্তাবান। অথচ তাদের বহুত্বও অবাস্তব নয়—কেননা বহুপুরুষের মধ্যে আছে একই পুরুষের ব্যষ্টিভাবনার আবেশ। তারা একেরই সনাতন অংশ এবং তাদের শাশ্বতভাবের মূলে আছে শাশ্বত অদ্বয়ভাবের অধিষ্ঠান। প্রাকৃত বুদ্ধি সান্ত আর অনন্তের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে সান্তের সঙ্গে যুক্ত করে বহুত্বকে এবং অনন্তের সঙ্গে একত্বকে। তাই তার হিসাবে এত গোল। কিন্তু অনন্তের ন্যায়ে বিরোধের কিছুমাত্র আভাস নাই। এইজন্যই সেখানে একের মধ্যে বহুত্বের শাশ্বত সমাবেশ যেমন সম্ভব তেমনি স্বাভাবিক।

আবার দেখি ব্রহ্মের অনন্ত নির্বিকল্প স্বরূপস্থিতিতে চিৎস্বরূপের অবিচল নৈঃশব্দ্য। অথচ সে-চিৎস্বরূপের আছে সীমাহীন পরিস্পন্দ—আছে অমেয় বীর্য, আনন্ত্যের সর্বসম্ভব আত্মপ্রসারণের চিন্ময় উচ্ছলতা। দুটি অনুভবেরই অনুকূলে তত্ত্বদর্শনের প্রামাণ্য আছে। কিন্তু প্রাকৃত কল্পনা স্বরূপস্থিতির নৈঃশব্দ্য ও সম্ভূতির পরিস্পন্দের মাঝে সৃষ্টি করে কৃত্রিম একটা বিরোধ—অনন্তের ন্যায়ে যার কোনও আভাস নাই। 'আনন্ত্যের মধ্যে আছে শুধু স্বরূপস্থিতির নৈঃশব্দ্য, সম্ভূতির অন্তহীন বীর্য ও তপোবিভূতি নাই'—একথা মানা যায় ব্রহ্মদর্শনের অন্যতম বিভাবরূপেই শুধু। ব্রহ্ম শক্তি-হীন বীর্যহীন চিন্মাত্র—একথা অকল্পনীয়। আনন্ত্যের মধ্যে অন্তহীন তপোবিভূতির উচ্ছলতা থাকবে, নির্বিশেষের মধ্যে থাকবে সর্বসম্ভবা শক্তির বীর্য, চিৎস্বরূপের অন্তর্গূঢ় সংবেগ হবে নির্বারিত। অথচ স্বরূপস্থিতির নৈঃশব্দ্য হবে সে-স্পন্দের অধিষ্ঠান। শাশ্বত স্থাণুত্ব শাশ্বত জঙ্গমতার অপরিহার্য সাধন এবং ক্ষেত্র—এমন-কি তার মর্মসত্য। কেননা, একটা অবিচল আধার ছাড়া আধারশক্তি তার বিপুল অভিব্যঞ্জনার রঙ্গপীঠ কোথায় পাবে? শব্দহীন অচঞ্চল স্থাণুত্বের একটা অধিষ্ঠান পেলে আমরা তারই ভূমিকায় স্থাপন করতে পারি মহাশক্তির এমন-একটা উচ্ছলন, যা আমাদের চঞ্চল বহির্মুখ চেতনার কল্পনারও অগোচর। ব্রহ্মের স্থিতি আর গতিতে বিরোধকল্পনা প্রাকৃত মনের সংস্কার মাত্র। বস্তুত চিৎস্বরূপের নৈঃশব্দ্য আর

তাঁর স্ফুরত্তা পরস্পরের আপূরক ও অপরিহার্য দুটি সত্য। প্রপঞ্চোপশম অক্ষর চিন্মাত্র পুরুষ তাঁর অন্তহীন তপোবীর্যকে নিজের মধ্যে শান্ত এবং সমাহিত রাখতে পারেন, কেননা আত্মশক্তির পরতন্ত্র সাধন তিনি নন। কিন্তু তাঁর শক্তিও আছে এবং তাকে তিনি বিচ্ছুরিতও করেন অন্তহীন শাশ্বত লীলোচ্ছলতার নিরঙ্কুশ সামর্থ্যে। এই বিচ্ছুরণে তাঁর বিরতি নাই ক্লান্তি নাই। অথচ তাঁর স্পন্দলীলায় নিত্য অনুস্যূত হয়ে আছে তাঁর স্পন্দহীন স্তব্ধতা, মুহূর্তের তরেও তার মধ্যে ঘটে না স্পন্দজনিত কোনও প্রচলন বিকার কি বিপর্যয়। লীলাচঞ্চল প্রকৃতির বিচিত্র রাগিণীতে অহরহ রণিত হচ্ছে সাক্ষিচেতনার অপ্রমেয় নৈঃশব্দ্য। এসব কথা আমাদের বোঝা কঠিন—কেননা আমাদের বহিশ্চর চেতনার সীমিত সামর্থ্য ঊর্ধ্বে-অধে কোনদিকেই প্রসারিত নয় এবং এই সীমার সংকোচ তার সকল কল্পনা ও সংস্কার কুণ্ঠিত করে রেখেছে। সুতরাং সসীম ও সবিশেষের সংস্কার নিয়ে যে নির্বিশেষ অসীমের ধারণা সম্ভব নয়, সেকথাও কি বলতে হবে?

অনন্তকে ধারণা করি অরূপ বলে, অথচ বিশ্ব জুড়ে আমাদের ঘিরে রয়েছে অন্তহীন রূপের মেলা। অতএব দিব্য-পুরুষকে স্বচ্ছন্দে বলা চলে একাধারে রূপী এবং অরূপ। এখানেও আছে—তাত্ত্বিক বিরোধ নয়, কিন্তু বিরোধের একটা আভাস শুধু। অরূপ বলতে বুঝি রূপায়ণ-শক্তির প্রতি-ষেধ নয়—কিন্তু অনন্তের স্বচ্ছন্দ স্ব-তন্ত্র রূপায়ণের নিমিত্ত। রূপায়ণের এই স্বাচ্ছন্দ্য না থাকত যদি, তাহলে সান্ত বিশ্বে দেখা দিত শুধু একটি রূপ অথবা সম্ভাবিত রূপের একটা সংকলন বা বাঁধাধরা ছক। অরূপ হল পর-মার্থ-সতের চিন্ময়-সত্ত্বের বা চিৎ-ধাতুর ধর্ম। বিশ্বের বিচিত্র সান্ত-ভাব সেই ধাতুর রূপ বীর্য বা আত্মব্যাকৃতি। দিব্য-পুরুষের নাম কি রূপ নাই। কিন্তু ঠিক এই কারণে নাম ও রূপের সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর বাধে না। রূপমাত্রেই ব্যাকৃতি—শূন্যে-শূন্যে খেয়ালখুশির কল্পনা নয়। কারণ যে বর্ণ রেখা আয়তন বা পরিকল্পনা রূপের অপরিহার্য উপাদান, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা 'অর্থ'। বলা যেতে পারে, তাদের আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে এক অব্যক্ত-তত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ এবং প্রয়োজন। এই-জন্যই রঙে রেখায় আয়তনে যোজনায় অদেখা ধরা দেয় কায়ার মায়ায়—কেননা যা অতীন্দ্রিয়, তার ব্যঞ্জনার তারা বাহন। রূপকে বলতে পারি অরূপের সহজ-বিগ্রহ, তার অনতিবর্তনীয় আত্মরূপায়ণের একটা ঝলক। শুধু-যে বাইরের রূপের বেলাতে একথা খাটে তা নয়। অদৃশ্যলোকে প্রাণ ও মনের যে-রূপায়ণ শুধু ভাবের চোখে দেখা চলে, অথবা অন্তঃসংজ্ঞার সূক্ষ্মবৃত্তি দিয়ে যে রূপের জগৎ ধরা যায়, তাদেরও এই রহস্য। নামের গভীর তাৎপর্য শুধু বস্তুর শাব্দিক সংজ্ঞাতে নয়—কিন্তু বস্তুর বিগ্রহে রূপায়িত হয়েছে যে-তত্ত্ব, তার

বৈশিষ্ট্য গুণ বা শক্তির সমূহভাবনায়। সংজ্ঞা-শব্দ বা জ্ঞেয়-নাম দিয়ে আমরা তাকেই উদ্দিষ্ট করি। এই অর্থে নামকে বলতে পারি 'বৈভব'। অতএব দেবতাদের গুহ্য নাম বলতে বুঝব তাঁদের স্বরূপসত্তার গুণ শক্তি বা বৈশিষ্ট্য —সাধকের চেতনা উপলব্ধির মধ্যে যাদের দিয়েছে ভাবময় রূপ। অনন্তস্বরূপ নামহীন, অগোত্র। কিন্তু সে-নামহীনতাতেই পূর্বকল্পিত হয়ে আছে সম্ভাবিত সকল সংজ্ঞা, দেবশক্তির সকল বৈভব, বিশ্বতত্ত্বের সমস্ত নাম এবং রূপ—কেননা সেখানে তারা সর্বসতের অন্তর্গূঢ় অব্যক্ত বিভাব মাত্র।

এতেই বুঝি, সান্ত ও অনন্তের যে-সহভাব বিশ্বসত্তার স্বরূপপ্রকৃতি, তাকে শুধু দুটি বিরুদ্ধভাবের সন্নিকর্ষ বা অন্যোন্যব্যঞ্জনা বললেই সব বলা হয় না। সূর্যের সঙ্গে আলো ও তাপের যেমন স্বাভাবিক অবিনাভাবের সম্বন্ধ, সান্ত ও অনন্তের সম্বন্ধও তেমনি। সান্ত অনন্তেরই একটা আত্ম-বিভাবনা—একটা পুরঃক্ষেপ। কোনও সান্ত-ভাবের স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নাই—সর্বত্র তার নির্ভর অনন্তের 'পরে। অনন্তের সঙ্গে স্বরূপের তাদাত্ম্য আছে বলেই সে টিকে আছে। অবশ্য আনন্ত্য বলতে আমরা শুধু দেশ ও কালে সীমাহীন আত্মপ্রসারণ বুঝি না। সেইসঙ্গে বুঝি দেশ ও কালের অতীত এক অমেয় অনির্বাচ্য তত্ত্ব, যা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে অণোরণীয়ান্ অথবা মহতো মহীয়ান্ রূপে—কালের অপ্রমেয় ক্ষণভঙ্গে, আণবিক বিন্দুর পারি-মাণ্ডল্যে, মুহূর্তস্থায়ী ঘটনার চকিত লেখায়। সান্তকে কল্পনা করি অবি-ভক্তের বিভাগরূপে; কিন্তু সে তো সত্য নয়। কেননা বিভাগ একটা আপাত-প্রতীতি মাত্র। কল্পরেখায় বস্তুর সীমা এঁকে দিতে পারি, কিন্তু বস্তু হতে বস্তুকে সত্যি-সত্যি কোনমতেই পৃথক করতে পারি না। চর্মচক্ষে নয়, অন্তরা-বৃত্ত চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে একটা গাছকেও দেখি যদি, তাহলে তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি এক অনন্ত অন্বয়তত্ত্বকে—গাছের প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুভব করি তার আবেশ। দেখি, আত্ম-উপাদান হতে সে গড়ে তুলছে গাছের উপাদান, তার অখণ্ড প্রকৃতি, তার সম্ভূতির লীলা, তার গুহাহিত শক্তির ক্রিয়া। এসমস্তই ওই অনন্ত অন্বয়-তত্ত্ব : ভূতে-ভূতে দেখি তার অখণ্ডিত আত্ম-প্রসারণ—তার 'বিধৃতিরসম্ভেদায়'। অতএব কেউ তাকে ছেড়ে বা কাউকে ছেড়ে নয়। তাই গীতায় আছে, 'সর্বভূতে অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত হয়ে আছেন তিনি।' বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ওই অনন্ত-চিন্ময় বস্তু, অতএব স্বরূ-পত আর-সব বস্তুর সঙ্গে তদাত্মক—কেননা তারাও তো ওই অনন্তস্বরূপেরই নাম এবং রূপ, তাঁর বীর্য এবং বৈভব।

সমস্ত বিভাগ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে অবিভক্ত একত্বের এই-যে অনপনেয় আবেশ, আনন্ত্যের গণিতের এই তো মূলসূত্র। উপনিষদের একটি উক্তিতে পাই তার আর্যা : 'পূর্ণ এই, পূর্ণ ওই; পূর্ণ হতে পূর্ণকে নিলে পূর্ণই

থাকে অবশিষ্ট।' ব্রহ্মের অনন্ত আত্মগুণনেরও এই সূত্র : সেই গুণনের ফলে ভূতে-ভূতে প্রজাত হলেন তিনি—এক হলেন বহু। কিন্তু বহুর প্রত্যেকেই ওই প্রাক্‌সিদ্ধ তৎস্বরূপ—যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন 'স্বে মহিম্নি', বহু-ভাবনাতেও যাঁর অদ্বৈতহানি ঘটেনি। সান্ত হয়ে দেখা দিলেন ব'লে কি এক বিভক্ত হলেন ?—তা তো নয়; কেননা এক অনন্তই তো বহু সান্ত হয়ে আমাদের কাছে ফুটলেন। এই বিসৃষ্টিতে অনন্তের সঙ্গে কিছুই জুড়তে হল না। অতএব তিনি সৃষ্টির আগেও যা ছিলেন, সৃষ্টির পরেও তা-ই থাকলেন। অনন্ত তো সান্তের যোগফল নয়। যিনি সব-কিছু হয়েও অনিঃশেষিত, সেই তৎস্বরূপই অনন্ত। অনন্তের এই ন্যায়ের সঙ্গে সান্তের ন্যায়ের বিরোধ ঘটে এই জন্যেই যে, অনন্তের ন্যায় স্বভাবতই সান্তের ন্যায়কে ছাড়িয়ে যায়, কেননা খণ্ড-প্রতিভাসের তথ্যের 'পরে তার নির্ভর নয়। তার তত্ত্বদৃষ্টি পরমার্থ-সতে অবগাহন ক'রে তারই সত্যে দেখে প্রতিভাসের সত্য। তাই সে প্রতিভাসকে বিবিক্ত ভূত স্পন্দ নাম রূপ কি বস্তুরূপে দেখে না, কেননা এমন পৃথকভাব তো কোনমতেই তার তত্ত্ব হতে পারে না। পৃথক্‌ত্ব সম্ভব হত—যদি প্রতিভাসের ভূমিকা হত শূন্যতা, তত্ত্বভাবের একটা সামান্য-ভিত্তি যদি তাদের না থাকত। অর্থাৎ অতর্কিত সহভাব ও অর্থক্রিয়াকারিতার সম্বন্ধ ছাড়া কোনও মৌল-বিভাবনার সম্বন্ধ তাদের মধ্যে খুঁজে না পাওয়া যেত। কিন্তু প্রতিভাসের তত্ত্ব তো তা নয়। তাদের আপাতবিবিক্ত সত্তার মূলে আছে একত্বের বন্ধন। এমন-কি তাদের ব্যবহারে বাইরে-ভিতরে স্পন্দ বা রূপায়ণের যে-স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, তাও সম্ভব হয় বীজভূত আনন্ত্যের 'পরে তাদের নির্ভর আছে বলে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বের সঙ্গে নিগূঢ় তাদাত্ম্য থাকাতেই তাদের বহুধা-বিলাস সম্ভব হয়। বস্তুত অন্বয়-তাদাত্ম্যই তাদের সমূল ও সদায়তন—তাদের রূপায়ণের অদ্বিতীয় হেতু, বিচিত্র বীর্যের এক অবিকল্প সংবেগ, এক সর্বসম্ভব উপাদান বা প্রকৃতি।

আমরা এই অন্বয়-তাদাত্ম্যকে অক্ষর বলে কল্পনা করি। অনন্তকালেও তার স্ব-ভাবের প্রচ্যুতি নাই, কেননা ক্ষরভাব বা ভেদভাব তার মধ্যে কখনও দেখা দিলে তার তাদাত্ম্যহানি হত। অথচ বিশ্বের সর্বত্র দেখছি এক বীজের অনন্ত-বিচিত্র ব্যাকৃতিই বিশ্বপ্রকৃতির মর্মরহস্য। মূলে এক শক্তি, কিন্তু তাহতে ঝরে পড়ছে অগণিত শক্তির নির্ঝর। এক মৌলিক রূপধাতু হতে বহুধা-ভিন্ন ধাতু ও কোটি-কোটি বিষম পদার্থের উদ্ভব। একই মন ভেঙে পড়ছে অগণিত মনোবৃত্তিতে—অন্যোন্যভিন্ন বিচিত্র প্রত্যয় ভাবনা ও কল্প-রূপায়ণের সমাহারে অথবা সংঘাতে। প্রাণ এক, কিন্তু অগণিত বৈষম্যে তার ব্যাকৃতি। এক মনুষ্যপ্রকৃতিতে কত শত জাতিবৈষম্য, আবার ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে কত ভেদ। একই গাছের পাতায়-পাতায় চলেছে প্রকৃতির কত রকমারি রেখায়ণ।

রকমফেরের নেশা এমনি পেয়ে বসেছে তাকে যে, দুটি মানুষের বুড়োআঙুলের ছাপকেও সে কিছুতেই এক করেনি। তাই শুধু ওই ছাপের জোরে একটি মানুষকে আর-সব মানুষ থেকে পৃথক করা যায়—যদিও মূলত সব মানুষই এক, তাদের মধ্যে স্বরূপের কোনও ভেদ নাই। যেমন সবজায়গায় একত্ব বা সাম্য আছে, তেমনি আছে ভেদ বা বৈষম্য। একটি বীজকে লক্ষ-কোটি আকৃতির বৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তোলা—এই হল বিশ্বের অন্তর্যামী চিন্ময় ধাতার শিল্পকলা। আবার আনন্ত্যের ন্যায়ও এই তত্ত্বকে সমর্থন করে : পরমার্থ-সতের স্বরূপে আছে অচ্যুত-স্বভাবের প্রতিষ্ঠা। তাই আকৃতি ও গতিপ্রকৃতির অগণিত বৈচিত্র্যে স্বচ্ছন্দে সে রূপায়িত হয়—বিভূতির ভেদকে পরার্ধের কোঠায় তুললেও শাশ্বত অন্বয়তত্ত্বের অক্ষর-স্বভাবের ভিত্তি এতটুকু টলে না। ভূতে-ভূতে একই চিদাত্মভাবের অধিষ্ঠান আছে বলে অফুরন্ত ভেদভাবনার উল্লাসে প্রকৃতি মেতে উঠতে পারে। অপরিণামী হয়েও প্রত্যেকের মধ্যে অন্ত-হীন পরিণামের লীলা চলছে—এই তত্ত্বের নিশ্চিত অবলম্বনটুকু না পেলে প্রকৃতির সকল কীর্তি বিস্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়ত নির্ঋতির মধ্যে, তার স্পন্দ ও বিসৃষ্টির পরিকীর্ণতাকে সংহত করবার কোনও উপায় থাকত না। অন্বয়-তাদাত্ম্য অক্ষরস্বভাব। তার অর্থ এ নয় যে, তার মধ্যে বৈচিত্র্যের ভাবনাহীন নির্বিকার সাম্যের একটি সুর বাজছে শুধু। বস্তুত সত্তার মর্মে অপরিণাম-স্বভাবের প্রতিষ্ঠা থাকলেই তার অন্তহীন রূপায়ণ সম্ভব হয়, অথচ রূপভেদের স্বাতন্ত্র্যে বিনষ্ট ব্যাহত বা উনীকৃত হয় না তার আত্মধৃতির বীর্য—অক্ষর-স্বভাবের এই হল তত্ত্ব। এক আত্মাই হয়েছেন পশু পক্ষী বা মানুষ। কিন্তু এই রূপের বি-কৃতিতেও আত্মস্বরূপ অব্যাকৃত থেকে যায়, কেননা বিশ্ব জুড়ে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের উল্লাসে চলছে একেরই অন্তহীন আত্মরূপায়ণ। প্রাকৃত বুদ্ধি বলবে, কে জানে এ-বৈচিত্র্য একটা অবাস্তব প্রতিভাস কিনা। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি, বৈচিত্র্য বাস্তব হলেই একত্ব বাস্তব হয়, তার সামর্থ্যের মেলে পূর্ণ পরিচয়, তার স্বভাবের সকল ঐশ্বর্য হয় উন্মীলিত—তার শুভ্র-জ্যোতিতে সমাহৃত সকল বর্ণরাগ ছড়িয়ে পড়ে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র সুষমায়। একের অনন্ত ভঙ্গিতে আত্মরূপায়ণকে আমরা ভুল করে ভাবি অদ্বৈতস্বভাব হতে তার বিচ্যুতি। কিন্তু বস্তুত তাতে প্রকাশ পায় একত্বেরই অফুরন্ত বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য। এই তো সৃষ্টির চমৎকার, বিশ্বের মায়া। কিন্তু অনন্তস্বরূপের স্বানুভব ও আত্মদৃষ্টিতে এর মধ্যে অযৌক্তিক অস্বাভা-বিক বা অতর্কিত কিছুই নাই।

বাস্তবিক ব্রহ্মের মায়া তাঁর অনন্ত-বিচিত্র অদ্বৈতস্বভাবের ইন্দ্রজাল ও আন্বীক্ষিকী দুইই। একত্ব ও সাম্যের একটা সঙ্কীর্ণ অব্যাভিচারী কল্পনাই যদি তত্ত্বের রূপ হত, তাহলে তার মধ্যে যুক্তি বা ন্যায়ের ঠাঁই হত না—কেননা

ন্যায়ের কাজ হল সম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে যথাযথভাবে দেখা। ন্যায়-যুক্তির পরাকাষ্ঠা সেইখানেই, যেখানে সে আবিষ্কার করে এক উপাদান এক বিধান—এক অন্তগূঢ় তত্ত্বের বজ্রলেপ যা বহুত্ব বিভেদ বৈষম্য ও বিসংবাদকে গেঁথে তোলে একত্বের সৌষম্যে। নিখিল বিশ্বস্পন্দে আছে অবরোহ আর আরোহের দুটি অন্ত মাত্র—একের বহুধা রূপায়ণ, আর বহুর একীভবন। দুটি অন্তই অপরিহার্য, কেননা একত্ব আর বহুত্ব আনন্ত্যের দুটি মৌল-বিভাব। ব্রহ্মের আত্মবিদ্যা ও সর্ববিদ্যা আত্মবিসৃষ্টিতে স্বরূপ-সত্তার বিভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। সেই সত্যের বৈভবই তাঁর লীলা।

ব্রহ্মের বিশ্বভাবনায় তাহলে এই ন্যায়ের অনুবৃত্তি চলছে। তার যুক্তির মূলে আছে মায়ারই অনন্ত প্রজ্ঞা। যেমন ব্রহ্মের সত্তা, তারই অনুরূপ তাঁর চেতনা বা মায়া। তার মধ্যে নাই আত্মসঙ্কোচের পীড়ন, একটিমাত্র স্থিতি বা রীতির বন্ধন। যুগপৎ বহুরূপে সে প্রজাত হতে পারে, অন্তঃসংগত স্পন্দবৈচিত্র্যে পারে বিচ্ছুরিত হতে--সীমিত বুদ্ধি যার মধ্যে দেখবে শুধু বিরোধের সংঘাত। এক হয়েও তার অফুরন্ত বৈচিত্র্য, অন্তহীন সাবলীলতা, যথাযোগ্য ভাবনার অপরিসীম নৈপুণ্য। মায়া বিশ্বের পরমচেতনা, শাশ্বত অনন্তের স্বরূপশক্তি। স্বভাবত অবন্ধন ও অমেয় বলে যুগপৎ সে ফুটিয়ে তুলতে পারে চেতনার বহুবিচিত্র ভূমি, আত্মশক্তির বহুমুখী প্রবেগ। অথচ তাতেও শাশ্বত চিৎশক্তির পরমসাম্য হতে তার বিচ্যুতি ঘটে না। তাই মায়া যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণা বিশ্বাত্মিকা ও জীবভূতা। লোকোত্তর পরমার্থ-সৎরূপে সে জানে তার ভূতভাবন ও বিশ্বাত্মভাব, নিজেকে জানে বিশ্বপ্রকৃতির চিৎশক্তিরূপে। আবার সেই সংগে ভূতে-ভূতে সে আস্বাদন করে ব্যষ্টি সত্তা ও চেতনার উল্লাস। জীবচেতনার বিবিক্ত ও সীমিত আত্মপ্রত্যয় যেমন আছে, তেমনি আছে সীমার বাঁধন ছিঁড়ে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ রূপে নিজেকে অনুভব করবার সামর্থ্য। জীবে বিশ্বে ও বিশ্বোত্তীর্ণে একই অদ্বৈতচৈতন্যের ত্রিপুটী ফুটে উঠেছে ত্রিভঙ্গিম হয়ে। তাই জীবের পক্ষে পর পরাপর ও অপর—সকল দশারই অনুভব সম্ভব হয়। জীবের পক্ষে এ-অনুভব সম্ভব হলে, শিবের পক্ষেও ত্রিধা আত্মরূপায়ণের বৈভবকে আস্বাদন করা অসম্ভব নয়—বিশ্বোত্তীর্ণের পরা ভূমি, বিশ্বাত্মার পরাপর ভূমি অথবা জীবাত্মার অপরা ভূমি হতে। অদ্বয়-তত্ত্বের চেতনায় যে বাস্তবতার বিভিন্ন ভূমি থাকতে পারে, একথা স্বীকার করলে আর এ-রহস্যকে অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। যে-সন্মাত্র অনন্ত ও স্ব-তন্ত্র, তার পক্ষে বিভিন্ন ভূমিতে অবস্থান অসম্ভব কি? তাকে কি নিয়তির নিয়ম দিয়ে বাঁধা যায়? বস্তুত চেতনা অনন্ত হলে, বিচিত্র আত্মরূপায়ণের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যও যে তার আছে, একথা মানতেই হবে। চেতনার বিচিত্র ভূমি থাকা সম্ভব মানলে পরে, ভূমির বৈচিত্র্য যে কত ভঙ্গিতে

ফুটতে পারে তারও লেখা-জোখা থাকে না। শুধু সেইসঙ্গে মানতে হয়, অদ্বয়স্বরূপের আত্মভাবনায় আছে সকল ভঙ্গিরই যুগপৎ সংবিৎ—কেননা অদ্বয় এবং অনন্ত দুইই স্বরূপত বিশ্বচেতন। কিন্তু সংকীর্ণ প্রাকৃত চেতনার ভূমির সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের অবিদ্যাস্থিতির সঙ্গে অন্তহীন আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের কোথায় যোগাযোগ, এই রহস্যই বোঝা কঠিন। হয়তো আরও আলোচনায় কথাটা ক্রমে-ক্রমে পরিষ্কার হবে।

অনন্ত-চেতনার আরেকটি বিভূতিকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। সে হল তার আত্মসংকোচ অথবা গৌণ আত্মরূপায়ণের সামর্থ্য—যাতে অসীম চেতনা ও বিজ্ঞানের নিটোল পূর্ণতার মধ্যে জাগে একটা অবান্তর স্পন্দন। অনন্তের আত্মবিভাবনার স্বাভাবিক সামর্থ্যে রয়েছে বিক্ষোভের এই অপরিহার্য বৃত্তি। স্বরূপসত্তার প্রত্যেক আত্মবিভাবনায় আছে স্ব-ভাবের ও স্বরূপসত্যের স্বগত-সংবিৎ: অর্থাৎ বিভাবনাতে বিশেষিত হয়েও সন্মাত্রের বিশিষ্ট আত্মসংবিৎ অকুণ্ঠিত। জীবের চিন্ময় স্বভাবের অর্থ এই যে, প্রত্যেক জীব আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনের একটা কেন্দ্র। দর্শনের পরিধি অবশ্য অন্তহীন, কিন্তু সবার পক্ষে তা এক। জীবে-জীবে বিভিন্ন চিৎকেন্দ্র থাকলেও দেশকৃত কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। এখানে প্রত্যেকটি কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের সঙ্গে যোগযুক্ত রয়েছে, কেননা এক অখণ্ড বিশ্বসত্তায় বিচিত্রচেতন বহু-পুরুষের সহভাবই তাদের আধার। প্রত্যেক ভূত দেখছে একই জগৎ—কিন্তু আত্মপ্রকৃতির প্ররোচনায়, এবং স্বকীয় আত্মভাবের কেন্দ্র হতে। কারণ, অনন্তের বিশিষ্ট এক-একটি সত্যবিভাবকে তারা ফুটিয়ে তুলছে—অতএব বিশ্বভাবনার সঙ্গে তাদের যোগসাধনারও ধারা স্বকীয় আত্মবিভাবনার অনুরূপ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই বিশ্বের তত্ত্ব বলে, তাদের ব্যক্তিগত দর্শনেও মৌলিক একটা সাম্য থাকতে পারে। কিন্তু স্ব-ভাব অনুযায়ী প্রত্যেকে তার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-টুকু ফুটিয়ে তুলবে—যেমন বিশ্বের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি মানুষ হিসাবে এক হলেও ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র। এই আত্মসংকোচ কিন্তু জীবের স্ব-ভাবে নিরূঢ় নয়। এ শুধু বিরাটের সর্বগত সমষ্টিভাবনাকে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তোলা। তাই চিন্ময়জীব অখণ্ড-সত্যের স্বনিহিত চিৎকেন্দ্র হতে কাজ করে যান আত্মপ্রকৃতিরই অনুবর্তনে। কিন্তু তাহলেও তাঁর অনুভবের ভিত্তি সার্বভৌম, তার মধ্যে অপরের আত্মা কি প্রকৃতির সম্পর্কে কোনও অন্ধতা নাই। অতএব তাঁর চেতনায় আত্মসংকোচের যে-ভান, তা পূর্ণজ্ঞানেরই বিলাস—অবিদ্যার ক্রিয়া নয়।...জীবত্বের এই আত্মসংকোচ ছাড়া অনন্তের চেতনায় আবার আছে বিশ্বভাবনার সংকোচ। একটা বিশ্ব বা জগৎ গ'ড়ে তার মধ্যে স্বকৃৎ ঋতম্ভরা শক্তির সৌষম্যকে সঞ্চারিত করবার জন্য তাঁর অনির্বাচ্য ক্রিয়াশক্তিকে একটা নিয়তিকৃতির মধ্যে গুটিয়ে আনতে হবে।

বিশ্বের বিসৃষ্টিতে অনন্তচেতনার বিশিষ্ট একটা বিভাবনার আবশ্যক হয়, যা সৃষ্ট-বিশ্বের অন্তর্যামী হয়ে তার ইষ্টসিদ্ধির পক্ষে যা বাহুল্য তাকে সংযমিত করবে। এমনি করে, আনন্ত্যের মধ্যে মন প্রাণ বা জড়রূপী বিভূতির স্ব-তন্ত্র প্রবৃত্তির জন্যও আত্মপরিচ্ছেদের অনুরূপ একটা বিভঙ্গ প্রয়োজন হয়। অনন্তস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন বলেই যে বিশিষ্ট স্পন্দ তাঁর পক্ষে অসম্ভব, একথা বলা চলে না। বরং অনন্তের বীর্যও অনন্ত বলে পরিচ্ছেদশক্তিও তাঁর একটা বীর্য-বিভূতি। কিন্তু তাঁর অন্যান্য আত্মবিভাবনা বা সান্ত-ব্যাকৃতির মত আত্মপরিচ্ছেদেও সত্যকার কোনও বিচ্ছেদ বা বিভাজন থাকবে না। কেননা পরিচ্ছেদকে ঘিরে তার আধাররূপে ও অন্তরালে অনন্ত-চেতনার আবেশ থাকবে, এবং এই আবেশের চেতনা প্রত্যয়সার হয়ে জড়িয়ে থাকবে পরিচ্ছেদের অবিপ্লুত আত্মচেতনাকে। আনন্ত্যের অভঙ্গচেতনায় এমনটি হতে বাধ্য, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সান্ত-স্পন্দের সমগ্র আত্মসংবিতেও এমনিতর একটা নিরূঢ় অখন্ডভাবনা আছে, যা ক্রিয়াপর না হলেও আপাত-বিদারের রেখাকে ছাপিয়েও অবিভাগ-প্রত্যয়কে অব্যাহত রেখেছে। অনন্তের মধ্যে এইধরনের সচেতন আত্মবিচ্ছেদ ব্যষ্টির আধারে বা সমষ্টির ক্ষেত্রে যে সম্ভব, তা কিন্তু অযৌক্তিক নয়। আমাদের উদার বুদ্ধি চিন্ময় সম্ভূতির লীলা বলে তাকে মেনেও নিতে পারে। তবু প্রাকৃত চেতনায় অন্ধ সংকোচের যে আড়ষ্ট বন্ধন, অবিদ্যাজনিত বিচ্ছেদ ও খন্ডতার যে-ভাবনা, ওই আত্মপরিচ্ছেদের সূত্র ধরে এপর্যন্ত তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে কি ?

কিন্তু অনন্ত-চৈতন্যের তৃতীয় একটি সামর্থ্য আছে। সে হল আত্ম-সমাধানের ফলে নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে স্বরূপস্থিতির নির্বিকল্পভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা—যেখানে আত্মসংবিৎ থাকলেও তা বিদ্যা অথবা সর্ববিদ্যার আকারে স্ফুরিত হয় না। সে-দশায় সব-কিছু পর্যবসিত হয় স্বগত-সংবিতের নির্বর্ণতায়—এমন-কি বিজ্ঞান ও অন্তশ্চেতনারও প্রলয় ঘটে বিশুদ্ধ সন্মাত্রের নিরুপাধিক প্রত্যয়ে। এই অবস্থাকে আমরা বলি নির্বিশেষ অতিচেতনার স্বরূপজ্যোতি—যদিও আমাদের কল্পিত অতিচেতনায় সাধারণত আত্মসচেতন ঊর্ধ্বচেতনারই একটা আবেশ থাকে। প্রাকৃত সংবিতের সংকীর্ণ ভূমি সে ছাড়িয়ে যায় বলে আমরা তাকে ভাবি অতিচেতন। আনন্ত্যের এই অনুপাখ্য আত্মসমাধানই, প্রকাশের দিক থেকে নয়—অপ্রকাশের দিক থেকে ধরে অচিতির রূপ। অচিতির মধ্যেও আছে আনন্ত্যের সত্তা, কিন্তু অপ্রকাশ-স্বভাব বলে আমরা তাকে অন্তহীন অসৎ ভাবি। ওই আপাত-অসতেও আত্মবিস্মৃত অথচ স্বারসিক চেতনা ও শক্তির বীর্য নিগূঢ় হয়ে আছে, নইলে অচিতির প্রেরণায় বিশ্বের ঋতম্ভরা বিসৃষ্টি সম্ভব হত না। আত্মসমাধানের একটা আচ্ছন্নদশার ভিতর দিয়ে এই সৃষ্টির কাজ চলে—মনে হয় শক্তি সেখানে আপাতমূঢ়তায়

অন্ধ হয়েও স্বতঃস্ফূর্ত, যদিও আনন্ত্যের সত্যবীর্য হতেই তার মধ্যে অকুণ্ঠ প্রেতির সঞ্চার হয়েছে। আর-একটু এগিয়ে গিয়ে যদি স্বীকার করি, আনন্ত্যের মধ্যে একদেশী আত্মসমাধানের একটা বিশিষ্ট অথবা সংকীর্ণ প্রবৃত্তিও সম্ভব, যার ফলে নিরবশেষ অভিনিবেশের গহনতায় নিঃশেষে নিজের ভিতরে তলিয়ে না গিয়ে ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি আত্মভাবনার বিশেষস্থিতিতে নিজেকে তিনি সংহৃত করেন : তাহলেই বুঝতে পারি, ঐকান্তিক অভিনিবেশ দ্বারা কি করে স্বরূপসত্তার একটি বিভাব সম্পর্কে অনন্তস্বরূপ বিবিক্তভাবে সচেতন হন। তখন ব্রাহ্মী স্থিতিতে পাই একটি মৌল যুগ্ম-বিভাব : ব্রহ্ম সগুণভাব হতে নিবৃত্ত হয়ে নির্বিকার নির্বিকল্প নির্গুণস্থিতিতে আত্মসমাহিত; তার বাইরে যা-কিছু, তা যবনিকার অন্তরালে রয়েছে, ওই বিশেষস্থিতির মধ্যে তার প্রবেশাধিকার নাই। বুঝতে পারি, এমনি করে প্রাকৃত-ব্যবহারেও সত্তার একদেশ বা একটি স্পন্দবৃত্তির সম্পর্কে চেতনা সজাগ থেকে আর সব-কিছুকে অচেতনার আড়ালে ঢেকে রাখতে পারে। অথবা সংকীর্ণ কিংবা বিশিষ্ট সংবিতের যে নিজস্ব প্রবৃত্তি বা অধিকার, তা নিয়ে ব্যাপৃত থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনিবেশজনিত জাগ্রৎ-সমাধির দ্বারা আর সব-কিছুকে সে আচ্ছন্ন করতে পারে। অনন্তচেতনার অখণ্ড সমাবেশ সেখানে অবিলুপ্ত হয়ে আছে, তার উদ্বোধন অসম্ভব নয়। কিন্তু তার ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, আছে শুধু নিগূঢ় ব্যঞ্জনা বা অনুস্যূতি। সংকুচিত সংবিতের স্তিমিত দীপ্তিতে তার প্রবর্তনা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে থাকে না নিত্যসন্নিহিত আত্মবীর্যের ভাস্বর প্রবেগ। অনন্ত-চৈতন্যের স্পন্দলীলায় উপরি-উক্ত তিনটি সামর্থ্যেরই প্রকাশ যে সম্ভবপর, এ-বিষয়ে তাহলে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। এই সামর্থ্যের বিচিত্র প্রবৃত্তির পরিচয় পেলে মায়ার খেলারও রহস্যভেদ করা অসম্ভব হবে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে শুদ্ধসত্তা চৈতন্য ও আনন্দ, আরেকদিকে বিশ্ব জুড়ে সেই সৎ-চিৎ-আনন্দের উচ্ছ্বসিত প্রবৃত্তি, বিচিত্র যোজনা ও অন্তহীন উচ্চাবচ বিপরিণাম—এ-দুয়ের মাঝে মন কেন বিরোধের সৃষ্টি করে, তারও একটা জবাব মেলে। শুদ্ধ-সন্মাত্র ও শুদ্ধ-চৈতন্যের নিত্যস্থিতিতে আমরা পাই তার স্বয়ম্ভূ নির্বিকার অলিঙ্গ সহজ অনুভব—শুধু তাকেই জানি সত্য এবং বাস্তব বলে। কিন্তু লীলার ভূমিতে অনুভব করি, লীলাস্পন্দই একান্ত সত্য ও স্বাভাবিক—এমন-কি শুদ্ধ-চৈতন্যের অনুভবকে অলীক ভাবতেও আমাদের আটকায় না। অথচ অনন্ত-চৈতন্য যে যুগপৎ স্থাণু এবং প্রভবিষ্ণু হতে পারে, একথাও এখন স্পষ্ট। স্থিতি আর গতি তার সত্তার দুটি বিভাব মাত্র এবং তার সর্বগত সংবিতে দুয়ের সহভাব মোটেই অসম্ভব নয়। তার স্থাণুত্ব উপদ্রষ্টারূপে প্রভবিষ্ণুতার

আধার, কিংবা সাক্ষী না হয়েও তার স্বতোভূৎ অধিষ্ঠান। অথবা প্রবৃত্তির মুখরতার মধ্যে অনুবিদ্ধ হয়ে থাকতে পারে নিত্যস্থিতির নৈঃশব্দ্য। কিংবা সমুদ্রের গভীর গহন যেমন তরঙ্গের চাঞ্চল্যকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অতল নৈঃশব্দ্যের এই বাণীরূপ। এইজন্যেই বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় চেতনার বিভিন্ন ভূমিকে যুগপৎ অনুভব করাও আমাদের সম্ভব হয়। যোগ-যুক্ত জীবনে এমন অবস্থাও আসতে পারে, যার মধ্যে আমাদের চেতনা দ্বিধাভিন্ন। বাইরে আমরা থাকি খর্ব, চঞ্চল, অজ্ঞান, হর্ষ-শোক প্রভৃতি দ্বন্দ্বময় ভাবনা ও বেদনার অভিঘাতে মুহ্যমান। অথচ অন্তরে আমরা শান্ত বৃহৎ সমত্বসম্পন্ন—বহিশ্চেতনার দিকে তাকিয়ে আছি অবিচল উপেক্ষা অথবা প্রশ্রিত কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে, কিংবা তার বিক্ষোভকে স্তব্ধ করে প্রশান্ত ঔদার্যে তাকে রূপান্তরিত করবার জন্যে শক্তিপ্রয়োগ করছি। এমনি করে আধারের বাইরে-ভিতরে অন্নময় প্রাণময় কি মনোময় মহলে অথবা অবচেতনার গভীর গহনে প্রাকৃত চেতনার যে মূঢ় প্রবৃত্তি রয়েছে, তার ঊর্ধ্বে উঠে সাক্ষি-ভাবে তাদের প্রশাসন করতে পারি। আবার ঊর্ধ্বচেতনার যে-কোনও ভূমি হতে নেমেও আসতে পারি অবরচেতনার যে-কোনও উপত্যকায়, তার স্তিমিত-দীপ্তি বা প্রদোষচ্ছায়াকে সাম্প্রতিক সাধনার আলম্বন ক'রে স্বরূপের অপরাংশকে এখনকার মত নিবৃত্ত কি নিগূঢ় রাখতে পারি। কিংবা তাকে লোকোত্তর এক শক্তিভান্ডাররূপে গণ্য করতে পারি, যেখান হতে অবরভূমির জন্য আহরণ করি আনুকূল্য অনুমতি সন্ধানী-আলোর দীপ্তি বা সূক্ষ্ম অনুভাব। অথবা সে যেন হয় আমাদের বিশ্রান্তির মহাভূমি আরোহ-অবরোহের সোপান বেয়ে সেখান থেকে ওঠা-নামা করি, প্রকৃতির অবরস্পন্দের খবর রাখি। আবার অন্তরাবৃত্ত হয়ে আমরা সমাধির গভীরে তলিয়ে যেতে পারি বাইরের সব-কিছু হতে নিজেকে সংহৃত করে দীপ্ত থাকতে পারি অন্ত-র্জ্যোতিতে। অথবা অন্তঃসংজ্ঞার এই গহনতারও অন্তস্তলে চেতনার কোনও গভীরতর গুহাশয়নে কিংবা অতিচেতনার লোকোত্তর কোনও ভূমিতে আত্মহারা হতে পারি। এছাড়াও সমব্যাপ্ত চেতনার একটা উদার লোক আছে, যার মধ্যে অবগাহন করে নিজেদের আমরা এক অখন্ড সবগত সংবিতের বিপুল পরি-বেশের মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে পাই। মানুষের বহিশ্চর বুদ্ধি শুধু অবিদ্যাকবলিত প্রাকৃত চেতনার স্থিতি ও গতির খবর জানে, তার গুহাহিত স্বরূপের সমগ্র পরিধি আজও তার জানার বাইরে। তাই লোকোত্তরের এই বিবরণ তার কাছে মনে হয় অদ্ভুত অনৈসর্গিক কি আজগুবি। কিন্তু আনন্ত্যের আলোকপাতে বুদ্ধি ও যুক্তির সীমা যদি প্রসারিত হয়, অথবা অনন্তস্বভাব চিদাত্মার অমেয় বীর্যে চেতনা অনুষিক্ত হয়, তাহলে লোকোত্তরের অনুভব আর দুর্গম ও তিরস্কৃত থাকে না আমাদের কাছে।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ স্বয়ম্ভূ পরমার্থ-সৎ, আর মায়া সেই স্বয়ম্ভাবেরই চিৎ-শক্তি। কিন্তু বিশ্বের উপাধিযুক্ত হলে এই ব্রহ্মই সর্বভূতাত্মা অথবা বিশ্বাত্মা; আবার তিনিই পরমাত্মারূপে বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও প্রতি পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের ব্যঞ্জনায় স্বপ্রকাশ। মায়া তখন তাঁর আত্মশক্তি। তাঁর এই পরম বিভাবের চেতনা যখন আমাদের মধ্যে ফোটে, তখন নৈঃশব্দ্যের সকল সত্তা অতল গহনে তলিয়ে যায়, অথবা বহিশ্চর প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত হয়ে প্রপঞ্চোপশম প্রশান্তিতে সমাহিত হয়। আত্মাকে তখন অনুভব করি নৈঃশব্দ্যের নিত্যস্থিতিরূপে। তিনি অচল নির্বিকার স্বয়ম্ভূ বিভু সর্বগত—অথচ নিষ্ক্রিয়, মায়ার নিত্য স্ফুরত্তা হতে বিবিক্ত।···আবার তাঁকে অনুভব করতে পারি প্রকৃতির প্রবৃত্তি হতে তটস্থ পুরুষরূপে। কিন্তু এ-অনুভবে অভিনিবেশের একটা ঐকান্তিকতা আছে, যা চিন্ময়ভূমির একদেশে চিত্তকে নিরুদ্ধ রাখে, সমস্ত স্পন্দবৃত্তি হতে তাকে বিবিক্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলতে চায় প্রকাশ ও প্রবৃত্তির সকল সংকোচ হতে নির্মুক্ত স্বয়ম্ভূ ব্রাহ্মী চেতনার নিরঞ্জন অনুভব। অধ্যাত্মসাধনায় এ-অনুভব স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য, কিন্তু এতেই অনুভবের নিটোল পূর্ণতা আসে না। কারণ আমরা জানি, যে-চিৎশক্তি কৃতি ও সৃষ্টির অধিনায়িকা, সে তো ব্রহ্মেরই মায়া বা সর্ববিদ্যা; সে-শক্তি আত্মারই শক্তি। স্ব-ভাববশে সক্রিয় পুরুষের যে-ব্যাপার, তাকে বলি প্রকৃতি। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতির মাঝে, আত্মার নৈঃশব্দ্য ও তাঁর চিন্ময় সৃষ্টিবীর্যের মাঝে ভেদের কল্পনা অযৌক্তিক। এরা বস্তুত একটি ভাবেরই দুটি দল। তাইতে বলা হয়, অগ্নিকে যেমন দাহিকাশক্তি হতে পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্মকেও তাঁর চিৎ-শক্তি হতে বিবিক্ত কল্পনা ক'রে চলে না। অতএব উত্তারের পথে প্রপঞ্চোপশম পরম প্রশান্তি ও নির্বিকল্প নিত্যস্থিতিরূপে যে প্রাথমিক আত্মদর্শন ঘটে, তাকেই অনুভবের পূর্ণসত্য বলতে পারি না। জগৎ-ভাব ও জগৎ-ক্রিয়ার নিমিত্তরূপে আত্মশক্তির স্ফুরত্তাও অনুভবের আরেকটা দিক হতে পারে। তবে কিনা কূটস্থ-ভাবও ব্রাহ্মী চেতনার একটা মৌল-বিভাব, যার মধ্যে তাঁর অপুরুষবিধ নির্গুণ স্বভাবের 'পরে খানিকটা জোর রয়েছে। তাই মনে হয়, আত্মার শক্তি যেন স্বতস্ফূর্ত সংবেগের বশে কাজ ক'রে চলেছে। আত্মা শুধু শক্তির আশ্রয়, তার প্রবৃত্তির সাক্ষী ভর্তা প্রবর্তক ও ভোক্তা—কিন্তু তাবলে মুহূর্তের জন্যেও তার সঙ্গ অবিবিক্ত নন। আত্মার অপরোক্ষ-অনুভবে তাঁর অজ শাশ্বত অশরীরী নির্লিপ্ত স্বভাবের পরিচয় পাই। আধারে গুহাশায়িরূপে যেমন তাঁকে অনুভব করি, তেমনি দেখি অধ্যক্ষরূপে ঊর্ধ্বে থেকে আধারকে তিনি জড়িয়েও আছেন—তিনি সর্বগত, সর্বভূতে সম, শাশ্বত অনন্ত অস্পর্শ নিরঞ্জন। কূটস্থ আত্মাকে আবার জীবের প্রকৃতিস্থ আত্মারূপেও দর্শন করা চলে। তখন তিনি কর্তা ভোক্তা ও মন্তা হলেও তাঁর মহিমা অম্লান, কেননা তাঁর ব্যষ্টিভাবনার সঙ্গে

ওতপ্রোত হয়ে আছে বিশ্বভাবনার বৈপুল্য—এই মুহূর্তে যার মধ্যে তিনি অবগাহন করতে পারেন। তার অব্যবহিত পূর্বে আছে বিশ্বোত্তর ভাবনার অবিকল্প প্রত্যয়—নির্বিশেষের মধ্যে অপ্রমেয় নিঃশেষ নিমজ্জন। আত্মা ব্রহ্মের সেই পরম বিভাব, যার মধ্যে আমরা যুগপৎ পাই জীবভূত, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপের অন্তরঙ্গ অনুভব। তাই আত্মোপলব্ধির বীর্যই আমাদের মধ্যে নিয়ে আসে ব্যক্তির মুক্তি, অচলপ্রতিষ্ঠ বিশ্বচেতনা ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বে অতিস্থিতির ক্ষিপ্র ও সহজ সিদ্ধি। কিন্তু এছাড়াও আত্মোপলব্ধির আরেকটা দিক আছে, যার মধ্যে আত্মাকে আমরা অনুভব করি শুধু সর্বভূতের ভর্তা ব্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে নয়। দেখি, সর্বভূতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান-রূপে স্বীয়া প্রকৃতির সকল বিভূতিতেই তিনি স্ব-তন্ত্র হয়েও তন্ময়। কিন্তু এখানেও স্বাতন্ত্র্য এবং অপুরুষবিধতাই তাঁর স্বভাব। বিশ্বে লীলায়িত আত্মশক্তির প্রশাসন ছুঁয়েও যায় না তাঁকে—অবিদ্যার জগতে প্রকৃতির কাছে পুরুষের আপাতবশ্যতার মত। চিৎসত্তার শাশ্বত স্বাতন্ত্র্যের অনুভব তাই আত্মোপলব্ধির মুখ্য অর্থ।

আত্মা যখন প্রকৃতির প্রবৃত্তি ও রূপায়ণের প্রবর্তক সাক্ষী ভর্তা ঈশ্বর ও ভোক্তা, তখন তাঁকে বলি পুরুষ। জীব অথবা বিশ্বরূপী সম্ভূতিতে সংবৃত্ত ও অবিবিক্ত হয়েও আত্মার যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ স্ব-ভাবের হানি হয় না কখনও, তেমনি তাঁর পুরুষরূপে বিশেষ করে ফুটে ওঠে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়েও অন্তরের যোগে নিত্যযুক্ত থাকেন তার সঙ্গে। চিন্ময়-পুরুষ তাঁর নিত্যত্ব বিভুত্ব ও অপুরুষবিধত্ব অব্যাহত রেখেও পুরুষবিধতার দিকেই ঝুঁকে পড়েন।* তাই প্রকৃতিতে তাঁকে দেখি যুগপৎ নির্গুণ-সগুণ সত্তারূপে। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগ রয়েছে বলে তিনি কোনকালেই পূর্ণবিবিক্ত নন। প্রকৃতির প্রবৃত্তি পুরুষের জন্যই—তাঁরই অনুমতিতে, তাঁর সঙ্কল্প ও ভোগের তর্পণকল্পে। আবার পুরুষও তাঁর চেতনা প্রকৃতির শক্তিতে উপসংক্রান্ত করেন, দর্পণে প্রতিবিম্বের মত সে-চেতনায় গ্রহণ করেন প্রকৃতির উপরাগ, বিশ্ববিধাত্রী শক্তি-রূপে প্রকৃতি যে-রূপেরই ছায়া ফেলে তাঁর 'পরে তাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন—প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে কখনও অনুমতি দেন, কখনও-বা তা প্রত্যাহার করেন। পুরুষ-প্রকৃতির স্বরূপানুভূতিও অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে অপরিহার্য, কেননা উভয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধের 'পরে রয়েছে শরীরী জীবের সমগ্র চৈতন্য-লীলার নির্ভর। পুরুষ যদি উদাসীন থেকে প্রকৃতিকে আমাদের মধ্যে কাজ

---

* সাংখ্যকার পুরুষের পুরুষবিধতার 'পরে জোর দিয়ে তাঁকে বহু বলে কল্পনা করেছেন এবং প্রকৃতিকে করেছেন বিভু। তাই সাংখ্যমতে প্রত্যেক পুরুষের স্ব-তন্ত্র সত্তা থাকতেও সব পুরুষ এক বিশ্বব্যাপী সামান্য-প্রকৃতিকেই ভোগ করেন।

করতে দেন, প্রকৃতির সমস্ত উপরাগকে স্বীকার করে আপনাহতে সায় দিয়ে যান তার কাজে—তাহলে আমাদের মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় জীবনচেতনা প্রকৃতির পরবশ হয়ে পড়ে। তখন প্রকৃতিজ গুণের অধীন হয়ে তারই প্রবৃত্তির শাসন মেনে তাদের চলতে হয়। কিন্তু পুরুষ নিজের স্বরূপ জেনে সাক্ষিরূপে প্রকৃতি হতে যদি সরে দাঁড়ান, তাহলে তা-ই হয় জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সূচনা। কেননা জীব তখন অনাসক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রকৃতির তত্ত্ব ও ব্যাপ্রিয়ার সকল রহস্য জানতে পারে। তখন আর প্রকৃতির কর্মে তাকে জড়িয়ে যেতে হয় না। তার উপরাগকে গ্রহণ করা-না-করা কিংবা তার কাজে সায় দিয়ে চলার মধ্যে পরবশতার ভাব আর থাকে না, তাই পুরুষের অনুমতিও হয় স্ব-তন্ত্র ও আজ্ঞাসিদ্ধ। প্রকৃতি আমাদের নিয়ে কি করবে না করবে, আমরাই তখন তার নিয়ন্তা। ইচ্ছা করলে তার সমস্ত ব্যাপার হতে বিবিক্ত হয়ে কূটস্থ আত্মার চিন্ময় নৈঃশব্দ্যে আমরা তখন সমাহিত হতে পারি। অথবা তার বর্তমান গুণলীলাকে প্রত্যাখ্যান করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি লোকোত্তর চিন্ময় ভূমিতে এবং সেখান হতে আমাদের জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারি। পুরুষ আর তখন অনীশ নন, আত্মপ্রকৃতির ঈশ্বর।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের সবচাইতে বিস্তৃত এবং প্রৌঢ় আলোচনা পাই। প্রকৃতি সেখানে ক্রিয়া-শক্তি—চৈতন্য হতে বিযুক্ত একটা প্রবেগ। চৈতন্য পুরুষের স্বভাব, অতএব পুরুষ হতে বিবিক্ত হয়ে প্রকৃতি জড় অচেতন ও যন্ত্রধর্মী। প্রকৃতি তার আত্মব্যাকৃতি ও ক্রিয়ার আধাররূপে গড়ে তোলে আদি জড়ভূত এবং তার মধ্যে ফোটায় প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির লীলা। কিন্তু জড় হতে উৎপন্ন প্রকৃত্যংশ বলে বুদ্ধিও জড় অচেতন ও যন্ত্রধর্মী। বুদ্ধির সাংখ্যসম্মত এই ব্যাখ্যা হতে জড়বিশ্বে অচিতির ক্রিয়াকলাপে কি করে অন্যোন্যসম্বন্ধ ও ঋতের ছন্দ দেখা দেয়, তার খানিকটা জবাব মেলে। বোঝা যায়, ইন্দ্রিয়মানস এবং বুদ্ধির 'পরে আত্মচৈতন্যের দীপ্তি ঝরলে তারই চেতনায় তারা সচেতন এবং চিৎসত্তার অনুমতিতে সক্রিয় হয়। প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে পুরুষ স্ব-তন্ত্র হন। জড়ের সঙ্গে অবিবেকের সম্ভাবনাকে নিরাকৃত করে তিনি হন প্রকৃতির প্রভু। প্রকৃতির উপাদানে ও ক্রিয়ায় তিনটি তত্ত্ব পর্যায় বা গুণ আছে। একটি তার জড়স্থিতি, আরেকটি প্রবৃত্তিধর্ম, আর তৃতীয়টি তার প্রকাশতত্ত্ব—সৌষম্য ও সামঞ্জস্যের সাধনায় যার পরিচয়। এই তিনটি গুণই আমাদের শরীর-মনের মৌল উপাদান ও প্রবৃত্তির নিমিত্ত। গুণবৃত্তির বৈষম্যে প্রকৃতি সক্রিয় হয়, আবার গুণসাম্যে তার উপশম ঘটে। সাংখ্য-মতে পুরুষ বহু—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নয়, কিন্তু প্রকৃতি এক। অতএব বিশ্বের সকল অন্বয় তত্ত্বই প্রকৃতির অন্তর্গত। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ আবার স্ব-তন্ত্র

ও স্ব-নিষ্ঠ—ভোগে অথবা অপবর্গে একান্তই অন্য-বিবিক্ত। অন্তরাবৃত্ত হয়ে ব্যষ্টি জীবচেতনা ও বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্বকে অপরোক্ষভাবে যখন জানি, তখন সাংখ্যসিদ্ধান্তের প্রামাণ্য অনস্বীকার্য হয়। কিন্তু সে-প্রামাণ্য ব্যাবহারিক প্রামাণ্য, অতএব একদেশী। তাই সাংখ্যের সিদ্ধান্তকেই আত্মা অথবা প্রকৃতির চরমতত্ত্ব বলে মানতে আমরা বাধ্য নই। জড়জগতে প্রকৃতি অচিৎ-শক্তিরূপে দেখা দেয় সত্য, কিন্তু চেতনার উৎক্রমের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিও চিন্ময়ী হয়ে ফুটে ওঠে। তখন দেখি তার অচিতির মধ্যেও সংবৃত্ত-চেতনার নিগূঢ় আবেশ ছিল। তেমনি ঘটে-ঘটে পুরুষ বহু বটে। কিন্তু তাঁর কূটস্থ অনুভবে দেখি, পুরুষ স্বরূপসত্তায় যেমন এক, তেমনি সর্বভূতেও এক। তাছাড়া পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈত যেমন অনুভবের সত্য, তেমনি তাদের অদ্বৈতভাবের অনুভবও তো সত্য। প্রকৃতি বা শক্তি তার পরিণামের লীলাকে পুরুষে সংক্রামিত করতে পারে। তার কারণ, প্রকৃতি পুরুষেরই আত্মপ্রকৃতি বা আত্মশক্তি, তাই তার উপরাগকে স্বীকার করতে তাঁর বাধে না। আবার পুরুষ যে প্রকৃতির প্রভু হতে পারেন, তারও গোড়ায় আছে ওই একই তত্ত্ব। পুরুষ আত্মপ্রকৃতির যে-লীলাকে এতকাল উদাসীন হয়ে দেখেছেন, আজ প্রভু হয়ে তার প্রশাসনের ভার তুলে নিয়েছেন। এমন-কি উদাসীন দশাতেও প্রকৃতির কাজে পুরুষের অনুমতির অপেক্ষা ছিল। তাইতে প্রমাণ হয়, তাঁরা কোনকালেই পরস্পরের অনাত্মীয় নন। সত্তার আত্মবিসৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনে এই দ্বৈত-স্থিতির উদ্ভব। কিন্তু তাবলে সত্তা ও চিৎ-শক্তিতে, পুরুষ এবং প্রকৃতিতে মৌল কোনও বিবিক্তভাব বা দ্বৈতের ভাবনা নাই।

বস্তুত আত্মাই আত্মপ্রকৃতির সমস্ত প্রবৃত্তির ঈক্ষণ অনুমোদন অথবা শাসনের জন্য পুরুষরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরুষ আর প্রকৃতির মাঝে দেখা দেয় দ্বৈতের একটা আভাস—যাতে পুরুষের অনুমোদন নিয়েই প্রকৃতির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্য ফুটতে পারে, আবার প্রকৃতির প্রশাসনে ও রূপায়ণে পুরুষেরও নিরঙ্কুশ ঈশনা থাকে। তাছাড়া পুরুষ যে-কোনও মুহূর্তে আত্মপ্রকৃতির যে-কোনও ব্যাকৃতি হতে নিজেকে বিবিক্ত করতে অথবা সকল গুণলীলার প্রলয় ঘটাতে পারেন যাতে, কিংবা উৎকৃষ্ট রূপায়ণের অনুমোদন বা নববিধান যাতে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, তার জন্যও এমনিতর দ্বৈত-ভাবনার প্রয়োজন আছে। আত্মশক্তিকে নিয়ে পুরুষের এই লীলায়নের যে সুনিশ্চিত একটা সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের অনুভবে তার প্রমাণসিদ্ধ পরিচয় পাই। অনন্ত-চৈতন্যের অমেয় বীর্যের এই তো যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম। আর চেতনার আনন্ত্য যে শক্তিকেও অনায়াস ও অকুণ্ঠিত করবে, তাও তো অনস্বীকার্য। পুরুষ আর প্রকৃতিতে রয়েছে অবিনাভাবের সম্বন্ধ। তাই প্রকৃতি বা চিৎ-শক্তির প্রবৃত্তিতে যে-স্থিতিই প্রকট হ'ক, পুরুষের মধ্যেও তার অনু-

রূপ একটা স্থিতি দেখা দেবে। পরমস্থিতিতে পরুষ যখন পুরুষোত্তম, তখন চিৎ-শক্তিও তাঁর পরা প্রকৃতি। প্রকৃতি-পরিণামের পর্বে-পর্বে পুরুষেরও ভূমিকার বদল হয়। মনঃপ্রকৃতিতে পুরুষ মনোময়, প্রাণপ্রকৃতিতে প্রাণময়, জড়প্রকৃতিতে অন্নময়। আবার অতিমানসে তিনি বিজ্ঞানময়, পরা সংবিতে আনন্দময় শুদ্ধ-সন্মাত্র। আমাদের মত শরীরী জীবের মধ্যে চৈত্যপুরুষরূপে তিনি আছেন সবার পিছনে—অন্তরাত্মারূপে ভরণ ও পোষণ করছেন চিন্ময়-জীবনের অন্তর্গূঢ় যত রূপায়ণ। আমাদের মধ্যে যে-পুরুষ জীবাত্মা—তিনিই বিশ্বে বিশ্বাত্মা, তুরীয়ে তুরীয়। আত্মস্বরূপের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য সুস্পষ্ট। কিন্তু এই আত্মস্বরূপেই আছে সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট চিৎ-সত্তার সগুণ-নির্গুণ স্বভাবের নিরঞ্জন সমন্বয়। তিনি নির্গুণ, কেননা গুণলীলা তাঁর মধ্যে ভেদের ভাবনা আনেনি। আবার তিনি সগুণ, কেননা ভূতে-ভূতে অভিব্যক্ত ব্যষ্টি-প্রকৃতির তিনিই শাস্তা। এই দ্বিদল আত্মস্বরূপ তাঁর স্বকীয় চিৎশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির সকল বিলাসের বিধাতা, তারই জন্যে পরিণামের পর্বে-পর্বে তাঁর যথাযোগ্য অধিষ্ঠান।

কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত। পুরুষ-প্রকৃতি যে-ব্যষ্টিবিভাবেই সম্পুটিত হয়ে দেখা দিন না কেন, বিশ্বভাবনার দিক দিয়ে চিন্ময়পুরুষ সর্বত্র তাঁর প্রকৃতির প্রভু অথবা শাস্তা। প্রকৃতিকে তাঁর নিজের 'পরে স্বৈরাচারের অধিকার দিলেও তার কর্মে কিন্তু তাঁর অনুমতির অপেক্ষা অব্যাহতই থাকে। ব্রহ্মের তৃতীয় বিভাবে অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরস্বরূপে এই তত্ত্বটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও ধাতা। এই বিভাবে পরমপুরুষ বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মিকা চিৎশক্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেন। অনুভব করি, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বান্তর্যামী 'চেতনশ্চেতনানাং', এমন-কি অচেতনেরও চেতনা। দেহে মনে হৃদয়ে জীবচেতনায় তিনি সর্বভূতাধিবাস, সর্বকর্মের শাস্তা ও অধ্যক্ষ, সর্বরসের মধুদ ভোক্তা, আত্মবিভূতিরূপে সর্বভূতের স্রষ্টা। সবময় পুরুষ তিনি—তাই সকল পুরুষ তাঁর অংশকলা, তাঁরই শক্তিস্বরূপ হতে বিশ্বের চিত্রশক্তির বিচ্ছুরণ। পরমাত্মারূপে তিনি সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, সন্মাত্ররূপে জগতের পিতা, চিৎ-শক্তিরূপে তার মাতা। সর্বভূতের তিনি 'বন্ধুরাত্মা'। সর্বসুন্দর আনন্দঘনবিগ্রহ তিনি, তাঁহতেই জগতে ঝরে পড়ছে রূপ আর আনন্দের ধারা—বিশ্বনিখিলে তিনিই বঁধু, তিনিই কান্তা। একদিক দিয়ে দেখলে এই ভগবত সত্তার অনুভবে আমাদের চেতনার সর্বাধিক স্ফূর্তি ও চরিতার্থতা, কেননা ঈশ্বরের মধ্যেই আছে সকল ভাবের অদ্বৈত-সমন্বয়, বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক তত্ত্বের যুগপৎ বিলাস। নিখিল ব্যষ্টি-বিভাবের তিনিই ভর্তা অধিবাসী এবং অতিগামী। তিনিই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা এবং পুরুষোত্তম (গীতা)। স্পষ্টই বোঝা যায়, লোকাতত

ধর্মের ঈশ্বর-পুরুষ তাঁকে বলা যায় না—কেননা সে-ঈশ্বর গুণে সীমিত ও সর্বভূত হতে বিবিক্ত ব্যক্তি-বিশেষ। তাই লোককল্পিত ঈশ্বরকে বলা চলে এক পরম-ঈশ্বরের খন্ড-রূপ বা খন্ড-নাম, তাঁর বিচিত্র দিব্যবিভূতি। সর্বগুণাধার ঈশ্বরকে সক্রিয় সগুণ-ব্রহ্মও বলা চলে না, কেননা সগুণ-ব্রহ্ম তাঁর একটি বিভাব মাত্র। তেমনি নিষ্ক্রিয় নির্গুণ-ব্রহ্মও তাঁর আরেকটি বিভাব। ঈশ্বরই ব্রহ্ম আত্মা ও চিৎসত্তা—আত্মসত্তার অধিষ্ঠান ও ভোক্তারূপে তাঁর প্রকাশ। বিশ্বের স্রষ্টা হয়েও তিনি বিশ্বাত্মক অথচ বিশ্বোত্তীর্ণ—তিনি শাশ্বত অনন্ত অনির্বাচ্য তুর্যাতীত দিব্য-পুরুষ।

ব্যক্তিভাব আর নৈর্ব্যক্তিকতার মাঝে একান্তবিরোধের যে-সংস্কার আমাদের চিত্তে রয়েছে, আসলে সে কিন্তু জড়জগতের উপরভাসা একটা পরিচয়কে অবলম্বন ক'রে আমাদেরই মনের সৃষ্টি। পৃথিবীতে দেখছি, অচিতি হতে সবার উদ্ভব। কিন্তু সে-অচিতি নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক। প্রকৃতিকে আমরা অচেতন শক্তি বলে জানি। তার গতি-প্রকৃতির যে-রহস্যটুকু আমাদের কাছে ধরা পড়ে, তাতে পাই তার নিখাদ নৈর্ব্যক্তিকতারই পরিচয়। সমস্ত শক্তি-রূপের মুখে এই মুখোস। বস্তুর যত গুণ ও বীর্য—এমন-কি প্রেম আনন্দ ও চেতনারও একটা নৈর্ব্যক্তিক বিভাব রয়েছে। মনে হয়, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক জগতে ব্যক্তিভাব চেতনার একটা বিকল্প মাত্র। এ-জগতে আছে শক্তির কুণ্ঠিত প্রচার, গুণের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতির ক্রিয়ার চিরাভ্যস্ত সংবেগ, ব্যষ্টি-অনুভবের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে বার-বার আবর্তন। ব্যক্তিভাবের এই হল উপাদান। কিন্তু এ-ব্যূহ আমাদের ভাঙতেই হয়। বিশ্বাত্মভাবকে পেতে হলে ব্যক্তিভাবের সংকীর্ণ গন্ডি ছাড়তেই হয়, অহন্তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতেই হয়। আর বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবে পেঁছিতে হলে তো কথাই নাই। কিন্তু আমরা যাকে ব্যক্তিভাব বলি, সে তো বহিশ্চর চেতনার একটা রূপায়ণ মাত্র। তার পিছনে আছেন শাশ্বত চিন্ময়-পুরুষ—যিনি পুরুষবিধতার বিচিত্র কঞ্চুকে নিজেকে সাজান, যুগপৎ বহু ব্যক্তিভাবের সমাহর্তা হয়েও যিনি এক শাশ্বত পরমতত্ত্ব। তাইতে দৃষ্টির প্রসারে দেখি—যাকে বলি নির্গুণ অপুরুষবিধতা, তাও চিন্ময়-পুরুষের অন্যতম বিভূতি মাত্র। সৎ-পুরুষ না থাকলে শুধু সত্তার কোনও অর্থ হয় না, সচেতন কেউ না থাকলে চেতনার দাঁড়াবার ঠাঁই থাকে না, ভোক্তা ছাড়া আনন্দ নিরর্থক ও নিষ্প্রমাণ, প্রেমিক ছাড়া কোথায় প্রেমের আধার বা পূর্ণতা, সর্বশক্তিমানের আশ্রয় না পেলে সর্বশক্তিও যে বন্ধ্যা! পুরুষ বলতেই আমরা বুঝি চেতন বিগ্রহ। এ-জগতে যদি অচিতির বিভূতি বা পরিণাম-রূপেও সে দেখা দেয়, তবু অচেতনাই তার তত্ত্ব নয়। কেননা অচিতি নিজেই যে নিগূঢ় চেতনার বিলাস মাত্র। সর্বত্র দেখছি, উপাদান হতে বিসৃষ্টি মহত্তর। তাই জড়ের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে বড় জীবচেতনা। আর

সবার চাইতে বড় চিদ্বস্তু—কেননা সে-ই তো আধারে 'গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্', উন্মেষের চরম তত্ত্বরূপে সে-ই দেখা দেয় সবার শেষে। আবার এই চিদ্বস্তুই পুরুষ—সর্বানুস্যূত বিরাট চিন্ময় পুরুষ। আমাদের 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' এ-ই পরপুরুষ, কিন্তু প্রাকৃত মন তাঁকে জানে না। আমাদের ক্ষুদ্র অহন্তা ও সংকীর্ণ ব্যক্তিভাবকেই সে মনে করে পুরুষ-তত্ত্ব, অচিতির গহন হতে সংকুচিত চেতনা ও ব্যক্তিভাবের প্রাতিভাসিক উন্মেষকে ভুল ক'রে ভাবে একান্ত সত্য বলে। তাইতে ব্রহ্মের গুণলীলা আর গুণাতীত ভাব, তাঁর পুরুষবিধতা আর অপুরুষবিধতার মাঝে দেখা দেয় আমাদেরই মনঃকল্পিত একটা মিথ্যা বিরোধ। এক শাশ্বত অনন্ত স্বয়ম্ভূ-সত্তাই পরমার্থ-সৎ। কিন্তু স্বয়ম্ভূ-সত্তার তত্ত্ব ও তাৎপর্য পর্যবসিত হয়েছে লোকোত্তর শাশ্বত পরম-সন্মাত্রের আত্মভাবে ও চিৎস্বরূপে—যাকে বলতে পারি অনন্ত পুরুষ, কেননা তাঁরই সত্তা নিখিল পুরুষবিধতার তত্ত্ব ও নিদান। তেমনি বিশ্বাত্মা বিশ্বচিৎ বিশ্বসৎ বা বিরাট পুরুষই বিশ্বের তত্ত্ব এবং তাৎপর্য। আবার ওই সন্মাত্র চিৎস্বরূপ আত্মা বা পুরুষই বহু-ভাবনায় জীব হয়েছেন, অতএব তাঁর স্ব-ভাব জীব-ভাবেরও তত্ত্ব এবং তাৎপর্য।

যাঁকে দিব্য-পুরুষ পরম-পুরুষ ও বিরাট্-পুরুষ বলছি, তাঁকেই যদি ঈশ্বর বলে মানি, তাহ'লে তাঁর জগৎ-প্রশাসনের রীতি সম্পর্কে আমাদের মনে একটা খটকা জাগে। সাধারণত ঈশ্বর বলতে আমাদের কল্পনায় ফোটে মানবীয় শাসনতন্ত্রের একটা আদর্শ। ভাবি, মন ও মনের ইচ্ছা নিয়ে তাঁর কারবার, তাই সর্বশক্তিমত্তার খেয়ালখেয়ালে জগতের 'পরে তাঁর মনঃকল্পনাকেই তিনি আইন বলে চাপান। তাঁর ইচ্ছা তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের বন্ধনহীন খুশির খেলা। কিন্তু দিব্য-পুরুষের কোনও দায় আছে কি সংকল্প বা ভাবনার স্বৈরাচার দিয়ে জগৎ শাসন করবার—তথাকথিত সর্বশক্তিমান-অথচ-অজ্ঞান (!) মানুষের মত? তাঁর মধ্যে মনোধর্মের সংকোচ নাই। তাঁর অখণ্ড-চেতনায় আছে সর্বভূতের স্বরূপ-সত্যের সংবিৎ। তিনি জানেন, সর্ববিৎ বলেই তাঁর জ্ঞানময় তপঃশক্তি সেই অন্তর্গূঢ় সত্যের প্রেতিতে ফুটিয়ে তুলছে বিশ্বের সকল বস্তুর গুহাহিত তাৎপর্য, তাদের নিয়তি বা সম্ভাব্যতা, তাদের অনতিবর্তনীয় আত্মস্বভাবের প্রবর্তনা। দিব্য-পুরুষ স্ব-তন্ত্র, নিয়তিকৃত কোনও নিয়মেরই বন্ধন তাঁর নাই। তবু তাঁর লীলাতে দেখা দেয় ক্রম ও নিয়ম—বস্তুর তারা স্বরূপ-সত্যের পরিচায়ক বলে। সে-সত্য গণিত কি যন্ত্র-তন্ত্রের স্থূল সত্য নয়। তার মধ্যে প্রকাশ পায় বস্তুর চিন্ময় তত্ত্বভাবের স্বরূপ, তারা যা হয়েছে এবং যা হবে তার অভিব্যঞ্জনা, তাদের অন্তর্নিবিষ্ট বীজভাবের আকৃতি। বিশ্বলীলায় স্বরূপে আবিষ্ট থেকেও দিব্য-পুরুষ অধ্যক্ষরূপে তাকে ছাপিয়ে আছেন। তাই প্রকৃতির একদিকে চলছে নানা জটিল বিধি-বিধানের সীমিত প্রযোজনা, অথচ

তারও মধ্যে রয়েছে দিব্য-পুরুষের আবেশ ও অধিষ্ঠান। কিন্তু প্রকৃতির এই ঐশ্বর্যকে ছাপিয়ে আরেকদিকে রয়েছে অধ্যক্ষ পুরুষের দিব্য-কর্ম ও ঐশ্বর-যোগের অবন্ধ্য প্রেতি—যা কামচারবশে নয়, প্রমুক্ত স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসেই কখনও নিয়তির বিপর্যয় ঘটায়। আমরা তাকে ভাবি প্রাতিহার্য বা ইন্দ্রজাল—জানি না এ শুধু অপরা প্রকৃতির 'পরে চিন্ময়ী পরমা প্রকৃতির অপ্রতর্ক্য প্রশাসন। বস্তুত অপরা প্রকৃতি তো পরমা প্রকৃতিরই খণ্ডবিভূতি মাত্র। অতএব উত্তর-ভূমির জ্যোতি শক্তি ও প্রভাব যে তার মধ্যে বিপর্যয় বা বিপরিণাম আনবে, সে আর বিচিত্র কি? জড়প্রকৃতি গণিতের স্বতঃসিদ্ধ বিধান মেনে যন্ত্রের মত চলছে, সেকথা মিথ্যা নয়। কিন্তু ওই যন্ত্রবৃত্তের অন্তরালে কাজ করে চলেছে চেতনার চিন্ময় বিধান, যাহতে অপরা প্রকৃতির যন্ত্রলীলাতে সঞ্চারিত হচ্ছে একটা অন্তরাবৃত্ত সাথকতার প্রবেগ, যাথাতথ্যের একটা গভীর ব্যঞ্জনা, অন্তঃসংজ্ঞ নিয়তির একটা গূঢ় প্রবর্তনা। আবার তারও উপরে আছে চিন্ময় স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য, যার মধ্যে চিৎ-পুরুষের বিশ্বম্ভর পরম-সত্যই দিব্যজ্ঞান ও দিব্যকর্মে ছান্দিত হয়ে উঠছে। ঈশ্বরের জগৎ-শাসনকে বা তাঁর কর্ম-রহস্যকে আমরা নরলীলা কি যন্ত্রলীলা ছাড়া আর-কিছুই ভাবতে পারি না। খানিকটা সত্য এতে থাকলেও এ তাঁর দিব্য-বিভূতির একটা দিক মাত্র। বস্তুত বিশ্বের প্রশাসনের মূলে রয়েছে সর্বাধিবাস ও সর্বাধ্যক্ষ পরম অন্বয়-বস্তুর অনন্ত-চিন্ময় সংবেগ। অতএব তার তাৎপর্য এবং গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে আমাদের অনন্ত-চেতনার ন্যায়ের বিধান আশ্রয় করতে হবে।

অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বের এই একটি বিভাবের সঙ্গে আর-আর বিভাবকে নিবিড়-ভাবে যুক্ত করে দেখলে বুঝতে পারি, তাঁর শাশ্বত স্বয়ম্ভাবের সঙ্গে তাঁর চিৎ-শক্তির বিশ্বভাবন পরিস্পন্দের কি সম্বন্ধ। নিষ্ক্রিয় নিশ্চল স্থাণু স্বয়ম্ভূসত্তার অগম নৈঃশব্দ্যে সমাহিত হলে দেখি : ওই নৈঃশব্দ্যের অনাহত ধ্বনিরূপে পরব্রহ্মের লীলাসঙ্গিনী চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপিণী মায়া চেতনার ফুল ফুটিয়ে চলেছেন সিদ্ধকল্পনার অকুণ্ঠ রূপায়ণে। সদ্-ব্রহ্মের নিত্য-স্থিতির অচলাসনে তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁরই অনুমতিতে সত্তার চিন্ময়-ধাতুকে আকারিত করছেন রূপ ও স্পন্দের অন্তহীন উল্লাসে—আর আকুতিচঞ্চলা গৌরীর লাস্যলীলার উপদ্রষ্টারূপে প্রশান্ত আনন্দে শিবস্বরূপ চেয়ে আছেন অক্ষুব্ধস্থিরমানস হয়ে। এ-লাস্য বাস্তব হ'ক বা বিভ্রম হ'ক, তবু এ-ই তার তত্ত্ব এবং তাৎপর্য। চিন্ময়ীর লীলা চলছে শুদ্ধ সন্মাত্রকে নিয়ে, মহাশক্তির অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে অস্তিত্বের অব্যাকৃত মহা গহন হতে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে সৃষ্টির কত ছন্দোময় উপাদান। অথচ নৃত্যপরা মহাপ্রকৃতির প্রতি চরণক্ষেপ বিধৃত হয়ে আছে শৈব দৃষ্টির গূঢ় অনুবিধান দ্বারা। এ-দর্শন সত্য, তাতে কোনও ভুল নাই। বাইরে-ভিতরে বিশ্বের সর্বত্র দেখছি এই লীলা।

অতএব বিশ্ব-সত্তার এই বিভাবের মূলে নির্বিশেষেরই কোনও সত্য-বিভূতির সায় আছে।...কিন্তু বিশ্বলীলার বহিশ্চর প্রতিভাস হতে চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করে যদি নিমজ্জিত করি—সাক্ষিচৈতন্যের নৈঃশব্দ্যে নয়—কিন্তু চিৎ-স্বরূপের সর্বাবগাহী লীলারসের আস্বাদনে, তাহলে আবার এই চিন্ময়ী মায়া-শক্তিকে দেখি স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের আত্মবীর্যরূপে। পরমপুরুষ মায়াধীশ সর্ব-ভূতের ঈশ্বর তিনি। আত্মবিসৃষ্টির স্ব-তন্ত্র শাস্তারূপে তিনিই বিশ্বের বিধাতা। বিশ্ব হতে বিবিক্ত হয়ে প্রকৃতিকে ও তার সৃষ্টিকে প্রবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যও যদি তিনি দেন, তবু তাঁর অনুমতিতে নিগূঢ় হয়ে থাকবে তাঁর ঈশনা—প্রতি পদে থাকবে 'তথাস্তু' বলে তাঁর অনুচ্চারিত অনুমোদনের শাসন। নইলে কিছুই ঘটবে না, জগতের কোনও কাজই চলবে না। শুদ্ধসন্মাত্র আর চিৎ-শক্তিতে, পুরুষে-প্রকৃতিতে স্বরূপত কোনও দ্বৈতভাব নাই। অতএব প্রকৃতির কর্তৃত্ব বস্তুত পুরুষেরই কর্তৃত্ব। অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে যখন বিশ্বের সর্বত্র এক প্রাণময় তত্ত্বের রূপায়ণ ও প্রশাসন অনুভব করি, তার সর্বেশনা ও অখণ্ড-বীর্যের আবেগকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখি—তখন আমাদের চেতনায় পুরুষে-প্রকৃতিতে ওই অবিনাভাবের সত্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন বুঝি, এও সেই নির্বিশেষের কোনও সত্যবিভূতির সিদ্ধরূপ।

আবার নৈঃশব্দ্যে সমাহিত হই যখন, তখন সে-গভীরে বিশ্বভাবিনী চিতি-শক্তি আর তার বিলাস কোথায় তলিয়ে যায়। তখন প্রপঞ্চ আমাদের কাছে উপশান্ত, নয়তো অবাস্তব। কিন্তু সন্মাত্রের মধ্যে যখন শুধু স্বয়ম্ভূ-পুরুষের প্রশাস্তার ভাবটি অনুভব করি, তখন তাঁর বিশ্ববিধায়িনী শক্তি নিমজ্জিত হয় তাঁর অদ্বিতীয় অনুভাবে অথবা ফুটে ওঠে তাঁর বিরাটভাবের একটা বিভূতি হয়ে। বিশ্বের মধ্যে আমরা তখন দেখি শুধু এক অদ্বিতীয় মহেশ্বরের নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য। দুটি দর্শনের মধ্যেই একান্ত-প্রত্যয়ের সূক্ষ্ম সংস্কার প্রচ্ছন্ন থেকে মনের মধ্যে বিপর্যয় আনে। কেননা প্রপঞ্চের উপশমেই হ'ক আর বিসৃষ্টিতেই হ'ক, দেবাত্মশক্তির অনুপলব্ধিতে আমাদের দর্শন—হয় আত্মস্বরূপের নৌতর দিকটা অতিমাত্রায় একান্ত করে তোলে, নয়তো পরমপুরুষের জগৎপ্রশাসনের 'পরে করে মানুষভাবের আরোপ। অথচ আমাদের বিজিজ্ঞাসিতব্য বস্তুর স্বরূপ হল অনন্ত। তাঁর আত্মশক্তির বহুধা পরিস্পন্দের বিচিত্র সামর্থ্য আছে এবং তার প্রত্যেকটি স্পন্দ ঋতময়। তাই দৃষ্টিকে উদার করে ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ দুটি সত্যবিভাবকে যদি এক অখণ্ড তত্ত্বরূপে দর্শন করি, অপুরুষ-বিধতার নির্বর্ণ চিদাকাশে যদি দেখি দেবাত্মশক্তির যুগনদ্ধ বিলাসে পুরুষ-বিধতার জ্যোতির্ময় বর্ণচ্ছটা, তাহলে পরমপুরুষের সম্যক অনুভবে ফুটে ওঠে পুরুষবিধতার দুটি দল—ঈশ্বর ও শক্তির পরম সামরস্য, 'জগতঃ পিতরৌ' শিব-শক্তির যুগল অনুভব। বিশ্ব জুড়ে সৃষ্টির প্রতি পর্বে পুরুষ-প্রকৃতির

মিথুনলীলার নিগূঢ় রহস্য তখন উজ্জ্বল হয়ে স্ফুরিত হয় আমাদের চেতনায়। স্বয়ম্ভূসত্তার অতিচেতন ভূমিতে শিব-শক্তি পরম সামরস্যে ঘনীভূত, অন্যোন্যব্যঞ্জনায় অবিনাভূত ও একাত্মপ্রত্যয়সার। কিন্তু জগতীচ্ছন্দের চিন্ময় বিলসনে দেখি ক্রিয়াশক্তিতে তাঁদের উন্মেষ। চিন্ময়ী জগজ্জননীই মায়া পরা প্রকৃতি বা চিৎশক্তিরূপে হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর ও মহেশ্বরীর আত্মবীর্যকে দৈবতলীলায় সম্ভাবিত করেন। তখন ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবান ক্রিয়াপর হন তাঁকে আশ্রয় করেই—শক্তিকে ছেড়ে শিব তখন অশক্ত শব। শিব-সঙ্কল্প শক্তিতে অনুস্যূত থাকলেও শক্তিই অনুত্তর চিদ্বীর্যরূপে বিশ্বপট প্রসারিত করেন, কেননা ওই মহাপ্রকৃতির গর্ভাশয়েই সর্বজীব ও সর্বভূত ভ্রূণের আকারে নিহিত ছিল। বিশ্বের সত্তা ও প্রবৃত্তি মহাপ্রকৃতির ছন্দ অনুসরণ করে। চিৎশক্তিই পরমপুরুষের সত্তাকে অনন্ত-বিচিত্র স্পন্দনে ও রূপায়ণে বিচ্ছুরিত ক'রে নিজেই এই যা-কিছু সব হয়েছেন। শক্তির লীলা হতে বিবিক্ত হয়ে প্রপঞ্চোপশমের পরম নৈঃশব্দ্যে আমরা তলিয়ে যাই—তাঁরই স্বাভীষ্ট নিমেষে বা ক্রিয়া-নিবৃত্তিতে। আমাদের উপশম ও অভাবপ্রত্যয়ে আছে তাঁরই উপশম ও নৈঃশব্দ্যের আবেশ। আবার যখন প্রকৃতি হতে নিজেকে স্ব-তন্ত্র বলে অনুভব করি, তখন তিনিই আমাদের মধ্যে জাগান মহেশ্বরের অনুত্তম সর্বগত ঐশ্বর্য, আমাদের ভাবে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অনুভাব। কিন্তু সে-ঐশ্বর্য মহাশক্তিরই স্বরূপ, তাঁরই পরমা প্রকৃতিতে অবগাহন করে আমরা তার তদ্‌গত অনুভব পাই। ব্রাহ্মী স্থিতির আরও উচ্চকোটিতে উঠলে পরেও জানব, সে-সিদ্ধির মূলে আছে চিন্ময়ী মহাশক্তির প্রসাদ। তাই বিশ্বজননীর কাছে আত্মসমর্পণ দ্বারাই পুরুষোত্তমে আমাদের আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হতে পারে। কেননা মহেশ্বরের পরমা প্রকৃতির দিকে চলেছে আমাদের উত্তরায়ণের অভিযান —অতএব মহাপ্রকৃতির অতিমানস শক্তিপাতে এই মনোধাতু যদি তাঁর অতিমানস ধাতুতে রূপান্তরিত না হয়, তাহলে আমাদের সাধকজীবনের সকল আকূতি ব্যর্থ হবে।...এমনি করে বুঝতে পারি, শুদ্ধ-সন্মাত্রের তিনটি বিভাবের মধ্যে কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই, অথবা তাদের নিত্যস্থিতি এবং প্রপঞ্চোল্লাসের তিনটি পর্যায়ে কোথাও ছন্দঃপতন ঘটে না। এক অখন্ড পরমার্থ-সৎই ব্রহ্মরূপে বিশ্ববিসৃষ্টির অন্তর্যামী অধিষ্ঠান ও ভর্তা, পুরুষরূপে তার ভোক্তা এবং ঈশ্বররূপে ঈক্ষিতা শাস্তা ও অধ্যক্ষ। আর এই বিসৃষ্টির নিরন্ত লীলায়নের মূলে আছে তাঁরই অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি—মায়া প্রকৃতি ও শক্তিরূপে।

এই মহাত্রিপুটীর অদ্বৈত ভাবনা আমাদের মনের পক্ষে সহজ নয়। কেননা, আমরা সামান্যপ্রত্যয় ও সংজ্ঞাশব্দ দিয়ে এমন-একটা তত্ত্বের বিবৃতি দিতে চাই, যা প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সামান্যধর্মী হলেও অধ্যাত্মচেতনায় ফোটে নিতান্তই

বিশেষধর্মী ও অতিবাস্তব জীবন্ত প্রত্যয়রূপে। আমাদের সামান্য-প্রত্যয়ে ব্যাপকতা থাকলেও অন্যোন্যভেদের গণ্ডিটানা একটা গভীর রেখা আছে—কিন্তু তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ তো তা নয়। তার বহু বিভাব থাকলেও অনোন্যভাবনায় তারা পরস্পরেরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তাই তার সত্যকে যে ভাবে ও ছবিতে রূপ দিতে হয়, তার মধ্যে জড়াতীতের ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে জীবনস্পন্দে। শুদ্ধ-বুদ্ধি সে-ছবিকে প্রতীক ভাবলেও তা প্রতীকের বাড়া—কেননা সে-প্রতীক বস্তুত অধ্যাত্মচেতার জীবন্ত অনভূতির তত্ত্বরূপ, অতএব তার রহস্যার্থ একমাত্র বোধির দর্শনে এবং অনুভবে ধরা পড়ে। বস্তুস্বভাবের নির্গুণ-তত্ত্বকে শুদ্ধ-বুদ্ধির সামান্যপ্রত্যয়ে তর্জমা করা যায় বটে—কিন্তু সত্যের আরেকটা দিক ধরা পড়ে কেবল ভাবক ও অধ্যাত্মচেতার দৃষ্টিতে। সে-অন্তর্দৃষ্টির অভাবে তত্ত্বের সামান্য-রূপ বিশেষের ব্যঞ্জনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে না, তাই তার পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয় না। বস্তুর স্বরূপের পরিচয় মেলে তার রহস্যরূপে। বুদ্ধি দিয়ে তার যে-ছবি আমরা আঁকি, সে শুধু আচ্ছিন্ন প্রতীকের ভাষায় সত্যের কল্পরূপ। অথবা যেন কিউবিস্ট শিল্পীর কল্পিত জ্যামিতিক রেখায় আঁকা বাক্-মধ্যমার ছবি। দার্শনিকের বিচারসভায় বুদ্ধির তর্জমার কদর হতে পারে—কিন্তু মনে রাখা উচিত, এতে আমরা সত্যের একটা আচ্ছিন্ন প্রতিরূপ পাই শুধু। তাকে পুরাপুরি বুঝতে কি প্রকাশ করতে হলে চাই অপরোক্ষ-অনুভবের বাস্তব প্রত্যয় এবং তার বাহনরূপে বাণীর বীণায় পূর্ণপ্রাণের সুরের আলাপ।

এইবার দেখা যাক, অখণ্ড তত্ত্বপরিচয়ের দিক দিয়ে এক আর বহুর সম্বন্ধ আমাদের চেতনায় কোন্ রূপ ধরে ফুটবে। এহতে ঈশ্বর আর জীবের সম্বন্ধও আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। লোকাতত ঈশ্বরবাদে কুম্ভকারের গড়া ঘটের মত বহুজীব ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সৃষ্টজীব স্রষ্টার আশ্রিত। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বের সম্যক্ দর্শনে, বহুও বস্তুত অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ –এই তাদের অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব। বহু বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক স্বয়ম্ভূসত্তার ব্যষ্টি-বিভাব। তারা নিত্য হলেও, তাদের নিত্যতা তাঁরই সত্তার আশ্রয়ে। আমাদের অন্নময় সত্তা প্রকৃতির বিসৃষ্টি, কিন্তু জীবচৈতন্য ঈশ্বরের 'অংশঃ সনাতনঃ'। প্রাকৃত জীবের পিছনে ব্রহ্মচৈতন্যই আছেন অধিষ্ঠানরূপে। তবু অন্বয়তত্ত্বই সত্তার স্বরূপসত্য এবং একের 'পরেই বহুর সত্তার নির্ভর। অতএব জীবের বিভাবনা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আশ্রিত। এই আশ্রিতভাব অবিদ্যাচ্ছন্ন অহংএর বিবিক্ত বুদ্ধিতে ঢাকা পড়ে যায়। যে-বিশ্বশক্তি অহংএর স্রষ্টা এবং প্রেরক, যার সত্তা ও কৃতির বিভূতিরূপে তার স্ফুরণ, প্রতিপদে তার অনুগ্রহে চালিত হয়েও মোহের বশে সে খোঁজে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু অহন্তার এই প্রয়াস স্পষ্টই একটা ব্যামোহ—আমাদের অন্তর্গূঢ় স্বয়ম্ভূ মহিমার একটা

বিকৃত ছায়া। অহন্তায় নয়, কিন্তু আমাদের গুহাহিত আত্মস্বরূপে এমন একটা-কিছু নিশ্চয় আছে যা বিশ্বপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে তুরীয়-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রকৃতি হতে তারও স্বাতন্ত্র্যের ভাব জাগে লোকোত্তর পরমার্থসত্তের প্রতি প্রপত্তি হতেই। দিব্য-পুরুষের কাছে জীবচেতনা ও জীবপ্রকৃতির আত্মসমর্পণেই আমাদের মধ্যে আত্মভাব এবং তত্ত্বভাবের পরম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কেননা দিব্য-পুরুষই সেই পরম-আত্মা এবং পরম তত্ত্ব আমরা তাঁরই স্বয়ম্ভাবে ও নিত্যতায় স্বয়ম্ভূ এবং নিত্য। এই প্রপত্তি তাদাত্ম্যভাবের বিরোধীও নয়, বরং একে বলি তাদাত্ম্যসমাপত্তির দ্বার। সুতরাং এখানেও আবার দেখছি বিশ্বপ্রকৃতির নর্মচর শাশ্বত সেই রহস্য : দ্বৈতের প্রতিভাসে অদ্বৈতের নিগূঢ় অভিব্যঞ্জনা এবং অদ্বৈত হতে প্রবৃত্ত দ্বৈতের আবার অদ্বৈতেই অবসান। অনন্তচেতনার এই সত্যেই এক আর বহুর মাঝে সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচিত্র লীলায়ন সম্ভব হয়। আবার তার মধ্যে, 'হৃদা মনসা মনীষা' অদ্বৈতের অবিলুপ্ত অনুভব, এমন কি তনুর অণুতে-অণুতে তার বিন্মুয় সত্তার দীপালি -এই তো স্বরূপোপলব্ধির সমুচ্চ শিখর! অথচ সে অদ্বৈতানুভূতিতে দ্বৈতসম্বন্ধের সত্য নিরাকৃত হয় না। বরং তার স্পর্শে সম্বন্ধ-তত্ত্বের সকল লীলা হয়ে ওঠে ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে ও রসোদ্‌গারে আত্যন্ত-সমুজ্জ্বল। এ যেমন অনন্তের ইন্দ্রজাল, তেমনি তার অলৌকিক ন্যায়প্রবৃত্তিও বটে।

আরেকটা সমস্যার সমাধান তবুও বাকী। সে হল ব্যক্ত আর অব্যক্তের বিরোধের সমস্যা। কিন্তু তারও সমাধান খুঁজতে হবে এই পথেই। আপত্তি হতে পারে : এপর্যন্ত যা-কিছু বলেছি, ব্যক্তবিশ্বের সম্পর্কে তা সত্য হলেও ব্যক্তভাব তো অব্যক্ত তত্ত্ব হতে ছল্‌কে-পড়া একটা অবর-সত্য মাত্র। তাই অনুত্তরের অব্যক্ত গহনে অবগাহন করলে বিশ্বসত্যের কোনও প্রামাণ্য তো সেখানে টিকবে না। অসম্ভূতি কালকলনাহীন অপরিণামী নিত্যস্থিতি - নিরতিশয় স্বয়ম্ভূসত্তার নির্বিকল্প তথতামাত্র। অতএব সম্ভূতির সত্যে কি তার উপাধি-বৈচিত্র্যে অব্যক্ত-তত্ত্বের কোনও পরিচয় মেলে না। আর যদিও মেলে তার অপর্যাপ্ততাই সে-পরিচয়কে করে তোলে অলীক একটা বঞ্চনা। ...তখন প্রশ্ন ওঠে : কালাতীত চিৎ-সত্তার সঙ্গে কালের কি সম্পর্ক? আমরা মেনে নিয়েছি, কালাতীত শাশ্বতে যা অব্যক্ত, শাশ্বত কালকলনায় তা-ই হয় ব্যক্ত। তা-ই যদি হয় অর্থাৎ কালকলনা যদি হয় শাশ্বত সদ্ভাবের বিভূতি, তাহলে অভিব্যক্তির নিমিত্ত যত বিচিত্র কি তার ভঙ্গিমা যত খণ্ডিতই হ'ক, কালকলনার যা মর্মসত্য তুরীয়ের মধ্যেই তার প্রাক্‌সত্তা ছিল—সেই কালাতীত তত্ত্ব হতেই তার উৎসারণ ঘটেছে। তা না হলে বলতে হয়, সম্ভূতির সত্য এসেছে কাল অথবা কালাতীতেরও বাইরে এক অনুপাখ্য তথত হতে। কালাতীত

চিৎসত্তা বলতে তখন বুঝব নেতিবাচক একটা পরমপ্রত্যয় যার স্বরূপ অনির্বাচ্য এবং যাকে আশ্রয় করে ফুটছে কালকলনার উপাধি হতে ওৎত্যের স্বাতন্ত্র্য মাত্র। কালপ্রত্যয়ের ব্যতিরেকমুখে তার ভাবনা—যেমন সগুণের ব্যতিরেকমুখে পাই নির্গুণের ইঙ্গিত। কিন্তু বস্তবিক কালাতীত প্রত্যয় বলতে আমরা বুঝি ত্রিকালের অন্যোন্যসাপেক্ষ ক্রমের অনুভব হতে নির্মুক্ত একটা স্বচ্ছন্দ চৈতন্যসত্তা মাত্র। কিন্তু এই চিৎসত্তা যে শূন্যরূপ, এ-কল্পনা আমরা কোথায় পেলাম? বরং বলতে পারি, এই কালাতীত সত্তাই নিখিল কালিক অভিব্যক্তির স্পন্দহীন নীরূপ অব্যবহার্য আধার, ভুবনের বীজঘন অদ্বৈতস্বভাবের শাশ্বত প্রত্যয়। কাল আর কালাতীত চিৎসত্তা 'শাশ্বত' সংজ্ঞা দুয়ের বেলাতেই খাটে। কালাতীতে যা অব্যক্ত গূঢ় এবং বীজভূত, কালে তা-ই অভিব্যক্ত হয় স্পন্দনে—অন্তত অন্যোন্যসম্বন্ধে ও পরিকল্পনায়, পরিবেশ ও পরিণামের বৈচিত্র্যে। অতএব কালও যেমন নিত্য, তেমনি কালাতীতও নিত্য—এক শাশ্বত সম্ভাবের দ্বিদল তারা। তাদের আশ্রয় করে ফুটছে সত্তা ও চৈতন্যের যুগনদ্ধ বিভূতি—একদিকে অচলপ্রতিষ্ঠার শাশ্বত প্রত্যয়, আরেকদিকে স্থিতির বুকে গতির নিত্য নৃত্যচ্ছন্দ।

দেশ-কালের অতীত পরমার্থ-সৎকে বলি নিত্যস্থিতির তত্ত্ব বা পূর্ব্য অধিষ্ঠান। অন্তরে যা ছিল বাইরে তাকে ফুটিয়ে তোলবার আধার রূপে ওই তত্ত্বের যে-আত্মপ্রসারণ, তাতে দেখা দেয় দেশ আর কাল। অন্যান্য দ্বন্দ্বের মত এ দুটিও বিভাবের দ্বন্দ্ব। একদিকে চিৎস্বরূপ স্বনিষ্ঠ সদাখ্য-তত্ত্বের ভাবনায় অন্তরাবৃত্ত, আত্মসমাহিত। আরেকদিকে তাঁর আত্মবিমর্শ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে তত্ত্বস্বরূপের বিচিত্র লীলায়নে। অদ্বয়তত্ত্বের এই আত্মপ্রসারণকে আমরা বলি দেশ আর কাল। সাধারণত দেশকে আমরা দেখি স্থাণু প্রসাররূপে, যার মধ্যে সব-কিছু নির্দিষ্ট একটা ছক মেনে চলছে কি দাঁড়িয়ে আছে। আবার কালকে দেখি জঙ্গম প্রসাররূপে, স্পন্দ আর ঘটনার পরম্পরা দিয়ে তার পরিমাণ করি। অতএব দেশ ব্রহ্মের আত্মপ্রসারণের স্থাণুভাব আর কাল তার জঙ্গমভাব।...কিন্তু একথা মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে শুধু। তাই এতে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। বস্তুত দেশও একটা ধ্রুব জঙ্গমতত্ত্ব, তার মধ্যে বস্তুর কালিক-সম্বন্ধের অভ্যস্ত নিয়তভাব সৃষ্টি করে কালস্পন্দের স্থাণুত্বের একটা বিকল্প। আবার তার জঙ্গমতা স্থাণু দেশের ভূমিকায় সৃষ্টি করে কালস্পন্দের বিকল্প। অথবা রূপ ও বস্তুর বিন্যাসের আধাররূপে দেশ ব্রহ্মেরই আত্মপ্রসারণ। আবার কাল সেই রূপ ও বস্তুর বাহক তাঁর আত্মবীর্যের বিস্ফুরণের জন্য ব্রহ্মের আরেক ভঙ্গিতে আত্মপ্রসারণ। অতএব দেশ আর কাল বিশ্বরূপ শাশ্বত-সন্মাত্রের আত্মপ্রসারের একটা যুগল ভঙ্গিমা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

বিশুদ্ধ ভৌতিক দেশকে জড়ের ধর্ম বলা চলে। কিন্তু জড় আবার

শক্তিস্পন্দের বিসৃষ্টি। অতএব জড়জগতের দেশকে বলতে পারি জড়শক্তির পূর্ব্য আত্মপ্রসারণ, অথবা তার আত্মসত্তার স্বকল্পিত অবকাশভূমি, তার প্রবৃত্তির আধাররূপী অচিৎ আনন্ত্যের একটা প্রতিরূপ—যার বুকে সম্ভব হচ্ছে জড়শক্তির বিক্ষেপ ও বিসৃষ্টির ছন্দ ও স্পন্দ। কাল সেই শক্তিস্পন্দের প্রবাহ, অথবা আমাদের চেতনায় প্রবহমানতার সংস্কার মাত্র—যার মধ্যে দেখছি ক্ষণপরম্পরার একটা নিয়মিত প্রতিভাস। অবিচ্ছেদ স্পন্দের নিরবচ্ছিন্ন আধার হয়েও সে পারম্পর্যের পর্বচ্ছেদ করে চলেছে, কেননা স্পন্দবৃত্তির মধ্যেই যে রয়েছে পারম্পর্যের একটা নিয়ত ধারা। অথবা শক্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণকল্পে কাল দেশেরই একটা আয়তন। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্-বৃত্ত চেতনা কালকেও প্রত্যক্-দৃষ্টিতে দেখে মন দিয়ে—ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়। তাই তাকে দেশের আয়তন বলে জানা তার পক্ষে সহজ হয় না—কেননা দেশকে আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়কল্পিত পরাক্-বৃত্ত প্রসাররূপেই ভাবতে অভ্যস্ত।

যা-ই হ'ক, চিৎই যদি পরমার্থসৎ হয়, তাহলে দেশ আর কালকে বলা চলে চিতের চৈতস উপাধি—যাদের অবলম্বন করে চিৎস্বরূপ দেখছেন আত্মশক্তির স্পন্দলীলা। অথবা হয়তো চিৎসত্তার তারা আত্মবিভূতি—চেতনার ভূমিভেদে যাদের অনুরূপ রূপান্তর ঘটছে। অর্থাৎ চেতনার এক-এক ভূমিতে আছে দেশ-কালের এক-একটা বিশিষ্ট প্রকার, এমন-কি একই ভূমিতে তাদের প্রকারভেদও দেখা দিতে পারে। তবু মূলত তারা এক মৌল অখন্ড-চিন্ময় দেশকাল-তত্ত্বের বিভাব। তাই ভৌতিক দেশকে ছাড়িয়ে গেলে, আমাদের অনুভবে নিখিল স্পন্দের আধাররূপী যে ব্যাপ্তির প্রত্যয় জাগে, তাকে কিছুতেই জড়ধর্মী বলা চলে না। বরং তাকে বলতে পারি, ব্রহ্মের আত্মশক্তি-বিচ্ছুরণের চিদাধার। জড়দর্শন হতে অন্তরাবৃত্ত হলে দেশের এই তত্ত্বের স্বরূপ বুঝতে পারি। কেননা, আমাদের অন্তশ্চেতনায় তখন এক চিদম্বরের বিপুল প্রসার ফুটে ওঠে—যা মনেরও আধার ও সঞ্চরণক্ষেত্র। ভৌতিক দেশকাল হতে তার তত্ত্ব পৃথক হলেও দুয়ের মাঝে একটা ওতপ্রোত ভাব আছে। কারণ মন তার আপন দেশে বিচরণ করেও জড়ের দেশে চলাফেরা করতে পারে, কিংবা বহির্দেশস্থ ব্যবহিত বস্তুর 'পরেও আপন প্রভাব ফেলতে পারে। চেতনার আরও গভীরে ডুবলে পাই বিশুদ্ধ চিন্ময় দেশের অনুভব। সে-অনুভবে স্পন্দের নিরোধে কালের তরঙ্গ স্তম্ভিত হয়ে যায়। অথবা স্পন্দ কিংবা ঘটনা থাকলেও গ্রাহ্য কোনও কালকলনার অনুশাসন সে মেনে চলে না।

এমনি করে অন্তরাবৃত্ত হয়ে যদি ব্যাবহারিক কালপ্রত্যয়ের নেপথ্যে চলে যাই, জড়ের সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে যদি বিবিক্ত হয়ে তার লীলা দেখে যাই—তাহলে বুঝতে পারি কালের প্রত্যয় ও স্পন্দ দুইই আপেক্ষিক, কিন্তু কাল স্বয়ং একটা শাশ্বত ও বাস্তব তত্ত্ব। কালের প্রত্যয় শুধু অভ্যস্ত

কালমানের 'পরে নয়, প্রমাতার চেতনা ও অবস্থানের 'পরেও নির্ভর করছে। তাছাড়া চেতনার এক-এক ভূমিতে কালের এক-এক প্রকার। মানস চেতনায় এবং মনের দেশে কালস্পন্দের যে অর্থ এবং মান, ভৌতিক দেশে তা অচল। মনের মধ্যেও চেতনার ভূমি অনুযায়ী কালস্পন্দের তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক ভূমির স্বতন্ত্র কালমান থাকলেও পরস্পর কালিক সম্পর্কের কোনও বাধা হয় না। জড়ভূমির একটু গভীরে তলিয়ে গেলেই দেখি, একই চেতনায় একাধিক বিভিন্ন কালস্থিতি এবং কালস্পন্দ রয়েছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বপ্নের কালে। তখন জাগ্রৎ-কালের কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই বিচিত্র ঘটনাবলীর দীর্ঘ একটা পরম্পরা ঘটতে পারে। অতএব ভিন্ন-ভিন্ন কালস্থিতির মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকলেও কালস্থিতির অনুরূপ কোনও কালমানের সন্ধান কিন্তু আমরা পাই না। তাইতে মনে হয়, চৈতস সত্তা ছাড়া কালের কোনও বাস্তব সত্তা বুঝি নাই। সত্তার স্থিতি ও স্পন্দ অনুযায়ী চেতনার প্রবৃত্তিতে যে-পরিবেশ গড়ে ওঠে, কাল তারই অনুবর্তন করে। অতএব কাল প্রত্যক্-বৃত্ত চেতনার একটা বৃত্তি মাত্র। আবার মানস-দেশ ও জড়-দেশের সঙ্গে ওতপ্রোত করে দেখলে মনে হয়, দেশও একটা মনোবিকল্প মাত্র। অর্থাৎ চিন্ময় ব্যাপ্তিধর্ম দুয়েরই মূল তত্ত্ব—কিন্তু বিশুদ্ধ মনোধাতু সে-ব্যাপ্তিকে রূপান্তরিত করে প্রত্যক্-বৃত্ত মনোময় আয়তনে, আর ইন্দ্রিয়-মানস তাকে দেয় ইন্দ্রিয়বোধের পরাক্-বৃত্ত আয়তনের রূপ। প্রত্যক্-বৃত্তি আর পরাক্-বৃত্তি একই চেতনার দুপিঠ মাত্র। আসল কথা এই : যে-কোনও দেশ বা কাল, অথবা যুগনদ্ধ দেশ-কাল মোটের উপর সন্মাত্রেরই একটা ভঙ্গিমা, যার মধ্যে সত্তার সংবেগের সঙ্গে মিলেছে চেতনার একটা স্পন্দ এবং সেই স্পন্দ ফুটিয়ে তুলছে ঘটনাবৈচিত্র্যের ফুল। চেতনা সেখানে ঘটনার সাক্ষী, আর সংবেগ তার রূপকার। দুয়ের অবিনাভাব-সম্বন্ধ সন্মাত্রেরই ওই ভঙ্গিমার মধ্যে নিরূঢ়। কাল-বোধের নিয়ামক সে-ই। সে-ই আমাদের মধ্যে জাগায় কাল-সম্বন্ধ কাল-স্পন্দ ও কাল-মানের সংবিৎ। বস্তুত কালিক বৈচিত্র্যের পিছনে কালের যে পূর্ব্য স্থিতি আছে, নিত্যের নিতত্বই তার স্বরূপ—যেমন নাকি অনন্তের অনন্তত্বই দেশের স্বরূপ-সত্য।

নিত্যত্বের দিক থেকে ব্রাহ্মী চেতনার তিনটি ভূমি থাকতে পারে। প্রথম ভূমিতে আছে ব্রহ্মের অচল-প্রতিষ্ঠা—যেখানে স্বরূপসত্তায় হয় তিনি আত্ম-সমাহিত, নয়তো আত্মসচেতন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্পন্দনে অথবা ভবনে চেতনার কোনও পরিণাম নাই। একেই আমরা বলব ব্রহ্মের কালাতীত নিত্যতা। দ্বিতীয় ভূমিতে এক অখণ্ডচেতনায় ভাসছে ভাবের বিচিত্র সম্বন্ধের নিয়ত পরম্পরা। ভব্য অথবা ভূত বিসৃষ্টির তারা অঙ্গীভূত—দাঁড়িয়ে আছে তথাকথিত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অখণ্ডসমাহারের পটভূমিতে।

ব্যাপ্তিচেতনায় যেন একটা মানচিত্র বা বাঁধা ছক প্রসারিত রয়েছে। শিল্পী চিত্রকর বা স্থপতি যেন মনশ্চক্ষে এক নজরে দেখে নিচ্ছে তার সংকল্পিত সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা। একে বলব কালের ধ্রুবা স্থিতি বা সর্বসমাহারী যৌগপদ্য। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে আবহমান বর্তমানের অনুভবে এই অখণ্ড কালদৃষ্টির কোনও পরিচয় নাই—যদিও অতীতের স্মৃতিতে তার খানিকটা আভাস মেলে, কেননা জ্ঞাত বিষয়ের সমাহারে সমগ্রতার একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা সেখানে অসম্ভব নয়। কিন্তু অখণ্ড কালদৃষ্টিও যে অবাস্তব নয় তার প্রমাণ পাই, যখন ঊর্ধ্বচেতনার বিশেষ-কোনও ভূমিতে আরূঢ় হয়ে দেখি তার সর্বান্তর্ভাবী উদার পরিমণ্ডল। তৃতীয় ভূমিতে চলছে চিৎশক্তির একটা ক্রমায়মাণ ছন্দোদোলা—নিত্যস্থিতির ধ্রুবদর্শনে যা সিদ্ধকল্পনার আকারে ফুটেছিল, পরিণামের পরম্পরায় তাকে এবার ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু এক অখণ্ডনিত্যতার মধ্যেই চলছে কালের এই ত্রিভঙ্গিম স্থিতি ও গতির লীলা। প্রবাহ-নিত্যতা আর নিঃস্পন্দ-নিত্যতা বাস্তবিক পৃথক দুটি নিত্যতা নয়—একই নিত্যতার সম্পর্কে তারা চৈতন্যের ভিন্ন ভূমিকায় স্থিতি মাত্র। সমগ্র কাল-পরিণামকে চৈতন্য স্পন্দলীলার বাইরে বা ঊর্ধ্বে থেকে দেখতে পারে। অথবা স্পন্দের মধ্যেই একটা ধ্রুববিন্দুতে অধিষ্ঠিত থেকে দেখতে পারে তার পূর্বাপর প্রবৃত্তি—সিদ্ধ সংকল্পনার নিয়তিকৃত অনুবর্তনে। কিংবা চৈতন্যের প্রবাহ স্পন্দপ্রবাহের সঙ্গে বয়ে যেতে পারে ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরের বীচিভঙ্গে—পিছন ফিরে যেমন দেখতে পারে অতীতে যা-কিছু ঘটেছে, তেমনি প্রমুখীন দৃষ্টিতে নিতে পারে অনাগত ভবিষ্যের পরিচয়। আর সর্বশেষ কল্পে বর্তমান ক্ষণের মধ্যেই অভিনিবিষ্ট হয়ে সেই একটি ক্ষণের সংকীর্ণ পরিসরের বাইরে রচতে পারে দৃষ্টির অবরোধ। অনন্তস্বরূপের মধ্যে এই সমস্ত ভূমিরই যুগপৎ সমাহার কিছুই অসম্ভব নয়। কালের ঊর্ধ্বে থেকে বা অন্তরে থেকে তিনি তার সাক্ষী হতে পারেন—তার মধ্যে না থেকে তাকে ছাড়িয়ে যেতেও পারেন। তাঁর সামনে ভাসছে কালাতীতের অপ্রচ্যুত মহিমা হতে কালস্পন্দের উদয়ন—তার সবটুকু কাঁপন তাঁর অবিচল অথচ নিত্যচঞ্চল ঈক্ষণের উদার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ছে, ক্ষণভঙ্গের চকিত স্ফুরণেও জ্বলে উঠছে তাঁর শাশ্বত দৃষ্টির বৈদ্যুতী। সান্ত চেতনা তার পায়ে পরেছে ক্ষণিক-প্রত্যয়ের শিকল। আনন্ত্যের এই স্বাতন্ত্র্য এবং যৌগপদ্য তাই তার কাছে মনে হবে ইন্দ্রজাল বা মায়ার খেলা। তার দেখার নিজস্ব ভঙ্গিতে গণ্ডি টানার প্রয়োজন আছে। একবারে একটি-একটি করে না দেখলে কোনমতেই সে সৌষম্যের ছন্দ খুঁজে পায় না। তাই আনন্ত্যের এই যৌগপদ্য তার কাছে একটা খাপছাড়া অবাস্তবতার গণ্ডগোল ঠেকবে। কিন্তু অনন্ত-চেতনায় সম্যক দর্শন ও অনুভবের এই অখণ্ডসমাহার নিতান্ত

যুক্তিসঙ্গত ও সুসমঞ্জস। বহুভঙ্গিম ঈক্ষণের সমাহারে সেখানে গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণ-চিন্ময় দর্শন। তার প্রত্যেকটি বিভাবের অন্যোন্যসঙ্গমে ফুটেছে ঋতসুষমার একটি সহস্রদল, দৃষ্টির বহুমুখীনতা দৃশ্যের একত্বকেই সেখানে রূপায়িত করছে—এক পরমার্থ-সতের সহচরিত বিভাবসমূহকে অন্তহীন বৈচিত্র্যের লীলায় ছড়িয়ে দিয়েছে রূপে-রূপে।

একই অন্বয়তত্ত্বের আত্মবিভাবনার এই যুগপৎ-বৈচিত্র্য যদি অযৌক্তিক না হয়, তাহলে কালকলনাহীন শাশ্বত সদ্‌ভাব আর শাশ্বত কালকলনা-- এ-দুয়ের সহচারও অসম্ভব নয়। অখণ্ড আত্মসংবিতের দুটি দল দিয়ে ব্রহ্ম দেখছেন একই নিত্যতার দুটি ভঙ্গি, সুতরাং তাদের মধ্যে বিরোধ অকল্পনীয়। শাশ্বত অনন্ত পরমার্থসতের আত্মসংবিতের দুটি বিভূতিতে রয়েছে অন্যোন্যাপেক্ষার সম্বন্ধ—অন্যোন্যব্যাবৃত্তির নয়। তার একদিকে আছে অব্যক্তস্থিতি ও অসম্ভূতির শক্তি, আরেকদিকে আছে স্বতঃসম্ভবী কৃতি স্পন্দ ও সম্ভূতির শক্তি। আমাদের বহিশ্চর সংকীর্ণ দর্শন স্বভাবত এ-দুয়ের মাঝে দেখবে একটা দুর্বোধ ও দুরপনেয় বিরোধ। কিন্তু ব্রহ্মের মায়াদৃষ্টিতে অর্থাৎ তাঁর শাশ্বত আত্ম-সংবিৎ ও সর্ব-সংবিতের দৃষ্টিতে এই যৌগপদ্য যেমন স্বরসবাহী, তেমনি স্বাভাবিক। ঈশ্বরের অনন্ত প্রজ্ঞা- ও জ্ঞানা-শক্তিতে, স্বয়ম্ভূ সচ্চিদানন্দের নিরূঢ় চিৎশক্তিতে উদ্ভাসিত যে-দর্শন, এই অবিরোধ-প্রত্যয় তারই অনতিবর্তনীয় বিলাস।

তৃতীয় অধ্যায়

নিত্য ও জীব

সোঽহমস্মি।

ঈশোপনিষৎ ১৬

আমি হচ্ছি সে-ই।

ঈশা উপনিষদ ১৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
...পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

গীতা ১৫।৭,১০

আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে হয়েছে জীবভূত।...জ্ঞান-চক্ষুই দেখে ঈশ্বরের দেহে-অবস্থান ভোগ ও উৎক্রমণ।

—গীতা (১৫।৭,১০)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি॥
যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগম্ অনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০,২১

দুটি পাখি, সুন্দর তাদের পাখা, একসাথে যুক্ত সখা তারা, একই বৃক্ষকে আছে জড়িয়ে। তাদের একজন খায় স্বাদু পিপ্পল, আরেকজন না খেয়ে চেয়ে থাকে তার পানে।...যেখানে সুপর্ণ আত্মারা অমৃতের ভাগ পেয়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে ঘোষণা করে বিদ্যার কথা, সেইখানে জগৎপাতা বিশ্বেশ্বর বিজ্ঞানী হয়েও আবিষ্ট হলেন অজ্ঞানী আমার মধ্যে।

—ঋগ্বেদ (১।১৬৪।২০,২১)

এক সর্বব্যাপী পরমার্থ-সৎ তাহলে নিখিলের সারসত্য। বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ এবং প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবের 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' তিনি। এই সর্বগত ব্রাহ্মী স্থিতির এক স্পন্দবীর্য আছে—যা তার অন্তহীন চিতি-শক্তির আত্মবিভাবনী বিসৃষ্টির এক অফুরন্ত উল্লাস। আত্মবিভাবনার একটি পর্বে সে জড়ত্বের আপাত-অচিতিতে নেমে আসে। আবার সেই অচিতির গহন হতে জীবরূপে জেগে উঠে ব্রহ্মের অতিমানস চিদ্বীর্যের লোকোত্তর ভূমির দিকে তার অভিযান চলে। সেই পরমপদে জীব খুঁজে পায় তার জীবনের গঙ্গোত্রী, তার বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপের দিব্যমহিমা। এই

তত্ত্বকে আধার করে বুঝতে হবে, আমাদের পার্থিব জীবনে নিহিত রয়েছে যে-সত্যের প্রবেগ, এই জড় প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে-দিব্যজীবনের আকৃতি। আমাদের জানতে হবে : জড়ের অন্ধতামিস্র হতে আবির্ভূত হয়ে জড়বিগ্রহের আশ্রয়ে যে-অবিদ্যাকে ফুটতে দেখছি, কোথায় তার উৎস, কি তার স্বরূপ। যে-বিদ্যায় তার পর্যবসান ঘটবে, তারই-বা ধরন কি; কি করে বিশ্বপ্রকৃতি একে-একে দল মেলছে, কি করে জীবচেতনা আপন স্বরূপ ফিরে পাচ্ছে। বস্তুত বিদ্যা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অবিদ্যার মধ্যে। নতুন করে তাকে অর্জন করতে হবে না, শুধু তার মুখের গুণ্ঠন খুলতে হবে। ভিতর থেকে উপরপানে আপনাকে সে পর্বে-পর্বে ফুটিয়ে তোলে। সাধনা দিয়ে তাকে পাবার চেয়ে সত্য তার এই সহজ আনন্দে ঊর্ধ্বে ও গহনে ফুটে ওঠা।...তাহলেও আমাদের মনে একটা খটকা থেকে যায়। যদি-বা মানি—আমাদেরই মধ্যে দেবতা আধারের সব ছেয়ে আছেন, আমাদের এই জীব-চেতনা বিশ্ব-পরিণামের প্রগতিচ্ছন্দের বাহন, তবু কি করে বলি, জীব একটা শাবত তত্ত্ব, অথবা আত্মজ্ঞান দ্বারা জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্যসিদ্ধিতে জীব যখন মুক্তিভাগী হল, তখনও তার ব্যষ্টিভাবের অনুবৃত্তি অব্যাহত রইল ! এ-সংশয় যখন জাগবেই, তখন তার একটা মীমাংসা গোড়াতেই করে ফেলা উচিত নয় কি ?

সংশয়টা তর্কবুদ্ধির। অতএব তার নিরসন ভাবোদ্দীপ্ত উদার অনুকূল-তর্কেই সম্ভব। আর এ-সংশয়ের পিছনে অধ্যাত্ম অনুভবের সমর্থন থাকলেও, সে-অনুভবের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সংশয়ের সমাধান খুঁজতে হবে। নৈয়ায়িকের জল্প-বিতণ্ডার হানাহানি দিয়েও সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলতে পারে। কিন্তু সে-চেষ্টা প্রাণহীন কৃত্রিমতায় দুষ্ট, তাতে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যতখানি, ততখানি প্রামাণ্যের দীপ্তি থাকে না। যুক্তিতর্কের একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, সেকথা অনস্বীকার্য। যুক্তির শাণে মনের ভাব আর তার বাহন ভাষা দুইই শাণিত দীপ্ত এবং সূক্ষ্ম হয়। তার ফলে, ব্যাবহারিক ভূয়োদর্শন দিয়েই হ'ক, অথবা দেহ-মন-চেতনার সূক্ষ্মবৃত্তি দিয়েই হ'ক, যেসব সত্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই, প্রাকৃত বুদ্ধির স্বাভাবিক আবিলতা হতে তাদের স্বচ্ছ ও নির্মুক্ত রাখতে পারি। সত্যের সঙ্গে সত্যের ধীর যোগযুক্তিতেই আমরা বিজ্ঞানের একটি পরিপূর্ণ রূপ গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু মূঢ় বুদ্ধি সে-জায়গায় আনাড়িপনার চূড়ান্ত করে সব-কিছুতে তালগোল পাকিয়ে, ছায়াকে রায় দিয়ে বসে কায়া বলে, অর্ধসত্যকে চট করে মেনে নিয়ে বেঘোরে পা বাড়ায়, কাঁচা সিদ্ধান্তের তিলকে ফাঁপিয়ে তাল করে, তর্কের জিদে কি ভাবের ঘোরে সত্যের মামলায় একতরফা ডিক্রি দিয়ে ফেলে! প্রাকৃত বুদ্ধির এই ফের হতে আমাদের বাঁচতে হবে। মনকে রাখতে হবে স্বচ্ছ নির্মল সাবলীল ও সূক্ষ্মদর্শী—যাতে সাধারণ মানুষের মত দৃষ্টির অনুদারতায় পদে-

পদে সত্যকেই মিথ্যার যোগানদার করে না তুলি। ন্যায়ের বাদ- ও জল্প-বিচারে যে অনাবিল তর্ক-বুদ্ধির চরম পরিচয়, তার অনুশীলনে মনের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং শাণিত হয়। অতএব বিজ্ঞান-সাধনায় তার উপযোগিতা যে অনুপেক্ষণীয়, একথা মানি। কিন্তু শুধু তর্ক দিয়ে জগৎ-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞান কোনটারই চরমে পোঁছনো যায় না—পরাবর সত্যের মাঝে সমন্বয় ঘটানো তো দূরের কথা। তর্কের প্রধান উপযোগিতা ভ্রান্তির নিরসনে—সত্যের আবিষ্কারে নয়। তবে কিনা অর্জিত বিজ্ঞান হতে অবরোহক্রমে নূতন সত্যের সন্ধান দিতে সে পারে, যাকে তখন প্রমাণ করবার ভার পড়ে অনুভব অথবা ঊর্ধ্বভূমির সত্যদর্শী বৃত্তির 'পরে। একবিজ্ঞান বা সম্যক্-দর্শনের সুসূক্ষ্ম ভূমিতে মনের তর্কপ্রবৃত্তি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যহেতু অনেকসময় বাধারই সৃষ্টি করে—কেননা তর্কপ্রবৃত্তির কারবার ভেদ নিয়ে, চুলচেরা বিচার করা তার অভ্যাস। তাই যেখানে ভেদকে পরাভূত করে অভেদ-প্রত্যয় ছাপিয়ে উঠতে চায়, সেখানে তার ধাঁধা লাগে। বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবের জগতে উত্তীর্ণ হয়েও সাধককে প্রাক্তন সংস্কারবশে এইধরনের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এবার আমাদের খুঁটিয়ে দেখা কর্তব্য—কোথা হতে বাধার সৃষ্টি হয়, কি করেই-বা তাদের এড়ানো যায়। তার চাইতে বড় প্রশ্ন, একত্ববিজ্ঞানের স্বরূপ কি? সর্বাত্মভাবে এবং শাশ্বত অদ্বৈতস্থিতিতে জীবের পরমপুরুষার্থ যখন সিদ্ধ হল, তখন তার স্বরূপের পরিচয় কি হবে?

প্রাকৃত বুদ্ধি জীবাত্মাকে অহংএর সঙ্গে জড়িয়ে দেখতে অভ্যস্ত বলে অহন্তার সঙ্কোচ ও ব্যবর্তক-ধর্মকে সে আত্মভাবের একমাত্র আশ্রয় মনে করে। তা-ই যদি হত, তাহলে অহংএর প্রলয়ে জীবেরও আত্মবিলোপ ঘটত। আমাদের নিয়তি হত জড় প্রাণ মন চেতনা বা কোনও অব্যাকৃত-তত্ত্বের অকূল পাথারে তলিয়ে যাওয়া—যে অব্যাকৃত সমুদ্র হতে ব্যষ্টিভাবের ব্যাকৃতি, তার মধ্যে নুনের পুতুলের মত গলে যাওয়া। কিন্তু আমরা যাকে অহং বলি, সেই একান্তবিবিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের সত্য স্বরূপ কি? স্পষ্টই দেখছি, তার কোনও তাত্ত্বিক স্বভাব নাই; আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট একটা খাতে প্রবাহিত করবার জন্য ব্যাবহারিক প্রয়োজনেই চেতনার সে একটা বিসৃষ্টি। এমনি করে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে মনোময় প্রাণময় ও স্থূল অনুভবের সংকীর্ণ ও বিবিক্ত একটা কোশ। আমরা তাকেই নিজের স্বরূপ বলে জানি, প্রকৃতির নিত্যপরিণামের মধ্যে ব্যষ্টিভাবের এই ঘনবিগ্রহকেই বলি 'আমি'। তারপর কল্পনা করি: একটা-কিছু আমাদের মধ্যে আছে, যে ব্যষ্টিভাবে আপনাকে রূপান্তরিত করেছে। ব্যষ্টিভাব যতক্ষণ, ততক্ষণই তার আয়ু—সাময়িক না হলেও অন্তত কালাবচ্ছিন্ন পরিণামের একটা ধারা সে। আবার কখনও নিজেদের কল্পনা করি ব্যষ্টিভাবনার আধার বা নিমিত্তরূপী মৃত্যুহীন একটা

সত্তারূপে। কিন্তু সেইসঙ্গে জানি, অমর হয়েও ব্যষ্টিত্বের সঙ্কোচকে কাটিয়ে ওঠবার সাধ্য আমাদের নাই। এই অনুভব আর কল্পনায় মিশে গড়ে উঠেছে আমাদের অহংবোধ। সাধারণত এই পর্যন্তই আমাদের জীবস্বভাবের স্বরূপ-জ্ঞানের সীমা।

কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারি, আমাদের বর্তমান ব্যষ্টিভাব প্রকৃতির একটা বহিরঙ্গ পরিণাম মাত্র। একটা বিশেষ দেহপিণ্ডে প্রাণের সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এ শুধু প্রকৃতির কতগুলি বাছাই-করা উপাদানের সচেতন অথচ সীমিত সমাহার, অথবা জন্মজন্মান্তরের সূত্র ধরে দেহ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে সেই সমাহারের নিত্যপরিণামী উদয়নের একটা অভিযান। এর পিছনে এক চিন্ময় পুরুষ আছেন। তিনি নিজের ব্যষ্টিভাবনা দ্বারা সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত নন, বরং ওই সমাহরণের ভর্তা ও নিয়ন্তা হয়েও তিনি তার অতীত। বিশ্ব-ব্যাপী বিরাট অনুভবের ভাণ্ডার হতে তিনি তাঁর ব্যষ্টিবিগ্রহের উপাদান বেছে নেন। তাই আমাদের ব্যষ্টিভাবনার মূলে যেমন একদিকে রয়েছে বিশ্বভাবনার আবেশ, আরেকদিকে তেমনি আছে এক নিগূঢ় চেতনার শাসন—যা জীবত্বের অনুভবকে সার্থক করবার জন্য বিশ্বের ভাবকে ব্যষ্টির ছাঁচে ঢেলে নেয়। পুরুষ আর তাঁর বিশ্বপ্রকৃতির উপাদান—এ-দুয়ের সমাবেশে আমাদের বর্তমান জীবত্বের অনুভব গড়ে উঠেছে। পুরুষ যদি আমাদের মধ্যে চিন্ময় বিগ্রহের সমাকলন হতে বিরত হয়ে কোনমতে অন্তর্হিত বিগলিত বা বিলুপ্ত হন, তাহলে এই জীবত্বের বনিয়াদও সেইসঙ্গে ভেঙে পড়বে। কেননা যে-পরমতত্ত্বের 'পর তার নির্ভর ছিল, সে না থাকলে জীবভাব দাঁড়াবে কিসের উপর? তেমনি বিশ্বপ্রকৃতিরও অন্তর্ধান বিলয় বা বিলোপ ঘটলে অনুভবের উপাদানের অভাবে জীবত্বেরও নিবৃত্তি ঘটবে। অতএব মানতে হবে, আমাদের সত্তার নির্ভর রয়েছে দুটি তত্ত্বের 'পরে। একদিকে আছে তার বিশ্বভাবনা, আরেক-দিকে ব্যষ্টিভাবনার চেতনা—যা আত্মানুভব ও বিশ্বানুভব দুয়েরই প্রবর্তক।

তারপর আরও এগিয়ে দেখি : জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট অন্তর্যামী-পুরুষের চেতনা পরিশেষে ব্যাপ্তির পথে চলে। সচেতন আত্মপ্রসারের অবন্ধন বৈপুল্যে বিশ্বজগৎ ও বিশ্বভূতকে তিনি নিজের মধ্যে টেনে এনে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সামরস্যে একাত্মক হয়ে যান। এই আত্মবিচ্ছুরণের উল্লাসে তাঁর আদিম অনুভবের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে ব্যাবহারিক জীবনের প্রতি পদে আত্মসঙ্কোচ ও ব্যষ্টিভাবনার কার্পণ্য—বিশ্বাত্মভাবনার অনন্ত প্রত্যয় ছড়িয়ে পড়ে বিবিক্ত জীবভাব বা সীমিত জীবচেতনার সকল কুণ্ঠা ছাপিয়ে। এমনি করে আমাদের জীবত্ব হতে অহন্তার কুণ্ডলী খুলে যায়। অর্থাৎ নিজেকে বাঁচাতে হলে চারদিকে গণ্ডি র'চে বিশ্বসত্তা ও বিশ্বপরিণামের উদার আলিঙ্গন হতে নিজেকে বিবিক্ত রাখতেই হবে—এই অবিদ্যা নিরাকৃত হয়।

একটি বিশিষ্ট দেশ-কালে আমরা বিশিষ্ট একটি দেহ-মনের অধিকারী মাত্র—এই অন্ধ সংস্কার তখন মুছে যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে জীবত্ব ও ব্যষ্টিভাবনার সকল তত্ত্বও কি শূন্যে মিলিয়ে যায়? পুরুষের কি আত্মবিলোপ ঘটে তখন, না বিরাট-পুরুষরূপে তিনি অগণিত দেহে-মনে শুধু অন্তর্যামী হয়ে আবিষ্ট থাকেন?...তা তো নয়। পুরুষের ব্যষ্টিভাবনার তখনও নিবৃত্তি হয় না, তাঁর আত্মসত্তা অক্ষুণ্ণ থেকে বিশ্বচেতনায় প্রসারিত হয়েও ব্যষ্টিভাবনাকে জাগ্রত রাখে। তখনও মন থাকে। কিন্তু সে-মন আর সাময়িক ব্যষ্টিভাবনার সীমিত প্রত্যয়কে আত্মভাবের সর্বস্ব বলে ভাবে না। সে জানে, এই সীমার চেতনা সত্তার অতল পারাবার হতে উৎক্ষিপ্ত সম্ভূতির একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস মাত্র, অথবা বিশ্বভাবনারই এ একটা চিন্ময় কেন্দ্র বা রূপায়ণ। জীবচেতনা তখনও বিশ্বপ্রকৃতি হতে ব্যষ্টি-অনুভবের উপাদান আহরণ করে; কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতিকে তখন আর সে নিজের বাইরে অজানার একটা বৃহত্তর ভাণ্ডার বলে জানে না, প্রকৃতির শাসনে প্রতি পদে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার বিড়ম্বনাও দূর হয়। জীব তখন জানে, বিশ্বপ্রকৃতি তার মধ্যে, তারই প্রত্যক্-চেতনায়। সে নির্মুক্ত চেতনার বিপুল প্রসারে ধরা দেয় তার নির্মাণ-স্বাতন্ত্র্যের বিশ্বগত উপাদান এবং বিশিষ্ট কালিক-প্রবৃত্তির ব্যূহিত যত অনুভব। এই নবলব্ধ চেতনায় জীবাত্মা উপলব্ধি করে, তার সত্য স্বরূপ বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তার অবিনাভূত হয়ে তার মধ্যেই সন্নিবিষ্ট। তার জীবত্বের কৃত্রিম ব্যূহ বিশ্বানুভবের একটা সাধন ছাড়া আর-কিছু নয়।

বিশ্বসত্তার সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবনা আমাদের মধ্যে এক কূট-স্থ পুরুষের চেতনা আনে, যিনি যুগপৎ বিশ্ব-বিগ্রহ ও প্রকৃতি-স্থ ব্যষ্টি-বিগ্রহ দুইই। বিশ্বে জীবে এবং জীবত্বের বহুধা বিলাসে সে-পুরুষ অনুভব করেন একই আত্মস্বরূপের বিচিত্র রূপায়ণের রসোল্লাস। এই কূট-স্থ পুরুষ স্বরূপত এক, নতুবা তাদাত্ম্যবোধের কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু এক হয়েও তাঁর আছে বিশ্বভাবনার ও বহুধা-বিচিত্র জীবভাবনার সামর্থ্য। একত্ব তাঁর স্বরূপের তত্ত্ব। কিন্তু বিশ্বভাবনা ও জীবভাবনা সেই স্বরূপেরই নিত্যস্ফুরত্তার বীর্য। এই বিশ্বতোমুখ স্ফুরণই তাঁর চিদ্‌বিলাস—সুদীপ্ত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-বিচ্ছুরণের মত। এই কূট-স্থ পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে তাঁর পরম-সাযুজ্য যদি লাভ করি, তাহলে তাঁর স্বরূপের বীর্য হতে কেন আমরা বিচ্যুত হব, কেনই-বা এমন করে বিচ্যুত হতে চাইব? যদি শুধু তাঁর স্বরূপাস্থিতিকে স্বীকার করি, উপেক্ষা করি তাঁর অনন্ত বীর্য চেতনা ও আনন্দের প্রসাদকে—তাহলে তার ফলে আমাদের তাদাত্ম্যবোধেরও অঙ্গহানি হয় না কি? নিস্তরঙ্গ তাদাত্ম্যের অনুভূতিতে ব্যষ্টি জীবের শান্তি ও বিশ্রান্তির আকূতি চরিতার্থ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মসত্তার বিচিত্র বীর্য প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সঙ্গে

অবিনাভাবের যে বহুভঙ্গিম উল্লাস, তাঁর সম্ভোগ হতে তাকে বঞ্চিতও হতে হয়। 'এহো হয়—কিন্তু আগে কহ আর।'—এই নিস্তরঙ্গ স্বরূপাবস্থান যে আমাদের পরমপুরুষার্থ, এর বাইরে আর-কিছুই যে নাই, একথা মানবার কোনও সংগত কারণ আছে কি?

পূর্বপক্ষী অবশ্য একটা কারণ দেখাতে পারেন। বলতে পারেন, চৈতন্যের শক্তি এবং প্রবৃত্তিতে তাদাত্ম্যানুভব সম্পূর্ণ হয় না। একমাত্র চৈতন্যের স্থিতিতেই একত্বের অবিকল্পিত পরিপূর্ণ উপলব্ধি।...কিন্তু তাদাত্ম্য-বোধের দুটি বিভাব আছে এবং দুয়ের অনুভবও স্বতন্ত্র। একটি বিভাবকে বলা চলে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের জাগ্রত যোগযুক্তি। আরেকটি, সুষুপ্তিতে জাগ্রতের বিলুপ্তির মত ব্রহ্মসত্তায় ব্যষ্টিসত্তার পরিনির্বাণ বা আত্মসমাহিত তাদাত্ম্য-প্রত্যয়। জাগ্রত-যোগে ব্যষ্টি-পুরুষ যুগপৎ প্রবৃত্তির প্রসারণে এবং স্বরূপাব-স্থানের গভীরতায় কূট-স্থ ও বিশ্বম্ভর পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি অনুভবেরই বিপুল পরিবেশে চলে তাঁর অব্যাহত ব্যষ্টিভাবনার লীলা, অতএব তার সঙ্গে ভেদের ভাবনাও থাকে। পুরুষ সর্বভূতের আত্মাকেই আপন আত্মা বলে জানেন। নিজের স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যবোধদ্বারা তিনি বিশ্বভূতের প্রাণন ও মননের নিবিড় সংবিৎ পান। এমন-কি প্রত্যক্-চেতনায় একাত্মক হয়ে তিনি তাদের প্রবৃত্তির প্রশাসনও করতে পারেন। কিন্তু ব্যবহারের ভেদ তবু থাকবেই। পরমপুরুষের যে-লীলা তাঁর নিজের আধারে স্ফুরিত, তার সঙ্গে তাঁর অপরোক্ষ বিশেষ-যোগ আছে। অপর জীব তাঁর আত্মস্বরূপ হলেও তাদের আধারে স্ফুরিত লীলার সঙ্গে তাঁর যোগ পরোক্ষ—সেখানে সর্বাত্ম-ভাবনা ও ব্রহ্মতাদাত্ম্যের অনুভবই যোগের বাহন। অতএব জাগ্রত-যোগে জীবত্ব থাকে—যদিও তার বিবিক্ত অহংভাবের প্রাচীর ভেঙে যায়। বিশ্বের সত্তা জীবত্বের উদার বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে, কিন্তু বিশ্বচেতনা জীবচেতনাকে গ্রাস করে ব্যষ্টিভাবের প্রলয় ঘটায় না—যদিও বিশ্বভাবনায় অহন্তার সংকোচ পরাভূত হয়।

ভেদভাবের এই শেষ আভাসটুকুও আমরা একত্ববোধের ঐকান্তিক অভি-নিবেশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে মুছে ফেলতে পারি। অথচ তাতে কি লাভ? তাদাত্ম্যবোধ পূর্ণ হবে তাতে? কিন্তু জাগ্রত-যোগে বিবিক্ত-বোধের ছোঁয়াচ লেগে তাদাত্ম্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, এই-বা কেমন কথা? ব্রহ্ম বহুধা প্রজাত হয়েছেন বলে কি তাঁর অদ্বৈতহানি ঘটেছে? পরমসাম্যের রসে সমাহিত হয়ে যে-কোনও মুহূর্তে আমরা যেমন তাঁর নিস্তরঙ্গ সত্তায় তলিয়ে যেতে পারি, তেমনি এই ভেদশবলিত অভেদের অনুভবে জাগ্রত থেকে যে-কোনও দশায় অক্ষুণ্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কাজ করেও যেতে পারি অদ্বৈতভাব হতে বিচ্যুত না হয়ে। অহংএর বিলয়হেতু খণ্ডমানসের উগ্র দুরাগ্রহ তখন আর আমাদের চেতনাকে পীড়িত

করে না।...তবে কি প্রলয়ের পথ খুঁজি শান্তি আর স্বরূপবিশ্রান্তির জন্য? কিন্তু তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েই তো পেয়েছি আমরা শান্তি ও বিশ্রান্তির অখন্ড অধিকার—যেমন শাশ্বত কর্মের মধ্যেই আছে পরমপুরুষের শাশ্বত শান্তির অচল প্রতিষ্ঠা।...তাহলে সমস্ত ভেদভাব নিরসনের আনন্দ পেতেই কি আমাদের এই প্রপঞ্চোপশম প্রলয়ের সাধনা? কিন্তু ভেদভাবেরও যে এক দিব্য প্রয়োজন আছে। সে যে নিবিড়তর একত্ববোধের সাধন, অহন্তাবিমূঢ় জীবনের মত খন্ডভাবের প্রযোজক তো নয়। এই ভেদভাব দিয়ে যে পাই আমাদেরই আত্মার অপর বিগ্রহের সঙ্গে, সর্বভূতস্থ পরম-পুরুষের সঙ্গে পরম সাযুজ্যের অনুভব। তাঁর বহুভাবনাকে অস্বীকার করলে একাত্মপ্রত্যয়ে কি এই রসের সন্ধান পেতাম? তাদাত্ম্যবোধ অখন্ডই হ'ক আর সখন্ডই হ'ক, দুয়েরই মধ্যে ব্রহ্ম জীববিগ্রহে আবিষ্ট হয়ে আস্বাদন করেন—এক ক্ষেত্রে তাঁর নিরঞ্জন অদ্বৈতস্বরূপ, আরেক ক্ষেত্রে তাঁর অদ্বৈতবাসিত বিশ্বাত্মভাব। অদ্বৈতস্বভাব হতে প্রচ্যুত হয়ে আবার তিনি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তার নির্বিশেষ স্বরূপে—এ তো তাঁর তত্ত্বভাবের সত্য নয়। সর্বোপাধিনির্মুক্ত নিরঞ্জন অদ্বৈতস্থিতিতে সমাহিত হওয়া অথবা বিশ্বোত্তীর্ণ তুরীয়ের অব্যক্ত গহনে ঝাঁপিয়ে পড়া—সে-অধিকার তো আমাদের কাড়ছে না কেউ। কিন্তু অখন্ড ব্রাহ্মী স্থিতির ঋতচিন্ময় ভাবনায় এমন-কোনও অনতিবর্তনীয় প্রেতি নাই, যা তাঁর বিশ্বাত্মভাবের উদার আনন্দসম্ভোগ হতে আমাদের বঞ্চিত করবে—কেননা এই ঔদার্যের অনুভবই তো জীবত্বের পরম সার্থকতা।

কিন্তু নিত্যজাগ্রত তাদাত্ম্যবোধে জীবচৈতন্য যে কেবল বিশ্বচৈতন্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয় তা নয়। সে তাতে পৌঁছয় সেই পরমচেতনায়, যা হতে বিশ্ব আর জীব দুইই উৎসারিত হয়েছে। আমাদের ব্যষ্টিভাবনা যেমন সেই কূট-স্থ পুরুষের সম্ভূতি, তেমনি তাঁর সম্ভূতি এই জগৎ। জগৎ-ভাবের মধ্যে জীব-ভাব সবসময় অনুগত রয়েছে। অতএব বিশ্ব আর জীবরূপে সম্ভূতির এই যুগললীলাও পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে আছে—তাই ব্যবহারদশাতেও তাদের অন্যোন্যনির্ভর হয়ে চলতে হয়। অথচ যখন দেখি, জীবচেতনার উন্মেষে নিখিল বিশ্ব তার কুক্ষিগত হয় এবং তাতে চিন্ময় জীবভাবের বিলোপ না হয়ে তার আত্মচৈতন্যেরই পরিপূর্ণ উদার বৈশারদ্য ঘটে—তখন একথা না ভেবে পারি না যে, জীবের মধ্যেও বিশ্ব নিত্য অনুগত ছিল, কেবল অহন্তার সঙ্কোচবশে তার অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চেতনা সে অন্তর্গূঢ় বিশ্বরূপের সন্ধান পায়নি। কিন্তু জীব ও জগতের অন্যোন্যভাবের কথা যখন বলি, প্রমুক্ত আত্মানুভবে যখন 'আমাতে জগৎ—জগতে আমি' এই দ্বিদল প্রত্যয় স্ফুরিত হয়, তখন স্পষ্টই বুঝি সাধারণ যুক্তির ভাষায় এবার হতে তত্ত্বের বিবৃতি আর সম্ভব হবে না। কারণ আর-কিছুই নয়। আমাদের ভাষা বস্তুতই

'মন-গড়া'। তার মধ্যে যে-বুদ্ধি অর্থের আরোপ করেছে, সেও স্থূল দেশ-কাল-নিমিত্তের সংস্কারে বাঁধা রয়েছে। তাই অবাঙ্মানসগোচর ভূমির অনুভবকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে তাকে প্রাকৃত জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবের 'পরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মুক্ত-পুরুষের চেতনা উত্তীর্ণ হয় যে-লোকে, সে তো জড়াশ্রয়ী নয়। অতএব তার সর্বাবগাহী দর্শনে যে-বিশ্ব ভেসে ওঠে, সেও এই জড় বিশ্ব নয়। সে-বিশ্ব দিব্য-পুরুষের চিন্ময় সম্ভূতির সহস্রদল সুষমা—দুলছে তাঁরই চিৎশক্তি ও স্বরূপানন্দের উদার ছন্দে। অতএব জীব ও জগতের অন্যোন্যভাব সেখানে চিন্ময় ও মনোময়। ব্যষ্টি আর সমষ্টিরূপে বহুত্বের যে দুটি বিভাব, তাদেরই অন্যোন্যসংগম সেখানে জ্বলে ওঠে অদ্বৈতানুভবের চিন্ময়ী দ্যুতিতে—বিদ্যুৎ-ঝলকে আঁকা হয় এক আর বহুর শাশ্বত সামরস্যের চিত্রলেখা। কারণ, বিশ্বে ভেদ ও অভেদের ছন্দে বহুর যে-লীলায়ন, তার মর্মগত পরমসাম্যের শাশ্বত সত্য বিধৃত রয়েছে ওই একের মধ্যে। অর্থাৎ বিশ্ব আর জীব এক বিশ্বোত্তীর্ণ আত্ম-স্বরূপের বিভূতি। তিনি বিভক্তবৎ প্রতিভাত হয়েও তত্ত্বত অবিভক্ত। আপাতবিভাজনের অন্তরালে সর্বত্র তিনি অখণ্ড মহিমায় অনুস্যূত। তাই আমরা দেখি, পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডের অবস্থান। তাই ব্রহ্মে রয়েছে সর্বভূত এবং সর্বভূতে আছেন ব্রহ্ম। নির্মুক্ত জীবচেতনা যখন এই তুরীয়ের সাযুজ্য লাভ করে, তখন এমনিতর স্ব-গত ও বিশ্ব-গত আত্মানুভবই তার অন্তরে জাগে, মনের মধ্যে সে-অনুভব এক দিব্য সামরস্যের আনন্দ-ব্যঞ্জনায় ধরে জীব ও বিশ্বের অন্যোন্যভাব ও অবিলুপ্ত সদ্‌ভাবের রূপ। সে-সামরস্যে আছে অদ্বৈতের অবিকল্পিত চেতনা, আছে আত্মহারা তন্ময়তা, আছে নিবিড় আলিঙ্গনের মুগ্ধ শিহরন।

ব্যাবহারিক বুদ্ধি দিয়ে এইসব উত্তরভূমির সত্যের ধারণা সম্ভবপর নয়। প্রথমত, অহংকে জীবভাব বলা চলে কেবল অবিদ্যার ক্ষেত্রে। কিন্তু এছাড়াও আধারে সত্যকার এক জীবসত্তা আছে, যা অহন্তা না হয়েও অপর জীবের সঙ্গে অহংনির্মুক্ত বিবিক্তভাবহীন এক শাশ্বতযোগে যুক্ত থাকে। সে-যোগের ধর্ম—স্বরূপত অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই ব্যবহারে ব্যতিষঙ্গ অথবা অন্যোন্যভাবের বিলাস। ব্রহ্মসদ্ভাবের পরিপূর্ণ বিভূতি এই অদ্বৈতভাবিত ব্যতিষঙ্গকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে। অতএব আমাদের ঈপ্সিত দিব্য-জীবনেরও এই ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত বুদ্ধির গোল ঠেকে এইখানে। দিব্যধামের আনন্ত্য হতে বিচ্ছুরিত সীমাহীন আত্মানুভবের উত্তরজ্যোতিকে আমরা এই অবরলোকের সীমিত অনুভবের ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে চাই। সে-অনুভবের অবলম্বন হল বিশ্বের সান্ত প্রতিভাস আর তার অন্যব্যাবর্তক সংজ্ঞা--যা দিয়ে জড়বিশ্বের তথ্যকে আমরা মনের খোপে-খোপে আলাদা করে

সাজিয়ে নিতে চাই। এই যেমন : 'জীব' শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়েও আমাদের তফাত করতে হয় অহং আর সত্যকার নিত্যজীবে—যেমন 'মানুষ' বলতে আমরা কখনও বুঝি মেকী মানুষ, কখনও-বা খাঁটি মানুষ। কিন্তু 'মানুষ' 'খাঁটি' 'মেকী' 'জীব' 'সত্য'—প্রত্যেকটি সংজ্ঞার প্রয়োগ হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থে। বেশ জানি, ওই সংজ্ঞাগুলি দিয়ে আমরা যা বোঝাতে চাই, ঠিক-ঠিক তা বোঝাতে পারছি না। ব্যষ্টি জীব বলতে আমরা সাধারণত বুঝি অন্যব্যাবৃত্ত একটা সত্ত্ব, যা নিজেকে সবার থেকে আলাদা রেখেছে। কিন্তু কার্যত সমস্ত বিশ্ব খুঁজেও এমন-একটি অন্যব্যাবৃত্ত বস্তুর সন্ধান মিলবে না। আসলে আমাদের কল্পিত 'জীব'-সংজ্ঞা মনের একটা বিকল্প মাত্র। তা দিয়ে ব্যাবহারিক জগতের খন্ডসত্যকে প্রকাশ করা চলে—এইটুকু তার সার্থকতা। মন তার বিকল্পসৃষ্ট শব্দের জালে জড়িয়ে যায়, ভুলে যায় আপাতদৃষ্টিতে-যুক্তিবিরোধী বৃহৎ-সত্যের সহযোগেই তার কল্পিত খন্ড-সত্য পেতে পারে পূর্ণ-সত্যের মর্যাদা—নইলে তার মধ্যে মিথ্যার ছোঁয়াচকে কোনমতেই এড়ানো যাবে না। এই যেমন : ব্যষ্টিজীবের কথা যখন বলি, তখন সাধারণত দেহ-প্রাণ-মনের অন্যবিবিক্ত ব্যষ্টিভাবনাকেই বড় করে দেখি। ভাবি, ব্যষ্টিভাবকে আশ্রয় করে অপরের সঙ্গে একাত্মক হওয়া জীবের পক্ষে অসম্ভব। দেহ-প্রাণ-মনের অতীত ব্যষ্টি জীবচেতনার কথা বলতে গিয়েও আমরা তার বিবিক্ত ভাবের কথা ভুলতে পারি না। মনে করি, অপরের সঙ্গে একটা অধ্যাত্মসম্পর্ক বা হৃদয়ের যোগাযোগ ছাড়া তাদাত্মভাবযুক্ত ব্যতিষঙ্গের নিবিড়তা অনুভব করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই, বারে-বারে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে, সত্য-জীব বা নিত্য-জীব বলতে আমরা বুঝি নিত্য-সত্তার শাশ্বত একটা চিদ্‌বিলাস—যার প্রতিষ্ঠা অদ্বৈতভাবনায়, কিন্তু অন্যোন্যভাবনার সামর্থ্য হতে যে কোনকালেই বঞ্চিত নয়। এই নিত্য-জীবই আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি এবং অমৃতের অধিকার পায়।

কিন্তু এতেও প্রাকৃত আর অ-প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বন্দ্ব মেটে না। নিত্য-জীবকে নিত্যস্বরূপের চিদ্‌বিলাস বলতে গিয়েও আমরা বুদ্ধিরই কল্পিত সংজ্ঞা ব্যবহার করি—কারণ তা নইলে দুর্বোধ সন্ধাভাষার শুদ্ধ প্রতীক ছাড়া লোকোত্তর অনুভবের বিবৃতি দেবার আর উপায় থাকে না। কিন্তু এতে দেখা দেয় আরেক গলদ। অহন্তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জীবভাবের পরিচয় দিতে এবার আমরা সকল বৈশিষ্ট্যবর্জিত সামান্য-প্রত্যয়ের ভাষা ব্যবহার করেছি। বস্তুত জীব চিদ্‌বিলাস হলেও নির্বিশেষ নয়। নিত্যের তত্ত্ব হলেও তাঁরই স্ব-গত ব্যষ্টিভাবনার সে চিন্ময় বিগ্রহ, এবং এই বিগ্রহেই সে অমৃতত্বের ভোক্তা। তাহতে এই সিদ্ধান্ত হয় : শুধু-যে আমিই আছি বিশ্বে এবং বিশ্ব আছে আমাতে তা নয়। ব্রহ্মও আছেন আমাতে এবং আমিও আছি ব্রহ্মে। কিন্তু

তার এ-অর্থ নয় যে, মানুষের 'পরে ব্রহ্মসত্তার নির্ভর রয়েছে। বরং তাঁর আত্মবিভাবনার অন্তর্দশায় যার স্ফুরণ, তারই আধারে তাঁর বহির্ব্যক্তি। জীব আছে তুরীয়ে, কিন্তু তুরীয়ও স্বমহিমায় প্রচ্ছন্ন আছেন জীবের মধ্যে। তারপর স্বরূপত ব্রহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত হয়েও তাঁর সম্বন্ধ-তত্ত্বের সম্ভোগে আমার কোনও বাধা নাই। মুক্তজীবরূপে ব্রহ্মের যেমন পরমসাম্যের অনুভবে তুরীয়-ভাবের আস্বাদন পাই—তেমনি জীবে-জীবে, তাঁর বিশ্বরূপেও পাই ব্রহ্মের সামরস্যের আস্বাদন। এমনি করে নির্বিশেষেরই সম্বন্ধ-তত্ত্বের কতগুলি আদিবিভাবে আমরা পোঁছই। মন তবেই তাদের আভাস পায়, যদি সে মানে—তুরীয় জীব ও বিরাট ওই চৈতন্যেরই শাশ্বত সিদ্ধবীর্য, এক নির্বিশেষ সন্মাত্রেরই নিত্যবিভূতি—দ্বৈতাতীত হয়েও যার তত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত। জীবের আধারে তাঁরই আত্মচেতনায় তাঁর মহিমা ফুটছে এমনিতর অনির্বাচ্য রহস্যের দ্যোতনায়। আমাদের এই বিবৃতিতে সামান্যপ্রত্যয়ের ভাষা এবার চরমে পোঁছল। কিন্তু এছাড়া আর উপায় কি! মানুষের ভাষায় সে-অনুভবকে আকার দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা ইতি- বা নেতি- কোনও বাদেই বুদ্ধির কাছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধরা পড়বে না। তাই বৈখরী বাকের চরম ঐশ্বর্য দিয়ে যদি তার এতটুকু আভাস দেওয়া যায়—এই শুধু আমাদের আশা।

মুক্তচেতনার কাছে যা নিঃসংশয়িত বাস্তব, প্রাকৃত মন তার মধ্যে দেখে শুধু বিরুদ্ধ-প্রত্যয়ের একটা জটলা। তাই বিদ্রোহের সুরে সে বলতে পারে : 'নির্বিশেষের স্বরূপ আমার জানা আছে; বেশ জানি, তার তত্ত্ব সমস্ত সম্বন্ধের অতীত। নির্বিশেষ আর সবিশেষে আছে অনতিবর্তনীয় একটা বিরোধ। যা সবিশেষ, কিছুতেই তার মধ্যে নির্বিশেষের স্থান হতে পারে না। আবার যা নির্বিশেষ, তার মধ্যেই-বা বিশেষ ধর্ম থাকবে কেমন করে? সুতরাং আমার মননধর্মের গোড়ার সত্যের সঙ্গে যে-কল্পনার বিরোধ ঘটছে, তা যেমন অবোধ্য অতএব মিথ্যা, তেমনি অসাধ্য অতএব নিষ্প্রয়োজন। অন্যোন্যবিরুদ্ধ দুটি তত্ত্বের দুটিই যুগপৎ সত্য হতে পারে না—মননের এ একটি মৌলিক রীতি। কিন্তু ভাবকের উক্তি এ-রীতিকে উল্লঙ্ঘন করে চলে পদে-পদে। ভাবক বলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য ঘটে, অথচ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করবার সম্ভাবনাও তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু তাদাত্ম্যবোধে সমস্তই যখন একাত্মপ্রত্যয়সার, তখন অন্বয়ব্রহ্ম ছাড়া সেখানে কে-ই বা ভোক্তা কে-ই বা ভোগ্য? ব্রহ্ম জীব আর জগৎ তিনটি বিভিন্ন তত্ত্ব না হলে তাদের মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধও সম্ভব নয়। অতএব সম্বন্ধ-তত্ত্ব বজায় রাখতে মানতে হবে—হয় তাদের নিত্যভেদ, নয়তো সদ্যোভেদ। শেষ কল্পে বলা যেতে পারে, অভেদভাবই তাদের প্রাক্‌সিদ্ধ তত্ত্ব এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। হয়তো অদ্বৈতই গোড়ার কথা এবং শেষের কথাও। কিন্তু জীব আর জগৎ আছে যতক্ষণ, ততক্ষণ তো অদ্বৈতসিদ্ধি

হবার নয়। বিরাট্-পুরুষ তুরীয় অদ্বৈতকে জেনে তাতে নিমজ্জিত হতে পারেন—বিরাট্-ভাবকে বিসর্জন দিয়েই। জীবও তেমনি **বিরাট্** কি তুরীয়ে ডুবতে পারে জীবত্ব এবং ব্যষ্টিভাবনার আত্যন্তিক প্রলয় ঘটিয়ে।...এ-ও হতে পারে : অদ্বৈতভাবই যখন শাশ্বত সত্য, তখন জীব ও জগৎ দুইই স্বরূপত অসৎ। তাদের প্রতিভাস শাশ্বত ব্রহ্মসত্তায় স্বারোপিত একটা বিভ্রম মাত্র। অবশ্য একথাটাও অন্যোন্যবিরোধদুষ্ট, অতএব ধাঁধার শামিল। কিন্তু ব্রহ্মসত্তায় অন্যোন্যবিরোধের কল্পনা থাকলেও তার সমাধানের দায় আমার নাই। তাবলে ব্যবহারের জগতে অথবা মননের গোড়াতেই অন্যোন্যবিরোধকে স্বীকার করে কিংবা তার সমাধান না ক'রে তো আমার কাজ চলে না। অতএব আমার সামনে দুটি পথ খোলা : হয় ব্যবহারদশায় জগৎকে সত্য মেনে ভাবব, কাজ করব; নয়তো তত্ত্বত জগৎকে মিথ্যা জেনে করব নৈষ্কর্ম্য এবং চিন্তাবিরতির সাধনা। বিরোধের সমাধান করা তো আমার দায় নয়। ব্রহ্মের মত আমিও যে জীবভাব ও বিরাট্-ভাবের অতীত লোকোত্তর চেতনায় দীপ্ত হয়ে জগতের বিরোধ নিয়ে কারবার করব ওই তুরীয় ভূমিতে থেকে, এ তো আমার পুরুষার্থ নয়। জীব থেকেই ব্রহ্ম হওয়া অথবা তিনটি ভাবকে যুগপৎ অঙ্গীকার করা যেমন আমার কাছে ন্যায়সিদ্ধ নয়, তেমনি ক্রিয়াসাধ্যও নয়।' প্রাকৃত বুদ্ধির এই রায়ে অবশ্য কোথাও অস্পষ্টতা নাই। তার বিশ্লেষণে দ্বিধা নাই, যুক্তিতে নাই স্বাধিকার-লঙ্ঘনের উৎকট প্রয়াস কি ভাবকালির প্রদোষচ্ছায়ায় পথ হারানোর বিড়ম্বনা। যে-ভাবকতার আমেজটুকু তার মধ্যে আছে, তা যেমন স্বচ্ছ তেমনি নির্গ্রন্থ। তাই সহজবুদ্ধির কাছে জীবনসমস্যার এ-সমাধান এত উপাদেয়। অথচ এ-সমাধানে আছে তিনটি ভুল। প্রথম ভুল, নির্বিশেষ ও সবিশেষের মাঝে অনপনেয় বিরোধের সৃষ্টি। দ্বিতীয় ভুল, অন্যোন্যব্যাবৃত্তির প্রাকৃত বিধানকে একটা অনতিবর্তনীয় সার্বভৌম বিধান মনে করা। আর তৃতীয় ভুল, যে-বস্তুর তত্ত্ব নিত্যের কোঠায়, কাল দিয়ে মেপে তার কোষ্ঠীবিচার করা।

নির্বিশেষ বলতে আমরা বুঝি এমন-একটা তত্ত্ব, যা শুধু জীবকে নয়, জীবধাত্রী বিশ্বপ্রকৃতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। যে বিশ্বোত্তীর্ণ পুরুষকে আমরা ঈশ্বর বলি, নির্বিশেষ তাঁরই পরম তত্ত্ব। তাঁকে ছাড়া এই দৃশ্য জগতের উদ্ভব বা সত্তা একমুহূর্তের জন্যেও সম্ভব হত না। সমস্ত সম্বন্ধের অতীত স্বয়ম্ভূস্বভাব বলে ইওরোপীয় দর্শনে এঁকে ব'লে Absolute. ভারতীয় দর্শন বলে 'ব্রহ্ম'। যা-কিছু সবিশেষ, তার সত্তা নির্ভর করে তার অন্তর্গূঢ় সামান্য-সত্যের অধিষ্ঠানের 'পরে। সে-অধিষ্ঠানসত্য যেমন সবিশেষের ধর্ম ও বীর্যের উৎস এবং আধার, তেমনি নিখিল সবিশেষের সে অতি-ষ্ঠাও। প্রত্যেক সবিশেষ তত্ত্বের বিবিক্ত প্রকাশ, অথবা আমাদের জ্ঞানগম্য নিখিল সবিশেষের সমূহ-প্রকাশ—দুইই নির্বিশেষ অধিষ্ঠানতত্ত্বের অর্থক্রিয়াকারী একটা

অবর অংশকলা মাত্র। যুক্তিতে পাই নির্বিশেষের উদ্দেশ, অধ্যাত্ম-অনুভবে পাই তার অপরোক্ষ পরিচয়। কিন্তু সংবেদন যত উজ্জ্বলই হ'ক, তার স্বরূপ অনির্বাচ্যই থেকে যায় আমাদের কাছে—কেননা মানুষের বাণী ও মন সবিশেষেরই খবর দিতে পারে শুধু। নির্বিশেষতত্ত্ব তাই অনিরুক্ত-স্বভাব, অবাঙ্‌মানসগোচর।

এপর্যন্ত ভাবনার মধ্যে কোনও গোল নাই। কিন্তু এর পরেই শুরু হয় বুদ্ধির দৌরাত্ম্য। বিরোধের সংস্কার মনের মজ্জাগত, ভেদ ও দ্বন্দ্বের কল্পনা ছাড়া এক পা এগোবার সাধ্য তার নাই। তাই নির্বিশেষ তার কাছে সবিশেষ উপাধি হতে নির্মুক্ত নয় শুধু—ওই উপাধি-নির্মুক্তিকেই আবার সে কল্পনা করে নির্বিশেষের একটা উপাধি বলে। অতএব যা নিরুপাধিক, উপাধিযুক্ত হবার সামর্থ্যই তার স্ব-ভাবে নাই—এই তার রায়। নির্বিশেষের সঙ্গে সবিশেষের শাশ্বত স্বগত-বিরোধই তার মতে পরমার্থতত্ত্ব। কিন্তু এমনি করে যুক্তির ভুলে আমরা একটা উভয়সঙ্কটের মধ্যে পৌঁছই। নির্বিশেষ সবিশেষের শাশ্বত প্রতিষেধ যদি হয়, তাহলে জীব ও জগতের সত্তাকে শুধু রহস্য না বলে বলতে হয় ন্যায়ত অসিদ্ধ। কেননা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, নির্বিশিষ সবিশেষ-ভাবনার উপাধি এবং সামর্থ্য হতে নির্মুক্ত—অথচ সবিশেষ-ভাবনার নিমিত্ত না হলেও অন্তত আধার তো বটেই। অতএব নিখিল সবিশেষের স্বরূপসত্য তাতেই নিহিত রয়েছে। এ-বিরোধের সমাধান কি? সঙ্কট হতে বাঁচবার **একটিমাত্র** পথ আছে। সে-পথ যুক্তির না অযুক্তির, তা বলা কঠিন। বলতে পারি : নীরূপ নির্বিশেষ শাশ্বত-সন্মাত্রে জগৎভাবের আরোপ একটা স্বতঃসিদ্ধ বিভ্রম, কালকলনার একটা অবাস্তব বিলাস। এ-আরোপের প্রযোজক হল আমাদের প্রমাদী জীবচেতনা যা মিথ্যা ক'রে ব্রহ্মকে জগদাকারে আকারিত দেখে—যেমন ভুল ক'রে মানুষ দড়িকে দেখে সাপ। কিন্তু জীবচেতনাও তো ব্রহ্মাধিষ্ঠিত একটা সবিশেষ তত্ত্ব—ব্রহ্মের সত্তায় সে সত্তাবান, নইলে বাস্তব-তত্ত্ব তার কিছুই নাই: অথবা স্বরূপত সে ব্রহ্মই। সুতরাং জীবের দ্বারা ব্রহ্মে জগদ্ভাবের আরোপ যেখানে, সেখানে বস্তুত ব্রহ্মই আমাদের মধ্য থেকে নিজের 'পরে আরোপ করছেন এই বিভ্রম, নিজেরই চেতনার বিশেষ-কোনও প্রকারে বাস্তব রজ্জুকে ভুল করছেন অবাস্তব সর্প বলে, তাঁর অনির্বাচ্য নিরঞ্জন স্বরূপ-সত্যে আরোপ করছেন জগতের একটা প্রতিভাস। ব্রহ্মের আত্মচৈতন্য এ-আরোপের অধিষ্ঠান নাও যদি হয়, তবু আরোপের অধিষ্ঠানচৈতন্য তাঁর বিভূতি, তাঁরই আশ্রিত—মায়াতে তাঁর আত্মপ্রসর্পণ। কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় কিছুই ব্যাখ্যাত হল না—গোড়ায় যে-বিরোধ দেখা দিয়েছিল তা তেমনি উদ্যতই থেকে গেল। বিরোধের সমাধান না করে আমরা তাকে ভাষান্তরিত করলাম মাত্র। তাইতে মনে হয়, লোকোত্তর রহস্যকে তর্কবুদ্ধির কৌশল দিয়ে ব্যাখ্যা করবার

দুরাগ্রহে আমরা শুধু ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছি মিছামিছি—শুষ্ক তার্কিকের মত আপন কোট বজায় রাখতে গিয়ে। যুক্তি মেনে চলার বাহাদুরিতে নিজের বুদ্ধির 'পরে যে-সংস্কারের ভার চাপিয়েছি, তাকেই আমরা আরোপ করেছি নির্বিশেষের 'পরেও। কি করে জগৎ হল, সে-রহস্য প্রাকৃত মনের অগোচর বলে ধরে নিয়েছি—নির্বিশেষ ব্রহ্মের জগৎরূপে নিজেকে বিসৃষ্ট করবার সামর্থ্যই নাই। কিন্তু জগৎসৃষ্টিতেও ব্রহ্মের যেমন বাধে না, তেমনি বাধে না তাঁর সেই সঙ্গেই বিসৃষ্টির অতি-ষ্ঠা হতে। আসল বাধা আমাদের সংকীর্ণ মনের সংস্কারে। সান্ত আর অনন্তের সহভাব যে অতিমানস ন্যায়ে সিদ্ধ—একথা সে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না অবিশেষের সঙ্গে বিশেষের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে কোন্‌খানটায়। প্রাকৃত বুদ্ধির যুক্তিতে এরা পরস্পরের বিরোধী। ব্রাহ্ম-ন্যায়ে এরা অন্যোন্যসম্বন্ধ—একই তত্ত্বের একান্তবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ নয়। অনন্ত-সন্মাত্রের চেতনা আমাদের মনশ্চেতনা কি ইন্দ্রিয়চেতনার মত নয়। তার বৃহৎ উদার আবেষ্টনে মন আর ইন্দ্রিয় একটা অবরবিভূতির ক্রিয়া মাত্র। তাই অনন্তেব যুক্তি মনের যুক্তি হতে একেবারেই আলাদা। মন পায় তথ্যের গৌণ পরিচয় এবং তা-ই দিয়ে তার ভাব ও ভাষা গড়ে। অতএব তার দৃষ্টিতে জগতে অনপনেয় বিরোধের অন্ত নাই। কিন্তু আনন্ত্যের আছে স্বাঙ্গীভূত অনাদিতথ্যের অপরোক্ষ অনুভব; তা-ই দিয়ে বিরোধের সমন্বয়সাধনা তার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক।

আমাদের ভুল হয়, যখন অনির্বাচ্যের নির্বচন করতে গিয়ে ভাবি, সর্ব-ব্যাবর্তক 'নেতি'র বিশেষণ দিয়েই বুঝি তাঁর পূর্ণ পরিচয়। অথচ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে চরম ইতিস্বরূপ এবং সমস্ত ইতির প্রবর্তক না ভেবেও উপায় নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহু দার্শনিক তার্কিকের চুলচেরা শব্দবিচারে না ভুলে শুধু বিশ্বের তথ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্বিশেষ-তত্ত্বকে যে বুদ্ধির একটা অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, এও কিছু আশ্চর্য নয়। এ'দের মতে নির্বিশেষ-তত্ত্ব তার্কিকের শব্দজাল হতে উৎপন্ন একান্ত অবাস্তব একটা শূন্যের বুদ্বুদ মাত্র। সত্যকার তত্ত্ববস্তু হল শাশ্বত সম্ভূতি—নির্বিশেষ অসম্ভূতি নয়। প্রাচীন ঋষিরা 'ব্রহ্ম এ নয়, ব্রহ্ম তা নয়' বলে নেতিবাদ দিয়ে ব্রহ্মকে লক্ষিত করলেও, তাঁর ইতিস্বরূপের লক্ষণ বলতে কিন্তু ভোলেননি। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন, ব্রহ্মকে শুধু নেতি বা ইতি দিয়ে বিশেষিত করলে সে হবে সত্যের অপলাপ। তাই তাঁরা বললেন, 'অন্নং ব্রহ্ম, প্রাণো ব্রহ্ম, মনো ব্রহ্ম, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্ম—সত্যং জ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম।' অথচ এর কোনটিতেই ব্রহ্মের সমগ্র পরিচয় হয় না, এমন-কি অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের উদারতম প্রত্যয় দিয়েও তাঁর ইতিস্বরূপের শেষ খবর মেলে না—একথাও তাঁরা জানতেন। প্রাকৃত জগতে দেখি, মনশ্চেতনা যত ঊর্ধ্বে উঠুক, কোনও ইতির ভাবনা দিয়েই বস্তুর তত্ত্বকে

সে নিঃশেষ করতে পারে না, তাই তার প্রত্যেক ইতিকে ছাপিয়ে থাকে নেতির মায়া। কিন্তু তাবলে সে-নেতি তো শূন্য নয়। বাস্তবিক যাকে শূন্য বলে ভাবি, তার মধ্যেই যে সংহত হয়ে আছে সত্তার বীর্য ও শক্তির সংবেগ—ভূতার্থ ও ভব্যার্থের ঘনীভূত সমাহার। আবার নেতির সত্তায় তার প্রতিযোগী ইতি অসৎ কি অবাস্তব হয় না। ইতিবাদ দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপ-সত্যের এমন-কি ইতি-রূপেরও পূর্ণ পরিচয় হতে পারে না, নেতিবাদে থাকে তার ইঙ্গিত। কারণ তত্ত্বভানে ইতি আর নেতি যে পাশাপাশি আছে শুধু তা নয়—তারা আছে অন্যোন্যসম্বন্ধ এমন-কি অন্যোন্যাশ্রিত হয়ে। তাই অবাঙ্‌মানসগোচর সম্যক্-দর্শনে তারা ফোটায় অখণ্ডের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা—একের আলোকপাতে অপরের রহস্য সেখানে দীপ্ত হয়ে ওঠে। বাস্তবিক একা-একা তাদের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হয় না। একটির তত্ত্ব করতে গিয়ে যখন আপাতবিরোধী তত্ত্বের ব্যঞ্জনাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে নিই, তখনই পাই তার মর্মসত্যের নিবিড় পরিচয়। অতএব নির্বিশেষের তত্ত্ব পেতে হলে, বোধির উদার-গহন অনুভবকেই করতে হবে বুদ্ধির সাধন—শুষ্ক তর্কের ব্যাবর্তক-বৃত্তিকে নয়।

আমাদের চেতনায় ব্রহ্মভাবের যে বিচিত্র স্বতঃস্ফুরণ তা-ই দেয় তাঁর ইতিস্বরূপের পরিচয়। আর তাঁর সম্পর্কে নেতিবাদ জাগায় তাঁর নির্বিশেষ ইতি-ধর্মের অশেষ পরিশেষকে, যা দিয়ে ইতিবাদের কুণ্ঠা নিরাকৃত হয়। ব্রহ্মের প্রথম পরিচয়ে পাই তাঁর সম্বন্ধ-তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি। জানি, তিনি সান্ত এবং অনন্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ। প্রত্যেকটি উপাধি-দ্বন্দ্বে, নেতিকারের মধ্যে নিহিত রয়েছে তার প্রতিযোগী ইতিকারের সমূহ বীর্য। নেতির গর্ভে হতেই ইতির স্ফুরণ, অতএব দুয়ে কোথাও বিরোধ নাই।...সম্বন্ধ-তত্ত্বের পরের ধাপে পাই তাঁর অনতিসূক্ষ্ম সত্য-বিভূতির পরিচয়। জানি, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক, বিরাট ও ব্যষ্টি। এখানেও দেখি, উপাধি-দ্বন্দ্বের প্রত্যেকটি কোটি তার আপাতবিপরীত কোটির অন্তর্ভুক্ত। বিরাট নিজেকে যেমন সংহত ও বিশিষ্ট করছেন ব্যষ্টি জীবে, তেমনি ব্যষ্টির মধ্যে আছে বিরাটের নিখিল সামান্য-গুণের অক্ষত সমাহার। বিরাট চেতনা তার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যকে জানে জীবচেতনার অগণিত বৈচিত্র্যে নিজেকে রূপায়িত করেই, বৈচিত্র্যকে নিরুদ্ধ করে নয়। তেমনি জীবচেতনার সার্থকতা বিশ্বচেতনার আবেশে, বিশ্বাত্মভাবনার স্ফুরণহেতু অকুণ্ঠ আত্মপ্রসারণে—অহন্তার সংকোচে নিজেকে সীমিত করে নয়। আবার বিশ্বের সমূহে ও ব্যূহে আছে বিশ্বোত্তীর্ণের অখণ্ড সমাবেশ। তার বিশ্বভাব অটুট থাকে নিজেরই তুরীয়-তত্ত্বের অধিষ্ঠানে। ভূতে-ভূতে আপন তুরীয়-স্বভাবের দিব্য-মহিমাকে অনুভব করেই তার জীবভাবের লোকোত্তর সাধনা সার্থক হয়। তেমনি দেখি, বিশ্বোত্তীর্ণই বিশ্বের আধার ও উপাদান, তাঁহতেই বিশ্বের বিসৃষ্টি।

এই বিসৃষ্টিতে তিনি খুঁজে পান তাঁর অনন্ত বৈচিত্র্যের অপরূপ ছন্দঃসুষমা। ...সম্বন্ধ-তত্ত্বের আরেক ধাপ নীচে নামলেও দেখি, ইতি আর নেতির একই খেলা। নির্বিশেষ ব্রহ্মে আমাদের পৌঁছতে হবে দিব্যভাবনার বৃহৎ-সামে তাদের সকল বিরোধকে গেঁথে নিয়েই, বিরোধকে হঠের দ্বারা বিলুপ্ত করে বা তার উগ্রতাকে চরমে তুলে নয়। কারণ, নির্বিশেষের মধ্যে আছে সকল বিশেষের, আত্মরূপায়ণের ছন্দোবৈচিত্র্যের সার্থক সম্ভাব—প্রতিষেধ নয়, তাদের সত্য-প্রতিষ্ঠার মূল নিদান—মিথ্যাত্বের আক্ষেপ নয়। নির্বিশেষের মধ্যে জগৎ ও জীব জগদ্ভাব ও জীবভাবের স্বরূপ-সত্য খুঁজে পায়—তাদের নিরসন ও মিথ্যাত্বের প্রামাণ্যকে নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁর যত আত্মবিভূতি বৈতণ্ডিকের মত কেবল খণ্ডন করছেন না: বরং তাঁর অস্তিত্বে আছে অস্তিভাবের এমন একান্ত ও অনন্ত বীর্য, যা অস্তিত্বের কোনও সান্ত প্রত্যয়ে নিঃশেষিত অথবা সীমিত হতে পারে না।

এই যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মের তত্ত্ব হয়, তাহলে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির অন্যোন্যব্যাবৃত্তির যুক্তি নিশ্চয়ই তাঁর বেলায় খাটবে না। লোক-ব্যবহারে সে-যুক্তি খাটে, কেননা সেখানে খণ্ড-সত্য নিয়ে আমাদের কারবার। সেখানে আছে দেশের বিভাগ, কালের ক্ষণভঙ্গ, বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতিতে ভেদ। তাদের মেনে নিতে হয় বলেই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমরা খুঁজি বস্তুস্বরূপের সুস্পষ্ট ছককাটা একটা পরিচয়। লোক-ব্যবহারের মধ্যে অস্তিত্বের সত্য প্রকাশিত হয়েছে রূপায়ণের অনতিবর্তনীয় উচ্ছলনে—অর্থক্রিয়াকারিতা যার তত্ত্ব। জড়-প্রকৃতিতে, বস্তুর বহির্বৃত্ত রূপায়ণে আমরা তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। কিন্তু অস্তিত্বের সোপান বেয়ে উপরপানে যত উঠে যাই, ততই দেখি নিয়তিকৃত নিয়মের আড়ষ্ট বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। জড়শক্তির বেলায় ব্যাবৃত্তির বিধান মানতে পারি, কেননা তখন বস্তুর স্বরূপ ও বীর্যের একটা মাত্র দিক আমাদের প্রয়োজন। বস্তুস্বরূপ অব্যাহত থাকবে, অর্থক্রিয়ার খাতিরে তার ধর্ম ও সামর্থ্য বিশেষভাবে সীমিত হবে—তবেই আমরা তাদের নিয়ে কাজ করতে পারব। তাই ব্যবহারের জগতে অন্যব্যাবর্তক ধর্মেই বস্তুর পরিচয়। কিন্তু মানুষ ক্রমে বুঝছে, বুদ্ধিকৃত ভেদ এবং বিজ্ঞানের হাতে-কলমে পরীক্ষণ ও বর্গীকরণ বিশেষ প্রয়োজনে আপন-আপন ক্ষেত্রে সার্থক হলেও তাতে বস্তুস্বভাবের সমগ্র বা তাত্ত্বিক রূপের সন্ধান মেলে না। এতে সমষ্টির তত্ত্ব পাওয়া দূরে থাকুক, বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য যাকে সমূহ হতে বিচ্ছিন্ন করে কৃত্রিম একটা বর্গের খোপে পুরেছি, তারও নিখুঁত পরিচয় পাই না। অবশ্য বিচ্ছিন্ন করার ফলে, হাতের মুঠায় পেয়ে তাকে খুশিমত নাড়াচাড়া করতে পারি বটে; এবং তাইতে ভাবি, বিষয় সম্পর্কে প্রবৃত্তি-সামর্থ্যই আমাদের বিবিক্ত ও বিশিষ্ট জ্ঞানকে পূর্ণসত্যের মর্যাদা দেয়। কিন্তু পরে বুঝতে

পারি, খণ্ডজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ছাড়িয়ে গিয়েই আমরা পাই বৃহত্তর সত্য ও মহত্তর সিদ্ধির অধিকার।

জ্ঞানের প্রথম ভূমিতে সমষ্টি হতে ব্যষ্টিকে বিবিক্ত করে দেখবার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। হীরা হীরাই, মোতি মোতিই—দুয়ের জাতি আলাদা, অন্য-ব্যাবর্তক ধর্মেই দুয়ের নিজস্ব পরিচয়। কিন্তু এছাড়াও দুয়ের মধ্যে কতগুলি সামান্যধর্ম আছে—এমন-কি বিশ্বের তাবৎ জড়পদার্থের সঙ্গে কোনও-না-কোনও দিক দিয়ে তাদের সাধর্ম্য আছে। সত্য বলতে তারা টিকে আছে পরস্পরের সাধর্ম্যের জোরে—বৈধর্ম্যের জন্য নয়। এই সাধর্ম্যের পরিধিকে প্রসারিত করে যখন দেখি, বিশ্বের সমস্ত জড়পদার্থের মূলে আছে এক শক্তি, এক উপাদান—বলতে গেলে এক অখণ্ড বিশ্বস্পন্দই স্বাত্মভূত ঋতম্ভরা সম্ভূতিকে রূপায়িত করছে বিচিত্র ধর্ম ও ব্যাকৃতির অফুরন্ত উৎসারণে ও সংযোজনে, তখন আমরা পাই নিখিল জড়ের কূটস্থ মর্মসত্যের পরিচয়। শুধু ভেদক ধর্মের পরিচয়ে খুশী থাকলে হীরা-মোতির কারবার অবশ্য পাকা হবে, জাতি ও গুণের বিচার করে তাদের দর ফেলাও যাবে। কিন্তু জাতিধর্মের গোড়ার খবর জেনে সাধর্ম্যের সূত্রে হীরা আর মোতির মৌল উপাদানগুলি যদি বাঁধতে পারি, তাহলে খুশিমত হীরা কি মোতি উৎপন্ন করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। আরও এগিয়ে গিয়ে নিখিল জড়ের মর্মধাতুকে যদি হাতের মুঠায় আনতে পারি, তাহলে ইচ্ছামত বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে ভূতজয়ের সিদ্ধিও আয়ত্ত করতে পারি। তাই বৈধর্ম্যের জ্ঞান পরম সত্যে ও চরম সিদ্ধিতে পৌঁছয় তখন, যখন বৈচিত্র্যের অন্তর্গূঢ় একত্বকে আবিষ্কার ক'রে সকল বৈধর্ম্যের মর্মচর সাধর্ম্যের নিগূঢ় বিজ্ঞানে অবগাহন করি। এই নিগূঢ় বিজ্ঞানে ব্যাবহারিক জ্ঞানের সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হয় না, অথবা তার তুচ্ছতাও সপ্রমাণ হয় না। জড়ের চরমতত্ত্বের আবিষ্কার হতে আমরা এমন সিদ্ধান্তও ক'রে বসি না যে, জড় বা বিশ্বমূল কোনও রূপধাতু কোথাও নাই—আছে শুধু শক্তির রূপাভিমুখী স্পন্দ বা জড়াভিমুখী বিসৃষ্টি। এমন কথাও বলি না তখন যে, হীরা-মোতি সমস্তই অসৎ এবং অবাস্তব—তারা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের কল্পিত একটা বিভ্রম। বলি না, শক্তি স্পন্দ বা রূপধাতুর অদ্বৈতই জড়বিশ্বের একমাত্র শাশ্বত তত্ত্ব, অতএব জড়বিজ্ঞানের পরমপুরুষার্থ হবে—হীরা-মোতি সব-কিছুকে ওই শাশ্বত মৌলতত্ত্বে বিলীন করা, তাদের ধর্ম ও ব্যাকৃতির অত্যন্তনাশ ঘটানো!...পদার্থের যেমন আছে স্বরূপ-সত্য, তেমনি আছে সাধর্ম্যের সত্য এবং ব্যষ্টি-ভাবেরও সত্য। শেষের দুটি স্বরূপ-সত্যেরই নিত্যসিদ্ধ বীর্যবিভূতি। স্বরূপ-সত্য অবশ্য তাদের ছাড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তিনের সমাহারেই সন্মাত্রের শাশ্বত পরিচয়—বিবিক্তভাবনায় নয়।

জড়ের জগতে ঊর্ধ্বলোকের সূক্ষ্মবীর্যকে স্থূলবুদ্ধির গোচর করতে না

পারলেও, অখণ্ডের ভাবনা যে এখানেও সত্য, বহু কষ্টে তার একটা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। কিন্তু তার রূপটি উজ্জ্বল ও বীর্যসম্পন্ন হয়ে ওঠে—যখন উত্তরায়ণের পথে চলতে থাকি। তখন দেখি ভেদকধর্ম ও বর্গীকরণের সার্থকতা যেমন আছে, তেমনি আছে সীমাও। বস্তুত সকল বস্তুই ভিন্ন হয়েও এক। ব্যবহারের প্রয়োজনে উদ্ভিদ পশু আর মানুষ আলাদা-আলাদা। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি, উদ্ভিদও পশুর পর্যায়ে পড়ে—তফাত কেবল এই যে, তার মধ্যে আত্মচেতনা ও ক্রিয়াশক্তি এখনও যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেনি। পশুর মধ্যে পাই মানবতার অস্পষ্ট সূচনা; মানুষও পশু, শুধু আত্মচেতনা ও চিৎশক্তির মাত্রাধিক্য মানুষের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তাকে। আবার এই মানুষেই নিরুদ্ধ হয়ে আছে চিৎশক্তির এমন-একটা সংবেগ, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে দেবত্বের বীজ। অতএব মানুষেও দেবতার অস্পষ্ট সূচনা আছে। এমনি করে, উদ্ভিদে পশুতে মানুষে দেবতায় শাশ্বত-পুরুষই গুহাহিত ও খিলীভূত হয়ে আছেন তাঁর সত্তার এক-একটি বিভূতিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। প্রত্যেকের মধ্যে আছে শাশ্বত গূঢ়াত্মার পরিপূর্ণ আবেশ। মানুষ যখন প্রকৃতির অতীত-পরিণামের সমাহরণ করে, মনুষ্যত্বের আকারে তার রূপান্তর ঘটায়, তখন মনুষ্যব্যক্তি হয়েও সে বিশ্বমানবের প্রতীক। তার মধ্যে বৈশ্বানরেরই ব্যষ্টিভাবনা মনুষ্যত্ব হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষ সর্বময়, অথচ সে স্বনিষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়। সে যা তা-ই। তবুও তার মধ্যে আছে নিখিল অতীতের সমাহার এবং নিখিল ভবিষ্যের সম্ভাবনা। শুধু তার বর্তমান ব্যষ্টিভাব দিয়ে তার সকল রহস্য বুঝব না। তেমনি, শুধু তার মানবত্বরূপ সাধর্ম্যের সত্যকে যদি দেখি, অথবা ব্যক্তিধর্ম ও জাতিধর্ম উভয়কে ছেঁটে ফেলে বিশুদ্ধ তত্ত্বভাবের মধ্যে তার মানবতারূপী ভেদকধর্ম এবং ব্যক্তিভাবের সকল বৈশিষ্ট্য যদি তলিয়ে দিই, তাহলেও তার তত্ত্ব জানতে পারব না। ব্যষ্টিও ব্রহ্ম, সমষ্টিও ব্রহ্ম। কিন্তু এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে আছে নির্বিশেষেরই পূর্ণায়ত স্বয়ম্ভূ-সত্তার নিত্যপ্রকাশ। অদ্বয়ভাব আমাদের স্বরূপের সত্য বলে এমন কথা বলা চলে না যে, দিব্য-পুরুষের বিচিত্র কর্ম ও বিভূতি সমস্তই তুচ্ছ অসার অবাস্তব বিভ্রমের প্রতিভাস মাত্র—অতএব আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের **একমাত্র** লৌকিক বা অলৌকিক সার্থকতা হল এই বিভ্রমের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া, পরমার্থসত্যের অবর্ণ অব্যাকৃতিতে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবনার প্রলয় ঘটিয়ে চিরতরে সম্ভূতির সকল সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া।

একই তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হবে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনেও। আমরা ভাল-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত কি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে চলি বিশেষ-কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে। কিন্তু এই ভেদবুদ্ধিই যদি জিজ্ঞাসাকে সীমিত করে রাখে, তাহলে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান আমরা কোনকালেই পাব না। এক্ষেত্রে

অন্যোন্যব্যাবৃত্তির বিধান শুধু বলে : একই বিষয় সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দুটি উক্তি একই সময়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি হতে প্রমাপক হতে পারে না—যদি তাদের অধিকার প্রয়োজন ও পরিবেশও এক হয়। একটা মহাযুদ্ধ, ধ্বংসের তান্ডব বা প্রমত্ত বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাতকে আমাদের অমঙ্গল বলে উৎকট প্রলয়ঙ্কর একটা বিপর্যয় বলে মনে হতে পারে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তার আংশিক পরিণাম হয়তো তা-ই। কিন্তু আরেকদিক থেকে বিচার করলে এই অমঙ্গলকেও বলতে হয় পরম মঙ্গল—কেননা এ-বিপ্লব অতীতের জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে দ্রুত নিয়ে আসে নবযুগের কল্যাণময় সূচনা। কোনও মানুষকে নিছক ভাল কি নিছক মন্দ বলা চলে না। সবার মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্মের মিশ্রণ আছে—এমন-কি মানুষের একটি ভাবে কি একটি কর্মেও দেখি বিরুদ্ধবৃত্তির কত জট পাকানো। আমাদের কর্মে, জীবনে, স্বভাবে—কোথায় নাই বিচিত্র গুণ ও ধর্মের দ্বন্দ্ব, আবার তার বিচিত্র সমাহার ও সমন্বয়?... তাই বিশ্বলীলার পরিপূর্ণ তাৎপর্য তখনই বুঝতে পারি, যখন চেতনায় নির্বিশেষের স্বরূপ-সত্যের আভাস জাগে এবং সেই মর্মাবগাহী দৃষ্টি নিয়ে তার সবিশেষ বিভূতির অখন্ড বৈচিত্র্যের দিকে তাকাই—যখন কাউকে পৃথক করে না দেখে সবাইকে জড়িয়ে দেখি সবার সঙ্গে এবং তাকেও ছাড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দিই সর্বাতিগ ও সর্বসমন্বয়ী অধিষ্ঠানতত্ত্বের 'পরে। বাস্তবিক জানা পূর্ণ হয়, যখন দিব্যচক্ষু দিয়ে বিশ্বলীলার মূলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ধরতে পারি, শুধু কুণ্ঠিত মানবী দৃষ্টি নিয়ে যখন বিশ্বের দিকে তাকাই না—যদিও জানি সর্বময়ের বিরাট লীলার মধ্যে আমাদের সীমিত দর্শন ও সাময়িক প্রয়োজনেরও নিগূঢ় একটা সার্থকতা আছে। সবিশেষের সকল বিভূতির পিছনেই আছে নির্বিশেষের আবেশ, তাকে আশ্রয় করেই তারা মঞ্জরিত। জগতের বিশেষ-কোনও কর্ম কি বিধানকে অখন্ড-ন্যায়ের বিধান বলা চলে না। অথচ এখানকার সকল বিধিব্যবস্থার পিছনে এমন-একটা নির্বিশেষ তত্ত্বের প্রেতি আছে, যাকে বলতে পারি পরম ন্যায়। বিশেষের ভিতর দিয়ে তারই প্রকাশ হলেও, তার পূর্ণরূপটি কিন্তু আমরা ধরতে পারি না। তাকে পুরাপুরি চিনতে পারি, যদি আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত ও সর্বাবগাহী হয়—দু-চারটি বহিরঙ্গ তথ্যের আপাত-প্রতিভাসে সন্তুষ্ট এই বর্তমান খন্ডদৃষ্টির চর্মভেদী পঙ্গুতা যদি টুটে যায়।...তেমনি পরম কল্যাণ ও পরম শ্রীও জগতে আছে। তার চকিত আভাস পাই যখন নিষ্পক্ষ দৃষ্টির উদার পরিবেশে সবাইকে গ্রহণ করি, তাদের বহিরাবরণ ভেদ করে পাই সেই গভীরের পরিচয় যার মর্মসত্যকে তারা ফুটিয়ে তুলতে চাইছে আপন বিচিত্র কর্মের ছন্দোলীলায়। সে-গভীর অব্যাকৃত নয়। কেননা অব্যাকৃত শুধু অব্যক্ত উপাদান অথবা ব্যাকৃতির ঘনীভূত দশা মাত্র, অতএব তাকে দিয়ে কোনও-কিছুরই তত্ত্ব

মেলে না। তাই অব্যাকৃত না বলে সে গভীর-গহনকে বলি নির্বিশেষ।...অবশ্য তত্ত্ববিচারের একটা উলটা পথ আছে। সব-কিছুকে আমরা ভেঙে-ভেঙে দেখতে পারি। একটা অখণ্ডভাব দ্বারা বিধৃত আছে বলেই যে তারা টিকে আছে—এমন কথা নাও মানতে পারি। তার ফলে, মনের বিকল্পবৃত্তি দিয়ে বিশ্বের অন্তরালে পুঞ্জিত অমঙ্গল অন্যায় কুশ্রীতা অসারতা সন্তাপ তুচ্ছতা ও অনার্য-ভাবের একটা চরম ও পরম প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু এ-পথ ধরে আমরা পৌঁছব শুধু অবিদ্যার গহনগুহায়—কেননা খণ্ডভাবনা অবিদ্যারই ধর্ম। এতে দিব্য-পুরুষের দিব্যকর্মের সত্য পরিচয় মেলে না। যে-বিশেষের ভিতর দিয়ে নির্বিশেষের প্রকাশ, তার রহস্য আমাদের কাছে দুর্বোধ। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি বিশ্বের মধ্যে দেখে শুধু দ্বন্দ্ব ও প্রতিষেধের মেলা, পুঞ্জীভূত বিরোধের উত্তালতা। কিন্তু তাবলে কি আমাদের অপ্রবুদ্ধ প্রাথমিক দৃষ্টির সংকীর্ণতাই সত্য হবে? এই বিশ্বলীলা অলীক একটা মনোবিলাসের অসার বঞ্চনা মাত্র? ...তাছাড়া চরমতত্ত্বের মধ্যে অনপনেয় একটা বিরোধের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে, তা-ই দিয়ে বিশ্বতত্ত্বের সমাধান কি কখনও সম্ভব? মানুষের বুদ্ধি ভুল করে, যখন বিরোধের প্রত্যেকটি কোটিকে সে স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা দিতে চায়, অথবা একটি কোটির একান্ত প্রতিষেধ দ্বারা বিরোধের সমাধান করতে চায়। কিন্তু বিরোধের কোনও সমন্বয় না করে শুধু তাদের জোড় মিলিয়েই যদি কেউ তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরম মীমাংসা করে বসে, কিংবা আপাতবিরোধের অতীত কোনও তত্ত্বে যদি সত্য সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা নিহিত না দেখে—তাহলে এমন পঙ্গু সমাধানের প্রামাণ্যকে অস্বীকার ক'রে মানুষের সহজবুদ্ধি সত্যনিষ্ঠারই নির্ভীক পরিচয় দেয়।

অস্তিত্বের আদিবিরোধের সমন্বয় কি সমাধান কালের কল্পনাকে আশ্রয় করেও সম্ভব নয়। কালসম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান বা ধারণা, তা দিয়ে ঘটনার পরম্পরাকে মাত্র জানা চলে। কাল একটা উপাধি অথবা উপাধির প্রবর্তক, চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে তার প্রকারান্তর ঘটে—এমন-কি একই ভূমিতে আধার-ভেদে তার প্রকারভেদ আছে। অর্থাৎ আমাদের কাল নিরুপাধিক নয় বলে নিরুপাধিকের স্বগত-সম্বন্ধকে স্পষ্ট করে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব। সম্বন্ধ-তত্ত্বের সর্বতোমুখী স্ফুরণ ঘটে কালেই। তাই আমাদের মনোময় ও প্রাণময় চেতনা কালকে সম্বন্ধ-তত্ত্বের নিয়ামক বলে অনুভব করে। কিন্তু এ-অনুভবও একটা প্রতিভাস মাত্র, অতএব তাকে দিয়ে বিশ্বমূল তত্ত্বের সম্যক নিরূপণ হতে পারে না। উপহিত আর অনুপহিত বস্তুতে তফাত করে আমরা ভাবি, কালের বিশেষ-কোনও পর্বে অনুপহিত তত্ত্ব যেমন উপহিত হল, অনন্ত হল সান্ত—তেমনি আরেকটা বিশেষ তিথিতে তার সান্তভাব ঘুচেও যেতে পারে। বস্তু-তন্ত্রী মন নিয়ে জগদ্ব্যাপারকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কালের এই রূপটিই

আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু সত্তার অখণ্ড দর্শনে পারম্পর্যের এই দ্বন্দ্ব নাই। সেখানে দেখি, সান্ত আর অনন্তের সহভাবই তত্ত্ব—তারা ওতপ্রোত এবং অন্যোন্যাশ্রিত। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন, কালের প্রবাহে পরম্পরার ছন্দে একবার বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে, আরেকবার হচ্ছে প্রলয়। কিন্তু এ-পারম্পর্যের কল্পনা আমাদের প্রাকৃত পর্যায়বোধের একটা অতিকায় সংস্করণ মাত্র। তাহতে একথা প্রমাণ হয় না যে, একটা বিশেষ ক্ষণে অনন্ত-সন্মাত্রের নিখিল প্রসারে উপাধির চটুল বিক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে যায়, পরমার্থ-সৎ তখন প্রতিষ্ঠিত হন অনুপহিত স্বভাবে। তারপর আরেকটা তিথিতে আবার শুরু হয় উপাধির বাস্তব বা অবাস্তব লীলায়ন। সম্বন্ধ-তত্ত্বের আদিম স্ফুরণ ঘটে আমাদের মনোময় কালকলনার বাইরে, কালাতীতের দিব্যধামে অথবা অখণ্ড-শাশ্বত মহাকালে—যার মধ্যে খণ্ডভাব ও পারম্পর্য আমাদেরই মানসপ্রত্যয়ের বিকল্পনায় উপচরিত হয়।

ওই মহাকালের মহাপারাবারে জগতের সকল ধারা এসে মিশেছে। বিশ্বের সকল তত্ত্ব, সত্তার সকল নিত্যবিভাব (অখণ্ড-সন্মাত্রে আনন্ত্য যেমন নিত্য, তেমনি সান্তভাবও নিত্য) অনাদি সম্বন্ধের স্ব-তন্ত্র ব্যঞ্জনা নিয়ে একরস হয়ে আছে অবিবিক্ত ব্রহ্মসদ্‌ভাবের নির্বিশেষ মহিমায়। ওই স্বরূপস্থিতি হতেই আমাদের অন্নময় বা মনোময় জগতে তারা প্রাকৃত সম্বন্ধের দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা আরও-কোনও নিম্নক্রমের বিবর্তনে নেমে এসেছে। একথা সত্য নয় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে বস্তুত বিশেষ ভাবনার কোনও সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু বিশেষ-কোনও লগ্নে সহসা তাঁর স্ব-ভাবে এল বিপর্যয়—অমনি বাস্তব অথবা অবাস্তব বিশেষণে আপনাকে তিনি বিশেষিত করলেন, এক অনির্বচনীয় মায়ার খেলায় এক হলেন বহু, নিরুপাধিক ব্রহ্ম নেমে এলেন উপাধির মধ্যে, নির্গুণ গুণাঙ্কুরে হলেন রোমাঞ্চিত। অবিভক্তকে বিভক্ত করে দেখা মনোধর্মের অনুকূল। তাই আমাদেরই মন সবিশেষে-নির্বিশেষে সগুণে-নির্গুণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। দ্বন্দ্বের দুটি কোটি নিশ্চয় অলীক নয়; কিন্তু তাদের তত্ত্বকে আলাদা করে দেখলে, কিংবা দুয়ের মাঝে অসমাধেয় বিরোধের একটা দেয়াল খাড়া করলে তাদের সত্য পরিচয় মেলে না। কারণ, ব্রাহ্মী স্থিতির সর্বগত দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বভাব মিথ্যা নয়—মিথ্যা তার বিরোধ বা বিবিক্ততা। শুধু-যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনের খণ্ডবৃত্তিতে বিবিক্তদর্শনের এই দুর্বলতা আছে, তা নয়। আমাদের অধ্যাত্ম-অনুভবেও এইধরনের একটা অন্যব্যাবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়, যখন অনুদার চিত্তের বিভাজনবৃত্তিকে আশ্রয় করে অধ্যাত্মপথের অভিযান শুরু হয়। যে-সত্য বুদ্ধির অতীত, তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করতে দার্শনিকের বিবেক-বিচার অবশ্যই প্রয়োজন—কেননা তা না হলে অবিবেকী মনের আবিল দৃষ্টির ঘোর কাটিয়ে বস্তুর স্বরূপদর্শন সম্ভব হয়

না। কিন্তু বিবেকদৃষ্টিকেই শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকলে, যা ছিল পথচলার প্রথম অবলম্বন তাকেই করা হয় পায়ের বেড়ি। অধ্যাত্মসাধনায় আপাতবিরোধী আলাদা-আলাদা পথে চলবার প্রয়োজনও আছে—কেননা মানুষ মনোময় জীব বলে অবাঙ্‌মানসগোচর সত্যের উদার পরিধিকে একবারেই সে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারে না। কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন উপলব্ধির ভেদ হতে বুদ্ধির কারসাজিতে সত্যের স্বরূপলক্ষণ নিয়েও গোঁড়ামি করি—যখন বলি, নির্গুণের উপলব্ধিই সত্য, আর-সব মায়ার খেলা মাত্র; কিংবা ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপের উপলব্ধিকেই সত্য মেনে সাধনার রাজ্য হ'তে নির্গুণ ভাবকে নির্বাসিত করি। সত্যদর্শী জানেন, মহাপুরুষদের এ-দুটি উপলব্ধি আপন-আপন অধিকারে যেমন সপ্রমাণ, তেমনি বিবিক্তভাবনায় পরস্পরের কাছে অপ্রমাণ। কিন্তু বস্তুত তারা একই পরমার্থসতের দুটি দিকের অনুভব। অতএব তাদের ব্যক্তিভাবের এবং আধারভূত স্বরূপ-সত্যের পূর্ণবিজ্ঞানের জন্য দুটি দিকেরই উপলব্ধি প্রয়োজন। তেমনি এক আর বহু, সান্ত আর অনন্ত, বিশ্বাত্মক আর বিশ্বোত্তীর্ণ, ব্যষ্টি আর বিরাটের বেলাতেও। তাদের প্রত্যেকটি কোটি স্ব-ভাবে থেকেও নিবিষ্ট রয়েছে অপর-ভাবে। অতএব উভয়কে জেনে উভয়ের আপাতবিরোধকে না ছাপিয়ে গেলে তাদের কাউকেই পুরাপুরি জানা যায় না।

দেখছি, একই অদ্বয়তত্ত্বের তিনটি বিভাব আছে—বিশ্বোত্তীর্ণ, বিশ্বাত্মক এবং ব্যষ্টি। ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত আকারেই হ'ক, প্রত্যেক বিভাবে আছে আর-দুটি বিভাবের সমাবেশ। বিশ্বোত্তীর্ণ, অনুত্তর স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তাঁর কাল-কলনার আধারস্বরূপ আর-দুটি বিভাবের প্রশাস্তা হয়ে আছেন। তাঁকে বলি দিব্য-পুরুষ বা শাশ্বত সর্বগত সর্ববিৎ সর্বেশ্বর সর্বানুস্যূত ঈশ্বরচেতনা—যিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠান অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা। এই পৃথিবীতে ব্রহ্মের ব্যষ্টি-বিভাবের চরম প্রকাশ মানুষে। মানুষই অনুত্তরের সেই সন্ধিচেতনা, যাকে আশ্রয় ক'রে ফোটে তাঁর আত্মবিভাবনার পরিস্পন্দ—অবিদ্যা ও বিদ্যার দুটি কোটিতে ব্রাহ্মী চেতনার সংবৃত্তি ও বিবৃত্তির লীলা। মনুষ্যব্যক্তি বা জীব আত্মজ্ঞানের সাধনায় আপন চেতনায় বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মকের পরম সাযুজ্য অনুভব করে, সর্বভূতমহেশ্বর ও সর্বভূতের পরম তাদাত্ম্য এবং সেই বিজ্ঞানের বীর্যে জীবনকে করে চিন্ময়। তার এই সামর্থ্যেই ব্যষ্টি-আধারে মূর্ত হয়ে ওঠে ব্রহ্মের দিব্যভাবনার প্রেতি। শুধু একটি জীবে নয়, সর্বজীবে এই দিব্য-জীবনের উন্মেষ তাঁর স্পন্দবিভূতির একমাত্র লক্ষ্য। জীবত্বের সদ্‌ভাব ব্রহ্মের কোনও আত্মভাবে কল্পিত একটা ভ্রান্তি নয়। সে-ভ্রান্তি যেদিন ধরা পড়ে, সেইদিন জীবের মুক্তি—এও তত্ত্বের দর্শন নয়। কারণ ব্রহ্মের স্বগত-সংবিৎ অথবা তার সগোত্র কোনও প্রত্যয়ের পক্ষে আত্মস্বরূপের সত্য ও সামর্থ্য না জানা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব

সে-অজ্ঞানের প্ররোচনায় নিজের 'পরে একটা মিথ্যার আরোপ ক'রে আবার তার সংশোধন করা, কিংবা যে-পথের মায়া কাটাতেই হবে একদিন—সেই অসম্ভবের পথে ঝাঁপিয়ে পড়া। এও সত্য নয় যে, জীবভাব দেবলীলার একটা গৌণ সাধন মাত্র এবং সে-লীলার একমাত্র তাৎপর্য সুখ-দুঃখের নাগরদোলায় জীবের অন্তহীন আবর্তন—যে-আবর্তনে শুধু কদাচ-কখনও দু-একটি জীবের এই অবিদ্যাচক্র হতে ছিটকে পড়া ছাড়া উত্তরায়ণের কোনও প্রত্যাশা নাই। ভাগবতী লীলার এই সর্বনাশা নিষ্করুণ পরিচয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতাম, যদি জানতাম মানুষের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবার সামর্থ্য নাই, আত্মোপলব্ধির সাধনায় ধীরে-ধীরে এই লীলাস্বাদকে ব্রহ্মানন্দের লোকোত্তর রসায়নে রূপান্তরিত করবার বীর্য নাই। বরং জানি, জীবের এই সামর্থ্য আছে বলেই তার সত্তারও জগতে একটা মূল্য আছে। তাই লীলার নিগূঢ় আকূতি ও চরম তাৎপর্য ফুটে উঠেছে জীব ও বিশ্বের সহস্রদল উন্মেষণে। তাদের মধ্যে থরে-থরে লীলায়িত হয়ে উঠছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দীপ্তি শক্তি ও আনন্দ—যা শাশ্বত মহিমায় নিত্য স্ফুরিত হয়ে আছে লোকোত্তর দিব্যধামে এবং জীব ও শিবের বহিশ্চর প্রতিভাসের পিছনে রয়েছে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু আত্মবিনাশে নয়—আত্মরূপান্তরে এবং আত্মসম্ভাব ও সম্বন্ধ-তত্ত্বের পরিপূর্ণ উল্লাসেই তাদের মধ্যে এই লীলার স্ফুরণ ঘটছে। নইলে কেনই-বা শুদ্ধ-সন্মাত্রে জীব ও বিশ্বের আবির্ভাব হল ? জীবের আধারে শিবের উন্মেষই এ-রহস্যের তত্ত্ব। তাই তো তিনি জীবের মধ্যে গুহাহিত হয়ে আছেন। আর তাইতে তাঁর আপনাকে ফুটিয়ে তোলবার আকূতিতে হবে জগৎজোড়া বিদ্যা-অবিদ্যার এই জালবুনানির গ্রন্থিমোচন।

চতুর্থ অধ্যায়

দিব্য ও অদিব্য

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্‌
যাথাতথ্যতোঽর্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

ঈশোপনিষৎ ৮

কবি মনীষী স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ তিনি—যথাযথ অর্থের বিধান করেছেন শাশ্বত কালের তরে।
—ঈশা উপনিষদ ৮

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।
মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ॥

গীতা ৪।১০; ১৪।২

জ্ঞানের তপস্যায় পূত হয়ে অনেকেই পেয়েছে আমার ভাব।...তারা পেয়েছে আমার সাধর্ম্য।
—গীতা (৪।১০; ১৪।২)

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। **কেন ১।৫**

তাকেই জান ব্রহ্ম বলে—এখানে মানুষ উপাসনা করে যার তাকে নয়।
—কেন (১।৫)

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা।...
সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥

কঠোপনিষৎ ৫।১২, ১১

এক, বশী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি।...সর্বলোকের চক্ষু সূর্য যেমন বাইরের চাক্ষুষ দোষে হয় না লিপ্ত, তেমনি এই সর্বভূতান্তরাত্মা লিপ্ত হন না জগতের দুঃখে।
—কঠ (৫।১২,১১)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে...তিষ্ঠতি।

গীতা ১৮।৬১

ঈশ্বর আছেন সর্বভূতের হৃদয়দেশে। —গীতা (১৮।৬১)

বিশ্ব এক শাশ্বত অনন্ত সর্বসতের বিভূতি। সর্বভূতের অন্তরে রয়েছেন সেই দিব্য-পুরুষ। আত্মস্বরূপে, সত্তার নিগূঢ় গহনে আমরাও সেই তৎ-স্বরূপই। আমাদের জীবচেতনায় গুহাহিত হয়ে আছেন যে-চৈত্য-পুরুষ, ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্মচৈতন্যের সনাতন অংশ তিনি। তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও বলেছি,

প্রকৃতি-পরিণামের পর্যবসান **দিব্য জীবনে**। তাইতে মনে হতে পারে, আমাদের বর্তমান জীবন আর তার অধস্তন স্তরে যা-কিছু আছে, সবই বুঝি অদিব্য। কথাটা কিন্তু স্বতোবিরোধের মত শোনায়। তাই অভীপ্সিত দিব্য-জীবন আর বর্তমানের অদিব্য-ভূমির মাঝে একটা ভেদের রেখা না টেনে, বরং একই দিব্য-বিভাবনার নীচের ধাপ হতে উপরের ধাপে আমরা উঠছি—এই কথা বলাই বোধ হয় যুক্তিসংগত। বাইরে থেকে প্রকৃতিকে দেখে যা মনে হয়, তাকে চূড়ান্ত না বলে তার মর্মসত্যে যদি অবগাহন করি, তাহলে এ-ই যে প্রকৃতি-পরিণামের স্বরূপ, এই নিয়তিই যে আমাদের প্রগতিপথের দিশারী—একথা মনে হবে অনস্বীকার্য। বিশ্বতশ্চক্ষুর যে নিষ্পক্ষ দর্শনে সুখ-দুঃখ শিব-অশিব ও বিদ্যা-অবিদ্যার লৌকিক দ্বন্দ্ব নাই, আছে শুধু অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চেতনা ও আনন্দের অকুণ্ঠ উল্লাস, তারও মধ্যে প্রকৃতির এই দিব্যরূপটিই ভাসবে। অথচ তত্ত্বদৃষ্টির কথা ছেড়ে দিয়ে ব্যাবহারিক দৃষ্টি নিয়ে যদি জগতের দিকে তাকাই, তাহলে একটা বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে দিব্য আর অদিব্যে ভেদের রেখা টানতেই হয়।...এই নিয়ে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়, এর পর তার যথার্থ মূল্যনিরূপণই হবে আমাদের কাজ।

একদিকে আত্মসংবিতের জ্যোতির্ময় বীর্যে সমুজ্জ্বল বিদ্যার জীবন, আরেকদিকে এই জগতে অনাদি-অচিতির তমিস্রা হতে কৃচ্ছ্র ও মন্থর গতিতে উদীয়মান আপাতমূঢ় কার্পণ্যোপহত অবিদ্যার জীবন—এ-দুয়ের মাঝে যে মৌলিক ভেদ, সেই ভেদ দিব্য এবং অদিব্য জীবনেও। অচিতিকে আশ্রয় করে যে-জীবনই গড়ে উঠুক না কেন, তার মধ্যে অপূর্ণতার একটা বনেদী ছাপ আছে। সার্থকতার অন্ধতৃপ্তি তার মধ্যে থাকলেও পূর্ণতা কি সৌষম্যের প্রসাদ নাই, আছে শুধু অগুনতি বৈষম্যের একটা জোড়াতাড়া। পক্ষান্তরে, যদি আত্মজ্ঞান ও আত্মবীর্যের এতটুকু সৌষম্যকে আশ্রয় করে নির্ভাঁজ প্রাণময় বা মনোময় জীবন গড়ে ওঠে, তার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে কিন্তু ফোটে একটা নিটোল পূর্ণতার ভাব। বৈষম্য ও অপূর্ণতার একটা কলংকতিলক নিত্য বয়ে বেড়ানো—এই হল অদিব্যতার পরিচয়। কিন্তু দিব্য-জীবনের অংকুরেই দেখা দেয় পূর্ণতা ও সৌষম্যের একটা দ্যোতনা এবং প্রগতির পর্বে-পর্বে সেই অস্ফুট সৌষম্য তিলে-তিলে ফুটে ওঠে সহস্রদল মহিমায়। অমৃতনিষেকে সঞ্জীবিত তার মূল—অতএব পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে সহজের ছন্দে উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অনুত্তর তুঙ্গতার অভিমুখে, তার অতিসূক্ষ্ম ও পরিশুদ্ধ ঐশ্বর্যের বর্ণমঞ্জরীতে ছেয়ে যায় অস্তিত্বের মহাকাশ। অদিব্য ও **দিব্য জীবনের** তফাত বুঝতে হলে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার সকল ঘাটের খবর নিতে হয়। কিন্তু সাধারণত আমরা তফাতের বিচার করি মানুষের বুদ্ধি নিয়ে—যে-বুদ্ধির 'পরে জীবনের সমস্যা গুরুভার হয়ে চেপে আছে, যাকে ঘিরে আছে দৈনন্দিন

ব্যবহারের সহস্র দ্বন্দ্ব ও জটিলতা। তাই আমাদের দৃষ্টিতে সব ছাপিয়ে ভাল-মন্দ আর সুখ-দুঃখের তফাতটা বড় হয়ে ওঠে—কেননা তাকে আশ্রয় করেই যত দ্বন্দ্ব সঙ্কুল হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনে। অতএব বুদ্ধি দিয়ে যখন বুঝতে চাই সর্বভূতে দিব্যসত্তার আবেশ, দিব্যভাব হতে জগতের বিসৃষ্টি এবং দিব্য প্রশাসনে তার বিধৃতি ও প্রগতি—তখন আমাদের প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ায় বিশ্ব জুড়ে অনর্থের অস্তিত্ব, সন্তাপের অনতিবর্তনীয় অভিশাপ, প্রকৃতির গৃহস্থালিতে দুঃখ-শোক ও আধি-ব্যাধির অবাঞ্ছিত বাহুল্য। জগদ্ব্যাপী এই নিষ্ঠুরতার অভিনয় দেখে বুদ্ধি অভিভূত হয়ে পড়ে। এ-জগতের মূলে যে কোনও দিব্যভাবনার প্রেতি ও প্রশাসন রয়েছে, এর অণুতে-অণুতে যে আছে এক সর্বগত সর্বদর্শী সর্বনিয়ামক ব্রাহ্মী চেতনার আবেশ—মানুষের এই সহজ প্রত্যয়ও তখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। মানুষী বুদ্ধি দিয়ে অনেক সমস্যারই সহজ ও সুন্দর সমাধান হয়—তাতে আত্মপ্রসাদেরও প্রচুর অবকাশ মেলে। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধির মাপকাঠিতে সব সমস্যার সমাধান হবে—এতখানি ঔদার্য তার কাছে আশা করা অন্যায়। তার দৃষ্টি যতই উদার হ'ক, মানুষ-ভাবের সংকীর্ণতা হতে তা কখনও মুক্ত নয়। বিশ্বতশ্চক্ষুর দৃষ্টিতে অনর্থ আর সন্তাপ জগতের একটা বৈশিষ্ট্য হলেও, তারাই তার একমাত্র গলদ নয় কিংবা আসল সমস্যার জড় ওইখানেই নয়। শুধু অনর্থ আর সন্তাপের মধ্যে জগতের অপূর্ণতার সকল নিশানা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। দিব্যভাব হতে প্রচ্যুতিই যদি পাপজগতের মূল হয়ে থাকে, তাহলেও তার জন্য কল্যাণ ও সুখস্বরূপ হতে মানুষের অধ্যাত্ম এবং দৈহ্য সত্তার বিচ্যুতি কিংবা অনর্থ ও সন্তাপের বেদনাকে পরাভূত করবার স্বাভাবিক অসামর্থ্যই শুধু দায়ী নয়। আমাদের ধর্মবুদ্ধি কল্যাণ খোঁজে, হৃদয় খোঁজে আত্মসুখ। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে শুধু ওই-দুটির অভাবই কি আমাদের পীড়িত করে? কল্যাণ ও সুখ ছাড়া আর-কোনও দৈবী সম্পদ কি নাই? সত্য শ্রী জ্ঞান বীর্য সর্বাত্মভাব—এরাও তো দৈবী সম্পদ, এরাও তো দিব্য-জীবনের উপাদান। অথচ কার্পণ্যের বদ্ধমুষ্টি হতে স্খলিত হয়ে এ-সম্পদের কতটুকু আমাদের ভোগে এসেছে? চিন্ময়ী প্রকৃতির অনুত্তর বীর্যের কতটুকু অধিকার আমরা পেয়েছি?

অতএব জীব ও জগতের অদিব্য বৈকল্যের হেতুকে শুধু ক্ষুণ্ণ-ধর্মবোধ-জনিত অনর্থ অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সন্তাপের বেদনাতে আবদ্ধ রাখা চলে না। এ-দুটি সমস্যা ছাড়া বিশ্বরহস্যের মধ্যে আরও অনেক জটিলতা আছে। বলা চলে, অনর্থ আর সন্তাপ এক মূল-কাণ্ডেরই দুটি পরিপুষ্ট শাখা মাত্র। এই মূল-কাণ্ডকে বলতে পারি পূর্ণতাহানি। জীবনসমস্যার সমাধান করতে হলে চাই এরই পূর্ণায়ত একটা আলোচনা। খুঁটিয়ে দেখলে বুঝি, আমাদের মধ্যে

পূর্ণতাহানির স্বরূপ ফোটে প্রথমত আধারে নিহিত দিব্যভাবের সঙ্কোচ বা পরিচ্ছেদে, যাতে তাদের স্বভাবের অপলাপ ঘটে। তারপর বহুশাখ কৌটিল্যের বিসর্পণে দেখা দেয় একটা প্রতীপ আচার, স্বরূপ-সত্যের আদর্শ হতে চ্যুত মিথ্যা একটা ব্যভিচার। প্রাকৃত মন সত্যের সে সহজ রূপ চেনে না—শুধু কল্পনায় তার আভাস পায়। তাই সত্যের ব্যভিচারকে সে মনে করে—হয় আত্মার দিব্যস্বভাব হতে অবস্খলন, নয়তো এক অসাধ্য সম্ভাবনার প্রতি নিষ্ফল আকূতি। কেননা, যে-সত্য শুধু কল্পলোকের বস্তু, তাকে বাস্তবে পাওয়া যাবে কি করে? অতএব মানতে হবে, হয় আমাদের অন্তর-পুরুষ ভ্রষ্ট হয়েছেন এক মহাবিপুল চেতনা বিজ্ঞান আনন্দ, শক্তি প্রীতি শ্রী, বীর্য কল্যাণ সামর্থ্য ও সৌষম্যের স্বরূপস্থিতি হতে; নয়তো আমাদের স্বভাবের সাধনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এক নিদারুণ ব্যর্থতার নিয়তি। তাই যাকে দিব্য ও কাম্য বলে সহজে অনুভব করি, তাকে পাবার শক্তি আমাদের নাই। এই চ্যুতি বা অশক্তির নিদান খুঁজতে গিয়ে দেখি, আমাদের আধারে—চেতনা শক্তি ও অনুভবের মর্মমূলে নয়, কিন্তু তার বহিশ্চর ব্যাবহারিক প্রবৃত্তিতে—আছে ব্রাহ্মী সত্তার অখণ্ডতাকে খণ্ডিত বা ত্রুটিত করে দেখবার একটা নিরূঢ় সংবেগ। অপরিহার্য অর্থক্রিয়াকারিতার বশে এই খণ্ডভাবনাই সঙ্কুচিত করে দিব্য চেতনা ও বিজ্ঞানের, শ্রী ও আনন্দের, বীর্য ও সামর্থ্যের, সৌষম্য ও কল্যাণের স্বতঃস্ফূর্ত ঔদার্যকে। সত্তার নিটোল পূর্ণতা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। তখন এইসব দৈবী সম্পদের উদার মহিমার প্রতি আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়, তাদের সাধনায় দেখা দেয় শক্তির বৈক্লব্য, চেতনায় তাদের অনুভব হয় খণ্ডিত, বীর্য ও সংবেগের দীনতায় অপকর্ষিত ও অনুজ্জ্বল। চিন্ময়-স্বভাবের তুঙ্গ-শিখর হতে অবস্খলনের লক্ষণ অথবা অচিতির অসাড় তটস্থ বৈচিত্র্যহীনতা হতে চেতনার কুণ্ঠিত উদয়নের ছাপ তাদের মধ্যে সর্বত্র সুস্পষ্ট। অনুভবের ঊর্ধ্বলোকে যে-তীব্রসংবেগ সহজ ও স্বাভাবিক, আমাদের মধ্যে হয় তা অবলুপ্ত নয়তো তার শাণিত দীপ্তি ম্লান হয়ে মিশে আছে পার্থিব জীবনের সাদা-মাটার সঙ্গে। শুধু তা-ই নয়। খণ্ডভাবের এই বঞ্চনা হতে পরিণামে দেখা দেয় দৈবী সম্পদের একটা বিকৃত বা প্রতীপ আচার। আমাদের সঙ্কীর্ণ মানসে অচেতনা ও অনৃতচেতনার কলুষ নেমে আসে, অবিদ্যার আঁধারে ছেয়ে যায় সকল আধার। পঙ্গু সঙ্কল্প ও অপূর্ণ জ্ঞানের দুরুপযোগে বা প্ররোচনায়, হীনবীর্য চিতি-শক্তির মূঢ় প্রবর্তনায় অথবা স্বভাবের ক্লীবোচিত দীনতায় আধারে জেগে ওঠে দৈবী সম্পদের বিরুদ্ধ যত বৃত্তি—দেখা দেয় অশক্তি অসাড়তা অনৃত প্রমাদ দুঃখ শোক দুষ্কৃত বৈষম্য ও অনর্থের ভিড়। তাছাড়া আমাদের আধারেরও কোন্ গহনগুহায় নিহিত আছে এই খণ্ডিত অনুভবের প্রতি একটা আসক্তি, জীবনের খণ্ডপ্রবৃত্তির প্রতি একটা দুরাগ্রহ। হয়তো

জাগ্রৎ-চেতনায় তাদের প্রকাশ দুর্লক্ষ্য, আধারের উৎপীড়িত অংশ হয়তো প্রতি-মুহূর্তে তাদের নিরসন চাইছে। কিন্তু তবু এইসমস্ত দুর্ভাবের প্রতি অপরা প্রকৃতির একটা গোপন সায় আছে, যার জন্যে এই অস্বস্তির উচ্ছেদ বা প্রত্যাখ্যান ও নিরাকরণ অসম্ভব হয়। চিৎ-শক্তি ও আনন্দের প্রেতি যখন সকল বিসৃষ্টির মর্মমূলে, তখন প্রকৃতির সংকল্প ও পুরুষের অনুমতি ছাড়া কিছুই আধারে টিকতে পারে না। অতএব এই অস্বস্তিকে জিইয়ে রেখে আধারের কোনও অংশ সুগভীর একটা তৃপ্তি অনুভব করে—এখন হ'ক না সে-তৃপ্তি মনেরও অগোচর কোনও ক্লিন্ন রুচির কুটিল বিলাস।

সমস্ত বিসৃষ্টিকে, এমন-কি তথাকথিত অদিব্যকেও দিব্য বিভূতি বলি যখন, তখন বিশ্বের প্রতিভাসকে অদিব্য বলে অনুভব করলেও তার তত্ত্বরূপটি যে দিব্যই—এমন-একটা আশ্বাসের ভাব আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন থাকে। কথাটাকে সহজে বুদ্ধিগম্য করবার জন্য বলতে পারি : ব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন, অনন্ত আনন্দময়। ব্যাবহারিক জগতের সান্ততায় তাঁর আনন্ত্য ব্যাহত হয় না। আমাদের পাপ ও অনর্থে তাঁর নিরঞ্জন স্বভাব বিদ্ধ হয় না। আমাদের দুঃখ ও সন্তাপে তাঁর আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয় না। তাঁর পূর্ণতার হানি হয় না আমাদের চেতনা জ্ঞান সংকল্প ও অখণ্ডভাবনার বৈকল্যে। উপনিষদের কোথাও-কোথাও দিব্য-পুরুষের বর্ণনায় আছে : এক অগ্নিই যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে-রূপে হয়েছেন প্রতিরূপ, এক সূর্য যেমন অপক্ষপাতে সবাইকে উদ্ভাসিত করেও স্পৃষ্ট হন না আমাদের চক্ষুদোষের দ্বারা, তেমনি তাঁর অনির্বচনীয় মহিমা।...কিন্তু শুধু তত্ত্বের উদ্দেশ এখানে পর্যাপ্ত নয়, চাই তার সমীক্ষা। যিনি নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন অনন্ত ও আনন্দময়, কি করে তিনি অপূর্ণতা মালিন্য সংকোচ মিথ্যা সন্তাপ ও অনর্থকে শুধু সয়ে যান না—আবার প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর বিসৃষ্টিতে তাদের জিইয়ে রাখেন, কেবল তত্ত্বার্থের সূত্র আউড়িয়েই সে-সমস্যার মীমাংসা হয় না। তত্ত্বকথায় পাই শুধু দ্বন্দ্বের পরিচয়, কিন্তু পাই না তার সমাধান।

অস্তিত্বের এই বিরুদ্ধ দুটি প্রতিভাসকে কেবল মুখামুখি দাঁড় করিয়ে রাখলে সহজেই সিদ্ধান্ত হতে পারে—এদের কোনও সমাধান বুঝি সম্ভব নয়। অতএব আমাদের একমাত্র উপায় হল, নিরঞ্জন ব্রহ্মসদ্‌ভাবের উপচীয়মান আনন্দকে যথাশক্তি আঁকড়ে থাকা; আর যতক্ষণ অদিব্য জগতের অসামকে দিব্যভাবের বৃহৎ-সামে আচ্ছন্ন না করতে পারি ততক্ষণ কোনমতে তাকে সয়ে যাওয়া।...অথবা সমাধান না খুঁজে আমরা খুঁজতে পারি নিষ্কৃতির পথ। বলতে পারি ঃ গুহাহিত ব্রহ্মসদ্‌ভাবই সত্য। আর বাইরের জগতের বৈষম্য অনির্বচনীয় অবিদ্যার কল্পিত একটা বিভ্রম বা মিথ্যা প্রতিভাস। অতএব বিসৃষ্টির মিথ্যাজাল এড়িয়ে কি করে গুহাহিত তত্ত্বের সত্যে পৌঁছনো যায়—এই হল

আমাদের সাধনা।...অথবা বৌদ্ধের মত বলতে পারি : এর মধ্যে সমস্যা কোথায় যে তার সমাধান খুঁজতে হবে? জগৎ অনিত্য এবং অপূর্ণ—এই তো দেখছি একমাত্র তত্ত্ব। এছাড়া আত্মা বা ব্রহ্ম বলে তো কিছুই নাই। আত্মা ঈশ্বর ব্রহ্ম—সমস্তই আমাদের চেতনার বিভ্রম শুধু। অতএব মোক্ষের একমাত্র পন্থা হল ক্ষণভঙ্গুর নিরন্ত প্রবাহের মধ্যে অবভাসিত বিজ্ঞান-সন্তান ও কর্ম-সন্তানের কল্পনাকে নিরস্ত করা। এই নিষ্ক্রমণের পথ দিয়ে আমরা আত্মভাবের পরিনির্বাণে পৌঁছই। আত্মার নির্বাণে বিশ্বসমস্যারও মহানির্বাণ ঘটে।... এও একটা পথ বটে, কিন্তু একেই একমাত্র পথ বলা যায় না। আবার আগের সমাধানগুলিকেও খুব সন্তোষজনক মনে হয় না। বহির্জগতের কোলাহলকে চিত্তের বহিরঙ্গ-প্রত্যয় ভেবে অন্তর্মুখী চেতনা হতে ছেঁটে ফেলে পূর্ণ নিরঞ্জন ব্রহ্মসদ্ভাবকে যদি একমাত্র তত্ত্ব বলে মানি, তাহলে ব্যক্তির পক্ষে গুহাহিত ব্রাহ্মী স্থিতির আনন্দময় নৈঃশব্দ্যে তলিয়ে গিয়ে অন্তর্জ্যোতিতে উল্লসিত চেতনায় অবস্থান করা নিশ্চয় সম্ভব হয়। শাশ্বত পরমার্থ-সতের মধ্যে একান্ত অন্তরাবৃত্ত আত্মসমাধান খুবই সম্ভব—এমন-কি তাঁর রসে নিজেকে সম্পূর্ণ তলিয়ে দিয়ে বিশ্বের কোলাহলকে লুপ্ত বা স্তব্ধও করতে পারি। কিন্তু তবু আমাদের সত্তার গভীরে কোথায় যেন অখন্ড-চেতনার জন্যে একটা আকূতি আছে, পূর্ণ সংবিৎ আনন্দ ও বীর্যের দিকে দুর্নিবার একটা প্রেতি আছে। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি পরাবর ব্রহ্মসদ্ভাবের জন্য সর্বত্র সঞ্চারিত নিগূঢ় একটা এষণা। যেসব সমাধানের উল্লেখ করেছি, তাদের দিয়ে অখন্ড সত্তা সম্যক জ্ঞান ও সর্বার্থসাধক সংকল্পের জন্যে এই নিরন্ত ব্যাকুলতার পূর্ণ তর্পণ কোনকালেই হয় না। জগৎকে যতক্ষণ সমূল সদায়তন সৎপ্রতিষ্ঠ বলে অনুভব না করছি, ততক্ষণ সৎ-স্বরূপের বিজ্ঞানও অখন্ড হয় না—কেননা এ-জগৎও যে তিনিই। ব্রহ্মস্বরূপেই এ-জগৎ চেতনায় ভাসবে এবং চিদ্বীর্যের আবেশে ব্রহ্মরসেই জারিত হবে। তবেই না বলতে পারব তাঁকে আমরা পুরাপুরি পেলাম।

সমস্যার হাত হতে বাঁচবার আরেকটা পথ আছে। ব্রহ্মসদ্ভাবকে তত্ত্বত মেনে নিয়েও আমরা সৃষ্টির দিব্যতাকে সমর্থন করতে পারি—পূর্ণতা সম্পর্কে মানবীয় সংস্কারকে সঙ্কুচিত মনের বৃত্তিজ্ঞানে সংশোধন অথবা প্রত্যাখ্যান ক'রে। বলতে পারি : নিখিলের অন্তর্যামী চিৎসত্তা যিনি, কেবল তিনিই যে অখন্ড পূর্ণস্বরূপ তা নয়। তাঁর সেই পূর্ণতার সখন্ড চিন্ময়-বিভাব ফুটে উঠেছে ভূতে-ভূতে—তাদের বীজভূত ভাবের সমর্থপ্রকাশে, অখন্ড বিসৃষ্টির মধ্যে তাদের যথাযোগ্য স্থানটি বেছে নেবার জন্যে। স্বরূপত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই চিন্ময়, কেননা প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্মের কোনও-না-কোনও ভাব বাস্তবের রূপ ধরছে, প্রকাশের বিশেষ-একটি ভঙ্গিকে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠছে ব্রহ্মেরই

সত্তা বিজ্ঞান ও সংকল্প। প্রত্যেকের মধ্যে সর্বতোভাবে তার আত্মপ্রকৃতির অনুকূল নিগূঢ় বিজ্ঞান শক্তি ও আনন্দের বিশেষ-একটা প্রকার ও পরিমাণ আছে। গূঢ় সংকল্পের একটা স্বগত সংবেগ, আত্মার একটা স্বয়ম্ভূ বীর্য, আত্মপ্রকৃতির একটা সহজ ধর্ম, একটা অলৌকিক তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা প্রত্যেকের মধ্যে অনুভবের যে-ছক বেঁধে দিয়েছে, আপন-আপন কর্মপ্রবৃত্তিতে তারা তারই অনুবর্তন করে চলেছে। অতএব তাদের প্রতিভাসে ফুটে ওঠে অন্তর্গূঢ় স্ব-ধর্মের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা। কেননা, ওই স্ব-ধর্মের সঙ্গেই সবার সুর বাঁধা, ওই উৎস হতে উৎসারিত হয়ে তারই আকৃতির ছন্দে তারা চলে আধারের অন্তর্যামী দিব্য প্রজ্ঞা ও ক্রতুর অকুণ্ঠ প্রশাসনে। এমনি করে শুধু স্ব-ধর্ম সম্পর্কে নয়, সমষ্টি-ধর্মের বিচারেও তারা অখন্ড ও দিব্যধর্মী—কেননা সমষ্টির মধ্যে তারা নিজের যথাযোগ্য স্থানটিই অধিকার করে আছে। সমষ্টির কাছেও তারা নিরর্থক নয়, বরং তারা স্বস্থানে আছে বলেই ভূত-ভব্যের নিটোল ছন্দে বৃহৎ-সামের অপূর্ব মূর্ছনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে বিশ্ববীণার তারে-তারে—খন্ডের যথাযথ বিন্যাসে সহস্রদল সুষমায় ফুটে উঠছে অখন্ডের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। এই বিশ্বে দিব্য-পুরুষের কোন্ ভাব ও আকৃতির রূপায়ণ, তার অখন্ড পরিচয় পাই না বলে বিশ্বকে আমরা ভাবি অদিব্যধর্মী, তার কত-কিছুকেই অবিচারে লাঞ্ছিত করি দিব্যভাবনার প্রতিকূল বলে। খন্ডদর্শনে অভ্যস্ত বলে আমরা অংশকে অংশীর মর্যাদা দিই, বাইরে থেকে ঘটনার বিচার করি অন্তরঙ্গ-ভাবের খবর না নিয়ে। তাইতে আমাদের বিচার হয় সংস্কারদুষ্ট, অনাদি প্রমাদের প্রবর্তনায় কলঙ্কিত। বিবিক্তভাব নিয়ে কোনও বস্তুই পূর্ণ হতে পারে না, কেননা বিবিক্তভাব আমাদের একটা মনোবিকল্প বা বিভ্রম মাত্র। পূর্ণতার সত্য রূপটি ফুটে ওঠে দিব্য সৌষম্যের সমগ্রতাকে আশ্রয় করেই।

এ-যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, তা মানি। কিন্তু সমস্যার পূর্ণ সমাধান এতেও হয় না। মানুষী দৃষ্টি নিয়ে মানুষী চেতনার কাছেই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু উপরের যুক্তিতে মানুষ-ভাবের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। এক্ষেত্রে তথাকথিত সৌষম্যের ছবিটিও পূর্ণায়ত নয়, কেননা তার মধ্যে অনর্থ ও অপূর্ণতার বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের অতি তীব্র বেদনাবোধকে নস্যাৎ করবারই চেষ্টা করা হয়েছে ভাবলেশশূন্য বুদ্ধির একটা বিকল্প দিয়ে। এই কি মানুষের জিজ্ঞাসার সদুত্তর? এতে কি তার মন মানে? তাছাড়া মানুষের অন্তরে সত্য ও জ্যোতির দিকে যে ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা আছে, সমস্ত অনর্থ ও অপূর্ণতাকে পরাভূত করে মনের নিরালায় যে-অধ্যাত্মবিজয়ের স্বপ্ন দেখছে সে, জগতের অদিব্যভাবকে মনের বিকল্প বলে উড়িয়ে দিলে মানবপ্রকৃতির সে-আকৃতি

কি নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে না? 'ভগবান যা করেছেন, ভালর জন্যই করেছেন, অতএব জগতের সব-কিছুই ভাল'—এমন-একটা নিরামিষ উক্তি প্রায়ই শুনি। উপরি-উক্ত দর্শনও কি ওই মূঢ় যুক্তিরই সগোত্র নয়? এতে বড়জোর সুখবাদী, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকের একটা নকল তৃপ্তি মেলে। এদিকে মানুষের অন্তর জুড়ে চলছে যে দুঃখ সন্তাপ ও সংঘর্ষের প্রমত্ত তান্ডব, তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না—শুধু এই একটু আভাস ছাড়া যে, ভগবানের দৃষ্টিতে এর একটা সার্থকতা থাকলেও তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু এই কি আমাদের অতৃপ্তি ও আকৃতির জবাব হল? জানি, সে-আকৃতিতে হয়তো অন্ধপ্রবৃত্তির প্ররোচনা আছে—মনের মূঢ় কামনার খাদ মেশানো আছে তাতে। কিন্তু তাহলেও আধারের গভীর গহনেও যে তার একটা দিব্য প্রতিরূপ নাই, একথাই-বা বলি কোন্ সাহসে? যে অংশী ব্রহ্ম অংশেরই অপূর্ণতাহেতু পূর্ণ হয়েছেন, তাঁর মধ্যে আছে অপূর্ণতাতেই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা—কেননা তাঁর বর্তমান স্থিতিতে কোনও অসিদ্ধ আকৃতির একটি বিশিষ্ট পর্বের পরিপূর্ণ রূপায়ণ রয়েছে। অতএব তাঁর সমগ্রতাকে বলতে পারি চলন্ত, চরম নয়। তাঁর সম্পর্কে গ্রীক মনীষীর এই উক্তি খাটে—ব্রহ্ম এখনও সম্ভূত নন, তিনি সম্ভবৎ মাত্র। ব্রহ্মের সত্যভাব তাহলে যেমন আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ়, তেমনি হয়তো লোকোত্তরও বটে। তাঁকে এই দুটি ভূমিতে যুগপৎ উপলব্ধি করাই হবে সমস্যার সত্য সমাধান। অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন পূর্ণ, তাঁর সাদৃশ্য অথবা সাধর্ম্যকে অধিগত ক'রে আমাদেরও তেমনি পূর্ণ হতে হবে।

অপূর্ণতা পশুরও আছে, মানুষেরও আছে। পশু সে-অপূর্ণতাকে মেনে নেয় অজ্ঞানে, স্বভাবের বশে। মনুষ্যস্বভাবের বশে তাকে যুক্তি দিয়ে সজ্ঞানে মেনে নেওয়াই যদি আমাদের চেতনার ধর্ম হত, যদি নিশ্চিত জানতাম অপূর্ণতাই আমাদের জীবন-সত্য ও সত্তার অন্তরঙ্গ পরিচয়—তাহলে বলা যেত, মানুষ আজ যা হয়েছে, তাতেই তার মধ্যে ব্রহ্মের আত্মরূপায়ণের চরম প্রকাশ ঘটেছে। তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নিতাম, আমাদের এই অপূর্ণতা ও সন্তাপ বিশ্বের অখন্ড সৌষম্যের অঙ্গীভূত একটা অলঙ্ঘ্য বিধান। কাজেই অবুঝ মন এবং তার চাইতেও অবুঝ প্রাণের খুঁতখুঁতি সত্ত্বেও হৃদয়ের ক্ষতে ওই দার্শনিক সান্ত্বনার প্রলেপ মেখে যথাসম্ভব যুক্তির বর্ম এ'টে দার্শনিক বিজ্ঞতার সঙ্গেই জীবনের খানাখন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তাম ভবিতব্যতার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।...এর চাইতেও বড় সান্ত্বনা হয়তো পেতাম ভক্তের হৃদয়াবেগে। ভাবতাম, তাঁর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী? এপারে যত দুঃখই থাক না কেন, ওপারে তো আছে আমাদের চিরাকাঙ্ক্ষিত বৈকুন্ঠধাম—সেই আনন্দলোকে গেলেই তো এখানকার ত্রিতাপের জ্বালা মুছে যাবে, আবার আমরা ফিরে পাব আপন পূর্ণ-নিরঞ্জন স্বভাবের

স্বাধিকার।...কিন্তু মানুষের চিত্তবৃত্তিতে ও বুদ্ধিতে এমন-কিছু আছে, যা তাকে পশু থেকে তফাত করেছে। অপূর্ণতার বেদনা পশুর মধ্যে নাই, আছে মানুষের মধ্যে। পূর্ণতাহানির দীনতা সম্পর্কে শুধু আমাদের মনই যে সচেতন তা নয়—আমাদের অন্তশ্চেতনাতেও তাকে নিরস্ত করবার একটা দুর্নিবার আগ্রহ আছে। অপূর্ণতা যে পার্থিব জীবনের অনতিবর্তনীয় বিধান—জীবাত্মা শান্তভাবে কিছুতেই এমন কথা মানতে চায় না। স্বভাবের সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে পরিমার্জিত করে সে চায় স্বারাজ্যের অখণ্ড মহিমা। শুধু-যে বৈকুণ্ঠের লোকোত্তর ধামে পূর্ণতার ঐশ্বর্য সহজ হয়ে ফুটে উঠবে তার মধ্যে, তার এই আশাই নয়। তার অভীপ্সা সার্থক হতে চায় এই মাটির পৃথিবীতেই, যেখানে কৃচ্ছ্রসাধনায় তিলে-তিলে জিনে নিতে হয় পূর্ণতার অধিকার। পূর্ণতাহানি যদি অপরা প্রকৃতির সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ঊর্ধ্বমুখী জীব-চেতনার এই অতৃপ্তি ও অভীপ্সাকেও বলতে হয় পরা প্রকৃতির সত্য। মানুষের এই হিয়া-দগদগিতে, এই অনির্বাণ অভীপ্সাতে আছে আধারে গুহাহিত দেববীর্যের এক স্বারসিক দীপ্তি। সে-ই তো আমাদের মধ্যে ওই আকূতির শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে, যাতে অন্তরের মণিকোঠায় ব্রাহ্মী চেতনার আবেশ শুধু অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাবের প্রশান্তিরূপেই না জেগে থাকে—তার প্রেতি যাতে বীজভূত দিব্যভাবকে থরে-থরে ফুটিয়ে তোলে এই আধারে প্রকৃতি-পরিণামের ছন্দে-লয়ে।

শুধু এই দৃষ্টিতেই বলতে পারি, পরিপূর্ণ সৌষম্যের ছন্দে এক চিন্ময় সিদ্ধির দিকে চলেছে নিখিলের অভিযান—এক দিব্য-প্রজ্ঞার প্রশাসনে। তাই জগতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিধান হয়েছে 'যাথাতথ্যতঃ'। কিন্তু, শুধু এতেই ব্রাহ্মী আকূতির সমগ্র পরিচয় মেলে না। বিশ্বে যা-কিছু হয়েছে, তার পূর্ণ সার্থকতা একমাত্র তার অন্তর্গূঢ় সামর্থ্য ও সংকল্পের নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতেই। আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি সাধারণত বিশ্বের প্রতিভাসে একটা স্থূল অর্থের পরিকল্পনা দেখতে পায়। আরও সূক্ষ্ম সত্য ও গভীর একটা তাৎপর্য যে তার মধ্যে নিহিত রয়েছে, সে-খবর পাই যখন দৈবী মনীষার রহস্য অধিগত হয়। তখনই বুঝতে পারি, বস্তুর স্বভাবস্থিতির সার্থকতা কোথায়। কিন্তু বিশ্বসংস্থানের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সঙ্গতি আছে—শুধু এই বিশ্বাসই পর্যাপ্ত নয়। নিরন্তর এষণাদ্বারা সেই চিন্ময় সঙ্গতির সূত্রকে আবিষ্কার করাই আমাদের স্বভাবের দায়। আর সে-আবিষ্ক্রিয়ার পরিচয় শুধু দার্শনিক বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বসঙ্গতির একটা ছক তৈরি করাতেই নয়। অথবা সব-কিছুর মধ্যে লোকবুদ্ধির অগোচর তাঁর ইচ্ছার একটা খেলা চলছে—এই বিশ্বাসে বিজ্ঞের মতই হ'ক্ বা চোখ বুজেই হ'ক্ জগৎটাকে কেবল নির্বিচারে মেনে নেওয়াতেই নয়। জ্ঞানের পরিচয় শক্তিতে। দৈবী মনীষার সূত্র যে পেয়েছি,

তা প্রমাণ হবে আধারে চিন্ময়ী কবিক্রতুর উদয়নে—যা অপরা প্রকৃতির বহিরঙ্গ প্রবৃত্তিকে তিলে-তিলে রূপান্তরিত করবে অন্তর্গূঢ় দৈবী ভাবনার ঋতময় বিধানে। জীবনের সন্তাপ ও দৈন্যের পীড়নকে ঈশ্বরকল্পিত আপাত-অপূর্ণতার একটা বিধান জেনে তিতিক্ষাসহকারে তাকে সয়ে যাওয়া অন্যায় কি অসংগত নয়, তা মানি। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মানতে হবে, অনর্থ ও সন্তাপকে আত্মবীর্যে পরাভূত ক'রে অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করা, চিন্ময় প্রকৃতির ঋতচ্ছন্দকে মূর্ত করা এই আধারে—এও ঈশ্বরকল্পিত আরেকটি বিধান। বস্তুত মানুষের চেতনায় স্বরূপ-সত্যের একটা চিন্ময় আভাস আছে, দিব্য-প্রকৃতি ও দেব-স্বভাবের একটা কল্পরাগ আছে। সেই উত্তরদীপ্তির তুলনায় স্বচ্ছন্দে বলা চলে, আমাদের প্রাকৃত ভূমির অপূর্ণতা অদিব্য জীবনেরই পরিচায়ক—তাকে ঘিরে আছে যে পার্থিব পরিবেশ, তাও দিব্য নয়। কিন্তু এ-অপূর্ণতা পূর্ণতারই অঙ্কুর মাত্র। এ শুধু দিব্য পুরুষ ও দিব্য প্রকৃতির প্রথম কঞ্চুক—ঈপ্সিত চরম রূপায়ণ নয়। এই আধারেই দিব্য-পুরুষের এক অমিত বীর্য গুহাহিত হয়ে আছে—যা মানুষের অন্তরে জ্বালিয়েছে অভীপ্সার অগ্নিশিখা, কল্পলোকের চকিত আভাসে করেছে তাকে উন্মনা, অতৃপ্তির অনির্বাণ দাহে প্রচোদিত করেছে উত্তরায়ণের অভিযানে, সকল আবরণ বিদীর্ণ করে এই মর্ত্য আধারে এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন-চেতনাতেই দেবতাকে ব্যাকৃত করবার এনেছে উন্মাদনা। অতএব আমাদের অপরা প্রকৃতি দিব্য-সংক্রান্তির একটা পর্ব মাত্র। এই অপূর্ণস্থিতিকে আশ্রয় করেই পেয়েছি এক মহত্তর বিপুলতর অভ্যুদয়ের সংকেত—যার মধ্যে চিন্ময় সিদ্ধি রূপায়িত হবে শুধু গুহাহিত দেবতার নিগূঢ় আবেশে নয়, কিন্তু সত্তার প্রত্যন্ততম বিভাবনাতেও স্ফুরিত হবে তার বৈদ্যুতী।

কিন্তু এসব সিদ্ধান্তই ন্যায়ের ভাষায় শুধু 'প্রতিজ্ঞা' মাত্র। বিশ্বস্থিতির নিগূঢ় রহস্যের যেটুকু আভাস পেয়েছি, তার সঙ্গে প্রত্যক্-চেতনার গভীর অনুভবকে মিলিয়ে পাই বোধিজাত প্রত্যয়ের এই ইশারা। বুদ্ধির কাছে তাকে সপ্রমাণ করতে হলে চাই দুঃখ অবিদ্যা ও অপূর্ণতার হেতু-নিরূপণ, বোঝা চাই বিশ্বপ্রবৃত্তির লক্ষ্যে বা ক্রমে কোথায় তাদের স্থান। ব্রহ্ম আছেন—এ-অভ্যুপগমে মোটামুটি মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার সায় আছে। কিন্তু জগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে তিনটি মত। প্রত্যেকটি মতের ভিত্তি জগৎ-দর্শনের এক-একটি বিবিক্ত ভঙ্গির 'পরে। তাই একটি মতের সঙ্গে আর-দুটি মতের কিছুতেই মিল হয় না।...মানুষের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এই গরমিলে, এবং স্বতোবিরোধের তাড়নায় অবশেষে সংশয় ও নাস্তিক্যে তার সকল তর্কের অবসান ঘটে। প্রথম মতে : এক সর্বগত শুদ্ধ বুদ্ধ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব। তাঁকে ছেড়ে তাঁহতে বিবিক্ত

হয়ে কিছুরই সত্তা সম্ভব নয়—কেননা তাঁকে আশ্রয় করে তাঁরই সত্তাতে সবার সত্তা। নিরীশ্বরবাদ জড়বাদ অথবা আদিমানবের নরাকার-ব্রহ্মবাদ ছাড়া সকল ধরনের ঈশ্বরবাদের গোড়ার সিদ্ধান্ত এই। অবশ্য জগদ্‌বিবিক্ত ঈশ্বরের কল্পনাও কোনও-কোনও ধর্মে আছে। তাদের মতে ঈশ্বরসৃষ্ট হয়েও জগৎ ঈশ্বরসত্তার বাইরে। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্র বা অধ্যাত্মদর্শন গড়বার বেলায় এইসব ধর্মও স্বীকার করে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী বা সর্বানুস্যূত—কেননা অধ্যাত্ম-মননের সঙ্গে এ-ভাবটি এত নিবিড়ভাবে যুক্ত যে একে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নাই। ব্রহ্মকে চিন্ময় পরমার্থতত্ত্ব বললে মানতে হবে, তিনি অখণ্ড অদ্বিতীয় এবং সর্বব্যাপী, অতএব তাঁর সত্তাকে ছেড়ে কারও সত্তা সম্ভব নয়। তৎ-স্বরূপ ছাড়া আর কোথা হতে কোনও-কিছুর বিসৃষ্টি হতে পারে? তাঁর আয়তন ছাড়া কোথায় কারও আশ্রয় থাকবে? তাঁর সত্তার বীর্যে ও নিঃশ্বসিতে প্রাণিত না হয়ে স্ব-তন্ত্র অস্তিত্বই-বা থাকবে কার? জগতের দুঃখ অবিদ্যা ও অপূর্ণতা—ঈশ্বরসত্তার আশ্রিত নয়—এমন কথাও আছে বটে কোনও-কোনও ধর্মে। কিন্তু তাহলে মানতে হয় দুজন ঈশ্বর—একজন শিবময় 'হোরমজ্‌দ্‌', আরেকজন অশিব 'অহ্রিমন্‌'। অথবা হয়তো একজন বিশ্বোত্তীর্ণ ও সর্বগত পূর্ণপুরুষ, আরেকজন বিশ্বের অপূর্ণসত্ত্ব বিধাতা বা বিবিক্ত অপরা প্রকৃতি। এ-কল্পনা সম্ভব হলেও শুদ্ধবুদ্ধির চরম দর্শনে তার সায় নাই। তাকে সত্যের বড়জোড় একটা গৌণবিভাব বলে মানা চলে, কিন্তু পূর্ব্য বা অখণ্ড তত্ত্বভাবের মর্যাদা কোনমতেই সে পেতে পারে না। এমনও বলতে পারি না, সর্বাধিষ্ঠান চিন্ময়-পুরুষ আর সর্ববিধাত্রী শক্তির স্বরূপে কোনও বৈধর্ম্য রয়েছে অথবা তাদের সংকল্পে কোনও অন্যোন্যবিরোধী প্রবর্তনা নিহিত আছে। আমাদের বুদ্ধি বলে, বোধিচেতনা অনুভব করে এবং অধ্যাত্ম অনুভবেও সমর্থিত হয় এই সত্যই যে: এক নির্বিশেষ নিরঞ্জন সন্মাত্রই রয়েছেন সর্ববস্তুতে এবং সর্বভূতে—তারা আছে তাঁরই আধারে এবং আশ্রয়ে। অতএব এই সর্বাধার ও সর্বান্তর্যামী ব্রহ্মসদ্‌ভাবের আবেশ ছাড়া বিশ্বে কিছুই নাই বা কিছুই ঘটে না।

এই গেল আমাদের প্রথম অভ্যুপগম। একে ভিত্তি করে সহজেই মানুষের মন গড়ে তোলে আরেকটি সিদ্ধান্ত। এই সর্বগত ব্রহ্মসত্তার পরা সংবিৎ ও পরা শক্তিই বিশ্বাবগাহী দিব্যপ্রজ্ঞা ও পূর্ণজ্ঞানের ঋতম্ভরা ঈশনায় হয়েছে নিখিলের মৌল সংস্থান ও প্রবৃত্তির প্রশাস্তা।...কিন্তু আস্তিক্যের এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশ্বের প্রাতিভাসিক রূপের একটা অসংগতি দেখা দেয়। মূলে যা-ই থাকুক, বিশ্বের স্থূল সংস্থান ও প্রবৃত্তিতে আমাদের প্রাকৃত চেতনা সর্বত্র দেখে একটা কুণ্ঠা ও অপূর্ণতার ছাপ। ব্রহ্মভাব সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা, বিশ্ব জুড়ে দেখি তার বিপর্যয়।—সর্বত্র একটা বৈষম্য, একটা প্রতীপ

আচার, ব্রহ্ম-সদ্ভাবের সুস্পষ্ট প্রতিষেধ না হ'ক তার বিকৃতি ও প্রচ্ছাদন তো বটেই।...এইতে দেখা দেয় তৃতীয় একটি সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম আর জগৎ তাহলে দুটি আলাদা তত্ত্ব বা আলাদা ধারা। দুয়ে এতই তফাত যে একটিকে পেতে হলে আরেকটিকে ছাড়তেই হয়। অধিষ্ঠান-ব্রহ্মকে জানতে হলে তাঁর সত্তায় স্ফুরিত বা বিসৃষ্ট এবং তাঁর দ্বারা অধিষ্ঠিত ও প্রশাসিত জগৎকে প্রত্যাখ্যান করতেই হবে আমাদের।...তিনটি সিদ্ধান্তের প্রথমটি অনস্বীকার্য। অধিষ্ঠিত জগতের সঙ্গে সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মের কোনও সম্পর্ক যদি থাকে, জগতের বিসৃষ্টি নির্মাণ বিধারণ ও প্রশাসনের বিন্দুমাত্র দায়ও যদি তাঁর থাকে, তাহলে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকেও না মেনে উপায় নাই। আবার তৃতীয়টিকেও মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ। অথচ আগের দুটির সঙ্গেই সে খাপছাড়া। এই অসঙ্গতি হতে দেখা দেয় এমন-একটা সমস্যা, মনে হয় তার সুষ্ঠু সমাধান কোনকালেই হবার নয়।

দার্শনিক বুদ্ধি অথবা শাস্ত্রযুক্তির দৌলতে এ-সমস্যার একটা জবাব দাখিল করা অবশ্য অসম্ভব নয়। এপিকিউরাসের দেবতাদের মত একজন নিষ্কর্মা ঈশ্বর খাড়া করলেও চলে। যন্ত্রারূঢ় প্রাকৃত জগৎ যে-পথেই গড়িয়ে চলুক, তিনি কিন্তু আপন আনন্দে বিভোর হয়ে উদাসীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।...বলতে পারি, ভূতে-ভূতে অবস্থিত নির্বিকার সাক্ষী পুরুষের অনুমতিতে স্ব-তন্ত্রা প্রকৃতির কর্ম আর বিকর্ম চলছে, আর তাঁর অক্ষুব্ধ নির্বর্ণ চৈতন্যে তিনি গ্রহণ করছেন তাদের প্রতিবিম্ব—এছাড়া পুরুষের আর-কোনও দায় নাই।...অথবা প্রপঞ্চের বিসৃষ্টি বা বিভ্রমের ওপারে আছেন এক অসঙ্গ নিরুপাধিক নিষ্ক্রিয় নির্বিশেষ পরমার্থ-সৎ: তাঁহতে অথবা তাঁর প্রতিযোগিরূপে এই সৃষ্টির অনির্বচনীয় রহস্যময় আবির্ভাব—শুধু কালগ্রস্ত জীবের বঞ্চনা ও পীড়নের জন্য!...কিন্তু এসব সমাধানের পিছন হতে উঁকি দেয় আমাদের দ্বিধা-বৃত্ত অনুভবের একটা আপাত-অসঙ্গতি। এতে বিরোধের সমন্বয় সমাধান কি ব্যাখ্যা কিছুই হয় না—শুধু অবিভক্তের মধ্যে একটা তাত্ত্বিক বিভাগের কল্পনা ক'রে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ দ্বৈতবাদ দ্বারা সেই বিরোধকে সমর্থন করা হয়। বস্তুত এর মধ্যে আছে একই ঈশ্বর-সত্তার দ্বৈতবিভাবের কল্পনা—ব্রহ্ম বা পুরুষ আর প্রকৃতিরূপে। কিন্তু প্রকৃতি বা বস্তুশক্তি তো ব্রহ্মশক্তি বা আত্মশক্তি ছাড়া আর-কিছুই হতে পারে না—কেননা বস্তুসত্তা যে স্বরূপত ব্রহ্মসত্তা হতে অভিন্ন। অতএব প্রকৃতির কর্ম ব্রহ্ম বা পুরুষ হতে একান্ত স্ব-তন্ত্র হয়ে চলছে না। এও সত্য নয় যে প্রকৃতি স্বৈরিণী ও প্রতীপচারিণী—পুরুষের হান-উপাদানে তার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। অথবা পুরুষের মূঢ় ও নিষ্ক্রিয় অসাড়তার 'পরে তার কর্ম অন্ধ যন্ত্রশক্তির একটা জুলুম শুধু।...আবার বলা চলে: ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়

সাক্ষিরূপে চেয়ে আছেন, আর ঈশ্বরই সক্রিয় স্বভাবে সৃষ্টি করছেন। কিন্তু এতেও গোল মেটে না। কেননা শেষ পর্যন্ত মানতে হয়, এ-দুটি একই তত্ত্বের যুগ্মবিভাব মাত্র—সাক্ষী ব্রহ্মের সক্রিয় বিভাবকে বলি ঈশ্বর, আর সক্রিয় ঈশ্বরত্বের সাক্ষীকেই বলি ব্রহ্ম। একই ব্রহ্ম জ্ঞানে সমাহিত, আবার কর্মে উচ্ছ্বসিত—এ-কল্পনায় যে-বিরোধ আছে, তার সমাধান প্রয়োজন হলেও সমস্যাটা অনিরুক্ত এবং অনির্বাচ্য থেকেই যায়।...এমনও বলতে পারি : ব্রহ্মের তত্ত্বভাবে একটা দ্বৈতচেতনা আছে—একটি চেতনা অচল, আরেকটি স্পন্দিত। স্থাণু অচলচেতনা ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপ-সত্য, ওই তাঁর নির্বিশেষ অখণ্ড-পূর্ণতার ভাব। আর তাঁর স্পন্দচেতনায় আছে অর্থক্রিয়াকারিতা এবং রূপায়ণের সামর্থ্য—তাতেই অনাত্মরূপে তিনি বিবর্তিত হন। সে-বিবর্তের দ্বারা তাঁর নির্বিশেষ অখণ্ডপূর্ণতা কোনমতেই পরামৃষ্ট নয়—কেননা কালাতীত তত্ত্বভাবের মধ্যে সে তো কালকলনার একটা বিভ্রম শুধু।...কিন্তু একথায় আমাদের দৃষ্টিতে রহস্যের ঘোর আরও ঘনিয়ে আসে। আধখানি সত্তা আর আধখানি চৈতন্য নিয়ে আমরা ব্রহ্মের আধখানি স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে আছি এবং প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হয়ে বাস্তব বলে মেনে নিচ্ছি এই স্বপ্নজীবনকে, এর করাল বিভীষিকা হতে নিষ্কৃতির কোনও উপায় দেখছি না; সুতরাং অবাস্তব বলে একে উড়িয়েই-বা দিই কি করে? এ তো মানতেই হবে, কালচেতনা আর তার বিভাবনা শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার বিভূতিরূপে তাঁরই আশ্রিত এবং অবিনাভূত। পরমার্থ-তত্ত্বের শক্তির 'পরেই সত্তার নির্ভর যার, সে কি করে তাঁর দ্বারা অপরামৃষ্ট হবে? আত্মশক্তির বিভাবনায় এ-জগৎ সৃষ্টি করেও তা থেকে তিনি নিঃসম্পর্ক হবেন কি করে? জগদ্‌ভাব পরা সংবিতের আশ্রিত হলে তার প্রবৃত্তি ও ব্যবহারও নিশ্চয় সেই সংবিতেরই স্বরূপশক্তির আশ্রিত হবে—বিশ্ববিধানে থাকবে চিৎসত্তার দিব্যবিধানের প্রশাসন! ব্রহ্মের মধ্যে যে-জগৎ আছে, তার চেতনা ওতপ্রোত হয়েই থাকবে ব্রহ্মের আত্মসংবিতের সঙ্গে। তার সমস্ত প্রবৃত্তি ও রূপায়ণের মধ্যে থাকবে তাঁরই শক্তির নিত্য প্রশাসন—অন্তত তার ঈক্ষণ তো বটেই, কেননা পূর্ব্য এবং শাশ্বত স্বয়ম্ভূসত্তার বিভাবনা ছাড়া স্ব-তন্ত্র কোনও শক্তি কি প্রকৃতির সত্তাই যে অসম্ভব। আর-কিছু না করলেও, তাঁর চিন্ময় সর্বানুস্যূত অনুধ্যানদ্বারাই যে ব্রহ্ম বিশ্বের প্রবর্তক বা নিয়ন্তা হবেন। বিশ্বস্পন্দের অন্তরালে আছে আনন্ত্যের প্রপঞ্চোপশম নৈঃশব্দ্য, চেতনা সেখানে বিশ্বসৃষ্টির নিষ্পন্দ সাক্ষিমাত্র—সমাহিত সাধকের এ-অনুভব মিথ্যা নয়। কিন্তু একেই তো অধ্যাত্ম অনুভবের সবখানি বলতে পারি না, আর এই একদেশী জ্ঞান দিয়েই তো বিশ্বরহস্যের আমূল ও সমগ্র সমাধান হতে পারে না।

ব্রহ্মের প্রশাসনে বিধৃত এই বিশ্ব—একথা মানলে পরে কোথাও তাঁর

প্রশাসনের ক্ষমতায় দাঁড়ি টানতে পারি না। কারণ, যে সত্তা ও চেতনাকে অনন্ত ও পরাৎপর বলে জানি, তার বিজ্ঞান ও সংকল্প যে সীমার সংকোচে কোথাও অনীশ্বর বা ব্যাহতগতি হবে, একথা অকল্পনীয়। অবশ্য এটুকু মানতে বাধা নাই যে, সর্বগত পরমব্রহ্মের পূর্ণ স্বভাবের আশ্রিত হয়েও যা অপূর্ণ হয়ে এবং অপূর্ণতার নিমিত্ত হয়ে ফুটেছে, প্রবৃত্তির খানিকটা স্বাতন্ত্র্য ব্রহ্ম তাকে দিতেও পারেন। এমনি স্বাতন্ত্র্যের অধিকার পেয়েছে অবিদ্যাচ্ছন্ন বা অচিতিমূঢ় অপরা প্রকৃতি, পেয়েছে মানুষের ইচ্ছা ও মন, পেয়েছে অচিতির অনতিবর্তনীয় মূঢ়তা হতে উচ্ছ্রিত অশিব তমঃশক্তির ঘোরচেতনা। কিন্তু তারা কেউ ব্রহ্মের আত্মভাব আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকৃতি হতে বিবিক্ত এবং স্ব-তন্ত্র নয়। ব্রহ্মের সদ্‌ভাবে ঈক্ষণে বা অনুমতিতেই তাদের ক্রিয়া চলছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য আপেক্ষিক। তার স্বভাবের অপূর্ণতার জন্য একমাত্র তাকে দায়ী করা চলে না। অপরা প্রকৃতির অবিদ্যা ও অচিতিও অখন্ড-সন্মাত্রের বিভূতি, অতএব স্ব-তন্ত্র সত্তা তাদেরও নাই। প্রকৃতির ক্রিয়াবৈকল্য সর্বগত ব্রহ্মেরই সত্যসংকল্পের অনুগত—তার বিপর্যাস নয়। একথা মানি, প্রবর্তিত শক্তি তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিধানে কাজ করে যায়। কিন্তু যে-ব্রহ্ম সর্বেশ্বর এবং সর্ববিৎ, তাঁর সর্বগত স্বয়ম্ভূসত্তায় প্রবৃত্তির কোনও তরঙ্গ যদি ওঠে, তবে তার মূলে আছে তাঁরই প্রবর্তনা ও প্রশাসন—কেননা অখন্ড-সন্মাত্রের ব্যাহৃতিমন্ত্র ছাড়া তাদের সৃষ্টি অথবা স্থিতি কি করে হবে? বিসৃষ্ট জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের এতটুকু সম্পর্কও যদি থাকে, তবে বিশ্বলীলায় তাঁকে ছেড়ে আর-কারও ঈশনা স্বীকার করা চলে না—তাঁর পূর্ব্য ও সর্বগত সদ্‌ভাবের নিত্যব্রত হতে কেউ নিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত হয়ে থাকতে পারে না। অখন্ড ব্রহ্মসদ্‌ভাবের এই স্বতঃসিদ্ধ পরিণামকে সর্বতোভাবে স্বীকার করেই দুঃখ অনর্থ ও অপূর্ণতার সমস্যাকে বিচার করতে হবে।

একটা ধারণা গোড়াতেই স্পষ্ট হওয়া চাই। এ-জগতে ভ্রান্তি অবিদ্যা সংকোচ সন্তাপ খন্ডবোধ কি সংঘাত আছে বলেই তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না যে, বিশ্বে ব্রহ্মের সত্তা চেতনা শক্তি প্রজ্ঞা ক্রতু ও আনন্দের অস্তিত্বও মিথ্যা অথবা অপ্রমাণ। অবিদ্যা প্রভৃতিকে বিচ্ছিন্ন ও স্ব-তন্ত্র করে দেখলে তাদের ডিঙিয়ে অখন্ড সচ্চিদানন্দকে আর দেখতে পাওয়া যায় না সত্য। কিন্তু বিশ্বলীলার সমগ্রতার মধ্যে তাদের সংস্থান ও তাৎপর্যকে যথাযথ স্থাপন করতে পারলেই এই ভ্রান্তি ঘুচে যায়। অংশী হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অংশকে অপূর্ণ হতশ্রী ও দুর্বোধ মনে হয়। কিন্তু তাকেই অংশীর পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে রাখলে তার অর্থ ছন্দ এবং প্রয়োজন বুঝতে পারি। ব্রহ্ম অনন্ত ভাবস্বরূপ। তাঁর এই অনন্তভাবের সর্বত্র দেখি সান্তভাবের খেলা। এই আপাত-প্রতিভাসকে আমরা গোড়ার তথ্য বলে জানি—আমাদের সংকীর্ণ

অহন্তা ও তার স্বার্থপর প্রবৃত্তিতে অহর্নিশ এই তথ্যেরই পরিচয় পাই। কিন্তু আত্মবোধের অখন্ডতায় অবগাহন করলে দেখি, কোথায় সান্তের সঙ্কোচ—আমরাও যে অনন্ত-স্বরূপ! আমাদের অহং বিশ্বসত্তারই একটা বিশেষ দিক, তার তো স্বতন্ত্র কোনও সত্তা নাই। আমাদের আপাত-বিবিক্ত ব্যষ্টি জীব-চেতনা আত্মপ্রকৃতির একটা বহিঃস্পন্দ মাত্র। তার পিছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমাদের শাশ্বত জীবস্বভাব—যা যুগপৎ সর্বাত্মভাবে পরিব্যাপ্ত এবং তুরীয় আনন্ত্যের তাদাত্ম্যে লোকোত্তীর্ণ। অতএব অহন্তায় সত্তার আপাত-সঙ্কোচ ঘটলেও বস্তুত সে আনন্ত্যেরই বীর্যবিভূতি। বিশ্বের অন্তহীন ভূতবৈচিত্র্যও অপ্রমেয় আনন্ত্যেরই পরিণাম ও সুস্পষ্ট দ্যোতনা—তার মধ্যে সীমিত অথবা সান্ত-ভাবের অনতিবর্তনীয়তা কোথায়? আপাত-খন্ডতা কখনও তাত্ত্বিক ভেদে পরিণত হতে পারে না। খন্ডভাবের আধার হ'য়ে তাকে অতিক্রম করেও থাকে অখন্ড-অদ্বৈতের নিগূঢ় ব্যাপ্তি, যাকে কোনও খন্ডভাবনাই খণ্ডিত করতে পারে না। জগতে অহন্তা আছে, আপাত-খন্ডতা আছে—আছে তাদের বিবিক্তবৃত্ত প্রবৃত্তি। কিন্তু একে জগতের গোড়ার তথ্য বলে মানলেও ব্রহ্মের চিন্ময়ী প্রকৃতির অখন্ড অন্বয়ভাবনা ক্ষুণ্ণ কি নিরাকৃত হয় না—কেননা অখন্ড আনন্ত্যের বীর্য যে অন্তহীন বহুভাবনায় স্ফুরিত হয়েছে, জগদ্‌ভাব তারই পরিণাম মাত্র।

অতএব তত্ত্বত বিশ্বের কোথাও খন্ডতা বা সীমার সঙ্কোচ নাই, ব্রহ্মের সর্বগত সদ্‌ভাবের কোথাও স্বরূপহানি ঘটেনি। অথচ প্রাকৃত চেতনায় সত্যি-সত্যি সঙ্কুচিতবৃত্তির একটা পীড়ন রয়েছে। আমরা নিজের স্বরূপ জানি না, গুহাহিত ব্রহ্ম স্বরূপত আচ্ছন্ন আমাদের কাছে—আর এই অবিদ্যার ফলে সবদিক দিয়ে আমরা অপূর্ণ। বহিশ্চর অহংচেতনায় আত্মার একমাত্র পরিচয় পাই; তাতেই নিমগ্ন হয়ে দেহ-প্রাণ-মনের কারাগারে আমরা বন্দী। তাইতে অখন্ড আত্মস্বরূপের 'পরে—তাত্ত্বিক না হ'ক, ব্যাবহারিক খন্ডভাবের আরোপে পরমার্থতত্ত্ব হতে যোগভ্রষ্ট হয়ে তার নানা অবাঞ্ছনীয় বিপাকে আমরা জর্জরিত হই। কিন্তু এইখানে আমাদের দৃষ্টির একটা নতুন ভঙ্গি আবিষ্কার করতে হবে। ব্যবহারের দিক থেকে অবিদ্যাকে আমরা যা-ই বুঝি না কেন, ঐশ্বর-যোগের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অবিদ্যা কিন্তু তথ্য হলেও তত্ত্ব নয়—আসলে সে বিদ্যারই একটা বৃত্তি। অবিদ্যারূপে বিদ্যার প্রতিভাস শক্তির একটা বহিঃস্পন্দ মাত্র, তার পিছনে আছে অখন্ড সর্বসংবিতের অধিষ্ঠান। সর্বসংবিৎ যখন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আপনাকে সীমিত ক'রে জ্ঞানের একটি বিশেষ বৃত্তি এবং কর্মের একটি বিশেষ ধারাকে আশ্রয় করে, তখন তার সেই পুরঃক্ষেপকে বলি অবিদ্যা। তার অন্তরালে অখন্ড জ্ঞানা-শক্তির বীর্য আপন যোগ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। এই নিগূঢ় বীর্য যেন সর্বসংবিতের জ্যোতি

ও শক্তির গোপন ভাণ্ডার। এই উৎস হতে যোগান পেয়ে প্রকৃতিতে আমাদের প্রগতির ধারা এগিয়ে চলে। পুরঃক্ষিপ্ত অবিদ্যার সকল ন্যূনতা পূরণ হয় এক রহস্যশক্তির আবেশে। সর্ববিৎ সত্যসংকল্পের ছকে যে-লক্ষ্য নিশ্চিত হয়ে আছে তার জন্য, এই শক্তিই তাকে নানা ব্যাঘাতের ভিতর দিয়েও ঠিক পথে চালিয়ে নেয়, লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হবার সকল সম্ভাবনাকে করে নিরাকৃত। অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়েও জীব এই শক্তির সহায়ে দুঃখ ও প্রমাদের প্রাকৃত অনুভব হতেও উত্তরায়ণের পাথেয় আহরণ করে, চলার পথে ফেলে যায় অনাবশ্যকের যত আবর্জনা।...তাছাড়া পুরঃক্ষিপ্ত অবিদ্যাশক্তির বৈশিষ্ট্য হল সংকুচিত পরিবেশের মধ্যে একাগ্র অভিনিবেশের নিবিড়তা। আমাদের প্রাকৃত মনেও তার পরিচয় পাই, যখন বিশেষ-কোনও বিষয়ে বা কর্মে চিত্তসমাধান ক'রে আমরা শুধু তার উপযোগী জ্ঞান ও ভাবনার উপযোগ করি, যা তার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক কি প্রতিকূল তাকে আপাতত নেপথ্যে রাখি। অথচ এর মধ্যে আধারের অখণ্ডচেতনাই কিন্তু যা করবার করছে, যা দেখবার দেখছে। সেখানে এমন কথা বলতে পারি না যে, চেতনার একটা ভগ্নাংশ অথবা অবিদ্যার একটা আচ্ছিন্ন ভাগই আধারে নির্বাক জ্ঞাতা ও কর্তার আসন নিয়েছে। আমাদের মধ্যে সর্বসংবিতের বহির্বৃত্ত অভিনিবেশশক্তিও ঠিক এই রীতিতে কাজ করছে।

চিত্তবৃত্তির খতিয়ান নিতে গিয়ে এই একাগ্রতার সামর্থ্যকে আমরা যে মানুষের মনোরাজ্যে খুব উঁচুদরের শক্তি বলে মনে করি, সেটা কিছু অসংগত নয়। তেমনি, ব্রাহ্মী চেতনাতেও একটা বিবিক্ত লক্ষ্যের দিকে সীমিত বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ প্রবর্তনার সামর্থ্য আছে—যাকে আমরা বলি অবিদ্যা। মানুষের একাগ্রচিত্ততার মত তাকেই-বা কেন মনে করব না ব্রহ্মচৈতন্যের একটা সমুচ্চ বিভূতি? স্বপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা যেখানে, সেখানেই কর্মের মধ্যে একান্তভাবে নিজেকে অভিনিবিষ্ট রেখে ওই আপাত-অবিদ্যার ভিতর দিয়ে নিজের প্রত্যেকটি অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করে তোলা সম্ভব। বিশ্ব জুড়ে দেখছি এই স্বপ্রতিষ্ঠ লোকোত্তর প্রজ্ঞার লীলা—বহুধা-বৃত্ত অবিদ্যা তার বাহন। প্রত্যেকের মধ্যে আপন অন্ধ আবেগকে অনুসরণ করবার প্রয়াস আছে—অথচ সবার ভিতর দিয়ে সংবাদি-বিবাদী সকল সুরের সমন্বয়ে ফুটে উঠছে বিশ্ব-রাগিণীর এক অপরূপ সৌষম্য। আমরা যাকে অচিতি বলি, তারও মধ্যে এই পরম প্রজ্ঞার সর্ববিৎ স্বভাবের আশ্চর্য পরিচয় পাই। অচিতির মধ্যে তমিস্রার আবরণ বলতে গেলে দুর্ভেদ্য হয়েছে। আমাদের অবিদ্যার চাইতেও তার বাধা স্থূলতনু—অতিপরমাণুতে, পরমাণুতে, জীবকোষে, উদ্ভিদে, কীট-পতঙ্গ, নিম্নশ্রেণীর ইতরপ্রাণীতে। অথচ সেখানেও দেখি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার নিরঙ্কুশ লীলায়ন। প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তিকে অথবা জড়ের অচেতন সংবেগকে ঠিক সে নিয়ে যায় সর্বসংবিতের সংকল্পিত গূঢ়বর্ত্মা পরিণামের

দিকে। যে-আধার সে-পরিণামের বাহন, সে তার খবর জানে না, অথচ তার প্রবৃত্তিতে ও সংবেগে পরিণামের ক্রিয়া হয় নিখুঁত। অতএব স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, অবিদ্যা বা অচিতির ক্রিয়া বাস্তবিক অজ্ঞানের ক্রিয়া নয়। এর মধ্যে আছে এক নিরতিশয় আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের অকুণ্ঠ বীর্যের দ্যোতনা। অবিদ্যার অন্তর্গূঢ় এই অখণ্ড সর্ববিজ্ঞানের বহিরঙ্গ পরিচয় বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার অন্তরঙ্গ অনুভব চাইলে পরে আমাদের অন্তশ্চেতনার অতল গহনে অথবা উত্তরচেতনার বৈপুল্যে ডুবতে হবে—এই অবিদ্যাচ্ছন্ন পরাক্-চেতনার অন্ধ যবনিকা সরিয়ে দাঁড়াতে হবে তার অন্তঃশীল চিন্ময় বিজ্ঞান ও ক্রতুর মুখামুখি হয়ে। তখন বুঝি, জীবনে অবিদ্যার ঘোরে যে-সাধনা করে এসেছি, ওই নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্বের অলক্ষ্য প্রেরণাতেই তা লোকোত্তর পরিণামের দিকে চলেছে। দেখি, অবিদ্যার প্রবৃত্তির পিছনে আছে এক বৃহত্তর ক্রিয়াশক্তির ঈশনা—আধারে যেন তার নিগূঢ় অভিপ্রায়ের চকিত আভাসও পাই। আজ শুধু বিশ্বাসের ডালায় যাঁর অর্ঘ্য রচেছি, সেদিন তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই, সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্বীকার করি তাঁর নিরঞ্জন বিশ্বম্ভর দিব্যাবেশ—প্রকৃতির অধ্যক্ষ ও সর্বভূতের মহেশ্বরকে অপরোক্ষ প্রত্যয় দিয়ে অনুভব করি।

অবিদ্যার যা তত্ত্ব, তার পরিণামেরও তা-ই তত্ত্ব। আমরা দেখি জীবন-ব্যাপী কত অশক্তি দৌর্বল্য আর ক্লৈব্য, শক্তির কত দৈন্য, সংকল্পের কত ব্যাহত আয়াস ও কৃচ্ছ্রসাধনা। কিন্তু ব্রাহ্মী দৃষ্টিতে এসমস্তই তাঁর আত্মবিভাবনা। আপন স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর সর্ববিৎ সর্বশক্তি ঋতের বিধানে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই বাইরের প্রকাশে শক্তির যোগান হয়েছে ঠিক সাধ্যের অনুরূপ। জীবের যেমন প্রয়াস, যেমন তার সিদ্ধি-অসিদ্ধির অনতিবর্তনীয় নিগূঢ় নিয়তি, তার সঙ্গে মিল রেখে পেয়েছে সে শক্তির পুঁজি। তার শক্তি বিশ্বের সমূহশক্তির অঙ্গীভূত, অতএব সেই শক্তির সমন্বয়ী প্রবৃত্তি ও বৃহৎ পরিণামের ছন্দ অনুসারে তার নিজস্ব শক্তির প্রবৃত্তি ও পরিণাম নিয়মিত হবে। শক্তিসংকোচের পিছনে সর্বশক্তির আবেশ আছে, আর সে-সংকোচও সর্বশক্তিরই লীলা। আবার বহু সঙ্কুচিত শক্তির সমবায়েই অখণ্ড সর্বশক্তির নিগূঢ় অভিপ্রায় নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে মূর্ত হয়। এমনি করে শক্তির সংবেগকে সঙ্কুচিত ক'রে সেই সংকোচের সহায়ে কাজ করে যাওয়া আমাদের কাছে শ্রম আয়াস বা কৃচ্ছ্রতার রূপ ধরে। সাধনার পথকে আমরা তাই অসিদ্ধি অথবা অর্ধসিদ্ধির কণ্টকে আকীর্ণ দেখি। অথচ এরই ভিতর দিয়ে মহাশক্তি যদি তার নিগূঢ় আকূতিকে সার্থক করে তোলে, তাহলে সে কি তার দৌর্বল্যের বাস্তব পরিচয়, না তার অনুত্তর সর্বেশনার সমুচ্ছলিত অনুপম উল্লাস?

জগৎ যে ব্রহ্মের আনন্দরূপ, একথা বোঝবার পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা—আমাদের বাস্তব জীবনে দুঃখের অনুভূতি। কিন্তু স্পষ্টই দেখছি, দুঃখ আসে চেতনার সঙ্কোচ হতে। আত্মশক্তির কুণ্ঠায় অনাত্মীয় শক্তিকে আয়ত্ত বা আত্মসাৎ করবার যে-অসামর্থ্য, তা-ই হল দুঃখবীজ। এই অসামর্থ্যে অনুভূতির সুর কেটে যায় বলে মাত্রাস্পর্শের আনন্দকে আমরা আর ধরতে পারি না। তাই সে আমাদের ইন্দ্রিয়কে অস্বস্তি বা বেদনার আকারে অভিহত করে, সংবেদনের জোয়ার-ভাটায় দেখা দেয় ধাতুবৈষম্য এবং তার ফলে বাইরে কি ভিতরে আধারেরও কোনও বৈকল্য। বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে ভেদভাব-জনিত শক্তিবৈষম্য হল এই দুর্দৈবের কারণ। কিন্তু বেদনাবোধের পিছনে আমাদের চিন্ময় আত্মস্বরূপে বিশ্বম্ভর পুরুষের সর্বাবগাহী আনন্দ গুহাহিত হয়ে আছে। দুঃখময় সম্প্রয়োগে প্রথম তিনি অনুভব করেন তিতিক্ষার আনন্দ, তারপর দুঃখজয়ের আনন্দ এবং অবশেষে তার অবশ্যম্ভাবী রূপান্তরের আনন্দ। পূর্বেই বলেছি, দুঃখ-সন্তাপ আনন্দেরই তির্যক অথবা প্রতীপ রূপ। তাই তাদের পক্ষে বিপরীত প্রত্যয়ে এমন-কি বিশ্বপ্লাবিনী আনন্দ-ধারায় রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই জগদানন্দ শুধু বিশ্বচেতনাতে নয়, আমাদের গুহাহিত চেতনাতেও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যখন অন্তরাবৃত্ত হয়ে আত্মস্বরূপে অবগাহন করি, তখন আমাদের মধ্যে জাগে এই নির্বাধ আনন্দের বিদ্যুন্ময় শিহরন। সে-আনন্দের পরশমণিতে সকল অনুভব সোনা হয়ে যায়। তাই আমাদের গুহাশায়ী চৈত্যপুরুষ অনুকূল- অথবা প্রতিকূল-বেদনীয় সকল অনুভবে আস্বাদ করেন পিপ্পলের স্বাদুরস, তাদের হান বা উপাদান দিয়ে নিজেরই পুষ্টি ঘটান—দুঃখ দুর্দৈব ও কৃচ্ছ্রতার তীব্রতম অভি-ঘাতেও খুঁজে পান একটা চিন্ময় তাৎপর্য এবং কল্যাণের ব্যঞ্জনা। বিশ্বম্ভর আনন্দের সান্দ্র চেতনা ছাড়া দুঃখের বোঝা কে বইতে পারত, কে তা চাপাত আমাদের 'পরে—কেই-বা তাকে করত আপন ইষ্টসিদ্ধি এবং আমাদের অধ্যাত্ম-প্রগতির উপকরণ? বিশ্বে অব্যভিচারী অন্বয়সত্তার আবেশ আছে বলেই এক অব্যভিচারী সৌষম্যের সুরে সব গাঁথা। অন্তর্গূঢ় ওই সুরসুষমার অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য তাই আপাত-বৈষম্যের কর্কশ ঝনৎকারে এমনি করে বেজে ওঠে, কিন্তু তবু তারা সঙ্গতি হারায় না। দেবগন্ধর্বের অখণ্ড সৌষম্যের সাধনা আবার তাদের আপন ঠাটে ফিরিয়ে আনে। সুরশিল্পীর অনায়াস অঙ্গুলিতাড়নে বিবাদি-সংবাদীর স্বরসংঘাত ধরে সুরসঙ্গতির রূপ—অসামের সকল ক্লিষ্টতা বিবশ হয়ে আপনাকে রূপান্তরিত করে জগতীচ্ছন্দের উপচীয়মান পূর্ণতায় হিল্লোলিত বৃহৎ-সামের মূর্ছনাতে। চিরাভ্যস্ত বহিশ্চেতনার সংস্কারবশে যাকে অদিব্য বলে ভাবি, তার অন্তরালে প্রতি পদে আবিষ্কার করি দিব্য-ভাবেরই তত্ত্বরূপ। অথচ আরেকদিক দিয়ে দেখতে গেলে সে তো অদিব্যই,

কেননা দিব্যভাবের পূর্ণস্বরূপকে সে-ই তো প্রতিভাসের আবরণে আড়াল করে রেখেছে। সে-আবরণের একটা আপাত-প্রয়োজন হয়তো আছে। তবু তাকে ধরে তো সত্যের পূর্ণ পরিচয় পাই না।

এমনি করে বিশ্বকে তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখেও, মানুষের সংকীর্ণ চেতনা তার 'পরে যে-রূপের আরোপ করেছে, তাকে একেবারে আমূল মিথ্যা এবং অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি না—উড়িয়ে দেওয়া উচিতও নয়। আমরা যাকে অনর্থের অর্থক্রিয়ারূপে দেখি—সেই দুঃখ শোক সন্তাপ প্রমাদ মিথ্যা অজ্ঞান দুর্বলতা অশক্তি অধর্ম দুরাচার কর্তব্যহানি সঙ্কল্পের বিচ্যুতি ও মূঢ়তা অহমিকা আত্মসঙ্কোচ সর্বাত্মভাবনার অভাব—এসমস্তই পার্থিব চেতনার সত্য, অলীক উপন্যাস তো নয়। অবশ্য সত্য হলেও অজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা তাদের যেমনটি দেখি, তাতেই তাদের পরিপূর্ণ তাৎপর্য অথবা সত্যকার পরিচয় ধরা পড়ে না। তাহলেও আমাদের অনুভবে খানিকটা সত্য তাদের থাকেই, আমাদের দেওয়া পরিচয়কে বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব পরিচয় পূর্ণ হয় না। চেতনার গহন বৈপুল্যে পৌঁছে দেখি তাদের আরেক রূপ। আমাদের কাছে অনর্থ ও প্রতিকূল বলে প্রতীয়মান হলেও বিশ্ব ও ব্যষ্টির দিক দিয়ে তাদের একটা সুগভীর সার্থকতা আছে। দুঃখের বেদন না থাকত যদি, ব্রহ্মানন্দের অফুরন্ত উল্লাস তেমন করে কি হৃদয়ের তারে ঝঙ্কৃত হত ? দুঃখের মধ্যে আছে আনন্দেরই প্রকাশের বেদনা। অজ্ঞান জ্ঞানেরই জ্যোতির্মণ্ডলের ছায়াতপময় বিচ্ছুরণ। ভ্রান্তি নিয়ে আসে সত্য আবিষ্কারেরই সম্ভাবনা ও প্রয়াসের সূচনা। দৌর্বল্য ও ব্যর্থতা দিয়েই পাই বিপুল সঞ্চিত শক্তির প্রথম আভাস। খণ্ড-ভাবনার লক্ষ্য—সামরস্যের আনন্দকেই সমৃদ্ধ করা মিলন-মাধুরীর বিচিত্র আস্বাদনে। **অপূর্ণতামাত্রই** আমাদের কাছে অশিব। কিন্তু এই অশিবের মধ্যেই শাশ্বত শিবের স্ফুরত্তার সংবেগ রয়েছে। অচিতির গহন হতে ফুটতে গিয়ে সব-কিছু প্রথমটায় অপূর্ণ আকার নিয়েই তো দেখা দেবে। অথচ সে-অপূর্ণতাতে নিগূঢ় চিৎস্বরূপের পরিপূর্ণ রূপায়ণের আশ্বাস থাকবে। কিন্তু বর্তমান অনর্থ ও অপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনার যে-বিদ্রোহ, তারও একটা সার্থ-কতা আছে। বিদ্রোহী চিত্ত প্রথমত রুখে দাঁড়ায় তিতিক্ষার বীর্য নিয়ে, কিন্তু অন্তরে সে জানে অপূর্ণতাকে প্রত্যাখ্যাত ও পরাভূত ক'রে প্রকৃতির রূপান্তর-সাধনাই তার জীবনব্রত। এইজন্যই দেখি, জীবনে অনর্থের ধার যেন কিছুতেই মরতে চায় না। অবিদ্যার রূঢ় আঘাতে বারবার জর্জরিত হয়ে জীবচেতনা বশীকারের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবে, অবশেষে উত্তরায়ণের পথে ধাবিত হবে রূপা-ন্তরের তীব্র আকূতি নিয়ে—এই তার অন্তর্যামীর অভিপ্রায়। অন্তরাবৃত্ত হয়ে চেতনার গভীরে তলিয়ে গিয়ে এক অন্তর্গূঢ় বিপুল সমত্ব ও উপশমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। বহিঃপ্রকৃতির উত্তালতা সেখানে আমাদের

স্পর্শও করবে না। কিন্তু এই অস্পর্শযোগের মুক্তি বৃহৎ হলেও পূর্ণ নয়, কেননা বহিঃপ্রকৃতিরও যে মুক্তির দাবি আছে, সে-দাবিকে এড়িয়ে কেবল অন্তরে ডুবলেই তো চলবে না। তারপর, আত্মমুক্তির দায় মিটলেও তো আমাদের ছুটি নাই —এরও পরে আছে বিশ্বের দুর্গতিহরণের তপস্যা, তার আকূতিকে সার্থক করবার সাধনা। মহামানব কি তার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন ? সর্বভূতের সঙ্গে যে এক হয়ে আছি, এ তো আমাদের অন্তরাত্মার নিবিড় অনুভব এবং সেই অনুভবই যে আত্মমুক্তির মত অপরের বন্ধনমোচনের সাধনাতেও আমাদের প্রচোদিত করে।

বিশ্বের অপূর্ণতা তাহলে বিশ্ববিসৃষ্টির শাশ্বতবিধানের অন্তর্গত। সত্য বটে, এ কেবল সৃষ্টির বিধান এবং সে-বিসৃষ্টির ক্ষেত্রও আমাদের এই বিশ্ব। অতএব বলতে পারি, বিসৃষ্টি না থাকলে কিংবা আমাদের এই জগৎ না থাকলে এমন বিধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিসৃষ্টি আছে, জগৎও আছে—অতএব বিধানও অপরিহার্য হয়ে থাকবে। একথা বললেই হয় না : এই বিধি-বিধান আর তার পরিবেশ মনশ্চেতনার একটা অলীক বিভ্রম মাত্র; ব্রহ্মে এর অসদ্ভাব যখন, তখন এর প্রতি উদাসীন হয়ে অথবা সম্ভূতির কবল হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মের অসম্ভূতিস্বরূপে লীন হওয়াই একমাত্র পুরুষার্থ। দ্বৈতবোধ মনোময় চেতনার সৃষ্টি বটে, কিন্তু মন সে-সৃষ্টির গৌণ সাধন মাত্র। পূর্বেই বলেছি, বিসৃষ্টির পিছনে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রেতি এবং আবেশ আছে— এই তার তত্ত্ব। ব্রহ্মচৈতন্য হতেই মনশ্চেতনার বিক্ষেপ হয়েছে—অখণ্ড-বিজ্ঞানের মধ্যে খণ্ড-অনুভবের সাধনরূপে। তাঁর সত্তা জ্ঞান আনন্দ এবং বীর্য অখণ্ড এবং সর্বগত। এই অপ্রচ্যুত অদ্বৈতভাবের মধ্যে খণ্ডভাবনার প্রতীপ-লীলাকে অনুভব করবার জন্যই মনের বিসৃষ্টি। ব্রহ্মচৈতন্যের এই প্রবৃত্তি ও পরিণামকে আমরা অবাস্তব বলতে পারি এই অর্থে যে, এতেই তাঁর শাশ্বত-সত্যের তাত্ত্বিক পরিচয় মেলে না। তাঁর পারমার্থিক সত্তার দ্বারা বাধিত হয় বলে মিথ্যার লাঞ্ছনে এদের লাঞ্ছিতও করতে পারি। কিন্তু তবু বিসৃষ্টির এই বর্তমান পর্বেও তাদের একান্ত বাস্তব ও অনুপেক্ষণীয় একটা তত্ত্ব যে আছেই— একথা অনস্বীকার্য। এমনও বলতে পারি না, তারা ব্রহ্মচৈতন্যের বিভ্রম—তারা তাঁর দিব্যপ্রজ্ঞার একটা সার্থক কল্পনা নয়, তাঁর দিব্য জ্ঞান বীর্য ও আনন্দের একটা সাকৃত স্ফুরণ নয়। তাদের সত্তা নিশ্চয় সার্থক। কি করে সার্থক, সে হয়তো আমাদের বহির্বৃত্ত চেতনার কাছে একটা নিরুত্তর প্রহেলিকা।

অপরা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যদি বলি : বস্তুর নিয়তিকৃত স্বভাবধর্মের যখন কোনও নড়চড় হতে পারে না, তখন অজ্ঞান অপূর্ণতা পাপ-তাপ দুর্বলতা ও কার্পণ্যের আড়ষ্ট বন্ধন হতে মানুষেরও নিষ্কৃতি কোথায় ?—কিন্তু তাহলে জীবনসাধনার সত্যকার কোনও মূল্যই থাকে না। তমিস্রার আবরণকে বিদীর্ণ

করবার, প্রকৃতির দৈন্যকে আপূরণ করবার মানুষের এই-যে নিরন্ত প্রয়াস, ইহ-জগতে বা ইহজীবনে তার কোনও সার্থকতা কি নাই ? তার একমাত্র পুরুষার্থ কি তবে জীবন হতে জগৎ হতে মনুষ্যত্বের সাধনা হতে—এককথায় তার অপূর্ণ স্বভাবের শাশ্বত কার্পণ্য হতে—মহানিষ্ক্রমণ, দেবলোকে বৈকুণ্ঠধামে বা নির্বিশেষ নিরুপাখ্যের নিরঞ্জন স্থিতিতে নিঃশেষ নিমজ্জন ? তা-ই যদি হয়, তাহলে মিথ্যা ও অজ্ঞান হতে সত্য ও বিজ্ঞানকে, অশিব ও অসুন্দর হতে শিব ও সুন্দরকে, দৌর্বল্য ও দীনতা হতে শক্তি ও মহিমাকে দোহন করবার এই-যে মানুষের নিত্য প্রচেষ্টা, এও তো একটা বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা, প্রতিভাসের অন্তরালে সত্যি তো চিৎস্বরূপের এইসব দৈবী সম্পদ নিহিত নাই। হয়তো তাদের প্রতিপক্ষভূত অদিব্যভাবনাই সত্য—দিব্যভাবনার ফোটবার মুখে একটা আপাত বিকৃতি ও বিপর্যয়ই অদিব্যভাবনার স্বরূপকথা নয়। কি করতে পারে মানুষ তখন ?—অপূর্ণ ধর্মের উচ্ছেদ করতে গিয়ে তার প্রতিপক্ষভূত ধর্মকেও সে অপূর্ণ জ্ঞানে ছাড়িয়ে যেতে পারে। এমনি ক'রে মর্ত্যের অজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে মর্ত্যের জ্ঞানকেও সে বিসর্জন দিক্, দৌর্বল্যকে তাড়াতে গিয়ে বীর্যকেও অনাদর করুক, সংঘর্ষ ও সন্তাপের সঙ্গে নির্বাসিত করুক মানুষের মৈত্রী ও আনন্দকেও। আজও মানুষের মধ্যে এইসব ধর্ম ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না কি তারা মিথুনধর্মী—একই তুচ্ছত্বের যেন সুমেরু আর কুমেরু তারা ? তাদের উৎকর্ষ ও রূপান্তর ঘটানো যখন সম্ভব নয়, তখন ও-দুয়ের মায়া কাটানোই তো ভাল। মানুষভাব কি কখনও দিব্যভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে ? সুতরাং চাই উচ্ছেদ। তাকে পিছনে রেখেই যেতে হবে আমাদের অমানব পুরুষের সন্ধানে।...বৈরাগীর এই এষণার পরিণাম কি, তা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মে ও দর্শনে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এর ফলে ব্যষ্টিজীব দিব্যভাবের পরিপূর্ণ সাধর্ম্য বা সামীপ্য পাবে। কেউ বলেন, এতে নির্বিশেষের অবর্ণতায় জীবাত্মার নির্বাণ ঘটবে। যা-ই হ'ক না কেন, মানুষের মর্ত্যজীবন যে স্বভাবদুষ্ট, তাতে কোনও ভুল নাই। অপূর্ণতাই তার শাশ্বতধর্ম—ব্রহ্মের দিব্য স্বভাবে এই এক নিত্য ও অনতিবর্তনীয় অদিব্য বিভূতি। মনুষ্যধর্মের অঙ্গীকারে, এমন-কি শরীর-সংযোগের সঙ্গে-সঙ্গেই জীবাত্মা দিব্যভাব হতে বিচ্যুত হয়। ওই তার আদি দুরিত বা প্রমাদ। সুতরাং জ্ঞানের উন্মেষ হতেই মানুষের অধ্যাত্মসাধনার একমাত্র লক্ষ্য হবে—ওই দুরিতের অত্যন্তনাশ, তার নির্মম মূলোচ্ছেদ !

এই যদি সত্য হয়, তাহলে দিব্যভাব হতে অদিব্যের বিসৃষ্টি একটা হেঁয়ালি, এবং তার একমাত্র সঙ্গত সমাধান লীলাবাদে। বিশ্ব ব্রহ্মের লীলা মাত্র—এ তাঁর অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে নটের মত শুধু অভিনয়ের আনন্দ পেতেই তিনি অদিব্যভাবের মুখোস পরেছেন—তত্ত্বত দিব্য হয়েও অদিব্যের ভান

করছেন। অথবা অজ্ঞান পাপ ও তাপরূপে অদিব্যভাবের সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর বহুমুখী সিসৃক্ষার উল্লাসে। কোনও-কোনও ধর্মে এমন অদ্ভুত কল্পনাও আছে—ঈশ্বর জগতে পাপী তাপী সৃষ্টি করেছেন দুর্ভাগাদের মুখে তাঁর অনন্ত জ্ঞান বীর্য আনন্দ ও শিবস্বভাবের স্তুতি শোনবার জন্য। তাঁর মাহাত্ম্যকীর্তনে শতমুখ হয়ে দুর্বল জীব খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগিয়ে যাবে তাঁর কল্যাণময় সান্নিধ্যের দিকে আনন্দের প্রসাদ পেতে। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনাতেও তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতে না পারে যদি (জীব স্বভাবত অপূর্ণ বলে সে-সম্ভাবনাই তার বেশী), তাহলে কারও-কারও মতে সেই স্খলনের জন্য তাদের শাস্তি হবে—অনন্ত নরকভোগ!...কিন্তু লীলাবাদের এমন ছেলেমানুষী বিবৃতির জবাবে বলা চলে : ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দময় হয়ে জীবের দুঃখে যদি সুখ পান, কিংবা তাঁর সৃষ্টির খুঁতের জন্য দণ্ডের বোঝা চাপান বেচারার ঘাড়ে, তাহলে তাঁর ঈশ্বরত্বের গুমর টেকে কি? মানুষের বুদ্ধি ও ধর্মবোধ এমন ঈশ্বরের বিদ্রোহী হয়ে বলতে পারে না কি—ঈশ্বর নাই? কিন্তু জীবাত্মা যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, মানুষের অন্তর্গূঢ় চিন্ময়পুরুষই যদি এই অপূর্ণ স্বভাবকে অঙ্গীকার ক'রে মনুষ্যত্বের দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে থাকেন; কিংবা পরমপুরুষের সাযুজ্য যদি জীবের নিয়তি হয়ে থাকে, এখানে এই অপূর্ণতার খেলায় এবং লোকান্তরে পূর্ণানন্দের মেলায় সে যদি তাঁর নিত্য সহচর হয়—তাহলেও লীলাবাদের সকল অসংগতি দূর হয় না বটে, কিন্তু তখন তার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার নালিশ নিয়ে বিদ্রোহ করা চলে না। লীলা-বাদের সমস্যা পূরণ করতে চাই দুটি তথ্যের সন্ধান। প্রথম কথা, এই অদিব্যের বিভাবনায় জীবের সায় ছিল কি না। দ্বিতীয়ত, মহেশ্বরের পুরাণী প্রজ্ঞার কোন্ যুক্তিতে এই লীলা সুগম এবং সার্থক হবে।

বিশ্বলীলাকে আর তেমন অদ্ভুত মনে হয় না এবং তার হেঁয়ালির ধারও অনেকটা মরে আসে, যদি লক্ষ্য করি : প্রকৃতি-পরিণামের মধ্যে নিয়মিত পর্ব-বিভাগ থাকলেও তারা জড়বিগ্রহ জীবেরই উত্তরায়ণের স্থির সোপানমালা। অচিতি হতে পরা সংবিৎ বা সর্বসংবিতের দিকে চলেছে দেবযানের সত্যে-ছাওয়া পথ—তার মধ্যে মানুষের চেতনা যেন মহাবিষুবের সংক্রান্তিবিন্দু। প্রকৃতি-পরিণামের পর্বে-পর্বে চলছে এই দিব্য বিভাবনার আয়োজন। অপূর্ণতা তখন কিন্তু হয় সে-বিভাবনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ, অচিতির মধ্যে দিব্য-ভাবের অখণ্ড ঐশ্বর্য যখন গুহাহিত হয়ে রয়েছে, তখন তার বিকাশও হবে একটা ক্রমকে অবলম্বন করে। ক্রম থাকলেই দল-মেলার ব্যাপার থাকবে—কুঁড়ি ধীরে-ধীরে ফুটবে ফুল হয়ে, অতএব ফোটা ফুলের তুলনায় তাকে অপূর্ণ বলতেই হবে। বিসৃষ্টিতে পরিণামের লীলা থাকলে স্বভাবত একটা অন্তরিক্ষ-লোক দেখা দেবে, আর তার উপরে-নীচে থাকবে আরও অনেক লোকের পর-

স্পরা। মানুষের মনোময় চেতনায় আমরা ঠিক এইটিই দেখি। তার মধ্যে বিদ্যা আর অবিদ্যার আলো-আঁধারি। এখনও সে অচিতি আর পূর্ণচিতির মধ্যে তটস্থা শক্তি যেন—অচিতির উপর দাঁড়িয়ে ধীরে-ধীরে উদ্ভিন্ন হচ্ছে বিশ্বচেতন পরমা প্রকৃতির দিকে। এমনিতর দল-মেলাতে অপূর্ণতা ও অবিদ্যার আমেজ থাকবেই। শুধু তা-ই নয়, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ-কোনও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যে স্বরূপ-সত্যের আপাত-বিপর্যয়ও তার অপরিহার্য সাধন হবে। অবিদ্যা অথবা অপূর্ণতাকে কায়েমী করতে হলে চাই দিব্যভাবের আপাত-প্রতিষেধ। তার অখণ্ড চেতনা বীর্য কল্যাণ আনন্দ ও সৌষম্যের জায়গায় ঠাঁই দিতে হবে বৈষম্য সংঘাত সংকোচ অচেতনা অসারতা অনর্থ ও সন্তাপকে। এই বিপর্যয়ের অবকাশটুকু না থাকলে অপূর্ণতা দৃঢ়মূল হতে পারে না অপরা প্রকৃতিতে, তার অন্তর্গূঢ় দিব্যভাবনাকে স্তম্ভিত ক'রে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে কি জিইয়ে রাখতে পারে না আপন স্বভাবকে। খণ্ডিত জ্ঞান নিশ্চয় অপূর্ণ জ্ঞান। আবার অপূর্ণ জ্ঞানে ন্যূনতা যতখানি, ততখানি অবিদ্যা—অতএব তা দিব্যভাবের প্রতিপক্ষ। কিন্তু এই অবিদ্যাই যখন আপন সঙ্কুচিত বিদ্যার সীমা পেরিয়ে তাকাতে যায়, তখন তার এযাবৎ-নিশ্চেষ্ট প্রতিপক্ষতা ধরে অর্থক্রিয়াকারী প্রতিপক্ষের রূপ। অর্থাৎ অবিদ্যাই তখন হয় ভ্রান্তির জননী, জ্ঞানে কর্মে জীবনে ব্যবহারে ফেলে অনৃত ও বিপর্যয়ের ছায়া। জ্ঞানের বিপর্যয় বিপথে নিয়ে চলে সঙ্কল্পকে—প্রথমে হয়তো ভুলের বশে। কিন্তু ক্রমে ভুল ভাঙলেও অভ্যাস আর ফিরতে চায় না—তখন বিপথ হয় রুচির পথ, আসক্তি ও উল্লাসের পথ। এমনি করে অবিদ্যার সহজ আবরণ হতেই জটিল বিক্ষেপের সৃষ্টি। অচিতি আর অবিদ্যাকে একবার মানলে পরে, অনর্থের এই পরম্পরা স্বভাবের বশেই দেখা দেবে। তখন বাধ্য হয়ে তাদেরও মানতে হবে। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই : আদপেই বিসৃষ্টির ওই পর্বায়ণের কি প্রয়োজন ছিল? বুদ্ধির কাছে এখনও এর উত্তরটা অস্পষ্ট।

এধরনের আত্মবিসৃষ্টি বা লীলার বোঝাকে অনিচ্ছুক জীবের ঘাড়ে চাপানোটা কিছুতেই যুক্তিসংগত নয়। কিন্তু স্পষ্ট দেখছি, এ-লীলাতে নিশ্চয় দেহীর সমর্থন ছিল—কেননা পুরুষের অনুমতি ছাড়া প্রকৃতির এক পা-ও এগোবার জো নাই। অতএব বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে শুধু-যে দিব্য-পুরুষের অনুমতি আছে তা নয়, জীববিসৃষ্টিতে জীবাত্মারও নিশ্চয় সায় আছে।...তবু প্রশ্ন হবে : দিব্য-পুরুষের ক্রতু ও আনন্দ কেন পরম্পরিত বিসৃষ্টির এই বেদনা-বিধুর দুর্গম পথ ধরল, আর জীবাত্মাই-বা তাতে সায় দিল কেন—সে-রহস্য তো রহস্যই থেকে গেল! কিন্তু নিজেদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে যদি অনুমান করি, বিশ্ববিসৃষ্টিরও মূলে ছিল অনুত্তরের এমনি একটা প্রেতি—তাহলে কিন্তু সমস্যাটাকে আর অসাধ্য মনে হয় না। বরং নিজেকে হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে বার করবার মধ্যে যে বীর্যের উল্লাস যে দুর্নিবার আকর্ষণ

রয়েছে, মনে হয় বিশ্বের কোথাও বুঝি তার তুলনা নাই। জয়োল্লাস ছাড়া মানুষের আর কী প্রিয় আছে? পথের বাধাকে নির্জিত করে ছিনিয়ে আনা জ্ঞান, ছিনিয়ে আনা শক্তি—সৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো অভিনবের পুঞ্জ-পুঞ্জ রূপায়ণে, বেদনাপ্লুত কৃচ্ছ্রতপস্যা ও দুঃখের অগ্নিদহনকে নির্জিত করে অদীনসত্ত্ব আত্মাকে নন্দিত করা—এই কি মনুষ্যত্বের চরম পুরস্কার নয়? অজ্ঞানেরও একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, কেননা সে সত্যৈষণার উল্লাস জাগায়, আনে অজানার আবির্ভাবে বিস্ময়ের চমক, নিরুদ্দেশের অভিযানে আত্মাকে দেয় প্রেরণা। আনন্দ চলার পথে, আনন্দ হারামণির অন্বেষণে, আনন্দ তাকে ফিরে পাওয়ায়। রণদুর্মদ বীরের আনন্দ শিরে জয়ের মুকুট প'রে—প্রাণপাতী তপস্যায় বাঞ্ছিত সিদ্ধিকে আয়ত্ত ক'রে। আনন্দ হতেই যদি সৃষ্টি উচ্ছলিত হয়ে থাকে, তাহলে জীবনসাধনাও সেই আনন্দের একটা ঢেউ। এই আপাতবিরোধ-কণ্টকিত প্রতীপ-লীলার মূলে আছে এরই প্রবর্তনা—অন্তত একে বলব তার অন্যতম প্রয়োজক। কিন্তু জীবভূত পুরুষের এই কৃচ্ছ্রতপস্যার আনন্দ ছাড়াও অনাদি-সন্মাত্রে প্রচ্ছন্ন আছে আরও-একটা গভীরতর সত্যের নিরূঢ় প্রেতি—যা আপনাকে স্ফুরিত করছে অচিতির গহনে তাঁর এই আত্মনিমজ্জনে। তাঁর আকূতি সার্থক হয়েছে—বিপরীত-ভাবনার ভিতর দিয়েই সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বভাবের অভিনব উন্মেষণে। যিনি অনন্তস্বরূপ, তাঁর আত্মবিভাবনার বৈচিত্র্যের যদি কোনও অন্ত না থাকে, তাহলে এমনি করে অমার আঁধারে পৌর্ণমাসীকে ফুটিয়ে তোলাও তাঁর একটা বিলাস এবং তা রহস্যবেদীর কাছে দুর্বোধ না হয়ে বরং বয়ে আনে একটা নিগূঢ়-গহন সার্থকতার ব্যঞ্জনা।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রপঞ্চবিভ্রম : মন স্বপ্ন ও কুহক

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

গীতা ৯।৩৩

অনিত্য অসুখকর এই জগতে এসে আমারই ভজনা কর তুমি।

—গীতা (৯।৩৩)

আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ...হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ। স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসংচরতি। স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি।... তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ, ইদং চ পরলোকস্থানং চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ। ...স যত্র প্রস্বপিতি, অস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা। প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ, স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। ন তত্র রথা ন পন্থানো ভবন্তি, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, —ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি। অথ সৃজতে। স হি কর্তা।

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যা অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি ॥
প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥
...অথো খল্বাহুঃ, জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি, যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইতি; অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।৭, ৯—১২, ১৪

দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি সর্বঃ পশ্যতি ॥

প্রশ্নোপনিষৎ ৪।৫

এই আত্মা বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে তিনি অন্তর্জ্যোতি; সকল ভূমিতে সমান পুরুষ-রূপে দুটি লোকেই করেন সঞ্চরণ। স্বপ্ন-পুরুষ হয়ে এই লোককে করেন তিনি অতিক্রম—পার হয়ে যান মৃত্যুর যত রূপ।...সেই পুরুষের আছে দুটি স্থান—একটি ইহলোক, আর একটি পরলোক; তৃতীয়টি সন্ধিভূমি ও স্বপ্নস্থান। ওই সন্ধি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই দুটি স্থানই দেখেন তিনি—দেখেন ইহলোক আর পরলোক। যখন ঘুমান, তখন সর্বাধার এই লোকের উপাদান নিয়ে নিজেই ভাঙেন নিজেই গড়েন —আপন আভায় আপন জ্যোতিতে। এই পুরুষ ঘুমান যখন, তখন হন স্বয়ংজ্যোতি। সেখানে নাই রথ বা পথ, নাই আনন্দ বা প্রমোদ, নাই পুকুর বা নদী; কিন্তু আপন জ্যোতিতে তাদের সৃষ্টি করেন তিনি, কেননা তিনিই কর্তা। সুপ্তি দিয়ে শরীর ছেড়ে অসুপ্ত থেকে সুপ্তদের দেখেন তিনি। প্রাণবায়ু দিয়ে নীচের বাসাটি বাঁচিয়ে রেখে বাসার বাইরে চলে যান অমৃতস্বরূপ; চলে যান যেখানে খুশি—হিরণ্ময় অমৃত পুরুষ, সঙ্গীহারা হংস যিনি।...লোকে বলে, 'শুধু জাগরণের দেশই তাঁর, কেননা যা তিনি জেগে দেখেন তা-ই দেখেন স্বপ্নে'; কিন্তু ওখানে তিনি স্বয়ংজ্যোতি।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৩।৭, ৯-১২, ১৪)

দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট, শ্রুত এবং অশ্রুত, অনুভূত এবং অননুভূত, সৎ এবং অসৎ —সবই দেখেন তিনি; সবই তিনি—দেখেন তাই।

—প্রশ্ন উপনিষদ (৪।৫)

মানুষ মনোময়। তার সকল চিন্তা সকল অনুভব নিরন্তর আন্দোলিত হচ্ছে অস্তি আর নাস্তি দুয়ের দোলায়। ভাবের জগতে এমন সত্য নাই, অনুভবের এমন কোটি নাই, যার সম্পর্কে তার মন হাঁ কিংবা না দুইই না বলতে পারে। যেমন সে বলেছে জীব নাই, জগৎ নাই, বিশ্বগত বা বিশ্বমূল তত্ত্ববস্তু নাই—অথবা কোনও তত্ত্বই নাই জীব আর জগৎ ছাড়া; তেমনি আবার সে এদের স্বীকারও করেছে পদে-পদে—কখনও মেনেছে একটিকে, কখনও জোড়ায়-জোড়ায়, কখনও-বা সবকটিকেই। এ না করে তার উপায় নাই, কেননা মানুষের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত-মনের ধর্মই হল বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে কারবার করা। কারও মর্মসত্যের সন্ধান সে জানে না বলে সবাইকে চায় বাজিয়ে নিতে—কখনও একে-একে, কখনও-বা জুড়ে মিলিয়ে। এমনি করে কোথাও যদি জ্ঞান কি বিশ্বাসের পাকা একটা ভিত্তি মেলে—এই তার আশা। অথচ তার জগৎ সম্ভাবিত এবং আপেক্ষিক সত্যের জগৎ, তাই কোনও-কিছুর সম্পর্কে একটা চরম নৈশ্চিত্য বা ধ্রুবসিদ্ধান্তে পৌঁছনো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমন-কি প্রত্যক্ষ বাস্তবও মানুষের মনে ধরে সংশয়ের রূপ—স্যাদ্-বাদের আওতায় প'ড়ে। 'হতে পারে, নাও হতে পারে'—মনের এ-দ্বিধা সবার বেলায়। যা 'হয়েছে', তারও চেহারা তার কাছে আচ্ছন্ন—কেননা সে 'নাও হতে পারত' এ-শঙ্কাও যেমন সম্ভব, তেমনি ভবিষ্যতে সে থাকবে না, এও তো মিথ্যা নয়। সমস্ত প্রাণনের 'পরেও রয়েছে অনিশ্চয়তার এই অভিশাপ। প্রাণপুরুষ জীবনের এমন-কোনও লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে সুস্থির হতে পারছে না, যা তাকে নিশ্চিত বা চরম তৃপ্তি দেবে, তার মধ্যে আনবে ধ্রুবসিদ্ধির কোনও আশ্বাস। ভূতার্থের পুঁজিকে সত্য মেনে জীবনের যাত্রা শুরু। কিন্তু দুদিনেই তার সে-পুঁজি ফুরিয়ে যায় অনিশ্চিত ভব্যার্থের পিছনে ছুটে। তখন, যাকে সে সত্য বলে মেনেছিল, তাকেও সংশয় করে। এ-পরিণাম তার পক্ষে স্বাভাবিক। কেননা, প্রথম থেকেই তার নির্ভর অবিদ্যার 'পরে—সত্যের নিশ্চিত রূপটি সে চেনে না। তাই চলার পথে যে-সত্যকেই সে আশ্রয় করে, তাকেই ছেড়ে যেতে হয় অপূর্ণ একদেশী ও সন্দিগ্ধ মনে করে।

মানুষ প্রথম থাকে জড়ীয় মনের ভূমিতে। সে-মন পরাক্-বৃত্ত, তাই সে শুধু জড়জগতের বাস্তব তথ্যকে মানে। সে-তথ্য তার কাছে নিঃসংশয়ে স্বতঃসিদ্ধ। যা স্থূল বাস্তব কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার কাছে তা অবাস্তব বা অজাত। যখন তা ভূতার্থরূপে জড়জগতের তথ্যরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে, তখনই তার বাস্তবতাকে পুরাপুরি মানা চলবে। নিজেকেও সে-মন জানে প্রত্যক্ তত্ত্ব বলে নয়, পরাক্ তথ্য বলে। যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করে আছে বলেই তার সত্তাকে বাস্তব বলা যায়। বাইরে কি ভিতরে প্রত্যক্-চেতনার অস্তিত্বকে প্রামাণিক বলে সে স্বীকার করে—একমাত্র তার বহির্বৃত্ত

চেতনার বিষয়রূপে। অথবা শুধু বহিশ্চেতনার আহৃত তথ্যের 'পরে নির্ভর করে যে-বুদ্ধি জ্ঞানের পাকা ইমারত গড়ে তোলে, এ-বিষয়ে তার রায়কেই সে চূড়ান্ত বলে মানে। আধুনিক জড়বিজ্ঞান এই মনোবৃত্তির একটা বিরাট রাজ্য। জড় ইন্দ্রিয় যে তথ্য বা বস্তুর সন্ধান পায় না, যন্ত্রযোগে তাকে ইন্দ্রিয়বোধের এলাকায় এনে ইন্দ্রিয়ের ভুলকে সে সংশোধন করে, ইন্দ্রিয়-মানসের প্রথম বেড়া ডিঙিয়ে ধাওয়া করে ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে। কিন্তু তারও তত্ত্বের কষ্টিপাথর হল ভূতার্থের স্থূল বাস্তবতা। বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি আর ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য দিয়ে যার যাচাই চলে, একমাত্র তারই প্রামাণ্য আছে তার কাছে।

কিন্তু জড়ীয় মনেরও পরে মানুষের মধ্যে আছে প্রাণীয় মন, যা তার কামনা-বাসনার বাহন। তার তৃপ্তি ভূতার্থে নয়, ভব্যার্থ নিয়ে তার কারবার। নিত্য-নূতনের প্রতি দুর্নিবার তার আকর্ষণ। অভ্যস্ত প্রাত্যহিকের বাঁধন ছিঁড়ে অনুভবের রাজ্য দিকে-দিকে প্রসারিত হ'ক—আসুক জীবনে কামনার নিরঙ্কুশ তর্পণ, ভোগের অজস্র উচ্ছলতা, স্ফীতকায় অহংএর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের প্লাবন নামুক—এই সে চায়। বাস্তব ভোগের শেষ বিন্দুটি নিঙড়ে নিতে যেমন সে চায়, তেমনি তার বিহার ভব্যার্থের কল্পজগতে। তারাও রূপ ধরুক, উপচে পড়ুক তার পানপাত্র হতে—এও তার আকূতি। শুধু জড় বাস্তবকে নিয়ে তার তৃষ্ণা মেটে না, সে চায় অন্তরে কল্পনা ও রসচেতনার সার্থক উদ্বোধনে রোমাঞ্চিত তৃপ্তির আনন্দ। কল্পলোকে এই অবাধসঞ্চারের অধিকার না থাকলে মানুষের জড়ীয় মন অবশভাবে পশু-জীবনের অনুবর্তন করত শুধু, জড়াশ্রয়ী বাস্তবজীবনের উদ্যোগপর্বেই তার অনাগত ভবিষ্যের যবনিকা পড়ত, জড়প্রকৃতির মূঢ় নিয়তিকে অতিক্রম করে তার আর-কিছুই কামনা করবার সাধ্য থাকত না। কিন্তু ভূতার্থের আড়ষ্ট বন্ধনে সঙ্কুচিত মূঢ় বা অভ্যস্ত তৃপ্তির কার্পণ্যকে প্রাণচঞ্চল বাসনার অশান্ত আকূতি সবলে আঘাত করে—স্তিমিত মনকে চকিত করে তোলে উদগ্র কামনা, অতৃপ্তির দাহ, জীবনের নিশ্চিত তৃপ্তির বাইরেও একটা-কিছু পাবার ব্যাকুল এষণা। এমনিভাবে আমাদের প্রাণীয় মন অভূত সম্ভাবনার চরিতার্থতায় বাস্তব ভূতার্থের সীমানাকে প্রসারিত করে—দূর-দিগন্তের নিত্য ইশারা আনে চেতনায়, নব-নব লোকের সন্ধানে ছোটে প্রাণের বিজয়-অভিযান, পরিবেশের সকল সঙ্কীর্ণতা চূর্ণ ক'রে স্বোত্তর প্রতিষ্ঠার দুর্বার প্রেতি জাগে তার শিরায়-শিরায়।...এই অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের চিন্তাবিধুর মনও যোগ দেয়। সব-কিছুকে খুঁটিয়ে দেখা, সংশয় করা তার স্বভাব। কত মত সে গড়ে আবার ভাঙে। সিদ্ধান্তের নিত্য-নূতন সৌধ রচনা করে, কিন্তু কাউকে চরম বলে মানতে রাজী হয় না। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে প্রমাণ মেনেও

তাকে সংশয় করে। যুক্তির পথে আপাত-শেষ নির্ণয়ে পৌঁছে আবার তাকে বিপর্যস্ত করে নতুন বা বিপরীত নির্ণয়ের খাতিরে।—এমনি করে অনিশ্চয়ের পথে চলে বুঝি অন্তহীন তার অভিযান! মানুষের মনোরাজ্যের, তার সাধনার এই তো ইতিহাস। তার নিরন্ত প্রয়াসে চারদিকের সীমার বাঁধন ভেঙে পড়ছে, কিন্তু চেতনার একভূমি হতে আরেক ভূমিতে উদয়ন ঘটছে না—শুধু অনন্য অথবা অনুরূপ কুণ্ডলীর বিস্ফারিত কম্বুরেখার মধ্যে বারবার সে পাক খেয়ে মরছে। তাই মানুষের নিত্যচঞ্চল এষণা পুরুষার্থ-সিদ্ধির একটা স্থির-নিশ্চিত প্রত্যয়ের কূলে কোনকালেই পৌঁছতে পারল না, তার নিজের কোনও নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের চরম প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হল না, শাশ্বত জীবন-সত্যের কোনও দৃঢ়মূল ভিত্তি কি সুস্পষ্ট আকার রূপ পেল না তার কল্পনায়।

এই নিত্যচঞ্চল অস্বস্তি ও আকূতির বিশেষ-একটা পর্বে, জড়ীয় মনও যেন বাস্তবের নৈশ্চিত্যে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এক অতর্কিত নাস্তিক্য-বুদ্ধি তার স্বকল্পিত জীবনাদর্শ ও জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পর্কে সংশয় জাগায়। সে ভাবে : বাস্তব বলে যাকে আঁকড়ে ছিলাম, সে কি বাস্তব? আর বাস্তব হলেও তার কি কোনও সার্থকতা আছে? বিড়ম্বিত জীবনে ব্যর্থ অথবা অতৃপ্ত কামনার পীড়নে আর্ত হয়ে প্রাণীয় মনও গভীর নির্বেদ ও নৈরাশ্যের সুরে বলে ওঠে—এসবই অসার চিত্তক্ষোভকর বিড়ম্বনামাত্র! জীবন অর্থহীন, আমাদের অস্তিত্বই একটা মরীচিকা। সব মায়া—সব মায়া! মিথ্যা ঘুরে মরছি আলেয়ার পিছু-পিছু।...মননবিধুর মন মতবাদের কত ভাঙা-গড়ার পর সহসা আবিষ্কার করে—এতদিন সে কল্পনায় আকাশকুসুম রচেছে শুধু। জগতে পরমার্থ কোথায়? পরমার্থ বলে কিছু থাকলেও আছে সকল বিকল্পনার বাইরে নির্বিশেষ এবং শাশ্বত হয়ে। যা সবিশেষ, যা কালকলিত, তা স্বপ্ন বা কুহক মাত্র। নিখিল প্রপঞ্চই একটা বিপুল প্রলাপ, একটা বিরাট বিভ্রম—প্রতিভাসের একটা মৃগতৃষ্ণিকা।...এমনি করে অস্তির প্রত্যয়কে ছাপিয়ে ওঠে নাস্তির প্রত্যয়—বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে তার ঐকান্তিক নিষ্ঠার উগ্রতা। এইহতে দেখা দেয় পৃথিবীর যত বড়-বড় নৈতিবাদী ধর্ম ও দর্শন। ইহজীবনের অগ্রসর প্রেতি হতে বিমুখ হয়ে মানুষ তার শাশ্বত নিরঞ্জন সিদ্ধি খোঁজে জীবনের ওপারে, অথবা জীবনের প্রলয় ঘটায় অব্যক্ত অক্ষরতত্ত্বে কিংবা পূর্ব্য অসতের মহাশূন্যতায় তলিয়ে গিয়ে। এদেশে বুদ্ধ আর শঙ্কর এই দুই মহামনীষীর দর্শনে নৈতিবাদ একটা মহাবীর্যশালী রূপ ও বৃহৎ সার্থকতা পেয়েছে। বুদ্ধ আর শঙ্করের মাঝামাঝি কিংবা তাঁদের পরের যুগে, এছাড়াও বড়-বড় দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের কারও-কারও প্রচারও হয়েছে যথেষ্ট, প্রতিভাবান সূক্ষ্মদর্শী সাধকের বিচার-মনীষা বৌদ্ধ ও শাঙ্কর দর্শনের নৈতিবাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে কোথাও-কোথাও অল্পাধিক

সফলও হয়েছে। কিন্তু তবু বিচারশৈলীর চিত্তাকর্ষকতা, সম্প্রদায়প্রবর্তকের বিরাট ব্যক্তিত্ব, অথবা জনসাধারণের উপর বিপুল প্রভাবের দিক দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এদেশের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে বুদ্ধের পরেই শঙ্করের স্থান, কেননা বৌদ্ধদর্শনের পূর্ণতর অনুবৃত্তিরূপেই শঙ্করদর্শন তার ঠাঁই জুড়েছে। তাই বহুযুগের অনুশীলনের ফলে এ-দুটি দর্শন ভারতবর্ষের সাধনা বিচার ও জনমানসকে আপন ছাঁচে ঢেলেছে। এখানকার সব-কিছুর 'পরে পড়েছে নৈতিবাদের করাল ছায়া। কর্মশৃঙ্খল ভবচক্র আর মায়া—তার এই তিনটি কীলক বজ্রদৃঢ় হয়ে প্রোথিত হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে। অতএব নৈতিবাদের গোড়ার ভাব বা সত্যকে নতুন করে যাচাই করবার দরকার আছে। খুব সংক্ষেপে হলেও, এ-দর্শনের মূলসূত্র এবং তার ব্যঞ্জনার সার্থকতা কি, কোন্ তত্ত্বদর্শনের 'পরে তাদের প্রতিষ্ঠা, যুক্তি বা অনুভবের কাছে তাদের কতটুকু প্রামাণ্য—এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমত আমাদের সমীক্ষা চলবে মায়াবাদের মূল ভাবগুলি নিয়ে—আমাদের নিজস্ব ভাব ও দর্শনের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া করতে হবে। কেননা, অদ্বৈতবাদ হতে দুটি দর্শনের যাত্রা শুরু হলেও মায়াবাদ পর্যবসিত হয়েছে প্রপঞ্চবিভ্রমবাদে, আর আমাদের দর্শন পেঁাছেছে প্রপঞ্চ-সত্যতাবাদে। এক মতে, প্রপঞ্চ অসৎ অথবা সদসৎ, ব্রহ্মের তুরীয়ভাব তার বিভ্রমের অধিষ্ঠান। আরেক মতে প্রপঞ্চ সৎ, তার আয়তন যুগপৎ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মসত্তা।

জীবনের প্রতি প্রাণপুরুষের সচরাচর যে বিতৃষ্ণা বা জুগুপ্সা, তাকে একান্ত ভাববার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। এর মূলে আছে জীবনসম্পর্কে নৈরাশ্যবাদীর ব্যর্থতাবোধের পীড়া। তাকে যদি সত্য বলে মানি, তাহলে আশাবাদীর জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলবার অদম্য আকূতি শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পকেই-বা সত্য বলে মানব না কেন? অবশ্য জীবনের ব্যর্থতাবোধে মনের যে-সায়, তার কতকটা সমর্থন আসে ব্যাবহারিক জগৎ থেকেই। বিচার-শীল মন দেখে, পৃথিবীতে মানুষের সকল প্রয়াস ও সাধনা একটা মায়ার ছলনা মাত্র। তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদ, মনুষ্যত্বের সাধনায় তার সিদ্ধিলাভের আশা, তার প্রজাহিত ও ভূতহিতের স্বপ্ন, কর্মে কীর্তিতে সিদ্ধিতে শক্তিতে তার সার্থক হবার আকূতি—সমস্তই শুধু আলেয়ার পিছনে ছোটাছুটি! মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করবার চেষ্টা এপর্যন্ত একটা আবর্তের মধ্যেই ঘুরছে। কত আইনের বাঁধন, জনমঙ্গল কত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও চারিত্র ধর্ম ও দর্শনের কত সাধনা চলে আসছে আবহমান কাল ধরে, কিন্তু মানুষের স্বভাবের অপূর্ণতায় বা জীবনের পঙ্গুতায় কি এতটুকুও রূপান্তর এসেছে? আদর্শ মানবসমাজ দূরে থাকুক, একটা আদর্শ মানুষও কি গড়ে

উঠেছে কোনওকালে ? কথায় বলে, কুকুরের লেজকে যত সিধাই কর—ছেড়ে দিতেই সে যে বাঁকা সেই বাঁকা ! বিশ্বমৈত্রী প্রজাহিত ও ভূতহিতের বাণী, খ্রীস্টের প্রেম বা বুদ্ধের করুণা জগৎকে একটুকু সুখী করতে পারেনি। নীরন্ধ্র অন্ধকারে এখানে-সেখানে তারা জ্বালিয়েছে শুধু খদ্যোতের দ্যুতি, বিশ্বজোড়া দুঃখের দাবানলে ঢেলেছে কেবল শিশিরের বিন্দু! অতএব, ক্ষণিক বিভ্রমের ব্যর্থতায় মানুষের সকল আকুতি লুটিয়ে পড়বে, তার সকল সিদ্ধি হবে অতৃপ্তির বেদনায় ছাওয়া স্বপ্নবুদ্বুদ মাত্র। তার সকল কর্ম সিদ্ধি-অসিদ্ধির দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত প্রাণপাতী আয়াস শুধু—কোথায় তার নিশ্চিত পরিণাম ? রূপান্তরের সাধনা মানুষের জীবনে ঘটাবে কেবল আকৃতির বদল—প্রকৃতির নয়। একের পিছনে একে তারা চক্রকের সৃষ্টি করবে শুধু—এই তো মানুষের অনুত্তরণীয় নিয়তি, তার জীবনের অনতিবর্তনীয় স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম।...এই নৈরাশ্যবাদে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকলেও একে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এতে মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী বেদনাময় অনুভবের স্বাক্ষর আছে—আছে এমন-একটা স্বারসিক তাৎপর্য, যা কোনও-না-কোনও সময়ে স্বতঃপ্রামাণ্যের দুর্বার বেগে মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে। শুধু তা-ই নয়। নিয়তির অলঙ্ঘ্য শাসনে বাঁধা মর্ত্যজীবনের যা-কিছু মৌল বিধান ও সার্থকতা, চক্রাবর্তন হতে কোনকালেই তাদের নিষ্কৃতি নাই—আমাদের যুগসঞ্চিত এই লোকাতত সংস্কার যদি একান্তই সত্য হয়, তাহলে নৈরাশ্যবাদ ছাড়া জীবন সম্পর্কে আর-কোনও সিদ্ধান্তকে আমল দেওয়া চলে না। বাস্তবিক এ তো অস্বীকার করবার উপায় নাই যে সারা জগৎ ছেয়ে দেখছি শুধু দুঃখ অজ্ঞান অপূর্ণতা ও অসিদ্ধির করাল ছায়া। যারা তাদের প্রতিপক্ষ, সেই আনন্দ জ্ঞান পূর্ণতা ও সিদ্ধির লেখা তার মধ্যে শুধু ক্ষণিকার চমক বা আলেয়ার মায়া। আবার এমনি নিবিড়ভাবে তারা ওতপ্রোত হয়ে আছে যে, জগতের এই যদি শাশ্বত রীতি হয়, আর-কোনও মহত্তর সিদ্ধির দিকে যদি তার কোনও ইশারা না থাকে, তাহলে বিশ্বপ্রপঞ্চকে অশক্ত অপূর্ণ অথবা অলীক বলা ছাড়া আর কোনও পথই থাকে না। বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয় : হয় এ-বিশ্ব অচিৎশক্তির বিসৃষ্টি, তাই আপাত-চেতনার সকল সাধনা এখানে অশক্তি বা ব্যর্থতার অভিশাপে বিড়ম্বিত। নয়তো স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই এখানে চলছে শুধু কৃচ্ছ্রতার একটা বিফল সাধনা—তার সিদ্ধির দেখা পাব 'হেথা নয়—অন্য কোনওখানে'। কিংবা সমস্ত বিশ্বব্যাপারটাই হয়তো একটা অর্থহীন বিরাট বিভ্রম মাত্র!

এই তিনটি কল্পের মধ্যে দ্বিতীয়টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলেও তাকে বিচারসহ বলতে পারি না। কারণ, 'ইহ' আর 'অমুত্র'কে তার মাঝে দাঁড় করানো হয়েছে অস্তিত্বের দুটি বিপরীত কোটিরূপে। দুয়ের

মাঝে যোগাযোগ কোথায়, তার কোনও সন্তোষজনক নির্দেশ নাই। দুয়ের মাঝে সমবায়সম্বন্ধেরও কোনও ইঙ্গিত নাই। তাছাড়া ইহলোককে আত্মার নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনার ক্ষেত্ররূপে সৃষ্টি করবার প্রয়োজন বা সার্থকতা কোথায়, তারও কোনও জবাব পাই না। এ শুধু খেয়ালী স্রষ্টার দুর্বোধ একটা খেয়াল বললে গোল চোকে বটে, কিন্তু বুদ্ধি তাতে খুশী হয় না। বলা চলে : অমৃতপুরুষেরা অবিদ্যার নতুন খেলা খেলতে স্বেচ্ছায় এখানে নেমে আসেন, কেননা অবিদ্যাকল্পিত জগতের স্বরূপ চিনে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার একটা দায় তাঁদের আছে। কিন্তু স্বভাবতই এমন সিসৃক্ষার আবেগ যেমন আকস্মিক তেমনি অচিরস্থায়ী হবে—এই পৃথিবীতে তার রূপায়ণের সম্ভাবনাও হবে অনিয়ত। অতএব তার জন্য নিত্যকাল ধরে এই বিরাট জগৎ-যন্ত্র সৃষ্টি করবার প্রয়োজন কি ছিল?...কিন্তু যদি বলি : এক মহত্তর সিসৃক্ষাকে চরিতার্থ করবার আয়োজন চলছে এই জগতে। এক দিব্য সত্য অথবা চিন্ময় সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠছে এখানে। তার জন্যে বিসৃষ্টির বিশেষ পর্বে দেখা দিয়েছে অবিদ্যার নিতান্ত সপ্রয়োজন একটা প্রবেশক। আবার বিশ্বের ব্যবস্থা এমনি সুকৌশল যে এখানে বাধ্য হয়ে অবিদ্যা চলছে বিদ্যার এষণায়, অপূর্ণ সূচনা বহন করছে পূর্ণসিদ্ধির প্রবেগ, ব্যর্থতার ইঙ্গিত রয়েছে জয়শ্রীর চরম প্রসাদের দিকে, দুঃখের তপস্যাতেই আছে চিন্ময় আনন্দের সহজ উন্মেষের সাধনা।—তাহলে কিন্তু সৃষ্টিসমস্যার সমাধান স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল হয়। তখন আর নৈরাশ্যভরে বিশ্বকে একটা অসার বঞ্চনা কি অর্থহীন প্রলাপ মনে করে বিলাপ করবার সঙ্গত কোনও কারণ থাকবে না। কারণ, এতকাল যারা বিলাপের মূল হেতু ছিল, তাদের তখন মনে হবে কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক নিয়তি বলে। বুঝব, বিশ্ব জুড়ে এই-যে প্রয়াস ও আয়াস সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সুখ ও দুঃখ বিদ্যা ও অবিদ্যার নিদারুণ দ্বন্দ্ব, তারও একান্ত প্রয়োজন আছে—এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন-চেতনাকে চিন্ময় সিদ্ধজীবনের ভাস্বর মহিমায় উত্তীর্ণ করবার জন্য। নিখিল বিশ্বকে তখন মনে হবে সৃষ্টির একটি উন্মিষন্ত শতদল। তার তাৎপর্য বোঝবার জন্য সর্বশক্তিমানের স্বৈরাচার প্রপঞ্চবিভ্রম অথবা অর্থহীন মায়াকুহকের কল্পনা আর প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু প্রপঞ্চনিষেধের দার্শনিক প্রামাণ্যের মূল এর চাইতেও গভীর যুক্তি ও অধ্যাত্ম-অনুভবের মধ্যে। তর্কের ভিত সেখানে আরও পোক্ত। দার্শনিক বলবেন : বিভ্রমই প্রপঞ্চের স্বভাব এবং স্বরূপ। যা বস্তুতই বিভ্রম, তার লক্ষণ ও নৈমিত্তিক ধর্ম নিয়ে হাজার তর্ক করেও তাকে তত্ত্বের প্রামাণ্য বা মর্যাদা দেওয়া চলে না। বিশ্বোত্তীর্ণ তুরীয়-ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব, তাঁর তুলনায় আর-সমস্তই অতত্ত্ব। চিন্ময় ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ প্রকাশে এই মর্ত্যজীবন

যদি দেবজীবনের ফুলন্ত জ্যোতিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, তবু তার স্বভাবের মূলে রয়েছে যে অতত্ত্বের অভিনিবেশ, তাহতে তার নিষ্কৃতি কোথায়? তাই দৈবী সম্পদের এই মহিমাকেও বলব বিভ্রমেরই হিরণ্যদ্যুতি। একান্ত বিভ্রম না বললেও তাকে বলব অবর-সত্য। তার মোহ ভাঙবে, যখন জীব জানবে—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অক্ষর তুরীয়ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই কোথাও নাই।...এই যদি হয় একমাত্র সত্য, তাহলে আমাদেরও অবস্থা হ'য়ে পড়ে একেবারে নিরালম্ব। চিন্ময় বিসৃষ্টির লীলা, জড়ত্বের 'পরে জীবচেতনার বিজয়, তার মহেশ্বরী সিদ্ধি, এই অপরা প্রকৃতিতে দিব্য-জীবনের উন্মেষ—এসমস্তই তখন মিথ্যা, অথবা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের 'পরে আরোপিত একটা ক্ষণিক বিভ্রমের খেলা। কিন্তু মনের সংস্কার অথবা মনোময়-পুরুষের তত্ত্বানুভবের ধরন হতে তত্ত্বসমীক্ষার ধারা নিরূপিত হয়। তাই চরম প্রামাণ্যের বিচারে মনের সংস্কারের প্রামাণ্যের কথাও ওঠে, ওই তত্ত্বানুভবের অনতিবর্তনীয়তা সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে। সে-অনুভব যদি অপ্রাকৃত চিন্ময় অনুভবও হয়, তবু তার প্রামাণ্য একান্তনিশ্চিত কি না, তার প্রেতি নিতান্তই অনুপেক্ষণীয় কিনা, এ-জিজ্ঞাসার অবকাশ থেকেই যায়।

প্রপঞ্চবিভ্রমকে কখনও বর্ণনা করা হয় একটা অবান্তর প্রত্যক্-অনুভব-রূপে—যদিও এ-ব্যাখ্যা সর্বসম্মত নয়। এ-মত অনুসারে, এক অনির্বচনীয় শাশ্বত সুপ্তি অথবা স্বপ্নচেতনার পটে বিশ্ব একটা রূপ ও স্পন্দের বিজৃম্ভণ মাত্র। নিরুপাধিক নিরঞ্জন স্বয়ংপ্রজ্ঞ সন্মাত্রের 'পরে এ শুধু কালকলিত একটা আরোপ—আনন্ত্যের অধিষ্ঠানে এ যেন স্বপ্নের খেলা কেবল! মায়াবাদী সিদ্ধান্তে (নেতিবাদের এটি অন্যতম; মূলগত সাদৃশ্য থাকলেও নেতিবাদের সকল প্রস্থানই হুবহু এক নয়, একথা মনে রাখা দরকার), জগৎ সম্পর্কে স্বপ্নের উপমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও স্বপ্ন উপমান মাত্র, প্রপঞ্চবিভ্রমের স্বরূপতত্ত্ব নয়। বস্তুতন্ত্র প্রাকৃত-মনের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, চেতনার অকাট্য সাক্ষ্যে যাদের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে, সেই জীব জগৎ ও জীবন একেবারেই অসৎ—তারা আমাদের 'পরে ওই চেতনারই আরোপিত একটা বঞ্চনা! তাই দার্শনিকের আসরে কতকগুলি উপমা হাজির করা হয়—বিশেষ করে স্বপ্ন ও কুহকের উপমা। তার উদ্দেশ্য প্রাকৃত-জনকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, চেতনার অনুভব চেতনার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হলেও বস্তুত তা অমূলক বা অদৃঢ়মূল বলেও প্রমাণিত হতে পারে। স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে স্বপ্ন স্বপ্নদশাতেই বাস্তব, জাগ্রতে নয়। তেমনি জগৎ আমাদের কাছে ব্যবহারদশায় সত্য ও বাস্তব বলে মনে হলেও মায়ার আবরণ খসে পড়লে দেখব—সে কোনকালেই বাস্তব ছিল না!...কিন্তু স্বপ্নের উপমার সার্থকতাকে খুঁটিয়ে দেখা উচিত; তার সঙ্গে আমাদের জাগতিক অনুভবের মিল কতখানি,

তারও যাচাই হওয়া দরকার। জগৎ যে স্বপ্নমাত্র, জোরগলাতেই আমরা একথা বলি—এখন সে-স্বপ্ন মনের, জীবের কি ব্রহ্মের যারই হ'ক না কেন। এই স্বপ্নের উপমাতেই মানুষের হৃদয়ে-মনে মায়াবাদের ঘোর ঘনিয়ে ওঠে। অতএব এ-উপমার যদি কোনও প্রামাণ্য না-ই থাকে, তাহলে সে-সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে অনুপযোগের কারণ দেখিয়ে সুদূর নির্বাসনে তাকে পাঠাতেই হবে। আর প্রামাণ্য থাকলেও খতিয়ে দেখতে হবে কতখানি তার দৌড়। তাছাড়া জগৎ যদি স্বপ্ন-বিভ্রম না হয়ে শুধু বিভ্রমই হয়, তাহলে দুটি সিদ্ধান্তের তফাত-টুকুকেও দাঁড় করাতে হবে একটা পাকা ভিত্তির 'পরে।

স্বপ্নকে আমরা বলি অবাস্তব, কেননা স্বপ্নের বাধ আছে—স্বপ্নভূমি হতে জাগ্রতের স্বাভাবিক ভূমিতে নেমে এলে তার আর-কোনও প্রামাণ্য থাকে না। কিন্তু বাধকে মিথ্যাত্বের প্রমাণ বলে খাড়া করা কঠিন। কেননা চেতনারও বিভিন্ন ভূমি থাকতে পারে এবং প্রত্যেক ভূমিই নিজস্ব তাত্ত্বিক-ধর্মের জোরে বাস্তব হতে পারে। এক ভূমির চেতনা আরেক ভূমিতে যেতেই খেই হারিয়ে যদি ফিকা হয়ে যায়, এমন-কি স্মৃতির সহায়ে ফিরে পেলেও তাকে যদি বিভ্রম বলে ধারণা হয়, তাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নাই। কিন্তু এতেই কি প্রমাণ হয় যে, এখন যে-ভূমিতে আছি তা-ই বাস্তব, আর যাকে ছেড়ে এসেছি সে অবাস্তব? লোকান্তরে কি চেতনার অন্য-কোনও ভূমিতে যেতে-যেতে মর্ত্যস্থিতিকে কোনও জীবের যদি মিথ্যা মনে হতে থাকে, তাতেই তার অবাস্তবতা প্রমাণিত হয় না। তেমনি প্রপঞ্চোপশমের নৈঃশব্দ্য কিংবা নির্বাণ-স্থিতিতে অবগাহন করে সাধকের যদি জগৎ ভুল হয়ে যায়, তাতেই সাব্যস্ত হয় না—জগৎ আগাগোড়াই একটা বিভ্রম শুধু। বাধের যুক্তি দিয়ে নির-পেক্ষভাবে এইটুকুই বলা চলে, ব্যাবহারিক চেতনায় জগৎ সত্য, আবার নির্বাণচেতনায় নিরুপাধিক সন্মাত্র সত্য।...স্বপ্নের অনুভবকে মিথ্যা বলবার পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি, স্বপ্ন পূর্বাপর পরম্পরাহীন একটা ক্ষণিক বিভ্রম। সাধারণ দৃষ্টিতেও জাগ্রতের চেতনা দিয়ে তার মধ্যে আমরা কোনও সঙ্গতি বা তাৎপর্য খুঁজে পাই না। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে ঠিক এই কারণেই জাগ্রতের উপমা খাপ খায় না। দিন হতে দিনান্তরে জাগ্রৎচেতনার ধারাবাহিকতার মত স্বপ্নের মধ্যেও যদি একটা সঙ্গতি ও পরম্পরা থাকত, প্রত্যেক রাত্রিতে যদি বিগত রাত্রির স্বপ্নানুভবের অবিচ্ছেদ একটা অনুবৃত্তি চলত, তাহলে স্বপ্নকে আমরা দেখতাম আরেক চোখে। স্বপ্নের সঙ্গে তখন জাগ্রতের তুলনাও চলত। কিন্তু আসলে, প্রকৃতিতে প্রামাণ্যে কি রীতিতে কোনদিক দিয়েই যখন দুয়ের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন স্বপ্ন কি করে জাগ্রতের উপমান হবে? বলি বটে, এ-জীবনও তো ক্ষণিকের মায়া। সব জড়িয়ে তার মধ্যে সঙ্গতি ও তাৎপর্যের একটা মূলসূত্র খুঁজে পাই না—এমন নালিশও

করি। কিন্তু তার কারণ হয়তো আমাদেরই বোঝবার শক্তির অভাব বা দীনতা। নইলে অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে জীবনকে যখন দেখি, তখন তাকে অনুভব করি সুসংগত সার্থকতার একটি পূর্ণ শতদলরূপে—যার মধ্যে অতীত অসংগতি-বোধের এতটুকু মালিন্যও নাই। তখন বুঝি, অসঙ্গতি ছিল আমাদেরই অন্তদৃষ্টিতে ও জ্ঞানে—জীবনধর্মে নয়। আন্তর সংগতির কথা না হয় থাক, জীবনে কি ব্যাবহারিক সঙ্গতিরও কিছু অভাব আছে? বরং তাকে কার্য-কারণের একটা অবিচ্ছেদ শৃঙ্খল বলেই কি মনে হয় না? কেউ-কেউ বলেন : ওটা আমাদের মনের ভুল। আমরাই জীবনকে কল্পনা করি পরম্পরিত বলে, নইলে তার মধ্যে সত্যকার কোনও পরম্পরা নাই। কিন্তু তাতেও স্বপ্ন আর জাগ্রতের পার্থক্য দূর হয় না। কারণ অন্তর্গূঢ় সাক্ষি-চৈতন্যের দৃষ্টিতে যে-সংগতি ফুটে ওঠে, স্বপ্নে তার একান্ত অভাব। তার তথাকথিত সংগতি-বোধের মূলে আছে জাগ্রতের পারম্পর্যের একটা অস্পষ্ট ও মিথ্যা নকল—একটা অবচেতন অনুকরণ। স্বপ্নজগতের এই নকল পারম্পর্য তাই অপূর্ণ একটা ছায়ার মায়া—প্রতি পদে সে ভেঙে পড়ে, কখনও-বা শূন্যে মিলিয়ে যায়। তাছাড়া জীবনের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করবার যেটুকু সামর্থ্য জাগ্রৎ-চেতনার আছে, স্বপ্নচেতনার তাও নাই। স্বপ্নে আছে প্রকৃতির অবচেতনবৎ স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়ন—মানুষের পরিণত মনের সচেতন সংকল্প ও কৃতি-শক্তির প্রবেগ নাই। তার পর, স্বপ্নের ক্ষণস্থায়িতা একটা মৌলিক ধর্ম, তাই একটা স্বপ্নের সঙ্গে আরেকটা স্বপ্নের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু জাগ্রৎ-জীবনের বিনশ্যৎ-স্বভাব শুধু তার খণ্ড-খণ্ড অনুভবে—নইলে জীবনব্যাপী ব্যাবহারিক অনুভবের সমগ্রতার মধ্যে বরং একটা স্থায়িত্বেরই আভাস মেলে। আমাদের দেহ ঝরে পড়ে, কিন্তু যুগ-যুগ ধরে জন্ম হতে জন্মান্তরে জীবাত্মার উৎক্রমণ চলে। বহু আলোকবর্ষের অবসানে অথবা কল্পান্তে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রলয় হতে পারে, কিন্তু তাতে বিশ্বস্থিতির ক্ষয় হবে না—কেননা অবিচ্ছেদ স্পন্দরূপ বলেই তার প্রবাহনিত্যতা স্বতঃসিদ্ধ। যে অনন্ত মহাশক্তির সে বিসৃষ্টি, তার স্বরূপ অথবা প্রবৃত্তির কোনও আদি-অন্ত আছে—একথা একেবারেই নিষ্প্রমাণ।...এমনি করে স্বপ্নে আর জাগ্রতে যেখানে এত বৈরূপ্য, সেখানে দুয়ের মাঝে উপমান-উপমেয়ভাবের কল্পনা কি সংগত?

সাম্যকল্পনার বিরুদ্ধে একটা বিশেষ আপত্তি এই যে, দর্শনশাস্ত্রে স্বপ্নের স্বরূপকে খুঁটিয়ে না দেখেই স্বপ্নের উপমার নিতান্ত উপরভাসা প্রয়োগ করা হয়েছে। স্বপ্ন কি সত্যি অর্থহীন ও অবাস্তব? সে কি কোনও তত্ত্ববস্তুর ব্যাকৃতি বা প্রতিরূপ কিংবা কল্পমূর্তিতে কি প্রতীকের রূপরেখায় তার একটা প্রতিলিপি হতে পারে না? এইজন্যই সংক্ষেপে হলেও নিদ্রা- ও স্বপ্ন-জ্ঞানের উৎপত্তির ধারা ও নিদান সম্পর্কে একটা আলোচনার প্রয়োজন

আছে। নিদ্রাতে জাগ্রৎ-ভূমি হতে চেতনার সংহরণ ঘটে। আমরা ভাবি, চেতনা তখন নিষ্ক্রিয়, নিরালম্ব অথবা স্তম্ভিত। কিন্তু এ হল অগভীর দৃষ্টির কথা। আসলে স্তম্ভিত থাকে জাগ্রতের ক্রিয়া মাত্র—শুধু বহিশ্চর মন অথবা প্রাকৃত দেহচেতনার প্রবৃত্তিই নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু অন্তশ্চেতনা তখন আলম্বনহীন নয়। নানা অভিনব প্রবৃত্তি উদ্বেল হয়ে ওঠে তার গভীরে, অথচ আমরা তার কোনও খবরই রাখি না—শুধু আমাদের স্মৃতির পরদায় তার উপরিচর ফেনোচ্ছ্বাসের একটুখানি ছাপ পড়ে। এমনি করে সুপ্তিতে বহিশ্চেতনার কাছাকাছি জেগে ওঠে আচ্ছন্ন একটা অবচেতনা, সে-ই হয় স্বপ্নজ্ঞানের আধার বাহন—এমন-কি নির্মাতাও। কিন্তু তারও অন্তরালে অধিচেতনার অতল সমুদ্র গুহাহিত হয়ে আছে, যার মধ্যে বিধৃত রয়েছে আমাদেরই অন্তর্গূঢ় সত্তা ও চেতনার সমগ্র রূপটি। সে হল চেতনার আরেক রাজ্য। অচিতি ও চেতনার অন্তরিক্ষলোকে যে-অবচেতনা রয়েছে, সাধারণত বহিশ্চেতনার তোরণপথে সে-ই তার কল্পবাহিনী পাঠায়—স্বপ্নের আপাত-অসংলগ্ন পরম্পরাহীন বিজৃম্ভণের আকারে। এই জীবনেরই বিচিত্র ঘটনার উপাদানকে যেন খেয়ালমাফিক বেছে নিয়ে তা-ই দিয়ে গড়া হয় চকিতের মায়াপুরী—তাকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কল্পনার চিত্রলেখা। এই হল কতগুলি স্বপ্নের ধরন। আবার অনেক স্বপ্নের উপাদান আসে অতীতের ব্যক্তি বা ঘটনার বাছাই-করা স্মৃতি হতে। তখন তারাই হয় কল্পলোকের ক্ষণিকার আদিবিন্দু। তাছাড়া এমনসব স্বপ্ন আছে, যাদের মনে হয় নিছক ভুঁইফোঁড় কল্পনার বিলাস—যেন তারা অবচেতনার আলোকলতা। কিন্তু আধুনিক মনোবিকলনবিদ্যা তাদেরও মধ্যে অর্থসংগতি আবিষ্কার করছে, যাকে ধরে আমাদের জাগ্রৎচেতনা মনের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জেনে তাকে শাসন করতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বপ্ন-বিচারের এই প্রথম প্রয়াস। কিন্তু এতেই স্বপ্নের প্রকৃতি ও সার্থকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আমূল রূপান্তর ঘটেছে। আজ মনে হচ্ছে, স্বপ্ন শুধু 'মনের অমূলক চিন্তা মাত্র' নয়। তার পিছনে যে-তত্ত্ববস্তুর অধিষ্ঠান আছে, ব্যাবহারিক জগতেও তার গুরুত্ব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু অবচেতনাই আমাদের একমাত্র স্বপ্ন-পসারী নয়। গুহাহিত অন্তশ্চেতনার যে-প্রত্যন্তদেশে অচিতির সঙ্গে ওই চেতনার সঙ্গম ঘটেছে, সেই গোধূলিলোকই আমাদের অবচেতনা। সেখানে অচিতি ফুটতে চাইছে চেতনার কুঁড়ি হয়ে। স্থূল অন্নময়-চেতনাও যখন স্তিমিত হয়ে জাগ্রৎ-ভূমি হতে অচিতির দিকে গড়িয়ে যায়, তখন এই অবচেতনাই তার আশ্রয় হয়। আরেকদিকে দেখতে গেলে অবচেতনাকে বলা যায় অচিতির উপকণ্ঠ, যার ভিতর দিয়ে তার সিসৃক্ষা ফুটে ওঠে আমাদের বহিশ্চেতনায় বা অধিচেতনাতে।

অচিতির তমোনিশা হতেই ফুটেছে আমাদের অন্নময়-চেতনার ঊষালোক। সুপ্তিতে বহিশ্চেতনা আবার যখন তার ওই গর্ভাশয়ের দিকে তলিয়ে যায়, তখন তাকে অবচেতনার ভিতর দিয়ে নামতে হয়—যেখানে তার অতীতের সংস্কার অথবা অভ্যস্ত মনন এবং চৈতসিকের বেগ সঞ্চিত রয়েছে। কেননা জীবনের সমস্ত অনুভবই অবচেতনার মধ্যে তাদের ছাপ রেখে যায়, ওইখানে সুপ্ত থাকে তাদের পুনরুদ্বোধনের বীজ। জাগ্রৎ-চেতনায় অনেকসময় তারা অঙ্কুরিত হয় নতুন-করে-ফিরে-আসা পুরানো অভ্যাসের আকারে, স্তিমিত বা নিগৃহীত প্রবৃত্তির, অথবা প্রকৃতির বর্জিত উপাদানের ছদ্মরূপে। কখনও-কখনও নিগৃহীত অথবা বর্জিত হলেও এইসব বৃত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় না। তাই অপরিচয়ের নীল-নিচোলের আড়ালে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটে—অতি অদ্ভুত ছন্নলীলায়, অভিনব পরিণামের দুর্লক্ষ্য সূচনা নিয়ে। স্বপ্নভূমিতে ব্যাপারটাকে মনে হয় যেন একান্তই আজগুবী। সুপ্ত সংস্কারকে ঘিরে কি ভিত্তি করে কি-যে খেয়ালের পুতুল-নাচ চলে, জাগ্রত মন যার কোনও অর্থ খুঁজে পায় না—কেননা অবচেতনার গূঢ়লিপির সঙ্কেত তার জানা নাই। কিছুক্ষণ স্বপ্নভোগের পর যখন অচিতিতে চেতনার প্রলয় ঘটে, আমরা তাকে বলি স্বপ্নহীন সুষুপ্তি। তারপর সুষুপ্তি হতে আবার স্বপ্নের অগভীর উপান্ত পার হয়ে আমরা পৌঁছই জাগ্রতের তীরে।

কিন্তু বস্তুত সুষুপ্তি স্বপ্নহীন নাও হতে পারে। সুষুপ্তিতে আমরা তলিয়ে যাই অবচেতনার আরও গভীর গহনে। সংবৃত্তির কুণ্ডলী সেখানে এত ঘনীভূত, চেতনা এত আচ্ছন্ন অসাড় ও গুরুভার যে তার বিসৃষ্টিকে উপরপানে ঠেলে তোলা যায় না। তাই সেখানে স্বপ্ন থাকলেও আমাদের অবচেতনার লিপিকার তার দুর্লক্ষ্য ছায়াবাহিনীকে চিনতে কি ধরে রাখতে পারে না। অথবা এমনও হতে পারে, দেহের সুপ্তিতেও মনের সবটুকু ঘুমিয়ে পড়ে না। তার জাগ্রত অংশ এই অবসরে নিমজ্জিত হয় সত্তার অন্তঃপুরে—বহিশ্চেতনার সঙ্গে সকল ব্যবহার চুকিয়ে দিয়ে জেগে ওঠে অধিচেতনার মনোময় প্রাণময় বা ভূতসূক্ষ্মময় স্তরে। অবচেতনার বহিরঙ্গকে বলতে পারি সুপ্তি-জাগ্রতের স্তর। সুষুপ্তিতে যদি তার কাছাকাছি কোথাও থাকি, তাহলে তার অনুলিপিতে ওই গভীরের কিছু-কিছু খবর থাকে। কিন্তু তার লেখন হয় অবচেতনার সঙ্কেতের অনুযায়ী, তাই তার মধ্যে স্বভাবত এলোমেলোর আঁচড় থাকে। খুব গুছিয়ে অনুলিপি করলেও বিকারের হাত হতে কি জাগ্রতের লেখার ছাপ থেকে তাকে কোনমতেই বাঁচানো যায় না।...আরও গভীরে ডুবলে আর-কোনও অনুলিপি থাকে না, বা থাকলেও তাকে ধরা যায় না। তাকেই ভুল করে আমরা স্বপ্নহীন সুষুপ্তি ভাবি—কিন্তু তখনও স্বপ্ন-প্রবৃত্তির জের চলতে থাকে অবচেতনার নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ যবনিকার অন্তরালে। অভ্যাসের

ফলে অন্তশ্চেতনার গভীরে যখন জেগে উঠি, স্বপ্নপ্রবাহের একটানা স্রোতকে তখন ধরতে পারি। তখন অবচেতনার আরও গুরুভার গভীর-গহনের সঙ্গে সচেতন যোগে যুক্ত হয়ে তার নিঃসাড় রহস্যের সদ্য-অনুভব পাই, অথবা স্মৃতির জাল ফেলে জাগ্রৎ-ভূমিতে তাকে টেনে তুলতে পারি। আরও গভীরে—একেবারে অধিচেতনার মণিকোঠাতেও আমাদের পক্ষে জেগে ওঠা সম্ভব। তখন চেতনার সম্মুখে লোকান্তরের এবং লোকোত্তরের দুয়ার অপাবৃত হয়—সুষুপ্তি আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় অগম-রহস্যের জ্যোতির্লোকে। সেখানকার অনুভবেরও অনুলিপি আমাদের কাছে পেঁছয়। কিন্তু অবচেতনা নয়—অধিচেতনা তার লিপিকার। তাকে বলতে পারি স্বপ্ন-পসারীর রাজা।

স্বপ্নচেতনায় অধিচেতন-লোক যদি এমনি করে ভেসে উঠে, তাহলে কখনও-কখনও অধিচেতন-বুদ্ধির প্রচোদনায় স্বপ্নলোক রূপান্তরিত হয় ভাবলোকে। তার মধ্যে ফুটে ওঠে ভাবঘন অপরূপ কত মূর্তি। জাগ্রতের দুরূহতম সমস্যার সেখানে সমাধান হয়, চেতনায় জাগে অতর্কিতের সংকেত প্রাতিভ-মনন কিংবা অনাগতের আভাস, অবচেতনার খামখেয়ালির জায়গায় দেখা দেয় সফল স্বপ্নের মেলা। এই সময়ে কখনও নানা প্রতীক-মূর্তি দেখা দেয়—কেউ তারা মনোময়, কেউ-বা প্রাণের উপাদানে গড়া। মনোময় প্রতীকের রূপরেখা নিখুঁত, ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রাণের গড়া প্রতীকগুলি প্রায়ই জাগ্রৎ-চেতনার কাছে জটিল ও দুর্বোধ। তবে কিনা মূল সঙ্কেতটি একবার ধরতে পারলে সেইসঙ্গে তাদেরও অর্থ-সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পরিশেষে, এই আধারের অথবা বিশ্বাধারের অপর-কোনও ভূমিতে যা দেখেছি বা অনুভব করেছি, এই চেতনায় তার খবর আসে। বিজ্ঞানভূমির স্বপ্ন-প্রতীকেরই মত এই জীবনের অন্তর-বাহির অথবা অপর জীবনের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ থাকে, নিজের বা পরের প্রাণ-মনের কত অজানা রহস্যের কিংবা তাদের 'পরে অকল্পনীয় কত প্রভাবের পরিচয় মেলে—যার আভাসও আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার অগোচর। কখনও-বা এখানকার সঙ্গে তাদের কোনও যোগই থাকে না। তারা তখন আমাদের প্রাকৃত-ভূমির নিরপেক্ষ অপর-কোনও চিন্ময় লোকসংস্থানের বার্তাবহ। সাধারণত আমাদের স্বপ্ন-চেতনার বেশির ভাগ জুড়ে থাকে অবচেতনার স্বপ্ন-পসরা—স্মৃতিতে তাদেরই ছাপ থেকে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও অধিচেতন স্বপ্নশিল্পীর প্রভাব সুপ্তির মধ্যে এত গভীর রেখাপাত করে যে, জাগ্রতের স্মৃতিতেও তার ছবি ভেসে ওঠে। সাধনায় অন্তরকে জাগ্রত ক'রে নিয়ত অন্তরাবৃত্ত থাকবার দুর্লভ অধিকার অর্জন করতে পারলে বর্তমান ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে—ভাবময় স্বপ্নলোকের দুয়ার খুলে যায়। তখন স্বপ্নের মধ্যে থাকে অবচেতনার বঞ্চনা নয়—অধিচেতনার আবেশ এবং তার ফলে স্বপ্নচেতনা সত্যের ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে ওঠে।

সুষুপ্তির মধ্যেও সম্পূর্ণ সচেতন থেকে স্বপ্নদশার আদ্যোপান্ত না হ'ক অনেকখানি সাক্ষীর মত দেখে যাওয়া—এও অসম্ভব নয়। তখন অনুভব হয়, চেতনার এক লোক হতে লোকান্তরে বিচরণ করতে-করতে অবশেষে কিছু-ক্ষণের জন্য আমরা স্বপ্নহীন প্রশান্তির জ্যোতির্ময় স্তব্ধতায় প্রবেশ করি। তাইতে জাগ্রতের অবসাদ দূর হয়, প্রাণ স্বশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়। তারপর আবার ওই পথ ধরে ফিরে আসি জাগ্রতের চেতনায়। সাধারণত এমনতর লোক-সংক্রমণের বেলায় অতীতের অনুভবকে আমরা ছেড়ে-ছেড়ে যাই। ফেরবার পথে, যা-কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট বা জাগ্রৎ-ভূমির খুব কাছাকাছি, স্মৃতিতে তারই ছাপ থেকে যায়। কিন্তু এ-ন্যূনতারও পূরণ অসম্ভব নয়। সাধনার দ্বারা ধারণার শক্তি বাড়ানো যায় অথবা স্মৃতিকে এমন তীক্ষ্ণ করা চলে যে, স্বপ্নের পর স্বপ্ন স্তরের পর স্তর আবার জাগিয়ে তুলে অন্তর্দশার সবটুকু ছবির মত ফোটানো যায়। সুপ্তি-চেতনার এমন সুসংলগ্ন অনুভব অবশ্য সহজসাধ্য নয়—তাকে স্বভাবগত করা আরও কঠিন। কিন্তু তাহলেও তা অসম্ভব নয়।

আমাদের অধিচেতনা কিন্তু বহিশ্চর অন্নময়-চেতনার মত অচিতিশক্তির পরিণাম নয়। পরিণামের উৎসর্পিণী ধারায় যে-চেতনা উপরের দিকে উঠে গেছে, আর অবসর্পিণী ধারায় যা সংবৃত্ত হয়ে এসেছে নীচের দিকে, দুয়ের সঙ্গমস্থলে রয়েছে অধিচেতন-লোক। তার মধ্যে আছে সূক্ষ্ম অন্তর্মন, অন্তঃপ্রাণ ও ভূতসূক্ষ্মময় সত্তা—যারা আমাদের স্থূল সত্তা ও প্রকৃতির চাইতেও ব্যাপক। আমাদের প্রাকৃত-স্বভাবে যা-কিছু অনাদি অচিৎ বিশ্বশক্তির নির্মিতি, অথবা বহিশ্চর-চেতনার নৈসর্গিক বৃত্তি-পরিণাম, কিংবা বিশ্ব-ব্যাপিনী অপরা প্রকৃতির বিচিত্র অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া নয়—তার প্রায় সব-টুকুরই নিগূঢ় উৎস এই অধিচেতনায়। এমন-কি ওইসব নির্মিতি বৃত্তি বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ও অধিচেতনার আবেশ এবং সুদূরপ্রসারী অনুভাব আছে। আমাদের প্রাকৃত-চেতনা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়মানসের পরোক্ষপ্রায় সন্নিকর্ষের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে যোগ রেখে চলে। কিন্তু অধিচেতনার মধ্যে আছে অপরোক্ষ সন্নিকর্ষের সামর্থ্য। তার অলৌকিক দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের ইন্দ্রিয়কে সত্যি-সত্যি অন্তরিন্দ্রিয় বলা চলে। অন্তর-পুরুষের কাছে তারা শুধু বার্তাবহ নয়, তারা তাঁর অপরোক্ষবিজ্ঞানের সহজ সাধন। বিষয়জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের 'পরে অধিচেতনাকে নির্ভর করতে হয় না। জ্ঞান তার অপরোক্ষ, ইন্দ্রিয় শুধু একটা আকার দেয় সেই জ্ঞানকে। জাগ্রৎ-ভূমিতে ইন্দ্রিয় কেবল আহৃত জ্ঞানের সাধন। বিষয়ের বাহ্য-পরিচয়কেই সে মনের দপ্তরে পেশ করে, তা-ই নিয়ে শুরু হয় মনের পরোক্ষসৃষ্টির বিলাস। কিন্তু অধিচেতনায় এসব কৃত্রিমতা একেবারেই অনাবশ্যক। বিশ্বচেতনার মনোময় প্রাণময় ও ভূত-

সূক্ষ্মময় ভূমিতে তার স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার আছে—শুধু অন্নময় ভূমিতে কি স্থূলজগতে তার সঞ্চরণ সীমিত নয়। অবসর্পিণী মহাশক্তির সংবৃত্তি-পরিণামে থরে-থরে যেসব লোক ফুটে উঠেছে, অথবা অচিতি হতে অতিচেতনার দিকে উত্তরায়ণের পথে ভেসে উঠেছে কি সৃষ্ট হয়েছে যেসব আলম্বন-জগৎ, তাদের সঙ্গে অধিচেতনার একটা স্বচ্ছন্দ সহজ যোগাযোগ আছে। নিদ্রাতে হ'ক, অথবা একাগ্র প্রত্যাহার বা সমাধিতে আত্মনিমজ্জন দ্বারা হ'ক, আমাদের মনোময় ও প্রাণময় পুরুষ ব্যাবহারিক বৃত্তিকে উপসংহৃত করে অধিচেতনারই বিপুল অন্তর্জগতে বিশ্রান্ত হন।

জাগ্রৎ-চেতনা অধিচেতন ভূমির সঙ্গে যোগাযোগের কোনও খবর রাখে না। অথচ অজ্ঞাতসারে ওইখান হতেই তার মধ্যে আসে প্রেরণার ঝলক, বোধি-ও ভাব-লোকের দীপ্তপ্রত্যয়, অননুভূত সংকল্প ও ইন্দ্রিয়চেতনার ইশারা, কর্মের উদ্দীপনা—বহিশ্চেতনার বাঁধ ভেঙে কোন্ অজানার জোয়ারের মত। সমাধির মত স্বপ্নেও অধিচেতনার জ্যোতির দুয়ার খুলে যায়, কেননা সমাধির মত স্বপ্নের আহ্বানেও আমরা সংকীর্ণ জাগ্রৎ-চেতনার যবনিকা সরিয়ে অধিচেতন-ভূমির রহস্যালোকে চলে যাই। কিন্তু সুপ্তিদশার খবর আমরা পাই সাধারণত অবচেতনার স্বপ্নলেখায়—অন্তঃসংজ্ঞার দীপ্তিতে নয় (সমাধি-প্রত্যয়ের মধ্যে যাকে সুলভতম বলা চলে), অথবা পশ্যন্তীর অতিপ্রাকৃত আলোকে সুপ্তিকে উদ্ভাসিত করেও নয়। অধিচেতনার অন্তঃসংবিৎ যখন সাময়িক বা চিরন্তন যোগে আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সুষুপ্তির অব্যাকৃত-ভূমিকে আলোকিত করে এমনিতর অথবা এর চাইতেও উদ্ভাস্বর এবং ঘনীভূত প্রত্যয়ের দীপ্তি। আমাদের গুহাহিত সত্তায় অধিচেতনা এবং তার একান্ত-সন্নিহিত অবচেতনার অধিষ্ঠান আছে—অন্তর্দর্শন এবং অতীন্দ্রিয় অনুভবের সামর্থ্য আছে তাদেরই। আমাদের বহিরঙ্গ-অবচেতনা তার লিপিকার শুধু। এইজন্যই উপনিষদে অধিচেতন পুরুষকে বলা হয়েছে স্বপ্ন-পুরুষ—কেননা সাধারণত স্বপ্নে অতীন্দ্রিয়-দর্শনে অথবা আন্তর-অনুভবের সংহত দশাতেই আমরা অধিচেতন প্রত্যয়ের শরিক হতে পারি। তেমনি উপনিষদে অতি-চেতনাকে বলা হয়েছে সুষুপ্তি-পুরুষ—কেননা সাধারণত অতিচেতনার মধ্যে অবগাহন করামাত্রই আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়বোধের উপশম হয়। অতিচেতনার আবেশহেতু সমাধির যে নিবিড় পরিণামে চিত্তের নিরোধ ঘটে, তার মধ্যে সাধারণত কোনও-কিছুর খবর থাকে না—সেখানে কি আছে তারও কোনও অনুলিপি থাকে না। একমাত্র সাধন-শক্তির বিশেষ বা অসাধারণ উৎকর্ষবশত, চেতনার কোনও অপ্রাকৃত আবেশে, অথবা সংকীর্ণ প্রাকৃত-চেতনার বিচ্ছেদ বা রন্ধ্রপথেই অতিচেতনার স্পর্শ কি ঝলক আমাদের ব্যাবহারিক অনুভবে নেমে আসতে পারে। উপনিষদের 'স্বপ্ন-স্থান' ও 'সুষুপ্তি-স্থান' স্পষ্টতই রূপক-

সংজ্ঞা। তাহলেও চেতনার এ-দুটি ভূমিকে ঋষিরা তত্ত্বভূমি ব'লেই জানতেন। জাগ্রৎ-ভূমিতে চিন্ময়-সংবেদনের স্পন্দলিপিতে যেমন বাহ্যবস্তু এবং বাহ্য-জগতের সঙ্গে চেতনার সন্নিকর্ষের ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে, তেমনি স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেও আছে অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুর অনুলিপি। অবশ্য জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনটিকেই প্রপঞ্চবিভ্রমের অঙ্গ বলে বর্ণনা করা যায়। বলা চলে : তিনটি ভূমিরই অনুভব মায়োপহিত চৈতন্যের বিকার মাত্র। স্বপ্ন ও সুপ্তি যেমন অলীক তেমনি অলীক আমাদের জাগ্রৎ, কেননা একমাত্র অবাঙ্-মানসগোচর আত্মা বা অদ্বয়ভাবই স্বরূপসত্য বা পরমার্থতত্ত্ব—ওই হল বেদান্তবর্ণিত আত্মার তুরীয় পাদ।...তেমনি এমন কথাও বলা চলে; জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি একই পরমার্থতত্ত্বের তিনটি বিভিন্ন ক্রম, অথবা প্রত্যক্-চেতনার তিনটি ভূমি—যার মধ্যে আমাদের আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞানের তিনটি বিশিষ্ট প্রকার রূপায়িত হয়েছে।

এই যদি স্বপ্নচেতনার সত্য পরিচয় হয়, তাহলে এমন কথা বলা চলে না যে, স্বপ্নের মধ্যে অর্ধ-অচেতনার 'পরে সাময়িক ভাবে অবস্তুর অবাস্তব কতগুলি ছবি চাপিয়ে দেওয়া হয় বস্তু বলে। মায়াবাদের সমর্থনে স্বপ্নকে তাহলে আর উপমারূপেও ব্যবহার করা চলে না। কেউ হয়তো বলবেন : স্বপ্ন তো বাস্তবিকই কোনও তত্ত্ববস্তু নয়—তত্ত্বের একটা অনুলিপি অথবা কতগুলি প্রতীকমূর্তির সমাহার মাত্র। তেমনি আমাদের জাগ্রতের অনুভবও তাত্ত্বিক নয়—তত্ত্বের অনুলিপি বা প্রতীকব্যূহের একটা পরম্পরা শুধু। একথা অনস্বীকার্য যে, বাহ্যজগৎ প্রধানত আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়বোধের পরদায় ছাপানো বা চাপানো কতগুলি মূর্তির সমাহার। সুতরাং পূর্বপক্ষীর যুক্তিকে এপর্যন্ত মানতে আমরাও রাজী। এও মানতে পারি, একদিকে দেখতে গেলে আমাদের সমস্ত অনুভব ও কর্মই একটা প্রচ্ছন্ন সত্যের প্রতীক শুধু। জীবনে তার পূর্ণরূপটি ফুটিয়ে তুলতে চাইছি, কিন্তু আজও এলোমেলো রেখার অপরিণত ছন্দে সে-ছবির একটা খসড়া শুধু আঁকা হচ্ছে। এইখানেই যদি সকল সাধনার ইতি হয়, তাহলে জীবনকে আনন্ত্যের চেতনায় আত্মা ও অনাত্মার একটা স্বপ্নছবি বলতে পারি বটে। কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে। ইন্দ্রিয়কল্পিত ছায়ামূর্তির সমাহারেই আমাদের কাছে বিশ্বের তাবৎ বস্তুর প্রাথমিক পরিচয়—একথা সত্য। কিন্তু আমাদেরই চেতনায় বোধির এক স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তিতে সে-মূর্তিগুলি পূর্ণাঙ্গ সুবিন্যস্ত। অতএব স্বতঃপ্রমাণ হয়ে ওঠে, ওই বোধিই ছায়াকে কায়ার সঙ্গে যুক্ত ক'রে বিষয়ের প্রত্যয়কে সুনিবিড় করে। তার ফলে অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের ভাষায় কি অনুলিপিতে তত্ত্বের একটা তর্জমাই যে আমরা পাচ্ছি তা নয়, ইন্দ্রিয়কল্পিত ছায়ার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তত্ত্বেরও কায়াকে। বোধির এই সহজবৃত্তির

সঙ্গে যোগ দেয় বুদ্ধির বৃত্তি। তার কাজ ইন্দ্রিয়গৃহীত বস্তুর ধর্মকে তলিয়ে বোঝা, ইন্দ্রিয়লিপিকে খুঁটিয়ে দেখে তার ভুলগুলি শুধরে দেওয়া। অতএব সিদ্ধান্ত করতে পারি, ইন্দ্রিয়কল্পিত অনুলিপির ভিতর দিয়ে বোধি ও বুদ্ধির সহায়ে আমরা একটা তাত্ত্বিক বিশ্বকেই দেখি। বোধি সেখানে বস্তুর মর্মের ছোঁয়াটুকু দেয়, আর বুদ্ধি তার সত্যকে পরখ করে সামান্যগ্রাহী প্রত্যয়ের বিজ্ঞান দিয়ে। একথা ভুললে চলবে না যে, ইন্দ্রিয়লিপিতে বিশ্বের যে-কল্পরূপটি আমাদের কাছে ফুটে ওঠে, তত্ত্বের তা নিখুঁত প্রতিলিপি বা আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও অথবা প্রতীকমূর্তির সমাহার হলেও, প্রতীক-মাত্রেই কোনও সদ্‌ভূত বস্তুর লিঙ্গ, কোনও তত্ত্বেরই অনুলিপি। ভাবের বিগ্রহে ভুল থাকলেও যে-ভাববস্তুকে সে রূপ দিতে চাইছে, সে তত্ত্বই—বিভ্রম নয়। গাছ পাথর কি জানোয়ার—যা-কিছুই দেখছি, বলতে পারব না যে যা নাই তা-ই দেখছি—দেখছি একটা কুহকের খেলা। হতে পারে তার সত্যকার মূর্তিটি দেখছি না, এমনও হতে পারে আরেকধরনের ইন্দ্রিয়ের কাছে তার আরেক রূপ ধরা পড়বে। তবু তার মধ্যে এমন-কিছু তত্ত্ব আছেই, ওই মূর্তিটিতে যার সার্থক রূপায়ণ দেখছি—যার সঙ্গে তার অল্পবিস্তর মিল থাকবেই।...কিন্তু মায়াবাদে একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব এবং তিনি অনির্বাচ্য অলক্ষণ শুদ্ধ সন্মাত্রস্বরূপ। কোনও প্রতীকমূর্তির সমাহারকল্পনায় তাঁর কোনও সত্য কি মিথ্যা অনুকৃতি সম্ভব নয়, কেননা তাহলেই তাঁর শুদ্ধসত্তার মধ্যে এমন-একটা বৈশিষ্ট্যের বীজ অথবা অব্যক্ত-সত্যের আভাস থাকা প্রয়োজন, যাকে নাম ও রূপের রেখায় আমাদের চেতনা রেখায়িত করতে পারে। শুদ্ধ-অব্যাকৃত তত্ত্বকে কোনও অনুলিপিতে, স্বরূপের পরিচায়ক কোনও বিশেষ-ধর্মের সমাহারে অথবা প্রতীক ও মূর্তির মেলায় রূপায়িত করা যায় না। কেননা তার মধ্যে আছে কেবল বিশুদ্ধ তাদাত্ম্যের নির্বিশেষ প্রত্যয়—রূপে রেখায় বা প্রতীকের আকারে ফুটিয়ে তোলবার মত আর-কিছুই সেখানে নাই। অতএব স্বপ্নের উপমা এখানেও খাটে না বলে তাকে খারিজ করাই উচিত। অধ্যাত্ম-অনুভবের একটা বিশেষ পর্বে বিশেষ-একটা মানসিকতার বর্ণাঢ্য চিত্ররূপে তার কদর থাকতে পারে, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিকের তত্ত্বসমীক্ষায় বা বিশ্বের তাৎপর্য-নিরূপণ কি উৎপত্তি-প্রকরণের বিচারে তার কোনও সার্থকতাই নাই।

স্বপ্নের উপমার মত ইন্দ্রজাল বা কুহকের উপমাতেও মায়াবাদের তত্ত্ব বুঝতে বিশেষ-কিছু সুবিধা হয় না। কুহক দু'রকমের—এক মতি-বিভ্রম, আর-এক দৃষ্টি-বিভ্রম বা সেইধরনের ইন্দ্রিয়জ-বিভ্রম। যেখানে যা নাই, সেখানে যদি তার ছবি দেখি, তাহলে সে হবে ইন্দ্রিয়ের একটা প্রামাদিক সৃষ্টি। তাকে বলব দৃষ্টি-বিভ্রম। আর মনের গড়া কিছুকে যখন বাস্তব

তথ্যরূপে গ্রহণ করি, তাকে বলি মতি-বিভ্রম। তার মধ্যে থাকে মানসিক কোনও প্রমাতার বিক্ষেপ, কল্পনার বস্তুঘন রূপ, অথবা মনঃকল্পনার অযথা-স্থিতি। প্রথমটির দৃষ্টান্ত মরীচিকা, আর দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত বেদান্তবর্ণিত রজ্জুতে সর্পভ্রম। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, সত্যকার কুহক নয় এমন অনেক-কিছুকেই আমরা কুহক বলি। অনেকসময় অধিচেতন-ভূমি হতে কোনও প্রতীকমূর্তি ভেসে ওঠে। কিংবা অধিচেতনা কি তার কোনও ইন্দ্রিয়বৃত্তি বহিশ্চেতনায় আবিষ্ট হয়ে জড়াতীত সত্যের সঙ্গে ঘটায়। তখন আমরা যা দেখি বা অনুভব করি, তাকে বিভ্রম কি কুহক বলা চলে না। আবার, যে-বিশ্বচেতনার আবেশে মনের বাঁধ ভেঙে আমরা বৃহৎ-সত্যের লোকোত্তর অনুভবে উত্তীর্ণ হই, তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেও অনেকে তাকে কুহকের পর্যায়ে ফেলেছেন।...কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব প্রচলিত দৃষ্টিবিভ্রম বা মতিবিভ্রমের দৃষ্টান্ত নিয়ে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই তো অধ্যাস-বাদের সুন্দর উদাহরণ। অধ্যাস হল বস্তুর 'পরে অবাস্তবের স্থাপনা—যেমন মরুভূমির শূন্যতার 'পরে মরীচিকার, উপস্থিত সত্য-রজ্জুর 'পরে অনুপস্থিত মিথ্যা-সর্পের। বলতে পারি, জগৎও এমনি-একটা মায়াকুহক—নিত্যবর্তমান অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের 'পরে অবর্তমান অতাত্ত্বিক বিষয়প্রপঞ্চের আরোপ। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিভ্রমবশত যে-ছায়াবস্তু দেখা দিয়েছে, সে তো সম্পূর্ণ অসৎ কিছুর ছায়া নয়। ছায়া নকল হলেও তার একটা আসল রূপ আছেই—সেই রূপে সে সৎ এবং সত্য। কেবল ইন্দ্রিয় কি মনের ভুলে, যেখানে সে নাই সেইখানে তার আরোপ হয়েছে। মরীচিকা হয়তো নগর মরূদ্যান স্রোতস্বিনী কিংবা এমনি-কোনও অবর্তমান বস্তুর ছায়াছবি। কিন্তু তাহলেও সত্যকার নগর প্রভৃতি আছেই—নইলে মনের কল্পনাতেই হ'ক বা আলোকের প্রতিফলনেই হ'ক, তাদের ছায়াই-বা কি করে সেখানে বাস্তবের ভানে মনকে বঞ্চনা করতে আসবে? সর্প আছে—বিভ্রমের প্রমাতাও তার সত্তা জানে, তার আকৃতি চেনে। নইলে বিভ্রমের সৃষ্টিও সম্ভব হত না, কেননা দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে অন্যত্রদৃষ্ট বস্তুর আকৃতি-গত সাদৃশ্যই হল বিভ্রমের কারণ। অতএব অধ্যাসবাদের ব্যাখ্যায় এসব উপমা বিশেষ সুবিধার নয়। উপমা খাটত, যদি আমাদের দৃষ্ট জগৎ হত এখানে-অবর্তমান কিন্তু অন্যত্র-বর্তমান একটা সত্য জগতের মিথ্যা ছায়া। অথবা ব্রহ্মের একটা সত্য প্রকাশকে আবৃত কি বিকৃত করে এ যদি হত একটা কল্পিত মিথ্যা প্রকাশের আরোপ। কিন্তু বিভ্রমবাদীর মতে জগৎ অসৎ প্রপঞ্চ, অথবা নির্বর্ণ ব্রহ্মে আরোপিত একটা কল্পিত বিভ্রম মাত্র। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ—কিন্তু তিনি নীরূপ, কোনকালেই কোনও-কিছুর আধার নন। এক্ষেত্রে মরীচিকা বা সর্পের উপমা খাটত, যদি আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম মরুভূমির

শূন্যতায় এমন-কিছুর কল্পনা করত যার অস্তিত্বই কোথাও নাই। অথবা শূন্যভূমিতে রজ্জু সর্প প্রভৃতি এমন বস্তুর আরোপ করত, যারা একান্তই অসৎ।

দেখা যাচ্ছে, এসব উপমাতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথকধরনের বিভ্রমের একটা অসংগত মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। একটি বিভ্রমের সঙ্গে আরেকটির কোনও সাদৃশ্য না থাকলেও দুটিকে অভিন্ন বলে ধরা হয়েছে। ব্যাবহারিক-বিভ্রম আর মায়াবাদীর কল্পিত প্রপঞ্চ-বিভ্রম ঠিক এক বস্তু নয়। দৃষ্টি বা মতি-বিভ্রমে বিভ্রমের উপাদান—হয় সদ্ভূত, নয়তো সম্ভাবিত। যেমন করেই হ'ক, তারা বাস্তবেরই পর্যায়ে বা অধিকারে পড়ে। বিভ্রম ঘটে শুধু বস্তুর অযথা রূপায়ণ বা স্থাপনায়, তার মিথ্যা পরিণাম বা অসম্ভব যোগাযোগের দরুন। তাই মনের সমস্ত প্রমাদ ও বিভ্রমের মূলে আছে অবিদ্যার খেলা। প্রাক্তন বর্তমান বা সম্ভাবিত প্রমেয়কে আশ্রয় করে সে তথ্যের বিপর্যাস কি বিপর্যয় ঘটায়। কিন্তু কল্পিত প্রপঞ্চ-বিভ্রমে, বিভ্রমের প্রয়োজকের বাস্তবতা থাকলেও তার উপাদানের কোনও বস্তুসত্তা নাই। এ-বিভ্রম যেমন অনাদি তেমনি সর্ব-সম্ভব। তত্ত্ববস্তুর 'পরে সে একান্ত-কল্পিত নাম-রূপ-ক্রিয়া-কারকের আরোপ করে—অথচ তাদের তাত্ত্বিক সত্তা অতীতে বা ভবিষ্যতে কোনকালেই সম্ভাবিত নয়। এক্ষেত্রে মতি-বিভ্রমের উপমা খাটত, যদি নাম-রূপ-গোত্রহীন ব্রহ্ম এবং নাম-রূপ-গোত্রযুক্ত জগৎ উভয়কেই তাত্ত্বিক মেনে একের 'পরে অপরের অধ্যারোপ হত। অর্থাৎ সাপের জায়গায় দড়ি অথবা দড়ির জায়গায় সাপ, নির্গুণের নিবৃত্তির 'পরে সগুণের প্রবৃত্তির আরোপ—উভয়ক্ষেত্রে দুটি কোটিই সত্য, এই যদি বিভ্রমের পরিচয় হত। কিন্তু আরোপের দুটি কোটিই বাস্তব হলে বলতে হয়, তারা একই তত্ত্বের অসংকীর্ণ অথবা সংশ্লিষ্ট দুটি বিভাব, অথবা এক অখণ্ড-সত্তার ভাব ও অ-ভাবের দুটি মেরু মাত্র। তাদের সম্পর্কে মনের প্রমাদ কি বিপর্যস্ত-প্রত্যয় শুধু তত্ত্বের অবিদ্যাজনিত অযথা অনুভব বা অযথা সমাবেশ মাত্র। কোনমতেই তাকে জগৎপ্রসূতি অবিদ্যার বিভ্রম বলা যায় না।

মায়ার খেলাকে ভাল করে বোঝবার জন্য আরও যেসব দৃষ্টান্ত বা উপমা হাজির করা হয়, খুঁটিয়ে দেখলে তাদের মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি মেলে। তাইতে তাদের যেমন জোর থাকে না, তেমনি গুরুত্বও কমে যায়। রজ্জু-সর্পের উপমার মত শুক্তি-রজতের উপমাতেও ওই একই গলদ। আসলে এখানেও ভুল হয়েছে একটি উপস্থিত তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে আরেকটি অবর্তমান তত্ত্ববস্তুর সাদৃশ্যকে আশ্রয় করে। কিন্তু প্রপঞ্চবিভ্রমে এক অদ্বিতীয় অবিকারী ব্রহ্ম-বস্তুতে বহুধাজাত বিকারী অবস্তুর আরোপ হয়েছে। সুতরাং এখানেও উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সঙ্গতি নাই।...আরেকটি উপমা আছে—দ্বিচন্দ্র-

দর্শন : দৃষ্টিবিভ্রমবশত আমরা একটি বস্তুরই দুই বা বহু প্রতিরূপ দেখি। এমনি করে একটি চাঁদের জায়গায় দুটি চাঁদ দেখতে পারি। এখানে একটি বস্তুরই একাধিক অবিকল প্রতিরূপ দেখা গেল। তাদের একটি সত্য, আর বাকীগুলি বিভ্রম। কিন্তু ব্রহ্ম আর প্রপঞ্চের বেলায় এ-উপমাও খাটে না। কেননা একটি চাঁদ যেমন অবিকল দুটি চাঁদ হয়, তেমনি জগতে এক ব্রহ্ম তো অবিকল বহু ব্রহ্ম হয়ে দেখা দেন না। উপমাতে আছে সংখ্যার বিভ্রম। কিন্তু জগৎ তো শুধু ব্রহ্মের বহুগুণিত রূপ নয়—নির্বিশেষ একত্বের নির্বিশেষ বহু ভাব নয়। মায়ার খেলা এখানে দেখা দিয়েছে আরও জটিল হয়ে। তৎস্বরূপের অদ্বিতীয় শাশ্বত-অপরিণামী তাদাত্ম্যভাবের 'পরে একেরই বহুভাবনার বিভ্রম আরোপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে প্রকৃতির সংস্থান-বৈচিত্র্যের বিপুল মেলা, রূপ ও স্পন্দের বহুধা বিকল্প। অথচ নির্বিশেষ অধিষ্ঠান-ব্রহ্মে এসবের কিছুই ছিল না। স্বপ্ন অতীন্দ্রিয়দর্শন বা কবিকল্পনায় এমনতর অবাস্তব অথচ ব্যবস্থিত বৈচিত্র্য দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহলেও সে তো পূর্বসিদ্ধ একটা বাস্তব বিচিত্র-সংস্থানেরই অনুকৃতি, অথবা অনুকৃতিমূলেই সেখানে বৈচিত্র্যের প্রবর্তনা। এমনি করে কল্পনা বা বৈচিত্র্যসাধনার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মধ্যেও পূর্বানুকৃতির কিছু-না-কিছু ছাপ থেকেই যাবে। কিন্তু বিভ্রমবাদী তো মায়ার খেলাকে অনুকৃতি বলেন না। তাঁর মতে : মায়ার সৃষ্টি কোনও-কিছুর অনুকরণ নয়। মায়া একেবারেই এমন অবাস্তব স্পন্দ ও রূপের পসরা সৃষ্টি করেছে—যার কোনও সত্তা কোথাও নাই বা ছিলও না। একে তো কোনমতেই ব্রহ্মনিষ্ঠ কোনও-কিছুর অনুকৃতি প্রতিবিম্ব বিকার বা পরিণতি বলা চলবে না।... কিন্তু এমন অবাস্তব অথচ মৌলিক সৃষ্টির সঙ্গে ব্যাবহারিক মতি-বিভ্রমের কোনও তুলনাই হয় না। সুতরাং এর রহস্য আমাদের কাছে অনির্বচনীয়। এই বিরাট প্রপঞ্চ-বিভ্রম বাস্তবিকই তাহলে একটা অনুপম বিস্ময়। অথচ বিশ্বে সর্বত্র দেখছি, এক মূলা প্রকৃতিরই বহুধা-বিকৃতি—এই হল সৃষ্টির মূলসূত্র। কিন্তু সে-বিকৃতি বা বিসৃষ্টি বিভ্রম নয়, এক অখণ্ড পূর্বাধাতুরই বাস্তব ও বহুধা-বিচিত্র রূপায়ণ। একেরই তত্ত্ব নিজেকে আত্মনিষ্ঠ অগণিত রূপ ও অফুরন্ত বীর্যের সত্য ভাবনায় ফুটিয়ে তুলছে—এই লীলাই তো দেখছি দিকে-দিকে। এ-খেলা যে রহস্যে জড়িত, এমন-কি এ যে একটা ইন্দ্রজালের সমান, তাতেও ভুল নাই। কিন্তু কি করে কোন প্রমাণে বলব, এ শুধু অতত্ত্বের ইন্দ্রজাল—তত্ত্বের মায়া নয়; এ মাহেশ্বরী চিৎশক্তির বিলাস নয়—শাশ্বত আত্মসংবিৎ দ্বারা প্রবর্তিত আত্মবিসৃষ্টির লীলা নয়?

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, মনের স্বরূপ কি এবং অনাদি সন্মাত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কই-বা কি—কেননা মনই তো বিভ্রমের জনক। মন কি কোনও অনাদি

বিভ্রমশক্তির সন্ততি ও সাধন, অথবা সে নিজেই আদিবিভ্রমের প্রসূতি বিশেষ-কোনও শক্তি বা চেতনা? না মনের অবিদ্যায় শুধু স্বরূপসত্যের অন্যথা-গ্রহণ হয়—ঋত-চিৎই সত্যকার বিশ্বপ্রসূতি, অবিদ্যা-মন তার একটা তির্যক বিভূতি মাত্র? আমাদের প্রাকৃত-মনে যে চেতনার সিসৃক্ষার পূর্ব্যেবীর্য নাই, একথা অনস্বীকার্য। তার সৃষ্টি-সামর্থ্য গুণীভূত—পুরাণকল্পিত প্রজাপতির মত অনাদি সিসৃক্ষার সে অবান্তরসাধন মাত্র। অনুরূপ সকল মন সম্পর্কেই একথা খাটে। প্রাকৃত-মনের প্রমাদ তুলাবিদ্যার পরিণাম। অতএব তার উপমা দিয়ে বিশ্বপ্রসূতি মূলা বিদ্যা কি সর্বকল্পিকা সর্বসাধিকা মায়ার প্রকৃতি কি প্রবৃত্তির রহস্য বোঝা যায় না। প্রাকৃত-মন অতিচেতনা ও অচিতির মাঝামাঝি রয়েছে বলে এ-দুটি বিপরীত শক্তির বীর্য তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। তার একদিকে আছে এক গুহাচর অধিচেতন-সত্তার প্রবেগ, আরেকদিকে বহিশ্চর বিশ্বলোকের প্রতিভাস। তাই অন্তর্গূঢ় অজানার উৎস হতে একদিকে সে পায় কত প্রেরণা ও কল্পনা, বোধিজাত কত প্রত্যয়, জ্ঞান ও কর্মের কত প্রেতি, মনোময় ভূত-ভব্যের কত কল্পছবি। আবার বিশ্বপ্রতিভাসের অনুশীলন দ্বারা সে আহরণ করে সিদ্ধ-ভূতার্থের কত ছক এবং তারই অনাগত উত্তরকান্ডের ব্যঞ্জনা। তত্ত্বের সঞ্চয়ে তার ভান্ডার পূর্ণ—তার কিছু ভূত, কিছু-বা ভব্য। জড়বিশ্বের সিদ্ধ-ভূতার্থকে পুঁজি করে তার কারবার শুরু। তাদের ধরে অন্তর্বৃত্তিকে ব্যাপারিত করে সে ভূতার্থে নিহিত বা আভাসিত অসিদ্ধ-ভব্যার্থের সন্ধান পায়। ওই ভব্যার্থের মধ্যে কতগুলিকে সে বেছে নেয় তার আন্তরব্যাপারের আলম্বনরূপে এবং তাদের কল্পিত অথবা অন্তশ্চিন্তিত রূপায়ণ নিয়ে খেলা করে। আবার কতগুলিকে বেছে নেয় ভূতার্থরূপে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। কিন্তু তাছাড়াও তার প্রেরণার জোগান আসে লোকোত্তর বা গুহাচর অলখের উৎস হতে—শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের অভিঘাত হতেই নয়। তাই বহির্জগতের বাস্তব-পরিবেশকে ছাপিয়েও সে গূঢ়তর সত্যের সন্ধান পায়। আবার তাদের নিয়েও তার অন্তরে-অন্তরে অব্যক্ত হতে আহিত কিংবা অন্তশ্চিন্তিত রূপায়ণের খেলা, অথবা বাস্তবে তাদের কাউকে মূর্ত করবার সাধনা চলে।

ভূতার্থের সমীক্ষা ও ব্যবহারই প্রাকৃত-মনের বিশেষ ধর্ম। তাছাড়া অজ্ঞাত কি অমূর্ত সত্যের অনুমান বা গ্রহণের সামর্থ্যও তার আছে। অমূর্ত আর মূর্তের মাঝে যে-ভব্যার্থের আনাগোনা, তাকে নিয়েও তার বেসাতি চলে। কিন্তু অনন্তচেতনার সর্বজ্ঞত্ব সে পায়নি। তার জ্ঞানের সীমা সঙ্কুচিত এবং সেই সঙ্কোচকে বিস্ফারিত করবার জন্য চাই তার কল্পনা ও আবিষ্কারের সামর্থ্য। অনন্তচেতনার মত জানাকে সে প্রকাশ করে না, করে অজানাকে আবিষ্কারের তপস্যা। অনন্তের ভব্যার্থকে সে ধারণা করে নিগূঢ় কোনও

সত্যের পরিণাম কি রূপের বৈচিত্র্য বলে নয়—কিন্তু নিজেরই বন্ধনহীন কল্পনার ক্ষূর্তি সৃষ্টি বা বিজৃম্ভণরূপে। তেমনি অনন্ত চিতিশক্তির সর্বেশনাও তার নাই। বিশ্বশক্তি তার কাছ থেকে যে-উপচার গ্রহণ করবে, শুধু তাকেই সে মূর্ত করতে পারে। সমষ্টির লীলায় কখনও যে তার ব্যষ্টি ভাবনার বীর্য সার্থক হয়, তার কারণ—যে অতিচেতন বা অধিচেতন দেবতা অন্তর্যামিরূপে তার মধ্যে নিগূঢ় হ'য়ে আছেন, তিনিই তাকে নিমিত্ত করে প্রকৃতির ওই সার্থকতা চান। অপূর্ণতা এবং প্রমাদের অবকাশ আছে বলে তার জ্ঞানের সঙ্কোচ অবিদ্যার রূপ ধরে। তাই ভূতার্থের কারবারেও বস্তুর পর্যবেক্ষণে প্রযোজনায় বা সৃষ্টিতে তার ভুল হয়। ভব্যার্থকে নিয়েও তেমনি গোল বাধে বিষয়ের সংযোগে সমাবেশে প্রযোজনায় বা স্থাপনায়। আবার সত্যদর্শনের প্রসাদ পেয়েও সত্যকে সে বিকৃত দুর্ব্যাখ্যাত ও বৈষম্যদুষ্ট করতে পারে। তাছাড়া মনের নিজস্ব কতগুলি নির্মাণরূপ থাকতে পারে—যার মধ্যে ভূতার্থের কোনও সাদৃশ্য, মূর্ত হবার কোনও যোগ্যতা অথবা অন্তর্গূঢ় সত্যের সমর্থন নাই। ভূতার্থের অবৈধ অতিদেশ হতে এসব নির্মাণ-রূপের কল্পনা—তারা বিশ্বশক্তির অনীপ্সিত সম্ভাবনার সিদ্ধির দিকে হাত বাড়ায়, অপ্রযুক্তত্ব-দোষে দুষ্ট করতে চায় সত্যের প্রয়োগ। মন সৃষ্টি করতে পারলেও সৃষ্টির সে আদিপ্রবর্তক নয়। তার সৃষ্টিতে সর্বজ্ঞতা কি সর্বেশনার আবেশ নাই। এমন-কি প্রজাপতিরূপেও তার সিসৃক্ষা সবসময়ে সার্থক নয়।...অতএব সৃষ্টির আদিতে আছে মন নয়—মায়া। বিভ্রমশক্তিরূপিণী মায়াই তার বিশ্বের আদ্যা প্রসূতি, কেননা একেবারে শূন্য হতে সে বিশ্বের আবির্ভাব ঘটায়। (অবশ্য বলতে পারি, শূন্য নি'য়ে নয়, তত্ত্ববস্তুর উপাদান নিয়েই মায়ার সৃষ্টিলীলা; কিন্তু তাহলে তার সৃষ্টবস্তুকেও তত্ত্ব বলে মানতে হয়)। সংকল্পিত সৃষ্টির বিষয়ে মায়ার পূর্ণ বিজ্ঞান আছে, আ'ছে সিসৃক্ষাকে সার্থক করবার নিরঙ্কুশ সামর্থ্য। কিন্তু এ অকুণ্ঠিত বিজ্ঞান ও ঈশনা তার নিজের বিভ্রম সম্পর্কেই শুধু। ঐন্দ্রজালিকের মত অব্যাহত সিদ্ধি ও সর্বার্থসাধিকা শক্তি নিয়ে সে বিভ্রমের যত দল সৌষম্যের লীলাকম'ল সংহত করে—আপন বিচিত্র-ব্যাকৃতির বিজৃম্ভণকে জীববুদ্ধির 'পরে তত্ত্বার্থ ভব্যার্থ বা ভূতার্থরূপে আরোপ করে অবন্ধ্য অর্থক্রিয়ার প্রবেগ দিয়ে।

প্রাকৃত-মন স্বচ্ছন্দে এবং নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে পারে, যখন বাস্তবকে সে ক'র্মের উপাদানরূপে—অন্তত তার প্রবৃত্তির একটা আশ্রয়রূপে পায়, অথবা যখন বিশ্বের কোনও শক্তির তত্ত্ব জেনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হয়। এইজন্যই ভূতার্থের কারবারে সে পদস্খলনের আশঙ্কা করে না। এমনি করে ভব্যার্থকে মূর্ত বা ভূতার্থকে আবিষ্কার ক'রে সেই পুঁজি নিয়ে নূতন সৃষ্টির অভিযানে এগিয়ে যাওয়া—সাধনার এই সূত্র ধরেই আজ

জড়বিজ্ঞানের ওই বিপুল সিদ্ধি। কিন্তু প্রপঞ্চবিভ্রমের মত তার সৃষ্টিতে বিভ্রমের অথবা মহাশূন্যে অবস্তুর সৃষ্টি ক'রে বস্তুর প্রতিভাসরূপে তাদের চালিয়ে দেবার ছলনা নাই। কারণ. উপাদান হ'তে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকেই মন রূপায়িত করতে পারে। . বাস্তবে প্রকৃতির যেটুকু শক্তির যেভাবে প্রকাশ সম্ভব, সেই রীতি ধরেই শক্তির সঙ্গে তার কারবার চলে। যে-সত্য প্রকৃতির মধ্যে ভ্রূণরূপে নিহিত হয়েই আছে. শুধু তারই ব্যাকৃতি কি আবিষ্কার তার সাধনায়ত্ত। আবার অন্তশ্চেতনা বা ঊর্ধ্বভূমি হতে মনের মধ্যে সৃষ্টির যে-প্রেরণা আসে, তাতে তত্ত্বার্থ কি ভব্যার্থের ইঙ্গিত থাকলে তবেই সে বাস্তবে রূপায়িত হয়—নইলে শুধু মনের নির্মাণ-শক্তিতেই কোনও কাজ সিদ্ধ হয় না। কারণ, যা তত্ত্ব নয় ভব্যও নয়, মনের জল্পনা তার মূর্তি গড়লেও বাস্তবে তাকে সৃষ্টি করা কোনমতেই সম্ভব হয় না।...কিন্তু মায়াবাদীর মায়া অধিষ্ঠানতত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টি করলেও সে-সৃষ্টি অধিষ্ঠান-নিরপেক্ষ—অধিষ্ঠানে তার তত্ত্ব বা তার ভব্যতা নিহিত থাকে না। এমন-কি ব্রহ্মবস্তুকে উপাদান করে কিছু গড়লেও মায়ার সে-সৃষ্টি হবে—হয় কারণ-তত্ত্বের অননুগত, নয়তো অসম্ভাবিত। কেননা ব্রহ্ম স্বভাবত অরূপ অথচ মায়া গড়ে রূপ, ব্রহ্ম একান্তই নির্বিশেষ অথচ মায়া করে বিশেষের ব্যাকৃতি।

বলা যেতে পারে : মনের কল্পনা-বৃত্তি আছে। তা-ই দিয়ে সে যা গড়ে, তাকে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করতে তার বাধা নাই। এইখানে মায়ার খেলার সঙ্গে তার কতকটা সাদৃশ্য আছে না কি?...কিন্তু আমাদের মানস কল্পনা অবিদ্যারই একটা সাধন। জ্ঞান ও সার্থক-প্রবৃত্তির সামর্থ্য যেখানে সীমিত, সেখানেই অগত্যা এই কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। মন তার শক্তির দৈন্যকে পুরিয়ে নেয় কল্পনা দিয়ে। তা-ই দিয়ে দৃষ্ট হতে সে দোহন করে যা অদৃষ্ট এবং অদৃশ্য, সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভবকে সৃষ্টি করে নিজের খেয়াল-মত, গড়ে অবাস্তবের বস্তুরূপ, অথবা জল্পনার তুলিতে আঁকে সত্যের এমন-একটা কৃত্রিম ছবি, বাস্তব-অনুভবের সঙ্গে যার কোনও মিল নাই। বাইরে থেকে কল্পনাবৃত্তিকে এমনই মনে হয় বটে। কিন্তু আসলে কল্পনাও সত্যাশ্রয়ী। কল্পনা প্রাকৃত-মনের সেই শক্তি, যা দিয়ে সৎস্বরূপের অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্ভাবনাকে সে নিষ্কাশিত করে—এমন-কি অসীমের গহন থেকে অজানার নিগূঢ় ভাবনাকে জানার কোঠায় নামিয়ে আনে। কিন্তু তার চলার পথে পূর্ণজ্ঞানের আলো পড়েনি, তাই যে তত্ত্বার্থ এবং ভব্যার্থ এখনও ভূতার্থের সিদ্ধরূপ ধরেনি, তাকে পেতে সে নানান ছাঁদে মূর্তি গড়ে। সত্যের প্রাতিভ-স্ফুরণকে ঠিকমত চেনবার সামর্থ্য তার নাই, তাই জল্পনা দিয়ে প্রকল্প দিয়ে সত্যের সম্পর্কে তার গবেষণা চলে। বস্তুর স্বরূপযোগ্যতাকে ফুটিয়ে তোলবার শক্তি তার সংকীর্ণ ও সীমিত, তাই সে সম্ভাবনার ছবি আঁকে

বাস্তবে তাকে রূপ দেবার আশা বা ঔৎসুক্য নিয়ে। কিন্তু জড়বিশ্বের প্রতিকূলতায় আড়ষ্ট ও সংকুচিত তার রূপায়ণের সামর্থ্য, তাই সিসৃক্ষা ও আত্মবিভাবনার আনন্দকে সার্থক করতে কল্পলোকে তার বস্তু-ভাবনার বিলাস চলে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, কল্পনার ভিতর দিয়ে সে সত্যেরই একটা আঁচ পায়, জাগিয়ে তোলে ভব্যার্থের সেই ব্যঞ্জনা যা অবশেষে ভূতার্থে পর্যবসিত হয়—এমন-কি অনেকসময় তার কল্পনার চাপেই জগতের বুকে সম্ভাবিত পায় বাস্তবের রূপ। মানুষের মনের নাছোড়বান্দা কল্পনা চরিতার্থতার পথ একদিন খুঁজেই পায়—যেমন তার আকাশ-বিহারের কল্পনা। ব্যক্তি-মনের কল্পরূপও সত্য হয়ে ওঠে, যদি সে-রূপের অথবা রূপকৃৎ মনের বীর্য দুর্ধর্ষ হয়। কল্পনার মধ্যে অর্থক্রিয়াকারিতা আপনাহতেই দেখা দেয়, যদি সমষ্টি-মনের ভাবনা তার আশ্রয় হয়। অবশেষে একদিন সে পায় বিরাটের সত্য-সংকল্পের সমর্থন। সত্য বলতে সব কল্পনাতেই ভব্যার্থের ইঙ্গিত আছে। তার মধ্যে কেউ-কেউ কোনদিন বাস্তবও হয়ে ওঠে, যদিও সে-বাস্তবতার চেহারা হয়তো হয় আরেকরকম। কিন্তু অধিকাংশ কল্পনাই বন্ধ্যা হয়, কেননা হয়তো তারা বর্তমান কল্পের উপযোগী নয়। অথবা হয়তো ব্যক্তির নিরূপিত 'অদৃষ্টের' বহির্ভূত তারা কিংবা সমষ্টির সামান্যভাবনার সঙ্গে অসমঞ্জস, অথবা উপস্থিত জগৎ-ভাবের প্রকৃতি বা নিয়তির পক্ষে বিজাতীয়।

অতএব মনের কল্পনা আগাগোড়াই নিছক একটা বিভ্রম নয়। মনের বাস্তব অনুভব তার ভিত্তি, অন্তত তা-ই তার উৎস। কল্পনাকে বলতে পারি বাস্তবেরই রকমফের, অথবা তার মধ্যে আনন্ত্যেরই অপরোক্ষ বা পরোক্ষ সম্ভাবনা রূপ ধরে। যদি অন্য-কোনও সত্যের প্রকাশ হত জগতে, অথবা বর্তমান জগদ্বীজের সংস্থান অন্যরকম হত, কিংবা কল্পবহির্ভূত অন্য-কোনও সম্ভাবনা যদি স্ফুরণোন্মুখ হত—তাহলে কি ঘটতে পারত, কল্পনায় যেন তার আভাস পাই। তাছাড়া, স্থূল বাস্তবতার বাইরে যেসব অতীন্দ্রিয়-জগতের রূপ ও বীর্য রয়েছে, মনের রাজ্যে কল্পনাই তাদের খবর আনে। এমন-কি কল্পনা যখন উৎপ্রেক্ষার আকার ধরে, কিংবা বিভ্রম বা কুহকে পরিণত হয়, তখনও ভূতার্থ কি ভব্যার্থই তার অবলম্বন হয়। কল্পনা গড়ল মৎস্য-নারী। কিন্তু তার মধ্যে দুটি ভূতার্থকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এমনভাবে, যা ক্ষিতিতত্ত্বের স্বাভাবিক স্বরূপযোগ্যতার বাইরে। এমনি করে কল্পনা গড়ে গন্ধর্ব কিন্নর বা শরভের মূর্তি। কখনও তার মধ্যে কোনও অতীত বাস্তবের স্মৃতি থাকে—যেমন ড্র্যাগনে। কখনও চেতনার অন্যভূমিতে কি জীবনের অন্য পরিবেশে যা সত্য বা সম্ভব, কল্পনায় তারই রূপ ফোটে। এমন-কি বদ্ধপাগলেরও আজগুবী কল্পনার মূলে আছে বাস্তবেরই অতিরঞ্জিত বিপর্যাস। পাগল যদি নিজেকে ইংলণ্ডের রাজা ভেবে কল্পনায় প্ল্যান্টাজেনেট্

বা ট্যুডরদের সিংহাসনে সমাসীন হয়, তাহলে তাতে বস্তুস্থিতির বিপর্যয় ঘটলেও তার উপাদান তো অবাস্তব নয়। মানসিক প্রমাদের কারণ খুঁজলেও সাধারণত দেখি, তার গোড়ায় আছে অনুভূত তথ্যেরই বিপর্যস্ত সমাযোগ বিন্যাস কি প্রযোজনা, অথবা তার অনুচিত ধারণা বা ব্যবহার। গভীরতর সত্যচেতনায় বোধিপ্রত্যয়দ্বারা ভব্যার্থকে ধারণা করবার একটা প্রতিভা আছে। প্রাকৃত-মনে তারই ঠাঁই নিয়েছে কল্পনা—এই হল তার স্বরূপকথা। তাই মন সত্যচেতনার দিকে যতই উঠে যায়, ততই প্রাকৃত কল্পনা ঋতম্ভরা কল্পনার রূপ ধরে। প্রাকৃত-ভূমিতে সঞ্চিত ও ব্যাহত জ্ঞানের সঙ্কুচিত বৃত্তি অথবা সংকীর্ণ পরিসরের 'পরে সে-কল্পনা উত্তর-সত্যের বর্ণচ্ছটা ঢালে। অবশেষে ওই উত্তর-জ্যোতিতে জারিত হয়ে লোকোত্তর ঋতভৃৎ বীর্যের মধ্যে সে হারিয়ে যায়, অথবা স্বয়ং রূপান্তরিত হয় বোধি ও চিন্ময় প্রেতির বৈদ্যুতীতে। এই ঊর্ধ্বায়নের ফলে মন আর বিভ্রমের সৃষ্টি করে না, বা প্রমাদের সৌধ রচে না।...অতএব মন অসৎ অথবা শূন্যে কল্পিত বস্তুর অসপত্ন স্রষ্টা নয়। অবিদ্যার যে-জিজ্ঞাসাবৃত্তি, তাকেই বলি মন। তার বিভ্রমণও একান্ত অমূলক নয়—তাও সীমিত জ্ঞান বা অর্ধ-অবিদ্যার পরিণাম। মন বিশ্বগত অবিদ্যাশক্তির সাধন হতে পারে। কিন্তু সে যে প্রপঞ্চবিভ্রমেরও শক্তি বা সাধন, তার স্বরূপ অথবা প্রবৃত্তি হতে তা কিন্তু বোঝা যায় না। তত্ত্বার্থ ভব্যার্থ এবং ভূতার্থের এষণা ও আবিষ্কার মনের ধর্ম, তাদের সৃষ্টি করবার সামর্থ্য বা সম্ভাবনাও তার আছে। অথচ মন স্বয়ং এক অনাদি চৈতন্য ও শক্তির গৌণ বিভূতি। সুতরাং ওই চিৎ-শক্তিরও যে তত্ত্ব এবং ভূত-ভব্যের সৃষ্টিসামর্থ্য আছে, এ-অনুমান অসঙ্গত নয়। দুয়ের সামর্থ্যে তফাত শুধু এই যে, মনের ন্যায় সঙ্কুচিত নয় বলে চিৎ-শক্তির অধিকার বিশ্বময় প্রসারিত। অবিদ্যালেশশূন্য ব'লে প্রমাদের সম্ভাবনা হতে সে মুক্ত—এক লোকোত্তর সার্বজ্ঞ্য ও সর্বেশনার, শাশ্বত প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানের সে নিরঙ্কুশ সাধন অথবা স্বরূপবীর্য।

তাহলে দুটি সম্ভাবনার দুয়ার আমাদের কাছে মুক্ত হল। তার একটি এই : এক কুহকিনী অনাদি চিৎ-শক্তিই মনকে সাধন অথবা বাহন ক'রে নিখিল জীবচেতনায় বিভ্রম ও অবাস্তবতার কুহক সৃষ্টি করেছে। অতএব এই পরিদৃশ্যমান ব্যাকৃত বিশ্ব মিথ্যা, মায়ার ছলনা মাত্র—সত্য শুধু এক অনির্বাচ্য অব্যাকৃত নির্বিশেষ তত্ত্ব। তুল্যবল আরেকটি সম্ভাবনা এই : পরাৎপর অথবা বিশ্বাত্মক এক পূর্ব্য ঋতচিৎই ঋতময় বিশ্বের প্রসূতি। সেই বিশ্বে মনের কুণ্ঠিত প্রয়াস চলেছে অবিদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ চেতনার আলো-আঁধারিরূপে। মনশ্চেতনায় অজ্ঞান অথবা সীমিত জ্ঞানের বাধা আছে বলেই দেখা দেয় প্রমাদ বা অন্যথা-খ্যাতি, দৃষ্টার্থ হতে ভ্রান্ত অথবা দিগ্‌ভ্রষ্ট জল্পনা,

অদৃষ্টার্থের দিকে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ানো। তাই সে-চেতনার সৃষ্টি ও কৃতি অর্ধ-সার্থক হয়—কেননা সত্য ও প্রমাদ, বিদ্যা ও অবিদ্যার মাঝে অবিরাম সে আন্দোলিত। কিন্তু হোঁচট খেয়ে হলেও বিদ্যা হতে বিদ্যার দিকেই চলেছে অবিদ্যার এই অভিযান। তার স্বভাবধর্মে সঙ্কোচ ও ব্যামিশ্রতার বাধাকে ঝেড়ে ফেলবার সামর্থ্য নিহিত রয়েছে, এবং তার ফলে ঋতচিতের মধ্যে বন্ধনহীন বিহারদ্বারা আপনাকে সে পূর্ব্য-বিজ্ঞানের অধৃষ্য বীর্যে রূপায়িত করতে পারে। আমাদের এষণা নিয়ে চলেছে এই শেষোক্ত সম্ভাবনার দিকে। তার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ইশারা : প্রপঞ্চবিভ্রমের কল্পনা দিয়ে চেতনা-রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়, কেননা চেতনার স্বরূপধর্মে তার কোন সমর্থন নাই। সমস্যা আছেই। তার রূপ হল, আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ে এবং বিষয়-প্রত্যয়ে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার মিশ্রণ। স্বভাবের এই ন্যূনতার হেতু আবিষ্কার করাই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। তার জন্য শাশ্বত পরমার্থসত্যের মধ্যে অনাদি বিভ্রমশক্তির অনির্বচনীয় নিত্যস্থিতিকে টেনে আনবার, অথবা শাশ্বত নিরঞ্জন নির্বিশেষ পরা সংবিতের 'পরে অতর্কিতে এক অসৎ-প্রপঞ্চের অঞ্জন মাখিয়ে দেবার কোনও প্রয়োজন হয় না।
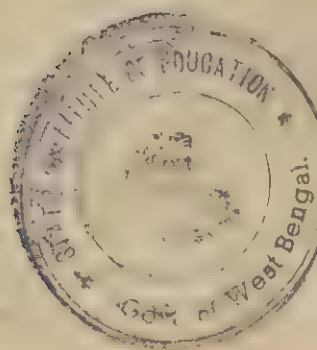
ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চবিভ্রম

ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা।

বিবেকচূড়ামণি ২০

ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা। —বিবেকচূড়ামণি ২০

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ॥
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৯, ১০

এই বিশ্বকে মায়ী সৃষ্টি করেন তাঁর মায়ায়: তারই মধ্যে নিরুদ্ধ আছে আরেকজন। মায়াকে জানবে প্রকৃতি, আর মায়ীকে জানবে মহেশ্বর।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪।৯, ১০)

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৫

পুরুষই এইসব—যা কিছু ভূত এবং যা-কিছু ভব্য, সব; অমৃতত্বেরও ঈশান তিনি—অন্নেতে যা বেড়ে চলে, তাও তিনি।

—শ্বেতাশ্বর উপনিষদ (৩।১৫)

বাসুদেবঃ সর্বম্। গীতা ৭।১৯

বাসুদেবই সব। —গীতা (৭।১৯)

কিন্তু এতক্ষণ ধরে যে-আলোচনা হল, তাকে বলতে পারি তত্ত্বসমীক্ষার প্রবেশক মাত্র। আসল সমস্যাটা এখনও নেপথ্যের অন্তরালে অসমাহিত হয়েই আছে। প্রশ্ন এই : যে অনাদি চৈতন্য বা শক্তি হতে বিশ্বের সৃষ্টি কল্পকৃতি বা বিভাবনা, তার সঙ্গে আমাদের জগৎ-প্রত্যয়ের কি সম্পর্ক? অর্থাৎ বিশ্বের স্বরূপ কি? সে কি আমাদের মনের 'পরে এক সর্বজয়া বিভ্রমশক্তির দ্বারা আরোপিত চেতনার কল্পমায়া শুধু, না সে পরমার্থ-সত্যেরই তত্ত্ব-রূপায়ণ—ক্রমে অবিদ্যার ঘোর কাটিয়ে উপচীয়মান বিদ্যার আলোকে আমরা যার পরিচয় গ্রহণ করছি? সেইসঙ্গে এসে পড়ে শুধু মন কি মনঃকল্পিত জগৎস্বপ্ন বা বিশ্বমায়ার স্বরূপকথা নয়, ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সম্পর্কেও নানান্ প্রশ্ন : ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তাঁর মধ্যে যে সৃষ্টির লীলা চলছে কিংবা আরোপিত হয়েছে, তার প্রামাণ্য কতটুকু? ব্রহ্মচৈতন্যে বা জীবচৈতন্যে বিষয়াকারা সত্যকার কোনও বৃত্তি আছে কি নাই? ব্রহ্ম কি জীবের সাক্ষিচৈতন্যে

যে-জগৎ ভাসছে, সে কি সৎ না অসৎ? এ-সম্পর্কে মায়াবাদীর কি মত, পূর্বেই তার উল্লেখ করেছি। তিনি বলবেন : জগৎ যে সত্য, সে ওই বিশ্ব-মায়ার কুহকমণ্ডলের মধ্যেই। প্রপঞ্চব্যবহারই মায়ার লীলার সাধন, তা-ই দিয়ে অবিদ্যার মধ্যে নিজেকে সে কায়েম রেখেছে। বিশ্বভুবনের যা-কিছু তত্ত্ব বা ভূত-ভব্য, তাদের সত্যতা ও বাস্তবতা শুধু মায়ার রাজ্যে, তার কুহক-মণ্ডলের বাইরে তাদের কোনও প্রামাণ্য নাই—ধ্রুব ও শাশ্বত হওয়া তো দূরের কথা। বিশ্বে বিদ্যার খেলা কি অবিদ্যার খেলা দুইই কালের পটে ক্ষণিকের চিত্রলেখা মাত্র। আবার এই বিদ্যাই আরেকদিক দিয়ে মায়ার একটা সপ্রয়োজন সাধন, কেননা বিদ্যা দিয়েই সে মনের রাজ্যে নিজের ঘোর ভাঙে। তাই অধ্যাত্মবিদ্যাকে অপরিহার্য মানতে আমাদের আপত্তিও নাই। কিন্তু বিদ্যা-অবিদ্যার সকল দ্বন্দ্বের ওপারে আছেন যে শাশ্বত শুদ্ধসন্মাত্র, যে নিত্য নিরুপাধিক ব্রহ্ম বা আত্মা, তিনিই একমাত্র পরমার্থসত্য ও অবিকার্য কূটস্থ-তত্ত্ব।...এ-জগতে সব-কিছু নির্ভর করছে মনের সংস্কার ও মনোময়-জীবের তত্ত্বানুভবের ধারার 'পরে। বিশ্বের তথ্য, ব্যক্তির অনুভব, অথবা বিশ্বোত্তীর্ণের উপলব্ধি—সবার তত্ত্ব এক হলেও মনের সংস্কার বা অনুভব অনুসারে তাদের তাৎপর্যনির্ণয়ের ভঙ্গি আলাদা হয়। সমস্ত মানসপ্রত্যয়ই জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীর আশ্রিত। তার প্রত্যেকটি অথবা সব-কটি পুটকেই বাস্তব কি অবাস্তব দুইই বলা চলে। তখন প্রশ্ন ওঠে, এদের মধ্যে কোনটি বাস্তব—কিধরনের কতখানি বাস্তব? মায়ার সাধন বলে ত্রিপুটীকে যদি বাতিল করি, তাহলে আবার প্রশ্ন হবে : ত্রিপুটীর বাইরে কি পরমার্থ বলে কিছু আছে? যদি থাকে তো মায়ার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

জ্ঞাতা ও জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কি খাটো করে একমাত্র জ্ঞেয় বা দৃশ্যজগৎকেই সত্য বলে দাঁড় করানো যায়। জড়বাদী তা-ই করেছেন। তাঁর কাছে চৈতন্য জড়ের আধারে জড়শক্তির ক্রিয়া শুধু। মস্তিষ্ককোষের নির্যাস ও কম্পন হতে কিংবা জড়ের অভিঘাতে জড়ের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্ষেপ হতে তার উদ্ভব। চৈতন্যকে নিছক জড়ে দাঁড় করানোর দুরাগ্রহকে শিথিল করে তার অন্য-কোনও নিদান মানলেও জড়বাদী তাকে শাশ্বত তত্ত্ব বলতে নারাজ। তাঁর মতে চৈতন্য কোনও-এক প্রকৃতির সাময়িক বিকৃতি মাত্র। জ্ঞাতা পুরুষও তাঁর কাছে একটা দেহযন্ত্র শুধু—জড়ের অভিঘাতে তার যন্ত্রবৎ প্রতিক্রিয়াকেই আমরা একটা সামান্যসংজ্ঞা দিয়ে বলি 'চৈতন্য'। অতএব ব্যক্তিচৈতন্যও জড়-প্রকৃতির কালাবচ্ছিন্ন পরতন্ত্র ব্যাপার মাত্র।...কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবছেন আরেকটা সম্ভাবনার কথা : শেষপর্যন্ত জড়ও হয়তো একটা অবাস্তব জন্য-পদার্থ মাত্র, হয়তো সে শক্তিরই একটা প্রতিভাস। তাহলে শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব—জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় সবই শক্তির খেলা। কিন্তু শুধু শক্তি আছে, তাতে

আবিষ্ট হয়ে কোনও শক্তিমান বা সৎস্বরূপ নাই, কোনও চৈতন্যের স্ফুরত্তা নাই; মহাশূন্যে চলছে শুধু অনাদি শক্তির বিক্ষেপ (কেননা যে-জড়ের আধারে তার ক্রিয়া দেখছি, আসলে সেও তো শক্তিজন্য, সুতরাং সেই-বা শক্তির আশ্রয় হবে কেমন করে?) : এও কি মনে হচ্ছে না একটা অবাস্তব মনোবিকল্প মাত্র? তাহলে শক্তি কি একটা দুর্বোধ স্পন্দলীলার চকিত চমক—যে-কোনও মুহূর্তেই তার বিবর্তের বিলাস থেমে যেতে পারে, অতএব আনন্ত্যের মহা-শূন্যতাই একমাত্র ধ্রুবতত্ত্ব? জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এক বিশ্বভাবন স্পন্দের বিপাক শুধু—বৌদ্ধদর্শনের এই কর্মবাদের স্বাভাবিক পরিণাম শূন্যবাদে।...আবার এও হতে পারে : বিশ্বে চৈতন্যেরই লীলা—শক্তির নয়। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে জড় যেমন স্বরূপত অজ্ঞেয় কিন্তু কার্যদ্বারা অনুমেয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, শক্তিও তেমনি পর্যবসিত হতে পারে চৈতন্যের ক্রিয়াতে—যে-চৈতন্য শক্তির মতই কার্যানুমেয়। কিন্তু এই চৈতন্যের ক্রিয়াও যদি শূন্যে-শূন্যে চলে, তাহলে আবার ওই সিদ্ধান্তেই এসে পেঁাছই : চৈতন্যও যেমন অলীক, তেমনি অলীক তার প্রাতিভাসিক লীলার অচিরবিভ্রম। এক অনন্ত শূন্য, এক অগ্র্য অসৎই কেবল ধ্রুবসত্য।...কিন্তু এসমস্ত কল্পের কোনটিই আমাদের পক্ষে অনতিবর্তনীয় নয়, কারণ কার্যানুমেয় চৈতন্যেরও পিছনে এক অদৃশ্য পূর্ব্য-সন্মাত্রের অধিষ্ঠান থাকতে পারে। তাহলে তার চিন্ময় মহাশক্তি একটা তত্ত্ব এবং তার বিসৃষ্টিও তাত্ত্বিক হবে। সে-বিসৃষ্টির প্রথম পর্বে অতীন্দ্রিয় অণুপ্রমাণ রূপধাতুর যে-বিচ্ছুরণ, ক্রমে শক্তির লীলায়নে তা-ই দেখা দেয় ইন্দ্রিয়গোচর জড় হয়ে। এই জড়ের রূপায়ণ যেমন সত্য, তেমনি সত্য জড়ের জগতে জীবের উন্মেষ—পূর্ব্য-সন্মাত্রেরই চেতনবিগ্রহরূপে। এই অনাদিসৎ পরমতত্ত্ব বিশ্ববিগ্রহ চিন্ময়-সন্মাত্র, অথবা 'বিশ্বে দেবাঃ' অথবা আরও কত-কি হতে পারেন। কিন্তু যা-ই হ'ন, তাঁর বিসৃষ্ট বিশ্বও হবে তথাভূত—বিভ্রম বা প্রতিভাস নয়।

প্রচলিত মায়াবাদে অদ্বিতীয় পরাৎপর চিন্ময় সন্মাত্রই একমাত্র তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্বভাবে তিনি আত্মস্বরূপ, কিন্তু যে-প্রাকৃতজীবে আত্মারূপে তাঁর অধিষ্ঠান, সে কিন্তু কালকলিত প্রতিভাস মাত্র। সর্বোপাধিশূন্যরূপে বিশ্বের অধিষ্ঠান তিনি, অথচ সেই অধিষ্ঠানে কল্পিত বিশ্ব—হয় অসৎ বা আভাস, নয়তো অবস্তু-সৎ। মোটের উপর বিশ্ব একটা বিভ্রম শুধু। কারণ, ব্রহ্ম 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' শাশ্বত নির্বিকার পরমার্থ-সৎস্বরূপ। তিনি ছাড়া কিছুই নাই, অথচ তাঁর একান্ত সদ্‌ভাবেরও কোনও সত্য সম্ভূতি নাই। তিনি নাম-রূপ-ক্রিয়া-কারক-বিশেষণবর্জিত—এই তাঁর নিত্যস্বরূপ। তাঁর চৈতন্যও আত্ম-সমাহিত নিরঞ্জন স্বরূপচৈতন্য মাত্র।...কিন্তু তাহলে এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম আর প্রপঞ্চবিভ্রমের মাঝে কি সম্বন্ধ? কোথা হতে এই অনির্বচনীয় মায়ার

আবির্ভাব হয়—কি করে সে অন্তহীন কালের স্রোতে ভেসে চলে? এ কী রহস্য, কার চরম চমৎকার?

একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব যখন, তখন শুদ্ধ ব্রহ্মের চৈতন্য বা শক্তিরই সত্যকার সৃষ্টিসামর্থ্য থাকবে এবং তার সৃষ্টিও হবে তাত্ত্বিক সৃষ্টি। কিন্তু শুদ্ধ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই যদি সত্য না হয়, তাহলে ব্রহ্মেরও সত্যকার সৃষ্টিসামর্থ্য থাকতে পারে না। ব্রহ্মচৈতন্যে তথাভূত ভাব রূপ কি ক্রিয়া-কারকের সংবিৎ থাকলে বুঝতে হবে সম্ভূতিও সত্য—বিশ্বের চিন্ময় ও জড়ময় দুটি রূপই যথার্থ। অথচ পরমার্থতত্ত্বের অনুভবদ্বারা এ-জ্ঞান বাধিত হয়, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের সঙ্গে ন্যায়ত জগৎ-ভাবের বিরোধ ঘটে। মায়ার খেলায় নাম-রূপ ভূত-ভাব ক্রিয়া-কারক কত-কিছুই দেখা দেয়। কিন্তু তাদের সত্য বলে মানতে পারি না, কেননা অখণ্ড-সন্মাত্রের অনির্বাচ্য নিরঞ্জন-স্বভাবের তারা বিরোধী। অতএব মায়াও অবস্তু—সে অসতী। স্বয়ং বিভ্রমরূপিণী হয়েই সে অগণিত বিভ্রমের জননী। অথচ এই বিভ্রম আর তার কার্যপরম্পরার কথঞ্চিৎ-সত্তা আছে, সুতরাং তাদের তত্ত্ব-প্রায় বলে মানতেও হবে। তাছাড়া বিশ্বের অধিষ্ঠানও শূন্য নয়, কারণ বিশ্ব ব্রহ্মেই আরোপিত। ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব বলে, যেমন করেই হ'ক ব্রহ্ম বিশ্বেরও অধিষ্ঠান। মায়ার মধ্যে থেকেই আমরা ব্রহ্মে তার নাম-রূপ ক্রিয়া-কারকের আরোপ করি, সব-কিছুকে জানি ব্রহ্ম বলে, অতত্ত্বের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই তত্ত্বস্বরূপকে। অতএব মায়াতেও তত্ত্বভাব আছে। মায়া যুগপৎ বস্তু এবং অবস্তু, সতী ও অসতী। অথবা বলতে পারি, মায়া বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়। মায়া স্বতোবিরোধে কণ্টকিত বুদ্ধির অতীত একটা প্রহেলিকা। কিন্তু কি তার রহস্য? সে-রহস্যের কি কোনই সমাধান নাই? নির্বিশেষ ব্রহ্মসদ্‌ভাবে এই বিভ্রমের বঞ্চনা কোথা হতে জুটল? মায়ার এই অতাত্ত্বিক তত্ত্বভাবের ধর্ম কি?

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, নিশ্চয় ব্রহ্ম মায়ার জ্ঞাতা। কারণ ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব যখন, তখন ব্রহ্ম ছাড়া কে আর জানছে মায়াকে? আর-কোনও জ্ঞাতার সত্তাও থাকতে পারে না। আমাদের মধ্যে যে-জীবচৈতন্যকে মায়ার সাক্ষী বলে মনে হয়, স্বয়ং সে মায়ারই কল্পিত অবাস্তব একটা প্রতিভাস। কিন্তু ব্রহ্ম মায়ার দ্রষ্টা হলে মুহূর্তকালের জন্যেও তার বিভ্রম কি করে টিকতে পারে? কারণ দ্রষ্টার সত্যকার দ্রষ্টৃত্ব যে আত্মচৈতন্যেই নিরন্তর সমাহিত, তাঁর নির্বি-শেষ স্বয়ম্ভূ-চেতনা ছাড়া তাঁর আর-কিছুরই যে সংবিৎ নাই। আর ব্রহ্মের নিরঞ্জন সত্যচেতনাতেই জগৎ ভাসে যদি—তাহলে জগৎও ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব তত্ত্বভূত। কিন্তু জগৎকে নির্বিশেষ স্বয়ম্ভূ-চেতনা বলতে পারি না, বড়জোর বলতে পারি তার রূপায়ণ—কেননা তাকে দেখছি অবিদ্যাপ্রতিভাসের ভিতর দিয়ে। অতএব জগৎকে তত্ত্ব মেনে সমস্যার সমাধান চলবে না। অথচ

আপাতত হলেও জগৎকে তথ্য বলে মানতেই হবে (যদিও তার তত্ত্বভাবকে স্বীকার করা অসম্ভব)—কারণ যেমন মায়া আছে, তেমনি আছে তার কার্য-পরম্পরা। আসলে তারা মিথ্যা হলেও তাদের সত্যতার ভান যে আমাদের চেতনার 'পরে চেপেই থাকবে। অতএব এই স্বীকৃতিকে ভিত্তি করে আমাদের সমস্যার বিচার করতে হবে, তার সমাধান খুঁজতে হবে।

যে-বিচারে মায়াকে সতী বলব, সেই বিচারে ব্রহ্মকেও তার দ্রষ্টা বলে মানতে হবে—নইলে মায়ার সত্তা সিদ্ধ হবে কেমন করে? মায়াকে তখন বলতে পারি ব্রহ্মের ভেদবিভাবনী জ্ঞানা-শক্তি, কেননা মায়িক-চৈতন্য আর অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্যের মাঝে পার্থক্য দেখা দিয়েছে মায়ার ফলোপধায়ক ভেদদর্শনের সামর্থ্যে শুধু। কিন্তু ভেদসৃষ্টিকে মায়াশক্তির স্বরূপ না বলে যদি পরিণাম বলি, তাহলে নতুন করে তার লক্ষণ খুঁজতে হয়। তখন বলতে পারি, মায়া ব্রহ্ম-চৈতন্যের শক্তিবিশেষ—কেননা একমাত্র চৈতন্যের পক্ষেই বিভ্রম দেখা বা সৃষ্টি করা সম্ভব, এবং ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া আর-কোনও পূর্ব্য কিংবা প্রবর্তক চৈতন্যও নাই। কিন্তু ব্রহ্মের স্বগত-সংবিৎ যখন শাশ্বত, তখন ব্রহ্মচৈতন্যে দেখা দেবে দুটি বিভাব। একটি বিভাবে থাকবে অখণ্ড পরমার্থসতের চেতনা, আরেকটিতে থাকবে অবস্তুপুঞ্জের চেতনা। তাঁর সার্থক দৃষ্টি-সৃষ্টির প্রভাবে অবস্তুর মধ্যেও একটা আত্মভাবের আভাস ফুটবে। কিন্তু ব্রহ্ম-ধাতু এই অবস্তু-পুঞ্জের উপাদান নয়, কেননা তাহলে তারাও বাস্তব হত। এই মতে 'এ-জগৎ সৎ-মূল, সৎ-আয়তন ও সৎ-প্রতিষ্ঠ'—উপনিষদের এই বাণীকে প্রমাণ মানা চলে না। ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নন। আত্মার মত তাঁর চিন্ময়-ধাতু দিয়ে আমাদের প্রকৃতি গড়া নয়—বস্তুত অবস্তু-সৎ মায়াই তার উপাদান। অথচ আমাদের আত্মা ব্রহ্মময়—এমন-কি ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াতীত। কিন্তু মায়ার ঊর্ধ্বে এবং মায়ার মধ্যে থেকে তিনিই আবার তাঁর সৃষ্টির দ্রষ্টা। অতএব, এক শাশ্বত সত্য দ্রষ্টা (ব্রহ্ম) এক অসত্য অশাশ্বত দৃশ্যকে (জগৎকে) দেখছেন অসত্য দৃশ্যের স্রষ্টা এক সদসৎ দর্শন (মায়া) দিয়ে—এ-রহস্যের আর-কিছুতেই কোনও সংগত সমাধান হয় না ব্রহ্মের দ্বিদল-চৈতন্যের কল্পনা ছাড়া।

ব্রহ্মে এই দ্বিদল-চৈতন্য না থেকে মায়া যদি তাঁর একমাত্র অদ্বিতীয় চিৎ-শক্তি হয়, তাহলে দুটি কল্পের একটি হবে সত্য। প্রথম কল্পে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্-ব্যাপাররূপেই মায়াশক্তি সত্য। তাঁর কূটস্থ অতিচেতনার নৈঃশব্দ্য হতে সে বাস্তব-অনুভবেরই ধারা বেয়ে প্রসৃত হয়ে চলেছে। তার বিশ্বানুভব ব্রহ্মচৈতন্যের বৃত্তিরূপে বাস্তব যেমন, তেমনি তা অবাস্তবও বটে—ব্রহ্মের পরমার্থ-সদ্ভাবের অঙ্গীভূত নয় বলে। দ্বিতীয় কল্পে মায়া ব্রহ্মের শাশ্বত-সদ্ভাবে সমবেত বিশ্বকল্পনার শক্তি; এই শক্তিতে তিনি অসৎ হতে

ফোটাচ্ছেন অবাস্তব নাম-রূপ ক্রিয়া-কারকের মেলা। এক্ষেত্রে নিজে বাস্তব, কিন্তু তার সৃষ্টি অলীক—নিছক কল্পনার বিজৃম্ভণ। কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টিবীর্য বা বিভাবনার শক্তি শুধু কল্পনাতেই পর্যবসিত, এমন কথা বলা চলে কি? অবিদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ পুরুষের পক্ষেই কল্পনা অপরিহার্য, কেননা বিদ্যার ন্যূনতা পূরণ করতে হয় তাকে কল্পনা দিয়ে, তর্কাভাস দিয়ে। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব যেখানে, সেখানে তাঁর অদ্বিতীয় চিৎ-স্বভাবে কোথায় কল্পনার অবকাশ? যিনি শুদ্ধ ও স্বয়ংপূর্ণ, অবস্তুর কল্পনা করতে যাবেন তিনি কিসের প্রয়োজনে? ব্রহ্ম 'একং সৎ' পূর্ণস্বরূপ নিত্যানন্দময়। কালাতীত বলে তিনি সিদ্ধস্বভাব—কিছুই তাঁর মধ্যে ব্যাকৃতির অপেক্ষায় নাই। তাহলে তিনি কার প্রেরণায় কিসের তাগিদে এক অবাস্তব দেশ-কালের সৃষ্টি করতে গেলেন? কেনই-বা শাশ্বতকাল ধরে তাকে ভরে তুলছেন বিশ্বজোড়া এই অন্তহীন ছায়ার মায়া দিয়ে? অতএব আপ্তকাম পূর্ণব্রহ্মের কল্পনাশক্তিই মায়া—একথাও ন্যায়ত অচল।

প্রথম কল্পে মায়াকে বলা হয়েছিল ব্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্-বৃত্তিপ্রসূত একটা অবাস্তব বস্তুতত্ত্ব। প্রাকৃত-জগতে মন যে একটা ভেদের রেখা টানে প্রত্যক্-অনুভব আর পরাক্-অনুভবের মাঝে, মায়ার এই স্বরূপকল্পনার মূলে আছে তারই সংস্কার। একমাত্র পরাক্-দৃষ্ট বস্তুকেই মন অবিকল্পিত নিরেট বাস্তব বলে জানে। তাই যা-কিছু প্রত্যক্-দৃষ্ট, তা-ই তার কাছে বাস্তব হয়েও অবাস্তব। কিন্তু মনঃকল্পিত এ-ভেদও ব্রহ্মচৈতন্যে থাকতে পারে না, কেননা হয় সেখানে প্রত্যক্ বা পরাক্ বলে কিছুই নাই, নয়তো ব্রহ্ম নিজেই তাঁর আত্মচৈতন্যের একমাত্র বিষয়ী এবং বিষয়। ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই যখন, তখন তাঁর কাছে বহির্বৃত্ত কোনও পরাক্ বস্তুও থাকতে পারে না। অতএব ব্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্-বৃত্তি এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তুকে বিবিক্ত রেখে বা বিকৃত করে জগতের এই কল্পমায়া রচনা করে চলেছে—এমন উক্তিতে আমাদেরই প্রাকৃত-মনের সংস্কারকে চাপানো হয় ব্রহ্মের 'পরে, তার অপূর্ণতার মালিন্যকে আরোপিত করা হয় পূর্ণস্বরূপের নিরঞ্জন-স্বভাবের উপরে। পরমপুরুষের বিজ্ঞানে এমন উপচার যে নিতান্তই অযৌক্তিক, তা বলাই বাহুল্য।...আবার ব্রহ্মের ভাব ও চৈতন্যের ভেদকল্পনাকেও প্রামাণিক বলতে পারি না—যদি ব্রহ্ম-ভাব আর ব্রহ্ম-চৈতন্যকে দুটি পৃথক তত্ত্ব বলে না ধরি। অর্থাৎ যদি কল্পনা না করি—ব্রহ্ম-চৈতন্যের বৃত্তি ব্রহ্ম-ভাবের শুদ্ধসত্তায় আরোপিত হচ্ছে শুধু, তাকে স্পর্শ করতে বা উপরক্ত ও অনুবিদ্ধ করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় অনুত্তর স্বয়ম্ভূ-সত্তাই হ'ন, অথবা মায়াকবলিত সদসৎ জীবের আত্মস্বরূপই হ'ন—তাঁতে আরোপিত বিভ্রমকে তিনি তাঁর ঋতচেতনার দ্বারা বিভ্রম বলেই জানবেন। অথচ আত্মমায়ার শক্তিতে

অথবা স্বগত কোনও হেতুর বশে নিজেরই কল্পনায় তিনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন—কিংবা বস্তুত বিভ্রান্ত না হলেও অনুভবে এবং আচরণে আপাত-বিভ্রমের পরিচয় দিচ্ছেন। এমনি-একটা দ্বৈত দেখা দেয় আমাদের অবিদ্যাশ্রিত চেতনাতেও, যখন প্রকৃতির গুণলীলা হতে বিবিক্ত হয়ে আত্মস্থ পুরুষকেই সে একমাত্র সত্য বলে জানে। পুরুষ ছাড়া আর-সবই তখন তার কাছে অনাত্মা এবং অবস্তু, অথচ ব্যবহারে তাকে তাদের বাস্তব বলে ধরে নিয়েই চলতে হয়। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের শুদ্ধ-ভাব ও শুদ্ধ-চৈতন্যের অখন্ড-অন্বয় স্বরূপকে অস্বীকার করা হয়। ফলে তাঁর অলক্ষণ অদ্বৈতস্বভাবে আরোপিত হয় দ্বৈতভাবের একটা কল্পনা, যাকে বলা চলে সাংখ্যসিদ্ধান্তে স্বীকৃত পুরুষ-প্রকৃতিরূপী দ্বৈততত্ত্বের সগোত্র। অতএব বর্তমান অভ্যুপগমকে টিকিয়ে রাখতে হলে এধরনের দ্বৈতগন্ধি সিদ্ধান্তকে আমাদের বাতিল করতেই হবে। নইলে মানতে হবে, ব্রহ্মে এক বহুধা-চিতি অথবা বহুধা-স্থিতির অনির্বচনীয় সামর্থ্য আছে। কিন্তু তাতে ঘটবে প্রতিজ্ঞাহানির দোষ।

আবার, আমাদের ব্যবহারদশায় বিদ্যা-অবিদ্যার যুগলশক্তি হতে দ্বৈধ-চেতনার উদ্ভব যেমন স্বাভাবিক, পরমার্থসতের বেলাতেও তা হবে না কেন—এ-যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বৈধকে সমর্থন করা যায় না। কারণ, ব্রহ্মচৈতন্যকে আমরা কোনমতেই মায়াকবলিত বলতে পারি না। তাহলে তাঁর শাশ্বত স্বগত-সংবিতের স্বয়ংপ্রভা অবিদ্যার মেঘে আড়াল হতে পারে—একথা মেনে আমাদেরই প্রাকৃত-চেতনার উপাধিকে আরোপ করা হয় ব্রহ্মের অপ্রাকৃত তত্ত্বভাবের 'পরে। বিসৃষ্টির বিশেষ-কোনও পর্বে চিৎশক্তির গৌণপ্রবৃত্তির পরিণামরূপে যদি অবিদ্যার আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং সে যদি হয় বিশ্বের উন্মিষন্ত দিব্য-কল্পনারই একটা অঙ্গ, তাহলে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মানতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু অনাদি ব্রহ্মচৈতন্যে অহেতুক অবিদ্যা বা বিভ্রমের শাশ্বত সমাবেশকে সার্থক বলে মান্‌ব কোন্ যুক্তিতে? এমন কল্পনাকে কি উৎকট একটা মনোবিকল্প বলে মনে হয় না—ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলেই যা নিষ্প্রমাণ?...ব্রহ্মের দ্বৈধ-চৈতন্যের তখন আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে। বলা যেতে পারে : ব্রহ্মচৈতন্যে অবিদ্যা নাই সত্য—কিন্তু তাঁর স্বগতসংবিতেরই সহচরিত সঙ্কল্পশক্তির একটা প্রবেগ আছে, যা বিশ্ববিভ্রমের সৃষ্টি ক'রে তাকে তাঁর প্রজ্ঞানের বিষয়ীভূত করছে। পরাক্-দৃষ্টিতে বিশ্বকে যেমন তিনি দেখছেন, তেমনি প্রত্যক্-দৃষ্টিতে জানছেন নিজেকেও। অতএব তাঁর শুদ্ধ-সংবিতে বিভ্রমের অবকাশ নাই, এবং আমাদের মত বিশ্বকে বাস্তব বলে অনুভবও করছেন না তিনি। বিভ্রম দেখা দিয়েছে মায়ার জগতে। জগতে থেকে আত্মা বা ব্রহ্ম এই বিভ্রমের লীলা হয় নির্লিপ্ত প্রয়োজকরূপে ভোগ করছেন নয়তো অসঙ্গ বিবিক্ত হয়ে দর্শন করছেন—যার কুহক আবিষ্ট করছে

শুধু মায়ার ক্রীড়নক প্রাকৃত-মনকেই। কিন্তু তাহলে স্বীকার করতে হয়, ব্রহ্ম তাঁর নির্বিশেষ শুদ্ধসত্তায় তৃপ্ত না থাকতে পেরে নিজেরই বিলাসের জন্য কালের ভূমিকায় নাম-রূপ ক্রিয়া-কারকের এই রঙ্গাভিনয় সৃষ্টি করেছেন। অসঙ্গ অদ্বিতীয় বলেই নিজেকে তিনি দেখতে চান বহুরূপে, শান্তং জ্ঞানম্ আনন্দম্ বলেই হতে চান সুখ-দুঃখ বিদ্যা-অবিদ্যা মায়িক বন্ধন ও বন্ধন-মুক্তির ব্যামিশ্র অনুভব বা আভাস-চেতনার সাক্ষী। এক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তির প্রয়োজন মায়িক জীবেরই; শাশ্বত ব্রহ্মচৈতন্যের মুক্তিকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। এমনি করে অনন্তকাল আবর্তিত হয়ে চলেছে তাঁর বিশ্ববিভ্রমের লীলাচক্র। বিভ্রমের সম্ভোগ তাঁর সপ্রয়োজন না হলেও এ তাঁর ইচ্ছার বিলাস। অথবা তাঁরই মধ্যে রয়েছে এই বিরুদ্ধধর্মের প্রেতি বা স্বতঃসংবেগ। কিন্তু ব্রহ্মকেই যদি অদ্বিতীয় শাশ্বত শুদ্ধ-সন্মাত্র বলে জানি, তাহলে প্রয়োজন সঙ্কল্প প্রেতি কি স্বতঃসংবেগ—তাঁর স্বভাবে এসব ধর্মের আরোপ অবোধ্য এবং অসম্ভব। এও একধরনের ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু এতে আসল রহস্য যুক্তি বা বুদ্ধির ওপারেই থেকে যায়—কেননা ব্রহ্মের স্থাণুস্বরূপের সত্যের সঙ্গে তাঁর চিৎসংবেগের বিরোধ তাতে ঘোচে না। বিশ্বের মূলে বিসৃষ্টির সঙ্কল্প অথবা বীর্য নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে যদি ব্রহ্ম-বীর্য অথবা ব্রহ্ম-সঙ্কল্প হয়, তাহলে তার সিসৃক্ষা অবশ্য তত্ত্বের তাত্ত্বিক বিসৃষ্টিতে, অথবা অন্তহীন কালকলনায় তার কালাতীত নিত্যসিদ্ধ ভাববিকারের অভিব্যঞ্জনাতে সার্থক হবে। কেননা পরমার্থসতের সমস্ত বীর্য পর্যবসিত হবে শুধু স্ববিরোধী বিভূতির ব্যঞ্জনায় অথবা অলীক বিশ্বে অসৎ পদার্থের কল্পনে—একথা অশ্রদ্ধেয়।

এমনি করে এখন পর্যন্ত সমস্যার সন্তোষজনক কোনও সমাধান হল না। কিন্তু হয়তো একান্ত-অসতের মধ্যে সত্তার আরোপে আমাদের ভুল হচ্ছে, কেননা মায়া এবং তার পরিণামকে বিভ্রম বললেও তাদের কথঞ্চিৎসত্তা থাকছেই। তার চাইতে বরং সব-কিছুকে একান্ত-অসৎ বলে সাহস করে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। একশ্রেণীর মায়াবাদী এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন—অন্তত নানা যুক্তি দেখিয়েছেন এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে। জগতের আংশিক বা আপেক্ষিক বাস্তবতা যাঁরা স্বীকার করেন, নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের মতকে সমালোচনা কর-বার পূর্বে সমস্যার এইদিকটার যাচাই হওয়া ভাল। একশ্রেণীর তার্কিক আছেন, যাঁরা সমস্যাটাকে উড়িয়ে দিয়েই তার সমাধান খোঁজেন। তাঁদের মতে : বিভ্রমের উৎপত্তি হল কি করে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মসত্তায় জগৎ এল কোথা থেকে, এ-প্রশ্নই অযৌক্তিক। যেহেতু জগৎ নাই, অতএব সমস্যারও কোনও বালাই নাই। মায়া অবাস্তব—একমাত্র ব্রহ্মই বস্তুভূত অসঙ্গ স্বয়ম্ভূ শাশ্বত পরমার্থ-সৎ। বিভ্রমের চেতনা দ্বারা ব্রহ্ম অপরামৃষ্ট, কেননা তাঁর কালকলনাহীন পরমার্থসত্তায় কোনও বিশ্বেরই আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু এমনি করে সমস্যা-

টাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাতে দেখা দেয় শুধু অর্থহীন বাক্‌চাতুরী, যুক্তির নামে কেবল কথার কসরত। একটা সত্যকার কঠিন সমস্যা যে আছে, তা না মেনে বা তার সমাধানের চেষ্টা না করে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি বিকল্পের আড়ালে আত্মগোপন করতে চায়। অথবা যতদূর তার অধিকার, তাকেও সে ছাড়িয়ে যায়—কেননা মায়া এবং মায়ার সৃষ্ট জগৎ, উভয়কেই নিরধিষ্ঠান একান্ত-অসৎ বলতে গিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধকেই সে বাতিল করে দেয়। বিশ্ব বস্তুতই নাই, আছে শুধু তার বিভ্রম—এই যদি সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কি করে বিভ্রমের সৃষ্টি হল? সে টিকেই-বা আছে কি করে? ব্রহ্মের সঙ্গে তার সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধেরই-বা স্বরূপ কি? আমরা মায়ার মধ্যে তার চক্রাবর্তনের কবলিত হয়ে আছি, আবার ছাড়াও পাচ্ছি তার বন্ধন হতে—এসব কথারই-বা তাৎপর্য কি? অজাতিবাদ অনুসারে মানতে হবে, ব্রহ্ম মায়া অথবা তার কার্যের সাক্ষী নন—এমন-কি মায়াও ব্রহ্মচৈতন্যের শক্তি নয়। ব্রহ্ম অতি-চেতন, আপন শুদ্ধ-সন্মাত্র স্বভাবে নিত্যসমাহিত, নিজের নির্বিশেষ-স্বরূপ ছাড়া তাঁর আর-কিছুরই চেতনা নাই, অতএব মায়ার সঙ্গেও তাঁর কোনও যোগা-যোগ নাই। কিন্তু তাহলে বিভ্রমশক্তিরূপেও মায়ার সত্তা সিদ্ধ হয় না। অথবা তখন মানতে হয় একটি দ্বিদল-তত্ত্ব অথবা দুটি তত্ত্ব : এক শাশ্বত অতিচেতন বা অনন্যচেতন আত্মসমাহিত পরমার্থ-সৎ এবং মিথ্যা বিশ্বের কর্ত্রী ও জ্ঞাত্রী এক বিভ্রমশক্তি। এমনি করে আমরা উভয়তঃপাশা রজ্জুর দুর্মোচন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি—যাকে এড়ানো চলে শুধু এই বলে যে, যখন তত্ত্ববিচার মায়ার ভূমিতে থেকেই করছি, তখন সেও তো একটা বিভ্রম। অতএব জগতের সমস্যাই থাকবে, তার উত্তর থাকবে না। একদিকে স্থাণু নির্বিকার পরমার্থ-সৎ, আরেকদিকে নিত্যপরিণামিনী মায়ার লীলা—আমরা এমনি দুটি একান্ত-বিরোধী তত্ত্বের মুখামুখি দাঁড়িয়েছি। তার ওপারে এমন-কোনও বৃহত্তর সত্যের পরিবেষ দেখতে পাচ্ছি না, যার মধ্যে তাদের মর্মসত্যকে আবিষ্কার করে এ-বিরোধের একটা সার্থক সমাধান খুঁজে পাব।

ব্রহ্ম মায়ার সাক্ষী না হলে জীবকে বলব তার সাক্ষী। কিন্তু জীব মায়ারই সৃষ্টি, অতএব অবাস্তব। সাক্ষিদৃষ্ট জগৎও মায়ার সৃষ্টি, সুতরাং অবাস্তব। এমন-কি সাক্ষি-চেতনাও তা-ই। কিন্তু সমস্তই যদি অবাস্তব হয়, তাহলে এই-যে মায়ার কবলিত হয়ে কালের স্রোতে আমাদের ভেসে যাওয়া—এও যেমন অর্থহীন, তেমনি অর্থহীন মায়াপাশ হতে মুক্ত হয়ে চিন্ময়-ধামে উত্তীর্ণ হওয়া। কেননা বন্ধন সাধনা কি মুক্তি সমস্তই যখন মায়ার অধিকারে, তখন সমস্তই তুল্যভাবে অবাস্তব, অতএব তুচ্ছ।...একটা মাঝামাঝি রফা অবশ্য সম্ভব। বলা চলে : ব্রহ্ম স্বরূপত মায়ার সংস্পর্শশূন্য, বিশ্ববিভ্রম হতে নিত্যমুক্ত এবং অসঙ্গ। কিন্তু সাক্ষী জীবরূপে অথবা সর্বভূতের আত্মারূপে

সেই ব্রহ্মই যেমন মায়ার ফাঁদে পা দিয়েছেন, তেমনি জীবত্বোপাহিত ব্রহ্মই আবার ফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। এই বেরিয়ে-পড়াটাই জীবের পক্ষে পরমপুরুষার্থ। কিন্তু এতেও ব্রহ্মে একটা দ্বৈধভাবের আরোপ করতে হয় এবং সেইসঙ্গে বিভ্রমের অন্তত একটা ব্যাপারকে অর্থাৎ মায়োপহিত ব্রহ্মের ব্যষ্টিজীবরূপে অবস্থানকে সত্য বলে মানতে হয়। সমষ্টিভূতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের তো প্রাতিভাসিক বন্ধন নাই, অতএব তাঁর মায়া হতে মুক্তির দায়ও নাই। সে-দায় আছে জীবের। কিন্তু বন্ধন যদি অবাস্তব হয়, তাহলে মুক্তিরই-বা সার্থকতা কোথায়? আবার মায়া এবং মায়ার জগৎ বাস্তব না হলে বন্ধন বাস্তব হয় কি করে? সুতরাং বন্ধনের বাস্তবতা মানতে গেলে মায়াকে একান্ত অবাস্তব বলতে পারি না। অন্তত তার কালিক ও ব্যাবহারিক বাস্তবতা তখন স্বীকার করতেই হয় এবং তাতেই তার তাত্ত্বিকতার অধিকার হয় সুদূরব্যাপী।...এর উত্তরে বলা যায়: অবাস্তব হল আমাদের জীবত্ব। জীবত্বের অলীক কল্পনা হতে ব্রহ্ম তাঁর আভাসকে যখন প্রত্যাহার করেন, তখন জীবত্বের যে নির্বাণ ঘটে, তাকেই বলি মোক্ষ। কিন্তু ব্রহ্ম যদি নিত্যমুক্ত হন, তাহলে তাঁর বন্ধনে দুঃখ নাই, মুক্তিতেও লাভ নাই। আর জীব যদি একটা অলীক আভাস মাত্র হয়, তাহলে তার মুক্তিরই-বা প্রয়োজন কি? ছলনাময় মায়া-মুকুরে যা ছায়ার ছবি, কোথায় তার সত্যকার বন্ধন-দুঃখ বা সত্যকার মোক্ষ-সুখ? যদি বল, এ-আভাস যে চিদাভাস—অতএব তার তাপ-দুঃখ ও মোক্ষ-সুখ দুইই সত্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে এই অলীক পরিবেশের মধ্যে কার চেতনা দুঃখের ভোক্তা হবে—যদি অখণ্ড-অদ্বয় শুদ্ধ-সন্মাত্রের চৈতন্য ছাড়া আর-কোনও চৈতন্যই কোথাও না থাকে? অতএব আবার দেখা দেয় ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে সেই দ্বৈধভাব : একদিকে তাঁর চেতনা লোকোত্তর ও মায়াতীত, আরেকদিকে তা মায়াধীন। কিন্তু তাহলেই আবার আমাদের মায়িক সত্তা ও মায়িক অনুভবের কথঞ্চিৎ-সত্যতা অনস্বীকার্য হয়। কারণ, ব্রহ্মের সত্তাই যদি আমাদের সত্তা হয়, তাঁর চিদ্‌বিভূতিই হয় আমাদের চেতনা, তাহলে হাজার উপাধি থাকলেও তাকে অংশত বাস্তব বলতেই হবে। আমাদের সত্তা এমনি করে বাস্তব হলে জগতের সত্তাই-বা বাস্তব হবে না কেন?

পূর্বপক্ষীর শেষ জবাব এই হতে পারে : দ্রষ্টা জীব এবং দৃশ্য জগৎ দুইই অবাস্তব। কেবল মায়াই ব্রহ্মে আরোপিত হয়ে কথঞ্চিৎ বাস্তবতা লাভ করে এবং তা-ই আবার উপসংক্রান্ত হয় জীবে ও তার জগৎ-বিভ্রমের অনুভবে। জীব যতক্ষণ বিভ্রমের বশ, তার প্রপঞ্চানুভবেরও মেয়াদ ততক্ষণ। কিন্তু প্রশ্ন হবে : এই অনুভবের প্রামাণ্য এবং তার স্থিতিকালীন বাস্তবতা প্রতিভাত হয় কার দৃষ্টিতে? প্রত্যাহারে মুক্তিতে বা নির্বাণে, কার দৃষ্টিতেই-বা

তার প্রলয়? কেননা মায়িক মিথ্যা-জীব যেমন বাস্তবধর্মী হয়ে বাস্তব-বন্ধনের অনুভাবিতা হতে পারে না, তেমনি বন্ধনের পরিহার বা আত্মবিলোপ দ্বারা সত্যকার মুক্তিসাধনাও তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা বাস্তব-চৈতন্যের অধিষ্ঠানেই মায়িকসত্তার এই প্রতিভাস সম্ভব। কিন্তু তাহলে মানতে হবে, যেমন করেই হ'ক্ সে বাস্তব-চৈতন্যের 'পরে মায়ার খানিকটা আঁচ লাগবেই। সে-চৈতন্য হয় ব্রহ্মের চৈতন্য—মায়ার জগতে নিজেকে প্রসর্পিত ক'রে আবার সে গুটিয়ে আসে সেখান হতে; নয়তো সে ব্রহ্মেরই আত্মভাব—বাস্তবের ধর্মরূপে তার খানিকটা মায়াতে আবিষ্ট হয়ে আবার ফিরে আসে উপসংহৃত হয়ে।...কিন্তু ব্রহ্মের 'পরে আরোপিত এই মায়ার স্বরূপ কি? অনন্তচৈতন্য বা শাশ্বত পরা সংবিতের বৃত্তিরূপে এ যদি ব্রহ্মের মধ্যে না ছিল, তাহলে এল কোথা হতে? ব্রহ্মের ভাব বা চৈতন্য যদি বিভ্রমের পরিণামকে অংগীকার করে, তাহলেই তার এই অন্তহীন পরম্পরার একটা বাস্তব মূল্য থাকতে পারে—নইলে এ শুধু হয় কালের পটে ছায়া-ছবির মায়া অথবা অনন্তের খেয়ালখুশিতে পুতুলনাচের মেলা।...আবার ফিরে আসতে হল ব্রহ্মের দ্বৈধ-ভাবে ও দ্বৈধ-চেতনায়: একদিকে তিনি মায়াকবলিত, আরেকদিকে মায়াতীত। সেইসংগে মানতে হল মায়ার অন্তত প্রাতিভাসিক সত্যতা। আমরা কেন বিশ্বে রয়েছি, তার কোনও সদুত্তর পাই না—যদি বিশ্ব এবং বিশ্বে আমাদের অবস্থান দুইই অবাস্তব হয়। জীব ও বিশ্বের বাস্তবতা সীমিত হ'ক্ আংশিক হ'ক্—তবু তার অস্তিত্বকে মানতেই হবে। কিন্তু অনাদি সর্বগত অথচ একান্ত অহেতুক বিভ্রমের বাস্তবতা কোথায়?—এর একমাত্র উত্তর, মায়ার রহস্য বুদ্ধির অতীত—অনির্বচনীয়।

জীব ও বিশ্বের ঐকান্তিক অবাস্তবতার কল্পনার সংগে একটা আপস-রফা করে তার উগ্রতাকে মোলায়েম করে নিই যদি, তাহলে এ-সমস্যার সম্ভবপর দুটি সমাধান পেতে পারি। উপনিষদে স্বপ্নসৃষ্টি ও সুষুপ্তিস্থিতির যে-বর্ণনা আছে, তাকে প্রত্যক্-চেতনার মায়িক বিশ্বানুভবের অর্থে গ্রহণ করলে পরমার্থসতের অন্তর্ভুক্ত বিভ্রম-চেতনারও প্রত্যক্-অনুভবের একটা ভিত্তি পাওয়া যায়। উপনিষদে আত্মারূপী ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে চতুষ্পাৎ বলে। বলা হয়েছে: এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই যা-কিছু সব ব্রহ্ম। যা কিছু আছে, আত্মা হয়েই আছে—সবার মধ্যে আত্মাই আত্মাকে দেখছেন তাঁর চারটি পাদে বা ভূমিতে। তাঁর চতুর্থপাদে অথবা শুদ্ধ স্বরূপস্থিতিতে তিনি প্রজ্ঞও নন, অপ্রজ্ঞও নন। অর্থাৎ আমরা যাকে চেতনা বা অচেতনা বলি, ব্রহ্মে তার আরোপ চলে না সেখানে। সে-ভূমি অতিচেতন একাত্মপ্রত্যয়সার—প্রপঞ্চোপশম আত্মসমাধানের নৈঃশব্দ্যে নিমজ্জিত। অথবা সেখানে আছে পরা সংবিতের সর্বাধার সর্বাধিষ্ঠান অথচ অপরামৃষ্ট স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু এই তুরীয় আত্মা

ছাড়াও সুষুপ্তি-পুরুষের এক জ্যোতির্ময় পাদ আছে—যা প্রজ্ঞানঘন এবং সর্বযোনি। সুষুপ্তিদশা হলেও তার মধ্যে এক সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর প্রজ্ঞার আবেশ রয়েছে। তাই তাকে জানি বিশ্বের বীজাবস্থা বা কারণাবস্থা বলে—যা সর্ব-ভূতের প্রভব এবং প্রলয়ের হেতু। তাছাড়াও আছেন স্বপ্ন-পুরুষ এবং জাগ্রৎ-পুরুষ। তাঁদের একজন আমাদের সূক্ষ্ম জড়াতীত প্রত্যক্-অনুভবের আধার, আরেকজন জাগ্রতের অনুভবকে ধরে আছেন। এই সুষুপ্তিস্থান স্বপ্নস্থান ও জাগরিতস্থানকে নিয়েই মায়ার অধিকার। সুষুপ্ত মানুষ স্বপ্নভূমিতে গিয়ে স্বরচিত নাম-রূপ ক্রিয়া-কারকের চঞ্চল মেলা অনুভব করে এবং জাগ্রতে নিজের চেতনাকে আপাতদৃষ্টিতে স্থাবর কিন্তু বস্তুত অচির-স্থায়ী বিচিত্র রূপায়ণে বাইরে রূপায়িত করে। তেমনি আত্মাও প্রজ্ঞানঘনতার গহন হতে উৎসারিত করেন তাঁর প্রত্যক্-বৃত্ত ও পরাক্-বৃত্ত বিশ্বানুভব। কিন্তু জাগ্রৎদশাকে সুষুপ্তির পূর্ব্য কারণ-সমুদ্র হতে আমাদের সত্যকার জেগে-ওঠা বলা চলে না। জ্ঞেয়-বস্তুর সদ্ভাব সম্পর্কে যে-বোধ স্বপ্নসংবিতে সূক্ষ্ম ও প্রত্যক্‌বৃত্ত, জাগ্রতে তা-ই ধরে স্থূল ও পরাক্-বৃত্ত অনুভবের পূর্ণবিকশিত রূপ—এইমাত্র তার বৈশিষ্ট্য। তাই সত্যকার জাগরণ হচ্ছে পরাক্-বৃত্ত ও প্রত্যক্-বৃত্ত চেতনা হতে—এমন-কি সুষুপ্তির প্রজ্ঞানঘন কারণদশা হতেও আত্মসংহরণ করে লোকোত্তর অতিচেতনার মধ্যে অবগাহন করা। চেতনা-অচেতনা সমস্তই মায়ার অধিকারে, অতএব তাদের ওপারে যাওয়াই যথার্থ জেগে-ওঠা।...এ-সিদ্ধান্ত অনুসারে মায়া সতী, কেননা সে আত্মার স্বাত্মবিভাবের অনুভবরূপা। আত্মভাবের খানিকটা যেমন মায়াতে উপসংক্রান্ত হয়, তেমনি মায়ার বিপরিণামকে স্বীকার করে আত্মাও তার দ্বারা প্রভাবিত হন। এই বিপরিণাম তাঁর চিৎস্বভাব হতে উৎসারিত, অতএব তাকে বাস্তব বলে জানতে বা মানতেও তাঁর বাধা নাই। অথচ মায়া আবার অসতী। কেননা, তার অধিকার সুষুপ্তি স্বপ্ন ও বস্তুত-অচিরস্থায়ী জাগ্রৎ পর্যন্তই ব্যাপ্ত—অতিচেতন পরমার্থসতের স্বরূপস্থিতি তো সে নয়। তবে কিনা এখানে ব্রহ্মসত্তার দ্বৈধভাব নাই—আছে শুধু একই সত্তার ভূমিভেদ। 'আদিতে রয়েছে এক দ্বিদল চেতনা, অর্থাৎ অসৎ হতে মায়িক বস্তু সৃষ্টি করবার সংকল্প রয়েছে অজ শাশ্বতপুরুষের মধ্যে—এমন কল্পনা এ-বিবৃতিতে নাই। বরং এই কথাই সত্য যে, এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তুই আছেন অতিচেতনা ও চেতনার বিভিন্ন-ভূমিতে, এবং প্রত্যেক ভূমিতে আছে তাঁরই স্বানুভবের বিশিষ্ট একটি প্রকার। কিন্তু নীচের ভূমিগুলি বাস্তব হলেও তারা আত্মার স্বকল্পিত সৃষ্টি ও দৃষ্টির দ্বারা অনুবিদ্ধ। এই বিকল্পনাকে কোনমতেই পরমার্থ-সৎ বলা যায় না। অদ্বয় আত্মা নিজেকেই বহুরূপে দেখছেন, কিন্তু তাঁর বহুত্ব প্রত্যক্‌চেতনার বৃত্তি মাত্র। তাঁর চেতনার বিভিন্ন ভূমির তত্ত্বও

তা-ই। অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণে অর্থাৎ তিনটি মায়িক-ভূমিতে বিশ্ব এক বাস্তব পুরুষের প্রজ্ঞা-বিসৃষ্টিরূপেই সত্য—বস্তু-বিসৃষ্টিরূপে নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, উপনিষদের কোথাও এমন কথা নাই যে, আত্মার অবর তিনটি পাদ বিভ্রম-স্থিতি বা অবাস্তব সৃষ্টি মাত্র। বরং এই কথাই বলা হয়েছে বারবার : এই যা-কিছু আছে (আমরা যাকে এখন মায়ার খেলা ভাবছি, এসমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই এইসব হয়েছেন। সর্বভূতকে দেখতে হবে আত্মাতে এবং আত্মাকে দেখতে হবে তাদের মধ্যে—শুধু তা-ই নয়, দেখতে হবে আত্মাই হয়ে আছেন সর্বভূত। কেবল আত্মাই যে ব্রহ্ম তা নয়—এই যা-কিছু সমস্তই আত্মা, সমস্তই ব্রহ্ম। এতখানি জোর দিয়ে বলবার মধ্যে কোথাও মায়াকে গলিয়ে দেবার মত একটুখানি ফাঁক নাই। কিন্তু উপনিষদেই আবার আছে, 'বিজ্ঞাতা ছাড়া আর-কিছুই নাই।' এইধরনের কতগুলি উক্তি এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামে চেতনার দুটি ভূমির বর্ণনা হতে মনে হতে পারে, ইতিপূর্বে সর্বব্রহ্মবাদের উপর যে-জোর দেওয়া হয়েছিল, এতে বুঝি তাকে ক্ষুণ্ণ করা হল। এইসব শ্রুতিকে প্রমাণ মেনেই মায়াবাদের সূত্রপাত, যার পর্যবসান ঘটেছে জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের অনপনেয় বিরোধে। আসলে উপনিষদে আছে আত্মার চারটি পাদের বর্ণনা। দৃক্-দৃশ্যহীন অতিচেতন তুরীয় পাদ হতে এলেন তিনি জ্যোতির্ময় সুষুপ্তিদশার তৃতীয় পাদে, অতিচেতনা যার মধ্যে ফুটেছে প্রজ্ঞানঘন হয়ে। সেই সর্বযোনি সুষুপ্তি হতেই দেখা দিল তাঁর অন্তঃপ্রজ্ঞ স্বপ্নদশার দ্বিতীয় পাদ এবং বহিঃপ্রজ্ঞ জাগ্রৎদশার প্রথম পাদ। উপনিষদের এই বিবৃতিকে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা অবাস্তব বিভ্রমসৃষ্টি অথবা আত্মবিৎ ও সর্ববিৎ পুরুষের তত্ত্বসৃষ্টি—দু'ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি।

উপনিষদে আত্মার তিনটি অবরভূমির বিবরণে আছে—চেতনার সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই তিনটি ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে প্রজ্ঞানঘন সর্বজ্ঞ পুরুষ, অন্তঃপ্রজ্ঞ প্রবিবিক্তভুক্ পুরুষ আর বহিঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক্ পুরুষের কথা।* এহতে মনে হয়, উপনিষদের সুষুপ্তি ও স্বপ্ন দুটি রূপকসংজ্ঞা। আমাদের

---

* বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বেশ স্পষ্ট করেই বলছেন : চেতনার দুটি ভূমি আছে, তারা দুটি লোক। স্বপ্নের মধ্যে দুটি লোককেই মানুষ দেখতে পায়, কেননা স্বপ্নদশা দুয়ের মাঝামাঝি—দুটি লোকের সন্ধিভূমি। যাজ্ঞবল্ক্য এখানে স্পষ্টই অধিচেতনার কথা বলছেন—জড় ও জড়াতীত লোকের মধ্যে যাকে বলতে পারি যোগাযোগের সেতু। সুষুপ্তির বর্ণনা একদিকে যেমন গভীর ঘুমের ছবি, আরেকদিকে তেমনি সমাধিরও ছবি : সমাধিতে সাধক অবগাহন করে এক চিদ্ঘন গহনের মধ্যে। তার আত্মভাবের সমস্ত ঐশ্বর্যই সেখানে আছে—কিন্তু আছে সংহত হয়ে, একান্তভাবে অন্তঃসমাহিত হয়ে। তাদের মধ্যে ক্রিয়ার প্রবর্তনা দেখা দিলে ঐতদাত্ম্যের চেতনাই তার আশ্রয় হয়। অতএব এ-অবস্থায় আমরা পাই চিৎসত্তার উত্তরভূমির পরিচয়, যা সাধারণত আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার অতিগামী।

জাগ্রৎ-ভূমির পিছনে তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে অতিচেতন ও অধিচেতন দুটি ভূমি, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন তাদেরই নাম। একমাত্র স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতেই আমাদের বহিশ্চর মনশ্চেতনা বাহ্যবস্তুর দর্শন হতে নিবৃত্ত হয়ে অধিচেতনার অন্তর্লোকে অথবা অতিচেতনা বা অধিমানসের ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়। ঠিক এই ব্যাপার ঘটে সমাধিতেও। এজন্য তাকেও বলা চলে একধরনের স্বপ্ন বা সুষুপ্তি। উপনিষদের রূপক-সংজ্ঞার মূলে এই রহস্যটুকু আছে। মন অন্তর্মুখ হয়ে স্বপ্নস্থিতিতে দেখে জড়াতীত বস্তুর মেলা—স্বপ্নচেতনা অথবা সূক্ষ্মদর্শনের রূপরেখায় আঁকা। আবার তারও ঊর্ধ্বে সুষুপ্তিস্থিতিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে চিদ্‌ঘন অতলতায়—ভাব কি মূর্তি দিয়ে তাকে আর সে মাপতে পারে না। এই অধিচেতন ও অতিচেতন ভূমির ভিতর দিয়েই আমরা পরা সংবিতের অগমরাজ্যে, স্বয়ম্ভু-চৈতন্যের অনুত্তর স্থিতিতে পৌঁছতে পারি। স্বপ্ন অথবা সুপ্তি-সমাধির গহনে না তলিয়ে গিয়ে প্রবুদ্ধ-চেতনার কমলমালাকে একে-একে যদি এই উত্তরায়ণের পথে ফুটিয়ে চলি, তাহলে দেখি তার সর্বত্র এক সর্বগত ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের চিন্ময় প্রতিষ্ঠা অনুস্যূত রয়েছে। তার মধ্যে বিভ্রমশক্তিরূপিণী মায়াকে টেনে আনবার কোনই প্রয়োজন হয় না। সাধকের অনুভবে তখন জাগে শুধু উন্মনীদশায় মনের উৎক্রমণ। সেইসঙ্গে মনঃকল্পিত বিশ্বের প্রামাণ্য ঘুচে যায়—তার অবিদ্যাবিকৃত রূপের জায়গায় ফুটে ওঠে আরেকটি তত্ত্বরূপ। উৎক্রমণের সময় প্রত্যেক ভূমিতে চেতনাকে জাগ্রত রেখে সমগ্রের একটা সুষম অখণ্ড-অনুভব হতে সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শনও অসম্ভব নয়। নিরোধ-সমাপত্তির দ্বারা সুষুপ্তির অব্যক্তে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ি, অথবা জাগ্রৎ-চিত্ত নিয়েই সহসা অতিচেতন কোনও ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হই, তাহলে মধ্যপথে বিশ্বশক্তি ও তার বিসৃষ্টির অলীকতা আমাদের মনকে অভিভূত করতে পারে। তখন বৃত্তিনিরোধদ্বারা তাদের নিরুদ্ধ করে চিত্ত তলিয়ে যায় লোকোত্তরের অতল পারাবারে। নিরোধাভিমুখী উত্তরায়ণের পথে অলীকত্বের এই অনুভবই 'জগৎ মায়াকল্পিত' এই মতবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। কিন্তু এই চরম দশাকে একান্ত বলে মানতে আমরা বাধ্য নই, কেননা এর পরে এরও চাইতে উদার পরিপূর্ণ পরমসিদ্ধি চিন্ময়-ভাবনার পক্ষে অনধিগম্য নয়।

মায়াবাদের এইধরনের অন্যান্য বিবৃতিতেও মানুষের মন তৃপ্ত হয় না—একটা অবিসংবাদিত নিশ্চয়তার ছাপ তাদের মধ্যে নাই বলেই। মায়াবাদের অপরিহার্যতা হবে তার সত্যতার প্রমাণ। কিন্তু তার কোনও বিবৃতি হতেই তাকে বিশ্বসমস্যার অপরিহার্য সমাধান বলে মনে হয় না। একদিকে শাশ্বত ব্রহ্মসত্তার অবিকল্পিত সত্যস্থিতি, আরেকদিকে প্রপঞ্চবিভ্রমের স্বতোবিরোধ-কণ্টকিত বিপর্যয়—এ-দুটি কল্পনার মাঝে যে-ফাঁক রয়েছে, তাকে পূরণ

করবারও কোনও উপায় নাই মায়াবাদে। দুটি বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের সহচারকে সম্ভবপর জ্ঞানে বুদ্ধ্যারূঢ় করা—এইটুকু সূচনাতেই তার যা সার্থকতা। কিন্তু তার মধ্যে নৈশ্চিত্যের এমন-কোনও প্রাবল্য অথবা অসন্দিগ্ধ প্রামাণ্যের এমন দীপ্তি নাই, যাতে অসম্ভাবনা-দোষ দূর হয়ে বুদ্ধির পক্ষে তার স্বীকৃতি অপরিহার্য হতে পারে। যে রহস্যময় বিরোধের সমাধান অন্যপথেও হওয়া সম্ভব, প্রপঞ্চবিভ্রম-বাদ তার মীমাংসা করতে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে আরেকটা বিরোধ, রহস্যজটিল নূতন আরেকটা সমস্যা—যার উপস্থাপনার রীতিই তার সমাধানকে পরাহত করেছে। একদিকে স্থাণু অচল সনাতন নির্বিকার স্বয়ংপ্রজ্ঞ বিশ্বোত্তীর্ণ নিরঞ্জন সন্মাত্রের স্বরূপস্থিতি; আরেকদিকে শক্তির বিচ্ছুরণে স্পন্দিত বিশ্বের প্রতিভাস—তার মধ্যে আছে বিকার, ভেদভাব, অন্তহীন বহুভাবনায় অনাদি শুদ্ধসন্মাত্রের বিচিত্র বিপরিণাম। মায়ার শাশ্বত লীলা বলে এই প্রতিভাসকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার ফলে অখণ্ড ব্রহ্ম-সত্তার স্বতোবিরুদ্ধ দ্বৈধভাবকে দূর করতে স্বীকার করতে হয় অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বতোবিরুদ্ধ দ্বৈধভাবকে। ব্রহ্মের বহুভাবনার প্রাতিভাসিক সত্যকে খণ্ডন করতে তাঁর মধ্যে মিথ্যা বহুত্বের স্রষ্টৃত্ব আরোপিত করে প্রকারান্তরে তাঁকে মিথ্যা-কল্পনের দোষে অভিযুক্ত করা হয়। যে-ব্রহ্ম তাঁর শুদ্ধ সন্মাত্র-স্বভাবের স্বতঃসংবিতে নিত্য সমুজ্জ্বল, তিনিই আবার নিত্য বহন করছেন আপাতপ্রতীয়মান আত্মবিসৃষ্টির একটা বিকল্প—অবিদ্যাচ্ছন্ন সন্তপ্ত জীবের এই জগৎরূপে। সে-জগতে আত্মজ্ঞানহীন মূঢ় জীব একে-একে আত্মসংবিতের প্রবুদ্ধ চেতনা অর্জন করে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে নিবৃত্ত হয় তার জীবত্বের ব্যষ্টিভাবনা!

এমনি করে বিশ্বসমস্যার একটা জটিলতা দূর করতে আরেকটা জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন—তখন সন্দেহ হয়, আমাদের প্রথম অভ্যুপগমে ভুল না থাকলেও কোথাও কিছু ন্যূনতা আছেই। ব্রহ্মের নির্বিকল্পস্থিতি বিশ্বরহস্যের অপরিহার্য ভিত্তি—একথা মেনেই তার ব্যঞ্জনাকে আরও তলিয়ে বোঝা দরকার ছিল।...তাই ব্রহ্ম আমাদের দৃষ্টিতে শাশ্বত অন্বয় স্থাণুস্বভাব ও শুদ্ধ-সন্মাত্রের নির্বিকল্প স্বরূপস্থিতি হয়েও নিজেরই শাশ্বত স্পন্দ ও গুণলীলা, অন্তহীন বৈচিত্র্য ও বহুভাবনার ভর্তা। তাঁর অন্বয়স্বভাবের অক্ষরস্থিতি হতে স্বতই উৎসারিত হচ্ছে বহুত্ব স্পন্দ ও গুণলীলার এই নিরন্ত নির্ঝর—তাতে তাঁর শাশ্বত ও অনন্ত অদ্বৈতভাবের হানি না হয়ে বরং বৈচিত্র্যের ভূমিকারূপে তার মহিমা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। ব্রহ্মের চৈতন্য যদি স্থিতিতে বা গতিতে দ্বিদল এমন-কি বহুদলও হতে পারে, তাহলে তাঁর স্বরূপসত্তার মধ্যেই-বা কেন দ্বৈধভাবের ঠাঁই হবে না, কেন তাকে আশ্রয় করে দেখা দেবে না স্বানুভবের বাস্তব বৈচিত্র্য? তখন বিশ্বচেতনাকে

সৃষ্টিধর্মী একটা বিভ্রমশক্তি বলা চলবে না—তাকে মানতে হবে ব্রহ্মেরই কোনও স্বরূপসত্যের অনুভব বলে।...এই সূত্র ধরে বিশ্বরহস্যের ব্যাখ্যা করলে, সে-ব্যাখ্যার উদার পরিবেশে আমাদের আত্মানুভবের দুটি কোটির সমন্বয়সাধনা যেমন সহজ হবে, তেমনি অধ্যাত্মজীবন হবে আরও সমৃদ্ধ এবং উর্বর। অন্তত এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে : শাশ্বত ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে শাশ্বত বিভ্রমের একটা বিকল্প বাস্তব হয়ে উঠছে শুধু অগণিত অবিদ্যাচ্ছন্ন সন্তপ্ত জীবের কাছে, আর সেই মায়ার বেদনাময় অন্ধতমসের কবল হতে মায়ারই অধিকারে থেকে আত্মবিলোপের বিবিক্ত সাধনায় একে-একে তারা নিষ্কৃতি পাচ্ছে—এ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে যদি যুক্তির সায় থাকে, তাহলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলেই-বা থাকবে না কেন ?

মায়াবাদকে আশ্রয় করে বিশ্বরহস্যের আর-একটা সমাধানের প্রয়াস আমরা দেখি শাঙ্কর-দর্শনে। শঙ্করের দর্শনকে বিশুদ্ধ মায়াবাদ না বলে বলা চলে বিশিষ্ট-মায়াবাদ। তাঁর যুক্তিতে যে নৈশ্চিত্য ও ঔদার্যের ব্যঞ্জনা আছে, তার অসাধারণ প্রভাবকে অস্বীকার করা কঠিন। বস্তুত শাঙ্কর-বেদান্তেই আমাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের দিকে প্রথম একটা ইশারা পাই। কারণ শঙ্করের মতে মায়ার বিশিষ্ট বা গুণীভূত একটা বাস্তবতা আছে—যদিও তার রহস্য অনির্বচনীয়। তত্ত্বসমীক্ষার যে-দ্বন্দ্ব আমাদের মনকে পীড়িত করে, তার এমন-একটা সমাধান আছে এ-দর্শনে—প্রথম দৃষ্টিতে যাকে সর্বথা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। বিশ্বের সত্যতাকে যেমন আমরা চিরন্তন ও অনতিবর্তনীয় বলে জানি, তেমনি আবার মনে হয় সবই এখানে অনিশ্চিত অপর্যাপ্ত এবং তুচ্ছ, সবই ক্ষণিকের মেলা—জীবন মিথ্যাপ্রায়, জগৎ একটা ছায়াছবি। এমনিতর মনোদ্বন্দ্বের একটা সমাধান আছে শাঙ্কর-দর্শনে। তাঁর মতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক, তাত্ত্বিক ও প্রাতিভাসিক, শাশ্বত ও কালিক ভেদে সত্যের দুটি ভূমি। প্রথমটি ব্রহ্মের নির্বিশেষ বিশ্বোত্তীর্ণ শাশ্বত শুদ্ধ-সদ্‌ভাবের সত্য, আর দ্বিতীয়টি মায়োপহিত ব্রহ্মে বিশ্বগত কালকলিত আপেক্ষিক-সত্তার সত্য। এমনি করে জীব ও জগত একহিসাবে দুইই সত্য। কারণ, জীব স্বরূপত ব্রহ্ম। ব্রহ্মই মায়ার অধিকারে আপাত-দৃষ্টিতে জীবরূপে তার কবলিত হয়ে অবশেষে তাঁর শাশ্বত ও সত্য স্বরূপের মধ্যে একদিন জীবের আপেক্ষিক ও প্রাতিভাসিক সত্তাকে মুক্তি দেন। কালাবচ্ছিন্ন সবিশেষ-ভাবের অধিকারে যদি অনুভব করি—ব্রহ্মই সর্বভূত হয়েছেন, শাশ্বত-পুরুষই বিশ্ব এবং জীবরূপে নিজেকে রূপায়িত করেছেন—তাহলে সে-অনুভূতিকেও সত্য বলব। কেননা তাঁর এই সর্বাত্মভাবের অনুভব মায়াতীত ধামের দিকে সাধকের যে মায়িক অভিযান, তার অন্তরিক্ষভূমি। আবার কালকলিত চেতনার কাছে বিশ্ব এবং বিশ্বগত অনুভব যেমন বাস্তব, তেমনি সে-চেতনাও বাস্তব।...

কিন্তু তখনই প্রশ্ন হয়, এই বাস্তবতার প্রকৃতি কি, তার মধ্যে নৈশ্চিত্যের আশ্বাসই-বা কতটুকু ? কারণ, বাস্তবতারও তারতম্য আছে। জীব ও জগৎ যেমন সত্যি-সত্যি বাস্তব হতে পারে (যদিও সে-বাস্তবতার মধ্যে অবরভূমির ছাপ থাকবেই), তেমনি তারা অংশত-বাস্তব অথবা একান্ত-অবাস্তব একটা বস্তুও হতে পারে। তারা সত্যি-সত্যি বাস্তব হলে মায়াবাদের কোনও সার্থকতা থাকে না। সৃষ্টি সত্য হলে তাকে আর বিভ্রম বলি কি করে ? কিন্তু সৃষ্টি যদি হয় অংশত-বাস্তব এবং অংশত-অবাস্তব, তাহলে সে-গলদের মূল থাকবে বিরাটের স্বগত-সংবিতের কোনও ন্যূনতায়, অথবা আমাদেরই আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শনের কোনও বৈকল্যে—যার জন্যে জীব ও জগতের সত্তায় জ্ঞানে ও জীবন-স্পন্দে প্রমাদের এই ছোঁয়াচ দেখা দেবে। কিন্তু প্রমাদের পর্যবসান ঘটবে—হয় অবিদ্যাতে, নয়তো বিদ্যা-অবিদ্যার সাংকর্যে। অতএব আমাদের বিচারের লক্ষ্য হবে, অনাদি বিশ্ববিভ্রমের তত্ত্বনিরূপণ নয়—শাশ্বত-অনন্ত সন্মাত্রের চিন্ময় সিসৃক্ষায় অথবা তাঁর প্রবৃত্তির উচ্ছলনে অবিদ্যা এসে জুটল কোথা হতে তারই মীমাংসা।...কিন্তু জীব ও জগৎ যদি অবাস্তব বস্তু হয়, অর্থাৎ বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনায় তাদের কোনও তাত্ত্বিক সত্তা যদি না থাকে, মায়ার অধিকার ছাড়িয়ে যেতেই যদি তাদের আপাত-বাস্তবতা শূন্যে মিলিয়ে যায়—তাহলে তাদের 'বস্তু' ব'লে স্বীকার করবার কোনও সার্থকতা থাকে না। এ যেন এক হাতে দান ক'রে আরেক হাতে কেড়ে নেবার মত। কেননা এতক্ষণ মুখে যাকে বস্তু বলে মেনে এসেছি, এখন জানছি আগাগোড়াই সে ছিল একটা মায়ার খেলা ! মায়া জীব ও জগৎ—এরা বস্তুও বটে, অবস্তুও বটে। কিন্তু এদের বাস্তবতা 'অবাস্তব বাস্তবতা' অর্থাৎ অবিদ্যার কাছে এরা বাস্তব হলেও তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিতে অবাস্তব।

কিন্তু জীব-জগৎকে একবার যদি বাস্তব বলে মানি, তাহলে অন্তত একটা সীমিত ক্ষেত্রে তারা সত্যি-সত্যি বাস্তব হবে না কেন, এ কিন্তু আমাদের ধারণায় আসে না। একথা স্বীকার করি, বিসৃষ্টির অধিষ্ঠানের চাইতে বিসৃষ্টির বহির্ভাস ন্যূন-সত্তাক। তাই, জগৎকে বলতে পারি ব্রহ্মের একটা ছন্দোলীলা। তার স্বরূপ-সত্যের কথা যদি বাদ দিই, তাহলে তাকে কোনমতেই পুরাপুরি বাস্তব বলতে পারি না। কিন্তু তার জন্যে তাকে অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দেবার পক্ষে আমাদের কি যুক্তি আছে ? অন্তর্মুখ মন যখন তার বিকল্পনা হ'তে স'রে দাঁড়ায়, তখন জগৎকে সে অবাস্তব ভাবতে পারে বটে। কিন্তু তার কারণ হল : মন বস্তুত অবিদ্যার সাধন, তাই তার কল্পনায় ভাসে বিশ্বের একটা অবিদ্যাচ্ছন্ন অপূর্ণ ছবি। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির প্রজ্ঞালোকে এই ছবিকে তার নিজেরই একটা অপ্রতিষ্ঠ ও অবাস্তব কল্প-কৃতি না ভেবে সে পারে না। ঋতম্ভরা পরা বিদ্যা ও তার নিজের অবিদ্যার মাঝে যে গভীর ব্যবধান, তা-ই

তাঁকে দেখতে দেয় না—বিশ্বোত্তীর্ণ তত্ত্বের সঙ্গে বিশ্বাত্মক তত্ত্বের কোথায় সত্য যোগ। চেতনার উত্তরভূমিতে তার এ-পঙ্গুতা দূর হয়ে বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণের যোগভূমি আবিষ্কৃত হয়। তখন তত্ত্বের বীর্যে জারিত চেতনায় অতাত্ত্বিক বোধেরও উদয় অসম্ভাবিত হয়, অতএব মায়াবাদেরও কোনও প্রয়োজন কি উপযোগিতা থাকে না। পরা সংবিতের দৃষ্টি বিশ্ব অনুবিদ্ধ নয়, অথবা তাঁর কালাত্মা বিশ্বকে বাস্তব মানলেও তিনি তাকে অবাস্তব বলেই জানেন—এ কখনও চরম সত্য হতে পারে না। বিশ্বোত্তীর্ণেরই 'পরে বিশ্বসত্তার নির্ভর। কালাতীত শাশ্বত ব্রহ্ম-সদ্ভাবে নিশ্চয় কালোপহিত ব্রহ্মের বিশেষ-কোনও তাৎপর্য নিহিত থাকবে। নইলে বিশ্বের সব-কিছুই চিদাবেশশূন্য অতএব নিঃস্বভাব হত, সুতরাং তাদের কালিক সত্তারও কোনও সত্যকার আশ্রয় থাকত না।

কিন্তু বিশ্ব কালাবচ্ছিন্ন, শাশ্বত নয়: অবিনাশী অরূপের 'পরে এ শুধু বিনশ্যৎ রূপের একটা আরোপ—এই যুক্তিতে বিশ্বকে বলা হয় তত্ত্বত-অবাস্তব। যুক্তির অনুকূলে মাটি এবং মাটির তৈরী ঘটের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়: মাটি হতে ঘট সরা আরও কত-কি তৈরী হয়—কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা মাটিতেই লয় পায়। মাটিই সত্য, ঘট সরা তার ক্ষণিকের রূপ। রূপের প্রলয়ে অবশিষ্ট থাকে শুধু অরূপ মাটির সত্য, আর-কিছু নয়।...কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দিয়েই এর বিপরীত সিদ্ধান্তকে আরও ভাল করে প্রমাণ করা যায়। বলা চলে: ঘটের উপাদান মাটি যখন সত্য, তখন সেই উপাদানে তৈরী ঘটও সত্য। ঘট একটা বিভ্রম নয়, এমন-কি মাটিতে মিশে গেলেও তার অতীত অস্তিত্বকে অবাস্তব বা মায়া বলতে পারি না। মাটি আর ঘটের মধ্যে এমন সম্পর্ক নয় যে একটি মূল তত্ত্ববস্তু, আরেকটি তার অবাস্তব প্রতিভাস। মাটিকে ছেড়ে তারও মূলভূত অদৃশ্য অথচ বিশ্বোপাদান আকাশ-তত্ত্বকে ধরে যদি বিচার করি, তাহলে বলতে পারি, দুয়ের মাঝে সম্পর্কটা শাশ্বত অব্যক্ত কারণতত্ত্বের সঙ্গে তারই আশ্রিত ব্যক্ত ও কালাবচ্ছিন্ন কার্য-তত্ত্বের। এখানে তত্ত্ব হতে তত্ত্বেরই উৎপত্তি হয়েছে—অতত্ত্বের নয়। তাছাড়া উপাদানভূত মাটি বা আকাশের মধ্যে ঘটরূপের শাশ্বত স্বরূপযোগ্যতা আছে। উপাদান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ যে-কোনও মুহূর্তে রূপেরও বিসৃষ্টি হতে পারে। রূপের তিরোভাবে রূপ শুধু ব্যক্তদশা হতে অব্যক্তদশায় সংহৃত হয়। একটা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হলেই প্রমাণ হয় না যে, ব্রহ্মাণ্ডবস্তুর সত্তা অচিরস্থায়ী একটা প্রতিভাস মাত্র। এই কল্পনাই বরং সুসঙ্গত যে, বিসৃষ্টির সামর্থ্য ব্রহ্মে নিরূঢ় এবং তার প্রবৃত্তিও অব্যাহত। হয় শাশ্বতকালের অবিচ্ছেদ প্রবাহে, নয়তো আবৃত্তির শাশ্বত ছন্দোদোলায় তার অভিব্যঞ্জনা। বিশ্বোত্তীর্ণের তুলনায় বিশ্বের বাস্তবতা অন্য ভূমির হতে পারে। কিন্তু তাবলে তাকে

কোনমতেই বিশ্বোত্তীর্ণের কাছে অসৎ বা অবাস্তব বলা চলে না। যা নিত্য-স্বভাব, একমাত্র তা-ই সত্য—এই হল আমাদের বিচারবুদ্ধির রায়। অর্থাৎ তার মতে প্রবাহনিত্যতাই তত্ত্বভাবের লক্ষণ, অথবা একমাত্র কালাতীত তত্ত্বই সত্য। কিন্তু কালাতীতের সঙ্গে কালকলনার এই ভেদ মনের একটা বিকল্প মাত্র, তত্ত্বাবগাহী সম্যক্-দর্শন তার প্রামাণ্যকে চরম বলে মানবে না। কালাতীত শাশ্বত-সদ্‌ভাব আছে বলেই কালের কলনা মিথ্যা হয়ে যায় না। দুয়ের মাঝে অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধ একটা কথার কথা শুধু—বস্তুত তাদের বেলায় আশ্রয়াশ্রয়ি-সম্বন্ধের কল্পনাই সমীচীন।

তেমনি, যে-যুক্তি নির্গুণের গুণলীলাকে মিথ্যা বলে, ব্যাবহারিক সত্যকে ব্যাবহারিক বলেই অতাত্ত্বিক-বাস্তবতার লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত করে, তাকেই-বা মান্‌ব কি করে? ব্যাবহারিক সত্যকে তো চিন্ময় সত্য হতে একান্ত-বিবিক্ত কি তার সঙ্গে সম্পর্কহীন আরেকটা তত্ত্ব বলতে পারি না। সে তো চিৎসত্তারই তপোবিভূতি, তারই গুণলীলার পরিস্পন্দ। দুয়ের মাঝে পার্থক্য যে নাই, তা নয়। কিন্তু সে-পার্থক্যকে অত্যন্ত-বিরোধ বলতে পারি, যদি গোড়াতেই ধরে নিই—অশব্দ প্রপঞ্চোপশম স্বরূপস্থিতিতেই নিত্যবস্তুর সত্য এবং সমগ্র পরিচয়। তখন মানতে হয়, নির্গুণের মধ্যে গুণাভাসের কল্পনা একেবারেই অচল—অতএব যা-কিছু গুণের খেলা, তার সঙ্গে ব্রহ্মের শাশ্বত পর-স্বভাবের একান্ত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু কালের অথবা বিশ্বের এতটুকু বাস্তবতা কোথাও থাকলেই মানতে হবে—নির্গুণের মধ্যে নিশ্চয় গুণধর্মের এমন-কোনও অধৃষ্য বীর্য এবং প্রেতি নিরূঢ় ছিল, যা বাস্তবতার ওই ব্যঞ্জনাটুকু ফুটিয়ে তুলেছে। আর ব্রহ্মবীর্য যে বিভ্রমের বিসৃষ্টি ছাড়া কিছুই করতে পারে না, একথাও নিষ্প্রমাণ। বরং এই কল্পনাই সমীচীন : সৃষ্টির সামর্থ্য যে-শক্তিতে নিরূঢ়, তার মূলে নিহিত আছে এক সর্ববিৎ সর্বেশ্বর চৈতন্যের সংবেগ। অবিকল্পিত তত্ত্বস্বরূপের বিসৃষ্টিও হবে তাত্ত্বিক—মায়িক নয়। আর ব্রহ্ম যখন 'একং সৎ', তখন তাঁর বিসৃষ্টিও তাঁরই আত্মরূপায়ণ, তাঁর শাশ্বত সদ্‌ভাবেরই মূর্ত ব্যঞ্জনা—শূন্যতার অনাদি-গহন হতে মায়াকল্পিত অসতের বিক্ষেপ নয়, এখন সে-শূন্যতা ধর্ম-শূন্যতা বা সংবিৎ-শূন্যতা যা-ই হ'ক না কেন।

জগৎকে যাঁরা সত্য বলে মানতে চান না, তাঁদের ধারণায় বা অনুভবে রয়েছে ব্রহ্মের নির্বিকার অলক্ষণ নিষ্ক্রিয়-স্বভাবের প্রত্যয়—যার উপলব্ধি হয় চেতনার বৃত্তিহীন নিরোধস্থিতির নৈঃশব্দ্যে। কিন্তু জগৎ গুণ-স্পন্দের পরিণাম। তার মধ্যে প্রবৃত্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়েছে সত্তার বীর্য, দিকে-দিকে ঘটেছে তপঃ-শক্তির বিচ্ছুরণ—কখনও নিরঙ্কুশ কল্পলীলায়, কখনও যন্ত্রমূঢ় আবর্তনে, কখনও-বা চিন্ময় মনোময় প্রাণময় অথবা জড়ময় উচ্ছলনে। সুতরাং মনে হতে

পারে, শক্তির এই লীলায়ন শাশ্বত ব্রহ্মসত্তার অচলস্থিতির প্রতিষেধ, অথবা তাঁর স্বরূপচ্যুতি—অতএব তা অবাস্তব। কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টি হিসাবে এ-মতবাদ অপরিহার্য নয়। ব্রহ্মদৃষ্টিতে সগুণ ও নির্গুণ দুটি ভাবেরই সমন্বয় কেন হতে পারবে না, তারও কোনও যুক্তি নাই। ব্রহ্মের শাশ্বত স্বরূপ-স্থিতিতে আছে শাশ্বত স্বরূপ-শক্তিরও সমব্যাপ্তি; স্বভাবতই সে-শক্তির মধ্যে স্পন্দ ও প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ সামর্থ্য অথবা স্ফুরত্তা থাকবে। কাজেই স্থাণুত্ব ও স্পন্দ দুইই ব্রহ্মস্বভাবের সত্য হতে পারে। আবার এ-দুটি ভাবের যুগপৎ সদ্ভাবেও কোনও বিরোধ নাই। বরং তা-ই স্বাভাবিক—কেননা শক্তির বিচ্ছুরণ কি স্ফুরত্তা সর্বদাই অধিষ্ঠান বা প্রয়োজক হিসাবে স্থিতিধর্মের অপেক্ষা রাখে, নইলে তার পরিণাম বা সিসৃক্ষা সার্থক হয় না। শিববিন্দুর অধিষ্ঠান না থাকলে শক্তির সৃষ্টি জমাট হতে পারবে না কখনও, শুধু আকারহীন উদ্দামতায় চিরকাল পাক খেয়ে চলবে। এইজন্যই সত্তার স্ফুরত্তায় তার স্থিতিধর্মের একটা আশ্রয়, সিদ্ধরূপের একটা প্রেতি প্রয়োজন হয়। জড়জগতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, শক্তিই বুঝি বিশ্বের পরম তত্ত্ব। কিন্তু সেখানেও শক্তির নিজেকে করতে হয় স্থিতিধর্মী, গড়তে হয় একটা স্থায়ী রূপ। 'ভাব' ক্ষণিক হলে তার কাজ চলে না, তার জন্য চাই ভাবের কালব্যাপ্তি। হতে পারে, ভাবের স্থিতি সাময়িক মাত্র, অথবা স্ফুরত্তার ক্ষণ-ভঙ্গে কল্পিত ও বিধৃত বস্তুধর্মের সে একটা সমন্বয়। কিন্তু যতক্ষণ তার স্থায়িত্ব, ততক্ষণ সে বাস্তব। এমন-কি তার নিবৃত্তি ঘটলেও অতীত স্থিতি-ধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা তাকে বাস্তবেরই কোঠায় ফেলি। অতএব ক্রিয়ার আধাররূপে স্থাণু অধিষ্ঠানের প্রয়োজন বিশ্বভাবনার একটা শাশ্বত বিধান এবং অধিষ্ঠান-তত্ত্বের প্রবর্তনাও একটা নিত্যকালীন ধর্ম। বিশ্ব জুড়ে শক্তিস্পন্দ ও রূপবিসৃষ্টির মূলে অচল অধিষ্ঠানতত্ত্বকে আবিষ্কার করবার পরেও দেখি বটে, সৃষ্টরূপের স্থিতি অশাশ্বত। একই ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তিতে, একই ভঙ্গিতে বারবার আবর্তিত হয়ে চলে শক্তির স্ফুরত্তা এবং তা-ই বস্তুর স্বরূপধাতুকে দেয় স্থিতিধর্মী আত্মরূপায়ণের একটা অবকাশ। অথচ এই স্থিতিধর্ম কৃত্রিম, কেননা শক্তিলীলার পৌনঃপুনিক ছন্দ হতেই তার আবির্ভাব। একমাত্র শাশ্বত ব্রহ্ম-সদ্ভাবেই আছে স্বয়ম্ভূ ধ্রুবস্থিতি।... কিন্তু তাহলেও শক্তিসৃষ্ট রূপ অশাশ্বত বলেই তাকে অবাস্তব বলতে পারি না—কেননা ব্রহ্মসত্তার শক্তি যখন বাস্তব, তখন তার সৃষ্ট রূপে ব্রহ্মসত্তারই বাস্তব রূপায়ণ হবে। যা-ই হ'ক, সত্তার স্থাণুভাব এবং তার শাশ্বত গুণলীলা দুইই সত্য এবং যুগপদ্-বৃত্তি। তার স্থাণুভাব যেমন গুণলীলার অনুগ্রাহক, তেমনি গুণলীলাতেও স্থাণুভাবের অপহ্নব ঘটে না। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই : পরমার্থ-সৎ ব্রহ্মের শাশ্বত স্থাণুভাব এবং শাশ্বত গুণলীলা

দুইই সত্য এবং স্বরূপে তিনি দুয়ের অতীত। চর-ব্রহ্ম আর অচর-ব্রহ্ম উভয়ে একই তত্ত্ব।

কিন্তু সাধনার প্রথম পর্বে দেখি, উপশমের অভ্যাসে আমাদের মধ্যে শাশ্বত-অনন্তের স্থিতিধর্মের উপলব্ধি জাগে। আমরা বিকল্পহীন প্রশান্তির স্তব্ধতায় ডুবে গিয়েই পাই ইন্দ্রিয় ও মনের কল্পিত জগতের অন্তরালে এক অনির্বচনীয় স্থাণুস্বরূপের নিঃসংশয়িত প্রত্যয়। চিত্তের বৃত্তিতে, প্রাণের ক্রিয়ায়, আধারের পরিস্পন্দনে যেন সে-তত্ত্ববস্তুর সত্যরূপ ঢাকা পড়েছে, কেননা ওরা ধরতে পারে শুধু সান্তকে—অনন্তকে নয়, পরমার্থ-সতের কালাবচ্ছিন্ন বিভাব নিয়েই ওদের কারবার—শাশ্বত বিভাব নিয়ে নয়।...এইহতে সিদ্ধান্ত হয় : এমনটি তো হবেই, কেননা যেখানে কর্মস্পন্দ বিসৃষ্টি বা বিশেষণ-জ্ঞান, সেখানেই দেখা দেবে সীমিত ভাবনা। তত্ত্বস্বরূপকে এরা ধরতে পারে না, তাই তত্ত্বের অখণ্ড-নির্বিশেষ চেতনায় অবগাহন করলে এদের কল্পমায়া আপনিই তিরোহিত হয়। কালের ভূমিকায় সে-মায়ার বাস্তবতা আপাতিক হ'ক বা যথার্থই হ'ক, নিত্যস্থিতির ভূমিতে তা একান্তই অবাস্তব। কর্ম হতেই অবিদ্যা—কৃত্রিম সৃষ্টি—সান্তভাব। স্ফুরত্তা ও প্রজাসৃষ্টি ব্রহ্মের নির্বিকার অজাত শুদ্ধ সন্মাত্র-স্বভাবের বিরোধী।...কিন্তু এ-যুক্তিকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক বলতে পারি না। কেননা বিশ্ব এবং বিশ্বব্যাপার সম্পর্কে আমাদের প্রাকৃত-চিত্তের যে-ধারণা, জ্ঞান ও কর্মের তত্ত্ববিচারে আমরা তাকেই করেছি আদর্শ। প্রাকৃত-জীব কালের চঞ্চল প্রবাহে ভেসে যেতে-যেতে জগৎকে দেখছে। তার সে-দৃষ্টিতে তলস্পর্শিতা নাই, অখণ্ডভাবনার ঔদার্য নাই। সমগ্রকে সে দেখতে পায় না, বস্তুর মর্মসত্যে অবগাহন করতে পারে না—তাই তার জ্ঞান খণ্ডিত, অতএব কর্মও বন্ধন। কিন্তু এই ক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের খদ্যোত-দ্যুতি হতে ঋতচেতনার শাশ্বতদীপ্তির সহজপ্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হলে দেখি, কর্ম সঙ্কোচ বা বন্ধনের কারণ নাও হতে পারে। মুক্ত পুরুষকে তো কর্ম সীমার বাঁধনে বাঁধে না—বাঁধে না শাশ্বত পুরুষকেও। শুধু কি তা-ই, আমাদের এই আধারে অন্তর্গূঢ় সত্য পুরুষকেও তো সে বাঁধে না। চিন্ময় পুরুষ অথবা গুহাহিত চৈত্য-পুরুষের 'পরেও কর্মের কোনও প্রভাব নাই। শুধু আমাদের এই বহিশ্চর কল্পিত অহং-পুরুষই কর্মতন্ত্রিত। এই অহং-পুরুষ আমাদের আত্মস্বরূপের একটা কালিক প্রকাশ—তার একটা বিপরিণামী ব্যাকৃতি। আত্মস্বরূপের আশ্রয়ে, তারই ঈশনায় তার সত্তা ও স্থিতি—সে-ই তার উপাদান। কিন্তু কালাবচ্ছিন্ন হলেও সে অবাস্তব নয়। আমাদের চিন্তা ও কর্ম এই প্রাকৃত আত্মরূপায়ণের সাধন। কিন্তু এ-রূপায়ণ কালের ছন্দে প্রকৃতি-স্থ পুরুষকে ধীরে-ধীরে ফুটিয়ে তুলছে বলে এর মধ্যে অপূর্ণতা আছে, আছে পরিণামধর্মের মন্থর স্ফুরণ। আমাদের চিন্তা ও কর্ম সে-

মন্থরতাকে দ্রুততর করতে চায়, আধারে আনতে চায় পরিবর্তন, অভিনবের প্রেতি দিয়ে প্রসারিত করতে চায় তার সীমার সংকোচ। অথচ ওই সীমাকেই আবার তারা আঁকড়ে থাকে। এই অর্থে তারা সংকোচ ও বন্ধনের কারণ, কেননা তারা নিজেরাই যে আত্মার স্বরূপাভিব্যক্তির একটা অপূর্ণ সাধন। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে গুহাহিত সত্যস্বরূপের এবং সত্যপুরুষের সাক্ষাৎ পাই যখন, তখন তো আর প্রাকৃত জ্ঞান ও কর্মের শৃঙ্খল আমাদের বাঁধে না। তখন জ্ঞানবৃত্তি হয় আত্মচেতনার আর কর্ম আত্মশক্তির বিভূতি। আত্মার প্রাকৃত-আধারের স্বচ্ছন্দ স্বতোনিয়ন্ত্রণের সাধনরূপে তারা হয় তাঁর উন্মীলনের সাধন—তাদের দিয়ে তিনি তাঁর সীমাহীন সম্ভূতির চিত্রলেখা এঁকে চলেন কালের বুকে। পুরুষের স্বতোনিয়ন্ত্রণ যেখানে প্রকৃতি-পরিণামের বিশেষ-কোনও ধারার অনুগামী, সেখানে বৃত্তিসংকোচ অপরিহার্য। 'তাতে আত্ম-স্বরূপের অপহ্নব অথবা তত্ত্বস্বভাব হতে প্রচ্যুতি ঘটে, অতএব তা অবাস্তব'—এমন কথা বলা চলত, যদি বৃত্তিসংকোচে সত্তার স্বরূপ বিকৃত কি তার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ হত। চৈতন্যই আমাদের লোকীয়-ভাবের গূঢ়তম সাক্ষী ও প্রয়োজক। বৃত্তিসংকোচ যদি কোনও অনাত্মশক্তির প্ররোচনায় চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতিকে অনৈসর্গিক কোনও উপরাগদ্বারা আচ্ছন্ন করত, অথবা পুরুষের আত্মচৈতন্য বা আত্মবিভাবনার বিরোধী কোনও উপসর্গের সৃষ্টি করত—তাহলে তাকে বলতাম চিৎস্বরূপের বন্ধন, অতএব অনৃত এবং অবাঞ্ছিত। কিন্তু ঋতময় দৃষ্টিতে দেখি, প্রকৃতির কোনও কর্মে কি রূপায়ণে পুরুষের স্বরূপের বিকৃতি ঘটে না, বৃত্তিসংকোচকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করায় তাঁর সমগ্রতারও কোনও হানি হয় না। এ-সংকোচ তাঁর আত্মকৃত—বাইরে থেকে চাপানো নয়। তাই তাকে আত্মবিভূতিরূপেই তিনি গ্রহণ করেন এবং যুগযুগান্তরব্যাপী কালের অয়নে সে হয় তাঁর সমগ্র রূপটি ফুটিয়ে তোলবার অপরিহার্য সাধন। সুতরাং বৃত্তিসংকোচ নিত্যমুক্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন নয়—এ বরং কূটস্থ চিন্ময়-পুরুষদ্বারা বহিশ্চর প্রকৃতি-স্থ পুরুষের 'পরে আরোপিত একটা ঋতায়ন। অতএব ব্যাবহারিক জীবনের কর্ম ও জ্ঞানবৃত্তির সংকোচ হতে এমন সিদ্ধান্ত করা অন্যায় যে, সংকোচের ব্যাপারটাই একটা অবাস্তবের খেলা; অথবা চিৎ-স্বরূপের এই-যে আত্মপ্রকাশের তপস্যা, বিচিত্র রূপায়ণ ও আত্ম-বিসৃষ্টির এই-যে সাধনা—এ একটা অলীক প্রতিভাস মাত্র। সত্য বটে, কালের অয়নদ্বারা তার বাস্তবতা অবচ্ছিন্ন। কিন্তু তবু সে বস্তু-সতেরই একটা বাস্তব রূপ—তাকে ছেড়ে আরেকটা কিছু নয়। মহাশক্তির এই স্ফুরত্তায় কর্মে পরিস্পন্দে ও বিসৃষ্টিতে যা-কিছু আছে, তা-ই ব্রহ্ম। সম্ভূতিতে স্ফুরিত হচ্ছে নিত্য-সতেরই স্পন্দলীলা। লোকীয়-কাল লোকোত্তর শাশ্বত মহাকালেরই বিভূতি। নানাত্বের অন্তহীন বিলাস সত্ত্বেও সমস্তই এক সত্তা, এক চৈতন্য। এই

অখণ্ড সৎস্বরূপকে তুরীয়-তত্ত্ব আর বিশ্বমায়ার অ-তত্ত্বে দ্বিধা খণ্ডিত করবার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

শাঙ্কর-দর্শনে আমরা দেখি বুদ্ধির সঙ্গে বোধির একটা বিরোধ। তাঁর বোধিতে আছে নির্বিকল্প তুরীয়ের সান্দ্র সংবিৎ, কিন্তু তাঁর যুক্তিশাণিত বুদ্ধি জগৎরহস্যকে দেখছে নিষ্পক্ষ বিজ্ঞানীর মর্মভেদী দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা নিয়ে। বোধি আর বুদ্ধির এই বিরোধকে তাঁর দুর্ধর্ষ প্রতিভা ওস্তাদের তুলির টানে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে বটে, কিন্তু তার শেষ সমাধানটি রয়েছে উহ্য। মনীষী দার্শনিকের বুদ্ধি প্রাতিভাসিক জগৎকে দেখছে যুক্তির ভূমিতে দাঁড়িয়ে। সেখানে যুক্তির মধ্যস্থতাতেই সত্যের চরম মীমাংসা—অতর্ক্য শ্রুতির প্রামাণ্য সেখানে অচল। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতের পিছনে আছে তুরীয়ের দুরবগাহ তত্ত্বরূপ—শুধু বোধিই তার খবর জানে। সেখানে কোন যুক্তিই বোধির অনুভবকে ছাপিয়ে যেতে পারে না—অন্তত যে সান্ত সংকীর্ণ বিভজ্যবৃত্ত যুক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সে তো নয়ই। ছাপিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক, বোধির সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ঘটানোও তার অসাধ্য—তাই বিশ্বের রহস্য তার কাছে অমীমাংসিত। যুক্তিকে প্রাতিভাসিক সত্ত্বের বাস্তবতা মানতেই হয়, তার সত্যকে সে নিষ্প্রমাণ বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। তাই তার প্রামাণ্য প্রতিভাসের গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। প্রাতিভাসিক সত্ত্বও বাস্তব, কেননা শাশ্বত পারমার্থিক সত্ত্বেরই সে কালিক প্রতিভাস। কিন্তু সে তো স্বয়ং পরমার্থতত্ত্ব নয়। তাই প্রতিভাস ছাড়িয়ে যখন পরমার্থে পৌঁছই, তখন প্রতিভাস থাকলেও আমাদের চেতনায় তার প্রামাণ্য থাকে না। প্রতিভাস এইজন্যই অবাস্তব। প্রতিভাস আর পরমার্থের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মনশ্চেতনা যখন দুটি অন্তই দেখতে পায়, তখন এমনতর বিরোধের একটা প্রত্যয় তার মধ্যে জাগা খুবই স্বাভাবিক। শঙ্কর তাকে স্বীকার করে নিয়েই তার সমাধান করতে চাইছেন, প্রথমত যুক্তির প্রামাণ্যের 'পরে সীমার রেখা টেনে দিয়ে। যুক্তির অধিকার প্রসারিত বিশ্বলোকে, সেখানকার সে একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু সেইসঙ্গে বোধিজাত স্বানুভবের স্বতঃপ্রামাণ্যের 'পরে নির্ভর করে বিশ্বোত্তীর্ণ পরমার্থতত্ত্বকেও তার নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। তাছাড়া, মায়ার রচিত ও কল্পিত মানসিক সংকীর্ণ সংস্কারের সকল বাঁধন ছিঁড়ে আত্মাকে তর্কপ্রস্থান দিয়ে নিষ্ক্রমণের পথ দেখাতে হবে, যার চরম সার্থকতা সমগ্র প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের প্রলয় ঘটানোতে। শঙ্করের সূক্ষ্ম ও গম্ভীর দর্শনের একাধিক ব্যাখ্যা থাকলেও আমাদের মনে হয়, মোটের উপর জগৎ-রহস্যের মীমাংসা সম্পর্কে এই তাঁর মত : একদিকে আছে শাশ্বত স্বয়ম্ভূ বিশ্বোত্তীর্ণ অক্ষরব্রহ্ম, আরেকদিকে কালাবচ্ছিন্ন প্রাতিভাসিক জগৎ। প্রতিভাসের মধ্যে শাশ্বত ব্রহ্মসত্তা নিজেকে প্রকাশ করেন আত্মা ও ঈশ্বররূপে।

মায়া ঈশ্বরের প্রাতিভাসিক সৃষ্টির শক্তি। এই মায়া দিয়েই ঈশ্বর কালিক প্রতিভাসের বিক্ষেপ ঘটান। কিন্তু নির্বিকল্প ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবে জগৎপ্রতিভাসের কোনও অস্তিত্ব নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন চেতনার সহায়ে মায়াই অতিচেতন অথবা একান্ত-আত্মচেতন ব্রহ্মে এই প্রতিভাসকে আরোপিত করে। পরমার্থ-সৎ ব্রহ্মই জগৎপ্রতিভাসে জীবের আত্মা হয়ে দেখা দেন। কিন্তু অপরোক্ষানুভূতিতে জীবের জীবত্ব যখন বিগলিত হয়, তখন আত্মস্বভাবের লোকোত্তর-ভূমিতে তার প্রাতিভাসিক স্বভাবের অত্যন্ত-বিমুক্তি ঘটে। জীব আর তখন মায়ার অধীন থাকে না। জীবত্বের প্রতিভাস হতে নির্মুক্ত হয়ে তার ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে। কিন্তু অনাদি-অনন্ত জগৎপ্রবাহ তেমনি বয়ে চলে ঈশ্বরের মায়িক সৃষ্টিরূপে।

এই সমাধানে অধ্যাত্ম-অনুভবের তথ্যের সঙ্গে যুক্তি ও ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানের তথ্যের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বটে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এবং ব্যবহারে জীবনটাকে ভাগাভাগি করে উভয়ের বিরোধ হতে নিষ্কৃতি পাবারও একটা পথ মেলে। কিন্তু তবু একে বিরোধের সত্য সমাধান বলতে পারি না। শংকরের মতে মায়া সৎও বটে, অসৎও বটে। জগৎ নিতান্তই বিভ্রম নয়, কেননা তার কালাবচ্ছিন্ন সত্তা এবং বাস্তবতা আছে। কিন্তু তাহলেও শেষ পর্যন্ত তুরীয়-ভূমিতে জগৎ মিথ্যাই।...এইখানে যে-দ্বিধা দেখা দিল, তার কাজল নির্বিকল্প স্বয়ম্ভূসত্তার শুভ্রতাকে ছেড়ে আর-সবাইকে ছুঁয়ে গেছে শাংকর-দর্শনে। যেমন ঈশ্বর : তিনি মায়ার কবলিত নন, বরং তিনিই মায়ী। কিন্তু তবু তিনি ব্রহ্মের আভাসমাত্র—পরমার্থতত্ত্ব নন। তাঁর সৃষ্ট কালিক-জগৎ সম্পর্কেই তাঁর বাস্তবতার প্রামাণ্য, তাছাড়া স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা তাঁর নাই। জীবের বেলাতেও তা-ই। যদি মায়িক-ব্যাপারের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়, তাহলে ঈশ্বর জীব কি জগৎ কিছুই থাকবে না। কিন্তু মায়া নিত্য। ঈশ্বর এবং জগতেরও কালিক নিত্যতা আছে। জীবও ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ বিদ্যার ফলে তার আত্মবিলুপ্তি না ঘটছে। এসব কথা মানতে গেলেই বুদ্ধির অগম্য অনির্বচনীয়বাদ আশ্রয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে এই-যে দ্বিধা, সৃষ্টির আদিতে এবং তত্ত্ববিচারের অন্তে এই-যে দুস্তর রহস্যের ছায়া ঘনিয়ে আসে, এতেই মনে হয় কোথায় যেন আমাদের ভাবনায় তন্তুবিচ্ছেদ ঘটেছে। ...ঈশ্বর যখন বাস্তব—মায়াকল্পিত নন, তখন হয় তিনি তুরীয়ের কোনও সত্যের বস্তু-বিভূতি, নয়তো তিনিই স্বয়ং তুরীয়স্বরূপ—তুরীয়ের আত্ম-বিভূতিরূপে জগতের প্রবর্তনা ও বিধৃতিই তাঁর ঈশ্বরত্ব। তেমনি, চেতনার একটা ভূমিতেও জগৎ যদি বাস্তব হয়, তাহলে তাকেও তুরীয়ের সত্যবিভূতি বলে মানতে হবে—কেননা একমাত্র তুরীয়-বস্তুই বাস্তবতার প্রয়োজক হতে পারে। আত্মোপলব্ধির দ্বারা শাশ্বত তুরীয়ধামে অবগাহন করবার সামর্থ্য

যদি জীবের থাকে এবং আত্মমুক্তিই যদি তার পরম-পুরুষার্থ হয়, তাহলে মানতে হবে জীবও তুরীয়ের সত্যবিভূতি। তার মুক্তির সাধনা যখন ব্যষ্টির সাধনা, তখন তুরীয়ের মধ্যে তার ব্যষ্টিভাবেরও একটা সত্য ও সার্থক রূপ আছে। সেই প্রচ্ছন্ন রূপকে আবিষ্কার করাই তার জীবনের তপস্যা। আত্মা এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের অবিদ্যাকে দূর করাই পুরুষার্থ—তথাকথিত জীবত্ববিভ্রম ও প্রপঞ্চবিভ্রমের সঙ্গে লড়াই করা নয়।

একটা কথা স্পষ্ট। তুরীয়ব্রহ্ম যেমন অপ্রতর্ক্য, একমাত্র নিদিধ্যাসনগম্য, জগৎরহস্যও তেমনি অপ্রতর্ক্য। কথাটা অযৌক্তিক নয়—কেননা জগৎ যে তুরীয়ব্রহ্মের বিভূতি। তাই তো তর্কবুদ্ধি দিয়ে তার তত্ত্ব বেড়ে পাই না। অতএব পরমার্থে-প্রতিভাসে বিরোধ মিটিয়ে জগৎরহস্যের মর্মে অবগাহন করতে হলে আমাদের যেতে হবে বুদ্ধিরও ওপারে। বোধির আলোকে যদি এ-রহস্যকে দীপ্ত করতে পারি, তবেই আমাদের সিদ্ধি। অমীমাংসিত বিরোধকে জিইয়ে রেখে তর্কদ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকে কোনমতেই চরম সমাধান বলা চলে না। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর জীব অতিচেতনা মায়িকচেতনা প্রভৃতি বিরুদ্ধ বা বিবিক্ত সংজ্ঞার সৃষ্টি ক'রে আমাদের তর্কবুদ্ধি একটা বিরোধাভাসকে সংহত ও চিরন্তন রূপ দিতে চায়। যখন একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই নাই, তখন এসমস্ত সংজ্ঞার প্রতিপাদ্য তত্ত্বও ব্রহ্ম। অতএব ব্রাহ্মী চেতনায় সকল সংজ্ঞার ভেদ সর্বসমন্বয়ী এক প্রত্যক্-দর্শনের অনুত্তর সৌষম্যে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই অদ্বৈতভাবনার সত্যে পেঁছিতে হলে যুক্তি-বুদ্ধির এলাকা পার হয়ে যেতে হয়, চিন্ময় স্বানুভব দ্বারা আবিষ্কার করতে হয় সকল ভাবনার সেই মহাসঙ্গমতীর্থ—যেখান হতে এক অন্তর্গূঢ় চিদাবেশে তাদের আপাত-বহুমুখীনতার সার্থক অভিযান প্রবর্তিত হয়েছে। বস্তুত বহুমুখ বিবিক্ত-বিসর্পণের ভাব কখনও ব্রাহ্মী চেতনায় ঐকান্তিক হতেই পারে না। সেখানে পেঁছিলে সব-কিছুকেই আমরা 'চক্রনাভিতে অরের মত সমর্পিত' দেখব। আমাদের প্রাকৃত-বুদ্ধির ভেদকল্পনায় কিছু সত্য থাকেও যদি, তবু তাকে বলব বহুধা-বিচিত্র অদ্বৈতভাবেরই সত্য। বিভজ্যবাদী বুদ্ধের সর্বাবগাহী তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত ছিল সম্বোধির দিব্যপ্রতিভা। তা-ই দিয়ে তিনি আমাদের প্রাকৃত মন ও ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিদৃষ্ট জগতের প্রতীত্যসমুৎপাদের তত্ত্ব এবং সর্ববিধ সংস্কার হতে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তার বেশী আর তিনি এগোননি। শঙ্কর বুদ্ধের পরেও আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন—বুদ্ধির অতীত তত্ত্বকে শূন্য-রূপ না দিয়ে দিলেন ভাব-রূপ। বুদ্ধের দর্শনে লোকোত্তর তত্ত্ব আছে যবনিকার অন্তরালে। যুক্তি দিয়ে তাকে হাতড়ে পাওয়া যায় না—তার জন্যে চাই চিত্তের সর্ববিধ সংস্কারের উচ্ছেদ। শঙ্কর এসে দাঁড়ালেন জগৎ ও শাশ্বত পরমার্থ-সতের

মাঝামাঝি। তাঁর দর্শনে জগৎরহস্য বুদ্ধিগম্য ভাবনার অতীত বা অনির্বচনীয় হলেও বুদ্ধি- ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের প্রামাণ্য অনস্বীকার্য। অতএব জগৎ তাঁর মতে অবাস্তব বস্তু মাত্র। এর পরে আরও-এক ধাপ এগিয়ে যেতে শঙ্করও নারাজ।...কিন্তু জগতের তত্ত্বরূপকে জানতে হলে পরা সংবিতের অপ্রতর্ক্য ভূমি হতে তাকে অতিচেতনার প্রজ্ঞাচক্ষু নিয়ে দেখতে হবে। এই অতিচেতনা বিশ্বের ভর্তা হয়েও তার অতি-ষ্ঠা এবং সেই অতিস্থিতি দিয়েই সে বিশ্বের সত্যরূপকে জানে। অতিচেতনাদ্বারা সংভৃত এবং অতিক্রান্ত যে প্রাকৃত-চেতনা, জগৎরহস্যের তত্ত্ব সে কি করে জানবে? তার জানা তো প্রতিভাসকে জানা মাত্র—তত্ত্বকে জানা নয়। সিসৃক্ষার স্বয়ম্ভূ সংবেগে উচ্ছ্বসিত পরা সংবিতের কাছে এ-জগৎ কি অনির্বচনীয় রহস্য, অথবা বিভ্রমাভাসবৎ একটা বিভ্রম—যা বস্তুত থেকেও অবাস্তব? দিব্য-পুরুষের কাছে জগৎরহস্যের একটা দিব্য তাৎপর্য আছে। এই বিরাট্-ভাবনার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা তাঁর চেতনায় স্বয়ম্প্রভ—কেননা তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ অথচ বিশ্বাত্মক পরা সংবিতই এ-ভাবনার আশ্রয়।

একমাত্র ব্রহ্মই আছেন পরমার্থ-সৎরূপে এবং ব্রহ্মই সব। তাহলে জগৎ পরমার্থ-সতের বহির্ভূত নয়—অতএব জগৎও সৎ। অথচ জগতের রূপে ও লীলায়নে আমরা তার সৎ-স্বরূপের পরিচয় পাই না, কেননা আমরা তাকে দেখছি দেশ ও কালের ভূমিকায় নিয়ত অথচ বিপরিণামী একটা স্পন্দরূপে। কিন্তু তাহতে এ-সিদ্ধান্ত হয় না যে, জগৎ অসৎ, কিংবা তৎ-স্বরূপ তার স্বরূপ নন। তার স্পন্দের অর্থ তৎ-স্বরূপেরই নিত্য উপচীয়মান আত্মব্যঞ্জনা বা আত্মবিসৃষ্টি—পরিণামের ছন্দে দলে-দলে আপনাকে ফুটিয়ে তোলা কালের বুকে। তাঁর এই ছন্দোদোলার সমগ্র ব্যাপ্তি অথবা তার অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা এখনও' আমাদের প্রাকৃত-চেতনার অগোচর। এইদিক থেকে বলতে পারি, এ-জগৎ তৎ-স্বরূপও বটে, তৎ-স্বরূপ নয়ও বটে। কেননা আত্মব্যঞ্জনার ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি রূপায়ণেও তৎ-স্বরূপের পরিপূর্ণ পরিচয় তো তার মধ্যে পাই না। অথচ তার সমস্ত রূপ বস্তুত ব্রহ্মেরই তত্ত্বভাবের ঘনবিগ্রহ। নিখিল সান্তের চিন্ময় স্বরূপ আনন্ত্যেই প্রতিষ্ঠিত। তিমিরবিদার বোধির দৃষ্টি নিয়ে যদি সান্তের দিকে তাকাই, তাহলে তার মণিকোঠায় দেখি তাদাত্ম্য ও আনন্ত্যেরই কৌস্তুভদ্যুতি।...শঙ্কা উঠেছে: বিশ্ব তাঁর বি-ভাতি অথবা প্রকাশরূপ হতে পারে না; কেননা তিনি স্বপ্রকাশ—বিশ্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করবার তাঁর কি প্রয়োজন? আমরাও তাহলে বলতে পারি, তাঁর আত্মবিভ্রম বা বিভ্রমমাত্রেরই-বা কি প্রয়োজন ছিল? মায়িক বিশ্ব সৃষ্টি করেই-বা তাঁর কি লাভ? ব্রহ্ম আপ্তকাম, অতএব প্রয়োজন তাঁর কিছুতেই নাই। তবু তাঁর অবন্ধন স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁর মধ্যে আত্মশক্তির

বিভূতি বা আত্মসিসৃক্ষার পরিণামরূপে আত্মবিভাবনী পরা শক্তির এক অবন্ধ্য প্রেতি থাকতে পারে—যা কালকলনায় আপনাকে বিচ্ছুরিত দেখবার ঈক্ষা হতে সঞ্জাত আত্মবিসৃষ্টির অনতিবর্তনীয় একটা প্রবেগ। এই প্রেতিকে আমরা দেখি তাঁর সিসৃক্ষা অথবা আত্ম-বুভূষারূপে। কিন্তু তাকে বরং বলা চলে ব্রহ্মের সন্ধিনী-শক্তির উল্লাস—যা আত্মবীর্যের উচ্ছলনে আপানাকে ফুটিয়ে তোলে ক্রিয়াশক্তির আকারে। ব্রহ্ম যদি কালাতীত শাশ্বতস্থিতিতে স্বপ্রকাশ হতে পারেন, তাহলে কালকলনার নিরন্ত নৃত্যের ছন্দেও নিজের মধ্যে দুলিয়ে দিতে পারেন আত্মরূপায়ণের দোলা। বিশ্ব প্রাতিভাসিক-তত্ত্ব হলেও সে তো ব্রহ্মেরই ভাতি বা প্রতিভাস। কারণ সমস্তই যদি ব্রহ্ম, তাহলে ভাতি এবং প্রতিভাস আসলে একই বস্তু। অতএব অবাস্তবতার কল্পনা অনাবশ্যক এবং অসার্থক—এতে মিছামিছি ঝামেলার সৃষ্টি হয় শুধু। কারণ বিশ্ব ও বিশ্বাতীতে যে-পার্থক্যটুকু রাখা প্রয়োজন, কাল ও কালাতীত-শাশ্বতের কল্পনার সঙ্গে বিসৃষ্টির কল্পনাকে জুড়ে দিয়েই তা অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে।

অবাস্তব বস্তু বলে যদি কিছু থাকে, সে হল আমাদের ব্যষ্টিচিত্তের বিবিক্ততাবোধ এবং সেইসঙ্গে অনন্তের মধ্যে সান্তের স্বয়ম্ভূসত্তার কল্পনা। বহির্বৃত্ত জীবচেতনার পক্ষে এই বোধ ও কল্পনার একটা ব্যাবহারিক প্রয়োজন আছে। অর্থক্রিয়াতেই তাদের প্রামাণ্য, এও সত্য। অতএব যেখানে বুদ্ধি ও আত্মানুভবের চারদিকে গন্ডি টানা, সেই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তবতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রাকৃত-চেতনার সীমা ছাড়িয়ে অনন্ত তত্ত্বস্বরূপের চেতনায় যখন অবগাহন করি, অর্থাৎ বহিশ্চর কৃত্রিম-পুরুষের ভূমি হতে যখন উত্তীর্ণ হই সত্য-পুরুষের সত্যলোকে—আমাদের সান্ত জীবত্ব সেখানেও থাকে, কিন্তু তাকে নিমিত্ত করে ফোটে অনন্তের সত্তা শক্তি ও ঈক্ষণ। তার স্ব-তন্ত্র কি বিবিক্ত সত্তা তখন থাকে না। ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য বা একান্তবিবিক্ততা তার বাস্তবতার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। আবার সান্তভাবের তিরোভাব ঘটে বলে তাদের অবাস্তবও বলা যায় না—কেননা বস্তুর তিরোভাব হতে পারে তার ব্যক্ত হতে অব্যক্ত আত্মসংহরণ মাত্র। কালাতীতের জগৎবিসৃষ্টি ঘটে কালিক পরম্পরাকে আশ্রয় করে। অতএব তার রূপায়ণের পর্বগুলি আপাতদৃষ্টিতে অচিরস্থায়ী হলেও প্রকাশের স্বরূপযোগ্যতার দিক থেকে তারা শাশ্বত। বস্তুর স্বরূপসত্তায় এবং অধিষ্ঠানচৈতন্যের গর্ভাশয়ে তারা ভবিতব্যের বীজ-রূপে নিত্য অন্তর্গূঢ় থাকে। তাই কালাতীত চৈতন্য তাদের চিরন্তন ভব্য-স্বভাবকে যে-কোনও মুহূর্তে কালকলিত ভূত-ভাবে রূপান্তরিত করতে পারে। জগৎ মিথ্যা হত, যদি তার ভাব ও রূপ হত নিঃস্বভাব ছায়ার মায়া—পরমার্থ-সতের নিজেরই মধ্যে আত্মচৈতন্যের একটা অলীক বিজৃম্ভণ, অচির-প্রভার ক্ষণদ্যুতিতে একবার ঝিকিয়ে উঠেই যা মিলিয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু

বিসৃষ্টি বা তার সামর্থ্য যদি শাশ্বত হয়, ব্রহ্মের সদ্‌ভাবই যদি যা-কিছু সব হয়ে থাকে—তাহলে বিভ্রম কি অবাস্তবতা কখনও বস্তুর স্বভাব হতে পারে না, অথবা তার আধারভূত জগৎও মিথ্যা হয় না।

মায়ার অর্থ যদি হয় বিভ্রম বা জগদ্‌ভাবের মিথ্যাত্ব, তাহলে মায়াবাদ দিয়ে বিশ্বসমস্যার সমাধান না হয়ে দেখা দেয় আরও নানান্‌ জটিলতা। বস্তুত মায়াবাদের সমাধানকে সমাধান বলা চলে না, বরং তাতে সমস্যাপূরণের সকল দুয়ার চিররুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, মায়াকে অবস্তু বলি কি অবাস্তব বস্তুই বলি, সব-কিছুকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়াই মায়াবাদের চরম তাৎপর্য। শিরশ্ছেদদ্বারা শিরঃপীড়া আরাম করবার মত তাকে দিয়ে ভব-রোগের চিকিৎসা হয় যেমন সহজ তেমনি সর্বনাশা। আমরা মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। আমাদের ক্ষণিক সত্তা থাকেও যদি, তারও সত্যতা একটা কল্পমায়া মাত্র! ...মায়াকে যাঁরা একান্ত অবস্তু বলেন, তাঁদের মতে মুক্তিসাধনী বিদ্যা আর বন্ধ-সাধনী অবিদ্যা, অথবা জগৎ-বর্জন আর জগৎ-গ্রহণ দুইই এক বিভ্রমের দুটি দিক মাত্র। কেননা গ্রহণ বা বর্জন করা হবে কাকে, করবেই-বা কে? নিত্য-কাল ধরে এক অতিচেতন অক্ষরব্রহ্মই ছিলেন শুধু। বন্ধন বা মুক্তি দুইই প্রতিভাস—কোনটাই তো সত্য নয়। সংসারাসক্তি, সেও যেমন মায়া—মুক্তির ডাকও তো তেমনি মায়া। মায়ার বুকে এ-ডাক জেগে উঠে মুক্তিতে আবার তারই বুকে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এমনি করে সব-কিছুকে নস্যাৎ করার শেষ কোথায়? বিশ্বে জীবচেতনার সকল অনুভবই যদি মায়া হয়, তাহলে কি করে জানব আমাদের অধ্যাত্ম-অনুভবও মায়া নয়? পরমাত্মার নির্বিকল্প স্বানুভবকে একমাত্র সত্য বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু জীবের চেতনাই যদি তার সাক্ষী হয়, তাহলে সেও যে মায়া নয়, তার কি প্রমাণ? জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আমাদের জগৎ-অনুভবও মিথ্যা। অতএব সেই অনুভবের আশ্রিত বিশ্বাত্মার অনুভব কিংবা ব্রহ্মাত্মভাবের প্রত্যয়ও নিষ্প্রমাণ। কি করে তখন বলি —ব্রহ্মই এই যা-কিছু সব হয়েছেন, তিনিই সর্বভূতের আত্মা, সবারই মধ্যে এক, একের মধ্যেই সব? কারণ, এসব উক্তি সত্য হতে হলে বাক্যঘটক দুটি পদই সত্য হওয়া দরকার। কিন্তু এখানে অন্তত একটি পদ মায়াকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা। সে-পদটির সাধারণ সংজ্ঞা 'জগৎ'। ব্রহ্মভূত হলেও জগৎ মিথ্যা। তাহলে ব্রহ্মই যে সত্য, তাই-বা বলি কি করে? কারণ শুদ্ধাত্মা, অশব্দ, স্থাণু, পরমার্থ-সৎ ইত্যাদি ব্রহ্মাকারা যে-বৃত্তিই আমাদের চিত্তে জাগুক, তার আশ্রয় চিত্ত তো মায়ারই বিকল্প এবং চিত্তের আধার এই দেহও তো বিভ্রমজনিত একটা বিক্ষেপ? স্বতঃপ্রামাণ্যের অনতিবর্তনীয় প্রত্যয় কি তত্ত্বের নিঃসংশয় অনুভব হতেও বলা যায় না—চরম তত্ত্বের অবিসংবাদিত পরিচয় এই। কারণ, 'ব্রহ্ম নির্গুণ' এ-অনুভবের মত 'ব্রহ্ম সর্বত্রগ দিব্য-পুরুষ, সত্য-বিশ্বের পরম

ঈশ্বর তিনি' এ-অনুভবেরও নিঃসংশয় চরম প্রামাণ্য আছে। যে-বুদ্ধি সব-কিছুকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়, আরেকটুখানি এগিয়ে গিয়ে এমন কথাও সে বলতে পারে—আত্মাও মায়া, যা-কিছু সৎ তা-ই মায়া। এই পথ ধরেছিলেন বৌদ্ধেরা। তাঁদের মতে আত্মাও অবাস্তব, কেননা অন্যান্য পদার্থের মত সে মনের একটা বিকল্প মাত্র। তত্ত্বের তালিকা হতে শুধু ঈশ্বরকে নয়, শাশ্বত আত্মা এবং নির্গুণ ব্রহ্মকেও তাঁরা ছেঁটে দিয়েছিলেন।

নির্জলা মায়াবাদে জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না। সে শুধু দেখিয়ে দেয় সমস্যার আসর হতে নিষ্ক্রমণের পথটি। তার চরম রায়কে সত্য মানলে বলতে হয়, আমাদের জীবন ও কর্ম সমস্তই প্রেতিহীন ও মিথ্যা—আমাদের অভীপ্সা সাধনা ও অনুভব একান্তই অর্থহীন। এক অনুদ্দিষ্ট অব্যবহার্য পরমার্থ-সৎ এবং অপবর্গসাধনা ছাড়া আর সব-কিছুতে আছে শুধু সত্তার বিভ্রম। যা-কিছু জগতে আছে, তা একটা বিরাট বিশ্ববিভ্রমের অঙ্গীভূত, অতএব বিভ্রমই তার তত্ত্ব। ঈশ্বর জীব জগৎ—সবই মায়ার কল্পনা। ঈশ্বর মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র, আমরাও চিদাভাসে ব্রহ্মের ছায়া—জগৎ ব্রহ্মের অবাচ্য স্বয়ম্ভূসত্তায় একটা অধ্যারোপ মাত্র।...এই সর্বনাশা মতের একটুখানি ধার মরে, যদি মায়াচক্রের মধ্যে ভাববস্তুর আপেক্ষিক একটা বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্মসাধনা ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের খানিকটা প্রামাণ্য মেনে নিই। কিন্তু তা সম্ভব হয়, যদি কালিক-সত্তার প্রমাণসিদ্ধ বাস্তবতা এবং কালাবচ্ছিন্ন অনুভবের বাস্তব প্রামাণ্য থাকে। তখন আর পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে বস্তুতে অবস্তুর বিভ্রম বলা চলে না। বিশ্বের জ্ঞান তখন বস্তুরই অবিদ্যাশবল বিকৃত জ্ঞান। তা নইলে, ব্রহ্ম সর্বভূতের আত্মা হলেও সর্বভূত যেমন মিথ্যা, তেমনি তাদের আত্মভাবও মিথ্যা—কেননা সমস্তই যে এক বিরাট বিভ্রমের অঙ্গ! আত্মার অনুভবও তাহলে বিভ্রম : 'তৎ ত্বম্ অসি' এই আদর্শের মূলে আছে অবিদ্যাজনিত সংস্কারের খেলা, কেননা কোথায় 'ত্বম্'—শুধু-যে আছে 'তৎ'! 'সোঽহং'-প্রত্যয়ে আবার দ্বিগুণ গলদ, কেননা এর মধ্যে আছে শাশ্বত-চিন্ময়ের কল্পনা—যিনি বিশ্বের অন্তর্যামী বিরাট্-পুরুষ। কিন্তু বিশ্ব অবাস্তব হলে বিরাট কি করে বাস্তব হয়?...অতএব জীব ও জগৎভাবের একটা সত্য আশ্রয় খুঁজে পেলেই বিশ্বরহস্যের সত্য সমাধান হতে পারে। তুরীয় পরমার্থ-তত্ত্বই সর্বযোনি। জীব ও জগতের সত্যকে ও সত্য-সম্বন্ধকে সেই তুরীয়-সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেই আমাদের সমাধান সত্য হবে। কিন্তু তাহলে জীব ও জগতের একটা বাস্তবতা মানতে হয়—'একং সৎ' আর 'বহু স্যাম্' দুয়ের মাঝে একটা সত্য সম্বন্ধ, গুণলীলার অনুভব আর নির্গুণের অনুভবের মাঝে একটা ভাবের যোগ মানতে হয়।

মায়াবাদে জগৎরহস্যের গ্রন্থিমোচন হয় না—হয় গ্রন্থিচ্ছেদন; এ-পথ নিষ্ক্র-

মণের, সমাধানের নয়। চিৎসত্তার এই পলায়নী-বৃত্তিতে প্রকৃতির 'পরে সংসারে বিবর্তমান শরীরী জীবের পরিপূর্ণ বিজয় সূচিত হয় না। কেননা এতে সিদ্ধ হয় শুদ্ধ প্রকৃতি হতে পুরুষের বিবেক—প্রকৃতির প্রমুক্তি ও পূর্ণ সার্থকতা নয়। এমনি করে সিদ্ধির চরমে এলেও শুধু আমাদের উৎক্রান্তির পিপাসাই চরিতার্থ হয়—আধারের একটি বৃত্তিরই ঊর্ধ্বায়ন ঘটে। তার আর-সব বৃত্তি অবহেলিত হয়ে শুকিয়ে মরে অবস্তু-সৎ মায়ার আলো-আঁধারিতে। কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, এমন উদার ও চরম সমাধানই সর্বোত্তম, যার মধ্যে সকল সত্যের সমাহার ও সমন্বয় আছে—যেখানে এক অখণ্ড সমগ্রতার পরিবেশে অনুভবের প্রত্যেকটি দল তার যথাযোগ্য স্থান পায়। সেই বিদ্যাকেই বলব পরা বিদ্যা, যা এক অভঙ্গসৌষম্যের বৃন্তে গেঁথে সমস্ত বিদ্যার তাৎপর্যকে উজ্জ্বল করে তোলে। অবিদ্যা ও বিভ্রমের কার্পণ্য অবশ্যই সে দূর করে, কিন্তু সেইসঙ্গে আবিষ্কার করে তাদের প্রবর্তক এমন-কি এক অর্থে সার্থক হেতুও। এই তো অনুভবের পরা কোটি, যার মধ্যে সমস্ত অনুভব সংহত হয় এক সর্বসমন্বয়ী পরমাদ্বৈতের জ্যোতির্ময় পরিবেষে। কিন্তু মায়াবাদের অদ্বৈত বর্জনধর্মী। তার মধ্যে এক সর্ববিলোপন পরম-প্রত্যয় ছাড়া আর-কোনও বিজ্ঞান কি অনুভবের কোনও তত্ত্ব বা তাৎপর্য নাই।

কিন্তু একটা কথা আছে। এতক্ষণ ধরে যে-বাদানুবাদ গেল, সে হল শুদ্ধবুদ্ধির এলাকার তর্ক। অথচ এধরনের তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরম সমাধান তর্কে হয় না—হয় অধ্যাত্ম-অনুভবের দীপ্তিতে, যার পিছনে আছে নিরূঢ় চিন্ময়-তত্ত্বের সমর্থন। তর্কবুদ্ধির কল্পিত ন্যায়-সিদ্ধান্তের বিরাট সৌধ এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে অপরোক্ষ অধ্যাত্ম-অনুভবের একটিমাত্র ঝলকে। মায়াবাদের সত্যকার জোর এই অনুভবের নিঃসংশয়তায়। মায়া-বাদীর দর্শনশাস্ত্র মনঃকল্পিত হলেও সে-শাস্ত্রের পিছনে যে-অনুভবের প্রামাণ্য আছে, তার অতিতীব্র সংবেগকে অস্বীকার করা যায় না বলেই মনে হয়, অধ্যাত্ম-অনুভবের এই বুঝি চরম অবধি।...মনন স্তম্ভিত। চিত্ত বিকল্পনা হতে উপরত। শুধু আছে শুদ্ধ নির্বিকল্প আত্মপ্রত্যয়—জীবত্বের ভাবনাহীন, জগদ্ভাবের আভাসলেশশূন্য। সহসা দুর্ধর্ষ সংবেগে তার মধ্যে জ্বলে উঠল তত্ত্বভাবের উদ্দীপ্ত স্বরূপচেতনা। চিদেকরস মনে জীব ও জগতের আভাস তখন বস্তুতই দেখা দেবে স্বপ্নছায়ার অলীক মায়া হয়ে—যেন স্বয়ম্ভূসতের অনুপহিত তত্ত্বভাবের 'পরে আরোপিত তত্ত্বহীন নাম-রূপ ও ক্রিয়া-কারকের মেলা তারা! এমন-কি আত্মার প্রসঙ্গও সেখানে অবান্তর। বিদ্যা আর অবিদ্যা সে-ভূমিতে শুদ্ধ-চিন্মাত্রের বর্ণহীন অনুপাখ্যতায় তলিয়ে যায়—চেতনা মূর্ছিত হয়ে পড়ে বিকল্পহীন সন্মাত্রের উপশান্ত অতিচেতনায়। অথবা সদাখ্যা দিয়েও বুঝি ওই অদ্বিতীয় শাশ্বত নিত্যস্থিতির নির্বিশেষ প্রত্যয়কে

বিশেষিত করা যায় না : সেখানে আছে কালকলনাহীন এক নিত্যতা, দেশ-বিভাগশূন্য এক আনন্ত্য, সর্বোপাধিনির্মুক্ত এক নিঃসঙ্গের কৈবল্য, গোত্রহীন এক প্রশান্তি, এক সর্বাতিভাবী একাগ্র নির্বিষয় সমাপত্তি। এ-অনুভব যে নিষ্প্রমাণ নয়, এ যে নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ—তাতে কোনও সন্দেহ নাই। এর একাত্মপ্রত্যয়সার তীব্রসংবেগ যে সাধকের চেতনা আচ্ছন্ন অভিভূত করে দেয়, তাও অনস্বীকার্য। তবু অধ্যাত্ম-অনুভবমাত্রেই অনন্তের অনুভব—তাই দিকে-দিকে বিতত রয়েছে তার বহুবিধ পথ। শুধু এই অনুভবেই নয়, আরও কোনও-কোনও অনুভবে আছে 'দিব্যঃ পরতঃ পরঃ' পুরুষের এমনই সুনিবিড় সামীপ্য, তাঁর আবেশের এমনই সুগভীর তাত্ত্বিক প্রত্যয়, যা-কিছু তাঁর চেয়ে ন্যূন তার বন্ধন হতে প্রমুক্তির এমনই অবর্ণনীয় শান্তি ও বীর্য। তারাও তো আনে পরমার্থতত্ত্বের চরম প্রামাণ্যের সর্বাভিভাবী অকুণ্ঠ প্রতিবোধ। পরম-ব্রহ্মের দিকে খোলা রয়েছে হাজারো পথ। যেমন হবে পথের ধরন, তেমনি হবে চরম অনুভবের প্রকার। তার প্রবেগে সাধক উত্তীর্ণ হবে তৎস্বরূপের অনির্ব-চনীয় অগমলোকে—যার তত্ত্ব বস্তুতই 'অবাঙ্‌মানসগোচরম্‌'। সমস্ত বিশিষ্ট চরম প্রত্যয় ওই অদ্বিতীয় অনুত্তরের উপধা বা উপান্তভূমির প্রত্যয়মাত্র। এদের ধরেই সাধক মনের ভূমি পার হয়ে অবগাহন করে অমনীভাবের লোকো-ত্তর মহাবৈপুল্যে।...প্রশ্ন হয় : এই-যে নিরুপাধিক অক্ষর স্বয়ম্ভূসত্তায় জীবের সমাপত্তি অথবা মহানির্বাণে জীবভাব ও জগদ্‌ভাবের প্রলয়—এ কি একটা উপধা-প্রত্যয় শুধু ? না এ-ই মানুষের চরম ও পরম অনুভব—যেখানে মহা-সমুদ্রের মধ্যে এসে মিশেছে তার সকল পথের মোহানা, অনুত্তরের প্রভাসে হারিয়ে গেছে যার মধ্যে অবর ব্রহ্মানুভবের যত দীপালি ? সমস্ত বিজ্ঞানের এই নাকি পরম বিজ্ঞান—সকল বিদ্যাকে অতিক্রম ক'রে উচ্ছেদ ক'রে এ-ই নাকি সবার পিছনে জেগে আছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে এর চরমতা সম্পর্কে তো বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই।...কিন্তু চরমত্বের এই দাবিকেও ছাপিয়ে আছে আরেকটা দাবি। এই নেতিভাবনা পার হয়ে মানুষের সুদূর অভিযান হতে পারে আরও মহত্তর নেতি অথবা ইতির দিকে। হয় অসতের মধ্যে ঘটতে পারে তার আত্মার মহাপরিনির্বাণ, নয়তো 'একং সৎ'-এর বৃন্তে বিশ্ব-চেতনা ও নির্বাণচেতনার দ্বিদল অনুভবকে গেঁথে নিয়ে সে চলে যেতে পারে অদ্বৈত-সম্পুটিত পরমসামরস্যের সেই তুর্যাতীত ভূমিতে, যার মধ্যে ভব আর নির্বাণ এক সর্বতোভাবী তত্ত্বের মহাসঙ্গমতীর্থে অবিরোধে ঠাঁই পেয়েছে। তাইতে বলা হয়, দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত তৎস্বরূপের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈতের সমাবেশ ও সমন্বয় হয়েছে, সেইখানেই তাদের বিশেষ-সত্য এক উত্তরসত্যের আশ্রয় পেয়েছে। যে প্রত্যন্ত সিদ্ধ-অনুভব সম্ভাবিত আর-সব অবর-অনুভবকে ছাড়িয়ে যায় বা গ্রাস করে, তাকে 'ব্রহ্মণঃ পথি বিততঃ' বলে স্বীকার করতে

বাধা নাই। কিন্তু যে পরম অনুভবে আছে সর্ববিধ অধ্যাত্ম-অনুভবের স্বীকৃতি ও সমাহার, আছে প্রত্যেক অনুভবের প্রত্যন্ততম প্রত্যয়ের সহজ-সিদ্ধি, এক পরাৎপর তত্ত্বভাবের মধ্যে সকল বিজ্ঞান ও অনুভবের সহস্রদল সৌষম্য, তাকে বলব 'ব্রহ্মণঃ পথি' আরও-এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কেননা, তার মধ্যে যুগপৎ ফুটে উঠেছে নিখিলের স্বরূপ-সত্যের অনুত্তর হিরণ্যবর্তনি দ্যুতি এবং অনন্ত তুর্যাতীতের উচ্ছ্রিততম মহিমা। উপনিষদ বলেন, ব্রহ্মই সেই পরমতত্ত্ব যাঁকে জানলে সব জানা হয়। কিন্তু মায়াবাদের সমাধানে, ব্রহ্ম তা-ই যাঁকে জানলে আর-সব হয়ে যায় অবস্তু এবং অবোধ্য প্রহেলিকা। এইমাত্র যে অনুত্তম সিদ্ধির কথা বললাম, শুধু তার প্রত্যয়ে ব্রহ্মকে জানলে সেই বিজ্ঞানে সব-কিছুর সত্য তাৎপর্য ধরা প'ড়ে ফুটে ওঠে শাশ্বতপরমের সঙ্গে তাদের নিরূঢ় সম্বন্ধের সত্য।

সমস্ত সত্যেরই নিজস্ব একটা প্রামাণ্য আছে—এমন-কি সত্যে-সত্যে আপাতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু এক বৃহত্তম সত্যের উদার আবেষ্টনে তাদের সমন্বয় ঘটানোই আমাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসার চরম লক্ষ্য। আর-কিছু না হ'ক, অন্তত আত্মা এবং বিশ্বকে বিশেষ-একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে বলে সমস্ত দর্শনেরই বিশিষ্ট একটা সার্থকতা আছে। ব্রহ্মের বহুধাবিভাতির বিচিত্র অনুভব আছে। বিভিন্ন দর্শনে সেই বৈচিত্র্য রূপায়িত হয়, অনন্তের গুহাচর রহস্যের এক-একটি প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়। তেমনি সাধকের প্রতিটি উপলব্ধিই সত্য। কিন্তু তাদের ইশারা সেই বৃহত্তম উত্তম-জ্যোতির দিকে—যা প্রত্যেকের সত্যতাকে কুক্ষিগত করেই অতি-ষ্ঠা হয়ে রয়েছে। এইদিক থেকে বলতে পারি, সমস্ত সত্য ও সমস্ত অনুভবই আপেক্ষিক—কেননা প্রমাতার চিত্ত এবং সত্ত্বের প্রত্যক্- ও পরাক্-দৃষ্টির বিভিন্নতা অনুসারে তাদের রূপও বিভিন্ন। লোকে বলে, যার যেমন স্বভাব, তার তেমনি ধর্ম। কিন্তু শুধু ধর্মই-বা কেন, প্রত্যেক মানুষের দর্শনও বলতে গেলে আলাদা। জগৎ বা জীবন সম্পর্কে প্রত্যেকের দৃষ্টি এবং অনুভবে একটা তফাত থাকবেই—যদিও নিজের দর্শনকে রূপ দেবার সামর্থ্য শুধু দু'এক-জনেরই থাকে। কিন্তু আরেকদিক থেকে দেখতে গেলে এই বৈচিত্র্যে অনন্তের অন্তহীন বৈভবই প্রকাশ পায়। প্রত্যেক সাধক তার চিত্তে বা হৃদয়ে পায় অশেষের এক কি একাধিক বৈভবের একটা ঝলক স্পর্শ বা আবেগ। চিত্তের বিশেষ ভূমিতে কখনও-বা এইসব বিচিত্র বৈভবের বিবিক্ত বর্ণচ্ছটা মিলিয়ে যায় যেন মহাকাশের উদার নীলিমায়, অথবা নির্বিশেষ সর্বগ্রাহী অনৈশ্চিত্যের চিত্ররাগে হয় শবলিত। কখনও-বা সমস্ত প্রত্যয় ঝরে গিয়ে শুধু একটি চরম সত্য অথবা একটি পরম অনুভবের বিদ্যুৎসূচী চেতনায় উদগ্র হয়ে থাকে। তখনই সাধকের মনে হয়, এতকাল ধরে যা সে দেখেছে বা ভেবেছে, যাকে

তার জীবনে কি জগতে ঠাঁই দিয়েছে—সবই মিথ্যা, সবই মরীচিকা। এই 'সব' অবশেষে তার ব্যক্তিজগৎ হতে সংক্রামিত হয় বিশ্বজগতে। তার কাছে বিশ্বও তখন অবাস্তব—অথবা বহুধাবৃত্ত বাস্তবতার বৃন্তহীন ছিন্নদল শুধু! তারও পরে, নির্বিশেষ অনুভবের অবর্ণ অনুপাখ্যতায় অবগাহন করলে তার 'সব-কিছু'ও খসে যায়—জেগে থাকে শুধু অক্ষরব্রহ্মের অনুদ্বেল পরম নৈঃশব্দ্য।... কিন্তু এইখানেই তো চেতনার উত্তরায়ণের ইতি নয়। এরও পরে আছে আবার সেই 'সব'কে ফিরে পাওয়া চিন্ময় নবারুণের বর্ণৈশ্বর্যে অনুরঞ্জিত ক'রে। নির্বিশেষের সত্যেই আবার সাধক খুঁজে পেতে পারে সকল বিশেষের সত্য। নির্বাণের নেতিপ্রত্যয় আর বিশ্বচেতনার ইতিপ্রত্যয় তৎস্বরূপের এক যুগনদ্ধ পরমপ্রত্যয়ে ফুটতে পারে তাঁর আত্মবিভাবনার দ্বিদল-কমল হয়ে। মন হতে অধিমানস ভূমিতে উত্তরণের পথে এই বহুভঙ্গিম অদ্বৈতভাবনা হল সাধকের মুখ্য অনুভব। নিখিল বিসৃষ্টিতে তখন মনে হয় যেন এক বৃহৎ-সামের অপরূপ বিপুল মূর্ছনা। তার চরম চমৎকার ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে অধিমানস ও অতিমানসের সেই সঙ্গমতীর্থে, যেখানে দাঁড়িয়ে সাধকের পরাবৃত্ত দৃষ্টি নিখিলের 'পরে অখণ্ডব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এ-দর্শনও যখন সম্ভব, তখন তন্ন-তন্ন করে এরও শেষ পর্যন্ত দেখে নেওয়া দরকার। 'বিশ্ব-রহস্যের সমাধান সম্ভবত প্রপঞ্চবিভ্রমের কল্পনায়'—এ-মতবাদ নিয়েও এতক্ষণ বিচার করতে হল, কেননা এর পিছনে আছে উত্তুঙ্গ অনুভবের সেই দুর্ধর্ষ প্রত্যয় যা দেখা দেয় উন্মনী-ভাবনার অন্তিম কম্বু-রেখায়—বৃত্তিবিচ্ছেদ বা বৃত্তিনিরোধের উপান্ত্যক্ষণে। কিন্তু যখন নিশ্চিত জানলাম, নিষ্পক্ষ তত্ত্বজিজ্ঞাসার অপরিহার্য পরিণাম এ-ই নয়, তখন এ-সিদ্ধান্তকে একপাশে সরিয়ে রাখতেও পারি, অথবা আরও উদার এবং সাবলীল কোনও মনন ও বিচারের প্রসঙ্গে কখনও প্রয়োজনমত তার আলোচনাও করতে পারি। এবার তাহলে মায়াবাদীর সমাধানকে বাদ দিয়েই বিদ্যা আর অবিদ্যার সমস্যাকে নতুন করে যাচাই করা যাক।

'তত্ত্বের স্বরূপ কি ?'—এই প্রশ্নের উত্তরের 'পরেই সব-কিছুর নির্ভর। আমাদের প্রাকৃত-চেতনা সান্ত সীমিত অবিদ্যাচ্ছন্ন। এই সীমিত চেতনার পরিবেশে বিষয়সম্প্রয়োগের যে বিশেষ ধারা, তা-ই দিয়ে আমাদের তত্ত্বের ধারণা নিরূপিত হয়। তাই পরচৈতন্যের পূর্ব্যভূমি হতে তত্ত্বের যে-দর্শন, তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত হতে তার আটকায় না। সুতরাং পারমার্থিক-তত্ত্ব এবং তার 'জন্য' ও আশ্রিত প্রাতিভাসিক-তত্ত্বের মাঝে কি পার্থক্য, উভয়ের সম্পর্কে আমাদের ব্যাবহারিক বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভবের যে ভ্রান্ত কল্পনা তারই-বা স্বরূপ কি—এসমস্তই আমাদের তলিয়ে বিচার করা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়বোধ বলে, পৃথিবী সমতল। দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়ের

এই রায়কে খানিকটা মেনে চলতেই হয়, ধরে নিতে হয় পৃথিবী যেন সত্যি-সত্যি সমতল। কিন্তু বিশ্বপ্রতিভাসের তত্ত্ব বলবে, পৃথিবী তো সমতল নয়। এই প্রাতিভাসিক-তত্ত্ব নিয়ে যে-বিজ্ঞানের কারবার, সে তাই পৃথিবীকে প্রায় গোলাকার ধরে তার হিসাব কষবে। এমনি করে প্রতিভাসের বাস্তব তত্ত্ব নিরূপণ করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেও বিজ্ঞান অনেকজায়গায় উলটে দিয়েছে। তবু ইন্দ্রিয়বোধের যে-শাঁসটুকু ঘিরে আমাদের ব্যবহারের পত্তন, তাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না—কেননা জগতের সঙ্গে কারবারে ওই ইন্দ্রিয়বোধ মনের 'পরে তাত্ত্বিক প্রামাণ্যের যে-ছাপ ফেলে, তাকে উপেক্ষা করাও যে অসম্ভব। আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করেও তাদের ছাড়িয়ে যায়, নিজেরই সংস্কার অনুযায়ী ধারণা করতে চায়—তত্ত্ব এবং অতত্ত্বের কি পরিভাষা। কিন্তু তবু প্রমাতার দৃষ্টিভঙ্গির বদল হলে সেইসঙ্গে বুদ্ধির কল্পিত ওই পরিভাষারও রূপ বদলে যায়। জড়বিজ্ঞানী প্রকৃতির নাড়ীর খবর নিতে গিয়ে তত্ত্বব্যাখ্যার যেসব সূত্র ও প্রস্থান খাড়া করেন, পরাক্-বৃত্ত প্রাতিভাসিক-তত্ত্ব ও তার পরিণামের 'পরে তাদের ভিত্তি। তাই তাঁর মতে মন হয়তো জড়ের প্রত্যক্-বৃত্ত রূপায়ণ, আত্মা এবং চিৎসত্তা অবাস্তব। অন্তত এই ধারণা নিয়ে তাঁকে চলতে হয় যে, জড় আর শক্তি—এই শুধু বিশ্বের তত্ত্ব। মন বিশ্বব্যাপী স্ব-তন্ত্র জড়-ব্যাপারের সাক্ষী মাত্র, কিন্তু সে-ব্যাপারের সঙ্গে মনের কোনও ধর্ম* অথবা বিরাট কোনও প্রজ্ঞার আবেশ কি প্রশাসন জড়িয়ে নাই। মনোবিজ্ঞানী আবার আপন মনে মনের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান—চেতনা ও অচেতনার অন্দরমহলে তাঁর আনাগোনা। সেখানে তিনি তত্ত্বের প্রত্যক্-বৃত্ত আর-একটা রূপ আবিষ্কার করেন—যার ধর্ম এবং চলনই আলাদা। তাঁর মতে বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠি হয়তো মনের কাছে আছে। মনই আসল তত্ত্ব—জড় শুধু তার রঙ্গভূমি। আর চিৎ মন হতে স্বতন্ত্র অবাস্তব একটা-কিছু।... কিন্তু জিজ্ঞাসু আরও গভীরে তলিয়ে গেলে দেখতে পাবেন সত্যের আরেকটা মহত্তর লোক, যার মধ্যে মনের প্রত্যক্-বৃত্ত তত্ত্ব আর জড়ের পরাক্-বৃত্ত তত্ত্ব উভয়ের দর্শনকে বিপর্যস্ত ক'রে জেগে আছে আত্মা ও চিৎসত্তার পরমার্থ-তত্ত্ব। সেখানে মনে হবে, জড় ও মন চিৎ-জগতেরই অন্তর্গত ও আত্মতত্ত্বের আশ্রয়ে স্ফুরিত একটা অবান্তর প্রতিভাস মাত্র। এমনি করে অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় জড় ও মনের তাত্ত্বিক প্রামাণ্যের দাবি অনেকখানি খাটো হয়ে যায়। তখন তাদের মনে হয় অবরভূমির সত্য বলে—এমন-কি তাদের অবাস্তব ভাবতেও দ্বিধা হয় না।

---

* আধুনিক 'আপেক্ষিকতাবাদ' এ-ধারণার ভিত নাড়িয়ে দিলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের হাতে-কলমে পরীক্ষণ ও তত্ত্বনিরূপণের জন্য এমন-একটা ফলোপধায়ক সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ এখনও প্রয়োজন।

কিন্তু সান্তের সঙ্গে কারবারে অভ্যস্ত প্রাকৃত-বুদ্ধির কাছেই তত্ত্ববস্তুর এমন ভাগাভাগি। কারণ, অখন্ডকে খন্ডিত করে তার একটি খন্ডকে বেছে নিয়ে তাকেই সমগ্রের মর্যাদা দেওয়া—এই তার স্বভাব। সান্তকে সান্ত মেনেই কাজ করতে হয় বলে এছাড়া তার উপায় নাই। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে, বুদ্ধির চালু-করা সান্তের কারবারে তার ওই মাপা-ওজনের বেসাতি নিয়ে আমাদের তুষ্ট থাকতে হয়—কেননা তত্ত্বের পরিণাম হিসাবে তারও যে একটা প্রামাণ্য আছে, তাকেই-বা উপেক্ষা করি কি করে? বুদ্ধির এই কাট-ছাঁটের সংস্কার এতই প্রবল যে, চিৎজগতে এসে সর্বময় বা সর্বগ্রাসী অখন্ডচৈতন্যের ভাবনাতেও মন খন্ড-বুদ্ধির ওই মোহটুকু ছাড়তে পারে না। সান্ত-প্রত্যয়ের পক্ষে অপরিহার্য ওই সীমার বেড়া। তাই তার তত্ত্বদর্শনেও অনন্তে ও সান্তে, চিৎ ও তার প্রতিভাসে কি বিভূতিতে ভাগাভাগি থাকে। তার মতে অনন্ত চিৎসত্তাই সত্য, আর সান্ত প্রতিভাস মিথ্যা। কিন্তু বিশ্বম্ভর অনাদি পর-চৈতন্যের অখন্ড সর্বাবগাহী সম্যক্‌-দর্শনে ভাসে সমগ্রের চিন্ময় তত্ত্বরূপ—আর প্রতিভাস দেখা দেয় সেই মহাবিন্দুজ্যোতির তত্ত্বময় বর্ণচ্ছটারূপে। চৈতন্যের এই উত্তরজ্যোতিতে বিশ্ব যদি অবাস্তব বলে প্রতিভাত হত, চিন্ময় সত্যের সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদই যদি তার তত্ত্ব হত, তাহলে স্বয়ং ঋত-চিৎ হয়ে সে-পরচৈতন্য শাশ্বত কাল ধরে অবিচ্ছেদে অথবা কল্প হতে কল্পান্তরে এই অনৃতের ভার কি করে বইত? কিন্তু তবুও এ-ভার সে বইছে। তাইতো প্রমাণ হয়, বিশ্ববিভূতির প্রতিষ্ঠা চিৎস্বভাবের ঋতেই—অনৃতে নয়।...কিন্তু এই সম্যক্‌-দর্শনে স্বভাবতই প্রাতিভাসিক-তত্ত্বেরও রূপ বদলে যাবে। সান্ত-জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যে-দৃষ্টিতে তাকে দেখে, তার জায়গায় ফুটবে আরও গভীর স্বতন্ত্র তত্ত্বভাবের একটা প্রত্যয়—তার তাৎপর্যে দেখা দেবে নিগূঢ়তর আরেকটা সত্যের ব্যঞ্জনা, তার স্পন্দলীলায় আন্দোলিত হবে সূক্ষ্মতর ও বিচিত্রতর আরও-একটা ছন্দের কম্পন। তত্ত্বের যে-পরিভাষা ও মননের যে-রীতি প্রাকৃত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের কল্পনাপ্রসূত, বৃহতের চেতনা তাদের সত্যা-নৃতের মিথুনে গড়া খন্ডিত সংস্কার বলে জানবে। অতএব এক্ষেত্রে তাদের যুগপৎ বাস্তব ও অবাস্তব বলতেও বাধা নাই। কিন্তু তাতেই যে প্রাতি-ভাসিক জগৎ অতাত্ত্বিক বা অবস্তু-সৎ হয়ে যাবে, তা নয়। তখন এই জগতেরই আরেকটা চিন্ময় রূপ ফুটবে—সান্ত দেখা দেবে অনন্তেরই একটা শক্তি স্পন্দ বা লীলায়নের ছন্দে।

আনন্ত্যের চেতনাই অনাদি পরচৈতন্যের স্বরূপ। অতএব তার মধ্যে বৈচিত্র্যের ভাবনা সংহত হবে অদ্বৈতানুভবের মহাবিন্দুতে। আনন্ত্য-চেতনায় আছে অভঙ্গ সর্বগ্রাহী সর্বব্যাপী সর্বনিয়ামক অতএব সর্ববিশেষক অথচ অখন্ড সমগ্রদর্শনের উল্লাস। তার দৃষ্টি বস্তুর স্বরূপ-সত্যে অনুবিদ্ধ। তাই

রূপ ও স্পন্দের মধ্যে সে দেখে তত্ত্বভাবেরই প্রতিরূপ ও পরিণাম, তার সন্ধিনী-শক্তির বিচ্ছুরণ ও রূপায়ণ। প্রাকৃত-বুদ্ধি বলে : সত্যের মধ্যে অন্যোন্য-ব্যাবৃত্ত ধর্মের ঠাঁই নাই। অতএব প্রাতিভাসিক জগতের সঙ্গে যখন তত্ত্বভূত ব্রহ্মসত্তার বিরোধ কিংবা বিরোধাভাস দেখছি, তখন জগৎ মিথ্যা হতে বাধ্য। আবার জীবভাব যখন বিশ্বভাব ও তুর্যভাব দুয়েরই বিরোধী, তখন জীবও মিথ্যা।...কিন্তু সান্তবুদ্ধির দৃষ্টিতে যা বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান, আনন্ত্যাবগাহী বুদ্ধি বা দৃষ্টির কাছে তা বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত নাও হতে পারে। আমাদের মন যেখানে ধর্মের ভেদ দেখে, আনন্ত্যের দৃষ্টিতে সেখানে আছে ভেদ নয়—ধর্মের আপূরণ। তত্ত্ব আর তত্ত্বের প্রতিভাস বস্তুত পরস্পরের আপূরক —অন্যোন্য-বিরোধী নয়, কেননা প্রতিভাস তত্ত্বেরই রূপায়ণ। সান্ত অনন্তেরই অন্যতম ব্যঞ্জনা—তার ব্যাবৃত্তি নয়। জীব তাই বিরাট ও বিশ্বোত্তীর্ণেরই আত্মবিভূতি —তাহতে স্বতন্ত্র কি তার বিরুদ্ধ একটা-কিছু নয়। বিরাটের বৈশিষ্ট্যের বাহন চিদ্‌ঘন বিন্দুস্বরূপ সে—বিশ্বোত্তীর্ণের সঙ্গেও সাযুজ্য এবং সাধর্মের বশে সে অভিন্ন। এই সর্বতোভাবী অদ্বৈতদর্শন কোনই বিরোধ দেখে না অরূপ তত্ত্বভাবের পুরুরূপ অভিব্যঞ্জনায়, স্বয়ম্ভূ স্থাণুত্বের অধিষ্ঠানে অনন্তের পরিভূ স্ফুরত্তায়, অন্তহীন একত্বের ভূতে-ভূতে রূপে-রূপে অগণিত বীর্যবিভূতিতে বিচিত্র স্পন্দলীলায় আত্মবিচ্ছুরণে—কেননা এসমস্তই তো সেই অনাদি-সৎ অদ্বয়ভাবের বহুধা-বিলাস। এই দৃষ্টিতে দেখলে জগৎবিসৃষ্টিকে মনে হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য একটা ব্যাপার, যার মধ্যে অপ্রাকৃত সমস্যা বলে কিছুই নাই—কেননা যিনি অনন্ত, তাঁর 'পুরাণী প্রবৃত্তি' যে এই রূপ ধরবে, এ তো অপ্রত্যাশিত নয়। প্রাকৃত-বুদ্ধিতে সমস্যার ঘোর ঘনিয়ে ওঠে—তার সান্তদৃষ্টি অখণ্ডের মধ্যে খণ্ডভাবনার বিরোধ কল্পনা করে বলে। অনন্তের বহুধা-প্রবৃত্তিকে স্বীকার করেও তার মধ্যে বিরোধটাকেই সে বড় করে দেখে। তার কাছে ব্রহ্মের সত্তার সঙ্গে শক্তির, স্থাণুত্বের সঙ্গে স্ফুরত্তার, অদ্বৈত-স্বভাবের সঙ্গে স্বাভাবিক বহুত্বের, পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ চিরকাল লেগেই আছে। কি করে অনন্তস্বরূপ জগৎরূপে পরিণত হলেন, শাশ্বত-সদ্‌ভাবের মধ্যে কি করে কালের কলনা দেখা দিল—তা তলিয়ে বুঝতে এই সান্ত বুদ্ধি ও সীমিত ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্যকে ছাড়িয়ে যেতে হবে এক বিশাল বুদ্ধি ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়সংবেদনের রাজ্যে। সেখানে আনন্ত্যচেতনার জ্যোতিঃ-সম্পাতে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অনুষিক্ত হলে, অনন্তের ন্যায়-যুক্তির রহস্য তাদের কাছে উন্মোচিত হবে। সে-ন্যায়ের বিধান শুদ্ধ-সন্মাত্রের স্বভাবের 'নয়'—তার মধ্যে তাঁর তত্ত্বভাবের স্বতঃপ্রবর্তনার অনতিবর্তনীয় পরম্পরা আছে। তাই তার অবয়বস্থাপনায় ফুটে ওঠে সন্মাত্রের পর্বে-পর্বে উন্মেষের দ্যোতনা—প্রাকৃত-মনের পঞ্চাবয়বী যুক্তির শৃঙ্খল নয়।

কিন্তু এরও পরে তর্ক উঠবে : এপর্যন্ত যা বলা হল, সে তো বিশ্বচেতনার বিবরণ মাত্র—নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে তারও ওপারে। কোনও উপাধি বা বিশেষণ দিয়ে তাঁকে সীমিত করা যায় না। কিন্তু জীব ও জগতের ভাবনায় ব্রহ্ম যখন সীমিত ও খণ্ডিত হন, তখন জীব-জগৎ অবশ্যই মিথ্যা।...নির্বিশেষকে বিশেষিত করা যায় না—এ-উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বটে। রূপ বা অরূপ, একত্ব বা বহুত্ব, স্থাণুস্বভাব বা জঙ্গমভাব—তাঁর 'পরে এসব কোনও বিশেষণেরই আরোপ চলে না। অর্থাৎ তিনি রূপের বিসৃষ্টি করলেও রূপ তাঁকে সীমিত করে না। বহু-রূপে প্রকাশ হলেও বহুত্ব তাঁকে খণ্ডিত করে না। তাঁর স্পন্দলীলাতেও তিনি অক্ষুব্ধ, সম্ভূতিতে নির্বিকার। আত্মবিসৃষ্টিতে যেমন তিনি ফুরিয়ে যান না, তেমনি সীমার বাঁধনেও সঙ্কুচিত হন না। বিভূতি-বিস্তরেও যে তত্ত্বভাব নিঃশেষিত হয় না, এ শুধু ব্রহ্মস্বভাবের সত্য নয়—জড়েরও সত্য তা-ই। মৃত্তিকা ঘটের নির্মাণে সীমিত হয় না, বায়ুর প্রবাহে বায়ুর স্বরূপহানি ঘটে না, তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত উল্লাসেও সমুদ্রের বন্ধন নাই। সীমার সঙ্কোচ দেখে শুধু আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় এবং মন। কেননা, সান্তকে অনন্ত হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে বা সীমায় ঘিরে তারাই তাকে স্বাতন্ত্র্যের একটা মর্যাদা দেয়। অতএব প্রাকৃত-বুদ্ধির এই কল্পনাই সত্যকার মায়া—নইলে অনন্তের মায়া নয়, সান্তও মায়া নয়। কারণ, অনন্ত বা সান্তের স্বরূপ-সত্তা ব্রহ্মেরই আশ্রিত—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কি মনের আশ্রিত নয়।

ব্রহ্ম অবাঙ্মানসগোচর। তাঁর দিকে খোলা আছে শুধু স্বানুভবের পথ। এই স্বানুভবেরও বৈচিত্র্যের সীমা নাই। সমস্ত অস্তি-ভাবের নিঃশেষ প্রতি-ষেধ দ্বারা তাঁকে যেমন অনির্বচনীয় অনন্ত সর্বশূন্য পরম অসৎ-রূপে পাওয়া যায়, তেমনি আবার তাঁকে পাওয়া যায় আমাদেরই অস্তি-ভাবের সকল মৌল-বিভূতির চরম চমৎকারে। তখন সব-কিছুরই পরম তিনি : তিনি পরম জ্ঞান, পরম জ্যোতি, পরম ভাব, পরম কান্তি—তিনিই পরম শক্তি, অথবা পরম শান্তির অক্ষোভ্য নৈঃশব্দ্য। আবার শুদ্ধ-সৎ শুদ্ধ-চিৎ শুদ্ধ-আনন্দ বা শুদ্ধ-শক্তির অনির্বচনীয় পরমসংবেদনেও পাই তাঁর পরিচয়। অথবা কখনও ডুবে যাই পরা সংবিতের সেই অনুত্তর গহনে, যেখানে আছে সর্বভাবের অনির্বাচ্য অদ্বৈতসমন্বয়ে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের পরম প্রত্যয়। এই অনুপাখ্য স্থিতিতে, শুদ্ধ-সন্মাত্রের এই অতলান্ত জ্যোতির্গহনে অতিচেতনার দুয়ার ঠেলে আমরা উপনীত হতে পারি নির্বিশেষের উপান্তভূমিতে।...স্বানুভবের এমনধারা কত বৈচিত্র্য। অথচ প্রচলিত ধারণা এই যে, ব্রহ্মকে একমাত্র জীবত্ব ও জগদ্‌ভাবের নিরাকৃতিতেই জানা যায়। কিন্তু সত্য বলতে জীবের পুরুষার্থ শুধু ক্ষুদ্র বিবিক্ত অহং-ভাবের নিরাকরণ। তার ফলে জীবত্বের চিন্ময় উত্তরা-য়ণদ্বারা জগৎকে আত্মসাৎ ও অতিক্রম করে ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের মহাগহনে সে

অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। অথবা তার পথ হতে পারে নিরোধের কি আত্মো-চ্ছেদের পথ। কিন্তু সে-নিরোধ জীবেরই সাধ্য, কেননা স্বোত্তরভূমির আক-র্ষণে জীবই তো ঝাঁপিয়ে পড়ে একান্ত-নির্বিশেষের অনুভবে।...আবার উত্তরা-য়ণের সাধনায় আত্মভাবকে পরা সত্তায় বা অতিসত্তায়, আত্মচৈতন্যকে পরা চেতনায় বা অতিচেতনায়, আত্মানন্দকে আনন্দের পরমোল্লাসে বা আনন্দের অতিভূমাতে উত্তীর্ণ করেও জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধ হতে পারে।...চেতনার উদয়নে বিশ্বচিতে আবিষ্ট হয়ে এবং আত্মচেতনাদ্বারা তাকে জারিত করে এক লোকোত্তর ভূমিতে উভয়কে সে উত্তীর্ণ করতে পারে। সে-ভূমিতে ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট—পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত এবং উভয়েরই ব্যষ্টিভাবনার বিশেষণ হতে নির্মুক্ত হয়ে অদ্বৈতভাবে সমাহিত। তাই সেখানে এক ও নানার দ্বন্দ্ব বিগলিত হয়ে যায় সৌষম্যের বৃহৎসামে, ফুটে ওঠে নিত্যসৃষ্টির সহস্রদল লীলার কমল—তাদাত্ম্যভাবনা ও অন্যোন্যভাবনার স্ফুরৎ-বীর্য সাম-রস্যের চরমকোটিতে হয় উল্লসিত! ইতি-ভাবের সাধনায়, নিত্যসৃষ্টির এই পরমা স্থিতিই আছে নির্বিশেষ অনুভবের উপান্ত্যতম ভূমিতে। নেতি-ভাব বা ইতি-ভাবের চরম প্রত্যয়ে, কত বিচিত্র উপায়ে যে অক্ষরব্রহ্মের অনুভব সম্ভব—প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সে একটা প্রহেলিকা। কিন্তু এ-রহস্য প্রাঞ্জল হতে পারে তার কাছে, যদি সে স্বীকার করে : অস্তিত্বের প্রাকৃত অনুভব ও সংস্কারকে ছাড়িয়ে বহু ঊর্ধ্বে রয়েছে ব্রহ্মের পরম সদ্‌ভাব। তাই অস্তিত্বের প্রতিষেধ-দ্বারা অথবা অসতের প্রত্যয় ও অনুভব দ্বারা আমরা তাঁকে স্পর্শ করি যেমন, তেমনি তাঁকে পাই চরম ইতি-ভাবনার প্রত্যয় দিয়েও। কেননা, বিশ্বে যা-কিছু আছে, প্রকাশের তারতম্যসত্ত্বেও সবই সেই তৎস্বরূপ, তিনিই সবার পরাৎপর তত্ত্ব। আমরা যাকে সৎ বা অসৎ বলি, সে-সবার মধ্যে অন্তর্যামী আত্মারূপে অনুস্যূত হয়েও তিনি সর্বোত্তীর্ণ। তাই তাঁকে বলি অনুপাখ্য 'কিং স্বিদ্'।

ব্রহ্মই পরমার্থ-সৎ—এই আমাদের মূল সিদ্ধান্ত। তারপরে প্রশ্ন হয়, যা-কিছু আমাদের অনুভবগোচর, সে কি সৎ না অসৎ? দার্শনিক বিচারে কখনও সদ্‌ভাব আর অস্তিত্বের মাঝে একটা পার্থক্যের কথা ওঠে। ধরা হয় সদ্‌ভাব বাস্তব, কিন্তু অস্তিত্ব বা তার ভান অবাস্তব। কিন্তু একথা টেকে, যদি 'অজঃ শাশ্বতঃ' এবং জাত-ভূতের মধ্যে একটা আত্যন্তিক বিচ্ছেদ থাকে। তখন অব্যক্ত-সৎকেই বলতে পারি একমাত্র বাস্তব তত্ত্ব। কিন্তু যা-কিছু 'অস্তি', তা যদি হয় সদ্-বস্তুরই আত্মোপাদানের রূপায়ণ, তাহলে আর এ-সিদ্ধান্ত টেকে না। 'অস্তি' যদি হত শূন্য হতে ব্যক্ত অসতের একটা রূপ, তাহলে তাকে অবস্তু বলা চলত। অস্তিত্বের যে-বিভিন্নভূমি অতিক্রম করে আমরা ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবে অবগাহন করি, তারাও সত্য—কেননা অসত্য এবং অবস্তু কখনও বস্তু-সিদ্ধির সরণি হতে পারে না। তেমনি যা ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত,

যা তাঁর শাশ্বত সদ্ভাব দ্বারা বিধৃত ও জারিত হয়ে স্বগত আধারে বিসৃষ্ট, তারও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। অব্যক্ত যেমন আছে, তেমনি আছে ব্যক্ত ভাবও। কিন্তু বস্তুর ব্যক্ততা কোনমতেই অবস্তু হতে পারে না। কালাতীত নিত্যস্থিতি আছে, আবার আছে কালের কলনা। কিন্তু কালাতীত তত্ত্বে যার মূল নিহিত নয়, কালে তার আবির্ভাবও অসম্ভব। আত্মার চিৎস্বভাব যদি আমার তত্ত্ব হয়, তাহলে চিত্তের বিভূতিরূপে আমার মধ্যে যে ভাবনা বেদনা প্রভৃতি বিচিত্র বৃত্তির প্রকাশ, তারাও তাত্ত্বিক। এমন-কি আমার যে-দেহ আত্মার বিগ্রহ ও আবাসস্বরূপ, তাকেও অসৎ কি অবাস্তব ছায়ার মায়া বলতে পারি না।...এসব বিরোধাভাসের একমাত্র সুসংগত ব্যাখ্যা এই যে, কালাতীত নিত্যতা আর কালাবিচ্ছিন্ন নিত্যতা এক শাশ্বত ব্রহ্ম-সদ্ভাবেরই দুটি বিভাব। বাস্তবতার বিভিন্ন ভূমিতে দুটি বিভাবই সত্য। কালাতীতে যা অব্যক্ত, তা-ই কালে অভিব্যক্ত। যা-কিছু আছে, বিসৃষ্টির বিশিষ্ট পর্বে বাস্তব হয়েই তা আছে এবং অনন্তের চেতনাতেও ফুটে আছে তার সেই বাস্তবতারই রূপ।

বিসৃষ্টিমাত্রেই যে সত্তার বিভূতি শুধু, তা নয়। চৈতন্য ও চিৎ-শক্তির তারতম্যেও তাদের ধর্মের তারতম্য ঘটে, কেননা সত্তার ভূমি নিরূপিত হয় চৈতন্যের ভূমি দিয়েই। এমন-কি অচিতিও সংবৃতচেতনারই বিশেষ একটা ভূমি ও বিভূতি—যার মধ্যে সত্তা অন্তর্লীন হয়ে আছে অসৎকল্প অব্যক্ত-ভাবের কুমেরুপ্রান্তে, যাতে এই তমিস্রা থেকে জড়বিশ্বের অন্তর্গত সব-কিছুর অভিব্যক্তি হতে পারে। অতিচেতনার মধ্যে চেতনা তেমনি পর্যবসিত হয়েছে শুদ্ধ-সন্মাত্রের নির্বিশেষ প্রত্যয়ে। এমন অতিচেতন ভূমিও আছে, যেখানে চেতনা যেন আত্মসংবিৎ হারিয়ে সমাহিত হয়েছে পরা সত্তার জ্যোতির্গহনে। সেই গভীর হতে অথবা তারই মধ্যে আবার জাগে সত্তার সংবিৎ- ও সন্ধিনী-শক্তির উল্লাস, জাগে বিজ্ঞান ও আত্মদর্শনের জ্যোতির্মহিমা। এই উন্মেষে মনে হতে পারে, তার তত্ত্বভাবের বুঝি ন্যূনতা ঘটল। কিন্তু বস্তুত অতি-মানসভূমিতে অতিচেতনা আর চেতনা একই তত্ত্বের স্বরূপ এবং সাক্ষী। অতএব পরম-শিবের আত্মবিমর্শে স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা কোথায়?...আবার এমন পরাৎপর ভূমিও আছে, যেখানে সত্তা আর চৈতন্যে কোনও বিশেষ নাই—যেহেতু তার মধ্যে দুইই পরমসামরস্যে বিগলিত। কিন্তু সত্তার এই অনুত্তর নিত্যস্থিতিতে সন্ধিনী-শক্তির পরম উল্লাস, অতএব সংবিৎ-শক্তিরও নিত্য-বিচ্ছুরণ আছে—কেননা সন্ধিনী- আর সংবিৎ-শক্তি এখানে একাত্মক ও অবি-নাভূত। শাশ্বতসত্তা ও শাশ্বতচেতনার এই যুগনদ্ধ স্থিতিই পরমেশ্বরের পরমধাম, আর তার স্বরূপ-বীর্য নির্বিশেষের সৃষ্টি-সামর্থ্য। এই স্থিতি চরিষ্ণু জগতের প্রতিষেধ নয়। নিখিল বিশ্বভাবনার স্বরূপ ও বৈভব এরই মধ্যে অন্তর্নিহিত।

তবু জগতে অবাস্তবতা বলেও তো একটা-কিছু আছে। সবই ব্রহ্ম অতএব সদ্‌বস্তু যদি, তাহলে তার মধ্যে এই অবাস্তবতার বোধ কোথাহতে আসে? অবস্তু যদি সত্তার বিভাব নাও হয়, তবু সে চেতনার বৃত্তি কি বিভূতি তো বটেই। তাহলে চেতনার এমন-কোনও ভূমি বা পরিণাম কি নাই, যেখানে তার বৃত্তি ও বিভূতি পূর্ণত অথবা অংশত অবাস্তব? এই অবাস্তবতার বোধকে অনাদি প্রপঞ্চবিভ্রম বা মায়ার ধর্ম বলে না মানলেও জগতে বিভ্রম উৎপাদন করবার শক্তি অবিদ্যার যে আছে, একথা অনস্বীকার্য। দেখছি, যা অবাস্তব তাকে কল্পনা করবার শক্তি মনের আছে। এমন-কি যা বাস্তব নয়, অন্তত পুরাপুরি বাস্তব নয়, তাকে সৃষ্টি করবার সামর্থ্যও তার আছে। নিজের বা বিশ্বের রূপও তো তার কাছে একটা বিকল্প মাত্র, যাকে পুরাপুরি-বাস্তব বা অবাস্তব কোনও পর্যায়েই ফেলা চলে না। কোথায় এই অবস্তু-বোধের আদি, কোথায়-বা তার অন্ত—কিই-বা তার নিমিত্ত? নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক উভয়ের উচ্ছেদেরই-বা কি ফল? সমগ্র জগদ্‌ভাব স্বরূপত অবাস্তব নাও হতে পারে। কিন্তু এই-যে অবিদ্যার জগৎ জুড়ে চলছে জন্ম ও মরণ সন্তাপ ও ব্যর্থতার নিত্য আবর্তন, তাকে কি অবাস্তব বলতে পারি না? অবিদ্যার ধ্বংসে তার সৃষ্ট এই জগতের বাস্তবতাও কি আমাদের চেতনায় লোপ পায় না? এবং এই জগৎ-জাল হতে নির্গমনই কি আমাদের একমাত্র স্বাভাবিক কৃত্য নয়?...একথা সত্য হত, যদি অবিদ্যা শুধু অজ্ঞানের শক্তি হত—তার সঙ্গে সত্য বা জ্ঞানেরও খানিকটা উপাদান জড়িয়ে না থাকত। কিন্তু আমাদের ব্যাবহারিক চেতনায় বস্তুত রয়েছে সত্য ও মিথ্যার একটা সংমিশ্রণ। তার বৃত্তি ও বিভূতিকে নিছক কল্পনা কি অমূলক একটা কৃতি বলা চলে না। তার সৃষ্টি ও রূপায়ণকে অথবা তার বিশ্বকল্পনাকে তত্ত্ব-অতত্ত্বের মিশ্রণ না বলে বরং বলতে পারি তত্ত্বের অর্ধবোধ ও অর্ধপ্রকাশ। আবার চৈতন্যমাত্রেই শক্তি। অতএব তার মধ্যে সৃষ্টির সামর্থ্য আছে। সুতরাং অবিদ্যাচৈতন্যেও বিকৃত সৃষ্টি ও বিকৃত স্ফুরণের সংবেগ আছে—স্বরূপশক্তির ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রয়োগ বশত বিকর্মে প্রবৃত্তি আছে। সমস্ত জগৎটাই একটা বিসৃষ্টি। কিন্তু তার মধ্যে আমাদের অবিদ্যা একটা খণ্ডিত সংকীর্ণ ও অজ্ঞানোপহত বিসৃষ্টির প্রযোজক। তাই তার সৃষ্টি অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রথম ধর্মকে খানিকটা প্রকাশ ক'রে আবার খানিকটা আচ্ছন্ন করেছে। এই ব্যবস্থাই যদি চিরকাল কায়েম থাকত, অবিদ্যার চক্রে আবর্তিত হওয়াই যদি জানতাম বিশ্বের নিয়তি, অথবা অংশত-অবিদ্যা যদি একটা প্রত্যয় ও পরিবেশের সৃষ্টি না করে নিখিল বস্তু ও ক্রিয়ার হেতু হত—তাহলে সংসার হতে জীবের নিষ্ক্রমণকেই বলতাম অবিদ্যা-নিবৃত্তির একমাত্র সাধন এবং মূলা অবিদ্যার নিবৃত্তিতে সংসারেরও উচ্ছেদ হত। কিন্তু অবিদ্যা যদি হয় পূর্ণবিদ্যার দিকে অভিযাত্রী

অর্ধবিদ্যা মাত্র, তাহলে জড়প্রকৃতির কবলিত এই জীবনের দিগন্তে ফুটে ওঠে আরেক চিন্ময়ী উষার অরুণিমা, এক মহত্তর সম্ভাবনার দ্যোতনা। তখন আসন্ন প্রভাতের সূচনায় এই সাময়িক আঁধারেরও একটা সার্থকতা অনস্বীকার্য হয়।

আমাদের অবাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে আরেকটা কথা ভাববার আছে, নইলে অবিদ্যার সমস্যাটাকে আমরা হয়তো ঘুলিয়ে ফেলব। আমাদের মন—অন্তত তার একটা অংশ—বাস্তবকে যাচাই করে ব্যবহারের মাপকাঠিতে। তার কাছে তথ্য বা ভূতার্থের সত্যই বড়। তার দৃষ্টিতে তথ্যই একমাত্র তত্ত্ব। কিন্তু এই তথ্যভাব বা ভূতার্থের তত্ত্বভাবের চারপাশে সে জড়বিশ্বের অন্তর্গত এই পার্থিব-অস্তিত্বের সীমার রেখা টেনে দেয়। অথচ পার্থিবজীবন বা জড়ের জগৎ একটা আংশিক বিসৃষ্টি মাত্র। তার মধ্যে পরমার্থ-সতের অনন্ত ভব্যার্থের একটিমাত্র ব্যূহ ভূতার্থের রূপ ধরেছে। এখানে বা এখনও মূর্ত হয়ে ওঠেনি, এমন অন্যান্য ব্যূহের তাতে নিরাকৃতি হয় না। কালকলিত বিসৃষ্টিতে নতুন ধারায় তত্ত্বের অভিব্যক্তি হতে পারে। সত্তার যে-সত্য আজও মূর্ত হয়নি, তার অঙ্কুরিত সম্ভাবনা ভূতার্থের রূপে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে জড়ের জগতে—এমন-কি এই পৃথিবীতে। আবার জড়াতীত ভূমির এমন সত্যও আছে, যারা বিসৃষ্টির অন্য-কোনও কল্পের অন্তর্গত। এখানে তাদের রূপ না ফুটলেও তারা অবাস্তব নয়। এমন-কি কোনও বিশ্বেই যা বাস্তব নয়, সত্তার এমন-কোনও সত্য অব্যক্তের মধ্যে বীজরূপে লীন থাকতেও পারে। আজও সে মূর্ত হয়নি বলে তাকে কোনমতেই অবাস্তব বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনের অন্তত একটা অংশ এখনও ব্যবহারের সংস্কারে আচ্ছন্ন রয়েছে। তার কাছে তথ্য অথবা ভূতার্থই হল তত্ত্ব, তার বাইরে সব-কিছুই অতত্ত্ব। অতএব এই মনের দৃষ্টিতে একধরনের নিছক ব্যাবহারিক অবাস্তবতা আছে। অর্থাৎ তার মতে, কোনও রূপসৃষ্টি তত্ত্বত মিথ্যা না হলেও এ-জগতে যদি তার মূর্ত সত্তা না থাকে, কিংবা তাকে বর্তমান পরিবেশে কি জীবনের বস্তুস্থিতিতে মূর্ত করে তোলা আমাদের সাধ্যাতীত হয়, তাহলে সে-রূপ অবাস্তব। কিন্তু একে অবাস্তবতার যথার্থ লক্ষণ বলা চলে না, কেননা এক্ষেত্রে বাস্তবতা অসৎ নয়—অসিদ্ধ মাত্র। এখানে সত্তার ব্যভিচার নাই, আছে শুধু বর্তমান বা বিজ্ঞাত তথ্যের ব্যভিচার।...এছাড়া আরেকধরনের অবাস্তবতা আছে, যার মূলে রয়েছে মানসপ্রত্যয় বা ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানের বিপর্যয়। সেখানে মন ও ইন্দ্রিয় তত্ত্বকেই দেখে, কিন্তু অবিদ্যাকৃত সঙ্কোচের বশে চেতনার বৃত্তি একটা মিথ্যা রূপের সৃষ্টি করে। এখানেও সত্তার ব্যভিচার নাই, অতএব একেও অবাস্তব বলতে পারি না। অবশ্য আমাদের ব্যাবহারিক চেতনার ভূমিতে এইধরনের অবিদ্যা-জনিত বিভ্রমের প্রশ্ন তত গুরুতর নয়। আসল প্রশ্ন হল, আমাদের জীব-

চেতনা ও সংসারচেতনার মূলে যে-বিপর্যয় রয়েছে তাকে নিয়ে। অর্থাৎ তুলা-অবিদ্যার সমস্যা নয়, মূলা-অবিদ্যার সমস্যার সমাধান চাই। কারণ স্পষ্ট দেখছি, আমাদের সমগ্র জীবনদর্শনের 'পরে আমাদের অনুভবের সকল ক্ষেত্রে যে সংকুচিত চেতনার ছায়া পড়েছে, সে যে শুধু আমাদেরই জীবধর্মের বৈশিষ্ট্য তা নয়—মনে হয় নিখিল জড়সৃষ্টির মূলেও এই অবিদ্যার প্রেতি আছে। তত্ত্বের অখণ্ডদর্শন যে অনাদি পরা সংবিতের স্বধর্ম, তার প্রবৃত্তি এখানে কুণ্ঠিত। তার জায়গায় দেখা দিয়েছে সংকুচিত চেতনার খণ্ডদর্শন, অসমাপ্ত সৃষ্টির পঙ্গু বৈকল্য, অথবা অর্থহীন ক্ষণভঙ্গের আবর্তে সৃষ্টিচক্রের নিরন্ত আবর্তন। বিশ্বকে বিভ্রম না বলে যদি বিসৃষ্টি বলে মানি, তবু আমাদের চেতনা শুধু তার একদেশকে বা খণ্ড-খণ্ড অবয়বকেই দেখে এবং তাকেই বিবিক্তসত্ত্বের মর্যাদা দেয়। আমাদের সমস্ত বিভ্রম ও প্রমাদের মূলে আছে এই সংকুচিত ও বিবিক্ত সংবিতের ছলনা—যা হয় অবস্তুকে সৃষ্টি করে, নয়তো বস্তুকে বিকৃত করে। সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন দেখি, শুধু আমাদের চেতনাই নয়, আমাদের চেতনার রঙ্গভূমি এই জড়জগতেরও আবির্ভাব হয়েছে অনাদি-সৎ কোনও চিন্ময়তত্ত্ব হতে নয়—আপাত-অসৎ এবং অচিৎ একটা-কিছুর সাক্ষাৎ প্রবর্তনা হতে। এমন-কি আমাদের অবিদ্যাও যেন এই অচিতিরই একটা আয়স্ত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য পরিণাম মাত্র।

তাহলে সমস্যাটা হল এই। ব্রহ্মের অসীম সংবিৎ-শক্তি এবং অখণ্ড সন্ধিনী-শক্তিতে কোথাহতে এই সীমার বেষ্টন ও খণ্ডভাবের বিপর্যয় এল? কি করে এ সম্ভব হতে পারে—এ যেমন একটা রহস্য, তেমনি সম্ভব হলেও এর তাৎপর্যই-বা কি, ব্রহ্মের তত্ত্বভাবের সঙ্গে এর সঙ্গতিই-বা কোথায়—এও আরেকটা রহস্য। অতএব বিশ্বরহস্যের সমাধানে অনাদিবিভ্রমের প্রশ্নটা মুখ্য নয়—আসল প্রশ্ন, অবিদ্যা ও অচিতি এল কোথা হতে? অনাদি-চিৎ বা অতি-চিতের সঙ্গে বিদ্যা ও অবিদ্যার সম্বন্ধই-বা কি?

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যা ও অবিদ্যা

চিত্তিমচিত্তিং চিনবদ্ বি বিদ্বান্।

ঋগ্বেদ ৪।২।১১

চিত্তি এবং অচিত্তিকে আলাদা করে চয়ন করুন বিদ্বান।

—ঋগ্বেদসংহিতা (৪।২।১১)

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোহন্যঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।১

বিদ্যা আর অবিদ্যা—দুটিই নিহিত আছে অনন্তের গহনে; কিন্তু তার মধ্যে অবিদ্যা ক্ষরস্বভাব আর বিদ্যা অমৃতস্বরূপ; আবার বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়ের ঈশ্বর যিনি, তিনি আরেকজন।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫।১)

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।...

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১।৯

জ্ঞ এবং অজ্ঞ—দুজনেই জন্মরহিত; তাঁদের একজন ঈশ্বর আরেকজন অনীশ্বর : আরও আছে জন্মরহিতা একজন—তারই মধ্যে আছে ভোক্তা এবং ভোগার্থ।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।৯)

ঋতায়িনী মায়িনী সং দধাতে মিত্বা শিশুং জজ্ঞতুর্বর্ধয়ন্তী।...

ঋগ্বেদ ১০।৫।৩

ঋতায়িনী আর মায়িনী দুটিতে আছে যুক্ত হয়ে; শিশুকে নির্মাণ ক'রে জন্ম দিল তারা, করল তাকে সংবর্ধিত।

—ঋগ্বেদ (১০।৫।৩)

ইতিপূর্বে দেখেছি, নিখিল অস্তিত্বের মূলে রয়েছে সাতটি তত্ত্ব—যারা স্বরূপত এক অখণ্ডসত্যের লীলায়ন। দেখেছি : জড় চিৎসত্তারই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভাব মাত্র—চৈতন্যের আত্মরূপায়ণের সে উপাদান, তার স্ব-সংবিতের আলোকে ফুটেছে তার রূপ। যে-প্রাণশক্তি নিজেকে জড়ে রূপায়িত করছে, যে-মনশ্চেতনা প্রাণশক্তিরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করছে, যে-অতিমানস মনকে নিজের বীর্যবিভূতির আকারে সৃষ্টি করছে—সবাই তারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আত্মবিভাবনা। স্বরূপধাতুর আপাতিক প্রতিভাসে এবং ক্রিয়াশক্তির পরিস্পন্দে তাদের মধ্যে চিৎসত্তার বিপরিণাম ঘটছে, কিন্তু সে-বিপরিণাম তাঁর তত্ত্বস্বরূপকে স্পর্শও করছে না। জড় প্রাণ মন ও অতিমানস এক অখণ্ড সন্ধিনীশক্তিরই বিচিত্র বীর্য, এক সর্বসৎ সর্বচিৎ সর্বক্রতু ও সর্বানন্দেরই বিলাস—

কেননা সমস্ত প্রতিভাসের পরমার্থ-তত্ত্ব হল ওই সর্বময় অখণ্ড-অন্বয় সত্যের চিদাবেশ। শুধু-যে তারা স্বরূপত এক, তা নয়। আত্মবিভূতির সপ্তধা-বৈচিত্র্যেও তারা পরস্পর ওতঃপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে। সাতটি তত্ত্ব যেন পরা সংবিতের অনন্ত শুক্রজ্যোতির সাতটি বর্ণচ্ছটা। অস্তিত্বের মহাকাশে বিচ্ছুরিত আত্মমায়ার এই বর্ণরীতিতে রচিত তাঁর অপরূপ চিতি-পট—যার মধ্যে দেশ ও কালের টানা-প'ড়েনে তিনি বুনে চলেছেন সাতটি মৌলিক বর্ণালির সমবায়ে খচিত অনন্ত-বিচিত্র রূপের পসরা। বৃহৎসামের ছন্দে গাঁথা তাঁর এই আত্মরূপায়ণের পূর্ব্যব্রত 'ধর্মাণি যা প্রথমান্যাসন্'। সেই সুরের আভোগে আবার ঝঙ্কৃত হল অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের মূর্ছনা—বিচিত্র শক্তির বিচিত্রতর সম্বন্ধ ও পরিণামের ব্যতিহারে এই অনির্বচনীয় সুরসংগতির রহস্য হয়ে উঠল আরও নিবিড়। অস্তিত্বের এই সুরসপ্তককে ঋষিরা বলেছেন সপ্ত বাক্, যার আলোকের অপূর্ব সুষমায় ফুটে উঠেছে ব্যক্ত ও অব্যক্ত লোকরাজির উন্মিষন্ত শতদল। আবার এই আলোকেরই মায়াঞ্জন চোখে মেখে আমাদের নিতে হবে জানা ও অজানার গোধূলিরাগে ছাওয়া নিখিল বিশ্বলোকের মর্মপরিচয়।...একই বাণী, একই জ্যোতি—কিন্তু সপ্তধা বিচ্ছুরিত তার দিব্যক্রতু।

অথচ এখানে দেখছি অচিতিই যেন ব্যক্তজগতের মূল। চেতনাকে দেখছি বিদ্যার অভীপ্সায় বিধুর নচিকেতার রূপে। কিন্তু পরমার্থসতের আত্মস্বরূপে অথবা তাঁর সপ্তধা-ক্রতুতে অবিদ্যার এই প্রাদুর্ভাবের কোনও তাত্ত্বিক হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। বৃহৎসামের মধ্যে কোথাহতে এল এই অসাম, আলোর মধ্যে এই আঁধার, তাঁর চিন্ময়ী সিসৃক্ষার অন্তহীন রসোল্লাসে এই খণ্ডভাবনার কার্পণ্য? আমাদেরই কল্পনায় যদি বৈরাজসামের এক মহাসংগীতি ভেসে আসে যাকে এইসব বিবাদী সুরের বিসংবাদ ছুঁয়েও যায়নি, তাহলে দিব্য-পুরুষের কল্পনাতেই-বা তা জাগবে না কেন? আর কল্পনা থাকলে বস্তুভূত অথবা অভিপ্রেত সৃষ্টির আকারে কোথাও তার সিদ্ধরূপও আছে। এই দিব্যসম্ভূতির কথা বৈদিক ঋষির অগোচর ছিল না। মর্ত্যের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁরা সত্তা ও চেতনার নির্বারিত প্রমুক্তির এক বৃহত্তর ক্ষেত্ররূপে একে অনুভব করেছিলেন। স্বপ্রকাশের এই জ্যোতির্ময় অব্যক্তকে তাঁরা বলেছেন—'সদনম্ ঋতস্য', 'ঋতস্য স্বে দমে', 'ঋতস্য বৃহতে', 'ঋতং সত্যং বৃহৎ'। সেখানে আদিত্যের ঋতায়নের চরমধামে সত্যেরই হিরণ্যদ্যুতিতে সংবৃত রয়েছে সত্যের রূপ। চেতনার সহস্র রশ্মি ব্যূহিত হ'লে 'তদ্ একং'-রূপে ফোটে সেখানে দিব্য-পুরুষের পরম প্রকাশ। আবার তাঁদের অনুভবে: সত্যানৃতের মিথুনে এ-জগতের জাল বোনা, তার মধ্যে ঋতের স্ফুরণ 'ভূরি অনৃত' দ্বারা পরিভূত। 'অপ্রকেত সলিল' হতে, অনাদি অন্ধতামিস্রা হতে বিপুল স্বধার বীর্যে এখানে হয় অদ্বিতীয় জ্যোতির জন্ম। অমৃত ও দেবত্বের অধিকার এখানে ছিনিয়ে আনতে হয় মৃত্যু

অবিদ্যা সন্তাপ দৌর্বল্য ও কার্পণ্যের বন্ধমুষ্টি হতে। আনন্ত্যের যে-ঋত-সুষমা শাশ্বত সিদ্ধির অকুণ্ঠ মহিমায় অসীম দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত, এই আধারেই তার লোকোত্তর অভিব্যঞ্জনাকে তাঁরা জেনেছিলেন মানুষের আত্ম-রূপায়ণের তপস্যা বলে।...চেতনার অবরভূমি তার উত্তরভূমির প্রথম সোপান। আঁধার বস্তুত আলোকেরই ঘনবিগ্রহ। অচিতির মধ্যেই গুহাহিত হয়ে আছে অতিচিতির স্বরূপবীর্য। খণ্ডবোধ ও অনৃতচেতনার যে-বঞ্চনা, সে আছে শুধু আমাদের উদ্দীপ্ত পৌরুষ অবচেতনার অতলগহন হতে ঋতম্ভরা অদ্বৈত-চেতনার ঋদ্ধিকে ছিনিয়ে আনবে বলেই। ভাবকের রহস্যময় সন্ধাভাষায় প্রাচীন ঋষিরা এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। বাস্তবের দীনতালাঞ্ছিত মানুষের 'দেবায় জন্মনে' এই-যে অনির্বাণ আকূতি, তার আর কোনও তাৎ-পর্য থাকতে পারে না। এই অনৃতকবলিত জগতে কোথাহতে এল তার ঋত-প্রতিষ্ঠার সংশয়হীন কল্পনা, তার অশাশ্বত চেতনার ক্ষীণ খদ্যোতিকায় কি করে জ্বলে উঠল দৈবী অভীপ্সার লেলিহান শিখা—যদি দিব্যজীবনের সিদ্ধি বিশ্বের কোথাও শাশ্বত না হয়ে থাকবে আনন্দ অমৃত বিদ্যা ও বীর্যের উপচয়ে ?

বাস্তবিক লোকসৃষ্টির আদর্শ সার্থক হতে পারে অখণ্ড অদ্বৈতচেতনার সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য আত্মসংবিতের অকুণ্ঠিত স্বধায় স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু আমরা যে-লোকে আছি, তার মূলে রয়েছে একটা বিপরীতভাবনার সংবেগ। অনাদি অচিতির প্রবর্তনা এখানে প্রাণের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে খণ্ডিত ও সঙ্কুচিত আত্মচেতনার আকারে। এক স্বয়ম্ভূ তামসী শক্তির কাছে আত্মসচেতন জীবের অবশ বশ্যতা আধারে স্বারাজ্য- ও সাম্রাজ্য-সিদ্ধির কৃচ্ছ্রসাধনায় ফুটে উঠছে—অন্ধপ্রকৃতির মূঢ় আবর্তনের মধ্যে সে চাইছে প্রবুদ্ধ চেতনা ও সংকল্পের স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা। মনে হয়, বিশ্বের দিকে-দিকে ছেয়ে আছে এক অন্ধ জড়শক্তির বিপুল বাধা, নিখিল জুড়ে এক দুর্নিবার আদিমনিয়তির মূঢ় সংবেগ (যদিও এখন জানি, আমাদের এ-আশংকা নিরাধার)। আর তার প্রতিস্পর্ধিরূপে দেখা দিয়েছে আমাদেরই প্রবুদ্ধ চেতনা ও সঙ্কল্পের ক্ষণিকা, যা সেই অনাদি জড়শক্তির একটা খণ্ডিত পরি-ণাম, তারই প্রশাসনে বিধৃত একটা ক্ষণভঙ্গের লীলা মাত্র। মনে হয় না কি, এ-দুয়ের সংঘাতে অবশেষে জড়শক্তিই সর্বজয়া হবে ? আপাতদৃষ্টিতে অচিতি আমাদের আদি এবং অন্ত। অতএব তার বক্ষ হতে বিচ্ছুরিত চিৎকণকে একটা সাময়িক স্ফুরণ বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। আঁধারের বুকে স্ফুলিঙ্গের দীপ্ত মুহূর্তের মধ্যে আঁধারেই তলিয়ে যাবে—জীবাত্মার হয়তো এই নিয়তি। বিশ্বরূপ অশ্বত্থের ঘন-করাল পল্লবচ্ছায়ায় এ শুধু চকিতে ফুটে-ওঠা ক্ষণিকার মঞ্জরী। অথবা, আত্মা যদি শাশ্বতই হয়, তবু

সে এখানে আগন্তুক মাত্র। তার স্বধাম প্রপঞ্চের অতীত কোনও লোকোত্তর-ভূমিতে—অচিতির রাজ্যে সে শুধু দুদিনের অবাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত অতিথি। অচিতির অন্ধকারে চপলার ক্ষণদীপ্তি যদি সে নাও হয়, তবু তার আবির্ভাবকে বলব একটা বিভ্রম—অতিচেতন দিব্যজ্যোতির একটা অবস্খলন!

তা-ই যদি সত্য হয়, তাহলে চারদিকে এই মূঢ়তা অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে কেবল সে-ই তাল ঠুকে দাঁড়াতে পারে, যে একটা আদর্শের দিব্যোন্মাদ নিয়ে কোন্ লোকোত্তর ভূমি হতে এই মর্ত্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই ধরণীর ধূলিতেই দ্যুলোকের স্বপ্নকে সফল করবার দিব্য প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে কোনও বাধাকেই সে মানবে না বাধা বলে, দিব্যমহিমার অলখদ্যুতি আর অনাহতবাণীই সকল বিক্ষোভের মধ্যে তার চিত্তে জাগিয়ে রাখবে নীরন্ধ্র তপস্যার প্রশান্ত বীর্য।...বাস্তবিক, বুদ্ধিমান মানুষ কোনদিনই এধরনের পাগলামিতে খেপে ওঠে না। গ্রহের ফেরে ওপারের আলেয়ার পিছনে দুদিন ছোটাছুটি ক'রে অবশেষে এ-প্রয়াস যে একেবারে নিরর্থক এই ভেবেই সে আশ্বস্ত হয়। জড়বাদী স্থিরবুদ্ধি। অচিতির অনতিবর্তনীয় শাসনকে মেনে নিয়ে তার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব ভোগৈশ্বর্যের আয়োজন ক'রে সে খুশী। তার সিদ্ধি বিদ্যা ও সুখ যদি ক্ষণস্থায়ী ও খণ্ডিতও হয়, তাতে তার আপত্তি নাই—কেননা সে জানে, মানুষের প্রবুদ্ধ চেতনা ও সংকল্প প্রকৃতির যন্ত্রমূঢ় প্রশাসনকে কৃচ্ছ্রসাধনায় যতটুকু স্ববশে আনতে পারে ততটুকুই তার লাভ। ধর্মবাদী চাইছে দ্যুলোকের আলো। কিন্তু সেও ভাবে, পৃথিবীতে তো সে-আলো ফোটবার নয়। দিব্যকাম দিব্যরতি ও দিব্যপ্রাণের সুধারসে প্লাবিত বৈকুণ্ঠের যে অনাবিল শুভ্রমহিমা, সে তো শাশ্বত হয়ে আছে বিরজার ওপারে। দার্শনিক মরমীয়া জানে, বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ সমস্তই চিত্তের বিভ্রম, অতএব অলক্ষণ নির্বিশেষতত্ত্বে অথবা নির্বাণের মহাশূন্যতায় আত্মবিলোপই মানুষের পুরুষার্থ। দৈবী মায়ায় সম্মোহিত জীব যদি কখনও অবিদ্যাকবলিত এই ক্ষণিকের মেলার মধ্যে দিব্যসম্ভূতির স্বপ্ন দেখে থাকে, তাহলেও তার ভুল একদিন ভাঙবেই। তখন সে আর আলেয়ার পিছু-পিছু ছুটতে চাইবে না।...তবু মানুষ আরেকটা দিকও ভেবেছে। অপরা প্রকৃতির আঁধার আর চিৎসত্তার জ্যোতি যদি একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ হয়, উভয়ের পিছনে যদি 'একং সৎ'এর উদার ও অচল প্রতিষ্ঠা থেকে থাকে, তাহলে দুয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটাবার—অন্তত শ্রুতির রহস্যাখ্যায়িকায় সূচিত সেতুবন্ধনের কল্পনাকে বাস্তবরূপ দেবার প্রয়াস কি একেবারেই অর্থহীন? এমন-একটা সম্ভাবনার প্রতি নিরূঢ় শ্রদ্ধার বশে মানুষ যুগে-যুগে পৃথিবীর বুকে অমরাবতীর স্বপ্ন দেখে এসেছে। মানুষ পূর্ণ হবে, তার সমাজ নিখুঁত হবে, আলোয়ারের জগতে একদিন নেমে আসবেন বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ হতে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে, এই পৃথি-

বীতে প্রতিষ্ঠিত হবে 'সাধূনাং রাজ্যম্' বা জগন্নাথের পুরী, এক নবীন মন্বন্তর নিয়ে আসবে শাশ্বত স্বর্গরাজ্যের সূচনা—যুগে-যুগে এমন-কত স্বপ্নের দেয়ালি মানুষের কল্পনায়। কিন্তু এ-কল্পনার মূলে প্রত্যক্ষ-অনুভবের স্থির প্রত্যয় ছিল না। তাই চিরকাল ভবিষ্যের স্বপ্নদীপ্তি আর বর্তমানের করালছায়ার মধ্যে মানুষের মন দোল খেয়েছে। কিন্তু এ-করালছায়া একেবারে অনপসার্য নাও হতে পারে। এই পার্থিব প্রকৃতির চিন্ময়পরিণাম হয়তো শুধু ভাবকের স্বপ্নবিলাস নয়, হয়তো তার পিছনে আছে মহাশক্তির নিগূঢ় আকূতি। অথচ পরাভব ও কার্পণ্যের গ্লানি মানুষকে বহন করতেই হয়, কেননা জ্ঞাতসারে হ'ক বা অজ্ঞাতসারে হ'ক, একটা স্বরূপনিষ্ঠ দ্বৈতবোধে আজ পর্যন্ত তার চেতনা জর্জরিত। আর এই দ্বৈত-বোধ হতে তার মধ্যে দেখা দেয় চিতি আর অচিতি, দ্যুলোক আর ভূলোক, ব্রহ্ম আর জগৎ, অসীম এক আর সসীম নানা, বিদ্যা আর অবিদ্যার মাঝে অন্যোন্যবিরোধের অনপনেয় ব্যবধান। কিন্তু এতক্ষণ নানাদিক বিচার ক'রে এইটুকু আমরা বুঝেছি, এই বিরোধ-কল্পনার পিছনে রয়েছে আমাদের প্রাকৃত-মনের সংস্কার বা চিরাভ্যস্ত খণ্ডদর্শনের যুক্তি। দেখেছি, আমরা যাকে বলি মাটির পৃথিবী, বৈদিক ঋষির ভাষায় সেও 'অগ্নবাসা হিরণ্যবক্ষাঃ', তারও হৃদয়খানি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'পরমে ব্যোমন্', সেও 'অদিতিঃ কবিঃ', তারও মধ্যে গোপন রয়েছে 'ভুজিষ্যং পাত্রম্'—দিব্যসম্ভোগের সুধাপাত্র। আমাদের এই বর্তমান অবরসত্তাতেই নিহিত রয়েছে তার অতিস্থিতির তত্ত্ব এবং প্রেতি; অতএব নিজেরই উত্তরায়ণ ও রূপান্তরের সংবেগে স্বোত্তরভূমিতে আরূঢ় হয়ে আপন স্বরূপসত্তাকে পূর্ণমহিমায় প্রকট করা তো তার পক্ষে অসাধ্য নয়। তাই অচিতি ও অবিদ্যার সঙ্গে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়শ্রী যে একদিন আমাদেরই অংকগতা হবে, এ-প্রত্যাশা অযৌক্তিক কি?

কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যার সহভাব সম্ভব হল কি করে, সে-প্রশ্নের সমাধান এখনও আমাদের বিচারে স্বচ্ছ হয়ে ওঠেনি। একথা মানি, যে-পরিবেশ হতে আমাদের যাত্রা শুরু, তার মধ্যে রয়েছে চিন্ময় সত্যের সঙ্গে আদর্শগত একটা বিরোধ—আলো-আঁধারের বিরোধের মত। আর, সে-বিরোধের উপাদান যুগিয়েছে আত্মা এবং বিশ্বাত্মা পুরুষের স্বরূপ সম্পর্কে জীবের অজ্ঞান। তারও মূলে রয়েছে বিশ্বগত এক অনাদি অবিদ্যা, আত্ম-সংকোচ হল যার পরিণাম। জীবনকে সে-অবিদ্যা খণ্ডিত সত্তা ও চেতনার ভিত্তিতে গড়েছে, জীবের সংকল্প ও সামর্থ্যের মাঝে টেনেছে বিভাজনের গভীর রেখা, তার অন্তর্জ্যোতিকে করেছে খর্ব, তার জ্ঞানে বীর্যে ও প্রেমে এনেছে খণ্ডতার সংকোচ। তার ফলে আধারে দেখা দিয়েছে অহমিকা, তামসিকতা, শক্তির কুণ্ঠা, জ্ঞান ও সংকল্পের অপপ্রয়োগ, বৈষম্য, দুর্বলতা ও দুঃখতাপ।

দেখেছি, অবিদ্যা জড় ও প্রাণের আশ্রিত হলেও তার মূল কিন্তু মনঃপ্রকৃতিতে। অখণ্ড অমিত চেতনাকে মিত সঙ্কুচিত ও বিশেষিত করে খণ্ডিত করাই হল মনের ধর্ম এবং অবিদ্যারও বীজ এইখানে। কিন্তু মনও তো বিশ্বের একটা মৌলিক তত্ত্ব। সেও তো অন্বয় এবং ব্রহ্মস্বরূপ। সুতরাং তার মধ্যে যেমন খণ্ডন ও বিশেষণের প্রবৃত্তি আছে, তেমনি আছে একত্ব- ও সামান্য-প্রত্যয়ের দিকেও একটা ঝোঁক। মনের এই বিশেষণী বৃত্তিই অবিদ্যার আকারে দেখা দেয়। তখন উত্তরজ্যোতির উৎসমূল হতে বিবিক্ত হয়ে খণ্ডনব্যাপারকেই সে একান্ত করে তোলে। তাতে যে মনের বিশিষ্ট স্বভাবটি শুধু প্রকাশ পায় তা নয়, বিশেষণী বৃত্তির প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতের দরুন জ্ঞানের একটা দিক ছাড়া আর-সব দিক তার দৃষ্টি হতে আড়াল হয়ে যায়। মনের এই বিশেষ-দর্শনের পিছনে একত্বের সামান্যপ্রত্যয় অস্পষ্ট একটা ভূমিকা মাত্র রচনা করে। তাই বিশেষের বিবিক্তজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ক'রে বহু বিশেষকে জোড়া দিয়ে সামান্যজ্ঞানের একটা আভাস রচনা করা ছাড়া তাকে তার ফিরে পাবার আর-কোনও উপায় থাকে না। বিশেষের প্রতি এই ঝোঁক বা অন্যব্যাবৃত্তিই হল অবিদ্যার প্রাণ।

বিশেষের প্রতি ঝোঁক তাহলে চেতনার একটা অসাধারণ বৃত্তি এবং আমাদের জীবনের সমস্ত অনর্থের মূলে আছে তারই প্রবর্তনা। এবার এই অন্যব্যাবৃত্তির সকল তত্ত্ব আমাদের খুঁটিয়ে জানতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে—শুধু তার স্বরূপ- ও নিদান-কথাই নয়, দেখতে হবে কি তার শক্তি ও প্রবৃত্তির ধারা, কোথায় তার চরম পরিণাম এবং কি করেই-বা তার উচ্ছেদ সম্ভব।...বিশ্বে অবিদ্যার ঠাঁই হল কেমন করে? অন্তহীন পরা সংবিতের কোন্ শক্তির লীলায় তাঁর অখণ্ড আত্মচেতনাকে গুণ্ঠিত করে দেখা দিল একান্ত-বিবিক্ত খণ্ডচেতনার এই বিশেষণী বৃত্তি? কোনও-কোনও দার্শনিক* বলেন: এ-জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নাই—কেননা অবিদ্যা বিশ্বের এক অনাদি রহস্য, তার হেতুনিরূপণ অবিদ্যাপ্রসূত বুদ্ধির সাধ্য নয়। আমরা শুধু বলতে পারি, অবিদ্যা আছে এবং এই এই তার কাজ। বিশ্বমূল পরমার্থত সৎ না অসৎ—সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি নিষ্প্রয়োজন। দেখছি, মায়া আছে—অবিদ্যা বা বিভ্রম তার একটা মৌলিক বিভাব। বিদ্যা আর অবিদ্যা

---

* বুদ্ধদেবের মতে জগৎরহস্য অব্যাকৃত থাকাই উচিত। কি করে পঞ্চস্কন্ধের সংযোগে অতাত্ত্বিক আত্মভাবের উদয় হল, তাকে আশ্রয় করে কি করে শুরু হল দুঃখময় সংসারের আবর্তন, এই ভব-চক্র হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কেমন করে—আমাদের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। কর্ম আছে; মিথ্যা সংযোজনবশত নাম-রূপ ও আত্মভাবের কল্পনাই দুঃখহেতু; কর্ম আত্মভাব ও দুঃখ হতে বিমুক্ত হওয়াই আমাদের পুরুষার্থ; এই বিমুক্তি দ্বারা আমরা উত্তীর্ণ হব লোকোত্তর শাশ্বত-ধাতুর অধিকারে; অতএব বিমুক্তিমার্গই আর্যসত্য—এই তাঁর মত।

দুইই ব্রহ্মের মায়াশক্তিতে নিরূঢ় একটা দ্বিদল বিভূতি মাত্র। এই দ্বৈতকে স্বীকার করে বিদ্যার সহায়ে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তার জন্যে বিশ্বের সব-কিছুকে অশাশ্বত জেনে এই মায়ার খেলার অসারতা উপলব্ধি করে জীবন-সন্ন্যাসকেই যদি জীবনের সাধনা করি, তাতেই-বা আপত্তি কি ?

কিন্তু অবিদ্যার প্রশ্নকে এমন করে এড়িয়ে গিয়ে মানুষের মন তৃপ্ত হ'তে পারে না। তাই দেখি, বুদ্ধদেবের অব্যাকৃত তত্ত্বকে ব্যাকৃত করবার চেষ্টা বৌদ্ধেরাও কিছু কম করেননি। যেসব দার্শনিক অবিদ্যার নিদানকথাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন, তাঁরাও কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তির পথ দেখাতে এমন-সব সুদূর-প্রসৃত সিদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন, যাদের প্রতিষ্ঠা শুধু-যে অবিদ্যার প্রবৃত্তি ও লক্ষণের একটা অভ্যুপগমের 'পরে তা নয়। অবিদ্যাকে বিশ্বের একটা মৌলিক তত্ত্বের পর্যায়ে না ফেলে এসব উক্তি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবই হত না। বাস্তবিক, নিদানের আলোচনা না করেই ভৈষজ্যের ব্যবস্থাকে কোনমতেই আরোগ্যশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা চলে না। শুরুতেই নিদানকথাকে চেপে গেলে চিকিৎসকের উক্তি সত্য কিনা, কোনও গলদ আছে কিনা তাঁর ব্যবস্থাপত্রে, এসব বিচার করবার কোনও উপায় থাকে না। এমনও তো হতে পারে, আজ পর্যন্ত বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে রোগ নিকাশ করতে গিয়ে রুগি-নিকাশের যে আসুরিক ব্যবস্থার চল রয়েছে, তার চাইতে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক উপায়ে সর্বাঙ্গীণ আরোগ্যের বিধান কোথাও আছে। তাছাড়া মানুষ মনন-ধর্মী, অতএব জ্ঞানের প্রসার ঘটানো তার স্বাভাবিক ধর্ম। বুদ্ধি দিয়ে অবিদ্যার স্বরূপ অথবা বিশ্বের কোনও মৌলতত্ত্ব নিখুঁতভাবে জানা তার পক্ষে সম্ভব নাও হ'তে পারে, কেননা প্রাকৃত বুদ্ধি বস্তুকে জানে শুধু তার লক্ষণ বৈশিষ্ট্য ধর্ম প্রবৃত্তি ও অন্যোন্যসম্বন্ধের পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা —তার অতীন্দ্রিয় স্বরূপসত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিদ্বারা নয়। কিন্তু অবিদ্যার বহিরঙ্গ প্রবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ক্রমে তার রূপ আমাদের কাছে নিখুঁত স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে। এবং অবশেষে একদিন—বুদ্ধি দিয়ে নয়, আত্মস্বরূপের মধ্যে সত্যের জ্যোতির্ময় অপরোক্ষ অনুভবে—আমরা হয়তো তার বাণীরূপ এবং তার স্বরূপের অভিজ্ঞা খুঁজে পেতে পারি। এমনি করে বুদ্ধির শুদ্ধিতে বোধির ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে অবিদ্যার তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব। মানুষ বুদ্ধির সহায়েই বোধির দিকে চলে। সত্যের আকূতি তার কাছে মনন- ও বিবেক-সাধনার চরম পর্বে বোধির দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। তখন উপরহতে জ্যোতির প্রপাতে না-জানার তিমিরাবরণ ভেঙে যায় এবং তার প্রবেগে 'জানা' হয় 'হওয়া'তে রূপান্তরিত।

একথা সত্য, মনোময় জীবের কাছে অবিদ্যার তত্ত্ব অনির্বচনীয়। কেননা,

তার বুদ্ধি অবিদ্যারই বিভূতি; অতএব ভেদচেতনার প্রথম উন্মেষে যে-ভূমিতে বিবিক্তমনের বিসৃষ্টি, প্রাকৃত-বুদ্ধির সীমিত বিবেকশক্তি কোনমতেই সে আদিবিন্দুতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এমন করে ধরতে গেলে শুধু অবিদ্যার তত্ত্ব কেন, যে-কোনও বস্তুর মূল তত্ত্বই তো বুদ্ধির নাগালের বাইরে। তাবলে কিছুই জানা যায় না ভেবে মানুষ তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এই অবিদ্যার মধ্যেই তাকে বিদ্যার তপস্যা করতে হবে। অবিদ্যাকে স্বীকার করে নিয়েই তার রহস্যভেদের প্রয়াসে তাকে উত্তরায়ণের পথিক হতে হবে। দীর্ঘকালের নিরন্তর তপস্যায় অবিদ্যার সকল আবরণ একে-একে খসিয়ে ফেলে অবশেষে তাকে পৌঁছতে হবে সত্যের সেই উপান্ত্যভূমিতে, হিরণ্ময় পাত্রে অবিদ্যা যেখানে রচেছে তার আলোর আড়াল। চিন্ময়ী প্রকৃতির নবোন্মেষিত সাধনসম্পদের বীর্যে তাকে পার হতে হবে অবিদ্যার ওই অলীক অথচ দুরত্যয়া মায়া।

অবিদ্যাশক্তির গতি-প্রকৃতি নিয়ে যে-ধরনের আলোচনা এতদিন আমরা করে এসেছি, তার চাইতে আরও গভীরে ডুবে এবার তার স্বরূপ ও নিদান-সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও সুমার্জিত করতে হবে। প্রথমে চাই অবিদ্যার আক্ষরিক অর্থের একটা নিখুঁত বিবৃতি। বিদ্যা ও অবিদ্যার বিবেক ঋগ্বেদের ঋষিরাও করেছেন। তাঁদের কাছে বিদ্যা হল সত্য ও ঋতের অপরোক্ষ-চেতনা এবং তারই অনুকূলে যা-কিছু। আর অবিদ্যা হল সত্য ও ঋতের অচেতনা বা 'অচিত্তি'। এই অচিত্তি শুধু-যে সত্যের বীর্যকে ব্যাহত করে তা নয়, তার প্রতীপসৃষ্টির দ্বারা অসত্য ও অনৃতকে পুষ্টও করে। অতি-মানস সত্যের দর্শন হয় যে-দিব্যচক্ষুতে, তার অভাবই অবিদ্যা—তা-ই বৈদিক ঋষির 'অচিত্তি' অর্থাৎ চেতনার অসামর্থ্য। বিদ্যা বা 'চিত্তি' তার বিপরীত—সে হল চিন্ময় দর্শন ও বিজ্ঞানের দিব্য সামর্থ্য। যে 'অপ্রকেতং সলিলম্' বা অচেতনার সমুদ্র হতে এ-জগতের উদ্ভব, ব্যাবহারিক প্রবৃত্তির দিক থেকে বিচার করলে অচিত্তিকে তার সমানধর্মা বলতে পারি না। তাকে বরং বলা চলে সঙ্কুচিত চেতনা—অনৃতের, দিতির বা অল্পের চেতনা। সম্যক্‌দর্শন অথবা ঋতের, অদিতির বা ভূমার জ্যোতির্ময় চেতনা তার বিপরীত। সঙ্কোচ-ধর্মী বলে অচিত্তির প্রত্যয় স্বভাবতই অনৃত-চেতনায় পর্যবসিত হয় এবং তার সুযোগ নিয়ে বৃত্রপুত্র, দিতিতনয় বা দস্যুরা মানুষের জ্যোতিরেষণাকে পরাভূত করে—তার অন্তরের জ্ঞানদীপকে নির্বাপিত ক'রে 'অদেবী মায়া'র প্রভাবে সৃষ্টি করে মিথ্যার বিভ্রম। মায়ার প্রাচীন অর্থ ছিল চিন্ময় ক্রতু বা সৃজনের দিব্য-প্রতিভা—শাশ্বত পরমমায়ীর দিব্যমায়া। কখনও-কখনও অবরজ্ঞানের প্রতীপ কৃতিশক্তিকেও বলা হত মায়া—কুহকী প্রবঞ্চক রাক্ষসের রক্ষোমায়া। কিন্তু পরের যুগে মায়ার অর্থসঙ্কোচ হতে অর্থের বিকার ঘটেছে। আমরা এখন

বিভ্রম ও প্রতিভাসের সৃষ্টিকারিণী 'অদেবী মায়া'কেই মায়া বলে জানি। বেদে বস্তুর স্বরূপসত্যের অভিজ্ঞা হল দিব্যমায়া। তার মধ্যে আছে বস্তুর স্বরূপ ধর্ম ও প্রবৃত্তির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা বা মায়াতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'দেবানাম্ অদব্ধা ব্রতানি'—চিৎশক্তিরাজির শাশ্বত অবিকল্পিত কৃতি ও সৃষ্টির বীর্য। এই দেবমায়াকে আশ্রয় করেই মানুষের আধারে জ্যোতির্লোকের দিব্য সামর্থ্য নেমে আসে।...শ্রুতির এই দৃষ্টিকে ন্যায়প্রস্থানের ভাবে ও ভাষায় এইভাবে তর্জমা করা চলে : অবিদ্যা হল মনের সেই বিভজ্যবৃত্ত বোধ, যার মধ্যে বস্তুর অখণ্ড-স্বরূপের বা স্ব-ধর্মের প্রত্যয় নাই। একের বৃন্তে গাঁথা চিৎ-শক্তির হাজারটি দল যে অন্যোন্যভাবের লীলায় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে—এ-চেতনা তার নাই। তার ঝোঁক বিভক্তবৃত্তি বিশেষ ধর্ম, বিবিক্ত প্রতিভাস অথবা একদেশী সম্বন্ধের 'পরে। অখণ্ডকে ছেড়েও যেন খণ্ডকে বোঝা যায়, বিশেষকে বুঝতে যেন বিশ্বকে বোঝবার কোনও প্রয়োজন নাই—এই হল তার সত্যৈষণার ধারা। কিন্তু বিদ্যার লক্ষ্য সমাহার বা একত্বভাবনার দিকে। অতিমানস চিন্ময় বৃত্তি দিয়ে সে বস্তুর অখণ্ডস্বরূপের ও স্বধর্মের অনুভব পায়। সম্যক্-সম্বোধির জ্যোতির্ভূমি হতে বিশ্বের চিত্রাবিভূতির 'পরে তার উদার দর্শন ছড়িয়ে পড়ে —নিখিল জগৎ যেমন করে বাঁধা পড়েছে মহেশ্বরের দ্যুলোকে আতত দৃষ্টির আলিঙ্গনে। বৈদিক ঋষির কাছে অচিত্তিও মায়া অর্থাৎ মূলত জ্ঞানেরই শক্তি, কিন্তু সঙ্কোচের বশে তার যে-কোনও পর্বে রয়েছে মিথ্যা ও প্রমাদের অতর্কিত সংক্রমণের সম্ভাবনা। তাইতে বস্তুস্বরূপের বিকৃত প্রত্যয়ে তার পরিণাম ঘটে, যা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিরোধী।

উপনিষদের বেদান্তে পাই এই কল্পনারই আরেক রূপ। সেখানে চিত্তি আর অচিত্তির জায়গায় দেখা দিয়েছে বিদ্যা আর অবিদ্যার সুপরিচিত বিরোধ। পরিভাষার পরিবর্তন ধরে অর্থেরও বিপরিণাম ঘটেছে। সত্যের এষণা যেহেতু বিদ্যার স্বভাব, বিশ্বের মূলে যখন রয়েছে 'একং সৎ', তখন বিদ্যার তাৎপর্য হল নির্বিশেষ একবিজ্ঞান। আর অদ্বৈতচেতনার ভূমিকা হতে বিচ্যুত নানাত্বের বিবিক্ত জ্ঞানই হল অবিদ্যা—যার পরিচয় পাই বিশ্বের ব্যাবহারিক প্রত্যয়ে। বেদের বাণীতে বিচিত্র ব্যঞ্জনার যে অপরূপ ঐশ্বর্য, বিশ্বতোমুখী দ্যোতনার যে-ইন্দ্রধনুচ্ছটা, ঋতভৃৎ কল্পনার যে বিদ্যুন্ময় ইঙ্গিত ছিল, পরের যুগে দর্শনের ওজনকরা ভাষায় আর সে মরমীচিত্তের সাবলীলতার সন্ধান মেলে না। তবু আত্মস্বরূপের উদার উপলব্ধির সঙ্গে নাড়ীর যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। এ-জগৎ একটা অনাদি বিভ্রম, বিশ্বের চেতনা স্বপ্ন বা কুহকের চেতনা মাত্র—এই দৃষ্টি নিয়ে অবিদ্যার স্বরূপ ব্যাখ্যা করবার রেওয়াজ তখনও দেখা দেয়নি। উপনিষদে অবিদ্যাসেবীকে যেমন বলা হয়েছে : 'অন্ধের হাত-ধরা অন্ধের মত হোঁচট খেয়ে চলেছে সে, বারবার ফিরে আসছে তারই জন্য ছড়ানো যে মরণের

জাল তার কবলে'; তেমনি আবার একথাও বলা হয়েছে : 'অবিদ্যার আঁধারে রয়েছে যে, তার চাইতেও নিবিড় আঁধারে সে তলিয়ে যায় শুধু বিদ্যাকেই যে আঁকড়ে থাকে; ব্রহ্মকে যে জানে বিদ্যা আর অবিদ্যা, এক আর নানা, সম্ভূতি আর অসম্ভূতি বলে, অবিদ্যা দিয়ে নানার অনুভব ধরেই সে চলে যায় মরণের পারে, আর বিদ্যা দিয়ে পায় অমৃতের অধিকার।' কারণ, সেই স্বয়ম্ভূই পরিভূরূপে বহু হয়েছেন; তাই দিব্য-পুরুষকে সম্বোধন করে উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে বলতে পারেন। : '**তুমিই তো** ওই চলেছ বৃদ্ধ হয়ে লাঠিতে ভর করে, **তুমিই তো ওই** কুমার আর কুমারী— এই নীল-পাখার আর ওই লাল-চোখের পাখিও যে **তুমিই**।' একথা ঋষি বলছেন না, অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের কাছে এই হয়ে তুমি ফুটছ **যেন**। উপনিষদের অনেকজায়গায় সম্ভূতির চাইতে অসম্ভূতির দিকে ঝোঁক বেশী, একথা সত্য। তবু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'সর্বমাত্মৈবাভূৎ'— এই তার মূল সুর।

উপনিষদে ভেদের যে-আভাস ছিল, পরের যুগে বেদান্তদর্শনে তা-ই হল পল্লবিত। একবিজ্ঞান যেহেতু বিদ্যা আর নানাত্বজ্ঞান যখন অবিদ্যা, তখন ঐকান্তিক ও বিভজ্যদর্শী তর্কবুদ্ধির কাছে বিদ্যা ও অবিদ্যার সহচার কিছুতেই সম্ভব নয়। দুয়ের মাঝে যখন তত্ত্বের ঐক্য নাই, তখন তাদের সমন্বয়ও অসম্ভব। অতএব বিদ্যা শুধু বিদ্যা, অবিদ্যা শুধু অবিদ্যাই। অবিদ্যা বিদ্যার বিরোধী একটা বাস্তবতত্ত্ব—শুধু তার সঙ্কোচ নয়। অবিদ্যার তাৎপর্য কেবল না-জানাতেই নয়—তার বাস্তব পরিণাম বিভ্রম ও বঞ্চনার সৃষ্টিতে, অবাস্তবের আপাত-প্রতিভাসে, মিথ্যার কালিক প্রতীতিতে। অবিদ্যার বিষয়বস্তু তাই কখনও সত্য ও শাশ্বত হতে পারে না। অতএব বিষয়ের নানাত্ব একটা বিভ্রম, অবিদ্যাকল্পিত জগৎও অবাস্তব। যতক্ষণ জগতের আপাতিক প্রতীতি, ততক্ষণ একধরনের বাস্তবতাও তার আছে বটে—স্বপ্নদশায় স্বপ্নের মত, বিকৃতমস্তিষ্ক বা প্রলাপী রোগীর দৃষ্টিতে দীর্ঘবিলম্বিত ছায়াছবির মত। কিন্তু যে-প্রতীতি আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকবে না—মাঝখানেও সে থাকতে পারে না। অতএব প্রতীতির জগৎ তত্ত্বত মিথ্যাই। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, সুতরাং তিনি কখনও বহুরূপে পরিণত হতে পারেন না। একত্ব আর বহুত্ব পরস্পরবিরোধী বলে একই বিশেষ্যে দুটি বিরুদ্ধ বিশেষণ কোনমতেই খাটতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ হয়েও সত্য জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন না। 'আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত'—একেও বিশ্বের তত্ত্বরূপ বলতে পারি না। মন অথবা কোনও অনির্বচনীয় তত্ত্বের মানসপরিণামই নির্বিশেষ-অদ্বৈতের ভূমিকায় নাম-রূপের বিকল্প ফুটিয়েছে। যা স্বরূপত অরূপ অলক্ষণ ও নির্বিশেষ, তাহতে বাস্তব রূপ ও বৈচিত্র্যের বিসৃষ্টি কোনকালেই হবার নয়। অথবা বিসৃষ্টিকে যদি কথঞ্চিৎ-বাস্তব বলে মানতে হয়, তবু বলব এ শুধু কালের কলনা। তাই এ

ক্ষণিকের মেলা বিদ্যার দীপ্তিতে শূন্যে মিলিয়ে যায়—সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত!

পরমার্থ-সৎ ও মায়ার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের যে-দৃষ্টি, তা নিয়ে আধুনিক বেদান্তের এই চুলচেরা তর্কদৃষ্টির সঙ্গে সায় দেওয়া চলে না। এইজন্যেই বেদান্তের প্রাচীন ধারার প্রতিই বরং আমাদের পক্ষপাত। আধুনিক বেদান্তীর সর্বনাশা সিদ্ধান্তের মধ্যে যে নির্ভীক চিত্তের বজ্রদীপ্তি রয়েছে, তাকে প্রশংসা করতেই হয়। যতক্ষণ ব্যাপ্তিতে সংশয় না থাকে, ততক্ষণ ন্যায়ের এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাধ্য-সাধনও যে অবাধিত, এও স্বীকার করি। ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য এবং আত্মভাব ও জগৎভাব সম্পর্কে আমাদের প্রাকৃত-মনের সংস্কার যে অবিদ্যাকলুষিত অতএব অপূর্ণ ও প্রমাদগ্রস্ত—বেদান্তীর এ-দুটি প্রধান অভ্যুপগমের সঙ্গে আমরাও একমত। তবু মানুষের বুদ্ধির 'পরে প্রচলিত মায়াবাদের দোর্দণ্ড আধিপত্যকে নির্বিচারে মেনে নিতে আমরা একেবারেই অক্ষম। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ এবং অধিকারকে তলিয়ে না বুঝলে এতদিনের অভ্যস্ত সংস্কারকে পাল্‌টানো সহজ নয়। বিদ্যা আর অবিদ্যা যদি চেতনার অন্যোন্যব্যাবৃত্ত স্ব-তন্ত্র দুটি বৃত্তি হয়, তাহলে দুয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন অসম্ভব। তখন বিশ্বকে বিভ্রম বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। অবিদ্যাই যদি জগৎ-ভাবের তত্ত্ব হয়, তাহলে আমাদের বিশ্বানুভবকে এমন-কি বিশ্বকেও বিভ্রম বলে মানতে হয়। অথবা যদি বলি, অবিদ্যা আমাদের স্বভাবের ধর্ম নয়, কিন্তু চেতনার সে একটা শাশ্বত মৌল বিভাব মাত্র—তাহলে বিশ্বের সত্য অবিদ্যানিরপেক্ষ হয় বটে। কিন্তু তাতে বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত থেকে বিশ্বের স্বরূপ জানা জীবের পক্ষে অসম্ভব হয়। তার জন্য তাকে যেতে হয় মনোবাণীর অতীতে বিশ্বব্যাকৃতির ওপারে সেই লোকোত্তর অথবা উত্তরলোকের চিন্ময়ধামে, চেতনা যেখানে শাশ্বত-পুরুষের দিব্যভাবের সমধর্মা হয়ে 'সৃষ্টিতেও যেমন উপজাত হয় না, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়েও হয় না বিচলিত।' কিন্তু শুধু শব্দের অর্থ ঘেঁটে বা তর্কের নিপুণ জাল বিস্তার করে এ-সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্যে চাই চেতনার সকল তথ্যের সম্যক পর্যবেক্ষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিশীলন। প্রাকৃত-চেতনার ঊর্ধ্বে অধে ও অন্তরালে যা-কিছু গুহাহিত হয়ে আছে, অগ্র্যা-বুদ্ধির তীক্ষ্ম এষণায় চাই তার মর্মসত্যের নিষ্কাশন।

'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—অধ্যাত্মসত্যের নিরূপণ তর্কবুদ্ধি দিয়ে হয় না। মনোবিদ্ দার্শনিক যাকে বিকল্পবৃত্তি বলেন, শব্দজ্ঞানের অনুপাতী সেই বস্তুশূন্য ভাবের কুহেলিকা নিয়ে তর্কের কারবার। এই বিকল্পই তার কাছে একান্তবাস্তব, তাই তার মোহ কাটিয়ে উদার সমগ্রদৃষ্টিতে জীবনের সত্য স্বরূপটি সে দেখতে পায় না। আপন মেজাজ ঝোঁক বা সংস্কার অনুসারে

জগৎকে আমরা নানান্‌ভাবে দেখি এবং সেই দেখাকেই বুদ্ধির কাছে যুক্তি দিয়ে সাজিয়ে তুলি। তাই যাকে ভাবি যুক্তিবিচারে পাওয়া, বাস্তবিক তার মূলে থাকে প্রাক্তন সংস্কারের নিগূঢ় প্রেরণা। যে-দর্শনের 'পরে যুক্তির নির্ভর, সে যদি সত্য ও সমগ্র হয়, তবেই যুক্তির প্রামাণ্য অনস্বীকার্য হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে সত্যের সম্যক-দৃষ্টিতে চেতনার স্বরূপ এবং প্রামাণ্য বিচার করতে হবে, খুঁজতে হবে কোথায় আমাদের চিত্তধর্মের উৎস, কতটুকুই-বা তার অধিকার—কেননা এই গবেষণার ফলেই আমরা আত্মা এবং জগতের সত্ত্ব ও প্রকৃতির মর্ম-পরিচয় পাব। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দিয়ে জানতে হবে—এই হল আমাদের জিজ্ঞাসার ধারা। তর্কবুদ্ধি শুধু অপরোক্ষ অনুভবকে যুক্তির কাঠামোয় সাজিয়ে তার বিন্যাসকে মনের কাছে স্পষ্ট করে তুলবে—এছাড়া অনুভবের 'পরে তার কোনও নিয়ন্ত্রণ চলবে না। অথবা যে-সত্য যুক্তির বাঁধা ছকে আঁটল না, তাকে ছেঁটে ফেলবারও কোনও অধিকার তার থাকবে না। বিভ্রম বিদ্যা বা অবিদ্যা—সমস্তই চেতনার ধর্ম অথবা পরিণাম। অতএব তত্ত্ব ও বিভ্রমের, বিদ্যা ও অবিদ্যার কি প্রকৃতি, পরস্পরের কি-ই বা সম্বন্ধ, তা জানতে হলে চেতনার গভীরে আমাদের ডুবতে হবে। পরমার্থ-সতের তত্ত্ব কি, বস্তুর স্বরূপ এবং প্রকৃতিই-বা কি—এই হল আমাদের জিজ্ঞাসার মুখ্য বিষয়। কিন্তু সন্মাত্রের অভিমুখে একমাত্র চেতনার পথ ধরে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। কেউ যদি বলেন পরমার্থ-সৎ অতিচেতন, অতএব তার রহস্যকে জানতে হলে চেতনাকে মুছে ফেলতে কি ছাড়িয়ে যেতে হবে, অথবা চেতনা নিজেই নিজের অতিস্থিতি বা রূপান্তরদ্বারা সেই অগমের পরিচয় পাবে—তাহলেও তো একমাত্র চেতনার কাছেই ওই সর্বনাশা পথের খবর ধরা পড়ে। এ-পথ লুপ্তির হ'ক ক্রান্তির হ'ক বা রূপান্তরের হ'ক, তার সাধনা ও সিদ্ধির দায় তো চেতনারই। অতএব আমাদের পরমপুরুষার্থ হল, এই চেতনাকে দিয়েই সেই অতিচেতনাকে জানা। কোন্ নিগূঢ় সামর্থ্যের বশে, কোন্ ক্রম অবলম্বন ক'রে অতিচেতন ভূমিতে সে উত্তীর্ণ হতে পারে—তার সূত্রটি আবিষ্কার করাই আমাদের একমাত্র সাধনা।

কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে চেতনার মানসরূপের সঙ্গেই আমরা পরিচিত। আমাদের কাছে চেতনা আর মন এক। তাই মনের আদিম প্রবৃত্তির সমীক্ষা হবে এষণার গোড়ার কথা। অথচ মন আমাদের সত্তার সবখানি নয়। মন ছাড়াও তার মধ্যে আছে দেহ আর প্রাণ, আছে অবচেতনা আর অচেতনা—তারও পরে আছে এক অন্তর্যামী চিন্ময়সত্তার উৎসমূলে অন্তশ্চেতনা আর অতি-চেতনার নিগূঢ় আবেশ। মনই যদি সব হত, অথবা চেতনার মৌলিক রূপ যদি হত মনোময়, তাহলে বিভ্রম কি অবিদ্যাকে আমাদের জীবভাবের প্রসূতি বলা চলত। কেননা, মনোধর্ম যখন জ্ঞানকে সঙ্কুচিত বা আচ্ছন্ন করে, তখনই প্রমাদ ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়—আর এমনতর মনঃকল্পিত বিভ্রম দিয়ে আমাদের চেতনার

শূন্য। সুতরাং সহজেই ধারণা হবে—মনই অবিদ্যার জননী, সে-ই আমাদের মধ্যে একটা মিথ্যা বিশ্বের বিভ্রম গড়ে তোলে। আসলে এ-জগৎ আমাদের চিত্তের প্রত্যক্-বৃত্ত বিকল্প ছাড়া কিছুই নয়।...অথবা মন হয়তো একটা আশয় মাত্র—এক অনাদি অনির্বচনীয় মায়া বা অবিদ্যাশক্তি তাতে নিক্ষেপ করে অশাশ্বত বিশ্ববিভ্রমের বীজ। এক্ষেত্রেও মন জননী—তবে কিনা 'বন্ধ্যা জননী', কেননা তার সন্তান অবাস্তব। আর মায়া বা অবিদ্যা এই প্রপঞ্চের মাতামহী, কারণ মায়াই মনের প্রসূতি। কিন্তু মাতামহী রহস্যের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আছেন, তাঁকে তো চেনবার উপায় নাই। কে এই মায়া ? ব্রহ্মই একমাত্র শাশ্বততত্ত্ব হলে তাঁকে ছেড়ে তো মায়ার কল্পনা হতে পারে না। তখন শাশ্বততত্ত্বের 'পরেও একটা বিশ্ববিকল্পনা বা বিভ্রমচেতনার আরোপ করতে হয়। স্বীকার করতে হয় : প্রপঞ্চের শিল্পী কেউ আছে—হয় সে মন, অথবা তার অনুরূপ বৃহত্তর কোনও চেতনা। তারই প্রবর্তনায় বা অনুমতিতে প্রপঞ্চবিভ্রমের সৃষ্টি। অথচ কোনও দুর্বোধ উপায়ে সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে সে-চেতনা নিজেই স্বকল্পিত বিভ্রমের জালে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর-কোনও তত্ত্ব থাকতে পারে না, তখন ব্রহ্মই এই শিল্পিচেতনা অথবা তার আধার।...যদি বলা যায়, অনাদি বিশ্ববিভ্রমের প্রতিবিম্বকে বা তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিকে মন শুধু দর্পণের মত গ্রহণ করে, তাহলেও গোল মেটে না। কারণ, এই মনের দর্পণ কোথাহতে এল, শাশ্বত তত্ত্বভাবের এই অতাত্ত্বিক প্রতিবিম্বই-বা এল কোথাহতে—এ-প্রশ্নের তখনও কোনও মীমাংসা হয় না। নির্বিশেষ ও অনির্দেশ্য তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও অনির্দেশ্য এবং নির্বিশেষ। তাহলে সবিশেষ বিশ্বকে কি করে বলি নির্বিশেষ ব্রহ্মের ছায়া ? যদি কেউ বলেন, দর্পণতল বন্ধুর বলেই প্রতিবিম্বের এই বিকৃতি দেখা দেয়—ক্ষুব্ধ সরসীর বীচিভঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকলার চঞ্চল ছবির মত, তাহলেও মানতে হবে মনের মুকুরে সত্যেরই ছায়া পড়ে খণ্ডিত ও বিকৃত হয়ে, সুতরাং তাকে আকাশকুসুমের মত একান্ত অলীক ও নিরাধার মিথ্যা নাম-রূপের মায়া বলব কোন্ যুক্তিতে ? অতএব একথা অনস্বীকার্য যে, এক অন্বয়তত্ত্বেরই আছে বিচিত্র সত্যবিভূতি, মনঃকল্পিত জগতের চিত্রচ্ছবিতে তারই ছায়া পড়ে বাঁকাচোরা হয়ে। প্রতিবিম্বের বিকৃতি সত্য প্রকৃতিরই বিকৃতি, অতত্ত্বের বিকৃতি কখনও নয়। জগৎ তাহলে মিথ্যা নয়। সত্য জগৎকেই মনের কৃতি কি কল্পনা আমাদের কাছে উপস্থিত করে অপূর্ণ বা বিকৃত আকারে—এই কথাই সত্য। কিন্তু তাইতে প্রমাণ হয়, মনের প্রত্যক্ষ এবং ভাবনা তত্ত্বকে জানবার একটা প্রয়াস মাত্র। তারও ওপারে আছে এক সত্য বিজ্ঞান বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, যা বিশ্বাতীত তত্ত্বের আধারেই পায় এক তাত্ত্বিক বিশ্বের অপরোক্ষ ও যথাভূত সংবিৎ।

যদি বিশ্বের মূলে পরমার্থ-সৎ আর অবিদ্যাচ্ছন্ন মন ছাড়া আর কিছুই

না থাকত, তাহলে অবিদ্যাকে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলে মানতে হত এবং অবিদ্যা বা মায়াই তখন হত বিশ্বের জননী। বাধ্য হয়ে তখন বলতে হত, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রজ্ঞ হয়েও শাশ্বত মায়াশক্তিতে নিজেকে অথবা নিজেরই কোনও মায়াকল্পিত প্রতি-ভাসকে মোহিত করছেন। মন সেক্ষেত্রে জীবের অবিদ্যাচেতনারূপে মায়ার বিভূতি মাত্র। যে-শক্তিতে ব্রহ্ম নিজের 'পরে নাম-রূপের আরোপ করেন, তা-ই মায়া। আর নাম-রূপকে সত্য বলে গ্রহণ করে যে-শক্তি, তা-ই মন।...অথবা ব্রহ্ম বিভ্রমকে বিভ্রম জেনেই সৃষ্টি করছেন যে-শক্তিতে, তা-ই মায়া। আর বিভ্রমের স্বরূপ ভুলে গিয়ে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবার যে-শক্তি, তা-ই মন।...কিন্তু ব্রহ্মের আত্মসংবিৎ যদি তাঁর অখণ্ডস্বরূপের চেতনাকে বহন করে, তাহলে এসব ফিকির খাটে না। ব্রহ্ম যদি যুগপৎ জানা এবং না-জানা কিংবা অংশত-জানা অথবা অংশত-না-জানায় আত্মচেতনাকে খণ্ডিত করতে পারেন, অথবা তাঁর অন্তত একটি কলাও যদি মায়াতে উপসংক্রান্ত হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয়—ব্রহ্ম-চৈতন্যে এমন-একটা দ্বৈধ- বা বহুধা-বৃত্তি আছে যার একপিঠ তত্ত্বসংবিৎ আরেক পিঠ বিভ্রমসংবিৎ, একদিক অতিচেতনা আরেকদিক অবিদ্যাচেতনা। অখণ্ডচেতনায় এমন বৃত্তিভেদ যুক্তিসঙ্গত না হলেও একে না মেনে যখন উপায় নাই, তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয়—চিজ্জগতের এ একটা মনোবাণীর অগোচর অনির্বচনীয় রহস্য।...কিন্তু যদি রহস্যবাদের আশ্রয় নিয়ে বিশ্বের তত্ত্বমীমাংসা করতে হয়, তাহলে এক সম্ভূতি বা সন্মাত্রের বহুতে রূপায়ণ এবং বহুর একীভাবে স্থিতি বা পরিণাম—একেও তো স্বচ্ছন্দে বিশ্বের নিত্যলীলা বলা চলে। যুক্তির কাছে এও প্রথমে একটা হেঁয়ালি মনে হয়। অথচ এ যে আমাদের নিত্যপরিচিত একটা তথ্য এবং তত্ত্ব, এও অনস্বীকার্য। কিন্তু একথা মানলে পরে বিশ্বব্যাপারের ব্যাখ্যায় মায়াবাদকে টেনে আনবার কি প্রয়োজন? তখন আমাদেরই অভ্যুপগমকে উত্তরপক্ষরূপে স্থাপন করে কি বলতে পারি না—এক শাশ্বত ও অনন্ত সন্মাত্রই তাঁর শুদ্ধসত্ত্বের অমেয় অনবগাহ সত্যকে চিৎ-শক্তির নিরন্ত মহিমায় বহুবিচিত্র ভঙ্গিতে ও ছন্দে, অগণিত রূপ ও স্পন্দের বৈখরী বিভূতিতে রূপায়িত করে চলেছেন? এই ভঙ্গি ও রূপ, এই ছন্দ ও স্পন্দ তাঁর অন্তহীন তত্ত্বভাবেরই তাত্ত্বিক রূপায়ণ ও বাস্তব পরিণাম। এমন-কি অচিতি এবং অবিদ্যাও অবাস্তব কিছু নয়। তারা তাঁর সংবৃত চেতনা ও স্বতঃসীমিত বিজ্ঞানের বীর্য—ফুটেছে একটা প্রতীপ ভঙ্গিতে। যে বস্তু-সৎ অচিতির বিভূতিতে গুহাহিত হলেন, তিনিই আবার অবিদ্যার বিভূতিতে আপনাকে প্রকট করে চলেছেন আবরণের উন্মোচনে। তাঁর কালকলনার এই লীলাকে সার্থক করবার জন্যই অচিতি ও অবিদ্যার এই তির্যক বিক্ষেপ প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্মী স্থিতির এই ভাবনাও যুক্তির বাইরে, কিন্তু তবু এর সমগ্রতাকে স্বতোবিরোধে কণ্টকিত বলতে পারি না। একে সুস্পষ্টভাবে ধারণা

করবার জন্য চাই আমাদের আনন্ত্যসম্পর্কিত বিকল্পবৃত্তির সংস্কার এবং প্রসার।

শুধু মনকে ধরে অথবা মনের অবিদ্যাশক্তিকে দিয়ে আমরা কোনদিনই জানতে পারব না জগতের তত্ত্বরূপ কি, অথবা অতিচেতন ভূমির কোনও রহস্যেরই প্রমাণসিদ্ধ পরিচয় পাব না। কিন্তু মনের মধ্যে কেবল যে অবিদ্যা-শক্তিই আছে তা নয়—একটা ঋতাভিমুখী প্রবর্তনাও আছে। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুদিকেই মনের দুয়ার খোলা রয়েছে। অবিদ্যার আদিবিন্দু হতে শুরু করে প্রমাদের কুটিল পথে তার অভিযান শুরু হল বটে, তবু উজান বেয়ে বিদ্যার মানসতীর্থে উত্তীর্ণ হওয়াই তার চরম লক্ষ্য। সত্যৈষণা ও সত্যবিসৃষ্টি অথবা বিদ্যাভীপ্সা নচিকেতা-মনের একটা মৌলিক প্রবৃত্তি—যদিও তার সামর্থ্য সীমিত এবং গৌণ। কল্পনা ভাবচ্ছায়া বা সামান্যপ্রত্যয় দিয়ে মন যে সত্যের ছবি আঁকে, তারও মধ্যে থাকে সত্যবিম্বেরই প্রতিবিম্ব বা আ-ভাস। আমাদের চেতনার গহনে বা লোকোত্তর ভূমিতে যা বাস্তব হয়ে আছে, মনের মধ্যে ওই আ-ভাসে ভাসে তার রূপরেখা। জড় ও প্রাণ যে-তত্ত্বভাবের রূপায়ণ, মন তাকে কতটুকুই-বা জানে? চিতেরও লোকোত্তর রহস্যগহনের সে কুণ্ঠাহত গ্রহীতা ও অপটু লিপিকার মাত্র। অতএব আমাদের মধ্যে সত্যের অখণ্ডরূপ ফুটতে পারে—অতিমানসে অবমানসে বা মনের গভীরগহনে লুকানো আছে চেতনার যত দ্যোতনা সে-সবার সম্মিলিত সমীক্ষাতেই। নীচে উপরে সবদিকেই ছেয়ে আছে অসীম রহস্যের আঁধার—তার মধ্যে মন একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা যেন। এই শিখাকে উজ্জ্বল করে অতিচেতনার ভাস্বর দ্যুতিতে মানস অবমানস অতি-মানস ও অচিতির সকল গহন যদি আলোকিত করতে পারে, তবেই নচিকেতার অভীপ্সা তার লক্ষ্যে পেঁছবে।

অন্তরে অবগাহন করে এক সর্বানুস্যূত পরা সংবিতে যদি চেতনার পর-অবর দুটি ভূমি মিলিয়ে দিতে পারি, তাহলেই দেখি সত্যের আরেক রূপ। জীবভাব ও জগৎভাবের সকল তথ্যের যাচাই করলে দেখি, এক অখণ্ড সদ্‌ভাবের লীলা সর্বত্র—এমন-কি বহুত্বের চরম বিভাবনাও বিধৃত রয়েছে একত্বের প্রশাসনে। অথচ বহুত্বের প্রতীতি যে সত্য, এও অনস্বীকার্য। একত্ব আর বহুত্ব একই সত্যের দুটি পিঠ, তাদের বিরোধ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির কল্পনা শুধু। সত্য বলতে একেরই লীলা সকল ঠাঁই। বাইরে যেখানে দুইএর খেলা, সেখানেও তলিয়ে দেখি দুই নাই, একই আছে। আমাদের চেতনায় যে দুইএর দ্বন্দ্ব, সে শুধু অখণ্ডসন্মাত্রের অন্বয় সত্যের বি-রূপ বিভূতি। এ যেন একই আদিত্য-দ্যুতিতে ছায়াতপের দ্বন্দ্ব। চেতনার প্রসারে এ-দ্বন্দ্বের বেদন মিটে যায়, কিন্তু একের বৈচিত্র্য তাতে লুপ্ত হয় না। যত নানার খেলা এক পরমার্থ-সতের বহুধা-রূপায়ণে মিলিয়ে যায় এক অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের রসোদ্‌গারে। যাকে সুখ-

দুঃখের দ্বন্দ্ব বলি, তার মধ্যেও দেখেছি—দুঃখ অখণ্ড আনন্দেরই ছায়ারূপ। দুঃখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে আনন্দেরই তীব্রসংবেগ। আধারের শক্তিদৈন্যে অনুভবিতা তাকে আত্মসাৎ করতে পারেনি, সইতে পারেনি তার বিদ্যুৎ-শিহরন—তাই সে দেখা দিয়েছে দুঃখের রূপে। অতএব দুঃখ আনন্দবিরোধী তত্ত্ব নয়, সে শুধু আনন্দের অভিঘাতে চেতনার তির্যক সাড়া মাত্র। তাই দেখি, আধারের শক্তি বাড়লে ও চেতনার প্রসার হলে, যাকে বলি দুঃখ তাও সুখ হয়ে ফুটতে পারে। ব্যাবহারিক জীবনেও দেখি, অবস্থাবিশেষে দুঃখ হয় সুখ, সুখ হয় দুঃখ। চেতনার প্রসারে দুইই হতে পারে ব্রহ্মের আনন্দরূপ। তেমনি যাকে বলি অশক্তি বা দুর্বলতা, সেও অদ্বিতীয় বিশ্বশক্তির অথবা ব্রহ্মের সংকল্পশক্তির একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি মাত্র। ব্রহ্মসংকল্পের দিক থেকে বিচার করলে দুর্বলতাকে বলব তাঁর শক্তির আত্মসংহরণ করবার সামর্থ্য—যাতে তার নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিকে পরিমিত করে একটি বিশেষ ধারায় বইয়ে দেওয়া চলে। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে আত্মার দিব্যক্রতুর পূর্ণবীর্যকে সীমার সঙ্কোচে ফুটিয়ে তোলবার সামর্থ্যই হল অশক্তির সত্যরূপ—অতএব তাকে শক্তির বিরোধী তত্ত্ব বলা যায় না।...তা-ই যদি হয়, তাহলে ঠিক এই ধারা ধরেই কি বলতে পারি না—অবিদ্যাও বিদ্যার বিরোধী নয়, সেও এক দিব্য কবিক্রতু বা চিন্ময়ী মায়ার বিভূতি মাত্র? বস্তুত অবিদ্যার মধ্যে অদ্বয় চিন্মাত্র পুরুষ তাঁর জ্ঞানা-শক্তিকে স্ফুরিত করতে চাইছেন একটা সংহৃত সুমিত ও সুনিয়ত আকারে। অতএব 'অবিদ্যায় প্রপঞ্চের উদয় আর বিদ্যায় তার বিলয়'—দুয়ের মাঝে এই বিরোধের সম্বন্ধ সত্য নয়। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই জগতে কাজ করছে একই অন্তর্গূঢ় সংবিতের প্রশাসনে। প্রবৃত্তিতে ভিন্ন হলেও তত্ত্বে তারা এক। অতএব তাদের অন্যোন্যপরিণামও নিতান্তই সহজ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বচেতনার মৌলিক প্রবৃত্তি ধরে বিচার করলে অবিদ্যা বিদ্যার সহচারী হলেও সমকক্ষ নয়। আসলে বিদ্যাশক্তি মুখ্য, অবিদ্যাশক্তি গৌণ। অবিদ্যা বিদ্যারই সঙ্কুচিত অথবা তির্যক বৃত্তি।

অজ্ঞ অথচ মতুয়ার বুদ্ধির আড়ষ্ট সংস্কার মুছে ফেলে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল দৃষ্টিতে জগতের দিকে তাকাতে পারলে তবে তার তত্ত্ব জানা যায়। চৈতন্যই বিশ্বের মূল, কিন্তু সে-চৈতন্য 'শক্ত'—অশক্ত নয়। চিৎশক্তিই বিশ্বের আধার এবং তাতেই তার প্রেতি নিহিত। সাধারণত দেখি চিৎশক্তির তিনটি প্রবৃত্তি। প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে নিখিল বিশ্বে অধিষ্ঠিত পরিব্যাপ্ত অভিনিবিষ্ট এক শাশ্বত সর্বগত স্বয়ংপ্রজ্ঞ চেতনা—একত্ব আর বহুত্বের চতুষ্কোটিই যার প্রভায় প্রভাস্বর। এই হল স্বয়ংসিদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ পরা সংবিতের আ-মর্শ, যার মধ্যে আত্মসংবিৎ ও সর্বসংবিতের দিব্যসমাহার ঘটেছে। আবার সত্তার আরেক মেরুতে দেখি এই চেতনারই স্বয়ংবিসৃষ্ট বিরোধের বিলাস, অচিতিরূপে আপা-

তিক আত্মবিলোপ যার চরম পরিণাম। আমাদের সাধারণদৃষ্টিতে অচিতি চেতনার একান্ত প্রতিষেধ—যদিও সে স্থাণু বন্ধ্যা বা অর্থক্রিয়াশূন্য নয়। কিন্তু আমরা জানি, তার অচেতনা একটা প্রতিভাস মাত্র—তার মর্মে নিগূঢ় হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে দিব্যমায়ার অকুণ্ঠিত ঈশনার ধ্রুব নিয়তি। এ-দুটি মেরুর অন্তরালে তটস্থ হয়ে ফুটেছে চেতনারই খণ্ডিত সঙ্কুচিত আত্মসংবিৎ। কিন্তু এ-সঙ্কোচও প্রতিভাস মাত্র, কেননা সর্বসংবিতের দিব্য প্রেতি তারও ভিতর দিয়ে অন্তর্গূঢ় হয়ে কাজ করে চলেছে। চেতনার এই তটস্থশক্তিকে মনে হয় অচেতনা ও অতিচেতনার মাঝামাঝি একটা স্থাণু বিভাব যেন। কিন্তু উদার দৃষ্টিতে দেখলে বুঝি, এ শুধু মূঢ় বিক্ষেপশক্তি নয়, বরং একে বলা চলে বিদ্যাশক্তির একটা উপচীয়মান উৎক্ষেপ। এই তটস্থশক্তি বা উৎক্ষেপশক্তিকেই আমরা বলি অবিদ্যা। পূর্ণসংবিৎকে স্বেচ্ছায় উপসংহৃত করবার যে-সামর্থ্য, জীবের মধ্যে তা-ই ধরে অবিদ্যার রূপ এবং এতেই তার চেতনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এইজন্যই তত্ত্বত বিদ্যাস্বরূপ হয়েও অবিদ্যা আমাদের কাছে অবিদ্যারূপে প্রতিভাত হয়। এখন চিৎশক্তির এই তিনটি বিভাবের নিদান ও অন্যোন্যসম্পর্ক নিরূপণ করাই হল আমাদের কাজ।

বিদ্যা আর অবিদ্যা তুল্যবল দুটি স্ব-তন্ত্র শক্তি হলে তাদের বিরোধের জের ঠেকত গিয়ে চেতনার চরমকোটিতে—নির্বিশেষের যে-উৎস হতে তাদের যুগল ধারা নেমে এসেছে, তার মধ্যে তাদের সকল দ্বন্দ্বের অবসান হত।* তখন বলা চলত—যথার্থ বিদ্যা হল নির্বিশেষ অতিচেতনার সত্যকে জানা। এছাড়া জীব জগৎ বা প্রাকৃত-চেতনার সত্যকে জানার মধ্যে একটা অপূর্ণতার রেশ থাকবেই, কিছু-না-কিছু অবিদ্যার খাদ মিশবেই। অপরা বিদ্যার আলো যত উস্কিয়েই তুলি না কেন, অবিদ্যার আলো-আঁধারির মায়া তাকে ঘিরে রাখবেই। হয়তো বিশ্বের মূলে যুগপৎ স্ব-তন্ত্র হয়ে কাজ করছে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার ছন্দঃসুষমা আর অচিতির অনৃতকুহকের প্রবর্তনা—যা বিশ্বের 'পরে ফেলছে চরম অসত্য অনর্থ ও সন্তাপের অনপসার্য করালছায়া। চিতি আর অচিতি দুয়েরই একটা অনপেক্ষ চরমকোটি আছে। এ-দুয়ের সংঘাতে নিখিল জুড়ে কেবল আলো-আঁধার ও ভাল-মন্দের রেষারেষি আর মেশামেশি চলছে। কোনও-কোনও দার্শনিক যে বলেন, শিব আর অশিব স্ব-তন্ত্রভাবে দুইই সত্য, দুয়েরই একটা অন্যানিরপেক্ষ নির্বিশেষ রূপ আছে, হয়তো সেকথা অসঙ্গত নয়।...কিন্তু এ-দর্শন যে সম্যক্ নয়, তাও আমরা জানি। জানি, বিদ্যা আর অবিদ্যা একই আদিত্যচেতনার ছায়াতপের সুষমা। বিদ্যার সঙ্কোচেই অবিদ্যার

---

* পরব্রহ্মে বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই শাশ্বত হয়ে আছে, একথা উপনিষদেও পাই। কিন্তু তার অর্থ এই, পরা সংবিতের স্বয়ংপ্রজ্ঞাতে নানাত্ব-চেতনা আর একত্ব-চেতনা সহচারিত হয়েই বিসৃষ্টির হেতু হয়েছে, অতএব তারা শাশ্বত আত্মসংবিতেরই দুটি বিভাব মাত্র।

আ-ভাস এবং এই সংকোচকে আশ্রয় করে প্রাকৃত চেতনায় দেখা দিয়েছে খন্ড-বৃত্তি প্রমাদ ও বিভ্রমের গৌণ সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে ষোলকলায় পূর্ণ হতে দেখি অচিতির তামস জড়তায় চিতিশক্তির সাকূত অবগাহনে। আবার সেই তমিস্রার মূঢ় গহন হতেই অঙ্কুরিত হতে দেখি চেতনার উপচীয়মান দীপ্তি এবং তারই আলোকে বিদ্যাশক্তির উন্মেষ। তাই আমরা জানি, অবিদ্যা যত মূঢ় হ'ক, নিগূঢ় পরিণামশক্তির প্রেতিতে সে বিদ্যার ক্রমপ্রসারিত কুন্ডলনে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। ক্রমে ভেঙে পড়বে তার বেষ্টনী, বস্তুর স্বরূপসত্য হবে পূর্ণ প্রকটিত, বিশ্বগত অবিদ্যার আবরণ দীর্ণ করে ফুটবে বিশ্বসত্যের অনির্বাণ দীপ্তি। এই ব্যাপারই ঘটছে : অন্তর্গূঢ় বিদ্যাশক্তির উন্মেষে তিলে-তিলে সাধিত হচ্ছে অবিদ্যার রূপান্তর—ঊষার বুকে মরে গিয়ে তার অন্ধকার আলোকের নবচ্ছটা হয়ে ফুটে উঠছে। সেই রূপান্তরেই বিশ্বের মর্মচর সত্য বিদ্যুতের রেখায় সর্বগত পরমার্থ-সতের স্বরূপদীপ্তিরূপে জ্বলে উঠবে। বিশ্বরহস্যের এই ব্যাখ্যা ধরে আমাদের সত্যের এষণা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার প্রামাণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের বহিশ্চর চেতনার সমীক্ষা দিয়ে। জানতে হবে, যা-কিছু গোপন হয়ে আছে তার উপরে নীচে বা অন্তরে —তার সঙ্গে কি সূত্রে সে বাঁধা। এমনি করেই আমরা অবিদ্যার প্রকৃতি ও অধিকারের পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি। সেইসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে, অবিদ্যা যার সংকুচিত ও বিকৃত প্রকাশ সেই বিদ্যাশক্তিরও প্রকৃতি ও অধিকারের পূর্ণচ্ছবি—যার চরম প্রসার অখন্ড আত্মসংবিৎ ও বিশ্বসংবিতের যুগলরূপে অধ্যাত্মচেতার অন্তরে জ্বালায় সমগ্রসত্যের শাশ্বত দীপালি।

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতি আত্মসংবিৎ ও অবিদ্যা

স্বভাবমেকে...বদন্তি কালং তথান্যে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১

স্বভাবের কথা বলেন কেউ, কেউ-বা বলেন কালের কথা।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১)

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে কালশ্চাকালশ্চ।

মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।১৫

ব্রহ্মের দুটি রূপ—কাল এবং অকাল।

—মৈত্রী উপনিষদ (৬।১৫)

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
............বিশ্বস্য মিষতো বশী॥

ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১,২

তারপর রাত্রির জন্ম হল—তাহতে জন্মাল সত্তার প্রবহন্ত সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রপ্রবাহের বুকে জন্মাল কাল—উন্মিষন্ত বিশ্বের বশী যে।

ঋগ্বেদ (১০।১৯০।১-২)

স্মরো ভূয়ান্॥ অস্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন...মন্বীরন্ন বিজানীরন্।
যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭।১৩

স্মৃতি তার চেয়ে বড়; স্মৃতি নইলে মনন হয় না, হয় না বিজ্ঞান। যতদূর স্মৃতির গতি, ততদূর সে হয় কামচারী।

—ছান্দোগ্য উপনিষদ (৭।১৩)

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।

প্রশ্নোপনিষৎ ৪।৯

ইনিই তো দ্রষ্টা স্পষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ আমাদের মধ্যে।

—প্রশ্ন উপনিষদ (৪।৯)

বিদ্যা আর অবিদ্যা চেতনার দুটি দল। তার মধ্যে প্রথমে আমাদের দৃষ্টি পড়বে অবিদ্যার 'পরে, কেননা অবিদ্যা চাইছে বিদ্যা হতে—এই আমাদের প্রাকৃতস্থিতির গোড়ার কথা। একদিকে আছে অচিতির অন্ধতমঃ, আরেক-দিকে আত্মবিজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের পূর্ণজ্যোতি। দুয়ের মাঝে এই অবিদ্যা তটস্থ হয়ে কাজ করছে—আত্মা এবং বিশ্বের খণ্ডিত সংবিৎ নিয়ে। আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন তার গতি-প্রকৃতির মোটামুটি একটা হিসাব নেওয়া, এবং তা-ই ধরে আধারে অন্তর্গূঢ় বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিরূপণ করা।...কেউ-কেউ স্মৃতিবৃত্তির 'পরে বেশী জোর দেন। এমনও বলেন, মানুষ স্মৃতিসর্বস্ব—তার আত্মভাব গড়ে উঠেছে স্মৃতিকে আশ্রয় করে।

অনুভবের সঙ্গে অনুভব জুড়ে একই অনুভাবিতার বৃত্তিরূপে তাদের গেঁথে তুলে স্মৃতিই গড়ছে আমাদের চিত্তসত্ত্বের পাকা বনিয়াদ। একথা যাঁরা বলেন, জীবনকে তাঁরা দেখেন যেন কালের বুকে ঢেউয়ের মেলা; প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া-পরিণামই তাঁদের মতে সত্যের স্বরূপ। সমগ্র সদ্-ভাবই একটা কর্মপ্রবাহ বা ক্রিয়াপরিণাম বা স্বয়ংতন্ত্র কোনও মহাশক্তির লীলায়নে কার্য-কারণের একটা ধারা নাও যদি হয়, তবু আমাদের সত্তা যে কর্মতন্ত্রিত, এ-বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রিয়াপরিণাম শক্তিস্ফুরণের একটা ভঙ্গি বা অবান্তর প্রয়োজক মাত্র। বলতে গেলে এ শুধু অর্থক্রিয়াকারিতার একটা চিরাগত ব্যবস্থা—ভব্যার্থের অন্তহীন সম্ভাবনার একটিমাত্র প্রকাশ। এ ব্যবস্থা বা প্রকাশও অপরিহার্য নয়। তার যদি অদল-বদল হত, যা ঘটতে দেখছি তার জায়গায় আর-কিছু ঘটত, তাহলেও আমাদের কিছুই বলবার থাকত না। বস্তুর তত্ত্ব তার প্রবৃত্তিতে নয়—প্রবৃত্তির পিছনে থেকে ক্রিয়াপরিণামকে যা শাসন নিয়ন্ত্রণ বা সার্থক করছে, তা-ই তার তত্ত্ব। একটা-কিছুর ঘটনই বড় নয়, তার চাইতে বড় তার পিছনে রয়েছে যে ঘটক শক্তি বা সংকল্প। তার চাইতেও বড় হল চেতনা—সংকল্প যার স্ফুরদ্-রূপ, বড় হল সত্তা—শক্তি যার ভবদ্-রূপ। কিন্তু স্মৃতি সত্তার একটা সপ্রয়োজন বৃত্তি মাত্র। অতএব সে কখনও আমাদের স্বরূপধাতুর অথবা জীবসত্ত্বের সবখানি হতে পারে না। আলোকের একটা ক্রিয়া যেমন বিকিরণ, তেমনি চেতনারও একটা ক্রিয়া স্মৃতি। মানুষ স্মৃতিসর্বস্ব নয়—সে আত্মসর্বস্ব বা আত্মরূপ। অথবা শুধু বহির্বৃত্তি ব্যবহার দিয়ে বিচার করলে মানুষ মনঃসর্বস্ব, কেননা মানুষই মনোময় পুরুষ। স্মৃতি মনের বহু শক্তি এবং বৃত্তির একটিমাত্র। সম্প্রতি আত্মা জগৎ ও প্রকৃতিকে নিয়ে আমাদের কারবারে চিৎশক্তির সে মুখ্য পরিণাম, এই তার বিশেষত্ব।

অবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে তবু স্মৃতিকে ধরেই শুরু করা ভাল, কেননা তাতে হয়তো জীবচেতনার কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের নিগূঢ় পরিচয় মিলবে। সাধারণত দেখতে পাই, মন তার স্মৃতিবৃত্তিকে খাটায়—হয় আত্মস্মৃতিরূপে, নয়তো অনুভবের স্মৃতিরূপে। প্রথমত কালভাবনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে আমাদের চেতনসত্তার সম্পর্কে মন স্মৃতির প্রয়োগ করে। সে বলে, 'এখন আমি আছি, আগেও ছিলাম, পরেও থাকব—কালের এই তিনটি ক্ষণভঙ্গে রয়েছে একই আমি-র অনুবৃত্তি।' স্মৃতির এই উপযোগ আমাদের আত্মসংবিতের গোড়ার কথা। এমনি করে কালের সংজ্ঞা দিয়ে মন জীব-চৈতন্যের শাশ্বতসত্তাকে প্রকাশ করতে চায়—যাকে সে তথ্য বলে অনুভব করলেও তার যাথার্থ্য জানে না কি প্রমাণ করতে পারে না। স্মৃতি মনকে অতীতের খবর এনে দেয়, আর অপরোক্ষ আত্মসংবিৎ চিনিয়ে দেয় শুধু বর্ত-

মানের ক্ষণটিকে। সংবিৎ হতে পূর্ববৎ-অনুমান দ্বারা এবং স্মৃতির সহায়ে অতীতচেতনার অবিচ্ছেদ-প্রবৃত্তির সাক্ষ্য মেনে আপনাকে সে কল্পনা করে ভবিষ্যতে। কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যতের বিস্তার কতখানি, তা সে জানে না। স্মৃতির সীমাই তার অতীতের সীমা। যখনকার স্মৃতি নাই, তখনও যে তার চেতনসত্তা ছিল, তা সে অনুমান করে অপরের সাক্ষ্য এবং পারি-পার্শ্বিকের অনুভব হতে। সে জানে, শৈশবের বুদ্ধিহীন মূঢ়দশাতেও তার সত্তা ছিল, কিন্তু আজ তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। জন্মের আগেও সে ছিল কি না, স্মৃতির বিচ্ছেদবশত আজ তা নিরূপণ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। ভবিষ্যতের কোন খবরই সে রাখে না। বর্তমান ক্ষণের পরের ক্ষণেও নিজের অস্তিত্ব তার কাছে নিশ্চিত নয়—তর্কিত, সুতরাং তার সাধ্যের অনায়ত্ত যে-কোনও ঘটনার দ্বারা তার তর্ক ভ্রান্ত বলেও প্রমাণিত হতে পারে। কেননা পরক্ষণে অস্তিত্বের সম্ভাবনা তার একটা প্রবল প্রত্যাশা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ তার মনের মধ্যে আছে অবিচ্ছেদ-বৃত্তিতার একটা বদ্ধমূল সংস্কার, যা সহজেই অমরত্ব-প্রত্যয়ের নিঃসংশয় রূপ ধরে।

কিন্তু এই নিশ্চয়-জ্ঞান কোথা হতে আসে ? এ কি মনের অনাদি-অতীত অনুভবের ছায়া—বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েও যার আকার-প্রকারহীন একটা সংস্কার এখনও মনের মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে ? না আমাদেরই সত্তার কোনও উত্তর বা গূঢ়তর ভূমি আছে, যেখানে বস্তুত আমরা শাশ্বত স্বয়ম্ভূসত্তার সংবিতে ভাস্বর, আর সেই আত্মবিজ্ঞানেরই একটা স্তিমিত প্রতি-বিম্ব পড়েছে এই মনের মধ্যে। অথবা হয়তো এ একটা কুহকের ছলনা—মরণ-প্রত্যয়ের মত। চেতনাকে সম্মুখে প্রসারিত করেও মরণকে আমরা প্রত্যক্ষ অনুভবের এলাকায় আনতে পারি না, তাই অবিচ্ছেদ-বৃত্তিতার নিঃসংশয় অনুভব নিয়ে বেঁচে থাকি। বিনাশ আমাদের কাছে একটা বুদ্ধিকল্পিত প্রত্যয় মাত্র। তাকে নিশ্চিত জানলেও অথবা সুস্পষ্ট কল্পনা করতে পারলেও একান্তবাস্তবরূপে অনুভবে ফুটিয়ে তুলতে পারি না—কেননা আমরা বেঁচে আছি শুধু বর্তমানে। অথচ মৃত্যু বিনাশ অথবা আমাদের এই বাস্তব-জীবনের তন্তুচ্ছেদ অস্তিত্বের একটা নিরেট তথ্য। ভবিষ্যতে এই শরীরেই বেঁচে থাকব—এমন বোধ বা প্রাগনুভবকে যতই প্রসারিত করি না কেন, এক-জায়গায় অজানার কূলে এসে সে ঠেকে যাবেই। তখন তাকে কুহকের ছলনা না বলে উপায় নাই। চেতনসত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের মনে যে-সংস্কার, তার অযথাপ্রসার বা অপপ্রয়োগ হতে যেমন সশরীরে বারবার বেঁচে থাকবার কল্পনা জাগে, তেমনি শাশ্বতচেতনার ভাবনাও হয়তো মনের একটা মায়া মাত্র। অথবা হয়তো আমাদের বাইরে আছে বিশ্বের কিংবা বিশ্বাতীত একটা-কিছুর শাশ্বত অনুবৃত্তি : সে চেতন বা অচেতন হ'ক, তার নিত্য-সদ্‌ভাবকে আমাদের

'পরে আরোপ করে আমরা অমরত্বের এই বিকল্প সৃষ্টি করি। বস্তুত আমরা ওই শাশ্বত-সদ্‌ভাবেরই ক্ষণবুদ্বুদ। কিন্তু তার নিত্যত্বের উপরাগে উপরক্ত হয়ে আমাদের আধারচৈতন্যকেও মন নিত্য বলে ভাবে।

প্রাকৃত-মন এসব সমস্যার সমাধান জানে না। এ নিয়ে অন্তহীন জল্পনার সৃষ্টি ক'রে অবশেষে যুক্তির অল্প-বিস্তর সমর্থন দিয়ে কতগুলি নির্ণয়হীন মতবাদকে সে প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। আমরা অমর—এও যেমন একটা বিশ্বাস, তেমনি আমরা মর—এও একটা বিশ্বাস। দেহের বিনাশে চৈতন্যেরও বিনাশ হয়—জড়বাদীর পক্ষে একথা প্রমাণ করা অসম্ভব। মৃত্যুর পরেও আমাদের আধারচৈতন্যের কোনও অবশেষ যে টিকে থাকে, তার কোনও নিঃসংশয় প্রমাণ নাই—জড়বাদী এইটুকুই বলতে পারেন। কিন্তু দেহের ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মারও ধ্বংস অনিবার্য, বস্তুতত্ত্বের সমীক্ষা হতে একথা তিনি প্রমাণ করতে পারেন না। দেহের মৃত্যুতেই যে জীবসত্ত্বের আয়ু ফুরিয়ে যায় না, দুদিন পরে অবিশ্বাসীর কাছেও হয়তো তার সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু তাতেও প্রমাণিত হবে চেতনসত্ত্বের অমরত্ব নয়—তার অবিচ্ছেদ-বৃত্তিতার মেয়াদ-বৃদ্ধি শুধু।

বস্তুত মনঃকল্পিত এই শাশ্বত-সদ্‌ভাবের বোধ আর-কিছুই নয়—শাশ্বত কালের বুকে ক্ষণভঙ্গের একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার বোধ ছাড়া। অতএব কালই শাশ্বত, চেতনসত্ত্বের অবিচ্ছেদ ক্ষণবৃত্তিতা শাশ্বত নয়। অথচ মনের সাক্ষ্য হতে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, শাশ্বত কাল বলে বস্তুতই একটা-কিছু আছে। হয়তো চেতনসত্ত্বের দৃষ্টিতে অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তির যে-ভান, তার নাম কাল। অথবা হয়তো শাশ্বত অস্তিতার অবিচ্ছেদ প্রবাহকে অনুভবের পারম্পর্য ও যৌগপদ্য দিয়ে মনে-মনে সে যে মেপে চলে, তাকেই বলে কাল এবং শুধু এতেই তার কাছে অস্তি-ভাবের পরিচয় ফোটে। শাশ্বত-অস্তিত্বরূপ কোনও চেতনসত্ত্ব কোথাও যদি থাকে, তাহলে সে হবে কালাতীত অর্থাৎ স্বয়ং অকাল হয়েও কালের আধার। এ বেদান্তের সেই 'নিত্যো নিত্যানাম্' : কাল তাঁর সংবিন্ময় কলা মাত্র, যার সহায়ে তাঁর আত্মবিসৃষ্টিকে তিনি দর্শন করেন। কিন্তু এই নিত্যস্বরূপের কালকলনাহীন আত্মবিজ্ঞান অতি-মানসভূমির তত্ত্ব, অতএব তা আমাদের চেতনার উজানে। তাকে পেতে হলে প্রাকৃত-মনের কালকলিত প্রবৃত্তিকে হয় স্তব্ধ করতে হবে নয়তো ছাড়িয়ে যেতে হবে—নৈঃশব্দ্যের পরম গহনে অবগাহন ক'রে অথবা তারই ভিতর দিয়ে শাশ্বত-ভাবের চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে।

একটা কথা এই আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবিদ্যাই আমাদের মনের স্বভাব। অবশ্য অবিদ্যা বিদ্যার অত্যন্তাভাব নয়—বরং তাকে বলতে পারি বিদ্যার নৈমিত্তিক সঙ্কোচ। কেননা তার মধ্যে বর্তমানের অপরোক্ষ অনুভবের

সংগে জড়িয়ে আছে পরোক্ষবিষয়ক অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের অনুমান এবং তাইতে কালাবচ্ছিন্ন পরম্পরায় সীমিত হয়ে জীবের আত্মপ্রত্যয় ও বিষয়ানুভব চলতে থাকে। কালকলনাময় শাশ্বত-সদ্ভাব যদি বস্তু-সতের ধর্ম হয়, তাহলে মানতে হবে—প্রাকৃত-মন তার স্বরূপ চেনে না। কারণ, তার নিজের অতীতকে স্মৃতির ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত বিস্মৃতির প্রদোষচ্ছায়ায় সে হারিয়ে ফেলেছে। তার ভবিষ্যতেরও রূপ না-জানার অন্ধ যবনিকার অন্তরালে ঢাকা আছে। শুধু ঘটনার স্রোতে তার বর্তমান ভেসে চলেছে—নামরূপের বিচিত্র পসরা নিয়ে। তার মধ্যে ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে নিত্যপরিণামের চটুল লাস্যে সে দিশাহারা। বিশ্বব্যাপী স্ফুরত্তার এই বিপুল অভিযান কোথায় চলেছে কে জানে—কে তার শাস্তা, কেই-বা তার বোদ্ধা !...কিন্তু কালকলনাহীন শাশ্বত-সদ্ভাব যদি বস্তু-সতের ধর্ম হয়, তাহলে তাকে প্রাকৃত-মন আরও চেনে না—কেননা ওই অব্যক্তগহনের যেটুকু আত্মরূপায়ণ দেশ ও কালে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, খণ্ডিত অনুভবের খদ্যোতিকায় ক্ষণে-ক্ষণে শুধু তারই সে পরিচয় পেয়েছে।

অতএব মন যদি আমাদের স্বরূপের সবখানি হয়, অথবা এই প্রাকৃত-মন তার দ্যোতকও হয় যদি—তাহলে আমরা তো কালের প্রবাহে ভেসে-যাওয়া অবিদ্যার বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই নই। বিদ্যার একটুখানি বর্ণলীলা মাঝেমাঝে ঝিকিয়ে ওঠে তার মধ্যে—এই তার ঐশ্বর্য শুধু !...কিন্তু মনেরও ওপারে যদি আত্মবিদ্যার এমন বীর্য থাকে, কালকলনাহীন নিত্যসংবিৎ যার স্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পরমসমন্বয়ে ক্ষণ-শাশ্বতের অনুপাখ্য ঐশ্বর্য যার কালদৃষ্টিতে ভেসে উঠেছে, অথবা কাল যার কালাতীত স্বরূপসত্তার বিভূতি মাত্র : তাহলে বুঝব চেতনার দুটি শক্তি আছে—একটি বিদ্যা, অপরটি অবিদ্যা। হয় তারা ভিন্নধর্মী অতএব অসংসৃষ্ট, তাদের নিদান ও প্রবৃত্তি দুইই পৃথক, প্রত্যেকেই তারা স্বয়ম্ভূ বলে অন্যোন্যবিবিক্ত নিত্যদ্বৈত তাদের মধ্যে: নতুবা তাদের মধ্যে আছে এইধরনের যোগ : একই চৈতন্য বিদ্যারূপে তার কালাতীত আত্মস্বরূপকে জানে, নিজেরই আধারে দেখে কালের কলনা; আবার সেই বিদ্যাই তার মধ্যে বহিশ্চর খণ্ডবৃত্তিতে ফুটে ওঠে অবিদ্যা হয়ে। সে-অবিদ্যা কালের আধারে নিজেকে দেখে আত্মকল্পিত কালিক-সত্তার আবরণে গুণ্ঠিত হয়ে, এবং একমাত্র গুণ্ঠনমোচন দ্বারাই ফিরে যেতে পারে শাশ্বত আত্মবিদ্যার উত্তর অধিকারে।

অতিচেতন বিদ্যাশক্তি এমন অসংগ ও বিবিক্ত যে দেশ-কাল-নিমিত্ত ও তাদের পরিণামকে জানবার সাধ্যই তার নাই—এ-কল্পনা নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ, তাহলে বিদ্যাশক্তিকে বলতে হয় অবিদ্যাশক্তিরই আরেক মেরু। কল্পনা করতে হয়, অখণ্ড চিন্মাত্রের মধ্যে পূর্ণ আত্মসংবিতের সামর্থ্য নাই। তাই

তার দুটি প্রান্তে আছে ইতি-মুখী আর নেতি-মুখী দুটি মেরু। কাল-কলিতের অন্ধতামসের অনুরূপ কালাতীতেরও অন্ধতামস আছে। অর্থাৎ অখণ্ডচিন্মাত্র একদিকে যেমন নিজের ব্যাকৃতিকে জানে কিন্তু নিজেকে জানে না—তেমনি আরেকদিকে নিজেকেই জানে, তার ব্যাকৃতিকে জানে না। এমনি করে তার মধ্যে আছে অন্যোন্যব্যাবর্তক এক তুল্যবল স্বরূপশক্তির লীলা শুধু—যা স্পষ্টতই অসম্ভব। কিন্তু প্রাচীন বেদান্তের উদার দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বুঝি, আত্মচেতনাকে দ্বিখণ্ডিত না করে তার ভাবনা করা উচিত একই অদ্বৈত-চেতনার যুগ্মবিলাস বলে। একটি বিলাস মনের ভূমিতে—পূর্ণ- বা অর্ধ-চেতনার দীপ্তি নিয়ে, আরেকটি মনের ওপারে অতিচেতন ভূমিতে। একটি কালাবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান, কালের শাসন মেনে চলতে হয় বলে আত্মবিজ্ঞানকে সে নিগূহিত রেখেছে। আরেকটি কালাতীত বিজ্ঞান, তাই আত্মনিরূপিত কাল-কলনাকে সে-ই ফুটিয়ে তোলে মহেশ্বরের পূর্ণপ্রজ্ঞা নিয়ে। কালিক অনুভবে পুষ্ট হয়ে একটি তার নিজের পরিচয় পায়, আরেকটি তার কালাতীত স্বরূপকে জানে বলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে চলে কালিক অনুভবের বর্ণরাগে।

এইবার তাহলে বুঝতে পারব, উপনিষদের ঋষি কেন বলেছিলেন—ব্রহ্ম বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই, অতএব বিদ্যায় ও অবিদ্যায় ব্রহ্মের সহবেদনই আমাদের দেবে অমৃতত্বের অধিকার। বিদ্যা দেশ-কাল-নিমিত্তহীন ব্রহ্ম-চৈতন্যের সেই নিরূঢ় বীর্য, যা অখণ্ড-সদ্ভাবের স্বরূপপ্রত্যয়কে ফুটিয়ে তোলে। এই অবিকল্পিত চৈতন্যই সম্যক তত্ত্বজ্ঞান। কেননা, তার শাশ্বত বিশ্বোত্তীর্ণ স্থিতিতে আছে শুধু আত্মসংবিৎ নয়, আছে বিশ্বের শাশ্বত কালিক পরম্পরার বিধৃতি বিসৃষ্টি বিজ্ঞান ও প্রশাসন। কালের পরম্পরায় কলিত চেতনার যে-বৃত্তি, তা-ই অবিদ্যা। তার জ্ঞান ক্ষণসঙ্গী, তাই খণ্ডিত। দেশের খণ্ডতা ও নিমিত্তের জটিলজালে অভিনিবিষ্ট বলে তার আত্মভাবও খণ্ডিত। একত্বের বহুধাবিচিত্র ভাবনায় নিজেরই কারাগারে সে বন্দী। একত্ববিজ্ঞানকে নিগূহিত রেখেছে বলে তাকে বলি অবিদ্যা। সেইজন্যে নিজেকে কি জগৎকে পুরাপুরি বা সত্য করে সে জানে না, জানে না বিশ্বাত্মক বা বিশ্বাতীতের তত্ত্ব। এই অবিদ্যার মধ্যে থেকে ক্ষণ হতে ক্ষণে দেশ হতে দেশে নিমিত্ত হতে নিমিত্তান্তরে হোঁচট খেয়ে জীব চলেছে খণ্ডিত জ্ঞানের প্রমাদে বিভ্রান্ত হয়ে।* এ-অবিদ্যা অচিতির অন্ধতামস নয়। এর মধ্যে

---

* 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানা...জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'—অবিদ্যার মধ্যে থেকে ঘূর্ণির পাকে ঘুরে মরে মূঢ়েরা—হোঁচট খেয়ে-খেয়ে চলে আঘাতে জর্জরিত হয়ে অন্ধ দিশারীর পিছনে অন্ধের পালের মত।

—মুণ্ডক উপনিষদ (১।২।৮)

তত্ত্বেরই দর্শন ও অনুভব হয় 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'। যে-বিদ্যা স্বরূপে অবগাহন না করে শুধু প্রতিভাসের চঞ্চল রূপ দেখে, এমন আলো-আঁধারি তার মধ্যে থাকবেই।...আবার ব্যক্তব্রহ্মের বিদ্যাকে নিরাকৃত ক'রে অদ্বৈত-চেতনার অলক্ষণ অব্যপদেশ্য প্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হয়ে থাকা—সেও তো 'ভূয় ইব তমঃ'। সত্য বলতে কোনটাই ঠিক তম নয়। একটি যেমন বিন্দুচেতনার চোখধাঁধানো জ্যোতি, আরেকটি তেমনি অর্ধচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মেঘভাঙা আলোর ভিতর দিয়ে দেখা ছায়াছবির মায়া। পরা সংবিৎ এর কোনটিতেই একান্তভাবে নিরুদ্ধ হয়ে নাই—অক্ষর এক আর ক্ষর বহু তাঁর শাশ্বত সর্বসমন্বয়ী আত্ম-বিজ্ঞানের মহাসঙ্গমতীর্থে সহজের দ্যুতিতে নিত্যবিলসিত।

কালের প্রচণ্ড আকর্ষণে বিভজ্যবৃত্ত চেতনার বন্ধুর পথে অসহায়ভাবে মন চলেছে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে একমাত্র স্মৃতির 'পরে ভর দিয়ে—কোথাও থামবার কি জিরোবার তার উপায় নাই। কিন্তু স্মৃতিই কি মনের ভর পুরাপুরি সইতে পারে? আত্মসংবিতের অভঙ্গ শাশ্বত অপরোক্ষ প্রত্যয় এবং বিশ্বের অভঙ্গ বা বর্তুল অপরোক্ষ অনুভব—এ-দুয়ের আকৃতি কার্পণ্যোপহত স্মৃতির স্বল্প বিত্তে কি মেটে? শুধু বর্তমান ক্ষণে মন পায় আত্মসংবিতের অপরোক্ষ প্রত্যয়; বর্তমানের সেই সংকীর্ণ পরিবেশে, দেশের উপস্থিত ভূমিকায় ইন্দ্রিয়ের সহায়ে সে বিশ্বের অর্ধ-অপরোক্ষ খণ্ডিত একটা অনুভব পায়। তার এই ন্যূনতাকে সে স্মৃতি কল্পনা ভাবনা ও প্রতীকী-চিন্তার রকমারি দিয়ে পুরিয়ে নেয়। যে প্রতিভাসের মেলা শুধু বর্তমান দেশ ও বর্তমান কালকে অধিকার করে আছে, তাকে ধরবার যন্ত্র হল তার ইন্দ্রিয়। আর বর্তমানের বাইরে যা, পরোক্ষভাবে তার ছবি নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোল-বার সাধন হল তার স্মৃতি কল্পনা ও ভাবনা। কেবল তার বর্তমানের অপরোক্ষ আত্মসংবিৎকে কোনও যন্ত্র কি সাধনের পর্যায়ে ফেলা চলে না। অতএব তত্ত্বভাব বা শাশ্বত-সদ্‌ভাবের সত্য সে অনায়াসে জানতে পারে শুধু এই অনুভবেরই ভিতর দিয়ে। তাই তার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে, যা আত্মানুভবের বাইরে, তা প্রতিভাস নয় শুধু—হয়তো তা প্রমাদ অবিদ্যা কি বিভ্রম, কেননা সে তো তার কাছে আত্মসংবিতের মত অপরোক্ষ তত্ত্ব হয়ে ধরা দেয় না।...এই হল মায়াবাদীর সিদ্ধান্ত। তার কাছে সত্য শুধু শাশ্বত আত্মা—মনের বর্তমান অপরোক্ষ আত্মসংবিতের পিছনে যাঁর অধিষ্ঠান। অথবা বৌদ্ধের মত বলা যেতে পারে: শাশ্বত আত্মাও একটা বিভ্রম বা মনের বিকল্প মাত্র; সদ্-ভাবের একটা মিথ্যা সংজ্ঞা বা মিথ্যা বিজ্ঞানকেই আমরা কল্পনা করি 'আত্মা' বলে। তখন মনের নিজেরই কাছে নিজেকে মনে হয় যেন খেয়ালী এক যাদুকর। মন আর মনের লীলা যুগপৎ আছে এবং নাইও—তত্ত্বভাবের স্থিতিস্বভাব এবং প্রমাদের ক্ষণভঙ্গ দুইই তাদের লক্ষণ। এ অদ্ভুত ব্যাপার

কি করে সম্ভব হয়, তা সে বুঝতে চায় অথবা চায়ও না। কিন্তু নিজেকে এবং নিজের বৃত্তিকে নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে প্রতিভাসের বিভ্রম হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিত্যস্বরূপের কালকলনাহীন প্রশান্তিতে লীন হওয়া—একেই সে তার পুরুষার্থ বলে জানে।

কিন্তু বাইরে কি ভিতরে, আত্মচেতনার অতীত বা বর্তমান মুহূর্তে আমরা যে একটা গভীর ভেদের কল্পনা করি, বস্তুত তা আমাদের সংকীর্ণ ও চঞ্চল মনোবৃত্তির কারসাজি মাত্র। এই মনের পিছনে, একেই তার বহিরঙ্গ প্রবৃত্তির সাধন ক'রে এক অচঞ্চল চেতনা রয়েছে। বর্তমান স্থিতির সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্য স্থিতির কোনও অনুত্তরণীয় বিচ্ছেদের কল্পনা তাকে পীড়িত করে না। অথচ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রবহমান কালস্রোতেও সে ভেসে চলে। কিন্তু তার অখন্ডদৃষ্টি তিনটি কালকেই একটি অবিভক্ত প্রত্যয়ে সম্পুটিত করে, যার মধ্যে কালাতীত অব্যয়াত্মার অচঞ্চল রঙ্গপীঠে চলে কালাত্মার চঞ্চল অনুভবের লাস্যলীলা। মন ও মনের বৃত্তিসমূহ প্রত্যাহৃত বা নিরুদ্ধ হলে আমরা এই নিত্যচেতনার অনুভব পাই—কিন্তু প্রথম দর্শনে তার অচল-স্থিতিকেই উপলব্ধি করি। তাকেই যদি একান্ত করে দেখি, তাহলে বলতে পারি : সে শুধু কালাতীত নয়, সে নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ—ভাবনা কল্পনা স্মৃতি সংকল্প মনন কোনও-কিছুরই এতটুকু হিল্লোল তার মধ্যে নাই। সে আপ্তকাম আত্মসমাহিত, অতএব বিশ্বকর্মের কোনও সাড়াই তাকে চকিত করে না। তখন মনে হয়, এই অক্ষরচৈতন্যই সত্য, আর-সমস্তই অসৎ রূপকল্পনার মিথ্যা বিজৃম্ভণ অথবা অপারমার্থিক রূপের মেলা—অতএব স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু এই নির্বিকল্প আত্মসমাধান চৈতন্যেরই বৃত্তি ও পরিণাম—মনন স্মৃতি ও সংকল্পে তার আত্মাবিষ্করণের মত। একমাত্র সেই নিত্য-স্বরূপই তত্ত্বাত্মা, যাঁর মধ্যে আছে কালকলিত ক্ষরবৃত্তি ও কালমূল অক্ষর-স্থিতি দুয়েরই সমার্থ্য। আর এই বৃত্তি ও স্থিতি উভয়ই সমকালীন, নইলে তাদের সত্তা অসম্ভব হত। তাদের একটি শাশ্বত হয়ে আছে, আরেকটি প্রতিভাসের মেলা সৃষ্টি করছে—এও তাদের তত্ত্ব নয়। এই নিত্যস্বরূপকে গীতাতে বলা হয়েছে 'পর-পুরুষ' 'পরমাত্মা' বা 'পরব্রহ্ম'—যিনি সর্বভূত-মহেশ্বররূপে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের ভর্তা।

কালাবচ্ছিন্ন মনোময় আত্মসংবিতেই চিদাভাসের গোড়ার পরিচয়। এইদিক থেকে মন ও স্মৃতিকে এতক্ষণ বিচার করে দেখেছি। কিন্তু আত্মানুভবের সঙ্গে আত্মসংবিৎকে জড়িয়ে এবং বিষয়ানুভবের সঙ্গে আত্মানুভবকে জড়িয়ে তাদের যদি বিচার করি, তাহলেও একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছব—যদিও তথ্যের ভারে সমৃদ্ধ হয়ে তখন সে-বিচার আমাদের কাছে অবিদ্যার স্বরূপকে আরও উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলবে। এবার দেখা যাক, বিচারে আমরা কি পেলাম।

এইটুকু বুঝেছি : আমাদের মধ্যে আছেন এক শাশ্বত চিন্ময়পুরুষ, যিনি কালকলনাহীন আত্মচৈতন্যের অচঞ্চল স্থিতির 'পরে মনের চঞ্চল বৃত্তির প্রতিষ্ঠা রচেছেন—আবার নিখিল কালস্পন্দকে অতিমানস বিজ্ঞানের কুক্ষিগত করে মনের বৃত্তি দিয়ে সেই স্পন্দলীলাতে বিলসিত হচ্ছেন। তিনিই ধরছেন বহিশ্চর মনোময়সত্ত্বের রূপ। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে চলেছে তাঁর চটুল নৃত্য। আত্মস্বরূপের প্রতি পরাঙ্‌মুখ হয়ে কালস্পন্দিত অনুভবের সঙ্গেই তিনি যুক্ত। সেই কালস্পন্দনেও অনাগতের অব্যক্ত সিদ্ধসত্তাকে তিনি অবিদ্যা ও অসত্তার আপাতিক তমিস্রার অন্তরালে ঠেকিয়ে রেখেছেন—শুধু বর্তমানের উজ্জ্বল মুহূর্তটিকে আস্বাদন ক'রে পরমুহূর্তেই আবার তাকে ঠেলে দিচ্ছেন স্মৃতির ক্ষীণদীপে অর্ধালোকিত ওই অব্যক্তের নেপথ্যগৃহে। এমনি করে অধ্রুব-চঞ্চল সত্তার ক্ষণিক বিলাসে তিনি বিশ্বজোড়া এই অধ্রুব-চঞ্চলের পসরাকে শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চলেছেন।...কিন্তু এও তাঁর ঐকান্তিক সত্য পরিচয় নয়। ক্রমে জানব, বস্তুত তিনি শাশ্বতকাল ধরে অতিমানস বিজ্ঞানে ধ্রুব ও স্বধাবান্ নিত্যস্বরূপ হয়ে আছেন। যাদের তিনি স্পর্শ করছেন, তারাও অধ্রুব বা অশাশ্বত নয়—কেননা এ যে কালের ঢেউএ মানসভোগের লীলায়নে নিজেকেই তিনি আস্বাদন করে চলেছেন।

অনুভব ও কর্মের আশয়রূপে চিৎসত্তার সব পুঁজি কালের ভাণ্ডারেই জমা থাকে। অতীতের (এবং অনাগতেরও) সেই পুঁজিকে বহিশ্চর মনোময়-সত্ত্ব অহরহ বর্তমান বিত্তের রূপ দিয়ে চলেছে। সেই বিত্তের কারবারে যা মুনাফা জোটে, তাকে অতীতের ভাণ্ডারে সে জমা দেয়, কিন্তু জানে না যে অতীতও তার মধ্যে নিত্যবর্তমান হয়ে আছে। আবার ওই পুঁজি হতে প্রয়োজনমত জ্ঞান ও সিদ্ধির বিত্ত আহরণ ক'রে সে অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় প্রবৃত্তির চলতি কারবারে তাকে ঢালে এবং তার ধারণায় তা-ই অনাগতের নবীন বিত্তে ফেঁপে ওঠে। অবিদ্যা বস্তুত পুরুষের আত্মবিদ্যার এমন-একটা উপচার, যা দিয়ে তিনি বিদ্যাকে কালাবচ্ছিন্ন অনুভব ও কর্মের উপযোগী করে তুলছেন। আমরা তাকেই বলি 'জানি না', যাকে পুঁজি হতে তুলে নিয়ে এখনও মনের কারবারে খাটাইনি অথবা যাকে খাটানো শেষ করে দিয়েছি। নইলে ভিতরে-ভিতরে আমরা সবই জানি। কেননা, অন্তরের অন্তঃপুরে দেশ-কাল-নিমিত্তের যথাযোগ্য পরিবেশে আত্মার স্বচ্ছন্দ উপযোগের অপেক্ষাতে সবই তৈরী হয়ে আছে। এমনও বলা চলে, আমাদের এই বহিশ্চর জীবসত্ত্ব গুহাচর শাশ্বত আত্মারই একটা উৎক্ষেপ। অন্তহীন ভব্যার্থের সম্ভূতিকে নিয়ে জুয়া খেলবে বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কালের অঙ্গনে। ক্ষণভঙ্গের চটুল ছন্দে নিজেকে সে বেঁধেছে পদে-পদে অনাগতের বিস্ময় ও কৌতুককে আস্বাদন করবে বলে। কি যেন তার হারিয়ে গেছে, আবার তাকে খুঁজে

আনতে হবে। যুগযুগান্তের আকৃতিতে টলমল চিত্তের এষণা আর সাধনা নিয়ে সুখ-দুঃখের ও আলো-ছায়ার জালবোনা সংসারের দুর্গম পথে তাকে চলতে হবে স্বারাজ্যের হৃতগৌরবকে আবার জিনে নিতে। তাই আত্মসংবিৎ ও আত্মসত্তার পূর্ণতাকে সে আড়াল করে রেখেছে, নইলে নিরূঢ় বীর্যের তীক্ষ্ম প্রকাশে আত্মস্বরূপের মহিমাকে উদ্ঘাটিত করবার অবসর সে কোথায় পাবে?

নবম অধ্যায়

স্মৃতি অহন্তা ও স্বানুভব

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে প্রভানুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চাননুভূতং চ সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি॥
প্রশ্নোপনিষৎ ৪।৫

এইখানেই মনরূপী এই দেবতা, একবার যা অনুভব করেছিলেন বারবার তা ফিরে অনুভব করেন স্বপ্নে—যা দেখা এবং না-দেখা, যা শোনা এবং না-শোনা, যা অনুভূত এবং অননুভূত, যা সৎ এবং অসৎ—সব দেখেন তিনি। তিনিই সব তাই দেখেন।

প্রশ্ন উপনিষদ (৪।৫)

স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তদ্ভ্রংশোঽহংত্ববেদনম্।

মহোপনিষৎ ৫।২

স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি; স্বরূপ হতে ভ্রষ্ট হলেই আসে অহন্তার বেদনা।
—মহোপনিষদ (৫।২)

একঃ সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণামস্মদ্ ধৃদো ভূরিজন্মা বি চষ্টে।

ঋগ্বেদ ১০।৫।১

এক সমুদ্ররূপে ধারণ করেছেন যিনি সকল স্রোতের ধারা, বহু জন্মের মধ্যেও এক যিনি, তিনিই দেখছেন আমাদের হৃদয়কে।

—ঋগ্বেদ (১০।৫।১)

মনোময়সত্ত্বের অপরোক্ষ আত্মসংবিৎই আনে তার মধ্যে বিচিত্র প্রত্যক্-বৃত্ত অনুভবের অবিরাম পরম্পরার পিছনে তারই নামরূপহীন শাশ্বত-সদ্ভাবের চেতনা, জীবধাতুর মনোময় ব্যাকৃতির অন্তরালে আবিষ্কার করে জীবচেতনাময় পরা প্রকৃতির নিত্যস্থিতি, অহন্তার পিছনে দেখে আত্মাকে। মনোভূমি অতিক্রম ক'রে এই আত্মসংবিৎ শাশ্বত বর্তমানের কালকলনাহীন নিত্যভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। আত্মসংবিতের এই নিত্যভূমি অবিকল্পিত, ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎরূপ মনঃকল্পিত বিভাগের দ্বারা অপরামৃষ্ট। দেশ- বা নিমিত্ত-ভেদের পরামর্শও তার মধ্যে নাই। কারণ, মনোময় জীব যদিও সচরাচর বলে 'আমি দেহবান্, আমি এখানে, আমি ওখানে, আর-কোথাও থাকব আমি,' তবু অপরোক্ষ আত্মসংবিতে প্রতিষ্ঠিত হলে সে দেখে, এ শুধু তার নিত্যপরিণামী প্রত্যক্-অনুভবের ভাষা—এতে পরিবেশ ও বহির্জগতের সঙ্গে তার বহিশ্চর চৈতনার একটা বহিরঙ্গী সম্বন্ধ মাত্র প্রকাশ পায়। বিবেকদ্বারা এই স্থূল সম্বন্ধ হতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে অনুভব করে—বাইরের এ-বিকারেও তার অপ-

রোক্ষানুভূত আত্মস্বরূপ নির্বিকার, অবিকল্পিত, দেহ মন বা দেহ-মনের কর্মক্ষেত্রের বিপরিণামে অপরামৃষ্ট। অতএব নিজেও সে স্বরূপত অলক্ষণ অব্যবহার্য নির্ধর্মক আপ্তকাম আত্মরতি শুদ্ধ-সন্মাত্রে নিত্যতৃপ্ত নিরঞ্জন চিন্মাত্র-স্বভাব।...এমনি করে আমরা স্থাণু আত্মার অনুভব পাই—শাশ্বত 'অস্মি' অথবা পুরুষবিধতা কি কালকলনাদ্বারা অবিশিষ্ট নির্বিকল্প 'অস্তি'ই যাঁর বাচক।

কিন্তু এই আত্মচৈতন্য একাধারে যেমন কালাতীত, তেমনি মহাকালরূপে আত্মপ্রতিবিম্বিত কালেরও তিনি অধীশ্বর। কাল তাঁর চিত্রবহ অনুভবের নিমিত্ত অথবা প্রত্যক্-বৃত্ত ক্ষেত্র শুধু। তখন 'অহমস্মি' এই তাঁর শাশ্বত শৈব-প্রত্যয়—যার অপরিণামী চিন্ময় ভূমিকায় আবর্তিত হয়ে চলেছে কাল-কলিত চিন্ময় অনুভবের তরঙ্গমালা। বহিশ্চর চেতনায় গ্রহণ-বর্জনের নিত্য দোলা আছে—অনুভবের পুঁজি বাড়িয়ে-কমিয়ে প্রতিমুহূর্তেই সে তার নিজের রূপের অদল-বদল ঘটায়। গুহাচর আত্মা এই বিপরিণামের ভর্তা ও আধার হয়েও স্বয়ং নির্বিকার। কিন্তু বহিশ্চর আত্মার মধ্যে নিয়ত অনুভবের পুষ্টি-সাধনা চলছে, তাই 'পূর্বক্ষণে যা ছিলাম এখনও তা-ই আছি' এমন অবি-সংবাদিত উক্তি করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই বহিশ্চর কালাত্মাতে বাস করে ব'লে অক্ষরস্থিতির দিকে গুটিয়ে আসা বা তার মধ্যে বাস করবার অভ্যাস যাদের নাই, তারা এই স্বতঃপরিণামী মনোময় অনুভবের ওপারে থাকবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। নিত্যস্পন্দিত চিত্তই তাদের আত্মা, তাই অসঙ্গ হয়ে বৃত্তিপরিণামের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে তারা বৈনাশিক বৌদ্ধের মত বলতে পারে : আত্মা বিজ্ঞানসন্তান ও চিত্তের জবন ছাড়া কিছুই নয়। দীপ-শিখার অবিচ্ছেদ-বৃত্তিতা কল্পনা মাত্র। শাশ্বত আত্মা বলে কিছুই নাই—অনুভবসন্তানের পিছনে আছে শুধু নিঃস্বভাব শূন্যতা। জ্ঞানের অনুভব আছে কিন্তু জ্ঞাতা নাই, সত্তার অনুভব আছে কিন্তু শাশ্বত-সৎ বলে কিছু নাই। ক্ষণভঙ্গুর অবয়বের সমাহার থাকলেও সত্যকার অবয়বী নাই। অথচ এই ক্ষণবিধ্বংসী প্রত্যয়ের কল্প-মেলন হতে দেখা দিয়েছে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়ের, সৎ সত্তা ও সত্তানুভবের একটা বিভ্রম।...অথবা কালকবলিত জীবসত্ত্ব এমনও ভাবতে পারে 'একমাত্র কালই তত্ত্ব এবং আমরা কালের বিসৃষ্টি।'...এমনি করে যাঁরা প্রত্যাহারের সাধনা করেন, তাঁদের মতে জগৎ বাস্তব হ'ক কি অবাস্তব হ'ক, তার মধ্যে একটা নিত্যসত্তার বা শাশ্বত আত্মভাবের বিভ্রমই চলছে। আবার যাঁরা অবিচল আত্মস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সব-কিছুতেই চঞ্চল অনাত্মার লীলা দেখেন, তাঁদের মতে কিন্তু শাশ্বত-সন্মাত্রই বাস্তব, আর তার মধ্যে চলছে অবাস্তব জগতের একটা বিভ্রম এবং এই জগৎবিভ্রমও চেতনার একটা কারসাজি শুধু।

কিন্তু কোনও মতবাদের ঝামেলায় না গিয়ে, বহিশ্চর চেতনার তথ্যগুলিকে একবার খুঁটিয়ে দেখা যাক, তার কোনও তত্ত্ব পাই কিনা। প্রথমেই তার নিছক প্রত্যক্-বৃত্তির রূপটি চোখে পড়ে। অবিরাম বয়ে চলেছে ক্ষণ-বিন্দুর একটি ধাবমান স্রোত, মুহূর্তের জন্যেও তাকে স্তম্ভিত করা অসম্ভব। হয়তো দেশসংস্থানের কোনও বিপর্যাস ঘটছে না, কিন্তু তবু প্রতিনিয়ত বিপরিণামের একটা স্পন্দন চলছে—যেমন চেতনাদ্বারা সাক্ষাৎ-অধ্যুষিত দেহপিণ্ডে, তেমনি তার পরোক্ষবাসিত পরিবেশের বিগ্রহে। দুটি আবাসই সমানভাবে তাকে বিক্ষুব্ধ করছে, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধ রয়েছে বলে ক্ষুদ্র আবাসের বিক্ষোভটাই চেতনায় বেশী স্পষ্ট। পিণ্ডদেহের সঙ্গে তার চেতনা সাক্ষাৎযোগে যুক্ত, তাই তার বিকার সহজেই তাকে বিচলিত করে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডদেহের সঙ্গে তার যোগ পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে এবং পিণ্ডের 'পরে ব্রহ্মাণ্ডের অভিঘাতের মধ্যস্থতায়। এইজন্যে বিকারের চেতনাও সেখানে পরোক্ষ। কালপরিণাম অত্যন্ত দ্রুত বলে সহজেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু দেহ ও পরিবেশের বিকার এত দ্রুত নয় বলে সহজে চোখে পড়ে না। অথচ সেও প্রতিমুহূর্তে বাস্তব, তারও গতিরোধ করা আমাদের অসাধ্য। মনোময় জীব তাকে খেয়াল করে, যখন মনোময় চেতনার 'পরে তার প্রভাব পড়ে—মনোময় অনুভব ও মনোময় শরীর যখন তার দ্বারা সংস্কৃত বা বিকৃত হয়। কেননা, পিণ্ড কি ব্রহ্মাণ্ডের নিরন্ত পরিণাম একমাত্র মন দিয়েই সে ধরতে পারে।...অতএব ক্ষণ-বিন্দু ও দেশ-সংস্থানের অবিরাম পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ ও কালদ্বারা অবচ্ছিন্ন সমগ্র পরিবেশের ক্ষণে-ক্ষণে বিপরিণাম ঘটছে এবং তার ফলে মনোময় জীবসত্ত্বেরও অফুরান কায়াবদল হচ্ছে। এই জীবসত্ত্বই আমাদের বহিশ্চর- অথবা আভাস-আত্মার বিগ্রহ। দার্শনিক পরিভাষায় পরিবেশের এই বিপরিণামকে বলে নিমিত্তপ্রবাহ। মনে হয়, এই প্রবাহের মধ্যে পূর্বক্ষণটি যেন পরক্ষণের হেতু, অথবা পরক্ষণটি পূর্বক্ষণাবচ্ছিন্ন পাত্র- শক্তি- বা বস্তু-সমূহের পরিণাম। অথচ যাকে আমরা 'হেতু' বলছি, আসলে তা হয়তো 'প্রত্যয়' মাত্র।...অতএব অপরোক্ষ আত্মসংবিৎ ছাড়া মনের অল্পাধিক অপরোক্ষ এবং নিত্যপরিণামী একটা প্রত্যক্-অনুভব আছে। এই অনুভবকে সে দু'ভাগে ভাগ করেছে : একটি প্রত্যক্-বৃত্ত অনুভব—তার চিত্তসত্ত্বের অফুরন্ত বৃত্তিপরিণামকে আশ্রয় ক'রে, আরেকটি নিত্যপরিবর্তমান পরিবেশের পরাক্-বৃত্ত অনুভব। মনে হয় এই পরিবেশই বুঝি অংশত বা পুরাপুরি তার চিত্ত-সত্ত্বকে গড়ে তুলছে—কিন্তু আসলে চিত্তসত্ত্বের ব্যাপারদ্বারাও পরিবেশের বিপরিণাম চলছে।...বস্তুত এসমস্ত অনুভবই প্রত্যক্-বৃত্ত—কেননা যাকে পরাক্-বৃত্ত বলেছি, তাকেও মন জানে প্রত্যক্-চেতনারই বৃত্তি দিয়ে।

স্মৃতির যে কতখানি গুরুত্ব, এই প্রত্যক্-অনুভবের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট হয়ে

ওঠে। অপরোক্ষ আত্মসংবিতের বেলায় স্মৃতি শুধু মনকে তার অতীত সত্তা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল এবং অতীত ও বর্তমান একই মনের ধারাবাহিকতাকে দিয়েছিল নৈশ্চিত্যের মর্যাদা। কিন্তু বৈশিষ্ট্যাবগাহী অথবা বহিশ্চর প্রত্যক্-অনুভবে স্মৃতির গুরুত্ব ফুটে ওঠে অতীত ও বর্তমান অনুভবের মধ্যে সেতুবন্ধনে, যাতে বহিশ্চর মনের খাপছাড়া অগোছাল ভাব দূর হয়ে তার ব্যাপ্রিয়ায় একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তাহলেও স্মৃতির ব্যাপারকে অতিরঞ্জিত করে দেখা আমাদের উচিত হবে না, অথবা তার 'পরে চেতনার সেইসব বৃত্তি আরোপ করা চলবে না যা বস্তুত মনোময়সত্ত্বের আর-কোনও শক্তিবিশেষের বিভূতি। আমাদের অহংবোধ যে কেবল স্মৃতি দিয়ে গড়া, তা নয়। ইন্দ্রিয়মানস এবং সমন্বয়ী বুদ্ধির মাঝে স্মৃতির শুধু দূতীয়ালি চলে : বুদ্ধির কাছে সে এনে হাজির করে অতীত অনুভবের যত সঞ্চয়, যাকে বহিশ্চর জীবনের ক্ষণপরম্পরার অভিযানে বয়ে বেড়াতে পারে না বলেই মন অন্তঃপুরের অন্তরালে গোপন রাখে।

একটু বিশ্লেষণে কথাটা ধরা পড়ে। সমস্ত মানসব্যাপারেরই চারটি উপাদান আছে : মনশ্চেতনার বিষয়, বৃত্তি, নিমিত্ত এবং বিষয়ী। অন্তরাবৃত্তচক্ষু সাক্ষীর প্রত্যক্-অনুভবে বিষয় হল চেতনসত্ত্বেরই কোনও অবস্থা বৃত্তি বা তরঙ্গ—যেমন ক্রোধ হর্ষ শোক ইত্যাদি কোনও বেদনা, ক্ষুৎ-পিপাসা প্রভৃতি প্রাণজ তৃষ্ণা, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি অন্তঃপ্রাণের কোনও সংবেগ, অথবা ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান বা কোনও মননবৃত্তি। মনশ্চেতনার বৃত্তি বা ক্রিয়া বলতে বুঝি, সাক্ষীর দ্বারা এইসব মনোভাবের পর্যবেক্ষণ বা বিচার, অথবা তাদের একটা মানস সংবেদন মাত্র—যার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও বিচার সংবৃত্ত এমন-কি নিশ্চিহ্নও হয়ে থাকতে পারে। চিত্ত-পুরুষ তখন বৈশিষ্ট্যাবগাহী বৃত্তি দিয়ে মনের ক্রিয়া এবং বিষয়কে কখনও পৃথক করে, কখনও-বা মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে দেয়। উদাহরণরূপে বলা চলে : একসময় চিত্ত-পুরুষ যেন ক্রোধচেতনার বৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তখন সে বৃত্তির বিবিক্ত মন্তা কি দ্রষ্টা নয়, অথবা বৃত্তির বেদনা বা ক্রিয়ার 'পরে তার কোনও প্রশাসন নাই। আবার কখনও সে বৃত্ত্যাকার হয়েও বৃত্তির সাক্ষী ও মন্তা—তখন তার মনে জাগে 'আমি ক্রুদ্ধ' এই অনুব্যবসায়। প্রথম কল্পে বিষয়ী বা চিত্ত-পুরুষ, চিত্তের প্রত্যক্-অনুভবের বৃত্তি এবং তার বিষয়রূপে মনোধাতুর ক্রোধময় পরিণাম—সব মিলেমিশে সৃষ্ট হয়েছে স্পন্দিত চিৎশক্তির একটা উদ্বেলন। কিন্তু দ্বিতীয় কল্পে আছে তার একটা ত্বরিত বিশ্লেষণ এবং বিষয় হতে প্রত্যক্-অনুভবের অংশত-বিবিক্ত একটা বৃত্তি। এই তটস্থপ্রায় বৃত্তির সহায়ে আমরা চিৎশক্তির স্পন্দ ও পরিণামের অনুভবে প্রত্যক্-চেতনার স্ফুরন্ত রূপটিই যে আস্বাদন করি তা নয়—বিবিক্ত হয়ে সাক্ষীর ভূমিকায় থেকে

নিজেকেও খুঁটিয়ে দেখি। এমন-কি তটস্থভাব প্রবল হলে ভাব ও কর্মকে অথবা বৃত্তিসারূপ্যকে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকারও আমাদের জন্মায়।

কিন্তু সাক্ষীর এই আত্মপর্যবেক্ষণের মধ্যে সাধারণত কিছু খুঁত থেকে যায়। কারণ, এসবজায়গায় বিষয় হতে বৃত্তিরই আংশিক বিবেক ঘটে মাত্র—অর্থাৎ চিত্ত-পুরুষ চিত্তবৃত্তি হতে একেবারে আলাদা হয়ে যায় না, বরং দুয়ে মিলেমিশে একাকার হবার সম্ভাবনাই হয় প্রবল। চিত্ত-পুরুষ বেদনাবৃত্তির সঙ্গে সারূপ্য হতেও নিজেকে পুরাপুরি বাঁচাতে পারে না। আমি যখন ক্রুদ্ধ, তখন আমার সংবিতে আছে আমারই চেতনাধাতুর ক্রোধময় পরিণামের একটা প্রত্যয় এবং সেই পরিণামেরও একটা সাক্ষিপ্রত্যয়। কিন্তু এই সাক্ষি-প্রত্যয়ও যে বৃত্তির পরিণাম—আমার স্বরূপ নয়, একথা আমার খেয়ালে আসে না। তাই চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আমিও একাকার হয়ে জড়িয়ে যাই—কোনমতেই নিজেকে স্ব-তন্ত্র ও বিবিক্ত করে রাখতে পারি না। অর্থাৎ অনুব্যবসায়ের সময়ও আমার মধ্যে পূর্ণবিবিক্ত অপরোক্ষ আত্মসংবিৎ জাগেনি। তখনও আমি বৃত্তিপরিণাম এবং তার অনুব্যবসায় হতে পৃথক নই। যে-চিৎশক্তি আমার মনোময় ও প্রাণময় প্রকৃতির উপাদান, তার বিপুল সমুদ্রে আমার এই বৃত্তিচৈতন্যের তরঙ্গমালা উত্তাল হয়ে উঠেছে—আমিও এক হয়ে আছি তাদের সঙ্গে। চিত্ত-পুরুষকে যখন প্রত্যক্-অনুভবের বৃত্তি হতে সম্পূর্ণ পৃথক করি, তখন আমার মধ্যে প্রথম জাগে বিশুদ্ধ অহন্তার সংবিৎ এবং সবার শেষে ফোটে সাক্ষিপুরুষ বা মনোময়পুরুষের পূর্ণ চেতনা। এ-পুরুষই ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধকে দর্শন করেন, কিন্তু ক্রোধ কি দর্শন কারও বৃত্তিদ্বারা তাঁর স্বরূপ সীমিত বা পরামৃষ্ট হয় না। অগণিত বৃত্তি ও অনুব্যবসায়ের অফুরন্ত পরম্পরার তিনি সাক্ষী। এও তিনি জানেন, এই পরম্পরা তাঁর স্বরূপের পরিণাম। আবার স্বরূপকে তিনি এই পরম্পরার অন্তর্গূঢ় অবিকল্পিত ভর্তা ও আধাররূপে অনুভব করেন। তাঁর চিৎশক্তির নিত্যপরিণামী রূপায়ণ বা ঋতায়নেও তাঁর স্বরূপস্থিতি ও সন্ধিনীশক্তির মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব একাধারে তিনি যেমন অক্ষরস্বভাবে স্থিত কালাতীত আত্মা, তেমনি আবার নিত্যসম্ভূত কালকলনাময় আত্মাও।

স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে দুটি আত্মার কথা হচ্ছে না। একই চিৎসত্তা চিৎশক্তির তরঙ্গদোলায় নিজেকে উদ্বেল করেছেন—নিজেরই বিচিত্র স্পন্দ-পরম্পরায় নিজেকে আস্বাদন করবেন বলে। কিন্তু এই উদ্বেলনে তাঁর তাত্ত্বিক কোনও বিকার, কোনও ক্ষয় কি উপচয় ঘটছে না। যে জড় বা শক্তি জড়জগতের আদি উপাদান, বৈজ্ঞানিক বলেন অবয়বসংযোগের নিত্য অদলবদলেও তার কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এও ঠিক তা-ই—যদিও প্রাকৃত প্রমাতার দৃষ্টিতে দেখা দেয় রূপের নিত্যপরিণাম। কেননা, প্রমাতার প্রত্যক্ষ পরিচয় শুধু

প্রতিভাসের সঙ্গে, তার অন্তরালে যে সত্তা শক্তি বা উপাদান রয়েছে তার কোনও খবর সে রাখে না। কিন্তু ওই গুহাচরের বার্তা যখন তার চেতনায় পৌঁছয়, তখন দৃষ্ট প্রতিভাসকে সে অবাস্তব বলে উড়িয়েও দিতে পারে না। প্রমাতা তখন দেখে, একদিকে আছে অবিকারী এক সত্তা শক্তি বা উপাদানতত্ত্ব—তার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলেই তাকে প্রাতিভাসিক বলা যায় না; তেমনি আরেকদিকে আছে ওই তত্ত্বস্তুর সম্ভূতি—তার সত্য পরিণাম বা বাস্তব আ-ভাস। এই সম্ভূতি বা পরিণামকে আমরা বলি প্রতিভাস, কেননা ব্যাবহারিক ভূমিতে চেতনায় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রিয়সংবিতের প্রয়োজনায় তার রূপ ফোটে পরোক্ষ হয়ে—অপরোক্ষ-চৈতন্যের অনুপহিত অখণ্ডব্যাপ্তি ও সর্বাবগাহী সম্ভূতিসংবিতের দীপ্তিতে তার মর্মপরিচয় ধরা পড়ে না। আত্মার বেলাতেও তা-ই। অপরোক্ষ আত্মসংবিতে তিনি সৎ, অপরিণামী। কিন্তু মনোময় সন্নিকর্ষ ও অনুভবে সম্ভূতির চিত্রলীলায় তিনি নিত্যপরিণামী। তাঁর এই পরিণামী রূপটিকেই আমরা চিনি—চেতনার অনুপহিত শুদ্ধবিজ্ঞান দিয়ে নয়, তার মনোময় উপাধির পরকলার ভিতর দিয়ে।

এই-যে অনুভবের পরম্পরা, চিত্তবৃত্তির দ্বারা উপহিত প্রমাতৃচৈতন্যের এই-যে পরোক্ষ বা গৌণ ব্যাপার—স্মৃতির প্রয়োজন এইখানেই। ক্ষণভঙ্গ আমাদের চিত্তবৃত্তির একটি মৌলধর্ম। নিজেকে ক্ষণপরম্পরায় বিশ্লিষ্ট না করে সে তার অনুভবের সংহতিকে খুঁজে পায় না কি ধরে রাখতে পারে না। পরিণামের যে-তরঙ্গকে অথবা সত্তার যে-চিৎস্পন্দকে সদ্য-সদ্য জানছি, তার বেলায় স্মৃতির ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন। আমি রেগে উঠলাম—এটা হল সম্মুগ্ধ প্রত্যয়ের ব্যাপার, স্মৃতির নয়। দেখছি যে আমি রেগেছি—এটাও স্মৃতির নয়, ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানের ব্যাপার। কিন্তু অনুভবকে কালপরম্পরার সঙ্গে যখন যুক্ত করি, অখণ্ড বৃত্তিপরিণামকে যখন ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরম্পরায় ভেঙে বলি 'এইতো এখনি রেগে উঠেছিলাম' কিংবা 'রেগে আছি—এখনও রাগ পড়েনি' অথবা 'একবার রাগ ধরেছিল, আবার যদি এমনটি ঘটে তাহলে আবার রাগব', তখনই অনুভবের সঙ্গে স্মৃতিও যোগ দেয়। বর্তমান বৃত্তিপরিণামের সঙ্গেও স্মৃতির সাক্ষাৎ যোগ ঘটে, যখন তার নিমিত্ত হয় অংশত বা সম্পূর্ণ অতীতের কোনও ঘটনা। যেমন, বর্তমানের সদ্যোনিমিত্তের বশে নয়, কিন্তু অতীতের কোনও অন্যায় কি দুঃখের স্মৃতিতে এখন যদি নতুন করে চিত্তে শোক বা রাগের ভাব জাগে; অথবা কোনও সদ্যোনিমিত্ত যদি অতীত নিমিত্তের স্মৃতি জাগিয়ে এখন ওই ভাবের সৃষ্টি করে। অতীত অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে চেতনার অন্তরালে অধিচেতন হয়ে। শুধু-যে আছেই, তা নয়—তার ক্রিয়াও অনেকসময় বর্তমানে প্রসর্পিত হয়। কিন্তু তবু তাকে চেতনার উপরমহলে ধরে রাখতে পারি না, তাই হারামণির কোঠা হতে আবার তাকে খুঁজে বার

করতে হয়। এইটি আমরা করি অন্তঃকরণের যে উদ্বোধনী ও সংযোজনী বৃত্তি দিয়ে, তাকে বলি স্মৃতি। বহিশ্চর মনোময় অনুভবের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এখন যার অস্তিত্ব নাই, অন্তঃকরণের আরেকটি বৃত্তি দিয়ে তাকে আমরা চেতনার পুরোভাগে টেনে আনি। এই বৃত্তিকে বলি কল্পনা। স্মৃতির চেয়েও তার শক্তি বড়—কেননা সাধ্য হ'ক বা অসাধ্য হ'ক, ভব্যার্থের বিপুল সমারোহকে সে-ই আমাদের অবিদ্যার আসরে নামিয়ে আনে।

কালিক পরম্পরার মধ্যে আমাদের অনুভবের যে-অবিচ্ছেদবৃত্তিতা, তাও মূলত স্মৃতিধর্মী নয়। এমন-কি স্মৃতির কোনও প্রয়োজনই থাকত না, যদি ব্যাবহারিক চেতনায় একটা অখণ্ড ব্যাপ্তি থাকত—ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে তাকে যদি ছুটতে না হত মুষ্টিচ্যুত পূর্বক্ষণকে পিছনে ফেলে অথচ অনধিগত পরক্ষণের এতটুকু আভাস না পেয়েও। কালোপহিত সম্ভূতির তত্ত্ব কি অনুভব স্বগতভেদশূন্য একটা প্রবাহ বা সমুদ্রের মত। শুধু অবিদ্যার সংকীর্ণ বৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাক্ষী চৈতন্যই ভেদবুদ্ধি দিয়ে তাকে খণ্ডিত করে, কেননা স্রোতের উপর চঞ্চলপক্ষ পতঙ্গের মত তাকেই কেবল ক্ষণে-ক্ষণে এদিক-ওদিক ছুটতে হয়। তেমনি দেশোপহিত সদ্‌ভাবও যেন স্বগতভেদহীন একটা প্রবহন্ত সমুদ্র। তারও মধ্যে শুধু ওই সাক্ষী চৈতন্যই খণ্ডতা দেখে, কেননা ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রসার সঙ্কীর্ণ বলে সমগ্রের অংশটুকু তার নজরে পড়ে। তাই অখণ্ড বস্তুর বহুধা-রূপায়ণকে সে স্বয়ংসিদ্ধ বিবিক্ত বস্তুর রূপ দেয়—যেন তারা অখণ্ড অধিষ্ঠান হতে স্ব-তন্ত্র এক-একটি তত্ত্ব। দেশে ও কালে বস্তুর একটা সংস্থান কি বিন্যাস থাকলেও, তার মধ্যে একমাত্র অবিদ্যাই ভেদ বা ফাঁকের কল্পনা করে। মনঃকল্পিত এই ফাঁকটুকু পুরতে কি ভেদটুকু জুড়তেই চিত্তবৃত্তির নানা কসরত আমাদের প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে একটি হল স্মৃতি।

আমার মধ্যে সংসার-সমুদ্রের একটা বিপুল প্রবাহ বয়ে চলেছে। ক্রোধ হর্ষ শোক প্রভৃতি চিত্তের বৃত্তি ওই অবিচ্ছেদ প্রবাহের একটা দীর্ঘানুবৃত্ত তরঙ্গ মাত্র। স্মৃতির সংবেগ এই অনুবৃত্তির সাধন নয়—যদিও প্রবাহের বুকে যে-তরঙ্গ হয়তো মিলিয়ে যেত, তার আয়াম বা আবৃত্তির সহায় সে হতে পারে। বস্তুত চেতনায় ঢেউ জাগে কি তার দোলন চলে আধারে অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রবেগে—তার স্বতঃপ্রবৃত্ত বিক্ষোভের ধাক্কায় এগিয়ে চলে আমার বৃত্তির প্রবাহ। স্মৃতি শুধু এই বিক্ষোভের মেয়াদ বাড়ায়। তার জন্যে, হয় সে চিত্তের ভাবনাকে আবার বিক্ষোভের নিমিত্তের সঙ্গে জুড়ে দেয়, নয়তো চিত্তের বেদনায় তার প্রথম হলকাকে জাগিয়ে তোলে। এইভাবে সে বিক্ষোভের আবৃত্তির একটা সার্থকতা সপ্রমাণ করে। নইলে বিক্ষোভ একবার দেখা দিয়েই হয়তো মিলিয়ে যেত, আবার ঠিক অনুরূপ নিমিত্ত উপস্থিত না হলে তার ব্যুত্থান অসম্ভব হত। একই অথবা অনুরূপ নিমিত্তের বশে একই

তরঙ্গের স্বাভাবিক ব্যুত্থানকেও স্মৃতি-জন্য বলা চলে না—অভিনব বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভেরই মত; স্মৃতি শুধু আবৃত্তির সহায়ে বিক্ষোভকে পাকা করে, মনকে আরও তার অধীন করে। জড়জগতে যেমন শক্তি ও রূপধাতুর লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে একই কার্য-করণের যান্ত্রিক আবৃত্তি দেখি, মনের জগতেও দেখি ঠিক একইধরনে নিমিত্তের আবৃত্তিতে চলছে পরিণামের আবৃত্তি—যদিও এখানে মনঃশক্তির স্বৈরিতা আর মনোধাতুর সাবলীলতা অনেক বেশী। অতএব এমন কথাও বলা চলে, নিখিল প্রাকৃতশক্তির মধ্যেই অবচেতন একটা স্মৃতির লীলা আছে—শক্তির সঙ্গে শক্তি-পরিণামের গাঁটছড়া সে-ই বেঁধেছে। তাহলে কিন্তু স্মৃতি শব্দটার অর্থব্যাপ্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমরা এইটুকু বলতে পারি, চিৎশক্তির তরঙ্গবৃত্তি আবৃত্তিধর্মী। এইভাবে সে তার নিজের স্বরূপ-ধাতুর বিচিত্র স্পন্দনকে নিয়মের বন্ধনে বাঁধে। সত্য বলতে, স্মৃতি সাক্ষী মনের একটা কৌশল মাত্র। এই কৌশলে সে তার পৌনঃপুনিক স্পন্দনবৃত্তির মালাকে কালের কলনায় গেঁথে নেয়। তাতে তার অনুভব কালের ছন্দে রূপায়িত হয়। বিচ্ছিন্ন বৃত্তিকে সংহত ও সুসম্বন্ধ ক'রে তার সংকল্পশক্তি যেমন তাদের আরও কার্যোপযোগী করে তোলে, তেমনি বুদ্ধিশক্তিও তাদের দেয় উত্তরোত্তর উপচীয়মান অর্থব্যঞ্জনার মর্যাদা। পূর্ব্য অচিতির মধ্যে যে পরিস্ফুট আত্মচেতনার সাধনা চলেছে, মনোময় জীব যে-সাধনায় আত্মপরি-ণামের লীলায়নে ফুটিয়ে তুলছে আত্মবিদ্যার অরুণ আলো—স্মৃতি সেই সাধনার একটা মুখ্য ও অপরিহার্য সাধন। কিন্তু তাবলে সে-ই একমাত্র সাধন নয়। এই সাধনা ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ চিত্তের জ্ঞানা- ও ইচ্ছা-শক্তির সমন্বয়ী বৃত্তি প্রত্যক্-অনুভবের সমস্ত উপাদানকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে অখণ্ড সৌষম্যের সুরে ঝঙ্কৃত করে না তুলতে পারে। অন্তত এই তো দেখছি প্রকৃতি-পরিণামের তাৎপর্য। এইভাবে সে জড়জগতের আপাত-মননহীন আত্মনিবিষ্ট শক্তির মূর্ছাভঙ্গে ধীরে-ধীরে জাগিয়ে তুলছে মনের দীপনী।

মনোময় অবিদ্যার অরেকটি সাধন হল অহংবোধ, মনোময় জীব যা দিয়ে নিজের সংবিৎ পায়—যা শুধু তার প্রবৃত্তির বিষয় নিমিত্ত ও ব্যাপারেরই চেতনা নয়, তাদের অনুভাবিতারও চেতনা। প্রথমত মনে হয় স্মৃতিই বুঝি অহং-বোধের একমাত্র উপাদান, সে-ই বুঝি বলে যায় 'যে-আমি রেগে উঠেছিলাম একটু-আগে, সেই আমিই আবার রেগেছি কি এখনও রেগে আছি।' কিন্তু বস্তুত স্মৃতি তার নিজের চেষ্টায় এইটুকু শুধু বলতে পারে, 'চিত্তবৃত্তির একই আসরে ঘটেছে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি।' আসলে এখানে দেখা দিয়েছে মনোধর্মের একটা ব্যুত্থান, অর্থাৎ মনোধাতুর উদ্বেল তরঙ্গের একটা পুনরুচ্ছ্বাস—অলৌকিক সন্নিকর্ষ দিয়ে মন যার প্রত্যক্ষ অনুভব পায়;

স্মৃতি এই বিভিন্ন ক্ষণের আবৃত্তির মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়, যাতে অন্তঃকরণ বুঝতে পারে—এসব একই মনোধাতুর একধরনের স্ফুরদ্রূপ এবং একই অন্তঃকরণ তাদের গ্রহীতা। অহংবোধ স্মৃতির পরিণামও নয়, কৃতিও নয়। সে যেন চিত্তের একটা নিত্যস্থায়ী ধ্রুববিন্দু, যাকে আঁকড়ে ধরে অন্তঃকরণ চিত্তক্ষেত্রে নিজের সঞ্চরণকে ছন্দোময় করে—নইলে তাকে এলোমেলোভাবে চারদিকে ছিটকে বেড়াতে হত। অহন্তার স্মৃতিতে অন্তঃকরণের এই ধ্রুবলক্ষ্য পুষ্ট হয়, স্থির হয়—কিন্তু তাবলে স্মৃতিই তার উপাদান নয়। খুব সম্ভব ইতর প্রাণীর মধ্যে এই ব্যষ্টিত্বের বোধ বা অহংচেতনা খুব গভীর নয়। ইন্দ্রিয়চেতনাকে আশ্রয় করে কালের প্রবাহে ভেসে চলেছে শুধু আত্মসারূপ্য ও অন্যাবিবিক্ততার একটা অস্পষ্ট কিংবা অনতিস্পষ্ট অনুবৃত্তিবোধ—বিশ্লেষণ করলে পরে পশুর অহংএর এই চেহারাই আমরা দেখব। কিন্তু মানুষের মধ্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনের জ্ঞানা-শক্তির একটা সমন্বয়ী বৃত্তি, যা অন্তঃকরণ- ও স্মৃতি-বৃত্তির সমবায়ে অহন্তার সুস্পষ্ট একটা চেতনা গড়ে তোলে (অবশ্য তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অহংবোধের অব্যভিচরিত আদিম বোধিপ্রত্যয়টুকুও)। এই অহংকে কেন্দ্র করেই তরঙ্গিত হয় 'সংজ্ঞা' বেদনা ভাবনা ও স্মৃতি। স্মৃতি থাক্ না থাক্, সব বৃত্তির মূলে যে একই অহং তাতে কোনও সংশয় নাই। সমন্বয়ী বৃত্তি বলে : এই হাজার রূপবৈচিত্র্যসত্ত্বেও সচেতন মনোধাতু একই চেতনপুরুষের বিভূতি; বোধ বা বোধের নিবৃত্তি, স্মৃতি বা বিস্মৃতি, বহিশ্চর চেতনা অথবা সুষুপ্তিতে নিমগ্ন অন্তরাবৃত্ত চেতনা—সমস্তই তার বৃত্তি। স্মৃতি গড়বার আগেও সে যেমন ছিল, তেমনি তার পরেও আছে। শৈশবে-বার্ধক্যে, নিদ্রায়-জাগরণে, আপাত-চেতনায় বা আপাত-অচেতনায় জেগে আছে সে-ই। যে-কাজের স্মৃতি আছে অথবা যার স্মৃতি নাই—সবারই সে কর্তা। তার আত্মভাবের সকল বিপরিণামের অন্তরালে সে-ই রয়েছে নিত্যস্থির।...মানুষের মধ্যে জ্ঞানা-শক্তির এই-যে সমন্বয়ী বৃত্তি, এই-যে আত্মসংবিৎ ও প্রত্যক-অনুভবের রূপবিগ্রহ, পশুর স্মৃতিপুটিত ও ইন্দ্রিয়পুটিত অহন্তার চাইতে অনেক উচ্চে এর স্থান—অতএব একেই যথার্থ আত্মবিজ্ঞানের প্রতিবেশী বলতে পারি।...প্রকৃতির ব্যক্ত এবং অব্যক্ত লীলার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেও দেখি, যেখানেই অহন্তার বোধ বা স্মৃতি আছে, তারই পিছনে আছে জ্ঞানা-শক্তির একটা অন্তর্গূঢ় সমন্বয়ী বৃত্তি। বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তির আশ্রয়ে থেকে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে এই অহন্তাকে সে-ই ফুটিয়ে তুলছে। প্রকৃতি-পরিণামের আধুনিক পর্বে এই সমন্বয়ী বৃত্তি মানুষের বুদ্ধিতে সর্বাধিক বিকসিত, যদিও বুদ্ধির প্রবৃত্তিতে ও উপাদানে এখনও অনেক কুণ্ঠা এবং অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অচিতিরও অন্তরালে অবচেতন বিজ্ঞানের একটা প্রেতি, বস্তুর স্বভাবে নিরূঢ় এক মহত্তর প্রজ্ঞার অনু-

শাসন প্রচ্ছন্ন রয়েছে—যা বিশ্বসম্ভূতির প্রমত্ততম তাণ্ডবের মধ্যেও রণিত করে সমন্বয়ের একটা ছন্দ, বুদ্ধিকৃত নিয়ন্ত্রণের আনে একটা আভাস।

একটা ব্যাপারে স্মৃতির গুরুত্ব বিশেষ করে নজরে পড়ে। একই আধারে কখনও-কখনও ব্যক্তিসত্তার একটা দ্বৈতভাব ব্যাসঙ্গ বা বিযোজন দেখা দেয়। পর-পর বা পর্যায়ক্রমে একই মানুষ অহংএর দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক ভূমিকায় তার স্মৃতি শুধু সেই ভূমিকার অনুভব ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়—অপর ভূমিকার কথা তার মনেও থাকে না। এতে মনে হয়, বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তা যেন দানা বেঁধে উঠেছে একই মানুষের মধ্যে। কেননা, এক ভূমিকায় সে যে-মানুষ, আরেক ভূমিকায় সে-মানুষ সে নয়—তখন তার নাম-গোত্র ভাবনা-বেদনা সবারই রূপান্তর ঘটেছে। এ-অবস্থায় স্মৃতিই ব্যক্তি-সত্তার সবখানি—এমন কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।...কিন্তু অহংএর বিযোজন না ঘটেও স্মৃতির বিযোজন ঘটতে পারে—যেমন সম্মোহিত দশায়। সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে কখনও অনুভব ও স্মৃতির এমন-একটা রাজ্য ভেসে ওঠে, যার সঙ্গে তার জাগ্রতের কোনই পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাবলে নিজেকে সে আলাদা একটা মানুষ মনে করে না। আবার কখনও মানুষ অতীত জীবনের সব কথা এমন-কি নিজের নাম শুদ্ধ ভুলে যায়, তবুও তার অহংবোধ বা ব্যক্তি-সত্তার কোনও বিপর্যয় ঘটে না। তাছাড়া চেতনার এমন ভূমিও আছে, যেখানে স্মৃতির ফাঁক না থাকলেও আধারের অতিদ্রুত পরিবর্তনে মনশ্চেতনার এমন আশ্চর্য রূপান্তর হয় যে, নূতন ব্যক্তিসত্তা নিয়ে মানুষের যেন নবজন্ম ঘটে। সে-রূপান্তর এত আমূল যে, মনের যোগসূত্র না থাকলে তার অতীতকে সে বর্তমানের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে স্বীকারই করত না—যদিও সে বেশ জানে, তার জন্মান্তর ঘটেছে এই দেহে এবং এই মনোধাতুতেই।...অন্তঃকরণকে ভিত্তি করে প্রত্যক্-অনুভবী মন স্মৃতির সুতায় তার অনুভবের মালা গেঁথে চলে। কিন্তু তার মধ্যে মনের সমন্বয়ী বৃত্তিই স্মৃতির আহৃত সকল উপকরণকে, তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যোগাযোগকে সুসম্বন্ধ করে জুড়ে দেয় একটি 'আমি'র সঙ্গে—যে-আমি অনুভব ও ব্যক্তিসত্তার বৈচিত্র্য এবং কালের ক্ষণভঙ্গ সত্ত্বেও সর্বদা একরূপ।

মনোময় জীবের অহংবোধ তার যথার্থ আত্মবোধ-স্ফুরণের উদ্যোগপর্ব মাত্র। অচিতি হতে আত্মচৈতন্যের দিকে, আত্ম-অবিদ্যা ও বিশ্ব-অবিদ্যা হতে পূর্ণ-বিদ্যার দিকে শরীরী মনের অভিযান চলেছে। তার মধ্যে একটিজায়গায় এসে সে এই অহংএর পরিচয় পেল, যার নিত্য-সদ্ভাবে তার বহিশ্চর চেতনা-বিভূতির বিচিত্র প্রত্যয় গাঁথা রয়েছে। এই অহংকে চেতনাবিভূতির সঙ্গে খানিকটা সে ঘুলিয়ে ফেলে। আবার আরেকদিকে তাকে মনে করে প্রাকৃত-বিপরিণাম হতে বিবিক্ত একটা উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব—হয়তো-বা শাশ্বত ও নির্বিকার

একটা সত্ত্ব।...শেষ-পর্যন্ত, সমন্বয় করতে গিয়ে ভেঙে-দেখা যে-বুদ্ধির স্বভাব, তার পরামর্শে প্রত্যক্-অনুভবকে সে শুধু বি-ভূতির ক্ষেত্রে সীমিত রাখতে পারে। ভাবতে পারে : নিত্যবিপরিণামই আত্মভাবের স্বরূপ, এছাড়া স্থাণু-ভাবের কল্পনা মনের একটা খেয়াল মাত্র। থাকা নয়—হওয়াই সত্তার তত্ত্ব।... পক্ষান্তরে শাশ্বত-সদ্‌ভাবের অপরোক্ষ চেতনাতে প্রত্যক্-অনুভবকে সে নিরুদ্ধ রাখতে পারে—বিভূতিস্পন্দের সংবিৎকে এড়িয়ে যাবার উপায় না থাকলেও, কিংবা তাকে ইন্দ্রিয় ও মনের মায়া কি কালগ্রস্ত অবরসত্তার একটা বিভ্রম বলে নিরাকৃত করতে পারে।

কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট। বিবিক্ত অহংবোধের উপর যে-আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, তা অসম্পূর্ণ। একমাত্র বা মুখ্যত একে আশ্রয় ক'রে এমন-কি এর প্রতিক্রিয়াবশে যে জ্ঞানের সৌধ রচিত হবে, তাকেও পূর্ণাঙ্গ কি দৃঢ়মূল বলা নিরাপদ হবে না। প্রথমত এধরনের জ্ঞান শুধু আমাদের বহিশ্চর চিত্তবৃত্তির লীলা। এই আধারে আত্মবিভাবনার যে বিপুল উচ্ছলন অন্তর্গূঢ় হয়ে চলেছে, তার সম্পর্কে একে জ্ঞান না বলে বলতে পারি অজ্ঞান।...দ্বিতীয়ত, ব্যষ্টি আত্মার সীমিত অনুভবের মধ্যে সত্তা ও পরিণামের যেটুকু তত্ত্ব আছে, এ-জ্ঞানে কেবল তার পরিচয় মেলে। তার বাইরে সমস্ত বিশ্বই তার কাছে অনাত্মা। অর্থাৎ বিশ্বকে সে আত্মার আত্মীয় বলে জানে না—তার বিবিক্ত চেতনার কাছে ও যেন বাইরের একটা-কিছু। তার কারণ, ব্যষ্টির আত্মসত্তা ও আত্মপরিণাম তার কাছে অপরোক্ষ, কিন্তু এই বিপুল বিশ্বসত্তা ও বিশ্ব-প্রকৃতি তো অপরোক্ষ নয়। এখানেও দেখছি, অজ্ঞানের বিপুল অমানিশার বুকে খণ্ডজ্ঞানের শুধু একটি খদ্যোতিকা!...তৃতীয়ত, এ-জ্ঞানে পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানের অথবা অখণ্ড বোধিচেতনার ভিত্তিতে সত্তা ও পরিণামের সত্য সম্পর্কের পরিচিতি হয় না। অবিদ্যা বা খণ্ডিত-বুদ্ধিই সে-পরিচয়সাধনের ভার নেয়। তার ফলে, পরমজ্ঞানের অভিযাত্রী মনের তীব্রসংবেগ প্রাকৃত বুদ্ধি এবং সঙ্কল্পের সংযোজনী ও বিযোজনী বৃত্তি দিয়ে অনুত্তরের রহস্য ভেদ করতে চায়। অতএব আমাদের বর্তমান অনুভব ও সম্ভাবনার মাপকাঠিতে বিচার ক'রে অখণ্ডসত্তাকে সে দ্বিখণ্ডিত করে এবং তার একটি কোটিকে যুক্তির শাণিত আঘাতে ছেঁটে ফেলে। এই ঐকান্তিক সাধনায় কেবল এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, মনোময় জীব একদিকে যেমন পরিণামের সকল লীলাকে আপাতদৃষ্টিতে নস্যাৎ ক'রে অপরোক্ষ আত্মসংবিতে সমাহিত হতে পারে, তেমনি আবার স্থাণু আত্মসংবিৎকেও আপাতত বাদ দিয়ে শুধু পরিণামের লীলাতেও সে অভি-নিবিষ্ট হতে পারে। মনের দুটি দিক তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উপেক্ষিত পক্ষকে তারা অবাস্তব অথবা চিত্তের একটা খেয়াল মনে করে। এক-পক্ষ বলে : ব্রহ্ম আত্মা বা জগৎ আপেক্ষিক সত্য মাত্র; এরা মনগড়া তত্ত্ব,

অতএব যতক্ষণ মনের বৃত্তি ততক্ষণ এদের আয়ু। তেমনি আবার আরেক পক্ষ বলে : জগৎ আত্মার একটা অর্থক্রিয়াকারী স্বপ্ন মাত্র; অথবা ব্রহ্ম ও আত্মা মনের একটা বিকল্প বা অর্থক্রিয়াকারী একটা বিভ্রম। এতেই প্রমাণ হয়, প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সত্তা আর পরিণামের সত্য সম্পর্কটি ধরা পড়েনি। কেননা একদেশী জ্ঞানের 'পরে নির্ভর বলে এ-দুটির মাঝে বিরোধকেই সে দেখেছে —সমাধানের কোনও ইঙ্গিত সে খুঁজে পায়নি।...কিন্তু অভঙ্গ সম্যক্-জ্ঞান চিৎপরিণামের লক্ষ্য। বুদ্ধির ছুরিতে চেতনার একটি বিভাবকে আরেকটি বিভাব হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে আত্মা কি জগতের পূর্ণ পরিচয় মিলবে না। কারণ, স্থাণু আত্মাই যদি একমাত্র তত্ত্ব হত, তাহলে সংসারের অস্তিত্বও হত অসম্ভাবিত। যদি 'চলা' প্রকৃতিই সব হত, তাহলে বিশ্বপরিণামের কল্পাবর্তন চলত, কিন্তু তার মধ্যে অচিতি হতে চিতের উন্মেষের কোনও প্রযোজনা থাকত না। এই-যে আমাদের খণ্ডচেতনা বা অবিদ্যার বুকে জ্বলছে উত্তরায়ণের একটা অনির্বাণ অভীপ্সা, আত্মভাবের অখণ্ড ঋতচিন্ময় অনুভবের সঙ্গে সর্ব-ভাবের ভাস্বর বিজ্ঞানকে যুক্ত করে জ্ঞানসিদ্ধির একটা অনতিবর্তনীয় আকূতি—তখন তার সম্ভাবনা কোথায় থাকত?

আমাদের প্রাকৃতসত্তা নিত্যসত্তার একটা বহিরাবরণ মাত্র—আর ওইখানেই অবিদ্যার পূর্ণ অধিকার। জানতে হলে নিজের গহনে অন্তর্দৃষ্টির সন্ধানী বিদ্যুৎ নিয়ে তলিয়ে যেতে হবে। এক বিপুল সত্তা অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে চেতনার গভীরে—বাইরের রূপায়ণ তার অতিক্ষুদ্র ও স্তিমিত প্রতিবিম্ব মাত্র। বহিশ্চর প্রাণ ও মনের বৃত্তি স্তম্ভিত হলেই জাগে স্থাণু আত্মস্বরূপের বজ্র-সত্ত্ব প্রত্যয়। তিনি গুহাহিত হয়ে আছেন। কেবল আত্মসত্তার বোধিজাত প্রত্যয়ের বিজলীঝলকে বাইরে তাঁর আভাস ফুটে ওঠে, আর দেহ-প্রাণ-মনের অহংপ্রত্যয়ের ধূমল ছায়ায় তাঁর কদর্থিত রূপের পরিচয় পাই। তাঁর সত্যকে জানতে হলে মনকে স্তব্ধ ক'রে ডুবতে হবে পরমনৈঃশব্দ্যের গহনে।...কিন্তু বহিঃসত্তার চরিষ্ণু বিভূতিও তেমনি আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরে নিহিত এক বিশাল সত্যের অতিক্ষুদ্র স্তিমিত প্রতিবিম্ব মাত্র। বহিশ্চর স্মৃতিও চেতনার একটা খণ্ডিত পঙ্গুবৃত্তি, এক অন্তশ্চর অধিচেতন-স্মৃতির গুহা হতে সে তার পুঁজি কুড়িয়ে আনে। কিন্তু ওই অধিচেতন-স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা আছে আমাদের ভবস্রোতোবাহিত সকল অনুভবের প্রতিলিপি—এমন-কি মন যাদের দেখেনি বা বোঝেনি, তাদেরও ছবি ওইখানে তোলা আছে। আমাদের বহিশ্চর কল্পনাও অধিচেতনার সিদ্ধ লীলাকল্পনার বিপুল বর্ণৈশ্বর্যের ছিটেফোঁটা নিয়ে তার রঙিন ছবি আঁকে। এই বহিঃপরিণামী দেহ-প্রাণ-মনের জোগান আসছে এক অমেয়-বিপুল মনের অতিসূক্ষ্ম প্রত্যয়ের ভাণ্ডার হতে, এক অফুরন্ত প্রাণশক্তির উচ্ছ্বসিত স্পন্দলীলার উৎস হতে, সূক্ষ্মতর ও

উদারতর গ্রহণশক্তির আধাররূপী এক ভূতসূক্ষ্মময় রূপধাতুর বিশাল সম্ভার হতে। গূঢ়চারী চিৎশক্তির এই রহস্যময় প্রবৃত্তির পিছনে আছে এক চৈত্যসত্তার অধিষ্ঠান। তাকে আমাদের ব্যক্তিভাবনার সত্য প্রতিষ্ঠা বলে জানি। আমাদের অহন্তা তারই মুখোস প'রে আধারের বহিরঙ্গনে বিচরণ করছে। বস্তুত ওই গুহাশায়ী অন্তরাত্মাই আমাদের আত্মানুভবের সঙ্গে বিশ্বানুভবের জুড়ি মিলিয়ে উভয়কেই তাঁর গভীরবেদিত্বের মহিমায় ধরে আছেন। দেহ-প্রাণ-মনকে অবলম্বন ক'রে যে বহির্মুখ অহন্তার প্রকাশ, সে শুধু বিশ্বপ্রকৃতির একটা উপরিচর কৃত্রিম সৃষ্টি। তাই, আমাদের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ভিত তখনই পাকা হয়, যখন এই আধারের গহনে ডুবে এবং তার বহিরঙ্গনে বিচরণ ক'রে আমাদের হৃৎশয় পুরুষ এবং আত্মপ্রকৃতি উভয়েরই সমগ্র পরিচয় নিতে পারি।

দশম অধ্যায়

তাদাত্ম্যবিজ্ঞান ও বিভক্তজ্ঞান

আত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি। গীতা ৬।২০

আত্মা দিয়ে আত্মাকে দেখে তারা আত্মার মধ্যে।

—গীতা (৬।২০)

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি স আত্মা।... সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ; ইদং ব্রহ্ম, ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৫।১৫,৭

যেখানে দ্বৈতই যেন থাকে, সেখানে একজন আরেকজনকে দেখে শোনে ছোঁয় ভাবে না জানে। কিন্তু যখন তার সব হয়ে যায় আত্মাই, তখন কি দিয়ে জানবে সে কাকে? আত্মা দিয়েই তখন জানে সে এই যা-কিছু রয়েছে। ...সবাই তাকে ছেড়ে যায়, আত্মাতে ছাড়া আর-কোথাও দেখে যে সবাইকে; কারণ এই যা-কিছু, সবই ব্রহ্ম—সর্বভূত এবং এই যা-কিছু সবই এই আত্মা।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৫।১৫,৭)

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

কঠোপনিষৎ ৪।১

বাইরের দিকে ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগুলি খুলে দিয়েছেন স্বয়ম্ভূ; তাই বাইরেই সব-কিছু দেখে মানুষ, অন্তরাত্মাতে নয়। কখনও কোনও ধীর পুরুষ আত্মাকে দেখেন মুখোমুখি আবৃত্তচক্ষু হয়ে অমৃতত্বের আকূতি নিয়ে।

—কঠ উপনিষদ (৪।১)

ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে। ন হি বক্তুর্বক্তেঃ। ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ। ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎপশ্যেৎ নাদ যদ্বদেৎ যচ্ছৃনুয়াৎ যদ্বিজানীয়াৎ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।২৩-৩০

দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, বক্তারও হয় না বচনের বিপরিলোপ।... তেমনি হয় না শ্রোতার শ্রুতির...অথবা বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের কেননা তারা অবিনাশী; কিন্তু তার দোসর বা তার থেকে বিভক্ত তো কিছুই নাই, যাকে সে দেখবে বলবে শুনবে কি জানবে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৩।২৩-৩০)

আমাদের বহির্মুখ প্রত্যয় অর্থাৎ নিজেকে অন্তরের বৃত্তিকে কি বহির্জগতের বিষয় ও ব্যাপারকে দেখবার যে মানসী দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের চারটি প্রকার বা ধরন হতে তার প্রামাণ্য ও গভীরতার তারতম্য নিরূপিত হয়। জানার মূল ধরন হল তাদাত্ম্যবোধ দিয়ে জানা। এই ধরনটি সবার অন্তর্গূঢ়

আত্মভাবের নৈসর্গিক ধর্ম। দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞান নৈসর্গিক নয়, উৎপাদ্য; অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ হল তার সাধন। তার মূলে কখনও থাকে নিগূঢ়তাদাত্ম্য-বিজ্ঞানের আবেশ; কখনও-বা তাদাত্ম্যবিজ্ঞান হতে উৎসারিত হয়েও কার্যত সে তাথেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে, তাই তার প্রত্যয়ে বীর্য থাকলেও পূর্ণতা থাকে না। তৃতীয় ধরনের জ্ঞানে বিষয়ী বিষয় হতে বিভক্ত হয়েও অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষকে তার সাধন করে, এমন-কি তার মধ্যে আংশিক তাদাত্ম্যবোধেরও অভাব হয় না। চতুর্থ জ্ঞানটি পুরাপুরি বিভজ্যবৃত্ত জ্ঞান; তার সাধন হল পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ। সন্নিকৃষ্ট বিষয়কে গ্রহণ করা তার ধর্ম, যদিও সে নিজের অজ্ঞাতসারে অন্তরের প্রাক্তন সংবিৎ ও বিজ্ঞানের ভান্ডার হতে আহরণ বা তর্জমা করেই তার বিষয়কে জানে।...অতএব প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানের চারটি সাধন আছে : তাদাত্ম্যবোধ দিয়ে জানা, অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়ে জানা, বিভজ্যবৃত্ত বা বহিরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ দিয়ে জানা, এবং অবশেষে পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়ে বিষয়কে নিজের থেকে একেবারে আলাদা করে জানা।

প্রাকৃতচিত্তে প্রথম ধরনের জ্ঞানের বিশুদ্ধ রূপ দেখি আমাদের স্বরূপ-সত্তার অপরোক্ষ সংবিতে। এই জ্ঞানের বিষয় কেবল আমাদের আত্মসদ্‌ভাবের বিশুদ্ধ প্রত্যয়টুকু ছাড়া আর-কিছুই নয়। জগতের আর-কোনও বিষয় সম্পর্কে প্রাকৃতচিত্তে এধরনের সংবেদন জাগে না।...কিন্তু প্রত্যক্-চেতনার সংস্থান ও বৃত্তিসম্পর্কিত জ্ঞানেও তাদাত্ম্যসংবিতের খানিকটা আভাস থাকে, কেননা এক্ষেত্রে জ্ঞাতার বৃত্তিসারূপ্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্রোধবৃত্তির উদাহরণ আগেই দিয়েছি : ক্রোধ হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে এমনভাবে আমাদের গ্রাস করতে পারে যে, তখনকার মত মনে হবে আমাদের সমস্ত চেতনা বুঝি ক্রোধের একটা উত্তাল তরঙ্গ মাত্র। প্রীতি শোক হর্ষ প্রভৃতি ভাবোচ্ছ্বাসেরও এমনি করে উড়ে এসে চেতনার সবখানি জুড়ে বসবার সামর্থ্য আছে। কখনও-কখনও চিন্তাতেও এমনটা হয়। চিন্তক 'আমি'কে ভুলে গিয়ে আমরা হয়ে যাই চিন্তাময় বা চিন্তনময়। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে এর মধ্যে একটা দ্বৈধ-বৃত্তি থাকে : আমাদের একভাগ রূপান্তরিত হয় চিন্তায় কি ভাবোচ্ছ্বাসে, আরেক ভাগ তার সঙ্গে কতকটা মাখামাখি হয়ে চলে কিংবা পাশে-পাশে থেকে তাকে অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়ে জানে। এই অন্তরঙ্গ ভাবটা অনেকসময় তাদাত্ম্যপ্রত্যয় বা বৃত্তিসারূপ্যের কাছাকাছি যায়।

এইধরনের তাদাত্ম্যভাব অথবা একই সময়ে আংশিক বিবেক এবং আংশিক তাদাত্ম্য সম্ভব হয়—বৃত্তির পরিণাম আমাদের সত্তার পরিণাম বলেই। বৃত্তিমাত্রেই আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় ধাতু ও শক্তির ব্যাকৃতি হলেও, সত্তার একটিমাত্র অংশকে তারা দখল করে থাকে। তাই তাদের

দ্বারা গ্রস্ত হয়ে তদাকার হতে আমরা বাধ্য নই। ইচ্ছা করলেই আমরা তটস্থ হয়ে সত্তাকে তার কালাবচ্ছিন্ন পরিণাম হতে বিবিক্ত রাখতে পারি—পরিণামের দ্রষ্টা ও শাস্তা হয়ে অনায়াসে তার আবির্ভাব কি তিরোভাব ঘটাতে পারি। এইভাবে অন্তশ্চর তটস্থবৃত্তির সহায়ে অর্থাৎ মনোময় বা শুদ্ধসত্ত্বময় বিবেক দিয়ে মনোময় বা প্রাণময় অপরা প্রকৃতির শাসন হতে নিজেকে আমরা খানিকটা এমন-কি কখনও পুরাপুরি নির্মুক্ত করতে পারি—অনায়াস মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সাক্ষী চেতা প্রশাস্তার আসনে। অতএব অন্তর্বৃত্তির জ্ঞানের দুটি ভাগ আছে। একদিকে আছে চিত্তের ধাতু ও বৃত্তির তাদাত্ম্যস্পৃষ্ট অন্তরঙ্গজ্ঞান। এই অন্তরঙ্গবোধ এত নিবিড় যে বহির্জগতের অনাত্মবস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না, কেননা সে-জ্ঞানে আছে শুধু বস্তুর বিবিক্ত ও পরাক্-বৃত্ত প্রত্যয়। আবার আরেকদিকে আছে তটস্থ-দৃষ্টির জ্ঞান। তটস্থ হলেও সেখানে দ্রষ্টার মধ্যে অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষের সামর্থ্য আছে, যা প্রকৃতির মূঢ় পারবশ্য হতে তাকে মুক্ত ক'রে আত্মভাব ও জগৎভাবের সমগ্রতার সঙ্গে বৃত্তিকে যুক্ত করবার স্বচ্ছন্দ অধিকার দেয়। এই তটস্থ ভাবটুকু না থাকলে আত্মপ্রকৃতির স্পন্দ পরিণাম ও প্রবৃত্তির আবর্তে আমরা আত্মস্থিতির স্বাতন্ত্র্য ও বিজ্ঞানময় ঈশনা হারিয়ে ফেলি। তখন আত্ম-প্রকৃতির স্পন্দবৃত্তিকে অন্তরঙ্গভাবে জানলেও আয়ত্তে রাখবার মত তাকে খুঁটিয়ে জানি না। কিন্তু বৃত্তিতাদাত্ম্যের সঙ্গে যদি সমগ্র প্রত্যক্-সত্তার তাদাত্ম্যবোধ জড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ বৃত্তিপরিণামের উদ্বেলনে সম্পূর্ণ অব-গাহন করে ভাব ও কর্মের চরম অভিনিবেশের মধ্যেও যদি নিজেকে মনোময় সাক্ষী চেতা ও শাস্তা করে রাখতে পারি, তাহলে প্রকৃতির কবল হতে মুক্তি পাই। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। আমাদের প্রাকৃত চেতনা দ্বিধা-বিভক্ত। তার যেটা প্রাণের মহল, সেখানে আছে জীবনধর্মের তাগিদ—কামনা হৃদয়াবেগ ও কর্মপ্রমত্ততার আকারে। তারা মনকে দখলে আনতে, গ্রাস করতে চায়। আবার মনও চায় এই জুলুম এড়িয়ে প্রাণকে আপন বশে আনতে। কিন্তু মনের পক্ষে তা সম্ভব হয় একমাত্র বিবিক্তভাবকে বজায় রেখে, কেননা অবিবেকেই তার মরণ ঘটে—প্রাণের স্রোত তখন তাকে অকূল-পানে ভাসিয়ে নেয়। কিন্তু বিভক্তচেতনার দুটি কোটির মধ্যে তাদাত্ম্যভাব দ্বারা একটা সাম্য আনা যদিও সম্ভব, তবু সাম্য বজায় রাখা সহজ নয়। আমাদের মধ্যে আছে এক মন-আত্মা। চিত্তবেগের সাক্ষী থেকে সে তাকে মুক্তি দেয়—হয় নিজে তার আস্বাদ পেতে, নয়তো কোনও জীবনধর্মের জোর-তাগিদে বাধ্য হয়ে। আবার তার সঙ্গে আছে এক প্রাণ-আত্মা—প্রকৃতির স্রোতে ভেসে যাওয়াই তার স্বভাব। অতএব আমাদের প্রত্যক্-অনুভবে আছে চৈতন্যবৃত্তির এমন-একটা ক্ষেত্র, যেখানে প্রত্যয়ের তিনটি ধারা এসে মিলেছে—

তাদাত্ম্যবোধ-জন্য জ্ঞান, অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষঘটিত জ্ঞান এবং তাদেরই আশ্রিত বিভক্ত-জ্ঞান।

মন্তা ও মননের মাঝে তফাত করা আরও কঠিন। সাধারণত মন্তা মননের মধ্যে ডুব দিয়ে তদাকার হয়ে তার প্রবাহে ভেসে চলে। ঠিক মননের ক্ষণেই যে মন্তব্যের সাক্ষী হয়ে সে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তা নয়। তার জন্যে হয় তাকে পিছন ফিরে স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়, নয়তো পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে হানতে হয় সমীক্ষকের তীক্ষ্ম দৃষ্টি। কিন্তু তবু মনন যদি চিত্তের সবখানি না জুড়ে থাকে, তাহলে একইসঙ্গে মনন ও মানসক্রিয়ার সচেতন নিয়ন্ত্রণে অন্তত আংশিক সাফল্য লাভ করাও অসম্ভব নয়। এ-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি তখনই আসে, যখন মন্তা মনোময়-পুরুষের ভূমিকায় নিজেকে প্রত্যাহৃত করে মনঃশক্তির বিক্ষেপ হতে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়াতে পারে। সাধারণত আমরা মন্তব্যের আবর্তে তলিয়ে যাই—বড়জোর মননক্রিয়ার অস্পষ্ট একটা চেতনা তখন আমাদের মধ্যে ভেসে থাকে। কিন্তু তা না করে আমরা মনশ্চক্ষে মননের মিছিল শুরু হতে শেষপর্যন্ত দেখেও যেতে পারি : এবং খানিকটা নিস্পন্দ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, খানিকটা-বা মননদ্বারা মননকে অনুবিদ্ধ করে তাদের নাড়ীনক্ষত্রের সকল খবর নিতেও পারি। অবিবেক বা তাদাত্ম্য-ভাবের পরিমাণ যা-ই হ'ক, আমাদের অন্তর্বৃত্তির জ্ঞানের দুটি ধারা আছে—একটি বিবেক, আরেকটি অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ। তটস্থদশাতেও এই সন্নি-কর্ষের নিবিড়তা অটুট থাকে। কেননা যে-কোনও জ্ঞানবৃত্তির মূলে সাক্ষাৎ-সংযোগের একটা আবেশ ও অপরোক্ষ-সংবিতের একটা প্রত্যয় আছে, যার মধ্যে তাদাত্ম্যভাবের কতকটা রেশ থেকেই যায়। বুদ্ধি যখন অন্তর্বৃত্তিকে লক্ষ্য করে কি জানে, তখন তার মধ্যে বিবিক্তভাবনার প্রাধান্য থাকে। আর যখন সংজ্ঞা বেদনা বা কামনার সঙ্গে মনের স্ফুরদ্‌বৃত্তির অনুষঙ্গ ঘটে, তখন অন্ত-রঙ্গ-ভাবনা হয় মুখ্য। কিন্তু এই অনুষঙ্গের বেলাতেও মনের মননবৃত্তি মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাক্ষীর তটস্থ বিবিক্তভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং স্বত-অনুষক্ত মানস স্ফুরণ অথবা প্রাণ ও শরীরের বৃত্তিকেও আপন শাসনে আনতে পারে। স্থূলশরীরের যে-বৃত্তিগুলি আমাদের চোখে পড়ে, তাদেরও আমরা এই দুটি উপায়ে জানি এবং চালাই : স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গভাবনা দিয়ে শরীরকে এবং শারীরবৃত্তিকে যেমন আত্মীয় বলে জানি, তেমনি মনের বিবিক্ত-ভাবনা দ্বারা তটস্থ থেকে তাদের শাসনও করি।...এমনি করে আধারের অন্দর-মহলের যে-খবরটুকু পাই, তা অনেকটা উপরভাসা এবং অপূর্ণ হলেও তার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ও অব্যবহিত অপরোক্ষ-অনুভবের আমেজ থাকে। কিন্তু বহির্জগতের জ্ঞানে এই অন্তরঙ্গভাবনার পরিচয় পাই না। কারণ, সেখানে দর্শন বা অনুভবের বিষয় হল অনাত্মা এবং অনাত্মীয়, অতএব তার

সঙ্গে চেতনার অব্যাহত অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ কোনমতেই ঘটতে পারে না। সন্নিকর্ষের জন্য সেখানে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় তো বিষয়ের অব্যবহিত অন্তরঙ্গ বিজ্ঞান দেয় না—শুধু তার ভূমিকারূপে বিষয়ের একটা আদল সে সামনে ধরে, এই তার কাজ।

বাহ্যবিষয়ের প্রতীতিতে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি বিবিক্তভাবনাকে পুরোপুরি আশ্রয় করে চলে। তাই তার ধরনধারনে আগাগোড়া পরোক্ষ-বোধের ছাপ পড়ে। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমরা কোনদিনই তদাকার হয়ে যাই না—এমন-কি মানুষের সঙ্গেও নয়, যদিও মানুষ আমাদের সমানধর্মী। নিজের সত্তায় যেমন ডুবতে পারি, অপরের সত্তায় তেমন পারি না। অব্যবহিত অন্তরঙ্গ এবং অপরোক্ষ প্রত্যয় নিয়ে নিজের গতি-প্রকৃতির অপূর্ণ-বিজ্ঞান আমাদের দ্বারা যদি-বা সম্ভব, অপরের বেলায় তাও সম্ভব নয়। তাদাত্ম্যবোধ দূরে থাকুক, অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে অচল। আমাদের মধ্যে চেতনার সঙ্গে চেতনার, সত্তার সঙ্গে সত্তার, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর কোথায় সাক্ষাৎ যোগাযোগ? অপরের সঙ্গে আমাদের তথাকথিত সাক্ষাৎ যোগ শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায়—ওই একটি পথে পাই তাদের যা-কিছু সরাসরি খবর। মনে হয়, দেখা শোনা বা ছোঁয়ায় যেন জ্ঞেয়বস্তুর সঙ্গে একটা অপরোক্ষ অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। কিন্তু আসলে তা নয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপরোক্ষতা বা অন্তরঙ্গতাকে বিশ্বাস করতে পারি না—কেননা ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে হাজির করে বস্তুর একটা প্রতিবিম্ব, অথবা তাকে উপলক্ষ্য করে চিত্তের একটা কম্পন, অথবা নাড়ীচক্রের প্রতিবেদন। এছাড়া বস্তুস্বভাবের অন্তরঙ্গ স্পর্শটুকু দেবার আর-কোনও আয়োজন তার সাধ্য নয়। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের সাধনসম্পদ এমনি অফলা, এমনি নিষ্কিঞ্চন তার দৈন্য যে, এই যদি আমাদের জ্ঞানসাধনের পুঁজি হয়, তাহলে আমরা জানবই-বা কি—অনৈশ্চিত্যের একটা কুহেলিকা ছাড়া?...কিন্তু এর মধ্যে এসে জোটে গ্রহণ-মনের বোধিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়জনিত ওই প্রতিবিম্ব বা কম্পনের ইশারাকে সে রূপান্তরিত করে বস্তুর প্রত্যয়ে। সেইসঙ্গে প্রাণময়বোধির বৃত্তি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত আরেকধরনের কম্পন হতে বস্তুর বীর্য বা শক্তিরূপ আবিষ্কার করে। অবশেষে গ্রহীতৃ-মনের বোধিবৃত্তি এইসব উপকরণ হতে এক নিমেষে বস্তুর একটা যথাযথ ভাব গড়ে তোলে। এই ভাবময় রূপের যা-কিছু ন্যূনতা, অখণ্ডগ্রাহী বুদ্ধি এসে তা পূরণ করে। বোধিবৃত্তির আদিব্যূহ যদি অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষের পরিণাম হত, অথবা তার মধ্যে সর্বগ্রাহী বোধিমানসের অকুণ্ঠ-ঈশনাময় বৃত্তির একটা সমাহার থাকত, তাহলে বুদ্ধির তদারকের কোনও প্রয়োজন হত না। তখন তার ডাক পড়ত ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের আবিষ্কর্তা বা সমাহর্তার ভূমিকায় শুধু। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধির আলম্বন হল একটা প্রতিবিম্ব বা ইন্দ্রিয়ের পেশ-করা

একটা পরোক্ষপ্রমাণ দলিল—বিষয়ের সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষের প্রত্যয় নয়। আবার ইন্দ্রিয়জন্য প্রতিবিম্ব বা কম্পনের মধ্যে আছে বস্তুর অপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়—বোধির দীপ্তিও কুয়াসার আবরণ পার হয়ে খিল-বীর্য হয়ে এসেছে। তাই আলো-আঁধারিতে গড়া তার বস্তুরূপের কল্পনাতে প্রমাদ বা অনিশ্চয়তা—অন্তত-পক্ষে অপূর্ণতার অবকাশ থাকে। ইন্দ্রিয়জ-বোধের ন্যূনতা, প্রাকৃতমনের প্রত্যয়ে নৈশ্চিত্যের অভাব এবং তার আহৃত তথ্যের তাৎপর্যনিরূপণে বৈকল্য—এইসমস্ত কারণ মানুষকে তার বিচার-বুদ্ধি পুষ্ট করতে বাধ্য করেছে।

আমাদের জগৎজ্ঞানের কাঠামোটা তাই নিতান্তই নড়বড়ে। তার মধ্যে আছে প্রথমত বস্তুর ইন্দ্রিয়জ প্রতিবিম্বের একটা কাঁচা উপকরণ, তার সঙ্গে গ্রহীতৃ-মন প্রাণময়-মন ও গ্রহণ-মনের বোধিবৃত্তিজাত বিবৃতির সমাহার এবং সবার উপরে বুদ্ধি দিয়ে সে-বিবৃতির পাদপূরণ, পরিমার্জন, উপসংখ্যানভূত জ্ঞানের সংযোজন ও সমূহ জ্ঞানবৃত্তির সমন্বয়সাধন। কিন্তু তবু আমাদের জগৎজ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ এবং অপূর্ণ, তার অর্থবিবৃতিতে কত অনিশ্চয়তা। সে-অপূর্ণতার গ্লানি মেটাতে কল্পনা জল্পনা ভাবনা ও অনুমান, নিষ্পক্ষ যুক্তি-বিচার, বিজ্ঞানের মাপজোখ অথবা ইন্দ্রিয়জ সাক্ষ্যের যাচাই সংশোধন ও সম্প্রসারণ—এমন কত-কিছুর ডাক পড়েছে। অথচ এত করেও আমাদের ভাণ্ডারে স্তূপাকার হয়ে উঠেছে অর্ধনিশ্চিত অর্ধশঙ্কিত পরোক্ষজ্ঞানের সঞ্চয়, বিষয়ের কল্পমূর্তির ইঙ্গিত ও ভাবময় প্রতিরূপের ব্যঞ্জনা, সামান্য-প্রত্যয় ও সাধারণবোধির কল্পনা, বিচিত্র মতবাদ ও অভ্যুপগমের বাহুল্য এবং তার সঙ্গে সংশয়ের বিপুল ভার আর তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা ও বিতর্কের অন্ধ আবর্তন। বিদ্যার সঙ্গে শক্তিও এসেছে। কিন্তু বিদ্যা অপূর্ণ বলে শক্তির প্রয়োগও আমরা জানি না—এমন-কি বিদ্যা ও শক্তির ধারা কোন্ খাতে বইলে তারা সার্থক হবে, সেও আমাদের অজানা। তার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের অপূর্ণতা জুটে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করেছে। একে তো সে-জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর এবং অতি করুণ তার শীর্ণতা—তারপর তারও অধিকার আমাদের বহিশ্চর জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমাকে ছাড়িয়ে যায়নি। শুধু আভাস-আত্মা এবং অপরা প্রকৃতির খানিকটা খবর আমরা জানি—জানি না আত্মস্বরূপের সত্য পরিচয় অথবা জীবনরহস্যের মর্মকথা। মানুষের মধ্যে আত্মার জ্ঞান বা আত্মার নিয়ন্ত্রণ নাই, জগৎশক্তি ও জগৎজ্ঞানের ব্যবহারে নাই প্রজ্ঞা অথবা সম্যক্ সঙ্কল্পের প্রেতি।

অবশ্য আমাদের এই প্রাকৃত দশাও বিদ্যার দশাই বলতে গেলে—কিন্তু সে-বিদ্যাকে জড়িয়ে আছে অবিদ্যার নাগপাশ। তাই আত্মসঙ্কোচের দরুন তা অনেকটা অবিদ্যার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে বিদ্যা না বলে বরং বলতে

পারি বিদ্যা-অবিদ্যার মিথুন। এ না হয়ে উপায়ও ছিল না—কেননা আমাদের জগৎজ্ঞানের মূলে আছে উপরভাসা বিভক্তদৃষ্টির একটা প্রত্যয়—কতকগুলি পরোক্ষ সাধন যার অবলম্বন। নিজেকে খানিকটা অপরোক্ষভাবে জানলেও আমাদের সে-জানা সীমার সঙ্কোচে পঙ্গু হয়ে আছে। কারণ ব্যবহারের ভূমিতে আমরা আত্মসত্তার একটা বহিরঙ্গ পরিচয় শুধু পাই—আত্মার সত্য স্বরূপকে, জীবপ্রকৃতির মূলাধারকে, মানুষের কর্মপ্রেরণার গঙ্গোত্রীকে চিনি না। আত্মজ্ঞান যে আমাদের নিতান্ত ভাসা-ভাসা, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাইতো আমাদের কাছে সবই রহস্যের গুণ্ঠনে ঢাকা : চেতনা-ভাবনার উৎস একটা রহস্য, হৃদয়-মন-ইন্দ্রিয়ের সত্যরূপ একটা রহস্য—জীবনের আদি-অন্ত ও সাধনার অর্থও একটা রহস্য। এ-আঁধারের যবনিকা অপসৃত হত, যদি আমাদের আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞান সত্যের পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হত।

এই সঙ্কোচ ও অপূর্ণতার কি কারণ, তা খুঁজতে গিয়ে দেখি—চিত্তের পরাক্-বৃত্তিকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে আছি : পরাঙ্-মুখী চেতনা দিয়ে নিজের চারদিকে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচেছি, তার আড়ালে হারিয়ে গেছে গভীরবেদী আত্মার অনিরুক্ত মহিমা, অখণ্ড আত্মপ্রকৃতির যত নিগূঢ় রহস্য। হয়তো জীবচেতনার পক্ষে এ-আড়ালের প্রয়োজন ছিল, নইলে বৃহত্তর চেতনার বিপুল-গভীর সত্যের উদ্বেল আন্দোলনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শুধু নিজের অহংটিকে কেন্দ্র করে দেহ-প্রাণ-মনের ব্যষ্টিভাবনা তার পক্ষে সম্ভব হত না। এই দেয়ালের মধ্যে যে দুটি-একটি ফাঁক বা জানলা আছে, তার ভিতর দিয়ে অন্তরাত্মার গুহাশয়নের দিকে যখন তাকাই তখন ছায়ালোকের রহস্যময়তা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না।...আবার প্রাকৃত চেতনাকেও প্রতিক্ষণ সতর্ক থেকে ব্যষ্টি-অহংকে আগলে রাখতে হয়—শুধু নিজের অদ্বয় আনন্ত্যের গভীর স্পর্শ হতে নয়—বিশ্বগত আনন্ত্যের নিত্য-উদ্বেল বিক্ষোভ হতেও। এখানেও সে দুয়ের মাঝে আরেকটা দেয়াল খাড়া করে; তার অহংকে কেন্দ্র করে যারা ঘন হয়ে নাই, তাদের সে নির্বাসিত করে দেয়ালের বাইরে—'অনাত্মা' নাম দিয়ে। কিন্তু তাকে এই অনাত্মা নিয়েও ঘর করতে হয়, কেননা সে তার আশ্রিত এবং সগোত্র—বলতে গেলে অনাত্মার বুকেই তার বাসা। অতএব তার সঙ্গে যোগাযোগের পথটা খোলা তাকে রাখতে হয়। দেহের মধ্যে অহংএর যে-বন্দিশালা, তার দেয়ালের বাইরে তাকে পা বাড়াতে হয়—আপন গরজেই অনাত্মার কাছে হাত পাতবে বলে। চারদিক ঘিরে যে অনাত্মীয়ের মেলা, তাদেরও উপেক্ষা করলে তার চলে না—কেননা যে-কোনও উপায়ে তাদের বশে এনে মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি অহন্তার প্রয়োজনে মজুর-খাটানোর দায় যে প্রকৃতিরই একটা বিধান। তাই দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে যে চেতনার পথ খোলা আছে, সেই পথে অনাত্মীয় বহির্জগতের সঙ্গে প্রয়োজনমত তার দেখা

শোনা আনাগোনা বা কাজ-কারবার চলে। এই পথে মনেরও চলাফেরা—যদিও এছাড়াও তার যোগাযোগের নিজস্ব সাধন আছে। ইষ্টসিদ্ধির আশু প্রয়োজনে মন সব দিয়ে জ্ঞান-তন্ত্রের একটা কাঠামো গড়ে, কেননা চারদিকের এই বিরাট অনাত্মীয় পরিবেশকে যথাসম্ভব বশে এনে কাজে লাগানো, এবং দুর্বশ হলেও অন্তত কারবার চালানো তার সঙ্গে—এই হল মনুষ্যমনের গোপন আকূতি। মনের রচিত জ্ঞানতন্ত্র দিয়ে সে-আকূতিকে যথাসাধ্য তৃপ্ত করবার চেষ্টা চলে। কিন্তু মনের জ্ঞান বিষয়ের বাহ্যজ্ঞান। তাতে জগতের সদর-মহলের কিংবা তার পরের মহলের খবর মেলে শুধু। ব্যাবহারিক প্রয়োজন তাতে মিটলেও সে-সার্থকতা সঙ্কীর্ণ এবং অনিশ্চিত। তেমনি, বিশ্বশক্তির অভিঘাত থেকে বাঁচবার জন্য যে-বর্ম সে এঁটেছে, তাও দুর্ভেদ্য কি পুরা-মাপের নয়। প্রবেশ-নিষেধের নোটিশ আঁটা থাকলেও অনাত্ম-জগৎ কোন্ ফাঁক দিয়ে যেন ঢুকে পড়ে, মনের সর্বাঙ্গ মুড়ে তাকে আপন ছাঁচে গড়ে তুলতে চায়। তার চিন্তা সংকল্প হৃদয়ের আবেগ ও প্রাণের উদ্দীপনা জর্জরিত হয় অপরের বা বিশ্বপ্রকৃতির তূণ হতে এইধরনের অনাত্মীয় শক্তির শরক্ষেপে। তার আত্মরক্ষার বর্ম শেষপর্যন্ত তিরস্করণীতে রূপান্তরিত হয়—তাই বহির্জগতের সঙ্গে এই ক্রিয়াব্যতিহারের পুরা খবর সে জানতে পারে না। শুধু ইন্দ্রিয়ের পথে কি অনিশ্চিত মানসপ্রত্যক্ষের সহায়ে অথবা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করে অনুমান দিয়ে তার জ্ঞানের সঞ্চয় সে আহরণ করে। কেবল এইটুকু তার আলোর জগৎ। আর সব ছেয়ে আছে অবিদ্যার অমানিশায়।

অতএব, বহিশ্চর অহংএর সঙ্কীর্ণ পরিসরকে ঘিরে এই-যে নিজের চার-দিকে আমরা নিরাপত্তার জোড়া-দেয়াল খাড়া করছি, ওই হল আমাদের বিদ্যা-কঞ্চুক বা অবিদ্যার হেতু। এই গুটিপোকার বাসা বাঁধাই যদি আমাদের এক-মাত্র জীবনধর্ম হত, তাহলে অবিদ্যার কোনও প্রতিকার ছিল না। কিন্তু সত্য বলতে, এমন করে অহংএর গুটি বাঁধা বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তির একটা সাময়িক আয়োজন মাত্র। তার উদ্দেশ্য, গুহাচর জীবাত্মা যেন বিরাটের নিমিত্তরূপে বহিঃপ্রকৃতিতে নিজেরই একটা প্রতিরূপ অথবা অবিদ্যার আধারে ব্যষ্টি-ভাবনার একটা প্রতীক গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বব্যাপী অচিতির অমানিশা হতে কলায়-কলায় চেতনার উন্মেষের এই একমাত্র ধারা। আত্মা এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে-অবিদ্যা, তা আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের অখণ্ডজ্যোতির্ময় প্রত্যয়ের দিকে তখনই এগিয়ে যেতে পারে—যখন আমাদের সঙ্কীর্ণ অহং ও তার অর্ধচ্ছন্ন চেতনা ধীরে-ধীরে অন্তরাবৃত্ত সত্তা ও চেতনার মহাবৈপুল্যের দিকে উন্মীলিত হয়। এই তার স্বরূপস্থিতির সত্য পরিচয়। এমনি করে আত্মস্বরূপকে শুধু সে জানে না—আত্মবৎ প্রতীয়মান বহির্জগৎকেও জানে

তার আত্মা বলে। কেননা তার সম্যক্-বিজ্ঞানের এক মেরুতে রয়েছে জীব-প্রকৃতিকে কুক্ষিগত ক'রে এক বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি, আরেক মেরুতে রয়েছে জীবের আত্মভাবের অন্তহীন অনুবৃত্তিরূপে এক লোকোত্তর সন্মাত্রের অমেয়তা। জীবাত্মাকে তার আপন-হাতে-গড়া অহং-চেতনার প্রাচীর ভাঙতে হবে, পিণ্ডদেহের সংকীর্ণ পরিসর ছাড়িয়ে যেতে হবে—বিরাট ব্রহ্মাণ্ডদেহকে করতে হবে আত্মসত্তার দ্বারা বাসিত। কেবল পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়ে না জেনে, সেই জানার সঙ্গে তাকে অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়েও জানতে হবে—তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের জ্যোতির্লোকে। তার আত্মভাবের এই সীমিত সান্ত প্রত্যয়কে করতে হবে সীমাহীন সান্তের প্রত্যয়ে রূপান্তরিত—আনন্ত্যের নিঃসীম মহানীলিমায় সম্প্রসারিত।

এমনি করে আত্মবোধ আর বিশ্ববোধ—এই দুটি সিদ্ধির দিকে চেতনার অভিযান চলেছে। তার মধ্যে আত্মবোধই আমাদের প্রথম সাধ্য। কেননা অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে পেলে বিশ্বের মধ্যেও আমরা নিজেকে পাব। প্রথমে ডুবতে হবে নিজের মধ্যে—ওইখানে থাকতে এবং ওইখানে থেকে বাঁচতে শিখতে হবে। তখন প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন হবে চেতনার দেউড়ি শুধু। বাস্তবিক বাইরে আমরা যা-কিছু হয়েছি, তার মূলে আছে অন্তরের প্রযোজনা। অলখের গভীর-গহন হতেই জীবনের নিগূঢ় প্রেতি আসে, আসে স্বতঃপরিণামী রূপায়ণের সংবেগ। ওই অতলতা হতেই আমাদের চিত্তে প্রেরণা জাগে, বুদ্ধির 'পরে বোধির আলো পড়ে—জাগে জীবন-ছন্দ, মনের আকূতি, সংকল্পের স্বয়ংবরণ। সবই চলে স্বত-উৎসারিত স্বাতন্ত্র্যের লীলায়। শুধু মাঝে-মাঝে বিশ্বশক্তির অতর্কিত উদ্বেলন কি-যেন নিগূঢ় প্রবর্তনায় তাদের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু আত্মশক্তির এই উৎসারণ ও বিশ্বশক্তির এই প্রবর্তনা আমাদের বহির্মুখ প্রকৃতির শাসনে ব্যাবহারিক জগতে অনেকটা নিগড়িত এবং বিশেষ করে সংকুচিত হয়ে পড়ে। অতএব অন্তশ্চর ওই প্রবর্তক আত্মার স্বরূপের সঙ্গে মিলিয়ে জানতে হবে বহিশ্চর এই নিমিত্ত-আত্মার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়—দুয়ে মিলে কি করে তারা জীবনের গৃহস্থালি চালাচ্ছে তার রহস্য আবিষ্কার করতে হবে।

আত্মস্বরূপের যেটুকু মূর্ত হয়ে উঠেছে, বাইরে শুধু তারই পরিচয় পাই। তারও কতটুকুই-বা আমরা জানি? সমগ্র ব্যাবহারিক জীবনটাই আমাদের কাছে অস্পষ্টের একটা পটভূমিকা মাত্র—নিশ্চিত প্রত্যয়ের রূপরেখায় বা আলোকবিন্দুতে খচিত। অন্তরাবৃত্ত হয়েও নিজের যে-পরিচয় পাই, তাতে দেখি শুধু কতগুলি খণ্ডিত রেখাচিত্রের সমাবেশ—নিজের অখণ্ড ছবিটি তার মধ্যে অর্থের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা নিয়ে ভেসে ওঠে না। কিন্তু এই সীমিত আত্মজ্ঞানকেও আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে অবিদ্যার একটা বিক্ষেপশক্তি।

আত্মদর্শনের নির্মলতা প্রতিনিয়ত কলুষিত হচ্ছে বহির্মুখ প্রাণ-আত্মার অবাঞ্ছিত অভিঘাতে। সে চায় মননধর্মী চিত্তকেও তার দাস ক'রে যন্ত্রের মত খাটিয়ে নিতে, কেননা প্রাণ-পুরুষের লক্ষ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা, কামনার সিদ্ধি, অহংএর তর্পণ—আত্মার বিজ্ঞান নয়। অতএব অনুক্ষণ সে মনের উপর চাপ দিয়ে তার ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল আভাস-আত্মার একটা মনোময় বিগ্রহ গড়ে তুলতে চাইছে। নিজের ও পরের সামনে মনকে দিয়ে সে আমাদের অলীক-প্রায় একটা কল্পমূর্তি খাড়া করিয়ে নিতে চায়—যা হবে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আধার, কামনা ও কর্মের সমর্থক, অহমিকার রসায়ন। প্রাণের এই দুরাগ্রহের লক্ষ্য শুধু আত্মসমর্থন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই নয়। কখনও-কখনও তা ঝোঁকে আত্মগর্হণ ও অতিমাত্রায় আত্ম-অসূয়ারূপ মনোবিকারের দিকে। এও এক-ধরনের অহমিকার বিলাস বা তার একটা প্রতীপ রূপ। প্রাণময় অহংএর এই আরেকটা ঠাট বা ঢং। বস্তুত প্রাণময় অহংএ প্রায়ই চালবাজি আর নাটুকে-পনার একটা মিশ্রণ থাকে। সে যেন সবসময় একটা-না-একটা ভূমিকায় নেমে নিজের কাছে—আবার পরেরও কাছে অভিনয় করছে। এমনিভাবে তোড়জোড় ক'রে আত্ম-অবিদ্যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় আত্মবঞ্চনার ঘোর। কেবল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে এই অনর্থের উৎসমূলকে আবিষ্কার ক'রেই তার অন্ধতা আর জটপাকানোর হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আমাদের বহিশ্চর শারীরচেতনার অন্তরালে এক বিশাল অন্তশ্চর মন-আত্মা প্রাণ-আত্মা এবং ভূতসূক্ষ্মময় দৈহ্য-আত্মা অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে। তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অথবা তার সঙ্গে তাদাত্ম্যযোগে যুক্ত হ'য়ে আমরা আবিষ্কার করতে পারি—কোন্ উৎস হতে আমাদের ভাবনা ও বেদনা উৎসারিত হয়, কর্মের প্রেষণা জাগে, শক্তির বিচিত্র ব্যাপ্রিয়াতে বাইরের মানুষটা গড়ে ওঠে। বস্তুত আমাদের এই আধারেই প্রতিনিয়ত চলছে এক গুহাহিত পুরুষের মনন ও দর্শন, প্রাণপুরুষের নিগূঢ় প্রাণন ও আস্বাদন, ভূতসূক্ষ্মময় পুরুষের স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়ের সংবেদন। অন্তরের প্রেতি আর বাইরের অভিঘাত দুয়ের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ-জটিল হয়ে উঠছে আমাদের ভাবনা আবেগ ও বেদনা, যুক্তি-বুদ্ধি তাদের গোছাতে গিয়েও ভাল করে গুছিয়ে উঠতে পারছে না—এই হল আমাদের জীবনের সদরমহলের খবর। কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে দেখি অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় শক্তির তপস্যা স্বাধিকারকে অতি-ক্রম করে যায়নি। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির নির্মল আলোকে তখন পরিষ্কার করে চিনে নিতে পারি তাদের প্রত্যেকের অবিমিশ্র প্রবৃত্তি, বিবিক্ত সামর্থ্য, স্বতন্ত্র উপাদান ও অন্যোন্যসঙ্গমের পরিপূর্ণ একটি ছবি। তখন বুঝতে পারি, বহিশ্চর চেতনায় বিরোধ ও সংঘাত আমাদের অন্যোন্যবিরোধী দেহ-প্রাণ-মনের বিষম ও বিপরীত বৃত্তির ক্ষুব্ধ আলোড়নেই উত্তাল হয়ে ওঠে। আবার সে-

আলোড়নের মূলে থাকে আধারের নিগূঢ় অথচ ফলোন্মুখ বিচিত্র সম্ভাবনার সংঘর্ষ অথবা চেতনার প্রত্যেক ভূমিতে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব—যা আমাদের বাইরে ফুটে ওঠে পাঁচমিশেলী ধাত ও ঝোঁকের রকমারিতে। কিন্তু বাইরে তারা তালগোল পাকিয়ে একটা লন্ডভন্ড ব্যাপার বাধিয়ে তুললেও. অন্তরের গহনে ডুবে গিয়ে আমরা তাদের স্ব-তন্ত্র ও বিবিক্ত গতি-প্রকৃতির একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাই। তাই মনোময় প্রাণ-শরীর-নেতা* পুরুষের অথবা 'মধ্য আত্মনি' প্রতিষ্ঠিত চৈত্যপুরুষের প্রশাসনে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা তখন কঠিন হয় না—যদি মন ও চেতনার সত্যসঙ্কল্পের একটা জোর এই সাধনার পিছনে থাকে। এইখানেই সতর্ক থাকতে হয়, কারণ প্রাণময়-অহংএর আকূতি-দ্বারা চালিত হয়ে আমরা যদি অধিচেতনায় অবগাহন করি, তাহলে একদিকে যেমন সমূহ বিপদ বা বিপর্যয় ঘটবার সম্ভবনা আছে, তেমনি আরেকদিকে কামনা অহঙ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার অতিস্ফীতিতে বিদ্যার উপচীয়মান বীর্যের জায়গায় দেখা দিতে পারে অবিদ্যাশক্তির ক্রমিক উপচয়। অধিচেতন ভূমিতে থেকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই প্রবৃত্তির কোন্ ধারা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অন্তর হতে উৎসারিত, আর কোন্ ধারা আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক অর্থাৎ বাইরে থেকে অভিসৃষ্ট। তখন মহেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তাদের প্রশাসন করা যায়, ইচ্ছামত বৃত্তির গ্রহণ বর্জন ও নির্বাচন দ্বারা সৌষম্যের উদারছন্দে অনায়াসে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। এই স্বচ্ছন্দ নির্মাণকৌশল কেবল আমাদের অন্তরপুরুষেরই জানা আছে—বাইরের জোড়াতালি-দেওয়া মানুষটার হয় তার জ্ঞান নাই, নয়তো তাকে পুরাপুরি রূপ দেবার সামর্থ্য নাই। বারবার ওই অন্তরগহনে ডুবতে পারলেই অন্তরপুরুষের কঞ্চুক খসে যায়, বাইরের নিমিত্তচেতনার 'পরে খিলবীর্য প্রশাসনের কুণ্ঠা দূর হয়ে যায়। স্বমহিমার ভাস্বর দীপ্তিতে তখন তিনি আমাদের এই জড়বিশ্বের জীবন-বেদিতে জ্বলে ওঠেন।

অন্তরপুরুষের বিজ্ঞান আর বহির্মুখ চিত্তের উপরভাসা জ্ঞান এ-দুয়ের মাঝে উপাদানের কোনও তফাত নাই। তাদের তফাত শুধু স্পষ্টতা আর অস্পষ্টতায়। বহির্মুখ জ্ঞানে যেন আলো-আঁধারের লুকাচুরি চলছে। আর অন্তরের বিজ্ঞান দিবালোকের মত স্বচ্ছ—কেননা যেমন সমর্থ এবং অপরোক্ষ তার সাধনস্পন্দ, তেমনি ছন্দঃসুষমা তার বৃত্তিযোজনায়। ব্যাবহারিক চেতনায় তাদাত্ম্যবিজ্ঞান আত্মভাবের একটা অস্পষ্ট প্রত্যয় ও আংশিক বৃত্তিসারূপ্যের রূপ ধরে। কিন্তু অন্তরে তার স্বানুভবের অস্পষ্টতা ও সংবেদনের কুণ্ঠা ঘুচে যায়, সমগ্র আন্তরসত্তার অন্তরঙ্গ অপরোক্ষসংবিতের সুনির্মল দ্যুতিতে

---

* মুণ্ডক উপনিষদ ২।২।৭

সে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন অখণ্ডিত প্রাণময় ও মনোময় সত্তার চিন্ময় দীপ্তি যেন আমাদের কাছে করামলকের মত হয়। তাই আমরা তখন বীর্যময় ভাবনার অপরোক্ষ নিবিড় সন্নিকর্ষদ্বারা প্রাণ- ও মনঃ-শক্তির ছন্দোময় সমগ্র-পরিণামকে অনুবিদ্ধ ও জারিত করতে পারি। আত্মসম্ভূতির প্রত্যেকটি পর্বে, আত্মপ্রকৃতির বর্তমান ভূমিতেও পুরুষের অসঙ্কুচিত আত্মরূপায়ণে তখন অনুভব করি যোগযুক্ত চেতনার তাদাত্ম্যবোধের নিবিড়তা—যাকে বলতে পারি বৃত্তি-সারূপ্যেরই চিন্ময় স্ব-তন্ত্র সংবেদন। এই অন্তরঙ্গ প্রত্যয়ের সঙ্গে আবার জড়িয়ে থাকে সাক্ষিপুরুষদ্বারা প্রকৃতিলীলার তটস্থ দর্শন। অতএব তাদাত্ম্য ও বিবেকরূপ জ্ঞানের এই চিন্ময় যুগলবৃত্তিতে সমগ্র সত্তার সম্যক জ্ঞান ও প্রশাসন আরও স্বচ্ছন্দ হয়। অন্তরপুরুষ তখন প্রাকৃতপুরুষের সমস্ত বৃত্তিকে দেখেন তটস্থ হয়ে অথচ মর্মভেদী গভীর দৃষ্টি দিয়ে। তাইতে তার আত্ম-বঞ্চনার ঘোর ও প্রমাদের বিড়ম্বনা কেটে যায়—আত্মভাবের প্রত্যক্-বৃত্ত পরি-ণামের দর্শন ও অনুভব তীক্ষ্ন স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের বিদ্যুন্ময় রেখায় জ্বলে ওঠে মনের পটে, গভীরবেদী পুরুষের অনিমেষ দৃষ্টিই তখন হয় সমগ্র প্রকৃতির বিজ্ঞাতা অনুমন্তা এবং শাস্তা। মনোময়পুরুষ এবং চৈত্যপুরুষের দ্বারাজ্যসিদ্ধিতে প্রাণবাসনার সংবেগ অধ্যাত্মপ্রেরণার সম্পূর্ণ অনুগত হয়। এ বশীকার ও দেশনা প্রাকৃতমনের স্বপ্নেরও অগোচর। এমন-কি দেহ ও ভূতশক্তিও আন্তর মন ও আন্তর সংকল্পের শাসনে এসে চৈত্যপুরুষেরই স্ববশ করণে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মনোময়পুরুষ ও চৈতন্যপুরুষের স্তিমিত-ভাবের সুযোগ নিয়ে প্রাণচেতনা যদি প্রবল ও উদ্দাম হয়, তাহলে তীব্র-সংবেগের বশে প্রাণের অন্তর্ভূমিতে প্রবেশ করবার ফলে সাধকের শক্তিলাভ হতে পারে বটে, কিন্তু তার বিবেক ও তটস্থ দৃষ্টি সেইসঙ্গে অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের শক্তি ও অধিকার বাড়লেও তার আবিলতা ও বিপথ-চারণার ব্যসন দূর হয় না। আগে যেখানে ছিল বুদ্ধিযুক্তের আত্মশাসন, তার জায়গায় হয়তো দেখা দেয় একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ততার বিপুল প্রবেগ, অথবা অতিসংযমিত অথচ ভ্রান্ত অহমিকার দুরাগ্রহ। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই, কেননা সাধকের অধিচেতনা তখনও বিদ্যা-অবিদ্যার সঙ্গমক্ষেত্রে। তার মধ্যে যেমন আছে বিদ্যার বৃহত্তর প্রকাশ, তেমনি আছে আত্মম্ভরি অতএব গাঢ়তর অবিদ্যার অবকাশ। আত্মবিদ্যার প্রসার এই ভূমিতে স্বাভাবিক হলেও তাকে অভঙ্গ সম্যক্-জ্ঞান বলা চলে না, কারণ অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত সংবিৎই অধিচেতনার মুখ্যশক্তি—তাদাত্ম্যপ্রত্যয় নয়। তাই বিদ্যার বিপুল বীর্য ও বিভূতির সন্নিকর্ষ যেমন তার পক্ষে স্বাভাবিক, তেমনি সে অবিদ্যারও বিপুল বীর্য ও বিভূতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

কিন্তু অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষের বৃহৎ যোগে জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও

অধিচেতনার একটা বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতমনের মত ইন্দ্রিয়গৃহীত রূপ ও স্পন্দকে মনোময় এবং প্রাণময় বোধিবৃত্তি ও যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে সংস্কৃত ক'রে বিশ্বের পরিচয় গ্রহণ করবার প্রয়োজন তার হয় না। অধিচেতন-প্রকৃতিতে অবশ্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবিতের একটা অন্তর্গূঢ় সামর্থ্য আছে—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের দিব্যসংবিন্ময়ী একটা প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু সে যে কেবল জড়-জগতের বিষয়ের প্রতিচ্ছবি চেতনায় ফুটিয়ে তোলে, তা নয়। স্থূল ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ সামর্থ্যের সীমা ছাড়িয়ে লোকান্তর হতেও সে বিষয়বতী প্রবৃত্তির বিচিত্র স্পন্দন আনে। এই দিব্য-করণ যে রূপ বা ছবি ফুটিয়ে তোলে, অনেক-সময় তারা বাস্তব না হয়ে প্রতীকী হয়। তারা ভব্য-রূপের আভাস আনে, অপর-কোনও সত্ত্বের ভাব চিন্তা কি আকূতির ব্যঞ্জনা অথবা বিশ্বশক্তির কোনও নিগূঢ় বীর্য বা সম্ভাবনার মূর্ত দ্যোতনা জাগায়। বিশ্বভুবনে এমন-কিছু নাই, যাকে সে কল্পমূর্তিতে ভাবের কায়ায় বা রূপঘন বিগ্রহে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। বস্তুত বহির্মানে নয়, অধিচেতন মনেই আছে চিন্তাসংক্রমণ পরচিত্তজ্ঞান দূরদর্শন প্রাতিভজ্ঞান প্রভৃতি নানা অলৌকিক বিভূতি। আমাদের বহির্মুখ ব্যক্তিসত্তা ব্যষ্টিভাবনার অবিরাম সাধনায় অবিদ্যার প্রাচীর গড়ে অন্তরে-বাইরে যে-ব্যবধান খাড়া করেছে, তার কোনও ফাঁক বা চিড়ের ভিতর দিয়ে এইসব সিদ্ধি অধিচেতনা হতে বহিশ্চেতনায় সংক্রামিত হয়। কিন্তু এমনভাবে আবরণ ভেদ করে আসতে হয় বলে অধিচেতন সংবিতের বৃত্তি অনেকসময় বিপথচারণায় চিত্তকে ব্যামোহগ্রস্ত করে—বিশেষত তার অর্থ আবিষ্কারের ভার যদি প্রাকৃতমনের 'পরে পড়ে। সে-মন তো জানে না অধিচেতন বৃত্তির চলন কি ধরনের, কি রীতিতে কল্পিত হয় তার ইশারা, কি রূপকের ভাষায় তার আলাপচারি চলে। অধিচেতনার রূপক বুঝতে বা তার ভাবের মধ্যে ঠিক-ঠিক ঢুকতে হলে চাই বোধি ও বিবেকের নিগূঢ়তর সামর্থ্য, অন্তর্মুখ চিত্তের সূক্ষ্মতর নৈপুণ্য। তবু অধিচেতনার সংবিৎ যে ইন্দ্রিয়শাসিত বহিশ্চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে আমাদের জ্ঞানের প্রসারে দূর-দিগন্তের আশ্বাস আনে—একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু তার চাইতে বড় হল অধিচেতনার সেই দিব্য সামর্থ্য, যা দিয়ে অপর চেতনা বা বিষয়ের সঙ্গে তার অপরোক্ষ চিন্ময় যোগ ঘটে। তার জন্য অন্য-কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না—শুধু তার আত্মভাবের অনুগত দিব্য-সংবিতের স্বরূপশক্তি ছাড়া, যা চিত্তসত্ত্বের অপরোক্ষবৃত্তি দিয়ে জানে বিষয়ের তত্ত্বরূপ। বিষয়কে সংবিতের রসে জারিত ক'রে অন্তস্তলে অনুবিদ্ধ হয়ে সে তার নিগূঢ়তম রহস্য আহরণ করে। বাইরের কোনও লিঙ্গ বা অনুভাবকে আশ্রয় না ক'রে চিত্তসত্ত্বেরই 'পরে চিত্তসত্ত্বের অপরোক্ষ সংস্পর্শ বা আবেশ দ্বারা ভাবনা বেদনা ও শক্তির স্বতঃসঞ্চারী জ্যোতির্ময় দ্যোতনাকে সে স্ফুরিত

করে। এমনি করে অন্তরপুরুষ সব-কিছুর অপরোক্ষ অন্তরঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত ও নিখুঁত পরিচয় পান। যে-প্রত্যক্ষলোক এবং তারও বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির যে অদৃশ্য নিগূঢ়শক্তির পরিমন্ডল আমাদের ঘিরে আছে, অজ্ঞাতসারে তাদের অভিঘাতে আমাদের দেহ প্রাণ মন ও চেতনা প্রতিনিয়ত দুলছে। প্রাকৃতচিত্ত তার সন্ধান রাখে না, কিন্তু অন্তরপুরুষের অধিচেতন সংবিৎ তার সকল তত্ত্ব জানে। আমাদের বহির্মনেও কখনও-কখনও এমন চেতনার আভাস জাগে, যার মধ্যে অপরের ভাবনা বা অন্তরের আন্দোলনের ছায়া পড়ে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে বাহন না করেও বিষয় বা ঘটনার জ্ঞান ফোটে, অথবা এমনিতর আর-কোনও অলৌকিক সামর্থ্যের পরিচয় মেলে। কিন্তু এসব শক্তির প্রকাশ যেমন অনিয়ত, তেমনি তার ধরন নিতান্ত কাঁচা এবং অস্পষ্ট। তারা আমাদের গুহাচর অধিচেতনসত্তার বিশিষ্ট ধর্ম। অতএব তার শক্তি কি বৃত্তির উদ্বেলনে তারা চেতনার উপরস্তরে ভেসে ওঠে। আধুনিক গবেষকেরা অধিচেতনার এই বহির্বিচ্ছুরণকে 'অধ্যাত্ম-রহস্য' খেতাব দিয়ে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করছেন, যদিও সাধারণত এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ আত্মার সম্পর্ক খুবই কম। আসলে তারা পড়ে অধিচেতনার অধিকারে স্থিত অন্তর্মন অন্তঃপ্রাণ ও ভূতসূক্ষ্মময় সত্তার এলাকাতে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ও যথেষ্ট ব্যাপক হতে পারে না। কেননা তাঁরা এসব তথ্যের যাচাই করেন বহির্মনের মাপে—তার পরোক্ষসন্নিকর্ষের পদ্ধতিকে প্রমাণ মেনে। বহির্মনে অধিচেতন বিভূতির প্রকাশকে অসাধারণ অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত মনে হয়। অতএব তাদের অপূর্ণ বিরল ও দুর্নিরীক্ষ্য আবির্ভাব নিয়ে গবেষণা চালাতে গেলে তার ফল কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। তারা যে-অন্তশ্চেতনার স্বাভাবিক বৃত্তি, তার সঙ্গে বহির্মনের ব্যবধানের প্রাচীর যদি ভাঙতে পারি, অথবা স্বচ্ছন্দে ডুবতে কি বাসা বাঁধতে পারি যদি চেতনার গহনগুহায়, তাহলেই আমরা এই অভিনব বিজ্ঞানরাজ্যের সকল পরিচয় পাব এবং তাকে আমাদের সমগ্রচৈতন্যের এলাকাভুক্ত করে উদ্বুদ্ধ আধারশক্তির পরিমন্ডলে তার আলো ছড়িয়ে দিতে পারব।

বহিশ্চর মন দিয়ে অপর মানুষকেও প্রত্যক্ষভাবে জানবার উপায় নাই—যদিও জানি তারা আমাদের সগোত্র, আমাদের সবার দেহ-প্রাণ-মন এক ছাঁচে ঢালা। মানুষের শরীর-মনের একটা মোটামুটি তত্ত্ব আমরা জানি। তার অন্তরের আন্দোলনের যে-পরিচয় বাইরের চিরদৃষ্ট অনুভাব বা প্রত্যয়ের আকারে নিয়ত ফুটে উঠছে, ওই তত্ত্ববিচারে তাকেও আমরা কাজে লাগাই। মনুষ্যপ্রকৃতির এই সংক্ষিপ্তসারের সঙ্গে আমরা জুড়ি ব্যক্তিগত চারিত্র ও চালচলন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা। নিজেকে যতটুকু জানি, স্বভাবত তারই মাপে অপরকে বুঝতে এবং বিচার করতে চাই। কথা এবং আচরণ থেকে

পরের মনের ভাব ধরতে চাই, সমবেদনার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চাই তাকে। কিন্তু মোটের উপর এই তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফল যেমন অনিশ্চিত, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভ্রমসংকুল। পরচরিত্রের অনুমানে প্রায়শ থাকে আমাদের মনগড়া সিদ্ধান্তের ভেজাল—বাইরের অনুভাবের ব্যাখ্যায় শুধু আন্দাজে-ঢিলমারার ধৃষ্টতা। মনুষ্যচরিত্রের সাধারণজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের নজির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অধরা-ধারায় ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন-কি যাকে বলি অন্তর্দৃষ্টি, তারও আড়ালে কত-যে ফাঁকি লুকিয়ে থাকে! বাস্তবিক মানুষ কেউ কাউকে চেনে না। অত্যন্ত ফিকা একটুখানি সমবেদনা ও অন্যোন্য-অনুভবের হাল্‌কা ডোরে সবার হৃদয় বাঁধা। নিজেকেই-বা আমরা কতটুকু জানি। তারও চাইতে কম জানি পরকে—এমন-কি হৃদয়ের যারা অতি কাছে তাদিকেও। কিন্তু অধিচেতনার গভীর গহনে ডুবলে জাগে চারদিককার ভাবনা-বেদনার অপরোক্ষ সংবিৎ—চেতনায় লাগে তাদের অভিঘাতের দোলন, সমুখ দিয়ে ভেসে যায় তাদের চলচ্ছবি। অপরের চিত্তলিপি পাঠ করা তখন আর কঠিন কি অনিশ্চিত ব্যাপার নয়। যারাই একসঙ্গে মিলেছে কি আছে, তাদের মধ্যে চলছে মন প্রাণ ও ভূতসূক্ষ্মের একটা নিঃশব্দ অন্যোন্যবিনিময়। মানুষ তার কোনই খবর রাখে না—শুধু কথায় কাজে বা বাইরের সংঘাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে চেতনাকেই সে আন্দোলিত করে এবং তারই উদ্বেলনে বহিশ্চেতনায় রূপ ধরে। এই নিত্যবিনিময় চলছে। বাইরে তার ক্রিয়া পরোক্ষ, কেননা পরস্পরের অধিচেতনাকেই সে আন্দোলিত করে এবং তারই উদ্বেলনে রূপ ধরে বহিশ্চেতনায়। কিন্তু যখন অধিচেতন ভূমিতে আমরা জেগে উঠি, তখন অন্তরে-অন্তরে এই ব্যতিষঙ্গ ক্রিয়াব্যতিহার ও অন্যোন্যবিনিময়ের চেতনাও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন আর আমাদের অসহায়ভাবে তাদের অভিঘাত সইতে হয় না—তাদের গ্রহণ বা বর্জন করা, তাদের থেকে আত্মরক্ষা করা বা বিবিক্ত হওয়া সমস্তই হয় আমাদের ইচ্ছাধীন। অপরের সঙ্গে এখন আমাদের যে-যোগাযোগ, তা প্রায়ই জ্ঞানত বা ইচ্ছাকৃত নয় এবং অনেকসময় আমাদের অজ্ঞাতসারে তা অপরের হয়ত অনিষ্টকর। কিন্তু অধিচেতন ভূমিতে আরূঢ় পুরুষের পক্ষে এ-বাধা নাই। তাঁর চিত্তের যোগে থাকে সজ্ঞান আনুকূল্যের প্রসাদ, হৃদয়ে-হৃদয়ে জ্যোতিঃসুধাময় আত্মবিনিময় ও আতিথেয়তার সার্থক অবদান, হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে বোঝবার ও অন্তর্যোগে যুক্ত হবার একটা নিবিড় আয়োজন। আর প্রাকৃত ভূমিতে চিত্তের যোগে আছে শুধু একটা বিবিক্ত আসঙ্গের বোধ—যা না-বোঝা এবং ভুল-বোঝার বেদনায় কণ্টকিত, পরস্পরের পরিচয় যেখানে প্রমাদী মনের দুর্ব্যাখ্যায় ভারাক্রান্ত ব'লে মিলনের আশাও শঙ্কাবিধুর।

অধিচেতনভূমিতে আরূঢ় হলে অবিগ্রহ বা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের কারবারে আরেকটা গুরুতর পরিবর্তন আসবে। এই শক্তিগুলি

আমাদের কাছে কার্যানুমেয়; তাদের ক্রিয়া ও পরিণামের যেটুকু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা-ই দিয়ে তাদের পরিচয়। তার মধ্যে শুধু জড়শক্তির খানিকটা তত্ত্ব আমরা জানি—অথচ অদৃষ্টচর মনঃশক্তি ও প্রাণশক্তির একটা বিপুল আবর্তের মধ্যে আমাদের বাস। তাদের আমরা চিনিও না—এমন-কি তারা যে আছে, তাও জানি না। এই অদৃশ্য রাজ্যের স্পন্দ ও ক্রিয়ার সংবিৎ জাগতে পারে আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ় অধিচেতনার স্ফুরণে—কেননা অপরোক্ষসন্নিকর্ষ ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, প্রাতিভ দিব্যসংবিৎ দিয়ে এই অতীন্দ্রিয়লোকের তত্ত্ব অধিচেতনাই জানে। চেতনার সদরমহলে তার বার্তা সে পাঠায় বটে, কিন্তু বহির্মুখ চিত্তের মূঢ়তায় তা দেখা দেয় নানা দুর্বোধ ইঙ্গিত হুঁশিয়ারি আকর্ষণ-বিকর্ষণ পূর্বাভাস ভাবনা ও অস্পষ্ট বোধিপ্রত্যয়ের শীর্ণ ও বিকলাঙ্গ আকার নিয়ে। এইসব বিশ্বশক্তির সাম্প্রতিক লক্ষ্য ও পরিণামকেই যে অন্তরপুরুষ তাঁর অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষজনিত বাস্তবপ্রত্যয় দিয়ে জানেন, তা নয়। তাদের বর্তমানের ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে অনাগত পরিণামের সম্ভাবনা, তারও কতকটা আভাস তিনি পান। আমাদের অধিচেতনায় আছে কালের ব্যবধানকে উল্লঙ্ঘন করবার অধৃষ্য বীর্য। তাই তার তারে সুদূর দেশের বা প্রত্যাসন্ন কালের বার্তা স্পন্দিত হয়, এমন-কি কখনও তার চোখের সামনে সরে যায় দিগন্তলীন অনাগতেরও যবনিকা। অবশ্য এই প্রাতিভজ্ঞান অধিচেতনার ধর্ম হলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়, কেননা এর মধ্যে বিদ্যা ও অবিদ্যার সংমিশ্রণ আছে বলে এ-দর্শনে যেমন সত্য আছে, তেমনি আছে প্রমাদেরও অবকাশ। তাদাত্ম্যবোধ নয়, অপরোক্ষসন্নিকর্ষ-জনিত জ্ঞানই অধিচেতনার সাধন। কিন্তু সন্নিকর্ষ আছে বলেই বিবিক্ত-বোধেরও ছোঁয়াচ লেগেছে তার গায়—যদিও সে-বিবিক্তপ্রত্যয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ-যোগের যে-নিবিড়তা, তার আভাসটুকুও আমাদের ব্যাবহারিক অনুভবে মিলবে না। বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে ফাঁপিয়ে তোলবার যে একটা ব্যামিশ্র প্রবৃত্তি রয়েছে আমাদের প্রাণময় ও মনোময় অন্তঃপ্রকৃতিতে, তার প্রতিকার সম্ভব আরও গভীরে ডুবে গিয়ে চৈত্যসত্তার সাক্ষাৎকারে—যিনি জীবের দেহ ও প্রাণের ভর্তা। এই চৈত্যসত্তার প্রতিভূরূপে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক চিন্ময় জীবসত্ত্ব, প্রাকৃত আধারে যা অতিসূক্ষ্ম চিদ্বীজকে নিহিত করে। ব্যবহার-দশায় আধারের মুখ্য সাধন নয় বলে এই চিদ্বীজের ক্রিয়া স্তিমিত ও সংকুচিত। বাস্তবিক প্রাকৃতদশায় জীবাত্মাকে জীবের ভাব ও কর্মের সাক্ষাৎ প্রভু এবং নিয়ন্তা বলা চলে না—কেননা আত্মপ্রকাশের জন্য সবসময় তাকে মনোময় প্রাণ-ময় ও অন্নময় সাধনের 'পরে নির্ভর করতে হয়। মনঃশক্তি এবং প্রাণশক্তি প্রতিনিয়ত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে অভিভূত করতে চাইছে। কিন্তু অধিচেতনার গভীরে অবগাহন করে একবার যদি সে তার নিগূঢ় বৃহৎ স্বরূপের সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত হয়, তাহলে তার এই পরনির্ভর স্বভাবের কার্পণ্য ঘুচে যায়—

স্বারাজ্যসিদ্ধির অকুণ্ঠ বীর্য তার করায়ত্ত হয়। সুপ্রবুদ্ধ জীবাত্মার মধ্যে তখন ফোটে তত্ত্বদর্শনের স্বরসবাহী চিন্ময় দীপ্তি, জাগে এক স্বতঃসিদ্ধ বিবেকখ্যাতির অগ্র্যা বৃত্তি—যা সত্যকে অবিদ্যা ও অচিতির মিথ্যা হতে বিবিক্ত করে, দৈবী মায়াকে পৃথক করে আসুরী মায়ার ছলনা হতে। এমনি করে জীবাত্মা আধারের সর্বাংশের ভাস্বর অধিনায়ক হয় এবং তার এই জাগৃতিতে অধ্যাত্মজীবনের মোড় ফিরে যায় সম্যক্-বিজ্ঞান ও সম্যক্-রূপান্তরের দিকে।

এই হল অধিচেতনার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কিন্তু আপাতত এই অন্তর্গূঢ় মহাভূমির ধরন হতে তার নিখুঁত রূপটি আমরা আবিষ্কার করতে চাই। দেখতে চাই তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। পূর্বেই বলেছি, বিষয়ের সঙ্গে কি চেতনার সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষসন্নিকর্ষ দ্বারা তাদের তত্ত্ব জানা—এই হল অধিচেতনার মুখ্য ধর্ম। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারি, এর মূলে রয়েছে তাদাত্ম্যবোধের নিগূঢ় প্রত্যয়, বিষয়ের বিবিক্ত-সংবিতের আকারে তাদাত্ম্যসংবিতের একটা তর্জমা। আমাদের প্রাকৃতচেতনার বহিশ্চর প্রত্যয়ে যেমন জীবের সঙ্গে জগতের পরোক্ষসন্নিকর্ষের সংঘাতে দীপ্ত-জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে, তেমনি অধিচেতনাতেও কোনও অলৌকিক-সন্নিকর্ষের বশে নিগূঢ় প্রাক্সিদ্ধ জ্ঞানের একটা ঝলক বাইরে আপনাকে ফুটিয়ে তোলে। বস্তুত বিষয় এবং বিষয়ীতে রয়েছে একই চৈতন্য। এই তাদাত্ম্য বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সন্নিকর্ষে আত্মচেতনায় জাগায় স্বনিহিত অথচ সুপ্ত অনাত্মসংবিৎ। বহির্মনে এই প্রাক্সিদ্ধ জ্ঞান দেখা দেয় অর্জিত জ্ঞানের আকারে। কিন্তু অধিচেতনায় এ যেন পূর্বানুভবের স্মৃতি—ফুটে উঠেছে ভিতর থেকে। আবার এ-জ্ঞান অবিমিশ্র বোধিপ্রত্যয় হলে, আন্তরসংবিতে তার স্বতঃপ্রামাণ্যের স্বচ্ছতা থাকে। আর সন্নিকর্ষজ বিষয়জ্ঞান হলেও তার মধ্যে থাকে স্বারসিক প্রত্যভিজ্ঞার অব্যবহিত প্রত্যয়।...বহিশ্চেতনায়, সত্যকে দেখছি আমরা বাইরে—এই হল জ্ঞানের ধারা : বিষয়ের সত্য যেন আমাদের 'পরে বিষয়েরই একটা প্রক্ষেপ। বিষয়ের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়বোধের উদ্রেক, অথবা বিষয়ের বাস্তবরূপের একটা সংবিন্ময় প্রতিরূপের উদ্বোধন—এই হল ব্যাবহারিক জ্ঞানের রীতি। বহির্মনের কাছে জ্ঞানের পরিচয় এইটুকুতে সীমিত—কেননা বহির্জগৎ আর নিজের মাঝে যে-দেয়াল সে গড়ে তুলেছে তার মধ্যে আছে শুধু ইন্দ্রিয়সংবিতের ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে বিষয়ের বাইরের রূপটাই সে দেখে, তার অন্তররহস্যের কোনও সন্ধান পায় না। কিন্তু ভিতরের যে-দেয়াল তার অন্তর্গূঢ় সত্তা থেকে তাকে পৃথক করেছে, তার মধ্যে আগে-থেকে তৈরী-করা অমন-কোনও ফাঁক নাই। তাই অন্তরগহনের কোনও খবর সে জানে না—দেখতে পায় না সত্তার গভীর উৎস হতে জ্ঞানের স্বচ্ছন্দ উৎসারণ। অতএব ব্যবহারজগতের নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারকেই তত্ত্ব বলে না মেনে তার উপায়

নাই ; অর্থাৎ বাহ্যবস্তুই তার কাছে জ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজক। তাই মনের সহায়ে বিষয়কে জানবার বেলায় আমাদের জ্ঞান হয় পরাক্-বৃত্ত—সত্য যেন বাইরে থেকে আরোপিত হয় চিত্তের 'পরে। যা আমাদের সত্তায় নাই, বিষয়জ্ঞানে তাকেই দেখছি যেন মনঃকল্পিত একটা ছবির আকারে। অতএব জ্ঞান আমাদের কাছে একটা প্রতিবিম্ব বা বিষয়সংস্পর্শে উদ্রিক্ত একটা নির্মাণকায় মাত্র। বস্তুত বিষয়সন্নিকর্ষে অন্তরের গভীরগহনে যে নিগূঢ় সত্ত্বোদ্রেক, তাকেই বলি জ্ঞানের হেতু। ওতেই বিষয়ের একটা অন্তর্গূঢ় স্বরূপবিজ্ঞান অন্তর হতে উৎক্ষিপ্ত হয়, কেননা বিষয় তত্ত্বত আমাদের বিরাট আত্মভাবের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চর জীবাত্মার বাইরে-ভিতরে খাড়া রয়েছে দুটি প্রাচীরের ব্যবধান, যা আত্মস্বরূপ ও জগৎস্বরূপের জ্ঞান হতে তাকে বঞ্চিত করেছে। তাইতে আমাদের প্রাকৃতচেতনায় অন্তরের নিগূঢ় বিজ্ঞানের একটা বিকল রূপ-রেখা বা অপূর্ণ প্রতিরূপ শুধু ভেসে ওঠে।

বহির্মনের কাছে আচ্ছন্ন ও অপ্রত্যক্ষ হয়ে আছে এই-যে তাদাত্ম্যচেতনার গূঢ়সঞ্চারী প্রবৃত্তি, অপরোক্ষসংবিতের দীপ্তিতে তাও জ্বলে ওঠে—যখন ব্যষ্টি-ভাবনার নিগড় ভেঙে অধিচেতনা বেরিয়ে পড়ে বিশ্বচেতনার মহাবৈপুল্যের দিকে এবং বহিশ্চর চেতনাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে সেই সংবেগের স্রোতে। অধিচেতনা আর বিশ্বচেতনার মাঝে আছে সূক্ষ্মতর মনোময় প্রাণময় ও ভূত-সূক্ষ্মময় কোশের ব্যবধান—যেমন বিশ্বপ্রকৃতি হতে আমাদের বহিঃপ্রকৃতি পৃথক হয়ে আছে স্থূল অন্নময় কোশের বাধায়। কিন্তু অধিচেতনার চারদিকে যে-দেয়াল, তা এত স্বচ্ছ যে তাকে বরং বেড়া বলা যায় দেয়াল না বলে। তাছাড়া অধিচেতনাকে ঘিরে আছে এক চিন্ময় পরিমণ্ডল, যা ওই কোশগুলির বাইরে প্রচ্ছুরিত হয়ে গড়ে তুলেছে তার নিজের একটা পরিচেতন জ্যোতির্ময় পরিবেষ। এই প্রভামণ্ডলের ভিতর দিয়ে সে বিশ্বজগতের খবর পায়, এমন-কি বাইরের কোনও অভিঘাত আধারে প্রবেশ করবার আগেই তার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই পরিচেতনার পরিবেষকে যথেচ্ছ বিস্ফারিত করে বিশ্বময় নিজেকে প্রচ্ছুরিত করবার সামর্থ্য অধিচেতনার আছে। প্রচ্ছুরণের ফলে ক্রমে এমন-একটা সময় আসে, যখন তার চারদিক থেকে বিবিক্তবোধের বেড়া ভেঙে পড়ে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে অধিচেতনা রূপান্তরিত হয় বিশ্বচেতনায় এবং সর্বাত্মভাবের অপ্রমেয় ঔদার্যে। এমনি করে বিরাট পুরুষ ও বিরাট প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য হতে জীবের মধ্যে প্রমুক্তির একটা বিপুল প্রবেগ সঞ্চারিত হয়। সে তখন হয় বিশ্বচেতন বৈশ্বানর পুরুষ। এই সাধনার সিদ্ধিতে প্রথম তার মধ্যে জাগে বিশ্বাধিবাস বিশ্বাত্মার অনুভূতি। তার তীব্রতায় ব্যষ্টিত্বের বোধ বিলুপ্ত হয়ে অহন্তার প্রলয়ও ঘটতে পারে বিশ্বসত্তার মধ্যে। আবার এমনও হয় : বিশ্ব-

শক্তির নির্বারিত কিরণপ্লাবনের কাছে উন্মিষিত হয় বিকসিত চেতনার শতদল —সুধাসারে অভিষিক্ত হয় দেহ-প্রাণ-মনের প্রতিটি অণু, বিলুপ্ত হয় ব্যষ্টি-প্রবৃত্তির স্বতন্ত্র অনুভব। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই অনুভবের প্রসার হয় সীমিত : বিরাট পুরুষ ও বিরাট প্রকৃতির অপরোক্ষসংবিতে জীবের মন প্রাণ ও দেহ দলে-দলে উন্মিষিত হতে থাকে বিশ্বমন বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বজড়ের নিরন্ত শক্তির অভিষেকে। এই উন্মেষের ফলে বিশ্বের সঙ্গে জীবের একটা একাত্মবোধ অর্থাৎ আত্মচেতনায় বিশ্বের এবং বিশ্বচেতনায় আত্মার সুনিবিড় অন্তর্ভাব হয় সাধকের প্রায়িক অথবা অবিচ্ছেদ একটা উপলব্ধি। আর সেই-সঙ্গে স্বভাবত 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা'—এই অনুভবটি জাগ্রত হয়। তখনই সাধকের চিত্তে ফোটে বিরাট পুরুষের সত্তার সুনিশ্চিত অপরোক্ষপ্রত্যয়—তাকে আর শুধু ভাববাসিত অনুভব ব'লে মনে হয় না তার।

কিন্তু তাদাত্ম্যবোধের 'পরেই বিশ্বচেতনার প্রতিষ্ঠা, কেননা বিশ্বাত্মা নিজেকে জানেন সর্বভূতের আত্মা বলে। আত্মস্বরূপে সর্বভূত তাঁতেই স্থিত, সমস্ত প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি। সর্বাধার বলে আধেয়ের সর্বত্র তদাত্মক হয়ে তিনি অনুপ্রবিষ্ট ও অনুস্যূত। আবার তদাত্মিকা স্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর অতিস্থিতি। তাই তাদাত্ম্যবোধের দিক দিয়ে যেমন তাঁর মধ্যে আছে অদ্বয়ভাব ও সর্ববিজ্ঞান, তেমনি অতিস্থিতির দিক দিয়ে আছে সর্ব-গ্রাসিতা ও সর্বানুবেধ—আত্মচৈতন্যের লোকোত্তর পরিবেশের মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অপরোক্ষ প্রত্যয় এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মর্মাবগাহী নিবিড় অনুভব। বিশ্বাত্মা গুহাহিত হয়ে আছেন ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে, অথচ সমষ্টিকে ছাড়িয়েও আছেন। অতএব তাঁর আত্মবোধে এবং জগৎবোধে এমন-এক বিবেকশক্তি আছে, যা বিষয়ের অন্তর্নিবিষ্ট বিশ্বচিৎকে ওই আধারেই অব-রুদ্ধ থাকতে দেয় না। এইজন্যই ব্যষ্টিভাবনা ব্যক্তির ঐকান্তিক স্বধর্মের অনুকূল হলেও বিরাট পুরুষের পক্ষে তা বন্ধনের কারণ নয়। তাই তিনি ভূতে-ভূতে নিজেকে বিভাবিত করলেও তাঁর সর্বাধার সত্তার মহিমা কুণ্ঠিত হয় না। এইখানে তাহলে পাই এক ব্রহ্মাণ্ডগত তাদাত্ম্যের আধারে অগণিত পিণ্ডতাদাত্ম্যের সমাবেশ। কেননা, বিশ্বচেতনার মধ্যে যদি বিবিক্তপ্রত্যয়ের কোনও লীলা থাকে কি দেখা দেয়, তাহলে এই যুগল তাদাত্ম্য হবে তার ভিত্তি এবং তাতে কোনও বিরোধের সৃষ্টি হবে না। সন্নিকর্ষকে বজায় রেখেই প্রত্যাহারদ্বারা বিবিক্ত হয়ে জানবার প্রয়োজন কোথাও যদি থাকে, তাহলেও সেখানে বিবিক্তভাব থাকবে তাদাত্ম্যভাবের কুক্ষিগত, অভেদে সন্নিকর্ষই হবে সেখানকার সন্নিকর্ষের স্বরূপ—কারণ সর্বত্র আধেয় বিষয় আধাররূপী আত্মার একদেশ মাত্র। ভেদভাব যখন মূলোচ্ছেদী হয়ে দেখা দেয়, তখনই অভেদভাব আপন স্বরূপকে নিগূহিত ক'রে ঈষৎ-বিদ্যার একটা উচ্ছ্বাস পরোক্ষে কি

অপরোক্ষে উৎক্ষিপ্ত করে, যা নিজের উৎসমূলকে জানে না। অথচ তখনও অভেদভাব বা তাদাত্ম্যবোধেরই এক বিপুল সমুদ্র প্রতিনিয়ত উদ্বেল হয়ে উঠছে ব্যবহিত কি অব্যবহিত জ্ঞানের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বা শীকরোৎক্ষেপে।

এই হল জ্ঞান বা চেতনার দিক। তাছাড়া আছে ক্রিয়া বা শক্তির দিক। দেখছি, বিশ্বশক্তির বিপুল প্লাবন, অবিরাম তরঙ্গদোলা, দিকে-দিকে প্রবাহিত নির্বারিত খরধারা। তারা গড়ছে ভাঙছে আবার গড়ছে কত বস্তু ও ভূতের মেলা, বুনছে ছিঁড়ছে কত বিচিত্র স্পন্দ ও ঘটনার জাল—ভূতে-ভূতে অনুপ্রবিষ্ট ও ব্যূহিত, আবার ভূত হতে ভূতান্তরে প্রবাহিত ও উৎসারিত হয়ে চলেছে তারা যেন কোন্ নিরুদ্দেশের অভিসারে। প্রত্যেক প্রাকৃতজীব যুগপৎ এই শক্তিপ্রবাহের আধার ও ক্ষেপণযন্ত্র। জীব হতে জীবে বয়ে চলেছে মনঃশক্তি ও প্রাণশক্তির অবিরাম স্রোত। জড়শক্তির বিপুল প্লাবনের মত তারাও উত্তাল হয়ে উঠছে বিশ্বপ্লাবী বন্যার উদ্দাম প্রবাহে। শক্তির এই বিশাল বিক্ষেপ আমাদের বহির্মনের প্রত্যক্ষের অগোচর। কিন্তু অন্তরপুরুষ তাকে জানেন—অবশ্য অপরোক্ষসন্নিকর্ষের সহায়ে। বিশ্বচেতনায় অবগাহন করে পুরুষ বিশ্বশক্তির এই লীলাকে আরও ব্যাপকভাবে জানেন নিজেরই স্পন্দিত সত্তার নিবিড় অনুভবে। এ-অবস্থায় জ্ঞান পূর্ণতর হলেও তার ক্রিয়াপরিণাম কিন্তু আংশিক হয়, কেননা বিরাট পুরুষের সঙ্গে তদাত্মক হয়ে স্বরূপে অবস্থান জীবের পক্ষে সম্ভব হলেও তার ফলে বিরাট প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় তাদাত্ম্য-বোধ সর্বাংশে সিদ্ধ হয় না। সাধকের বিবিক্ত আত্মসত্তার বোধ লুপ্ত হলেও তার প্রাণ ও মনের খাতে শক্তির ধারা স্বভাবত ব্যষ্টিভাবনার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেই বইবে। আধারে বিশ্বশক্তির প্রবাহই বইবে তখন -জীবস্থ শক্তিকূটে প্রারব্ধের লীলাকে অনুসরণ করা হবে তার রীতি। কারণ, ব্যষ্টি-আধারে শক্তিকূটের কাজই হল শক্তির বিচিত্র ধারা হতে বিশিষ্ট কতগুলি শক্তির নির্বাচন সংহরণ ও রূপায়ণ এবং সেই রূপায়িত শক্তিকে খাতবন্দী করে একটা ধারায় বইয়ে দেওয়া। সমূহশক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন সম্ভাবিত হলে এই শক্তিকূট অকেজো হয়ে পড়ে—তখন তাকে বাতিল করা কি নিশ্চেষ্ট রাখাই সঙ্গত। এ-অবস্থায় ব্যষ্টি দেহ-প্রাণ-মনের আধারে তার নৈর্ব্যক্তিকতাকে খাত কি কেন্দ্র করে বইবে শুধু বিশ্বশক্তির অবিশিষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত একটা স্রোত, তার মধ্যে ব্যষ্টিজীবলীলার কোনও সার্থকতাই রূপায়িত হবে না। এ-অবস্থা লাভ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য প্রাকৃতমনের ভূমিকে ছাড়িয়ে অধ্যাত্মচেতনার সমুচ্চশিখরে উঠতে হয়। বিশ্বাত্মভাবের মধ্যে অচল-প্রতিষ্ঠার অনুভব যেখানে মুখ্য, সেখানে বিশ্বব্যাপ্ত অধিচেতনাতে থাকে বিশ্বাত্মা এবং সর্বভূতের আত্মার সঙ্গে অভেদসিদ্ধির জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞান ক্রিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে তাদাত্ম্যবোধকে পরিণত করে শুদ্ধ সর্বগত চিন্ময়

অপরোক্ষসন্নিকর্ষের বিপুলতর বীর্যে ও গভীরতর অন্তরঙ্গতায়। সর্বজীবে সর্বভূতে চেতনার সিদ্ধবীর্য তখন সংক্রামিত হয় তীব্রসংবেগের সার্থক ও সুনিবিড় উচ্ছলনে, সবাইকে আত্মসাৎ ও জারিত করবার সামর্থ্য হয় অকুণ্ঠিত, অন্তরঙ্গ দর্শন ও অনুভবের প্রাতিভশক্তি হয় উচ্ছ্বসিত এবং এই বৃহত্তর মুক্তপ্রকৃতিকে আশ্রয় করে আধারে উথলে ওঠে জ্ঞানা-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির বিচিত্র বিভূতি।

অতএব অধিচেতনাকে বিশ্বচেতনায় প্রসারিত করেও আমরা জ্ঞানের অধিকারকে বিস্তৃত করি মাত্র, কিন্তু তার সর্বাবগাহী আদ্যচ্ছন্দের পরিচয় পাই না। যদি আরও এগিয়ে গিয়ে তাদাত্ম্যবোধের বিশুদ্ধ স্বরূপটি চিনে নিতে চাই, কি করে এই তাদাত্ম্যবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানশক্তির প্রবর্তক আধার বা নিয়ামক হয় তার রহস্য যদি বুঝতে চাই, তাহলে অন্তঃস্থ মন প্রাণ ও ভূত-সূক্ষ্মের এলাকা ছাড়িয়ে আমাদের ঢুঁড়তে হবে অধিচেতনার আর দুটি প্রত্যন্ত-ভূমি অর্থাৎ অবচেতনার 'পরে ফেলতে হবে সন্ধানী চিত্তের আলো, স্পর্শ বা অনুবিদ্ধ করতে হবে অতিচেতনার লোকোত্তর ধাম। কিন্তু অবচেতনায় সবই আঁধারে ঢাকা—বিশ্বাত্মভাবনা সেখানে গণচেতনার মত আচ্ছন্ন, ব্যষ্টিভাবনাও তমোময় অনৈসর্গিক বিকলাঙ্গ ও মূঢ়সংস্কার দ্বারা বাহিত। অবচেতনায় আছে এক তামস তাদাত্ম্যসংবিৎ, যেমন আছে জানি অচিতির মধ্যে। কিন্তু সে-সংবিৎ অপ্রকাশ—তার রহস্য অব্যক্ত। আর লোকোত্তর অতিচেতনার স্তরে-স্তরে আছে প্রভাস্বর চিৎপ্রকাশের নির্বারিত মহিমা। বিদ্যাশক্তির গঙ্গোত্রী সেইখানে—তাদাত্ম্যবিজ্ঞান আর বিভক্তজ্ঞানের যুগলধারা উৎসারিত হয়েছে ওই মহাভূমি হতে। অতএব ওইখানে গেলে জানতে পারব তাদের নিদানকথা—তাদের প্রবৃত্তিভেদের সকল রহস্য।

কালাতীত পরমার্থসতের যে-আভাসটুকু আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভবে উপসংক্রান্ত হয়, তা-ই দিয়ে বুঝতে পারি, সত্তা আর চৈতন্য সেখানে এক। সাধারণত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি বৃত্তিকে আমরা বলে থাকি চেতনা: এই বৃত্তিগুলির অভাব বা উপশম যেখানে, সে-অবস্থাকে বলি অচেতনা। কিন্তু যেখানে চেতনার কোনও স্ফুট ব্যাপার কি নিশানা নাই, এমন-কি বিষয় হতে উপসংহৃত হয়ে চেতনা যেখানে শুদ্ধসন্মাত্রে সমাহিত কিংবা আপাতিক অসত্তায় সংবৃত্ত, সেখানেও তার অস্তিত্ব সম্ভব। বস্তুত চৈতন্য সত্তায় সমবেত—তাকে বলতে পারি সত্তার রস। অতএব চৈতন্য স্বয়ম্ভূস্বরূপ—অক্রিয়া উপশম আবরণ সংবরণ বা নিরুচ্ছ্বাস আত্মসমাধান—কিছুতেই তার বিপরিলোপ হয় না। সুষুপ্তিতে জড়সমাধিতে সংবিৎহারা দশায় এমন-কি অভাবের প্রতীতিতেও সত্তার সঙ্গে এই চৈতন্য অবিনাভূত হয়ে আছে। কালাতীত পরমস্থিতিতে চেতনা সত্তার সঙ্গে একীভূত অতএব নিস্পন্দ। কিন্তু তাবলে

তাকে পৃথক একটা তত্ত্ব বলতে পারি না—সেখানেও তাকে জানি আত্মসত্তায় সমবেত শুদ্ধ নির্বিকল্প আত্মসংবিৎ বলে। সেখানে জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন, তাই তার বৃত্তি নাই। সত্তা নিজের কাছে নিজেই প্রকাশিত বলে, নিজেকে জানতে কি নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে সেখানে বৃত্তির কোনও প্রয়োজন হয় না। বিশুদ্ধসন্মাত্রের বেলায় একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য লোকাদি সর্বসতের বেলাতেও। চিন্ময় স্বয়ম্ভূসত্তার আত্মসংবিৎ যেমন স্বারসিক, তেমনি স্বারসিক তাঁর সর্বসংবিৎ। কিন্তু তার জন্য তাঁর আত্মবিমর্শী জ্ঞানবৃত্তির প্রয়োজন হয় না, কেননা তাদাত্ম্যবোধের চরম চমৎকারে এক অখণ্ড স্বরসবাহী সংবিতের মধ্যে ফুটে ওঠে বিষয়-বিষয়ীর সামরস্য। স্বয়ম্ভূসৎ নিজেই সব হয়েছেন বলে তাঁর আত্মসংবিৎ স্বভাবত সর্বসংবিতের অবিনাভূত। এমনি ক'রে আপন কালাতীতস্থিতিকে জানেন বলে পরমপুরুষ এক স্বানুভবের বিলসনে তাঁর কালকলনাময় সত্তাকে এবং তার অন্তর্ভুক্ত যা-কিছু সব জানেন। তাঁর এই অনুভবও স্বরসবাহী পরাৎপর সর্বাবগাহী এবং বৃত্তিশূন্য। একেই বলে স্বরূপবিশ্রান্ত তাদাত্ম্যসংবিৎ। বিশ্বসত্তার অনুভবে এই সংবিৎই ধরে স্বরূপানুগত স্বতঃপ্রকাশ কারণহীন বিশ্বচেতনার আকার, যার মধ্যে বিশ্বাত্মা নিজেই বিশ্বরূপ হয়ে নিজেকে আস্বাদন করেন।

কিন্তু এই বিশুদ্ধ স্বানুভবের স্বধা ও বীর্য হতে শুদ্ধসংবিতের আরেকটি বিভূতি উৎসারিত হয়, যাকে স্বানুভবের আদি প্রচল্‌দ-রূপ বলে মনে হলেও বস্তুত সে তার একটা স্বাভাবিক ভঙ্গি—কারণ পরমপুরুষের আত্মসংবিতের প্রত্যেকটি বিভূতি বস্তুত তাদাত্ম্যসংবিতের প্রকারভেদ মাত্র। নিজের শাশ্বত স্বরূপস্থিতির কোনও বিকার কি বিপরিণাম না ঘটিয়ে, এই আত্মসংবিতে অন্তর্ভাবনা ও অন্তর্যামিত্বের একটা গৌণ অথচ অবিনাভূত সংবিৎ দেখা দিতে পারে। স্বয়ম্ভূ পরমপুরুষ আপন অদ্বিতীয় সত্তাতে অনুভব করেন সর্বভূতের সত্তা। আবার সবাইকে আত্মসত্তায় অন্তর্ভাবিত করে অনুভব করেন নিজেরই সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও শক্তির স্বরূপবিভূতি-রূপে। সেইসঙ্গে আত্মারূপে ভূতে-ভূতে সন্নিবিষ্ট হয়ে অন্তর্যামী আত্ম-স্বভাবের ব্যাপ্তি দিয়ে বিন্দুতে পান সিন্ধুর অনুভব। কিন্তু তাঁর আত্ম-সংবিতের এই ত্রিপুটী সকল অবস্থাতেই স্বরসবাহী স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্রিয়া-করণ- বা বৃত্তি-শূন্য। কেননা, জ্ঞান এখানে ক্রিয়ারূপ নয়, আত্ম-স্বভাবে নিত্যসমবেত শুদ্ধসত্ত্বরূপ মাত্র। সমস্ত অধ্যাত্ম অনুভবের মূলে আছে এই তাদাত্ম্যজন্য তাদাত্ম্যসংবিৎ, সর্বাত্মভাবনার প্রত্যয় যার স্বাভাবিক রস। আমাদের চেতনার ভাষায় তাকে তর্জমা করে পাই উপনিষদের এই বিজ্ঞানত্রিপুটী : 'সর্বভূতকে দর্শন করা আত্মাতে' 'আত্মাকে দর্শন করা সর্ব-ভূতে' 'যাঁর মধ্যে আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত'—অর্থাৎ অন্তর্ভাবনা অন্তর্যামিত্ব

ও তাদাত্ম্যের অপরোক্ষসংবিৎ। কিন্তু অনুত্তরসংবিতে এ-দর্শন চিন্ময় স্বানুভব মাত্র। সে যেন সন্মাত্রের স্বয়ম্প্রভা—আত্মাকে বিষয় করে আত্মার অনুব্যবসায়াত্মক বিবিক্তদর্শন পর্যন্ত নয়। কিন্তু এই অনুত্তর আত্মসংবিতে ফোটে পরম-পুরুষের অবিনাভূত স্বরূপশক্তির নিত্যসমবেত উল্লাসরূপে এক অভিনব চিদ্‌বিলাস—যাকে ঠিক পরা সংবিতের আত্মসমাহিত স্বরূপনিষ্ঠ স্বয়ম্প্রভা ও স্বতঃপ্রামাণ্যের আদ্যচ্ছন্দ বলা চলে না। এই চিদ্বিলাস অনুত্তরের একটা নতুন ভঙ্গি, যার মধ্যে আমাদের পরিচিত জ্ঞানের প্রথম সূচনা। এতে যেমন চেতনার একটা ভূমি আছে, তেমনি আছে জ্ঞানেরও স্পন্দ বা বৃত্তি : চিৎস্বরূপ নিজেকেই জানছেন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের, বিষয়ী ও বিষয়ের দুটি কোটিতে নিজেকে বিভক্ত ক'রে। অথবা বলা যায়, এ যেন তাঁর আত্মসংবিতের মধ্যে বিষয়-বিষয়ীর স্ববিমর্শময় একটা সম্পুট। কিন্তু তাঁর এ-চিদ্বিলাসও স্বরসবাহী ও স্বতঃপ্রমাণ—তাদাত্ম্যবোধেরই এ একটা বৃত্তি। এখনও এর মধ্যে বিভক্তজ্ঞানের আভাস দেখা দেয়নি।

কিন্তু বিষয়ী যখন আত্মবিষয় হতে খানিকটা দূরে সরিয়ে নেন নিজেকে, তখনি দেখা দেয় তাদাত্ম্যবোধের শক্তিপরিণামের একটা তৃতীয় পর্ব। তার মধ্যে আছে এক চিন্ময় স্বগতদর্শনের নিবিড়তা, চিদাবেশের সর্বানুস্যূত একটা ব্যাপ্তি, সর্বভূতকে আত্মস্বরূপে দর্শন স্পর্শন ও রসনের একটা দিব্য উল্লাস। বিষয়ের মর্মে অবগাহন করে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাদাত্ম্যবোধের সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তিচৈতন্য দিয়ে তার স্বরূপ ও আধেয়কে চিনে নেওয়া—এ-ভূমির এই এক বিশেষত্ব। প্রত্যক্ষ সেখানে নিষ্পন্ন হয় তাদাত্ম্যপ্রত্যয়দ্বারা। তারপর এ-ভূমিতে আছে এক চিন্ময় সামান্যপ্রত্যয়, যাকে বলতে পারি মননের স্বরূপধাতু। অবশ্য এ-মনন অজানাকে আবিষ্কার করে না আমাদের মননের মত। আত্মস্বরূপে অধিগত বিষয়কেই সে ফুটিয়ে তোলে নিজের ভিতর থেকে; তারপর চিদাকাশে অর্থাৎ আত্মসংবিতের প্রসারিত পটভূমিকায় তাকে স্থাপন ক'রে আত্মসংবিন্ময় সামান্যপ্রত্যয় দিয়ে তাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে। তাছাড়াও এ-ভূমিতে আছে এক চিন্ময় রসোল্লাস—সামরস্যের পরম অনুভবে যেন অদ্বৈতসম্পুটের সঙ্গে অদ্বৈতসম্পুটের মেশামেশি, সত্তায়-সত্তায় চেতনায়-চেতনায় আনন্দে-আনন্দে অন্যোন্যসঙ্গমের এক অনির্বচনীয় উচ্ছলন। আবার এখানে আছে অভেদে ভেদাভাসের আনন্দঘন নিবিড় চেতনা, রস-রীতির নিত্য-সম্প্রয়োগে পরমসাম্যের অসমোধর্ব আস্বাদন, শাশ্বত অদ্বয়স্বরূপের শক্তি সত্য ও সত্তার বিচিত্র ভাবনায় অরূপের রূপের মেলায় আনন্দের নিরন্ত আন্দোলন। চিৎশক্তির এই লীলায়নে মহাকাশের বুকে সম্ভূতির বর্ণরাগ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে আত্মরূপায়ণের ইন্দ্রধনু হয়ে। কিন্তু অনন্তের চিদ্বিলাসরূপে এসব শক্তিই তাঁর স্বরূপশক্তি—তারা ব্যূহিত পরিকল্পিত কি বিসৃষ্ট করণশক্তি

নয়। তারা সেই চিন্ময় অদ্বয়তত্ত্বের স্বগতসংবিন্ময় প্রভাস্বর স্বরূপধাতু—তাদের ক্রিয়াতে আত্মাই কর্তা কর্ম করণ ও আধার। শুদ্ধচিৎই এখানে দৃক্-শক্তি, শুদ্ধচিৎই বেদনায় স্পন্দমান, শুদ্ধচিৎই বিশেষ- ও সামান্য-প্রত্যয়ের আকারে স্বয়ংজ্যোতির্ময়। এসমস্তই তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের লীলা—অখণ্ড-সংবিতের বহুধাবিসৃষ্ট আত্মভূমিকায় তার স্বরূপশক্তির স্বতঃসঞ্চরণ। পরমপুরুষের অনন্ত স্বানুভবের বিহার দুটি কোটিতে : একদিকে রয়েছে তাঁর নিরুপাধিক একরস তাদাত্ম্যপ্রত্যয়, আরেকদিকে বহুধাবিলসিত তাদাত্ম্য-প্রত্যয়। একদিকে আত্মসমাহিত স্বরূপানন্দ, আরেকদিকে অদ্বৈতরসভাবিত ভেদভাবনার অনির্বচনীয় রসোদ্‌গার।

অভেদভাবকে অভিভূত করে ভেদভাব যখন প্রবল হয়, তখনই দেখা দেয় বিভক্তজ্ঞানের আভাস। আত্মার প্রত্যয়ে তখনও বিষয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্যের বোধ জাগরূক রয়েছে। কিন্তু তবু স্বগত ভেদভাবনাকে সেখানে তিনি একান্ত করে দেখেন। এর মধ্যে প্রথমত আত্মা এবং অনাত্মার ভেদ জাগে না—জাগে শুধু নিজের আত্মা এবং পরের আত্মা এই দুটি কোটি মাত্র। খানিকটা তাদাত্ম্যজন্য তাদাত্ম্যবোধ তখনও থাকে। কিন্তু প্রথমে তার উপরে চাপে ব্যতিষঙ্গ- ও সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানের ভার, তারপর তাকে অভিভূত ক'রে জ্ঞানের এই শেষোক্ত পর্যায় হয় সর্বেসর্বা। তখন অভেদপ্রত্যয়কে মনে হয় গৌণ—অন্যোন্যসন্নিকর্ষের হেতু নয়, তার পরিণাম। অথচ তখনও বিবিক্ত আত্ম-ব্যূহের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হয়ে থাকে অভেদভাবের সর্বগ্রাসী সর্ব-ব্যাপী ও সর্বান্বয়ী অন্তরঙ্গপ্রত্যয়। অবশেষে তাদাত্ম্যবোধ চলে যায় নেপথ্যের অন্তরালে। তখন সত্তার সঙ্গে অপর সত্তার, চেতনার সঙ্গে অপর চেতনার যে-খেলা চলে, নিগূঢ় তাদাত্ম্যবোধ তার আধার হ'লেও সে-বোধের অনুভব থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় প্রত্যক্ষগ্রহণ ও অন্যোন্যসন্নি-কর্ষের অনুবেধ ব্যতিষঙ্গ এবং অন্যোন্যবিনিময়। এই ক্রিয়াব্যতিহারে তখন সম্ভব হয় বিজ্ঞান অন্যোন্যসংবিৎ বা বিষয়সংবিৎএর অল্পবিস্তর অন্ত-রঙ্গতা। আত্মার সঙ্গে আত্মার অন্যোন্যসঙ্গমের বোধ এখানে নাই, আছে অন্যোন্যাশ্রয়ের অনুভব। তাই এখনও অপরকে মনে হয় না একান্ত বিবিক্ত ও অপরিজ্ঞাত একটা পৃথক সত্তা বলে। অবশ্য এর মধ্যে চেতনার কার্পণ্য রয়েছে, কিন্তু তবু পূর্ব্যবিজ্ঞানের খানিকটা আভাস তাতে আছে—যদিও স্বভাবধর্মের পূর্ণতা হারিয়ে বিজ্ঞান এখানে খণ্ডভাবনার দ্বারা খিলবীর্য হয়েছে। বিভজ্যবৃত্তিতা এ-বিজ্ঞানের সাধন বলে এ বড়জোর পৌঁছতে পারে অন্যোন্যসান্নিধ্যে—কিন্তু তাদাত্ম্যভাবে নয়। চেতনার মধ্যে বিষয়ের অন্তর্ভাব এখনও সম্ভব, এখনও পরিতোগ্রাহী সংবিৎ দিয়ে চেতনা বিষয়কে জানে। কিন্তু এই অন্তর্ভাবনা চেতনাবহির্ভূত বিষয়ের অন্তর্ভাবনা। তাই আত্মা

তাকে আপন করে নেয় অর্জিত বা পুনরধিগত জ্ঞান দিয়ে। এইজন্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে, তাকে ধীরে-ধীরে আত্মসাৎ করে তবে চেতনার বিষয়বোধ সম্পূর্ণ হয়। এখানেও বিষয়কে অনুবিদ্ধ করবার সামর্থ্য চেতনার আছে, কিন্তু সে-অনুবেধ ব্যাপ্তিধর্মা নয় বলে তাদাত্ম্যবোধে তার পর্যবসান ঘটে না। বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট চেতনা তাই সাধ্যমত বিষয়ের তথ্য আহরণ ক'রে বিষয়ীর কাছে উপস্থাপিত করে। চেতনার সঙ্গে চেতনার মর্মাবগাহী অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ এখনও সম্ভব এবং তাতে অন্তরঙ্গাবিজ্ঞানের বিদ্যুৎশিখা কখনও হয়তো ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কিন্তু তার ব্যাপ্তি অথবা স্থায়িত্ব হয় সীমিত। চিন্ময় দৃষ্টি কি চিন্ময় অনুভবের অপরোক্ষসংবিৎ দিয়ে বিষয়ের অন্তর-বাহির দেখা বা অনুভব করা—এও এখানে অসম্ভব নয়। তাছাড়া সত্তায়-সত্তায় চেতনায়-চেতনায় আছে অন্যোন্যসংগম ও অন্যোন্যবিনিময়ের লীলা, আছে ভাবনা বেদনা ও বিচিত্র শক্তিরাজির ব্যতিষঙ্গ—যাদের অভিযান কখনও সম-বেদনা ও মিলনের দিকে, কখনও-বা বিরোধ ও সংঘর্ষের দিকে। কখনও ঐক্যের সাধনা চলে অপরকে গ্রাস করে, কখনও-বা অপর চৈতন্য বা সত্তাদ্বারা স্বেচ্ছায় গ্রস্ত হয়ে। অথবা কখনও পরস্পরের অন্তর্ভাবনা ব্যাপন ও জারণা দ্বারাই চলে একত্বসিদ্ধির প্রয়াস। এইসব ক্রিয়া এবং ক্রিয়াব্যতিহারকে বিজ্ঞাতা অপরোক্ষসন্নিকর্ষ দিয়ে জানেন এবং তাঁর এই জ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে তোলেন তাঁর সম্বন্ধের জগৎ। চেতনার সঙ্গে বিষয়ের অপরোক্ষসন্নিকর্ষ-জনিত জ্ঞানের উৎস এইখানে। কিন্তু এ-জ্ঞান অন্তরপুরুষের পক্ষেই স্বাভা-বিক। আমাদের বহিঃপ্রকৃতি তাকে ভাল করে চেনে না বলে এ তার এলাকার বাইরে থেকে যায়।

বিভজ্যবৃত্ত অবিদ্যার এই সূচনাতেও বিদ্যার বিলাস আছে। কিন্তু বিদ্যা এখানে সীমিত ও বিবিক্তদর্শী। অন্তর্গূঢ় ঐক্যের আধারে এখানে খণ্ডিতসত্তার লীলা চলছে -যার পরিণামে দেখা দিচ্ছে প্রচ্ছন্ন ঐক্যের একটা আভাস মাত্র। স্বরসবাহী পূর্ণ তাদাত্ম্যসংবিৎ এবং তজ্জন্য জ্ঞানবৃত্তি পরার্ধ-লোকের ধর্ম। আর এই অপরোক্ষসন্নিকর্ষজন্য বিজ্ঞান বিশেষ করে দেখা দেয় জড়াতীত মনশ্চেতনার সমুচ্চতম শিখরে। এসব ভূমি আমাদের প্রাকৃতচেত-নার কাছে অবিদ্যার আচ্ছাদনে আড়াল হয়ে আছে। মনের জড়াতীত ভূমির অবরভাগে এই সংবিৎ ঊনীকৃত হয়ে ফোটে—বিবিক্তভাবনার স্পষ্টতর ছাপ নিয়ে। যা-কিছু জড়োত্তর, তার মধ্যে এই অপরোক্ষসন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানের দ্যোতনা আছে কি থাকতেও পারে। আমাদের অধিচেতনার এই হল মুখ্য সাধন—বলতে গেলে তার সংবিতের মূর্ধন্যনাড়ী। কেননা, অধিচেতন- বা অন্তর-পুরুষ বলতে গেলে অবচেতনার প্রত্যন্তভূমির 'পরে ওই পরার্ধচেত-নারই একটা পুরঃক্ষেপ। অতএব তার মধ্যে সেই উত্তুঙ্গ উৎসের চেতনার

বিশিষ্ট ধারা অনুস্যূত রয়েছে এবং গোত্রসম্পর্কে তার সংগে অধিচেতনার আত্মীয়তা বেশী নিবিড়। প্রাকৃতভূমিতে আমরা অচিতির তনয়; কিন্তু অন্তরের অন্তরে আমরা পেয়েছি প্রাণ মন ও চেতনার উত্তরভূমির উত্তরাধিকার। তাই যতই অন্তরে ডুবি, অন্তরে থাকি, অন্তরের অন্তরে দল মেলি ফুলের মত, অন্তরের বিত্তে সমৃদ্ধ হই, ততই আমরা মুক্ত হই অচিতি-জননীর মূঢ় বাহুবন্ধন হতে, এগিয়ে চলি অতিচেতনার সৌরকরোজ্জ্বল পথে—আজ যার সকল আভাস আড়াল হয়ে আছে অবিদ্যার তিমিরাবরণের অন্তরালে।

সত্তা হতে সত্তার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে পূর্ণ হয় অবিদ্যার ভরা। চেতনার সংগে চেতনার অপরোক্ষসন্নিকর্ষ তখন হয় সম্পূর্ণ তিরস্কৃত অথবা স্থূল প্রলেপে আচ্ছন্ন—যদিও অধিচেতনায় তার সূক্ষ্ম স্পন্দন নিরন্তর চলতেই থাকে। তেমনি আধারে অন্তর্গূঢ় তাদাত্ম্যভাবনার পরিব্যাপ্তি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষবৃত্ত হয়ে থাকে। সত্তার বহির্ভাগে দেখা দেয় পরিপূর্ণ বিবিক্ততার বোধ—অখণ্ডচেতনা খণ্ডিত হয় আত্মা ও অনাত্মার দুটি কোটিতে। অনাত্মার সংগে কারবার করতেই হয়, অথচ তাকে জানবার কি আয়ত্ত করবার কোনও প্রত্যক্ষ উপায় থাকে না। প্রকৃতি তখন সৃষ্টি করে যোগাযোগের পরোক্ষসাধন—স্থূল ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দিয়ে, সংজ্ঞাবহা ও আজ্ঞাবহা নাড়ীর ব্যাপার দিয়ে, মনের সমন্বয়ী বৃত্তির সহায়ে স্থূল ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুগ্রহ ও আপূরণ ক'রে। কিন্তু এসমস্তই পরোক্ষজ্ঞানের সাধন; কেননা চেতনাকে এখানে অবশ হয়ে করণবৃত্তির অনুবর্তন করতে হয়—তাই বিষয়ের সংগে অপরোক্ষ যোগ তার সম্ভব হয় না। এদের সংগে দেখা দেয় যুক্তি বুদ্ধি ও বোধি। মন ও ইন্দ্রিয়ের আহৃত পরোক্ষ তথ্যরাজিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তারা অনাত্মবস্তুকে জানতে কি হাতের মুঠায় এনে আত্মসাৎ করতে যথাসাধ্য প্রয়াস করে, অথবা খণ্ডিতসত্তার ব্যবধানকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে অনাত্মবস্তুর সংগে অন্তত আংশিক ঐক্য অনুভব করতে চায়। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানের সাধনগুলি স্পষ্টত অপর্যাপ্ত এবং অনেকসময় অকেজো। তাতে আবার মনের বৃত্তি প্রকারান্তরে তাদের মূলাধার হওয়াতে সমস্ত জ্ঞানের গোড়াতেই দেখা দেয় একটা অনিশ্চয়তা। এই ন্যূনতা আমাদের জড়ভূমির স্বভাবধর্ম। অচিতি হতে প্রকাশের কুণ্ঠা নিয়ে যা-কিছু আবির্ভূত হয়, তারই মধ্যে এই গলদ দেখা দেয়।

অচিতিকে বলতে পারি অতিচেতনার প্রতীপ ছায়া। অতিচেতনার মতই সে নির্বিশেষ, তেমনি স্বতঃক্রিয়—অথচ সম্মূঢ় চেতনার এক বিরাট কুণ্ডলনে সংবৃত্ত। এ যেন সত্তার নিজের মধ্যে নিজের প্রলয়—নিজের আনন্ত্যের অতলতায় তার আত্মনিমজ্জন। স্বয়ম্ভূসত্তায় প্রভাস্বর আত্ম-

সমাধান যেন এখানে রূপান্তরিত হয়েছে অন্ধতামিস্রের মধ্যে আত্মনিগূহনে, ঋগ্বেদের বর্ণনায় যাকে বলা হয়েছে 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্'—আঁধার যেন গুণ্ঠিত হয়েছে আঁধারে। তাই অচিতিকে দেখায় যেন অসতের মত। জ্যোতির্ময় নিরূঢ় আত্মসংবিতের জায়গায় দেখা দিয়েছে আত্মবিস্মৃতির অতলগহনে চেতনার নিমজ্জন। সত্তায় চেতনা অনুস্যূত হয়েও কিন্তু তার মধ্যে জেগে নাই। অথচ এই সংবৃত্ত চেতনাতে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে নিগূঢ় এক তাদাত্ম্যবোধ। সেই বোধে নিহিত আছে অব্যক্ত আনন্ত্যের যত নিমীলিত সত্যের সংবিৎ। তাই এই অন্তর্গূঢ় সংবিৎ যখন সৃষ্টিতে সক্রিয় হয়, তখন নিরূঢ় বিজ্ঞানের ঋতম্ভরা প্রবৃত্তি নিয়ে সে নিখুঁত করে ফুটিয়ে তোলে বিশ্বের শতদল। কিন্তু চেতনা নয়, শক্তি তার কৃতির আদ্যচ্ছন্দ। নিখিল জড়পদার্থের মধ্যে নিঃশব্দে নিষন্ন রয়েছে সম্ভূতবিজ্ঞানের কুণ্ডলিনী সত্তা ও শক্তি—স্বতঃপরিণামী বোধি যার বিগ্রহ। অচক্ষু হয়ে এই বিজ্ঞান সম্যক্-দর্শী—স্বতঃস্ফূর্ত বুদ্ধিরূপে আকারিত করে চলেছে তার অচিন্তিত অব্যক্ত কল্পনারাজি। তার নিমীলিত দৃষ্টির অব্যর্থ আলোক-তীর বিদ্ধ করছে সকল রহস্যের মর্মস্থল, অসাড়তার আচ্ছাদনে ঢাকা অবরুদ্ধ সংবেদনরূপে বিশ্বময় সে ছড়িয়ে পড়ছে অপ্রমত্ত নৈশ্চিত্যের নিঃশব্দ সঞ্চারে—পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু তার ঘটাবার নিরঙ্কুশ হয়ে তা ঘটিয়ে তুলছে। অচিতির এই স্থিতি ও ক্রিয়া স্পষ্টতই বিশুদ্ধ অতিচিতির স্থিতি ও ক্রিয়ার অনুরূপ—শুধু তার মধ্যে লোকোত্তরের অনাদি স্বরূপজ্যোতি আত্ম-অবিদ্যার ঘনান্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। জড়বিগ্রহে অনুস্যূত থেকেও এইসব শক্তি স্ব-তন্ত্র হয়ে কাজ করে চলেছে বিগ্রহের নির্বাক অবচেতনার অনালোকে।

এই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি, চেতনা কি করে কুণ্ডলমোচন করে পর্বে-পর্বে তার সহস্রদল পরিণামের মধ্যে জেগে ওঠে। সাধারণভাবে এই চিন্ময় উন্মেষের কথা আগেই বলেছি। আমরা জানি, জড়-বিগ্রহের ব্যষ্টিসত্তা অন্নময়—মনোময় নয়। কিন্তু তবু তার মধ্যে আছে অধিচেতনার এক নিগূঢ় আবেশ—নিখিল অচেতনবিগ্রহের মধ্যে অদ্বিতীয় চিৎসত্তারূপে তার অন্তর্গূঢ় শক্তিরাজিকে যে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করছে। এমনও শুনেছি : জড়বস্তুমাত্রেরই পারিপার্শ্বিক বস্তুসংস্পর্শের ছাপকে সংস্কাররূপে গ্রহণ ও ধারণ করবার সামর্থ্য আছে। তাছাড়া নিজের থেকে শক্তিবিকিরণ করাও তার একটা ধর্ম। এইজন্য অলৌকিক উপায়ে যে-কোনও বস্তুর অতীত ইতিহাস আবিষ্কার করা, অথবা তার বিকীর্ণ শক্তির সম্পর্কে সচেতন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। জড়ের এই অলৌকিক ধারণাশক্তি ও শক্তিবিক্ষেপের মূলে আছে অব্যূঢ় অথচ নিরূঢ় এক মহাসংবিতের আবেশ, যা জড়বিগ্রহে পরিব্যাপ্ত থেকেও এখনও তাকে উদ্দ্যোতিত করে তুলতে

পারেনি। বাইরে থেকে আমরা দেখি, উদ্ভিদ ও ধাতুদ্রব্যের মত অচেতন পদার্থেরও বিশেষ কতকগুলি শক্তি ধর্ম বা স্বারসিক প্রভাব আছে—অথচ এদের সক্রিয় বা সঞ্চারিত করবার কোনও সাধন কি উপায় তারা জানে না। বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে এলে, অথবা কোনও প্রাণীর বুদ্ধিপূর্বক ব্যবহারেই এইসব শক্তি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এইথেকে দ্রব্যগুণকে আধার করে মানুষ একাধিক বিজ্ঞানও গড়ে তুলেছে। কিন্তু দ্রব্যগুণ তত্ত্বত পৌরুষেয়সত্তার ধর্ম—অব্যাকৃত উপাদানমাত্রের ধর্ম নয়। তারা চিৎপুরুষেরই শক্তি—সম্মূর্চ্ছিত অচিতির সুপ্তি হতে জেগে উঠেছে তাঁর তপোবীর্যের প্রবেগে। নিরূঢ় অথচ আত্মসমাহিত চিন্ময় শক্তির এই-যে মূঢ় যন্ত্রাচার, জীবজগতের প্রথম পর্বে তা ফুটে ওঠে অবমানস প্রাণনস্পন্দে—যার মধ্যে পাই সংবৃত্ত ইন্দ্রিয়সংবিতের আভাস মাত্র। আদিম জীবদেহ চায় আলো-বাতাস এবং পুষ্টি—চায় একটুখানি হাত-পা ছড়াবার জায়গা। কিন্তু তার অন্ধ আকূতি তখনও অন্তর্বৃত্ত স্থাণুবিগ্রহের কারাগারে বন্দী। নিসর্গবৃত্তিকে স্ফুটরূপ দিয়ে নিজেকে বাইরে আকার দেওয়া কি বহির্জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আদিজীবের স্থাণুভাব জীবন-লীলার বিচিত্র ছন্দে ঝঙ্কৃত হবার জন্য নয়। তাই সে বাইরের অভিঘাতকে চুপ ক'রে হজম করে। অসাড়ে হয়তো সে আঘাত করে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজেকে অন্যের 'পরে চাপাতে পারে না। এখনও তার মধ্যে অচিতিই প্রবল। অন্তর্গূঢ় সংবৃত্ত তাদাত্ম্যভাবদ্বারা আবিষ্ট হয়ে এখনও অচিতিই আধারে কাজ করে চলেছে, জ্ঞানের সচেতন সাধন দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগ ঘটাবার সামর্থ্য এখনও তার অর্জিত হয়নি। প্রগতির এই পর্বটি দেখা দেয়, প্রাণ যখন হয় ব্যক্তচেতন। তার মধ্যে দেখি, বন্দী চেতনার বাইরে আসবার জন্য আকুলি-বিকুলি। এই ব্যাকুলতাই বিবিক্ত জীবসত্তায় জাগায় বাইরের জগৎসত্তার সঙ্গে সচেতন যোগস্থাপনের একটা অনতিবর্তনীয় প্রয়াস। সে-প্রয়াস প্রথমত অন্ধ ও সঙ্কুচিত। কিন্তু বাইরের সঙ্গে ক্রমেই তার লেন-দেনের কারবার বেড়ে চলে। শুধু পারিপার্শ্বিকের নাড়া পেয়ে সাড়া দেওয়াই নয়, নিজের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে চরিতার্থ করবার জন্য ভিতরের সঞ্চিত সামর্থ্যকে বাইরে স্ফুরিত ও আরোপিতও সে করতে পারে। এমনি করে যোগাযোগের পুঁজি বাড়িয়ে জীবধর্মী জড়বিগ্রহ ক্রমে তার চেতনাকে উন্মিষিত করে অচেতনা বা অবচেতনার স্তিমিত দীপ্তি হতে সংকীর্ণ বিভক্তজ্ঞানের ধূসর আলোকে।

অতএব বিবিক্তচেতনার ক্রমিক উন্মেষের মধ্যে দেখতে পাই, স্বয়ম্ভূ অনাদি পৌরুষেয়সংবিতে অন্তর্গূঢ় চিদ্‌বীর্য কি করে চরম সিদ্ধির দিকে কলায়-কলায় ফুটে ওঠে। এইসব শক্তি গুহাহিত ও সংবৃত্ত তাদাত্ম্যবোধের

স্বরূপশক্তি—অবদমিত হয়ে ছিল আধারে। এবার তারা শীর্ণকায় নিয়ে শঙ্কিত চরণের স্তিমিত সঞ্চারে ক্রমে-ক্রমে বাইরে এল। প্রথমে দেখা দিল নিতান্ত অপুষ্ট ও আচ্ছন্ন একটা সম্মুগ্ধসংবিৎ—জীবনযোনি-প্রযত্ন ও প্রচ্ছন্নবোধির প্রেরণায় ধীরে-ধীরে রূপান্তরিত হল সে সুস্পষ্ট ইন্দ্রিয়সংবিতে। তারপর ফুটল প্রাণনধর্মী মনের প্রত্যক্ষসংবিৎ—তার পিছনে রইল আচ্ছন্ন চিৎ-দৃষ্টি ও আচ্ছন্নচিতের বিষয়ানুভব; হৃদয়ের আকম্প্র আবেগ খুঁজতে লাগল অপর হৃদয়ের স্পর্শ। অবশেষে বহিশ্চর চেতনায় ভেসে উঠল সামান্যপ্রত্যয় ভাবনা ও যুক্তি—জ্ঞানের সকল তথ্য আহরণ করে গড়ে তুলল বিষয়ের সামান্য ও বিশেষ দুটি রূপেরই পরিচয়। কিন্তু এতেও বিজ্ঞানের পূর্ণতা এল না, কেননা বিভজ্যবৃত্ত অবিদ্যা ও তিরস্করণী অচিতির আদিম কুণ্ঠা তাকে বিকল করেই রাখল। এখনও বহিরঙ্গসাধনের 'পরে সব-কিছুর নির্ভর, স্বারাজ্যের অধিকারে কেউ স্ব-তন্ত্র নয়। চেতনার 'পরে চেতনার সাক্ষাৎ প্রভাব নাই : মনোময় চেতনা বিষয়কে পেতে চায় পরিতোগ্রহণ ও অনুবোধের একটা কৃত্রিম আয়োজন দিয়ে—তাতে বিষয়কে আয়ত্তে আনা কি তার মর্মে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। অধিচেতনার হাতে রয়েছে তার একমাত্র প্রতীকার। বহিশ্চর মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অধিচেতনার কোনও নিগূঢ় শক্তির মুক্তধারা যখন নির্বারিত প্রবাহে বয়ে যায়—মনোময় বুদ্ধির উপরাগে তার স্বভাবের স্বচ্ছতাকে রঞ্জিত না ক'রে, তখনই কেবল সত্তার গভীর হতে নূতন সাধনার অস্পষ্ট সূচনা জাগে। কিন্তু অভিনবের এই সূচনাও নিয়ম নয়—নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তাই আমাদের অর্জিত ও অভ্যস্ত জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকে মনে হয় অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত একটা-কিছু। একমাত্র হৃদয়গুহার গ্রন্থিবিকিরণ অথবা তার মধ্যে অবগাহন করেই আমরা অন্তরঙ্গ অপরোক্ষসংবিতের সঞ্চয়ে বহিশ্চর পরোক্ষসংবিতের ভাণ্ডার আপূরিত করতে পারি। অন্তরাত্মার গভীর গহনে অথবা অতিচেতনার উত্তুঙ্গ শিখরে প্রবুদ্ধ চিত্তের প্রদীপ্ত শিখা যদি জ্বলে ওঠে, তবেই জীবনকে অধিকার করে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অমোঘ প্রবর্তনা—তাদাত্ম্য-বোধ যার আধার শক্তি ও স্বরূপধাতু।

একাদশ অধ্যায়

অবিদ্যার অবধি

অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী।

কঠোপনিষৎ ২।৬

যে মনে করে, শুধু এই লোকই আছে—আর কোনও লোক নাই।

—কঠোপনিষদ (২।৬)

অনন্তে অন্তঃ পরিবীতঃ।
অপাদশীর্ষা গূহমানো অন্তা।

ঋগ্বেদ ৪।১।৭, ১১

অনন্তের অন্তরে ছড়িয়ে আছে...অপাদ, অশীর্ষ—নিগূহিত ক'রে দুটি অন্ত।

—ঋগ্বেদ (৪।১।৭,১১)

য এবং বেদাহহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং ভবতি। অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যো হসাবন্যোহহমস্মীতি, ন স বেদ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৪।১০

যে জানে 'আমি ব্রহ্ম', সে হয় এই যা-কিছু সব; আর যে অন্য দেবতার উপাসনা করে আত্মাকে ছেড়ে, ভাবে 'দেবতা পৃথক আর আমিও পৃথক' কিছুই জানে না সে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।৪।১০)

সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞ...স্থূলভুক্ প্রথম পাদঃ। স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ...প্রবিবিক্তভুক্ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। সুষুপ্তস্থান একীভূত প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্যামী। অদৃষ্টম্ অলক্ষণম্... একাত্মপ্রত্যয়সারং চতুর্থম্। স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ ২—৭

এই আত্মা চতুষ্পাৎ। জাগরিতস্থান বহিঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক্ আত্মা—এই প্রথম পাদ; স্বপ্নস্থান অন্তপ্রজ্ঞ প্রবিবিক্তভুক্—এই দ্বিতীয় পাদ; সুষুপ্তস্থান একীভূত প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আনন্দভুক্—এই তৃতীয় পাদ; সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী, অদৃষ্ট অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার—এই চতুর্থ পাদ। এই তো আত্মা, এঁকেই জানতে হবে।

—মাণ্ডুক্য উপনিষদ (২-৭)

অংগুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥

কঠোপনিষৎ ৪।১২, ১৩

অংগুষ্ঠমাত্র পুরুষ, আছেন আমাদের আত্মার মধ্যখানে; ভূত-ভব্যের ঈশান তিনি...তিনিই আছেন আজ, তিনিই থাকবেন কাল।

—কঠ উপনিষদ (৪।১২,১৩)

তাদাত্ম্যবোধের অভিযাত্রী এই বিবিক্তবোধ বা অবিদ্যার একটা বিস্তৃত পরিচয় নেবার সময় হয়েছে এতক্ষণে। অবিদ্যাই আমাদের মনশ্চেতনার ধাত্রী। মনুষ্যলোকেরও অবরভূমিতে চেতনার যে-প্রকাশ, তারও মূলে আছে এই অবিদ্যার একটা ছন্নতর রূপ। সত্ত্ব ও শক্তির উত্তাল তরঙ্গমালা যেমন বাইরে থেকে আছড়ে পড়ছে, তেমনি উদ্বেল হয়ে উঠছে ভিতর থেকে। আর তার সংঘাতে ঘটছে চিত্তসত্ত্বের রূপায়ণ, জাগছে দেশ ও কালের ভূমিকায় আত্মা এবং অনাত্মার মনোময় প্রত্যয় ও মনোবাসিত ইন্দ্রিয়সংবিৎ। আমাদের মধ্যে এই হল অবিদ্যাশক্তির পরিচয়। এরই মধ্যে চলছে অপূর্ণ সংবিতের ক্রমিক উপচয়—কালপরিণামের নিত্যস্পন্দিত প্রবাহ এবং দেশসংস্থানের পরাক্-বৃত্ত আধারকে অবলম্বন ক'রে। কালের প্রবাহে জীব শুধু নিত্য-বর্তমানের অপরোক্ষসংবিৎ নিয়ে ভেসে চলেছে। অতীতের অপস্রিয়মাণ স্রোতের কবল হতে প্রত্যক্ ও পরাক্ অনুভবের খানিকটা সে বাঁচাতে পারে স্মৃতির সহায়ে। এই পুঁজি হতেই ভাবনা সংকল্প ও প্রযত্ন দ্বারা দেহ-প্রাণ-মনের বীর্যদ্বারা সে তার বর্তমানের স্থিতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রচে। আধারে আবিষ্ট যে-সন্ধিনী-শক্তি মানুষের বর্তমানকে গড়ে তুলেছে, তার প্রেতির ইশারা রয়েছে আমাদের অনাগত সম্ভূতির উপচীয়মান বিপুল দিগন্তের দিকে। আত্মপ্রকাশের নানা উপকরণ ও বিষয়ানুভবের বিচিত্র সঞ্চয়, ক্ষণভঙ্গের মেলা হতে কুড়িয়ে-নেওয়া খণ্ডজ্ঞানের পুঁজি—শিথিল মুষ্টিতে মানুষ এদের আঁকড়ে আছে। তার ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান স্মৃতি বুদ্ধি ও সংকল্প এই বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়কে গেঁথে তুলছে নিত্যনূতন অথবা নিত্য-আবর্তিত সম্ভূতির আয়োজনে। বুদ্ধিকৃত এই সমাহারকে আশ্রয় করেই দেহ-প্রাণ-মনের শক্তি সচল হয়ে তার সাধ্যকে সম্ভাবিত এবং সিদ্ধিকে প্রকট করে। চেতনার যত অনুভব ও শক্তির যত বিক্ষেপ, আধারে তাদের পুঞ্জভাবের সমাহার ও সমন্বয় ঘটে জীবসত্ত্বকে লক্ষ্য করেই। অহংবোধের একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে তারা দানা বেঁধে ওঠে—কেননা এই অহন্তাই প্রকৃতির সংস্পর্শে পুরুষের প্রত্যক্-অনুভবকে উদ্রিক্ত ক'রে তাকে সংকীর্ণ চিত্তক্ষেত্রের একটা বাঁধাধরা অভ্যাসে পরিণত করে। অহন্তা না থাকলে আমাদের সমস্ত অনুভব হত যেন স্রোতে-ভেসে-যাওয়া তৃণখণ্ড বা শৈবালের দল। তাদের অসম্বদ্ধতার মধ্যে অহন্তাই প্রথম ছন্দ ও সঙ্গতি এনেছে। এই অহংবোধ থেকে মনশ্চেতনার মধ্যে বুদ্ধির ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে আরেকটি কৃত্রিম বিন্দুচেতনা, যাকে বলতে পারি অহংজ্ঞান বা আত্মভাব। সম্মুগ্ধ অনুভব অহংবোধকে আশ্রয় করে দানা বাঁধবার পর এই অহংভাবে সমর্পিত হয়। প্রাণচেতনার ভূমিতে অহংবোধ আর মনশ্চেতনার ভূমিতে অহংজ্ঞান—এই দুটিতে মিলে আত্মার একটা কৃত্রিম প্রতীক খাড়া রাখে, যাকে আমরা বিবিক্ত আত্মভাব

বলে জানি। এই বিবিক্ত অহংকার গুহাহিত চিৎসত্তার বা যথার্থ আত্মভাবের প্রতিভূ। বহিশ্চর মনের ব্যষ্টিভাবনা অহরহ অহংকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এমন-কি তার বিশ্বহিতৈষণাও স্ফীতকায় অহমিকার একটা রূপ। অহংএর এই কীলককে আশ্রয় করেই প্রকৃতির চাকা ঘুরছে আমাদের মধ্যে। এমনিতর আত্মকেন্দ্রিকতার বিধান ততদিন কায়েম থাকে, যতদিন না তার প্রয়োজন নিঃশেষিত হয় চিন্ময় আত্মপুরুষের আবির্ভাবে—যিনি যুগপৎ চেতনার চক্র গতি ও কীলক, একাধারে নাভি ও পরিধি।

কিন্তু আত্মানুসন্ধানের ফলে দেখতে পাই, প্রত্যক্-অনুভবের যে সমাহার ও সমন্বয়কে আমরা ব্যাবহারিক জীবনের ভিত্তি করেছি, তার মধ্যে আমাদের জাগ্রতচেতনারও সবটুকুকে পোরা যায় না। বর্তমানের চলন্ত প্রবাহে বিষয় এবং বিষয়ীর যে মনোময় সংবিৎ ও অনুভব আমাদের বহিশ্চর-চেতনায় অহরহ ভেসে উঠছে, তার কতটুকুই-বা আমরা খেয়ালে আনি? তারও অতি সামান্য অংশ অতীতের সর্বনাশা গহ্বর হতে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। সেই স্মৃতির সঞ্চয়ের সামান্য ভাগ বাঁধা পড়ে বুদ্ধির সমন্বয়সূত্রে, আবার তারও অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নিয়ে চলে সংকল্পশক্তির কর্মসাধনা। জড়বিশ্বে যেমন, তেমনি আমাদের প্রাকৃতচেতনার দৈনন্দিন লীলাতেও দেখি, প্রকৃতির গৃহ-স্থালিতে যেন কোনও বাঁধুনি নাই। অনেকখানি ছেঁটে ফেলে কি হাতে রেখে কাজ চালাতে সামান্য-কিছু বেছে নেওয়া, কঞ্জুস-উড়নচণ্ডীর মত একদিকে হাত গুটিয়ে রেখে আরেকদিকে খুলে দেওয়া অপচয়ের সদাব্রত, যে ব্যয় কি সঞ্চয়টুকু নিরর্থক নয় তারও শীর্ণ পরিমাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুধু—মনে হয় এই যেন প্রকৃতির রীত। কিন্তু বাইরে এমনটা দেখালেও ভিতরের কথাটা কিন্তু অন্যরকম। প্রকৃতি যা যত্ন ক'রে সঞ্চয় করে না কি কাজে লাগায় না, তা যে মিছামিছি খোয়া যায় বা নষ্ট হয়—তা নয়। তার বেশির ভাগ সে গোপনে-গোপনে আমাদের আধারকে গড়ে তুলতে ব্যবহার করে। আমাদের পুষ্টি সম্ভূতি ও কর্মশক্তির অনেকখানি জোগান আসে তার ওই গোপন-ভাণ্ডার হতে। আমাদের সচেতন বুদ্ধি সঙ্কল্প বা স্মৃতিকে তার জন্য বাহবা দেওয়া যায় না। তার চাইতে অনেক বেশী পুঁজি থেকে তার নতুন গড়নের উপকরণ হিসাবে। আমরা হয়তো তার ইতিকথা বেমালুম ভুলে গেছি—পুরাতনের সঞ্চয়কেই ব্যবহার করছি অভিনবের সৃষ্টি ভেবে। অথচ যে-উপকরণকে ভাবছি আমাদের নতুন সৃষ্টি, আসলে তা অতীতের অলক্ষ্য পরিণামের সমাহার মাত্র—তার কথা আমরা ভুললেও প্রকৃতি কিন্তু ভোলেনি। চেতনার অভিব্যক্তিতে জন্মান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার করলে বুঝি, আমাদের কোনও অনুভবই অকেজো নয়। দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতির যন্ত্রশালায় চলছে আমাদের গড়ে তোলবার সাধনা। তার মধ্যে অনুভবের কোনও উপাদানকে

বর্জন করা চলে না—যদি কখনও সমস্ত প্রয়োজন চুকে গিয়ে ভবিষ্যতের ঘাড়ে একটা বোঝা হয়ে সে না দাঁড়ায়। চেতনার যেটুকু উপরে জেগে আছে, তাথেকে একটা-কিছু সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে। কেননা একটু ভেবে দেখলেই বুঝি, প্রকৃতিপরিণামের অতি সামান্য অংশই আমাদের চেতনায় ভাসে। তার বেশির ভাগ কাজ-কর্ম চলছে অবচেতনার আড়ালে—যেমনটি দেখছি তার জড়ের লীলায়। নিজেকে যা বলে জানি শুধু তা-ই নয়, তার চাইতে আমরা ঢের বড়। সত্যি বলতে আমাদের ক্ষণিক সত্ত্ব আমাদের বিপুল সত্তার সমুদ্রে একটা রঙিন বুদ্বুদ মাত্র।

এমন-কি জাগ্রৎচেতনার একটা উপরভাসা পরিচয় নিতে গিয়েও দেখি, নিজের ব্যষ্টিসত্তা ও ব্যষ্টিপরিণামেরও অনেকখানি আমাদের সম্পূর্ণ অগোচর। গাছ-পালা মাটি-পাথর যেমন অচিতির শামিল, এও যেন ঠিক তা-ই। কিন্তু মনস্তত্ত্বের পরীক্ষা ও সমীক্ষাকে যদি প্রাকৃতচেতনারও ওপারে প্রসারিত করতে পারি, তাহলে বিজ্ঞানের উপচীয়মান আলোকে দেখি, আমাদের সমগ্র সত্তার কী বিশাল প্রদেশ জুড়ে আছে এই তথাকথিত অচিতি বা অবচেতনা (বস্তুত তাকে গূঢ়চেতনা বলাই উচিত ছিল); আর আমাদের জাগ্রতের সংবিৎ জুড়েছে আধারের কতটুকু ঠাঁই! তখন বুঝি, জাগ্রৎ মন ও অহন্তা এক অন্তর্গূঢ় বিশাল অধিচেতন আত্মভাবের 'পরে ক্ষণিকের একটা আরোপ মাত্র। অথবা সে-গূঢ়োত্মার আরও সঠিক সংজ্ঞা হবে 'অন্তরপুরুষ'—যাঁর অনুভবের সামর্থ্য জাগ্রতের সামর্থ্যকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের মন ও অহন্তা যেন অস্তিত্বের কল্লোলিত সমুদ্রের বুকে জেগে আছে পর্বতশিখরের মত—পর্বতের বিশাল অবয়ব নিমজ্জিত রয়েছে সমুদ্রের অতলগহনে।

এই গূঢ়োত্মা ও গূঢ়চেতনাই আমাদের সত্য ও সমগ্র জীবসত্ত্ব; বহিঃসত্ত্ব তার একটা অংশ ও প্রতিভাস অথবা বাইরের প্রয়োজনে বাছাইকরা খণ্ডরূপ মাত্র। বহির্জগতের বিরামহীন অভিঘাতের কতটুকুই-বা আমরা জানি। কিন্তু যা-কিছু আমাদের আধারকে বা জগৎকে স্পর্শ করে, অন্তরপুরুষ সবার খবর রাখেন। অন্তর্জীবনেরও নিত্যপরিণামের সামান্য পরিচয়ই পাই; কিন্তু অন্তরপুরুষ তার সকল কথা এত খুঁটিয়ে জানেন যে, মনে হয় কিছুই বুঝি তাঁর চোখ এড়ায় না। প্রত্যক্ষের কতটুকুই-বা জমিয়ে রাখি স্মৃতির ভাণ্ডারে? যা জমাই, তাও সময়মত হাতের কাছে পাই না। কিন্তু অন্তরপুরুষ কিছুই ফেলেন না, হাতের কাছে সব তিনি গুছিয়ে রাখেন। প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির যে-ব্যঞ্জনা বা যে-যোগাযোগ আমাদের মার্জিত মন-বুদ্ধির বোধগম্য, আমরা শুধু তাদের নিয়ে জ্ঞানের সূত্রে সমন্বয়ের জাল বুনতে পারি। কিন্তু অন্তরপুরুষের বুদ্ধিকে মার্জিত করে তোলবার দরকার হয় না। কেননা, আমরা বিশ্বাস করতে কি পুরাপুরি মানতে না চাইলেও একথা সত্য যে, তাঁর বুদ্ধি

প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির সকল তথ্য ও যোগাযোগের সূত্র অনায়াসে গুছিয়ে রাখতে পারে। তাদের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা তার অধিগত যদি নাও থাকে, তবু তাকে আয়ত্ত করতে তার একমুহূর্ত বিলম্ব হয় না। তাছাড়া, জাগ্রৎমনের মত শুধু বাহ্যেন্দ্রিয়ের উঞ্ছই তার প্রত্যক্ষের সম্বল নয়। সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের সাধনকে অবলম্বন করে তার প্রত্যক্ষের অধিকার অকল্পনীয় সুদূরতায় প্রসারিত হয়—যার প্রমাণ পাই প্রাতিভজ্ঞানের নানা নিদর্শনে। বহিশ্চর সংকল্প বা প্রবৃত্তির সঙ্গে অধিচেতন প্রেতির কি সম্পর্ক, আজও আমরা তা তলিয়ে বুঝিনি। এখনও অধিচেতনাকে ভুল করে অচেতনা বা অবচেতনা বলি, নাড়াচাড়া করি তার কতকগুলি অপরিচিত ও অপরিণত বিভূতি নিয়ে অথবা রুগ্ণ মনুষ্য-চিত্তের কতগুলি অনৈসর্গিক বিকার নিয়। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে গভীরে ডুবলে দেখি, আমাদের সমগ্র চিত্তপরিণামের পিছনে আছে অন্তরপুরুষের অবাধিত প্রত্যয় ও নির্বারিত সংকল্প বা প্রেতির সংবেগ। তাঁর নিগূঢ় সাধনা ও সিদ্ধির যে-অংশ সকল বাধা কাটিয়ে প্রাকৃতজীবনে ভেসে ওঠে, আমরা শুধু তাকেই দেখি চিত্তপরিণামের সুপরিচিত আকারে। অতএব যথার্থ আত্মজ্ঞানের প্রথম সোপান হল আমাদের এই গূঢ়াত্মা অন্তরপুরুষটিকে চিনে নেওয়া।

নিজেকে ভাল করে জানতে গিয়ে এই অধিচেতন আত্মার জ্ঞানকে যদি অবচেতনার কুমেরু হতে অতিচেতনার সুমেরু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করি, তাহলে দেখি আসলে এই অধিচেতনাই আমাদের ব্যাবহারিকসত্তার সকল উপাদান জোগায়। আমাদের প্রত্যক্ষ সংকল্প স্মৃতি বুদ্ধি সমস্তই তার প্রত্যক্ষ স্মৃতি সংকল্প ও বুদ্ধির ব্যাপারের একটা সংকলন মাত্র—এমন-কি আমাদের অহন্তা তার আত্মচেতনা ও প্রত্যক্-অনুভবের একটা ক্ষুদ্র বহিশ্চর প্রতিরূপ। অধিচেতনা যেন উত্তাল সমুদ্র, আর তার বুকে উদ্বেল হয়ে উঠছে আমাদের এই চিত্তপরিণামের তরঙ্গদোলা।...কিন্তু কোথায় এই অধিচেতনার সীমা, কতদূর তার ব্যাপ্তি? কি তার স্বরূপ? সাধারণত যা-কিছু আমাদের জাগ্রতে ভাসে না, তাকেই আমরা তথাকথিত অবচেতনার কোঠায় ফেলি। কিন্তু অধিচেতনার সবখানি না হ'ক, অনেকখানিকেই ওই নামে ডাকা চলে না। কারণ, অবচেতনা বলতে আমরা বুঝি একটা আচ্ছন্ন অস্পষ্ট অচেতনা বা অর্ধ-চেতনা। কিংবা কল্পনা করি জাগ্রৎচেতনার তলায় একটা মগ্নচৈতন্যের রাজ্য, যা জাগ্রতের মত গোছানো নয় বলেই তার চাইতে অপকৃষ্ট—অন্তত স্বাতন্ত্র্যের অভাবই তার অপকর্ষের হেতু। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে চেতনার গহনে ডুবলে দেখি, অধিচেতনার মধ্যে যদিও পাতালপুরীর অভাব নাই, তবু তার কোনও-এক দেশকে অধিকার করে জ্বলছে চৈতন্যের এক বিশাল জ্যোতি—বহিশ্চেতনার চাইতেও অবারিত তার প্রতিষ্ঠা ও ঈশনা, আমাদের দৈনন্দিন কর্মের সে অনিমেষ সাক্ষী। এই আমাদের গুহাহিত অন্তরপুরুষ—এঁকেই জানি

অধিচেতন আত্মা বলে। অবচেতনা হতে তিনি বিবিক্ত, কেননা অবচেতনা আমাদের আত্মপ্রকৃতির জঘন্যতম গুহাভূমি। তেমনি, আমাদের সমগ্রসত্তার একদেশ উদ্দ্যোতিত করে জেগে আছে অতিচেতনার উত্তরজ্যোতি, যার মধ্যে পাই 'পরতঃ পরঃ' আত্মার সাক্ষাৎকার। এই অতিচেতনভূমিকেও স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা দিতে হবে, কেননা এ আমাদের আত্মপ্রকৃতির গুহ্যতর মূর্ধন্যলোক।

কিন্তু তাহলে অবচেতনার স্বরূপ কি? কোথায় তার শুরু? জাগ্রতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? মনে হয়, সে যেন অধিচেতনারই একটা অংশ; তাহলে তার সঙ্গেই-বা তার কি সম্পর্ক?...আমাদের দেহচেতনা আছে, আছে দেহাত্মবোধ; অথচ দেহের অধিকাংশ ক্রিয়া আমাদের মনের কাছে বস্তুত অচেতন। শুধু মনই যে তাদের খবর রাখে না, তা নয়; আমাদের অতিস্থূল দৈহ্যসত্তাও তো জানে না তার অন্তঃপুরে কি ঘটছে—এমন-কি তার নিজের সত্তা সম্পর্কেও সে সচেতন নয়। তার যে-অংশটুকু অন্তঃকরণের আলোকে আলোকিত এবং বুদ্ধির দ্বারা অবেক্ষিত, তাকেই সে জানে অথবা বলতে গেলে সে-সম্পর্কে একটা সংবেদন মাত্র জাগে তার মধ্যে। উদ্ভিদ বা ইতরপ্রাণীর মত আমাদের এই শরীরের কাঠামোটা জুড়ে প্রাণের লীলা চলছে, অথচ তার অধিকাংশ আমাদের কাছে অবচেতন—কেননা তার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার অতি সামান্যই আমাদের নজরে আসে। প্রাণবৃত্তির সব না হ'ক, বেশির ভাগ রয়েছে যবনিকার অন্তরালে; শুধু তার অনৈসর্গিক প্রকাশের সংবিৎটাই আমাদের চেতনায় তীক্ষ্ণ হয়ে বাজে। তাই প্রাণের তর্পণের চাইতে তার বুভুক্ষা, স্বাস্থ্যের ছন্দের চাইতে ব্যাধির বিকার, জীবনের স্বচ্ছন্দ লীলায়নের চাইতে মৃত্যুর রূঢ় আকস্মিকতা মনে হয় তীব্রতর। প্রয়োজনের তাগিদে সচেতন দৃষ্টির কাছে প্রাণলীলার যতটুকু ধরা পড়ে, অথবা সুখ-দুঃখের উত্তালতায় যতটুকু তার বেদনার তন্ত্রীতে প্রহত হয়, তার যে-সংবিৎ নাড়ীতন্ত্রে কি দেহযন্ত্রে ক্ষুব্ধ আলোড়ন জাগায়—আমরা শুধু তারই খবর জানি। তাই মনে হয়, আমাদের দৈহ্যপ্রাণও বুঝি নিজের বৃত্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। হয় সে উদ্ভিদের মত সংজ্ঞাহীন বা অন্তঃসংজ্ঞ, নয়তো আদিজীবের মত তার মধ্যে জেগেছে শুধু চেতনার অঙ্কুর। অতএব যতটুকু তার অন্তঃকরণের দ্বারা আলোকিত এবং বুদ্ধির দ্বারা অবেক্ষিত, ততটুকু সম্পর্কেই তার সচেতনতা।

কিন্তু সাধারণত মনের বৃত্তি বা সংবিতের সঙ্গে চেতনাকে আমরা ঘুলিয়ে ফেলি। তাই এ-সিদ্ধান্ত অতিরঞ্জন এবং প্রমাদদোষে দুষ্ট। দেহ ও প্রাণের কতকগুলি বৃত্তির সঙ্গে মন খানিকটা জড়িয়ে যায় বলে তাদের মনে হয় মনোবৃত্তির শামিল; তাইতে সমগ্র চেতনাকেই মনোময় ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে মনকে সাক্ষীর আসনে বসালে দেখি, প্রাণ এবং দেহ—এমন-কি প্রাণের স্থূলতম দৈহ্যপ্রকাশ পর্যন্ত—নিতান্তই আত্মসচেতন। দেহ

ও প্রাণবৃত্তির অন্তরালে আছে এক আচ্ছন্ন অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা, যার চেতনা কতকটা হয়তো আদিতম জীবের সম্মুগ্ধসংবিতের মত। মানুষের মন সেই সংবিতে উপরক্ত হয়ে তাকে খানিকটা মনোময় করে তুলেছে—এইমাত্র তফাত। অথচ সে-চেতনার একটা স্বাধীন চলন আছে, তাকে কোনমতেই আমাদের মত মনোধর্মী বলা যায় না। তারও মন আছে বললে বুঝতে হবে, সে-মন দেহে এবং দৈহ্যপ্রাণে সংবৃত্ত ও গুহাহিত। আত্ম-চেতনা সেখানে ব্যাহিত নয়—তাই তার মধ্যে আছে শুধু বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাণের স্পন্দন, আকূতির আলোড়ন, অভাবের তাড়না, বুভুক্ষা, সুখ-দুঃখ-মোহ, নানা নিসর্গবৃত্তি ও প্রকৃতিশাসিত প্রযত্নের একটা আকারপ্রকারহীন বোধ মাত্র। এ-বোধ মনশ্চেতনার চাইতে অপকৃষ্ট হলেও তার অস্পষ্ট সংকীর্ণ অথচ স্বতঃস্ফূর্ত একটা সংবিৎ আছে। আমরা যাকে মনের বিশিষ্ট লক্ষণ মনে করি, পুরাপুরি সেই স্বাতন্ত্র্য তার নাই বলে তাকে অবমানস নাম দিতে পারি বটে—কিন্তু আমাদের অবচেতনার নিদ্‌মহলের বাসিন্দা তাকে বলতে পারি না। কারণ মনকে এই বোধ হতে বিবিক্ত রেখে পিছনে সরে দাঁড়ালে দেখি, এও নাড়ীতন্ত্রবাহিত সম্মুগ্ধপ্রত্যয়ময় স্বতঃস্ফূর্ত একটা চেতনার বৃত্তি। মানসসংবিৎ হতে তার সংবিতের ধরন আলাদা। কেননা বিষয়সন্নিকর্ষে সাড়া দেবার একটা নিজস্ব ধারা, বিশিষ্ট একটা বেদনাবোধের সামর্থ্য তারও আছে—যার জন্যে মানস-সংবিতের মুখাপেক্ষী তাকে হতে হয় না। সত্যকার অবচেতনা কিন্তু এই অন্ন-প্রাণময় আধার হতে আলাদা একটা-কিছু। তাকে বলতে পারি চেতনার উপকূলে অচিতির পরিস্পন্দ। আপন সংবেগকে চিত্তসত্ত্বে রূপান্তরিত করবার জন্য যেমন সে তাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি অতীত অনুভবের সংস্কার-সমূহকে আকর্ষণ করে তার গভীর-গহনে। সেইখানে তারা সঞ্চিত হয় অচেতন অভ্যাসের বীজরূপে—বহিশ্চেতনায় প্রতিনিয়ত ঘটে তাদের বিক্ষিপ্ত ব্যুত্থান। অবচেতনায় সঞ্চিত এই আশয়গুলি তার প্ররোচনায় অনর্থের বাহন হয়ে যেন কোন্ অজানা উৎস হতে উৎসারিত হয় আমাদের স্বপ্নে বাতিকে কি মুদ্রাদোষে, বাসনার অতর্কিত সংবেগে, দেহ-প্রাণ-মনের নানা জটিল বিক্ষোভে ও বিপর্যাসে, আত্মপ্রকৃতির অন্ধতম আকূতির স্বতঃস্ফূর্ত নিঃশব্দ তাড়নায়।

কিন্তু অধিচেতনার মধ্যে অবচেতনার এই মূঢ়তা নাই। মন ও প্রাণশক্তির 'পরে তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, রয়েছে বিষয়ের ভূতসূক্ষ্মময় সুস্পষ্ট চেতনা। জাগ্রতের মতই তার সকল সামর্থ্য : সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, সর্বগ্রাসী স্মৃতির বিপুল পরিসর, বুদ্ধি সঙ্কল্প ও আত্মচেতনার অতিতীব্র বিবেচনশক্তি—সবই তার মধ্যে আরও পুষ্ট ব্যাপক ও জোরালো হয়ে আছে। তাছাড়া তার এমন সামর্থ্যও আছে যা মনের সামর্থ্যকে বহুদূর

ছাড়িয়ে গেছে। প্রত্যক্-বৃত্তিতে হ'ক বা পরাক্-বৃত্তিতেই হ'ক, সত্তার অপরোক্ষসংবিৎ আছে বলেই অধিচেতনার জ্ঞান ক্ষিপ্র, সংকল্পের সিদ্ধি অব্য-বহিত, বুদ্ধি মর্মাবগাহী, আকূতির তর্পণও সুগভীর। আমাদের বহির্মনকে কোনমতেই বিশুদ্ধমনোধর্মী বলা যায় না, কেননা তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে পঙ্গু করে রেখেছে দেহ ও দৈহ্যজীবনের সঙ্কোচ, নাড়ীতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির আড়ষ্টতা। সত্য বলতে অধিচেতন আত্মাই যথার্থ মনোধর্মী—কারণ এইসব সঙ্কোচের বাঁধন কাটিয়ে মনের স্বচ্ছ প্রকাশ তারই মধ্যে ঘটেছে। স্থূল মন ও ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ এবং বৃত্তি সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাদের সে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, ওইসব বৃত্তি বহুলপরিমাণে তারই সৃষ্ট বা প্রবর্তিত। তাকে অবচেতন বলতে পারি এই অর্থে যে, বহিশ্চেতনায় আপনাকে পুরা-পুরি প্রকট না ক'রে যবনিকার আড়ালে থেকে সে কাজ করে যায়। কিন্তু তাহ'লে তাকে অবচেতন না বলে বরং বলা উচিত অন্তশ্চেতন ও পরিচেতন—কেননা একাধারে বহিশ্চেতনার অন্তর্যামী ও পরিমন্ডল দুইই হল এই অধি-চেতনা। অধিচেতনার এই পরিচয় অবশ্য তার অন্দরমহলের পরিচয়। নইলে বহিশ্চেতনার খুব কাছাকাছি তার যে-সদরমহল, তার মধ্যে খানিকটা অবিদ্যার অরাজকতা আছে। এইজন্য অন্তররাজ্যে ঢুকে এই সন্ধিচেতনার আলো-আঁধারির মধ্যে যারা থমকে দাঁড়ায়, দুদিকের টানে অনেকসময় তারা বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবু এ-অবিদ্যা অবচেতনার অবিদ্যা নয়—বরং বলতে পারি এই অন্তরিক্ষলোকের ধূমল মায়া যেন অচিতির সগোত্র।

আমাদের সত্তার দেখছি তিনটি উপাদান : একটি অবমানস ও অবচেতনা —আমরা যাকে মনে করি অচেতনা; দেহ-প্রাণের অনেকখানি দখল করে সে জীবনের অন্নময় বনিয়াদ গড়েছে। তার পরে আছে অধিচেতনা, যা অন্তর্মন অন্তঃপ্রাণ ও ভূতসূক্ষ্মের অখন্ড সমবায়ে গড়েছে আমাদের অন্তশ্চেতনা; জীবচেতনা বা চৈত্যসত্তা তার ভর্তা। আর সবার উপরে আছে এই জাগ্রৎ-চেতনা, যা অবচেতনা ও অধিচেতনার নিগূঢ় প্রেতির একটা উদ্বেল উচ্ছ্বাস। কিন্তু এতেও আমাদের আধারের পরিচয় সম্পূর্ণ হল না। কেননা, প্রাকৃতচেতনার অন্তরালে শুধু-যে অন্তশ্চেতনাই গুহাহিত হয়ে আছে তা নয়—এক লোকোত্তর পরা সংবিৎ তাকে আবৃত করে রয়েছে আপন পক্ষপুটে। এই পরা সংবিৎও আমাদের স্বরূপ; বহিশ্চর মনোময় জীবসত্ত্ব হতে বিবিক্ত হলেও শুদ্ধ আত্মা হতে সে বিবিক্ত নয়। ওই অনুত্তরভূমি পর্যন্ত আমাদের চিদাকাশের ব্যাপ্তি। অবশ্য অধিচেতনাই আমাদের অন্তরপুরুষ। বিদ্যা-অবিদ্যার সঙ্গমতীর্থে সে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ময় সামর্থ্যের বিপুলতায় ভাস্বর হয়ে, জাগ্রৎচেতনার কুণ্ঠিত কল্পলোককে অতিক্রম ক'রে। কিন্তু তবু তাকে আমাদের সমগ্র সত্তার মহেশ্বর অথবা তার পরাৎপর রহস্য বলতে পারি না। জাগ্রৎচেতনা

অবচেতনা ও অধিচেতনার তিনটি ভূমি ছাড়িয়েও অন্তরাবৃত্ত অনুভবের বিদ্যুৎদীপ্তিতে কখনও জাগে এক সর্বাতিশায়ী পরা সংবিতের দিব্য মহিমা—যাকে মানুষ অভিহিত করে পরমাত্মা ঈশ্বর ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমের অস্পষ্ট সংজ্ঞায়। ওই অনুত্তরধাম হতে এই চেতনায় নেমে আসে অপ্রতর্ক্য আবেশের বৈদ্যুতী—পরব্যোমে অধিষ্ঠিত ওই পরা সংবিতের দিকেই আমাদের পরম-চেতনার নিত্য অভিযান। অতএব আমাদের সত্তার সমগ্র পরিমণ্ডলকে বেষ্টন করে আছে অতিচিতি ও অচিতির এক বিরাট বৃত্তচাপ, আমাদের অধিচেতনা ও জাগ্রৎচেতনা যার কুক্ষিগত। তার স্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে আমাদের প্রাকৃত চেতনার কাছে অপ্রতর্ক্য অগম্য ও অজ্ঞাত।

কিন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এই অধিদৈবত পরমপুরুষের স্বরূপ আমরা জানতে পারি। ইনিই আমাদের 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' অন্তরতম ব্যাপ্ততম পরাৎপর আত্মচেতনা। অনুত্তরের তুঙ্গশৃঙ্গে অথবা আমাদেরও চেতনায় প্রতি-ফলিত সচ্চিদানন্দ তিনি—অন্তহীন মনোবাণীর অতীত ঋতচিন্ময় তাঁর দিব্য কবিক্রতুর বীর্যে সৃষ্টি করেছেন এই ভূতগ্রাম ও জীবলোক। তিনিই পর-মার্থসৎ, নিখিলের স্রষ্টা ও ধাতা। বিশ্বাত্মরূপে তিনিই দেহ-প্রাণ-মনের কঞ্চুকে নিজেকে আবৃত করে অন্তর্গূঢ় হয়ে নেমে এসেছেন তথাকথিত অচিতিতে, অন্তর্যামী হয়ে নিয়মিত করছেন তার অবচেতনস্থিতিকে তাঁরই অতিমানস বিজ্ঞান ও সংকল্পের প্রশাসনে। আবার অচিতি হতে সমুত্থিত হয়ে অন্তশ্চেতনার অধিপতিরূপে ওই প্রজ্ঞা ও সংকল্পের ঋতময় বিধানে নিয়ন্ত্রিত করছেন তার অধিচেতনস্থিতিকে। পরিশেষে অধিচেতনা হতে তিনিই প্রতিক্ষিপ্ত করেছেন আমাদের এই বহিশ্চেতনাকে এবং তাতে অনু-প্রবিষ্ট হয়ে অনুত্তর জ্যোতির ঈশনায় তন্ত্রিত করছেন তার উদ্ঘাতিনী গতির অনিশ্চয়তাকে। অধিচেতনা ও অবচেতনাকে যদি বলি 'সমুদ্রোঽর্ণবঃ' যা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মনশ্চেতনার ফেনিল তরঙ্গদোলায়, তাহলে অতি-চেতনাকে বলব সেই সমুদ্রেরই আধার পরিগন্তা অধিবাস নিমিত্ত ও নিয়ন্তৃ-রূপে এক মহাকাশের অসীম বিস্তার। এই উত্তর-আকাশে আমরা পাই চিন্ময় আত্মস্বরূপের স্বরসবাহী নিরূঢ় অনুভব—যা নিরুদ্ধচিত্তের 'পরে প্রশান্তবাহিতার প্রতিবিম্বন অথবা গুহাহিত পুরুষের তত্ত্বাধিগমদ্বারা সাধন-লভ্য কোনও প্রত্যয় নয়। এই অতিচেতনার আকাশ সন্তরণ করেই আমরা উত্তীর্ণ হই পরমপদে ও চরমবিজ্ঞানে—অনুভবের লোকোত্তর কোটিতে। যে-অতিচেতনভূমিকে অবলম্বন করে অনুত্তর আত্মস্বরূপের পরমস্থিতিতে আমরা পৌঁছই, তার সম্পর্কে আমাদের অবিদ্যা প্রগাঢ়তম—অথচ অচিতির তমঃসম্পুটকে বিদীর্ণ করে এরই দিকে চলেছে নচিকেতার অভীপ্সার অভিযান। বহিশ্চেতনার প্রতি আমাদের এই-যে দুরাগ্রহ, লোকোত্তর ও

গুহাহিত আত্মস্বরূপের প্রতি এই-যে অন্ধতা, একেই বলি আমাদের মূল অবিদ্যার প্রথম আবরণ।

মানুষের বহিশ্চর জীবন কালের পরিণামস্রোতে ভেসে চলেছে। যে পরাক্-বৃত্ত মনকে আমাদের স্বরূপ বলে জানি, এই পরিণামপ্রবাহের অনাদি অতীতকেও যেমন সে জানে না, তেমনি জানে না তার অকূল ভবিষ্যকেও। শুধু বর্তমানের সংকীর্ণ পরিসরটুকু—তারও সবখানি নয়—তার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা আছে। এ-জীবনেরও কত স্মৃতি তার হারিয়ে গেছে, কত রহস্য তার ঢাকা রয়েছে যবনিকার অন্তরালে। আমরা নির্বিচারে বিশ্বাস করি : দেহজন্মের দুয়ার দিয়ে এই প্রথম আমরা জগতে এসেছি, আবার দেহ-বিনাশের আরেক দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে যাব এখানকার দুদিনের খেলা সাঙ্গ করে—অস্তিত্বের এই ক্ষণিকাবিলাসেই আমাদের সত্তার পরিচয়। অথচ এ-বিশ্বাসের মূলে আছে লোকায়তিকের মত এই মনোভাব : এছাড়া কিছুই তো দেখিনি শুনিনি কি মনে করে রাখিনি আমরা! অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত প্রবল যুক্তি বটে, কিন্তু বিচারশীল চিত্তের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা সন্দেহ। হতে পারে, আমাদের জড়াশ্রিত প্রাণ মন ও অন্নময় কোশের এ-ই তত্ত্ব—কেননা স্থূলদেহের জন্মকে আশ্রয় করে যেমন তাদের পত্তন, তেমনি স্থূলদেহের মৃত্যুতেই তাদের প্রলয়। কিন্তু এ তো জীবের কালকৃতপরিণামের যথার্থ পরিচয় নয়। অতিচেতনাই আমাদের বৈশ্বানর আত্মার স্বরূপ। সেই অতি-চেতন আত্মাই অধিচেতন হয়ে অচিতির গহন হতে এই বহিশ্চেতন পুরুষকে জন্ম-মৃত্যুর সীমাঙ্কিত অশাশ্বত চৈতন্যলীলার নায়করূপে উৎসারিত করে। অথচ অচেতন প্রকৃতির উপাদানে গড়া এই মর্ত্য বিগ্রহ আত্মারই অনন্ত রূপায়ণের একটি সাময়িক ভঙ্গি মাত্র। আমাদের আত্মস্বরূপ অজর অমর। নটের একটি ভূমিকার অভিনয়ে যেমন নটলীলার অবসান হয় না, অথবা কবির আত্মরূপায়ণ যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় না একটিমাত্র কবিতাতে, তেমনি একটি দেহের মরণেই আত্মারও মরণ হয় না। মর্ত্যবিগ্রহ বস্তুত আত্মার একটিমাত্র ভূমিকা, অথবা তাঁর অন্তহীন সিসৃক্ষার একটিমাত্র কাব্যরূপ। পৃথিবীতে বিভিন্ন মনুষ্যদেহে একই জীবাত্মা বা চৈত্যসত্তার জন্মান্তরকে আমরা সত্য বলে মানি আর না-ই মানি, আমাদের আত্মসত্তার কালকৃতপরিণাম যে সুদূর অতীতের গহন হতে অনাগতের ধূসর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, একথা অনস্বীকার্য। কারণ অতিচেতনা অথবা অধিচেতনাকে কোনমতেই কালের ক্ষণিকলীলার মধ্যে বন্দী করে রাখা যায় না। অতিচেতনা শাশ্বত কালাতীত—কাল তার একটা ভঙ্গি মাত্র। আর অধিচেতনার কাছে কাল বিচিত্র অনুভবের অন্তহীন পটভূমিকা শুধু। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতে জীব-সত্ত্বের ব্যাপ্ত থাকবে না—একথা অকল্পনীয়। অথচ আমাদের বর্তমান সত্তার

অর্থ খুঁজে পাই যে-অতীত দিয়ে, মন তার কতটুকু জানে—অতিবাস্তব স্থূল অস্তিত্ব ও তার খানিকটা স্মৃতি ছাড়া? এ-জানাকে কি জানা বলে? আর যে-ভবিষ্যতের অদৃশ্য আকর্ষণে পরিণামের বর্তমান ধারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, বলতে গেলে মন তার কিছুই জানে না। অবিদ্যার সংস্কারে আমরা এমনই আচ্ছন্ন যে, আমাদের মতুয়ার বুদ্ধি ভাবে : অতীতকে জানা যায় শুধু স্মৃতির কঙ্কাল দিয়ে, যেহেতু সে লুপ্ত; আর ভবিষ্যৎকে জানাই যায় না, কেননা সে অজ্ঞাত। অথচ অতীত আর ভবিষ্যৎ দুই নিহিত আছে এই বর্তমানে : গুহাহিত চেতনার অবিচ্ছেদ শাশ্বত অনুবৃত্তিতে অতীত কাজ করছে সংবৃত্ত-রূপে, আর ভবিষ্যৎ আছে স্ফুরণোন্মুখ হয়ে। কালপরিণামের শাশ্বত রূপকে যে জানি না, এ-ই আমাদের অবিদ্যাজাত আরেকটি সর্বনাশা সংকীর্ণ প্রত্যয়।

কিন্তু এইখানেই মানুষের আত্ম-অবিদ্যার শেষ নয়। কারণ শুধু-যে তার অতিচেতন অধিচেতন ও অবচেতন স্বরূপটি সে চেনে না তা নয়—তার এই বর্তমান জগৎটাকেও সে জানে না। অথচ তাকে বিষয় বা নিমিত্ত করে অহরহ জগতের ক্রিয়াপরিণাম চলছে, আবার জগৎকে বিষয় ও আশ্রয় করে নিত্য স্পন্দিত হচ্ছে তারও নিজের প্রবৃত্তি। কিন্তু অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সে ভাবে, এ-জগৎটা তার সত্তার বহির্ভূত সম্পূর্ণ বিবিক্ত একটা-কিছু। যেহেতু জগৎ তার ব্যষ্টি প্রাকৃতরূপ ও অহন্তার বাইরে, অতএব জগৎ তার দৃষ্টিতে অনাত্মা। ঠিক এই ভুল হয় তার অতিচেতন স্বরূপ সম্পর্কেও। ব্রহ্মকে প্রথম সে মনে করে নিজের থেকে পৃথক একটা তত্ত্ব—এমন-কি তাঁকে কল্পনা করে লোকবাহ্য ঈশ্বর বলে। অধিচেতন আত্মার প্রথম সাক্ষাৎকারেও তার মনে হয়, সে যেন আত্মবিবিক্ত এক বিরাট পুরুষ বা বিরাট চেতনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—এই পুরুষই তার স্বতন্ত্র ভর্তা ও নিয়ন্তা। জগতের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়—তার দেহ-প্রাণ এই বিশাল সমুদ্রের একটি ফেন-বুদ্বুদ মাত্র এবং এ-ই তার স্বরূপ।...কিন্তু অধিচেতনার সম্যক্-অনুভবে তাকে একাধারে আত্মব্যাপ্ত ও বিশ্বব্যাপ্ত বলেই প্রত্যক্ষ করি। অতিচেতন আত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকারে বিশ্বকে অনুভব করি তাঁরই লীলাবিভূতিরূপে—দেখি নিখিল বিশ্বের সব-কিছুই অখণ্ড অদ্বয়স্বরূপ, সব-কিছুই আমাদের আত্ম-স্বরূপ। দেখছি, এক অখণ্ড ভূতপ্রকৃতির মধ্যে এই দেহ একটা জড়ের গ্রন্থি, এক অবিভক্ত প্রাণসমুদ্রে এই প্রাণ একটা আবর্ত, এক বিচ্ছেদহীন বিরাট্-মনের আয়তনে এই মন একটা বিচিত্রবার্তাবহ অথবা রূপকৃৎ আধার মাত্র, এক অখণ্ড অনন্ত চিদাকাশে আমাদের জীবচেতনা ও ব্যক্তিসত্তা যেন অবর্ণজ্যোতির একটা ঝলক বা রশ্মিরেখা। অহংবোধই অভেদের মধ্যে ভেদবুদ্ধিকে পাকা করে। আর তার ভিত্তিতে আমাদের বহিশ্চর অবিদ্যাচেতনা গড়ে তোলে তার

বন্দিশালার কঠিন প্রাকার—যদিও তাকে ভেদ করা একেবারে অসাধ্য নয়। অহন্তাই বলতে গেলে অবিদ্যার সবচাইতে দুর্মোচন গ্রন্থি।

যেমন স্মৃতি দিয়ে ঘেরা একটুখানি কাল ছাড়া কালিকসত্তার আর-সবটাই আমাদের অজানা, তেমনি আমাদের দৈশিকসত্তারও-বা কতটুকু জানি—শুধু এই একটি দেহের সংকীর্ণ পরিসরে বাঁধা ক্ষুদ্র আয়তনটি ছাড়া? মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কুচিত চেতনায় পাই শুধু এরই প্রত্যক্ষ অনুভব, এর সঙ্গে আমাদের প্রাণ ও মনকে একাত্ম বলে জানি। আর বাইরের পরিবেশকে ভাবি একটা অনাত্মবস্তু মাত্র, যার সঙ্গে আছে কেবল প্রয়োজনের সম্পর্ক।...কারও-কারও মতে দেশ কিছুই নয়—বস্তু বা জীবাত্মার সহভাব ছাড়া। সাংখ্যমতে জীবাত্মা অসংখ্য এবং স্ব-তন্ত্র। অতএব তাদের অনুভবের ক্ষেত্ররূপী এক অখণ্ড প্রকৃতি দিয়েই তাদের সহভাব সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সহভাব যে আছে, তা অনস্বীকার্য; এবং শেষপর্যন্ত এক অন্বয়সত্তার আধারে সহভাবের কল্পনাতেই তার পর্যবসান ঘটে। সেই অন্বয়সত্তার আত্মপ্রসারণের যে প্রত্যক্ কল্পনা, তাকে বলি দেশ। এক অদ্বিতীয় চিন্ময়সত্তাই নিজের আত্মভাবকে আধার ক'রে তাঁর চিৎশক্তির সঞ্চরণক্ষেত্র কল্পনা করলেন—এই হল তাঁর দেশ-ভাবনার তত্ত্ব।...চিৎশক্তি পরিকীর্ণ হয়ে নিহিত হল বিচিত্র দেহে প্রাণে ও মনে; জীবাত্মা সেই বহুভাবনার একটিতে মাত্র অধিষ্ঠিত। তাই আমাদের মনশ্চেতনাও ওই একটি আধারে অভিনিবিষ্ট হয়ে তাকেই ভাবল আত্মা, আর-সবাইকে ভাবল অনাত্মা। এমনি করে অতীত ও অনাগতকে বাদ দিয়ে, এই একটি জীবনের চারদিকে অবিদ্যার কুণ্ডলী রচনা ক'রে তাকেই সে সমগ্রসত্তার মর্যাদা দিল। অথচ অখণ্ডের মধ্যে এমন ভাগাভাগিও একটা বিকল্প মাত্র, কেননা সমস্ত বিশিষ্টপ্রত্যয়ের পিছনে আছে সামান্যপ্রত্যয়ের উদার ভূমিকা। অখণ্ড সামান্যমনকে না জেনে আমাদের এই বিশিষ্টমনকেও কোনমতেই ঠিক-ঠিক জানতে পারি না। নিজের প্রাণের তত্ত্ব জানতে হলে ডুবতে হয় অখণ্ড-প্রাণের তত্ত্বে, এই দেহটির পরিচয় খুঁজতে হয় অখণ্ড ভূতপ্রকৃতির রহস্য মন্থন ক'রে। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যষ্টির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমষ্টিপ্রকৃতির বিধান দিয়ে—তাদের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির পিছনে আছে অখণ্ডপ্রকৃতির প্রশাসন ও প্রবর্তনা। কিন্তু এই-যে অখণ্ডসত্তার সমুদ্র নিরন্তর বয়ে চলেছে আমাদের প্লাবিত ও জারিত করে, তার চৈতন্যের সঙ্গে আমরা কতটুকু যোগ রেখে চলেছি? শুধু বহির্মনে ভেসে ওঠে তার যেটুকু রূপ ও সঙ্গতি, সেইটুকুর সঙ্গে আমাদের যা পরিচয়। এই জগৎ আমাদের মধ্যে নিঃশ্বসিত রূপায়িত ও মননে স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভাবি, জগৎ হতে বিবিক্ত হয়ে আমরা শুধু বেঁচে আছি ভাবছি আবর্তিত হচ্ছি নিজেকে কেন্দ্র ক'রে। আমাদের কালাতীত অতিচেতন অধিচেতন অথবা অবচেতন আত্মভাবের খবর যেমন

জানি না, তেমনি এই বিশ্বাত্মভাবেরও কোনই সন্ধান রাখি না। তবু এইটুকু বাঁচোয়া, আমাদের এই অবিদ্যার মর্মমূলে নিহিত আছে নিজেকে পাওয়া ও নিজেকে জানার অকুণ্ঠিত প্রেতি—তাই আপন স্বধর্মের অনুশাসনে শাশ্বত-কাল ধরে চলেছে তার বিরামহীন সাধনার জৈত্ররথ। মানুষ মনোময় জীব। তার মধ্যে এক বহুমুখী অবিদ্যা অহরহ রূপান্তরিত হতে চাইছে সর্ববিৎ বিদ্যাশক্তিতে—এই তার চেতনার পরিচয়। অথবা আরেকদিক থেকে বলতে পারি, বিষয়ের সঙ্কীর্ণ বিবিক্তসংবিৎ তার মধ্যে ফুটে উঠতে চাইছে অভঙ্গ-চেতনা ও সম্যক্‌প্রজ্ঞার সহস্রদল মহিমায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

অবিদ্যার নিদানকথা

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৮

তপঃশক্তিতে ঘটে ব্রহ্মের প্রচয়; তাহতে অভিজাত হয় অন্ন—অন্ন হতে প্রাণ মন এবং লোকসমূহ।

—মুণ্ডকোপনিষদ (১।১।৮)

সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রা বিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চা বিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৬

তিনি কামনা করলেন, 'বহু হয়ে প্রজাত হব আমি'; তারপর তপঃসমাহিত হলেন তিনি—সেই তপোবীর্যে এইসব সৃষ্টি করলেন : সৃষ্টি করে অনুপ্রবিষ্ট হলেন তাতে; অনুপ্রবিষ্ট হয়ে হলেন সৎ ও ত্যৎ, হলেন নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, হলেন বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অনৃত। সত্যই হলেন তিনি—হলেন এই যা-কিছু সব : তাঁকে বলে 'তৎ সৎ।'

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৬)

তপো ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।২,৫.

তপ-ই ব্রহ্ম।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।২।৫)

কথাটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এসেছে; এবার তাহলে অবিদ্যাসমস্যার গোড়া ধরে বিচার করা সম্ভব হবে। কিসের প্রয়োজনে চেতনার কোন্ পরিণামে অবিদ্যার উদ্ভব, এখন আমাদের তা-ই দেখা আবশ্যক। এক অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্বই পরমার্থসৎ—এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে চলবে আমাদের বিচার, দেখতে হবে অবিদ্যাসম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ তার সঙ্গে কতখানি খাপ খায়।...প্রথম প্রশ্ন এই : অনুত্তর সন্মাত্র যিনি, নিশ্চয় তিনি নির্বিশেষ চিন্মাত্রও—অতএব কোনমতেই তিনি অবিদ্যার বশ হতে পারেন না। তাহলে তাঁকে আশ্রয় করে কি করে অবিদ্যার প্রবৃত্তি ও স্থিতি সম্ভব হল, কোথাহতে এল এই আত্ম-সঙ্কোচক বিবিক্তজ্ঞানের বিচিত্র বিলাস? যাঁকে অবিভক্ত বলে জানি, তাঁর মধ্যে অনন্তকাল ধরে এই বিভক্তবৎ প্রত্যয়ের সার্থক পরিণামের লীলা কি

করে চলছে? শুদ্ধসন্মাত্র যখন অখণ্ড-অদ্বয়, তখন তাঁর মধ্যে আত্ম-অবিদ্যা থাকতেই পারে না। বিশ্বের যা-কিছু সমস্তই যখন তাঁর আত্মস্বরূপ, তাঁর চিন্ময় বিপরিণাম অথবা আত্মব্যাকৃতি, তখন এমনটি হতেই পারে না যে, তাদের স্বভাব ও স্বধর্মের সত্য পরিচয় কি তা তিনি জানেন না। আমরা বলি বটে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'; অথচ আত্মা বা বিশ্ব কারও স্বরূপ আমরা চিনি না। তাহতে এই বিপরীত সিদ্ধান্তই কি অনিবার্য হয়ে পড়ে না যে, স্বরূপত যা অবিদ্যালেশশূন্য, তারই মধ্যে দেখা দিল অবিদ্যার কালিমা—আত্মসংকল্পের কোনও নিগূঢ় প্রবর্তনাতে হ'ক অথবা স্বভাবধর্মের কোনও নিয়ম কি যোগ্যতাবশেই হ'ক, অবিদ্যার আঁধারে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হয়েছে? যদি বলি : অবিদ্যার আশ্রয় মন স্বয়ং মায়িক অ-ব্রহ্ম ও অসৎ এবং ব্রহ্ম অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ, সুতরাং অসতের অন্তর্ভাবী মনের অবিদ্যাদ্বারা কোনমতেই তিনি স্পৃষ্ট হতে পারেন না—তাহলেও কিন্তু সমস্যা মেটে না; কারণ ব্রহ্মকে অখণ্ড-অদ্বয়তত্ত্ব ব'লে স্বীকার করলে আর মায়ার ফাঁক দিয়ে গলবার রাস্তা থাকে না। অবিদ্যার তত্ত্ব বোঝাতে গোড়াতেই মায়াকে মানব ব্রহ্ম হতে পৃথক বলে, আবার তখনই অবাস্তব বলে তাকে উড়িয়ে দেব—এ শুধু মনোবাণীর একটা মায়া, যা দিয়ে আমরা ব্রহ্মে সম্ভাবিত অদ্বৈতহানির স্ববিরোধকে ঢাকতে চাইছি। দুটি অন্যোন্যবিরোধী তত্ত্বকে আমরা দাঁড় করিয়েছি মুখামুখি ক'রে : একদিকে বিভ্রমলেশশূন্য ব্রহ্ম, আরেকদিকে আত্ম-বিভ্রমোৎপাদিকা মায়া; অথচ অদ্বৈতের গাঁটছড়ায় বাঁধতে চাইছি দুজনকেই! ব্রহ্মই যদি অখণ্ড পরমার্থসৎ হন, তাহলে মায়া অবশ্যই ব্রহ্মশক্তি—তাঁরই চৈতন্যের বীর্য অথবা সত্তার পরিণাম। আবার জীবাত্মা যখন ব্রহ্মস্বরূপ অথচ আত্মমায়ার অধীন, তখন তার মধ্যে ব্রহ্মই তাঁর নিজের মায়ার কবলিত। কিন্তু এ-সম্ভাবনাকে স্বরূপসত্যের মৌলবিভাব বলে মানব কি করে? ব্রহ্মের মায়াবশ্যতার একমাত্র অর্থ হতে পারে—আত্মপ্রকৃতিরই কোনও নিগূঢ়বীর্যের কাছে তাঁর আত্মপ্রকৃতির বশীভাব। সে হবে সর্বাধিবাস চিৎস্বরূপের চিন্ময় স্বাতন্ত্র্যের একটা বিলাস, তাঁর আত্মবিভাবনী সর্ববিদ্যার একটা লীলায়ন। অতএব অবিদ্যা ব্রহ্মস্পন্দেরই অঙ্গীভূত, তাঁর চৈতন্যের স্বেচ্ছাস্বীকৃত পরিণাম। কারও বলাৎকারে নয়, আপন খুশিতে জেনে-শুনেই বিশ্ববিসৃষ্টির প্রয়োজনে অবিদ্যার সঙ্কোচকে তিনি অঙ্গীকার করেছেন—এই কথাই সত্য।

জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক নয়, দুয়ের মধ্যে নিত্যভেদ আছে, কেননা জীব অল্পজ্ঞ এবং ব্রহ্ম অখণ্ডচিন্ময় অতএব সর্বজ্ঞ—একথা বলেও অবিদ্যার সমস্যা চুকিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এ-কল্পনায় সত্তাদ্বৈতের অনুত্তর ও সর্বগ্রাহী অনুভব বাধিত হয়। প্রকৃতির ক্রিয়াপরিণামে যতই ভেদ থাকুক, এর অদ্বৈত সত্তায় যে সব-কিছু বিধৃত ও সমাহিত, চিত্তের এই সামান্য-

প্রত্যয়কে অস্বীকার করে আমরা এক পা-ও চলতে পারি না।...তার চাইতে ভেদে অভেদের তত্ত্বকে স্বীকার করা সহজ, কেননা বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করছি এই ভেদাভেদের লীলা। বলতে পারি : ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের অভেদও আছে, ভেদও আছে। স্বরূপসত্তায় অতএব স্বরূপপ্রকৃতিতে আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে এক, কিন্তু আত্মার বিভাবে দুয়ে ভেদ আছে বলে সে-ভেদ দেখা দিয়েছে প্রকৃতির ক্রিয়াতেও। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে তথ্যভাষণ হয় মাত্র, হয় না তার অন্তর্নিহিত সমস্যার তত্ত্বনিরূপণ। স্বরূপসত্তায় ব্রহ্মের সঙ্গে যার অভেদ-ভাব আছে, চিৎসত্তায়ও তাঁর সঙ্গে এবং সবার সঙ্গে ওই অভেদভাব যে বজায় থাকবে—একথা খুবই সঙ্গত। তাহলে সেই অদ্বৈতসত্তা আত্মভাবের স্ফুরদ্-রূপে এবং ক্রিয়াপরিণামে কি করে ভেদপ্রত্যয়ের কবলিত হবে—কি করে সে অবিদ্যাগ্রস্ত হবে? তাছাড়া ভেদাভেদসিদ্ধান্তের ন্যূনতা ধরা পড়ে আরেক-দিকে : জীবাত্মা যে শুধু ব্রহ্মের স্থাণুস্বরূপে সমাপন্ন হতে পারে তা নয়, তাঁর সক্রিয়স্বভাবের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।... অথবা সমস্যার মূলোচ্ছেদ করতে পারি এইভাবে : অস্তিত্বের যত সমস্যা, সবই জ্ঞানগম্য ভাবের সমস্যা। তার ওপারে আছে অবিজ্ঞেয় বস্তু, যাকে আমরা ভাবপ্রত্যয় দিয়ে কোনকালেই জানতে পারব না। সৃষ্টি না হতেই ওই অবি-জ্ঞেয়ের মধ্যে মায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। অতএব মায়িক সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত থেকে তার নিদানকথা জানব কি করে? জড়বিজ্ঞানীর অজ্ঞেয়বাদের মত এও একধরনের অজ্ঞেয়বাদ—চিৎতত্ত্বকে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু সব অজ্ঞেয়বাদেরই বিরুদ্ধে আপত্তি এই—এ শুধু বুদ্ধির পরাভব, অর্থাৎ চেতনার বর্তমান আপাতসঙ্কোচকে অতি সহজেই মেনে নিয়ে জিজ্ঞাসু মনের দুঃসাহসকে দাবিয়ে রাখা শুধু। প্রাকৃতচিত্তের এ-নির্বীর্যতাকে না হয় সইতে পারি : কিন্তু যে-জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, তাকে কি করে এমন বীর্যহীন ভাবব? ব্রহ্ম যেমন নিজেকে জানেন, তেমনি জানেন অবিদ্যার হেতুকেও। অতএব যে-জীব ব্রহ্মস্বরূপ, তারও কাছে কেন জ্ঞানের সকল দুয়ার উদ্ঘাটিত হবে না, অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্বকে জেনে কেনই-বা সে তার বর্তমান অবিদ্যার উৎসমূল আবিষ্কার করতে পারবে না?

অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব বলে কিছু থাকলে সে কি ব্রহ্মেরই এক পরাৎপর স্থিতি হবে না? অনুভবের চরমে আমরা তাঁকে জানি সৎ চিৎ ও আনন্দের পরম ভাবপ্রত্যয়রূপে। তারও ওপারে আছে তাঁর অভাবপ্রত্যয়—উপনিষদ যাকে বলেছেন অসৎ। 'অসৎই ছিল সবার আগে, অসৎ হতে হল সতের জন্ম'— উপনিষদের উক্তিটি এই। সম্ভবত বুদ্ধের নির্বাণেরও এই মর্মরহস্য। নির্বাণদ্বারা বর্তমানস্থিতির প্রলয় ঘটানোর অর্থ হয়তো এমন-এক লোকোত্তর ভূমিতে আরূঢ় হওয়া, যেখানে আত্মভাবের সংস্কার কি অনুভবও অবশিষ্ট

থাকবে না—অস্তিপ্রত্যয় হতেও বিমুক্তিতে ঘটবে পরমপুরুষার্থের অনির্বচনীয় সিদ্ধি।...অথবা অসৎ হয়তো উপনিষদের অনুপাখ্য ও নিরুপাধিক ভূমানন্দ—যা অনিরুক্ত, ভাবাতীত, সত্তা ও চেতনার চরম প্রত্যয় ও বিবৃতিকেও যা ছাড়িয়ে গেছে। ইতিপূর্বে অসতের এই অর্থই আমরা মেনে নিয়েছি—অনন্তের পথে অন্তহীন অভিসারে কোথাও দাঁড়ি টানতে চাই না বলে।... অথবা অসৎ হয়তো সৎ হতে পৃথক একটা-কিছু—হয়তো নিরুপাধিক সত্তার ভাবনাও অচল সেখানে। বৈনাশিকের চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত 'বিনাশ' তাহলে এই অসৎ।

কিন্তু বিনাশের সর্বশূন্যতা তো কিছুরই কারণ হতে পারে না—এমন-কি প্রতিভাস বা বিভ্রমেরও নয়। অতএব নিরুপাখ্য অসতের এ-অর্থ সংগত না হলে তাকে বলতে হয় নিত্য-অব্যক্ত নির্বিশেষ শক্তিযোগ্যতা মাত্র। আনন্ত্যের সে যেন এক অনির্বচনীয় শূন্যতার প্রহেলিকা, যাহতে যে-কোনও মুহূর্তে সবিশেষ শক্তিযোগ্যতার উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু তার দুটি-একটি মাত্র কখনও পর্যবসিত হয় ভূতার্থের প্রাতিভাসিক রূপায়ণে। যা-কিছু ফুটতে পারে এই অসৎ থেকে : কি ফুটবে বা কেন ফুটবে, কেউ তা বলতে পারে না। অর্থাৎ বলতে গেলে এ যেন পরম নির্ঋতির গর্ভাশয়, যাহতে অতর্কিত সৌভাগ্যের-না দুর্ভাগ্যের ?—বশে আবির্ভূত হয়েছে বিশ্বের এই ঋতচ্ছন্দ।...অথবা বলতে পারি, বিশ্বে সত্যকার ঋতায়ন বলে কিছুই নাই। আমরা যাকে ঋতচ্ছন্দ ভাবি, সে শুধু ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তির একটা চিরাভ্যস্ত সংস্কার—একটা মনের বিকল্প। অতএব বিশ্বের আদিকারণ খোঁজবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ওই পরম নির্ঋতির গর্ভাশয় হতে অকল্পনীয় যত বিরোধ, অসম্ভব যত অনাসৃষ্টি আবির্ভূত হতে পারে। এ-জগৎটাও কি তা-ই নয়—নানা বৈষম্য ও ধাঁধায় কন্টকিত একটা রহস্যময় প্রহেলিকা ? অথবা হয়তো শেষপর্যন্ত এ-জগৎ একটা অতিকায় ভ্রান্তি—এক অন্তহীন অর্থহীন উৎকট প্রলাপ মাত্র। অতএব পরা সংবিৎ ও পরা বিদ্যা নয়—পরম অচিতি ও অবিদ্যাই সম্ভবত একমাত্র জগৎকারণ। এমন বিশ্বে সব-কিছুই সম্ভব : হয়তো 'কিছু-না' হতেই এখানে 'সব-কিছুর' আবির্ভাব হয়েছে। মনের মনন হয়তো মননহীন শক্তি অথবা অচেতন জড়ের একটা বিকার মাত্র। সর্বত্র প্রকৃতির যে ঋতম্ভরা লীলা দেখছি, মিছাই তাকে ভাবছি স্বভাবসত্যের রূপায়ণ। আসলে এ শুধু শাশ্বত আত্ম-অবিদ্যার যন্ত্রাবর্তন—স্বকৃৎ চিন্ময়সংকল্পের স্বতঃপরিণাম নয়। কে জানে, হয়তো শাশ্বত সম্ভূতি শাশ্বত বিনাশেরই একটা নিত্যপ্রতিভাস মাত্র।...বিশ্বরহস্য সম্পর্কে সকল জল্পনাকেই তুল্যবল ভাবতে পারি, কেননা যুক্তির দিক থেকে তাদের সপ্রমাণ কি নিষ্প্রমাণ দুইই বলা চলে। বিশ্বচক্র-প্রবর্তনের কোনও আদিবিন্দু বা নিশ্চিত লক্ষ্য যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, সেখানে মনে হয় সব-কিছুই

তো সম্ভব। এইধরনের সব মতেই মানুষের সায় ছিল; এবং ভুল করে থাকলেও তাতে লাভ ছাড়া তার ক্ষতি হয়নি কিছুই—কেননা ভুলের ভিতর দিয়েই মন সত্যের পথ খুঁজে পায়। ভুল যেমন বিপরীত ভুলকে ভাঙে, তেমনি একটা নতুন সিদ্ধান্তেরও ইশারা আনে: এমনি করে ভুলে-ভুলে ঠোকাঠুকি করে জিজ্ঞাসার অভিযান এগিয়ে চলেছে নির্ভুল সত্যের দিকে। কিন্তু বৈনাশিকবুদ্ধির এই রায়কে চরমপর্যন্ত ঠেলে নিলে দর্শনের সারা ইমারতটাই ভেঙে পড়ে। কারণ, দর্শন আবিষ্কার করতে চায় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে, নির্ঋতির অরাজকতাকে নয়। অজ্ঞেয়বাদই যদি হয় সকল জিজ্ঞাসার শেষ, তাহলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার এত আড়ম্বরের কি প্রয়োজন ছিল? উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে, দর্শন সার্থক হয়—যদি একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের সূত্রটি সে খুঁজে পায়। তাই অবিজ্ঞেয়কে নিছক জানার-বাইরে বলতে চাই না; মন দিয়ে তাকে জানা যায় না, এই কথাই বরং মানতে পারি। 'কিছুই নাই', তা নয়: 'একটা-কিছু' আছে—তারই চরম চমৎকারের পরম প্রকাশকে বলছি অবিজ্ঞেয়। মানুষের মন তুঙ্গতম সানুতে আরোহণ ক'রে পাখা মেলে দিয়েও তার পার পায় না। কিন্তু সে-বস্তু যখন নিজের কাছে প্রকাশ, তখন আমাদেরও কাছে প্রকাশ হতে তার বাধা কোথায়? সে-প্রকাশের আলোতে আমাদের সম্ভাবিত জ্ঞানের চরম প্রকাশ তো ম্লান হবে না, বরং সে আত্মদর্শন ও স্বানুভবের ঐশ্বর্যে ঢেলে দেবে মহত্তর সিদ্ধি ও বৃহত্তর সত্যের বীর্য। অতএব 'একটা-কিছু' আছেই—যাকে এমন করে জানা যায়, যাতে তারই মধ্যে তাকে দিয়েই ঘটে সকল সত্যের চরম স্থিতি ও পরম সমন্বয়। তাকে আমাদের জানতে হবে; ওই 'একটা-কিছুই' হবে আমাদের দর্শন ও মননের আদিবিন্দু। জিজ্ঞাসার পথে চলতে হবে তাকেই ধরে—তবে না সকল রহস্যের সমাধান হবে। কেননা, ওই তৎস্বরূপের ভাবনাই আমাদের দিতে পারে স্বতোবিরোধ-কণ্টকিত বিশ্বের রহস্যকুঞ্চিকার সন্ধান।

এই যে 'একটা-কিছু'—বেদান্ত বলছে এবং আমরাও বরাবর বলে এসেছি—তার প্রকাশ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে অর্থাৎ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের পরা ত্রিপুটীতে। অবিদ্যার রহস্য বুঝতে হলে যাত্রা করতে হবে এই প্রথমজাত সত্য হতে। বিশুদ্ধ-চৈতন্য বিদ্যারূপে নিজেকে প্রকাশ করেও সে-বিদ্যাকে এমনভাবে সীমিত করল, যাতে অবিদ্যার প্রতিভাস সম্ভবপর হল। চৈতন্যের এই স্ব-তন্ত্র বৃত্তির মধ্যেই আমরা সমস্যার ঈপ্সিত সমাধান খুঁজে পাব। চৈতন্যের শক্তিতে যে স্বাভাবিক স্পন্দলীলা আছে, অবিদ্যা তারই বিসৃষ্টি। অতএব অবিদ্যা স্বরূপতত্ত্ব নয়—ক্রিয়াজন্য বিক্ষেপ মাত্র। তাই অবিদ্যার তত্ত্ব জানবার জন্য চাই চৈতন্যের এই শক্তিরূপের বিশ্লেষণ। পরা সংবিৎ স্বভাবত পরা-শক্তিশালী; চিতের প্রকৃতিই শক্তি। জ্ঞান অথবা ক্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে

পরিণম্যমান অথবা সৃষ্ট্যুন্মুখ ভাবনার বীর্যে তপঃসমাহিত শক্তির যে-অভিনিবেশ, তাহতেই বিশ্বের বিসৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ স্ববিমর্শময় চিৎপুরুষ যেন তাঁর অন্তর্নিহিত নিখিল ভাবের বীজ ও পরিণতিকে আত্মনিরূঢ় তপের* তাপে ফুটিয়ে তুলছেন। তাঁর এই স্বরূপসত্যের ও ভব্যার্থের ভাবনাই হল সৃষ্টিবীজ। আমাদের প্রাকৃতচেতনাকে বিশ্লেষণ করলেও দেখতে পাই, যে-কোনও বিষয়ের অভিমুখে তপঃশক্তির এই প্রেরণাতেই তার সম্ভাবিত ক্রিয়াশক্তির সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ পরিচয়। এই তপস্যার বীর্যই রয়েছে তার সকল জ্ঞান কর্ম ও সৃষ্টির মূলে। তপস্যার দুটি ক্ষেত্র আছে আমাদের মধ্যে : একটি আধ্যাত্মিক লোক বা অন্তর্জগৎ, আরেকটি আধিভৌতিক লোক বা বহির্জগৎ। কিন্তু অন্তর-বাইরে বিষয়ের এমন ভাগাভাগি করে তপঃশক্তির প্রকৃতি ও পরিণামে একটা দ্বৈধভাব আনা আমাদের বেলায় খাটলেও অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের বেলায় কিন্তু খাটে না। কারণ, বিশ্বের সমস্ত-কিছুই যখন তাঁতে রয়েছে, সবই যখন তিনি—তখন আমাদের সীমিতমনের বিভক্তবৎ-প্রত্যয় তো কোনমতেই তাঁর স্বভাবে আরোপিত হতে পারে না।...দ্বিতীয়ত, আধারের সমগ্রশক্তির একদেশ মাত্র আমাদের ঈপ্সিত প্রযত্নে স্ফুরিত হয়—সে-প্রযত্ন বাহ্য কি মানস, যা-ই হ'ক না কেন। শক্তির বাকিটুকুর স্ফুরণ বহিশ্চেতনার কাছে হয় অবচেতন অথবা অতিচেতন, অতএব অনীপ্সিত। প্রযত্নের সঙ্গে ইচ্ছার এই যোগ-বিয়োগ হতে ব্যাবহারিক জীবনে গুরুতর কতগুলি বিপরিণাম দেখা দেয়। কিন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দে এই প্রযত্নভেদ বা তার বিপরিণাম নাই—কেননা সমস্তই যে তাঁর অখণ্ড আত্মস্বরূপ, সমস্ত প্রযত্ন ও তার ফল যে তাঁর অখণ্ড সত্যসঙ্কল্পের পরিস্পন্দ, তাঁর চিতি-শক্তির উচ্ছলন। আমাদের বেলায় চেতনার ক্রিয়া যেমন স্ফুরিত হয় তপে, তেমনি হয় তাঁরও। কিন্তু তাঁর তপঃ অখণ্ডসন্মাত্রের সর্বতোগ্রাহী সংবিতের সর্বাবগাহী অখণ্ডিত তপস্যা।

কিন্তু এইখানে প্রশ্ন হতে পারে : পরমার্থসতে ও মহাপ্রকৃতিতে আছে চরত্ব এবং অচরত্ব, অক্ষর স্বরূপস্থিতি এবং ক্ষরস্বভাব স্ফুরত্তা দুইই। সুতরাং

---

* তপঃ শব্দের যৌগিক অর্থ তাপ—রূঢ় অর্থ শক্তির যে-কোনও বিলাস, চিৎশক্তির আত্মগত অথবা বিষয়গত অবিচল সাধনাভিনিবেশ। প্রাচীনেরা কল্পনা করেছেন, তপ হতে বিশ্বের সৃষ্টি হল—অণ্ডের আকারে; আবার তপ বা চিৎশক্তির হৃদয়ের তাপে সেই অণ্ড বিদীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এলেন প্রকৃতি-স্থ পুরুষ—ডিম হতে পাখির ছানার মত। ইংরাজী গ্রন্থে সাধারণত তপস্যার অনুবাদ করা হয় penance; এ-অনুবাদটি একেবারেই ভুল। এদেশের তপস্বীদের তপঃসাধনায় penance বা প্রায়শ্চিত্তমূলক পীড়নের নামগন্ধও ছিল না। এমন-কি যেসব কৃচ্ছ্র তপস্যার মধ্যে আত্মনিগ্রহের ভাব ছিল, 'শরীরস্থ ভূতগ্রামের কর্শন' তাদেরও লক্ষ্য ছিল না : সেখানে তপস্যাদ্বারা দৈহ্যপ্রকৃতির কবল হতে চেতনাকে মুক্ত করা, অথবা চেতনার অলৌকিক উত্তপনদ্বারা কোনও আধ্যাত্মিক বা লৌকিক সিদ্ধি অর্জন করাই ছিল সাধকের উদ্দেশ্য।

যে-ভূমিতে শক্তির নিমেষে সকল গতি স্তব্ধ হয়ে আছে, সেখানে এই তপঃশক্তি ও তার অভিনিবেশের কি স্থান, কি কাজ? তপঃশক্তিকে সাধারণত আমাদের মধ্যে চৈতন্যের সক্রিয়স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত ভাবি, বাইরের কি ভিতরের শক্তি-স্পন্দনেই তার প্রকাশ দেখি। যা আমাদের মধ্যে স্থাণু হয়ে আছে, সে তো ক্রিয়ার জনক নয়: অথবা সে শুধু ইচ্ছাবিযুক্ত যান্ত্রিকক্রিয়ার প্রবর্তক মাত্র। তাই তাকে সংকল্প বা চিৎশক্তির সঙ্গে আমরা যুক্ত ভাবি না। কিন্তু এই স্থাণুপ্রকৃতিতেও ক্রিয়ার সামর্থ্য অথবা স্বতঃক্রিয়ার স্ফুরণ যখন সম্ভাবিত, তখন তারও মধ্যে সম্মুগ্ধবৎ সত্ত্বোদ্রেক অথবা স্বতঃস্ফূর্ত চিৎশক্তির একটা আবেশ আছে। অথবা তার মধ্যে আছে প্রবর্তিকা তপঃশক্তির একটা নিগূঢ় ভাবনা কিংবা নিবর্তিকা তপঃশক্তির প্রতীপতা। হয়তো এই অনীপ্সিত ক্রিয়ার পিছনে আছে আমাদেরই আধারে নিগূঢ় কোনও বৃহত্তর অজ্ঞাত চিৎ-শক্তি বা সংকল্পের প্রবর্তনা। তাকে সংকল্প যদি নাও বলি, তবু তাকে শক্তিবিশেষ বলে মানতেই হবে। সে-শক্তি হয়তো নিজেই ক্রিয়ার প্রযোজক, অথবা বিশ্বশক্তির সন্নিকর্ষে আভাসে কি অভিঘাতে সাড়া দেওয়া তার স্বভাব। এও জানি, বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যাকে স্থাণু অসাড় বা নিষ্ক্রিয় ভাবি, তারও আত্মধৃতির মূলে আছে এক নিগূঢ় অবিরাম স্পন্দন, আপাতস্থাণুত্বের আধার-রূপে আছে শক্তিরই সক্রিয়তা। অতএব এখানেও দেখছি, সব-কিছু সম্ভব হচ্ছে শক্তির সান্নিধ্যে, বিশ্বের সমস্তই তার তপোবিভূতি।...কিন্তু এই চরত্ব ও অচরত্বের দ্বৈত পার হয়ে আমরা পৌঁছতে পারি এমন-এক লোকোত্তর ভূমিতে, যেখানে চেতনা নিস্তরঙ্গ প্রশান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়—স্তব্ধ হয়ে যায় দেহ ও মনের সকল ক্রিয়া। সুতরাং চেতনারও দেখছি দুটি রূপ : এক রূপে সে সক্রিয়, স্পন্দমান—নিজের ভিতর হতে উৎসারিত করে চলেছে জ্ঞান ও কর্মের ফোয়ারা, অতএব তপই তার ধর্ম; আরেক রূপে চেতনা নিষ্ক্রিয়, অ-শক্ত, শুদ্ধ স্বরূপস্থিতি মাত্র, অতএব তপের অভাবই তার ধর্ম। কিন্তু সত্যি কি সেখানে তপের অভাব? অখন্ড সচ্চিদানন্দের ভাবাভাবের এই ভেদ কি বস্তুতই সার্থক? কেউ-কেউ বলেন—হাঁ, ব্রহ্মে এমনতর ভেদের একটা সার্থ-কতা আছে। সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দুটি বিভাবের কল্পনা এদেশের দর্শনের যেমন একটা প্রধান ও ফলোপধায়ক সিদ্ধান্ত, তেমনি সাধকের অধ্যাত্ম-অনুভবেও তার সমর্থন আছে।

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি। স্থাণুভাবের সাধনায়, বিশিষ্ট খন্ডজ্ঞান হতে আমরা উত্তীর্ণ হই অখন্ড সর্বসমন্বয়ী জ্ঞানের বিপুল ঔদার্যে। তারপর স্থাণুত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি লোকোত্তরের দিকে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মীলিত করি, তাহলে অনুভব করি এক বিপুল শক্তিপাতের সংবেগ, যাকে কোনমতেই সঙ্কীর্ণ অহন্তার নিজস্ব বিত্ত বলতে পারি না। বিশ্বাত্মক অথবা বিশ্বোত্তীর্ণ

এই শক্তির আবেশে আমাদের মধ্যে খুলে যায় তখন জ্যোতির দুয়ার, নেমে আসে জ্ঞান কর্ম বীর্য ও সিদ্ধির বিপুল প্লাবন—যাকে কিছুতেই নিজের স্বায়ত্ত স্পন্দ বলে ভাবতে পারি না। অনুভব করি, এ সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমদেবতার উল্লাস—আমরা শুধু তার আধার বা নিমিত্ত মাত্র। অচলস্থিতির দুটি বিভাবেই আধারে এই সিদ্ধির অবতরণ হয়—কেননা উভয়ক্ষেত্রে ব্যষ্টি-চেতনা অবিদ্যার সংকীর্ণবৃত্তিকে পরিহার ক'রে নিজেকে মেলে ধরে পরা স্থিতি অথবা পরা কৃতির দিকে। শেষোক্ত পন্থায় শক্তির উৎসমুখ খুলে যায়, আধারে নেমে আসে জ্ঞান ও কর্মের উচ্ছল প্লাবন; অতএব তাকে বলি তপের বিভূতি। কিন্তু প্রথমোক্ত পন্থায় অর্থাৎ পরা স্থিতির দিকে আত্মো-ন্মীলনের ফলে উদ্বুদ্ধ হয় জ্ঞান ও অভিনিবিষ্ট একাগ্রভাবনার সামর্থ্য, অথবা চেতনার সূচীমুখ বিদ্ধ হয় নিস্পন্দ আত্মোপলব্ধির নিবিড়তায়। কিন্তু এই আত্মধৃতিতেও তো শক্তির পরিচয় রয়েছে, অতএব এও তো তপঃ। সুতরাং চিৎশক্তির একাগ্র অভিনিবেশকে তপঃ বললে, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ চৈতন্যের ধর্ম বলে তাকে মানতে হবে। এও স্বীকার করতে হবে, আমাদের স্থাণুত্বেরও মূলে এক অদৃশ্য তপঃশক্তির অধিষ্ঠান বা প্রবর্তনা রয়েছে। চিৎশক্তির তপোবীর্য নিখিল সৃষ্টি কৃতি ও স্ফুরত্তার যাবৎস্থায়ী আধার; আবার এই তপোবীর্য সমস্ত স্থাণুত্বের অন্তর্গূঢ় ভর্তা—অটল টলছে না এরই আবেশে। এমন-কি অক্ষরস্বভাবের চরম নিষ্ক্রিয়াতে, অন্তহীন স্তব্ধতায় বা শাশ্বত নৈঃশব্দ্যেও রয়েছে এই তপোবীর্যেরই শিলাঘন অভিনিবেশ।

কিন্তু আপত্তি হবে: তাহলেও শেষপর্যন্ত দুটি বিভাবকে তো ভিন্নই মানতে হয়, কেননা দুয়ের ফল তো দেখছি পৃথক। নির্গুণ-ব্রহ্মে সমাপত্তির ফলে ঘটে ভবের নিবৃত্তি, আর সগুণে সমাপত্তির ফলে চলে ভবের অনুবৃত্তি। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, ব্যষ্টিচেতনা একভূমি হতে আরেক ভূমিতে উত্তীর্ণ হবার সময়েই তার মধ্যে এই পার্থক্যের বোধ জাগে। বিশ্বে অনুস্যূত ব্রহ্ম-চৈতন্যের অনুভবে তাঁকে জানি বিশ্বক্রিয়ার মূলাধাররূপে; আবার বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যকে অনুভব করি বিশ্বক্রিয়া হতে প্রত্যাহৃত শক্তির ব্যতিরেকমুখী একটা সংবেগরূপে। কিন্তু বিশ্বক্রিয়ায় সন্ধিনী-শক্তির বিলাস যদি তপো-বীর্যের বিভূতি হয়, তাহলে তপোবীর্য দ্বারা সন্ধিনী-শক্তির বিশ্ববিমুখ প্রত্যা-হারও সাধিত হয়। ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ চিদ্ভাব পরস্পরবিরোধী ও খাপ-ছাড়া দুটি আলাদা তত্ত্ব নয়। একই চৈতন্য, একই শক্তি তারা—অখণ্ডসত্তার এক কোটিতে যেমন রয়েছে আত্মসংহরণের স্তব্ধতায় নিবিষ্ট, তেমনি তার আরেক কোটিতে আত্মোচ্ছলন ও আত্মোন্মীলনের পরিস্পন্দে হচ্ছে উৎসারিত। এ যেন স্তব্ধ জলাশয় হতে বয়ে চলেছে বহুমুখী প্রণালিকার চঞ্চল স্রোত।

বাস্তবিক প্রত্যেক কর্মস্পন্দনের পিছনে আছে সত্তার শান্তবীর্যের এক অচল-প্রতিষ্ঠা—কর্মপ্রবাহের সে-ই উৎস ও ধারক। এমন-কি শেষপর্যন্ত কর্মের অন্তরালে থেকেও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অবিবিক্ত না হয়েই সে হয় কর্মের নিয়ন্তা। অস্পন্দ সত্তাই স্পন্দিত হয় কর্মে, কিন্তু কর্মের মধ্যে নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দিয়ে একেবারে সে একাকার হয়ে যায় না। কেননা কর্ম যত বৃহৎ হ'ক, তার প্রবাহ উৎসারিত হয় যে-উৎস হতে, তাকে সে কোনমতেই সম্পূর্ণ ফুরিয়ে ফেলতে পারে না। শক্তির কোনও প্রকাশই শক্তিমানকে নিঃশেষ করতে পারে না—অব্যক্ত শক্তির একটা বিপুল সঞ্চয় থেকেই যায় তার মধ্যে। কর্মস্পন্দন হতে নিজেকে সংহৃত ক'রে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে যখন নিজের কর্মধারা লক্ষ্য করি, তখনও দেখি, যে-কোনও কর্ম কি কর্মসমষ্টির পিছনে আছে আমাদের সমগ্রসত্তার একটা আবেশ। অখণ্ড স্বরূপ-স্থিতির বিশ্রান্তিতে সে যেমন নির্বিকার, তেমনি আবার শক্তির সীমিত বিচ্ছুরণে চঞ্চল। কিন্তু তার নির্বিকারত্ব সামর্থ্যহীন জড়ত্ব মাত্র নয়—বরং তাকে বলতে পারি আত্মসংহৃত শক্তির উদ্যত স্থাণুত্ব। এই ভাবটি আরও বৃহৎ হয়ে ফুটে উঠবে আনন্ত্যের চেতনাতেও। কেননা, যেমন নৈঃশব্দ্যের নিত্যস্থিতিতে, তেমনি বিসৃষ্টির উৎসারণেও অন্তহীন অমেয় তাঁর বীর্যের প্রকাশ।

সব-কিছু নিঃসৃত হল যে-স্তব্ধতা হতে, সে কি নিরুপাধিক, না আত্ম-সংহরণের ভূমিকায় পরিদৃশ্যমান কর্মস্পন্দের দ্বারা বিশিষ্ট—এ-প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট, নির্গুণ আর সগুণ ব্রহ্মে ভেদের কল্পনা প্রাকৃতমনের পক্ষে সপ্রয়োজন হলেও আসলে আছেন একই ব্রহ্ম—দুটি ব্রহ্ম নয়। এক পরমার্থসৎই তপঃশক্তির সংহরণে যেমন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তেমনি তপঃশক্তির উচ্ছলনে তিনিই আবার সগুণ ও সক্রিয়। কর্মস্পন্দ বা বিসৃষ্টির প্রয়োজনে এ যেন একই সত্তার দুটি মেরু, অথবা শক্তির একটা দ্বিদল প্রকাশ। স্তব্ধতা হতে উৎসারিত কর্মস্পন্দ একটা কুণ্ডলাবর্ত রচনা করে স্তব্ধতার বুকে ফিরে যায়—আবার এক নূতন আবর্তে উৎসারিত হবার জন্যে। ব্রহ্মের নির্গুণভাবে প্রকাশ পায় তাঁর তপঃশক্তির স্ববিমর্শময় স্তব্ধতা অর্থাৎ নিস্পন্দ বীর্যের আত্মসমাহিত একাগ্রভাবনা। আবার তাঁর সগুণভাবে ফুটে ওঠে সেই তপঃশক্তিরই উচ্ছলন—স্তব্ধতার গভীর সঞ্চয় হতে উৎসারিত করে চলে সে লক্ষকোটি কর্মতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেলন। অথচ প্রত্যেকটি তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত গতিতেও অনুবিদ্ধ হয়ে আছে তার একান্ত অভিনিবেশ এবং তার প্রবেগে ঝলকে-ঝলকে তাহতে বিসৃষ্টি হচ্ছে সত্তার সঙ্গোপন সত্য ও নিরুদ্ধ সামর্থ্য। এই উচ্ছলনেও শক্তির একাগ্র-ভাবনা আছে—কিন্তু সে-ভাবনা বহুমুখী বলে আমরা তাকে মনে করি পরি-

কীর্ণতা। বাস্তবিক শক্তি সেখানে দল মেলে, ছড়িয়ে পড়ে না : ব্রহ্মের যে-শক্তিবিক্ষেপ, তা আত্মবহির্ভূত মহাশূন্যের অবাস্তবতায় হারা হবার জন্য নয়। আত্মসত্তার অন্তহীন পরিসরে তাঁর শক্তির লীলায়ন চলে—অফুরন্ত রূপান্তর ও পরিণামেও তার বীর্য সংক্ষিপ্ত কি ঊনীকৃত হয় না। অতএব নির্গুণস্থিতিকে বলি শক্তির বিপুল সংহরণ—ব্রহ্মের তপঃ সেখানে বিচিত্র স্পন্দলীলা এবং রূপায়ণের অধিষ্ঠান ও প্রবর্তক। তাঁর সগুণভাবেও শক্তির সংহরণ আছে, কিন্তু তপঃশক্তির অভিনিবেশ সেখানে স্পন্দে এবং পরিণামে। যেমন জীবে, তেমনি শিবে—শক্তির দুটি বিভাবই অন্যোন্যাপেক্ষ। তারা এক অখন্ডসন্মাত্রের কর্মস্পন্দের দুটি মেরুরূপে যুগপৎ অবিনাভূত হয়ে আছে।

পরমার্থসৎকে তাহলে অচলস্থিতির স্তব্ধতা বলতে পারি না যেমন, তেমনি তাঁকে বলতে পারি না চলৎসত্তার শাশ্বত স্পন্দ। অথবা কালের বুকে পর্যায়ক্রমে এ-দুটির আবর্তনও তিনি নন। বস্তুত দুটির কোনটিকেই ব্রহ্মের একমাত্র অবিকল্পিত তত্ত্বভাব বলা চলে না। আবার দুটি বিভাবের মাঝে বিরোধের কথা তখনই ওঠে, যখন ব্রহ্মচৈতন্যের বৃত্তির দিক থেকে তাদের বিচার করি। তাঁর সন্ধিনী-শক্তির চিন্ময় মহাবিন্দুকে বিশ্বস্পন্দে বিচ্ছুরিত দেখি যখন, তখনই বলি ব্রহ্ম সক্রিয়, জঙ্গম। আবার সেই মহাবিন্দুকেই যখন দেখি স্পন্দ হতে নিবৃত্ত হয়ে চিদ্ঘন স্তব্ধতায় যুগপৎ সংহৃত, তখন বলি ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, স্থাণু। এমনি করে একই ব্রহ্ম যুগপৎ সগুণ ও নির্গুণ, ক্ষর ও অক্ষর; এ নইলে ওইসব সংজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। বস্তুত ক্ষর এবং অক্ষর দুটি স্ব-তন্ত্র তত্ত্ব নয়—তারা একই তত্ত্বের অন্যোন্যাপেক্ষ দুটি বিভাব মাত্র। সাধারণত জীবের প্রবৃত্তিদশা ও নিবৃত্তিদশার মধ্যেও আমরা এমনিতর ভেদের কল্পনা করি। ভাবি, প্রবৃত্তিতে জীব অবিদ্যাচ্ছন্ন—যে-নিবৃত্তিভাব তার সত্য স্বরূপ, তার কোনও খবর তখন সে রাখে না। কিন্তু নিবৃত্তির চরমস্থিতিতে তার প্রবৃত্তির পূর্ণবিস্মৃতি ঘটে, কেননা প্রবৃত্তি ছিল তার আভাসসত্তা শুধু। নিদ্রা ও জাগরণের মত দুটি দশাকে আমরা পর্যায়ক্রমে অনুভব করি বলেই এমনটি হয়। জাগ্রতে আমরা নিদ্রাকে যেমন ভুলি, তেমনি নিদ্রাতে ভুলি জাগ্রৎকে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে নিদ্রা-জাগরণের এই আবর্তন ঘটে আমাদের সমগ্রসত্তায় নয়—তার একটি অংশে শুধু। অথচ ভুল করে ওই একদেশকেই আমরা ভাবি সত্তার সবখানি। অন্তরের গভীরে তলিয়ে গেলে অনুভব করি এক বৃহত্তর সত্তা নিত্যজাগ্রত রয়েছে আমাদের মধ্যে—কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। এমন-কি আমাদের বহিশ্চর খন্ডিতচেতনার কাছে যে-ভূমি মূঢ়, তার মধ্যে যা-কিছু ঘটে তাও সে জানে। নিদ্রা কি জাগরণ দ্বারা কোনকালেই তার সংবিৎ সীমিত হয় না। যে-ব্রহ্ম সর্বজীবের অখন্ড স্বরূপসত্তা, তাঁরও সঙ্গে আমাদের এমনি সম্পর্ক। অবিদ্যার ভূমিতে নিজেকে

আমরা একীভূত করেছি মনোময় অথবা চিন্ময়-মনোময় খণ্ডিতচেতনার সঙ্গে। গতির আবর্তে প'ড়ে তার স্থাণুভাবকে এ-চেতনা ভুলে যায়। আবার এই চেতনাতেই গতির সংবিৎ হারিয়ে যায় যখন, তখন স্থাণুত্বে সমাহিত হয়ে তার কর্তৃভাব হতে সে বিবিক্ত হয়ে পড়ে। পরিপূর্ণ স্থাণুত্বের অচলপ্রতিষ্ঠায় মন তখন হয় নিঃসুপ্ত বা সমাহিত—অথবা চিন্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মুক্তি পায়। কর্মচঞ্চল খণ্ডিতসত্তার মধ্যে যে অবিদ্যার ঘোর ঘনিয়ে আসে, এই নৈঃশব্দ্য তার ক্লিষ্টতা হতে নিষ্কৃতি আনে। কিন্তু সেইসঙ্গে সে জ্যোতির্ময় পাত্রদ্বারা অপাবৃত করে ব্রহ্মের ক্ষরসত্যের মুখ, জ্যোতির্ময় বিবেকদ্বারা নিজেকে তাথেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। সাধকের চিন্ময় মনশ্চেতনা তখন আত্মসমাহিত থাকে অবিচল নৈঃশব্দ্যের স্বরূপস্থিতিতে; এবং তার ফলে—হয় কর্তৃচেতনার সামর্থ্য তার লুপ্ত হয়, নয়তো কর্মের প্রতি জন্মায় বিরাগ। এই অশব্দযোগ ব্রাহ্মী স্থিতির পথে অভিযাত্রী সাধকের পক্ষে বিশ্রামের একটা বিশেষ ভূমি। কিন্তু এর চাইতে মহত্তর ভূমি আছে, যেখানে আমাদের অখণ্ডসত্তার সম্যক্ সার্থকতা ঘটে—পুরুষের ক্ষর ও অক্ষর দুটি স্বভাবেরই যুগপৎ প্রমুক্তিতে। যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ভর্তা, নৈঃশব্দ্য এবং গুণলীলা উভয়ের দ্বারা অনুপহিত যিনি, সেই তৎস্বরূপে অবগাহন ক'রে তখনই সাধকের পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

কারণ একথা সত্য নয় যে, ব্রহ্ম একবার নিস্পন্দ স্থিতি হতে নেমে আসছেন স্পন্দের দোলনে, আবার তাঁর শক্তিস্পন্দ হতে নিবৃত্ত হয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন নিস্পন্দ স্থিতিতে। এই যদি অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ হত, তাহলে বিশ্বের স্থিতিকালে নির্গুণব্রহ্মের সত্তা অসম্ভাবিত হত—শুধু ক্রিয়াশক্তি ছাড়া কোথাও কিছুই থাকত না। আবার বিশ্বের প্রলয়ে সগুণব্রহ্মেরও প্রলয় ঘটত, অক্ষর নৈঃশব্দ্যের পরমনিবৃত্তিই হত সত্তার স্বরূপ। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। নিখিল বিশ্বস্পন্দে, তার অভিনিবিষ্ট গতির বহুধাবৈচিত্র্যে, আমরা যে অনুভব করছি এক শাশ্বত নিস্পন্দতা ও আত্মনিবিষ্ট প্রশান্তির আবেশ ও বিধৃতি। এ কি সম্ভব হত, যদি স্পন্দেরও অন্তরে অন্তর্যামী ভর্তারূপে স্তব্ধতার অভিনিবেশ না থাকত? পূর্ণব্রহ্মে একই সময়ে ক্ষর- ও অক্ষর-ভাব দুটিই রয়েছে—জাগ্রৎ আর সুপ্তির মত দুয়ের মাঝে পর্যায়ের কোনও দোলন নাই। শুধু আমাদের আধারের একদেশে আছে প্রবৃত্তির এমনতর একটা আবর্তন; তার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে আমরাই দুলতে থাকি অবিদ্যার এক কোটি হতে আরেক কোটিতে। কিন্তু আমাদের অখণ্ডসত্তার মধ্যে তো স্বগতবিরোধের এই দ্বন্দ্ব নাই। তাই অক্ষরস্বভাবকে পেতে গিয়ে ক্ষরস্বভাবের সংবিৎকে তার মুছে ফেলতে হয় না। অবিদ্যাসঙ্কুচিত খণ্ডিতসত্তার কুণ্ঠাকে পরিহার করে আমরা যখন প্রকৃতি-পুরুষের সম্যক-

বিজ্ঞান ও অখণ্ডপ্রমুক্তির চেতনায় ফিরে যাই, তখন ক্ষরভাব ও অক্ষরভাবের যৌগপদ্য আমাদেরও আয়ত্ত হয়। তার ফলে বিশ্বচেতনার এই দুটি কোটিকে অনায়াসে আমরা ছাড়িয়ে যাই—প্রকৃতির সংযোগে অথবা বিয়োগে প্রকটিত এই দুটি আত্মবিভূতির কোনটিই আর তখন একান্তভাবে আমাদের বাঁধে না।

গীতায় আছে, 'পুরুষোত্তম ক্ষরের ওপারে এবং অক্ষর হতেও উত্তম'; ক্ষর ও অক্ষরের সমবায়েও তাঁর পূর্ণ পরিচয় মেলে না। তাঁর মধ্যে ক্ষরভাব ও অক্ষরভাব যুগপৎ দুটিই রয়েছে—একথার এমন অর্থ নয় যে, একপাদ ক্ষর ও ত্রিপাদ অক্ষরের দুটি ভগ্নাংশ জুড়ে তাঁর অভঙ্গ সত্তা গড়ে তোলা হয়েছে। কেননা তাহলে ব্রহ্মকে বলতে হয় অবিদ্যার সমষ্টি : তাঁর অক্ষর ত্রিপাদ কেবল যে ক্ষরপাদের প্রতি উদাসীন তা-ই নয়, তার চলনেরও কোনও খবর সে রাখে না। আবার তেমনি তাঁর ক্ষরভাবও অক্ষরভাবকে জানে না, কেননা ক্ষরত্ব হতে নিবৃত্ত না হয়ে অক্ষরসমাপত্তিও তার সম্ভব হয় না।...কল্পনা করতে পারি, দুটি ভগ্নাংশের সমষ্টি হয়েও পূর্ণব্রহ্ম উভয়ের অতীত তটস্থ ও বিবিক্ত একটা-কিছু : তাঁর সত্তার দুটি কোঠাতেই চলছে এক অনির্বচনীয় মায়ার লীলা। আপন ঝোঁকে ক্ষরের জগতে সে যা-খুশি-তাই করছে, অথবা কর্ম হতে ছুটি নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে আছে অক্ষরস্থিতিতে—ব্রহ্ম তার কিছুই জানেন না, বা সে-সম্পর্কে কোনও দায়ও তাঁর নাই।...কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থসৎ হলে তাঁর সগুণ নির্গুণ দুটি ভাবকেই তিনি জানেন। কিন্তু দুটির কোনটিই তাঁর অনুত্তর পরস্থিতি নয়—অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মী হলেও তারা তাঁর বিরাট চৈতন্যেরই অন্যোন্যাপূরক দুটি বিভাব। শাশ্বত স্তব্ধতায় সমাহিত হয়ে ব্রহ্ম নিজের ক্ষরস্বভাবের লীলা জানছেন না—তাঁর এমন বিবিক্তস্থিতি কোনমতেই সত্য হতে পারে না। বরং ক্ষরাতীত বলেই আপন স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় তিনি তাঁর ক্ষরভাবেরও আধার—তাকে ধরে আছেন অক্ষোভ্য প্রশান্তির শাশ্বত বীর্যে, আত্মসমাহিত তপস্যার নিত্যস্থিতি হতেই সঞ্চারিত করছেন তার মধ্যে প্রবর্তনার সংবেগ। আবার ক্ষরস্বভাব ব্রহ্ম অক্ষর-স্থিতি হতে বিবিক্ত হয়ে তার কোন খবর জানেন না—একথাও সত্য হতে পারে না। কারণ নিত্য সর্বগত ব্রহ্ম নিশ্চয় তাঁর ক্ষরলীলারও ভর্তা, তার 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' হয়ে আপন প্রভাবে কবলিত করে আছেন তাকে—অথচ শক্তির প্রচণ্ডতম আবর্তের মধ্যেও শাশ্বত প্রশান্তিতে স্তব্ধ অবন্ধন ও আনন্দময় হয়ে আছেন। বস্তুত নির্গুণস্থিতিতে হ'ক বা গুণলীলাতে হ'ক, তাঁর অনুত্তর পরমার্থসত্তার সংবিৎ দুটিতেই নিত্যস্ফূর্ত। কেননা, তাঁর এই দুটি বিভূতির যে বীর্য ও সার্থকতা, তার গোপন উৎস আছে ওই অনুত্তরপদের স্বমহিমার বীর্যে। আমাদের অনুভবে তারা যে বিবিক্ত ও সঙ্গতিহীন হয়ে দেখা দেয়, তার কারণ একান্তভাবনা দিয়ে আমরা তাঁর একটি বিভাবকেই

আঁকড়ে ধরি এবং এই ঐকান্তিকতার ফলে পূর্ণব্রহ্মের অখণ্ড আবেশের প্রসাদ হতে নিজেদের বঞ্চিত করি।

আরেকদিক থেকে বিচার ক'রে পূর্বেও বলেছি এবং বর্তমান আলোচনা হতেও এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ছে যে, পরব্রহ্ম বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কিছুতেই অবিদ্যার আশ্রয় কিংবা তার বিভজ্যবৃত্ততার প্রবর্তক বলা চলে না। অবিদ্যা আমাদের অখণ্ডসত্তার একটা একদেশী বৃত্তি মাত্র। অথচ আমরা তাকেই মনে করছি আমাদের সবখানি—যেমন না কি দেহের মধ্যে থেকে সুপ্তি-জাগ্রতে দোলায়মান বহিশ্চর খণ্ডচেতনাকেই ভাবছি আমাদের স্বরূপ। অখণ্ডের সবটুকু না নিয়ে শুধু-যে তার একটি অংশের সঙ্গে নিজের অবিবেক ঘটানো—এই হল অবিদ্যার উপাদানকারণ। অতএব ব্রহ্মের পরমার্থভাবে অথবা তাঁর অখণ্ড পূর্ণতার মধ্যে অবিদ্যার স্বভাবস্থিতি যদি অসম্ভব হয়, তাহলে বিশ্বে তত্ত্বত মূলা অবিদ্যা বলেও কিছু থাকতে পারে না। মায়াকে যদি শাশ্বত ব্রহ্মচৈতন্যের নিত্যবিভূতি বলি, তাহলে তাকে অবিদ্যা কিংবা তার সগোত্রই-বা বলি কি করে? বস্তুত মায়া আত্মবিদ্যা ও সর্ববিদ্যার স্বরূপশক্তি এবং যুগপৎ সে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক—এই কথাই তখন মানতে হয়। সে-মায়াতে অবিদ্যার লীলা একটা গৌণবিভূতি মাত্র, বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে তার খণ্ডিত ও আপেক্ষিক সত্তা পরে দেখা দিয়েছে—মনে হয় এই যুক্তিই সঙ্গত।...তাহলে জীবের বহুত্বের সঙ্গে কি অবিদ্যার কোনও স্বারসিক সম্বন্ধ আছে? ব্রহ্ম যখন নিজেকে বহুধা বিভাবিত দেখেন, তখনই কি অবিদ্যার আবির্ভাব হয়? ব্যষ্টিজীবের একটা সঙ্কলনই কি তাঁর বহুবিভাবনার তত্ত্ব? প্রত্যেক জীব স্বভাবতই সমূহের একটি বিবিক্ত অংশ মাত্র, কারও চেতনার সঙ্গে কারও চেতনার যোগ নাই—তাই অপরকে বহিশ্চর ও অনাত্মীয় সত্তা বলে জানা ছাড়া তার আর-কোনও উপায় নাই। দেহের সঙ্গে দেহের অথবা মনের সঙ্গে মনের যোগেই জীবের সকল আত্মীয়তা পর্যবসিত হয়, তার চাইতে গভীর কোনও ঐক্যভাবনার সামর্থ্যও তার নাই।—এই কি ব্রহ্মের বহুভাবনার পরিচয়?...কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এ-অনুভব চেতনার সবচাইতে বাইরের স্তরের নিশানা মাত্র—যেখানে দেহ-প্রাণ-মন সবারই বৃত্তি বহির্মুখ। কিন্তু এর চাইতে সূক্ষ্ম গভীর ও বৃহৎ চেতনার বৃত্তিও এই আধারে আছে। অন্তরাবৃত্ত হয়ে তার মধ্যে যত তলিয়ে যাই, ততই দেখি চেতনায়-চেতনায় বিচ্ছেদের প্রাচীর ক্রমেই ফিকা হয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে অবিদ্যার আবরণ খসে গিয়ে অভেদের স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিতে বিশ্বভুবন প্লাবিত হয়ে গেছে!

মহাপ্রকৃতি আত্ম-অবিদ্যার অন্ধতমিস্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আবার সেই অতলগহন হতে জীবচেতনার খদ্যোতবিন্দুতে শুরু হয়েছে তার জ্যোতি-রয়ণের অভিযান। বহুধাপরিকীর্ণ তার চেতনা—খণ্ডে-খণ্ডে অন্তহীন

দ্বন্দ্বের তুমুলতায় বিক্ষুব্ধ; তার মধ্যে ঐক্যের ভাবনাকে সার্থক করতে হবে ওই খণ্ডিত জীবচেতনাকেই আশ্রয় করে। তার উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তির আদি-বিন্দু হল দেহ—যার মধ্যে আপাতভেদের প্রতীতি সবচাইতে উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। দেহের সঙ্গে দেহের যোগাযোগে বাহ্যসাধন একমাত্র অবলম্বন। সেখানে বহিঃসত্তার ব্যবধানকে মেনে চলতেই হয়। দেহের মধ্যে দেহের অনুপ্রবেশ সম্ভব—অনুবিদ্ধ দেহকে বিদীর্ণ করে, অথবা প্রাক্‌সিদ্ধ বিদারণজনিত কোনও অবকাশকে আশ্রয় করে। দেহের সঙ্গে দেহের আত্যন্তিক মিলন ঘটে অবয়বের বিশ্লেষণ ও গ্রসন দ্বারা। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কবলিত ও জীর্ণ করার ফলে পরস্পরের আত্তীকরণ ঘটে, অথবা আত্মহারা সংমিশ্রণে উভয় পক্ষের প্রলয় ঘটলে তবে মিলন সম্পূর্ণ হয়। মন যখন দেহের সঙ্গে অবিবিক্ত হয়, তখন দেহের সঙ্কুচিত বৃত্তিতে তারও স্বাচ্ছন্দ্য পীড়িত হয়। নইলে দেহের চাইতে সূক্ষ্ম বলে দুটি মন পরস্পরকে আহত বা বিভক্ত না করেও পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে—এমন-কি পরস্পরকে ক্ষুণ্ণ না করে মনোধাতুর অন্যোন্যবিনিময়, অথবা একটি মনের মধ্যে আরেকটি মনের অন্তর্ভাবও অসম্ভব নয়। তবু প্রত্যেক মনের মধ্যে অন্যাবিবিক্ত একটা স্বকীয়তা আছে, এবং তাকে ধরেই যে সে আপন স্বাতন্ত্র্য খুঁজবে—এও স্বাভাবিক। কিন্তু আত্মচেতনায় ফিরে গেলে পর মিলনের বাধা ধীরে-ধীরে কমে গিয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়। চৈতন্যের ভূমিতে আত্মার সঙ্গে আত্মার তাদাত্ম্যবোধ, আত্মার দ্বারা আত্মার পরিব্যাপ্তি এবং আত্মাতে আত্মার অনুপ্রবেশ—এমনিতর সর্বাত্মভাবের সকল লীলায়নই সম্ভব। আর এ-অনুভব সিদ্ধ হয় সুষুপ্তি বা নির্বাণের বিবিক্তবোধশূন্য অলক্ষণ কৈবল্যে নয়—যার মধ্যে দেহ প্রাণ ও জীবচৈতন্যের সকল ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত। সিদ্ধের পূর্ণ-জাগ্রৎ চেতনাতেই এই প্রতিবোধ জাগে, যা নিখিল ভেদবৈচিত্র্যের সাক্ষী ও রসিক হয়েই অনায়াসে তাদের ছাড়িয়ে যায়।

অতএব অবিদ্যা এবং তার বিভজ্যবৃত্ততার সঙ্কোচ জীববহুত্বের অনুত্তরণীয় স্বভাবধর্ম নয়, অথবা ব্রহ্মের বহুবিভাবনার ঐকান্তিক স্বরূপও নয়। ব্রহ্ম যেমন সগুণ ও নির্গুণভাবের অতীত, তেমনি একত্ব ও বহুত্বেরও ওপারে। আত্মস্বরূপে অবশ্য তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু সে-একত্ব আত্মসঙ্কোচের দ্বারা বহুবিভাবনার সামর্থ্য হতে তাঁকে নিবৃত্ত করে না—দেহ ও মনের বিভক্তবৃত্তি একত্বের মত। ব্রহ্মের একত্ব গণিতের সংখ্যৈকত্ব নয়, যার মধ্যে এক-শ'র ঠাঁই হয় না বলেই এক-শ'র চাইতে তাকে খাটো ভাবি। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যেমন এক-শ'র ঠাঁই আছে তেমনি এক-শ'র প্রত্যেকের মধ্যে আবার তিনি এক। আত্মস্বরূপে তিনি অদ্বিতীয়। তাই বহুর মধ্যে একমাত্র তিনিই আছেন এবং বহুও তাঁর মধ্যে আছে এক হয়ে। অর্থাৎ ব্রহ্মের চিদাত্মভাবের একত্বে

জড়িয়ে আছে তাঁর জীবাত্মভাবের বহুত্বসংবিৎ। আবার তাঁর বহুজীবরূপে আত্মভাবের চেতনায় অনুস্যূত হয়ে আছে সর্বজীবের তাদাত্ম্যভাবের অনুভব। প্রত্যেক জীবে অন্তর্যামী চিন্ময়পুরুষরূপে তিনি 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' রয়েছেন—আপন একত্বের অপ্রচ্যুত সংবিৎ নিয়ে। আবার তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান জীবাত্মা যেমন অন্বয়স্বরূপের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য অনুভব করে, তেমনি অনুভব করে সর্বাত্মভাবের উল্লাস। দেহাত্মবোধে সংকুচিত আমাদের বহিশ্চর চেতনা আজ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বিভক্তবৃত্তি প্রাণ ও বিভজ্যবৃত্ত মনের সঙ্গে নিজেকে ঘুলিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রতিবোধের দীপ্তিতে তার সংবিৎকেও উজ্জ্বল করে তোলা অসম্ভব নয়। সুতরাং বহুত্বভাবনাকে কোনমতেই অবিদ্যার অপরিহার্য প্রযোজক বলা চলে না।

পূর্বেই বলেছি, অবিদ্যার তরঙ্গ দেখা দেয় অনেক পরে—অবসর্পিণী ধারার শেষের দিকে, যখন মন তার চিন্ময় ও অতিমানস অধিষ্ঠান হতে বিবিক্ত। এই পার্থিবজীবনে তার চরম ঘোর ঘনিয়ে ওঠে, যখন বহুধাপরিকীর্ণ ব্যষ্টিচেতনা বিভজ্যবৃত্ত মনের সহায়ে মূর্তরূপে অধ্যস্ত হয়, কেননা একমাত্র মূর্তরূপকেই বলা চলে বিভাজনের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ অবলম্বন। কিন্তু মূর্তরূপের স্বরূপ কি ? এখানে তাকে দেখছি কুণ্ডলিত শক্তির একটা বিগ্রহরূপে—ক্রিয়ার অবিরাম আবর্তে রচিত ও বিধৃত সত্তার সে যেন একটা গ্রন্থি। সে যদি লোকোত্তর কোনও সত্য বা তত্ত্বের বিচ্ছুরণ বা বিভূতিও হয়, তবু এখানে তার মধ্যে স্থায়িত্ব বা নিত্যত্বের এতটুকু আভাস দেখতে পাই না। অখণ্ডরূপেও যেমন সে নিত্য নয়, তেমনি তার উপাদানভূত পরমাণুও নিত্য নয়—কেননা পরমাণুও শক্তিগ্রন্থি মাত্র। শক্তির অবিরাম কুণ্ডলনেই পরমাণুর আপাতস্থাণুত্ব দেখা দিয়েছে, সুতরাং কুণ্ডলিত শক্তিকে শিথিল করে পরমাণুর অবয়বের বিশরণও অসম্ভব নয়। রূপকে আশ্রয় করে শক্তিস্পন্দের যে একাগ্র তপঃ, তা-ই তাকে ধরে রেখেছে সত্তার বক্ষে এবং তা-ই হয়েছে বিভাজনের স্থূল অবলম্বন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, প্রকৃতির গুণলীলায় যা-কিছু ঘটছে, তারই মধ্যে আছে বিষয়কে আশ্রয় করে শক্তিস্পন্দের একটা একাগ্র তপঃ। অতএব অবিদ্যারও মূলে আছে আত্মসমাহিত একাগ্র তপেরই প্রবর্তনা—অর্থাৎ শক্তির একটা বিবিক্ত স্পন্দকে নিয়ে চিৎশক্তির স্বচ্ছন্দ লীলায়ন। আমাদের মধ্যে চিত্ত এই অবিদ্যার ক্ষেত্র। ব্যক্তিচেতনাকে আশ্রয় করে চিৎশক্তির যে-বিবিক্তস্পন্দ, তার সঙ্গে চিত্ত তদাত্মক হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, স্পন্দের প্রত্যেক বিবিক্ত পরিণামের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য ঘটে। এই বৃত্তিসারূপ্যই চেতনার চারদিকে গড়ে তোলে বিবিক্ত বোধের একটা প্রাচীর এবং তার ফলে চিত্ত যেমন তার সমগ্রসত্তার পরিচয় পায় না, তেমনি অপর শরীরী চেতনাকে বা বিশ্বচেতনাকে জানাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়। অতএব

চিত্তের এই ঐকান্তিক বৃত্তির মধ্যেই অবিদ্যার রহস্য খুঁজতে হবে—যে-অবিদ্যার আপাতিক ছায়ায় ঢেকে আছে মনোময় শরীরী পুরুষের চেতনা, জড়প্রকৃতির আপাত-অচিতিতে ফুটেছে যার বিপুল অমানিশার করাল মায়া। এই-যে সর্বনিবেশন সর্ববিভাজন সর্ববিস্মরণ তপঃসমাধি, বিশ্বের এই অব্যক্ত প্রাতি-হার্যের স্বরূপ কি—এখন তা-ই আমাদের প্রশ্ন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চিতিশক্তির ঐকান্তিক অভিনিবেশ ও অবিদ্যা

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥

ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১

সত্য এবং ঋত জাত হল অভীদ্ধ তপঃ হতে; তাহতে জাত হল রাত্রি এবং রাত্রি হতে অর্ণ-বান্ সমুদ্র।

—ঋগ্বেদ (১০।১৯০।১)

ব্রহ্মের বিশ্বভাবনায় ফুটে উঠছে একত্ব ও নানাত্বের অন্যোন্যসংবিৎ -এই তাঁর বিরাট-ভাবের তত্ত্ব। আবার স্বরূপত তিনি একত্ব এবং নানাত্ব উভয় উপাধির অতীত অথচ উভয়ের আধার ও সংবেত্তা—এই তাঁর তত্ত্বভাবের পরিচয়। অতএব এই তত্ত্বদর্শনের 'পরে দাঁড়িয়ে বলা চলে, চিতি-শক্তির একটা গৌণপরিণাম হতেই অবিদ্যার বিসৃষ্টি সম্ভব। অখণ্ডসত্তার খণ্ডিত জ্ঞান অথবা খণ্ডিত ক্রিয়ার 'পরে অভিনিবিষ্ট চেতনার যে-ঝোঁক সত্তার আর-বাকিটুকু ছেঁটে ফেলে তার সংবিৎ হতে, তাকেই বলি অবিদ্যা। এই অভি-নিবেশের ধরন অনেকরকম হতে পারে। কোথাও নানাত্বকে বাদ দিয়ে একত্ব আপনাতেই আপনি অভিনিবিষ্ট; কোথাও নানার অভিনিবেশ আত্মস্পন্দের বিশিষ্ট ধারার প্রতি—একত্বের সর্বগ্রাহী সংবিতের দিকে না তাকিয়ে; কোথাও-বা দেখি ব্যষ্টি জীবের নিবিষ্ট আত্মরতি নিজেকে জড়িয়ে—একত্ব ও নানাত্ব দুয়ের কথা ভুলে গিয়ে, কেননা তার বিবিক্ত প্রাকৃতচেতনায় ও-দুটি রয়েছে অপরোক্ষ-সংবিতের বাইরে। আবার কোথাও চিৎপরিণামের বিশিষ্ট কোনও ভূমিতে দেখা দেয় ঐকান্তিক অভিনিবেশের একটা সামান্যবিধি—যার মধ্যে উপরি-উক্ত তিনটি ধরনেরই সমাবেশ ঘটে। তখন দেখতে পাই বিবিক্ত চিতি-ক্রিয়ার একটা বিবিক্ত স্পন্দলীলা। কিন্তু তার আধার হয় প্রকৃতির গুণক্রিয়া—পৌরুষেয়বোধ নয়।

মনে হয় অবিদ্যাকে চিতিশক্তির এমনিতর ঐকান্তিক অভিনিবেশরূপে কল্পনা করাই যুক্তিসংগত, কেননা এ-সম্পর্কে অন্য-কোনও অভ্যুপগম যথেষ্ট প্রামাণিক কিংবা ব্যাপক নয়। অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে অবিদ্যার জনকরূপে কল্পিত হতে পারেন না, কারণ তাঁর অখণ্ড পূর্ণত্বের তাৎপর্যই হল পূর্ণপ্রজ্ঞা বা সর্বসংবিৎ। যিনি অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ, বহুকে কোনমতেই তাঁর অখণ্ডচিন্ময় সত্তার বাইরে ফেলে রাখা যায়

না, কেননা তাতে বহুত্বের সত্তা অসম্ভাবিত হয়। শুধু এইটুকু বলতে পারি, হয়তো বিশ্বলীলা হতে তটস্থ ব্রহ্ম আত্মচৈতন্যের কোনও লোকোত্তরভূমিতে সমাবিষ্ট থেকে জীবের মধ্যেও ওই তটস্থ-বৃত্তিকে সঞ্চারিত করতে পারেন। ...তেমনি বহুর অখণ্ডসমষ্টি অথবা প্রত্যেক ব্যষ্টিবিভূতিও যে সমষ্টি অন্বয়-তত্ত্বকে অথবা অপর ব্যষ্টিবিভূতিকে জানে না, তা নয়। কারণ বহুত্ব বলতে আমরা বুঝি, এক দিব্য-পুরুষেরই সর্বময় আবেশ। তার মধ্যে ব্যষ্টিভাবনা থাকলেও, অখণ্ড বিরাটচৈতন্যের সমাবেশহেতু নিখিলের সঙ্গে এক চিন্ময় তাদাত্ম্যভাবনাও রয়েছে এবং তার সঙ্গে সম্পুটিত হয়ে আছে অনুত্তরের অনাদিসদ্‌ভাবের একরসপ্রত্যয়। অতএব অবিদ্যা আত্মচৈতন্যের স্বভাবধর্ম তো নয়ই, এমন-কি জীবাত্মারও স্বভাব নয়। চিন্ময় প্রকৃতির বিশেষাভিমুখী প্রবৃত্তি যখন কর্মের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশবশত আত্মস্বরূপকে এবং আত্মশক্তির অখণ্ড পরিচয়কে ভুলে যায়, তখনই অবিদ্যার সূচনা হয়। সুতরাং অবিদ্যার বৃত্তিকে কোনমতেই অখণ্ডসত্তার অথবা অখণ্ড সন্ধিনী-শক্তির সমগ্র পরিণাম বলা চলে না। কেননা পূর্বেই বলেছি, সমগ্রতার পরিচয় পূর্ণ-প্রজ্ঞাতে—খণ্ডচেতনায় নয়। অতএব অবিদ্যা চিতিশক্তির একটা বহিশ্চর খণ্ডিত বৃত্তি মাত্র। ব্যাকৃতির বিশেষ-একটি ধারার প্রতি তার অভিনিবেশ। যা তার এলাকার বাইরে অথবা যার বৃত্তি পরিস্ফুট নয়, তাকে ভুলে থাকাই তার স্বভাব। অবিদ্যার কুহেলিকায় প্রকৃতি আত্মার প্রত্যয়কে স্বেচ্ছায় আবৃত করেছে, ভুলেছে সর্বময়কে। তাঁদের পাশ কাটিয়ে বা পিছনে রেখে সে এখন নিজেকে একান্তভাবে নিবিষ্ট রাখতে চায় সত্তার কোনও বহির্মুখ লীলায়নে।

অনন্ত সন্মাত্রে ও তাঁর অনন্ত সংবিতে তপঃশক্তি অবিনাভূত হয়ে আছে চিতিশক্তির নিরূঢ় বীর্যরূপে। এ যেন অনন্তসংবিতের আত্মনিরূঢ় কিংবা আত্মসংহৃত স্ববিমর্শ অথবা বিষয়বিমর্শ। কিন্তু সে-বিমর্শের বিষয় হয় সে নিজে, নয়তো তার সত্তার কোনও স্পন্দ বা বিভূতি। এই আত্মসমাধান যখন স্ব-গত বা স্বরূপনিষ্ঠ, তখন সে ধরে অবিকল্পিত স্ববিমর্শের রূপ—আত্ম-স্বরূপের মণিকোঠায় প্রত্যক্‌-বৃত্তির পূর্ণগ্রস্ত প্রবিলয়ে অথবা আত্মহারা আত্মনিমজ্জনে। আবার কখনও এই আত্মসমাধান সর্বগত, কিংবা সমগ্র-বহুত্বের অখণ্ডপ্রত্যয়ে উদ্ভাসিত, অথবা সমগ্রেরই কলায়-কলায় বহুভঙ্গিম অনুভবে বিলসিত। হয়তো কখনও তার মধ্যে আত্মসত্তার বা আত্মস্পন্দের একদেশের প্রতি বিবিক্ত একটা অভিনিবেশ দেখা দেয়—যেন একটি কেন্দ্রে বিদ্ধ হয়ে একাগ্রতার সূচীমুখ বৃত্তিতে অথবা আত্মসত্তার একটিমাত্র বহির্বৃত্ত বিভূতিতে সকল ভাবনা লীন হয়ে আছে। সবার আগে, স্ব-গত অভিনিবেশের এক প্রত্যন্তে আছে অতিচেতনার নৈঃশব্দ্য, আরেক প্রত্যন্তে অচিতির অসাড়তা। সর্বগত অভিনিবেশ তার পরে; তার মধ্যে আছে সৎ-চিৎ-আনন্দের

অখণ্ডসংবিৎ অথবা অতিমানসের সম্যক্‌সমাধি। তৃতীয় ধাপে আছে বহুধাবৃত্ত অভিনিবেশ অথবা অধিমানসের সংবর্তুল প্রত্যয়। আর চতুর্থ ধাপে বিবিক্ত অভিনিবেশ—অবিদ্যার যা বিশেষ ধর্ম। পরা সংবিতের অনুত্তর সম্যক্‌-প্রত্যয়ে চেতনার এই চারটি বিভাব বা শক্তিই সান্দ্র-সংহত হয়ে আছে—যেন এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পুরুষের অখণ্ডদৃষ্টিতে আত্মবিমর্শের সমকালেই ভাসছে সর্বতোবিলসিত এই আত্মবিভূতির অবিভক্ত প্রত্যয়।

এই অভিনিবেশ বা আত্মসমাধানের অর্থ যদি হয় বিষয়ীর আত্মনিরূঢ় স্ববিমর্শ অথবা বিষয়বিমর্শ, তাহলে এ যে চিৎসত্তার স্বভাবধর্ম—একথা স্বীকার করতেই হবে। কারণ অন্তহীন প্রসারণ অথবা বিকিরণ চৈতন্যের স্বধর্ম হলেও তার পীঠভূমিতে আছে চেতনার আত্মনিরূঢ় সর্বাধার স্বধার বিলাস। তার শক্তির আপাতিক বিক্ষেপ বস্তুত অপক্ষয় নয়—বিভিন্ন ব্যূহে শক্তির সমাবেশ মাত্র। আত্মনিরূঢ় অভিনিবেশ আধাররূপে তার পিছনে আছে বলেই তার বহির্বৃত্ত বিক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। অতএব আধারের একদেশে কি একটি স্পন্দবৃত্তিতে, অথবা একটি বিষয় কি বিষয়ীতে পরাক্‌-বৃত্ত বা প্রত্যক্‌-বৃত্ত চেতনার ঐকান্তিক অভিনিবেশে, চিৎস্বরূপের অখণ্ডসংবিৎ নিরাকৃত অথবা পরাবৃত্ত হয় না। কেননা, এ-অভিনিবেশ তাঁর তপঃশক্তিরই আত্মসংহরণের একটি ভঙ্গি মাত্র। ঐকান্তিক অভিনিবেশের পিছনে আবার অবশিষ্ট আত্মজ্ঞানের একটা সমূহন থাকে। তখন তার মধ্যে সর্বগ্রাহী সংবিৎ থাকতেও অভিনিবেশের কাজ চলে যেন মূঢ়ের মত। এ-অবস্থাকে নিশ্চয় অবিদ্যার ভূমি বা বৃত্তি বলা চলে না। কিন্তু অভিনিবেশের বৃত্তি দিয়ে চেতনা কখনও অন্যব্যাবৃত্তির একটা প্রাচীর খাড়া করে তার চারদিকে এবং শক্তিস্পন্দের একটিমাত্র ক্ষেত্রে বিভাগে বা আধারে আপনাকে অবরুদ্ধ রেখে নিজের মধ্যে শুধু তারই সংবিৎ জাগিয়ে রাখে, অথবা অপরকে জানে আত্মসত্তার বহির্ভূত বলে। তখনই জ্ঞানের মধ্যে দেখা দেয় একটা আত্মসঙ্কোচনী বৃত্তি, বিবিক্তজ্ঞানের আবির্ভাব যার পরিণাম; এবং চরমে তা-ই ধরে অর্থক্রিয়াকারী অবিদ্যার বিশিষ্ট রূপ।

আমরা মানুষ অর্থাৎ মনোময় জীব। আমাদের চেতনায় ঐকান্তিক অভিনিবেশ ফুটে ওঠে কি আকারে, তার পরিচয় নিতে গিয়ে অবিদ্যার স্বরূপ এবং তার ব্যাবহারিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে আসবে। একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল। সাধারণত মানুষ বলতে আমরা তার অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করি না। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের খাত বেয়ে চলেছে চেতনা ও শক্তির একটা আপাত-অবিচ্ছেদ প্রবাহ—তারই একটা সমাহারকে আমরা নাম দিয়েছি মানুষ। মনে হয়, এই শক্তিপুঞ্জই যেন মানুষের সব কাজ করে চলছে—সে-ই যেন তার মননের মন্তা, তার

ভাবের অনুভাবিতা। আসলে এই শক্তি চিতিশক্তির একটা ধারা—যা সম্প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়ে আছে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কর্মের কালাবচ্ছিন্ন প্রবাহে। কিন্তু আমরা জানি, এই শক্তিধারার পিছনে আছে চেতনার এক বিপুল সমুদ্র। ধারাকে সে চিনলেও ধারা তার কোনও খবর রাখে না, কারণ বহির্ব্যক্ত এই শক্তিধারা অদৃশ্য এক মহাশক্তির একদেশী একটা পরিণাম মাত্র। মানুষের অধিচেতন আত্মাই হল ওই সমুদ্র। তার মধ্যে আছে তার অতিচেতন অবচেতন অন্তশ্চেতন ও পরিচেতন সত্তার সমাবেশ এবং সকলকে জড়িয়ে তার জীবাত্মা বা চৈত্যসত্তা। আর বাইরের প্রাকৃত-মানুষটা হল ওই ধারা। তার মধ্যে অন্তর্গূঢ় সত্তার শক্তিস্পন্দ বা তপঃ অভিনিবিষ্ট হয়ে আছে চেতনার বহির্বাটিতে—বহিরঙ্গ কতগুলি কর্মের জঞ্জাল নিয়ে। কিন্তু তপঃশক্তির বেশীর ভাগই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চেতনার অন্তঃপুরে। চিৎসত্তার অস্পষ্ট গোধূলি-লোক হতে একটা ছায়াময় সংবিৎ হয়তো উঁকি দেয় মানুষের অন্তরে, কিন্তু বাইরে বহিরঙ্গ প্রবৃত্তির ঐকান্তিক অভিনিবেশে তার কোনও আভাসই জাগে না। এই তপঃশক্তি যে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞান, তা নয়। অন্তত তার অন্তঃপুরে বা চেতনার গভীরে, আমরা অজ্ঞান বলতে যা বুঝি, তার কোনও নিশানা নাই। কেবল বহিরঙ্গ কর্মের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশবশত তার বৃহত্তর আত্মস্বরূপকে যেন সে ভুলে আছে ওই বহির্মুখীনতারই প্রয়োজনে—এই হল তার অজ্ঞানের তাৎপর্য। অথচ সমস্ত কর্মের প্রকৃত কর্তা কিন্তু সত্তার অন্তঃসমুদ্র—তার বাহিধারা নয়। বহিরঙ্গ কর্মের উত্তালতা জেগেছে গভীর সমুদ্রের আলোড়ন হতে—চেতনার বহিরুচ্ছ্বাস হতে নয়। তরঙ্গচেতনা তরঙ্গের বাইরে কিছুই দেখছে না—ওই দোলনেই সে অভিনিবিষ্ট, ওই তার প্রাণ। অতএব নিজেকে সে তাদের কর্তা ভাবতে পারে—কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বস্তুত অন্তঃসমুদ্রই আত্মার স্বরূপ। অখণ্ড সংবিৎ-শক্তি ও অখণ্ড সন্ধিনী-শক্তির সে আধার, অতএব অবিদ্যার এতটুকু আভাসও তার মধ্যে নাই। এমন-কি তরঙ্গকেও স্বরূপত অজ্ঞান বলা চলে না, কেননা তারও মধ্যে ভুলে-যাওয়া সংবিতের একটা অন্তর্গূঢ় সঞ্চয় আছে, নইলে তার কৃতি কি স্থিতি দুইই অসম্ভব হত। কিন্তু তরঙ্গ আত্মবিস্মৃত—আপন দোলনে সে বিভোর হয়ে আছে। যতক্ষণ দোলন আছে, ততক্ষণ তার আবেশে সে আত্মহারা—তার বাইরে আর-কিছুর দিকে তাকাবার অবসরটুকুও তার নাই। অতএব স্বরূপনিষ্ঠ অনতিবর্তনীয় আত্ম-অবিদ্যা নয়, ব্যাবহারিক প্রয়োজনে উদ্ভূত সংকীর্ণ আত্মবিস্মৃতিই হল এই ঐকান্তিক অভিনিবেশের স্বরূপ। এই অভিনিবেশই অবিদ্যার প্রবর্তক।

জানি, মানুষ তপঃশক্তির একটা অবিচ্ছেদ প্রবাহ—কালকলনাময় চেতন শক্তিই তার আত্মপরিচয়। অতীত কর্মের সঞ্চিত প্রবেগকে সে মূর্ত করে

তোলে তার বর্তমানে এবং ওই অতীত ও বর্তমান কর্মের সমবায়ে গড়ে তোলে তার সিদ্ধ ভবিষ্যৎকে। অথচ সে তন্ময় হয়ে আছে শুধু বর্তমান মুহূর্তটিতে, ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরের তরঙ্গদোলায় ভেসে চলেছে তার জীবন। চেতনার এই বহিশ্চর বৃত্তিকে আঁকড়ে আছে বলেই তার অনাগতকে সে জানে না, অতীতেরও সবটুকু জানে না—শুধু স্মৃতির জালে যেটুকুকে বর্তমানের ডাঙায় টেনে তুলতে পারে সেইটুকু ছাড়া। আবার সে যে শুধু অতীতের মধ্যে বেঁচে আছে, তাও নয়। স্মৃতির জালে যাকে সে টেনে তোলে, সে তো অতীতের বাস্তব রূপ নয়—অতীতের সে প্রেতচ্ছায়া। যা মরে গেছে ফুরিয়ে গেছে নাস্তি হয়ে গেছে, স্মৃতিতে ভর করে তার একটা কল্পছবি তার সামনে অতীতের রূপ ধরে ভেসে ওঠে।...কিন্তু এসমস্তই অবিদ্যার বহিরঙ্গ বৃত্তির খেলা। আমাদের অন্তর্গূঢ় ঋত-চিৎ তো তার অতীতকে ভোলেনি। অতীত জীবন্ত হয়েই আছে তার মধ্যে—স্মৃতির গুহায় মুমূর্ষু হয়ে নয়। সে-অতীত জাগ্রত জীবন্ত স্পন্দমান ফলোন্মুখ। চিৎশক্তির নিগূঢ় প্রেরণায় মাঝে-মাঝে চেতনার উপরের কোঠায় সে ভেসে ওঠে স্মৃতির আকারে, অথবা সত্য বলতে অতীত কর্ম বা অতীত কারণের পরিণামরূপে। কর্মবাদের তত্ত্বও হল তা-ই। অন্তর্গূঢ় ঋত-চিতের ভবিষ্যদর্শনেরও সামর্থ্য আছে : এই আধারের গুহাগহনে রয়েছে প্রাতিভসংবিতের এক উদার ক্ষেত্র, সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রসারিত যার জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল—কালসংবিৎ কাল-দৃষ্টি ও কালবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম চেতনা নিয়ে। এই অন্তর্গহনে এমন একটা-কিছু আছে, যার সত্তা তিনটি কালে অবিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, আপন কুক্ষিগত করে রেখেছে কালের যত আপাতবিভাগ, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নিজের মধ্যে উদ্যত রেখেছে ফোটাবার অপেক্ষায়।...অতএব বর্তমানের মধ্যে এমনি করে তন্ময় হয়ে যাওয়া, এই হল ঐকান্তিক অভিনিবেশের দ্বিতীয় পর্ব, যা আধারে সঙ্কোচ ও জটিলতার জটকে আরও পাকিয়ে তোলে। কিন্তু তাতে কর্মের আপাতধারা সহজ ও সরল হয়, কেননা তার মধ্যে থাকে শুধু কালের অখণ্ড অনন্ত প্রবাহের ব্যঞ্জনাকে আচ্ছন্ন ক'রে বর্তমান ক্ষণের একটা বিশিষ্ট পরম্পরা।

তাই বহিশ্চর চেতনায়, ব্যাবহারিক জীবনের নিত্যস্পন্দনে মানুষ শুধু একটি-ক্ষণের মানুষ। একদিন ছিল অথচ আজ নাই—এমন অতীতের মানুষও সে নয় যেমন, তেমনি অনাগত দূরের মানুষও সে নয়। তার বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সেতুবন্ধন হয়েছে স্মৃতিতে, আর ভবিষ্যতের যোগ ঘটছে প্রত্যাশিতের কল্পনায়। তিনটি কালের মধ্যে অহংবোধের একটা অবিচ্ছেদ অনুস্যূতি রয়েছে, কিন্তু সে-বোধও মনগড়া একটা সূত্র মাত্র—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে গ্রাস ক'রে পরিব্যাপ্ত স্বরূপসত্তার একটা বাস্তব চেতনা তাকে

আশ্রয় করে নাই। তারও পিছনে আত্মভাবের একটা বোধি আছে। কিন্তু সে-বোধি অবিকল্পিত তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ের একটা আধারচেতনা মাত্র, তাই ব্যক্তি-ভাবের বিপরিণামে সে বিক্ষুব্ধ হয় না। আবার আত্মসত্তার বহিরঙ্গনে মানুষ শুধু ক্ষণিকের মানুষ—অন্তর্গূঢ় নিত্য মানুষ নয়। অথচ এই ক্ষণিকসত্তাতে তার অখণ্ডসত্তার সত্য কি সমগ্র পরিচয় নাই। এতে আছে শুধু বহিশ্চর জীবনের তাগিদে তারই গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত একটা ব্যাবহারিক সত্যের সংবেদন। অবশ্য এও সত্য—অবাস্তব নয়। সমগ্রসত্তার আংশিক প্রকাশের দিক দিয়ে তাকে যদি সত্য বলি, তাহলে অপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে বলব অবিদ্যা। আর এই অবিদ্যার অপ্রকাশস্বভাব ব্যাবহারিক সত্যকে শুধু সঙ্কু-চিত করে না—করে বিকৃত। তাইতে মানুষের সচেতন জীবনেও অনুভূত হয় অবিদ্যার অন্ধ প্ররোচনা। সে পথ চলে অর্ধসত্য অর্ধমিথ্যা খণ্ডিতবিজ্ঞানের নির্দেশ মেনে—আত্মার স্বরূপসত্যের অনুশাসনে নয়, কেননা সে-স্বরূপের সংবিৎ তার বিলুপ্ত। অথচ তার আত্মস্বরূপই অন্তর্যামিরূপে জীবনের হাল ধরে আছেন—প্রতিপদে তিনিই তার শাস্তা ও নিয়ন্তা। অতএব যে বাঁধা খাতে তার জীবনধারা বয়ে চলে, তাও বস্তুত অন্তর্গূঢ় বিদ্যাশক্তির নির্মিতি। এর মধ্যে বহিশ্চর অবিদ্যাশক্তি প্রয়োজনবশে একটা সীমার বেড়া খাড়া করে, জুটিয়ে আনে বর্তমান ক্ষণের উপযোগী নানা মালমসলা। তাইতে মানুষের চেতনায় ও কর্মে বর্তমানের রাঙন মায়ার ছাপ পড়ে যায়। এমনি করে, একই কারণে বর্তমান জীবনের নাম-রূপের সঙ্গে মানুষ নিজেকে ঘুলিয়ে ফেলে। তাই তার কাছে জন্মপূর্বের অতীত আর মরণোত্তর ভবিষ্যৎ দুই সমান অন্ধ-কার। অথচ সে যাকে ভোলে, তার অন্তর্গূঢ় অখণ্ডচেতনা কিন্তু তাকে ভোলে না। তার ধ্রুবা স্মৃতির গোপন ভাণ্ডারে সমস্তই সঞ্চিত থাকে নিত্যবর্তমানের স্ফুরন্ত সামর্থ্য নিয়ে।

প্রাকৃতচেতনায় ঐকান্তিক অভিনিবেশের একটা ব্যাবহারিক দিক আছে। তার প্রকাশ গৌণ এবং সাময়িক হলেও তার মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ ইশারা আছে। এক অর্থে বহিশ্চর মানুষকে বলা চলে ক্ষণজীবী। এই বর্তমান জীবনেই সে সংসারের রঙ্গমঞ্চে ক্ষণে-ক্ষণে একাধিক ভূমিকার অভিনয় করে চলেছে। একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সময় তার ঐকান্তিক অভিনিবেশ ওতেই তাকে তন্ময় করে, ক্ষণেকের জন্য নিজের আর সব-কিছু ভুলে গিয়ে একটি বিভাবকেই সে একান্ত মুখ্য করে তোলে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য সে হল যোদ্ধা, অভিনেতা, কবি, কি এমনতর একটা-কিছু। তার এই হবার মূলে আছে আধারে নিহিত সন্ধিনী-শক্তির একটা বিশিষ্ট প্রবৃত্তি—আছে তার তপঃ, তার অতীত হতে প্রচ্ছুরিত চিদ্‌বীর্যের প্রেতি এবং ক্রিয়া। এমনি করে ঐকান্তিক অভিনিবেশের কাছে অন্তত কিছুকালের জন্য নিজের একটা

দিককে সে যে ছেড়ে দিতে পারে, শুধু তা নয়। তার কর্মের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে সব ভুলে এই আত্মহারার মত বর্তমানের মধ্যে ডুবে যাবার 'পরেই। অথচ একথা স্পষ্ট যে, সাময়িক কর্মের মধ্যেও আমরা গোটা মানুষটার পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের পরিচয় পাই, শুধু তার বিশেষ-একটা বিভাবের নয়। যা সে করছে, যে-ধরনে করছে, চারিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ছে তার কর্মের 'পরে—সেসমস্তই তার স্বধর্মের প্রকাশ, তার বুদ্ধি প্রতিভা ও শিক্ষাদীক্ষার ফল। তার মধ্যে আছে অতীতের আশয় ও সংস্কার—শুধু এ-জন্মের নয়, আছে জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্মের বিপাক। আবার শুধু অতীতই-বা কেন—তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই, আছে তার পরিবেশের প্রভাব। এরা সবাই তার কর্মের নিয়ন্তা। বর্তমানের যোদ্ধা অভিনেতা বা কবির পাঠ তার আধারে নিহিত তপঃশক্তির একটা বিবিক্ত বিভূতি। তার সন্ধিনী-শক্তিই ব্যাহিত হয়ে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছে আত্মবীর্যের এই বিশিষ্ট প্রকাশে। তপঃশক্তির যে বিশেষ প্রবৃত্তি তার মধ্যে দেখা দিল, সে যেন ক্ষণেকের তরে আর সব-কিছু ভুলে গিয়ে ওই একটি কাজে তন্ময় হয়ে আপনাকে ঢেলে দিল। অথচ সত্য বলতে কিছুই তার হারায়নি—চেতনার পিছনে সবাই তারা সারাক্ষণ জাগ্রত এবং উদ্যত হয়ে আছে, আরব্ধ কর্মের 'পরে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে তাদের প্রভাব, অদৃশ্য তুলির টানে ফুটিয়ে তুলছে তারা বর্তমানের রূপ। তপঃশক্তির এই সঙ্কোচের সামর্থ্য দৈন্য বা দুর্বলতার পরিচয় নয়, বরং তাকে বলতে পারি চেতনার একটা মহাবীর্য। বর্তমানের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশহেতু মানুষের এই-যে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, মৌল আত্মবিস্মৃতি হতে তার ধরন কিন্তু আলাদা। কেননা এক্ষেত্রে মনের চারদিকে যে-ব্যবধানের প্রাচীরটা গড়ে ওঠে, তা খুব দৃঢ়ও নয়, স্থায়ীও নয়। ইচ্ছা করলেই মন যে-কোনও সময়ে খণ্ডিতবর্তমানের অভিনিবেশ ছেড়ে ফিরে যেতে পারে বৃহত্তর আত্মভাবের উদার পরিসরে। কিন্তু বাইরের মানুষটার পক্ষে ভিতরের মানুষটার নাগাল পাওয়া এত সহজ নয়। ইচ্ছামাত্র চেতনার অন্দরমহলে কেউ ঢুকতে পারে না। অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত উপায়ে মনের বিশেষ-কোনও অবস্থায় কখনও-কখনও মানুষ অন্দরের ছাড়পত্র পায় বটে, কিন্তু সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হলে চাই দীর্ঘকালের দুশ্চর তপস্যা—গভীরতা উত্তুঙ্গতা ও বিস্তার তিন দিকেই চাই আত্মবোধের ব্যাপ্তি। তবু তো সে অন্দরে ঢুকতে পারে। অতএব দুটি আত্মবিস্মৃতির মাঝে তফাতটাও আপাতিক মাত্র—তাত্ত্বিক নয়। বস্তুত উভয়ক্ষেত্রে আছে ঐকান্তিক অভিনিবেশের একইধরনের প্রবৃত্তি। কেননা, উভয়ক্ষেত্রে পুরুষ তন্ময় হচ্ছে তার বিশেষ-একটি বিভাব কর্ম কি শক্তির প্রকাশের মধ্যে—যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রের পরিবেশ ও কর্মধারা স্বতন্ত্র।

এই ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে পুরুষ যে কেবল বৃহত্তর আত্মভাবের বিশেষ-কোনও বিভাবনাতে তন্ময় হয়ে যায়, তা নয়। বর্তমান কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে তার পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতেও অভিনিবেশের আরেকটা দিক প্রকাশ পায়। অভিনেতা তীব্র অভিনিবেশবশত সে যে অভিনেতা একথা ভুলে গিয়ে পাত্রের সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে যায়। সে যে নিজেকে সত্যি-সত্যি রাম কি রাবণ ভাবে, তা নয়। কিন্তু ওই নামে সংকেতিত বিশিষ্ট চারিত্র বা কর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ তদাত্মক হয়ে তার আসল অভিনেতার রূপটি সে ভুলে যায়। তেমনি কবিও ভুলে যায় যে, সে মানুষ বা কবিকর্মের কর্তা : ক্ষণেকের তরে সে একটা ভাবোদ্দীপ্ত নৈর্ব্যক্তিক তপোবীর্য মাত্র—ভাষায় ও ছন্দে যার রূপায়ণ চলছে; এছাড়া তার আর-সব ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। যোদ্ধা নিজেকে ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রূপান্তরিত হয় রণদুর্মদের দুর্বার তাড়নায়, জিঘাংসার উন্মাদনায়। তেমনি প্রচণ্ড ক্রোধে মানুষ চলতি কথায় 'জ্ঞানশূন্য' হয়ে যায়; আরও জোরালো ভাষায় তাকে 'ক্রোধময়' বললে বর্ণনাটা হয় এর চাইতে সুস্পষ্ট ও সংগত। এইসব সংজ্ঞায় সত্যের একটা তাত্ত্বিক বিবৃতি আছে। কিন্তু তবু তাতে মানুষের সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ সত্যটি প্রকাশ পায় না—শুধু তার চেতনার তপঃক্রিয়ার বিশেষ-একটা ব্যাবহারিক দিক ছাড়া। বৃত্তির উত্তালতায় সে যে আত্মহারা হয়ে যায়, তাতে ভুল নাই। মুহূর্তের মধ্যে তার প্রবৃত্তির একটা দিক ছাড়া আর সবদিক ঢাকা পড়ে যায়, আপনাকে সংযতভাবে চালিত করবার সামর্থ্য লুপ্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজিত চিত্তের ঐকান্তিক সংবেগ হয় তার কর্মের সারথি—এমন-কি সে যেন ওই সংবেগেই রূপান্তরিত হয়। প্রাকৃত-মানুষের ক্ষুব্ধ চিত্তে আত্মবিস্মৃতির মাত্রা সাধারণত এই পর্যন্ত চড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সে ফিরে আসে আত্মসংবিতের বৃহত্তর অবিক্ষুব্ধ আয়তনে—যার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি জাগিয়েছিল সাময়িক একটা তরঙ্গ মাত্র।

কিন্তু বিশ্বচেতনার মহাবৈপুল্যের মধ্যে এই আত্মবিস্মৃতিকে চরম কোটিতে উত্তীর্ণ করবার একটা সামর্থ্য আছে। অবশ্য মানুষের অচেতনা সে চরম-কোটি নয়, কেননা জাগ্রৎচেতনাই মানুষের বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম বলে অচেতনার ঘোর তার চিত্তে সুচিরস্থায়ী হতে পারে না। তাছাড়া অচেতনা একটা অভাব-বাচী শব্দ বলে প্রতিযোগী চেতনার 'পরেই তার তাৎপর্য নির্ভর করছে। তাই মানুষের অচেতনায় নয়—জড়প্রকৃতির অচিতিতে আমরা খুঁজে পাই আত্ম-বিস্মৃতির চরম কোটি। অবশ্য আত্মবিস্মৃতিও বিশ্বচেতনার আপেক্ষিক ধর্ম মাত্র, সুতরাং তাকে একান্ত চরম মনে করলে ভুল হবে। মানুষের জাগ্রৎ-চেতনায় ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে অবিদ্যার যে সাময়িক সংকোচ দেখা দেয়, এই অচিতিও ঠিক সেইধরনের। কারণ আমাদের অবিদ্যার পিছনে যেমন

আছে বিদ্যার আবেশ, তেমনি পরমাণুতে ধাতুখণ্ডে উদ্ভিদে জড়প্রকৃতির প্রত্যেক ব্যাকৃতি ও শক্তিতে আছে এক অন্তর্গূঢ় চেতনা সঙ্কল্প ও বুদ্ধির লীলা—যা প্রকৃতির আত্মবিস্মৃত নির্বাক রূপায়ণেরও অতীত একটা তত্ত্ব। উপনিষদ তাকেই বলেছেন 'চেতনশ্চেতনানাম্'—সবই চেতন আর সেই চেতনেরও চেতন তিনি। তাঁর নিত্যসান্নিধ্য এবং চিদাবেশ বা তপঃ ছাড়া প্রকৃতির কোনও কাজ চলতে পারে না। বিশ্বে যে অচিতির লীলা দেখছি, তাকে বলি প্রকৃতি। তার মধ্যে তপঃশক্তির একটা আত্মসমাহিত অথচ বহির্বৃত্ত স্পন্দ আছে। শক্তি নিজের স্পন্দলীলায় এমন তদ্গত হয়ে আছে সেখানে যে, তার সে-অবস্থাকে বলা চলে অন্ধতামিস্র বা জড়সমাধি। মূর্ছাভঙ্গে সে যে আপন স্বরূপে ফিরে যাবে, মনে হয় এ-সামর্থ্য তার লোপ পেয়েছে। অবশ্য তারও মধ্যে আছে অখণ্ড চিৎপুরুষের অধিষ্ঠান, আছে তাঁর চিৎশক্তির লীলা। কিন্তু প্রকৃতি তাদের পিছনে রেখে শুধু কর্মস্পন্দময় জড়সমাধিতে আচ্ছন্ন ও আত্ম-বিস্মৃত হয়ে আছে। প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি, আর পুরুষ চিৎসত্তা। সত্তা আর শক্তির অবিনাভাবই পরমার্থতত্ত্ব। কিন্তু এখানে দেখছি, অচেতন প্রকৃতি পুরুষের সংবিৎ হারিয়ে অচিতির নীরন্ধ্র অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, আবার ধীরে-ধীরে চেতনার উন্মেষে মূর্ছার ঘোর ভেঙে তার ওই হারানো সংবিৎ ফিরে পাচ্ছে। প্রকৃতি পুরুষের যে-রূপবিগ্রহকে গড়ে তুলছে, তার মধ্যে আপনাকে ঢেলে দিয়ে পুরুষও যেন অচেতন অন্নময় প্রাণময় বা মনোময় সত্ত্ব হয়ে যান : অথচ প্রত্যেক রূপায়ণে তাঁর তত্ত্বরূপটি থাকে অবিচ্যুত। তাই অন্তর্গূঢ় চিৎসত্তার দিব্যবিভাই প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তিতে অন্তর্যামিরূপে আবিষ্ট হয়ে অচেতনা হতে চেতনার পর্বে-পর্বে তাকে ফুটিয়ে তোলে।

মানুষের জাগ্রৎচিত্তের অবিদ্যার মত অথবা তার সুপ্তচিত্তের অচেতনা কি অবচেতনার মত, প্রকৃতির অচিতিও একটা বহিরঙ্গ বৃত্তি মাত্র। বস্তুত তার মধ্যে সর্বচিতের পরিপূর্ণ আবেশ অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাই অচিতিকে বলতে পারি অন্তশ্চিতেরই প্রতিভাস। কিন্তু প্রাতিভাসিকতার পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই একমাত্র অচিতিতেই, কেননা চিৎতত্ত্ব এখানে সম্পূর্ণ অব-লুপ্ত—আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিহ্ন। অবশ্য চিৎই বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব—কিন্তু অচিতিতে দেখি তার একান্ত প্রতিষেধ। অর্থাৎ তত্ত্বভাবকে সম্পূর্ণ নির্জিত ক'রে তার প্রতিভাস এখানে জয়ী হয়েছে। চিতের আত্মনিগূহন এখানে এতই অনড় যে, চিৎপরিণামের তীব্রসংবেগেও তার মুক্তি ঘটে না—যতক্ষণ অচিতির নাগপাশ প্রকৃতির অন্য-কোনও রূপায়ণে এসে একটুখানি শিথিল না হয়। এমনি করে পশুচেতনায় অচিতির ঘোর তরল হয়ে আসে খণ্ড-সংবিতে। অবশেষে মনুষ্যচেতনার চরমে দেখা দেয় প্রকৃতির চিন্ময় প্রবৃত্তির একটা প্রাথমিক সূচনা—যার মধ্যে চিৎপ্রকাশের সম্ভাবনা পূর্ণতর হলেও তবু

সে বহিরঙ্গই। কিন্তু অচিৎপ্রকৃতি আর চিৎপ্রকৃতির মধ্যে এ-ব্যবধান নিতান্তই প্রাতিভাসিক বা আপাতিক—বহির্জগতের প্রাকৃত মানুষ আর অন্তর্জগতের আসল মানুষের ব্যবধানের মত, যদিও সেখানে ব্যবধানের পাষাণপ্রাচীর অতখানি অনড় নয়। তত্ত্বদৃষ্টিতে, একই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রশাসন চলছে বিশ্বের সর্বত্র; অতএব জড়প্রকৃতির অচিতিতেও দেখি একই ঐকান্তিক অভিনিবেশের লীলা। মানুষের জাগ্রৎচিত্ত যেমন তার চারদিকে আত্মসঙ্কোচের একটা প্রাচীর খাড়া করে, অথবা কর্মের প্রতি অভিনিবেশে আত্মহারা হয়ে যায় ক্ষণে-ক্ষণে, তেমনি অচিৎপ্রকৃতিতেও দেখি একইধরনের তন্ময়তা—শক্তির স্ফুরণে ও ক্রিয়ার ব্যাপারে তেমনি করে আপনাকে হারিয়ে ফেলা। দুয়ের কেবল এই তফাত, প্রকৃতির অচিতিতে আত্মসঙ্কোচ পৌঁছেছে আত্মবিস্মৃতির চরম কোটিতে। তাই সে একটা সাময়িক মূঢ়বৃত্তি নয় শুধু, নিখিল জড়প্রকৃতির ওই হল কর্মের ধারা। প্রকৃতির অচিতিকে বলতে পারি অবিমিশ্র আত্ম-অবিদ্যা। আর মানুষের খণ্ডজ্ঞান ও সামান্য-অজ্ঞান হল প্রকৃতির খণ্ডিত আত্ম-অবিদ্যা—আত্মবিদ্যার অভিমুখে তার ঊর্ধ্বপরিণামের একটা নিশ্চিত নিশানা। কিন্তু বিচার করে দেখলে শুধু এই দুটি অবিদ্যার কেন, সকল অবিদ্যারই স্বরূপ হল তপঃশক্তির একটা বাহ্যত-ঐকান্তিক আত্মবিস্মৃত অভিনিবেশ। তার মধ্যে সত্তার চিদ্‌বীর্য শক্তিস্পন্দের একটি ধারায় বা একদেশে তন্ময় হয়ে শুধু তারই সংবিৎকে জাগিয়ে রাখে, অথবা আপাতদৃষ্টিতে শুধু ওই একটি লীলায়নে আপনাকে ফুটিয়ে তোলে। নিজের রচা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এই অবিদ্যার একটা অর্থক্রিয়াকারিতা এবং সার্থক প্রামাণ্য অবশ্য আছে। কিন্তু তার বাইরে সে নিতান্তই বহিরঙ্গ প্রাতিভাসিক ও একদেশী একটা ব্যাপার বলে, কোনমতেই তাকে অখণ্ড স্বরূপতত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া চলে না। অবশ্য 'তত্ত্ব' কথাটা আমরা ব্যবহার করছি গৌণ অর্থে—মুখ্য অর্থে নয়। কেননা, একহিসাবে অবিদ্যাও একটা বস্তু, অতএব সেও তাত্ত্বিক। কিন্তু তাবলে অবিদ্যা কখনও আমাদের সমগ্র সত্তা নয়। তাকে স্ব-তন্ত্র করে দেখতে গেলে তার সত্যরূপটিও বিকৃত হয়ে ওঠে বহিশ্চর চেতনায়। আসলে, সংবৃত্ত বিজ্ঞান ও চেতনা পর্বে-পর্বে বিকশিত করে চলেছে তার অন্তর্গূঢ় সত্যকে—এই হল অবিদ্যার পারমার্থিক তত্ত্ব। চলার পথে অচিতি এবং অজ্ঞান ফুটে ওঠে তারই সার্থক পরিণামরূপে।

অবিদ্যার মৌল প্রকৃতি তাহলে এই। অবিদ্যা বস্তুত চিতিশক্তিরই একটা বিবিক্ত বৃত্তি। আপাতদৃষ্টিতে সে যেন তার অখণ্ড তত্ত্বরূপটি ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে আছে নিজের কাজে। তাই তার মধ্যে দেখা দিয়েছে আত্মসঙ্কোচ ও আত্মবিভাজনের একটা প্রতিভাস—যা পরমার্থত সত্য না হলেও ব্যবহারের দিক দিয়ে একান্ত সত্য।...অবিদ্যার স্বরূপ জানলে এবার তার হেতু আধার

ও প্রবৃত্তির তত্ত্ব বোঝাও কঠিন হবে না। বিশ্বব্যাপারে অবিদ্যার সার্থকতা ধরা পড়ে, যখন দেখি অবিদ্যা ছাড়া বিশ্ববিসৃষ্টি নিরর্থক অথবা অসম্ভব হত। কিংবা সম্ভব হলেও বিসৃষ্টির ব্যাপারকে কোনমতেই সম্পূর্ণভাবে বা বর্তমান রীতিতে রূপ দেওয়া চলত না। অতি বিচিত্র অবিদ্যার লীলা—কিন্তু তার প্রত্যেকটি বিভাব সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্যের সঙ্গে সুসঙ্গত অতএব সপ্রয়োজন। শাশ্বতমানুষের সত্তা কালাতীত। অবিদ্যা নইলে সে-মানুষ কালের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে তার তরঙ্গদোলায় ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে আন্দোলিত হয়ে চলতে পারত কি? অথচ মানুষের বর্তমান জীবনের এই তো ধারা। অতিচেতন বা অধিচেতন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার পক্ষে ব্যষ্টিমনের গুহায় বসে জগতের সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের জট-পাকানো আর জট-ছাড়ানো সম্ভব হত কি? অথবা হয়তো তখন তার সে-কাজের ধরনই হত অন্যরকম। বিবিক্ত অহংচেতনার গণ্ডিতে না বেঁধে, নিজেকে শুধু বিশ্বাত্মভাবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখলে কোথায় থাকত তার বিবিক্ত ব্যক্তি-সত্তা—তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মের বৈশিষ্ট্য? অথচ তার ওই ঐকান্তিক আত্মকেন্দ্রিকতাই হল বিশ্বব্যাপারে অহংবোধের বিশিষ্ট একটা দান। নিজেকে ঘিরে মানুষ কাল চিত্ত ও অহন্তার অবচ্ছেদে অবিদ্যার এক-একটা প্রাচীর খাড়া করেছে—বিশ্বের অমেয় ঔদার্য ও আনন্ত্যের জ্যোতিঃপ্লাবন হতে আপনাকে আগলে রাখবার জন্য। নইলে বিশ্বের বুকে তার কালাবচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-ভাবকে সে গড়ে তুলবে কেমন করে? শুধু এই-একটি জীবনকে কেন্দ্র করে বাঁচতে হবে তাকে—অতীত ও অনাগতের অন্তহীন বিস্তারকে ভুলে গিয়ে। নইলে অতীত যদি সবসময় উদ্যত থাকত তার চেতনায়, তাহলে বর্তমানের সম্বন্ধ-জালকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে সে পারত না। কারণ বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় তার জ্ঞানের ভাণ্ডার তখন এত বৃহৎ হত যে, তাতে তার কর্মের ভারকেন্দ্র হত বিচলিত, তার অর্থ এবং ধরন যেত বদলে। মানুষ বাসা বেঁধেছে মনের মধ্যে, তাকে গ্রাস করেছে দেহাশ্রয়ী জীবনের স্থূলতা—অতিমানস আছে তার চেতনার আড়ালে। এ নইলে চারদিকে এই-যে ভেদ খণ্ডতা ও সঙ্কোচের বৃত্তি দিয়ে তার মন অবিদ্যার দুর্গপ্রাকার খাড়া করেছে, তা কখনও সম্ভব হত না—অথবা সে-ব্যবধান হত প্রয়োজনের তুলনায় অতিমাত্রায় শীর্ণ এবং স্বচ্ছ।

যে-প্রয়োজনে ঐকান্তিক অভিনিবেশরূপী অবিদ্যার উদ্ভব অপরিহার্য হয়েছে, সে হল চিৎপুরুষের আপনাকে হারিয়ে আবার খুঁজে পাবার খেলা। এই আনন্দলীলার আয়োজনেই প্রকৃতির মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি অবিদ্যার আবরণে আড়াল করেছেন। অবশ্য অবিদ্যা নইলে যে বিশ্ববিসৃষ্টি অসম্ভব হত, তা নয়। কিন্তু তার ধারা হত বর্তমান ধারা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মের সিসৃক্ষা তখন চরিতার্থ হত শুধু উত্তরলোকের বিসৃষ্টিতে, অথবা নিত্যজগতের পরিণামহীন প্রস্তারে—যার মধ্যে প্রত্যেকটি সত্ত্ব থাকত আপন স্বভাবধর্মের অখণ্ডজ্যোতিতে দীপ্ত। কিন্তু তাহলে পরিণামের আবর্তনে সৃষ্টির এই-যে প্রতীপ ধারা, এ অসম্ভব হত। এখানে যা লক্ষ্য, ওখানে তা হত ধ্রুবা স্থিতি। এখানে যা বিবর্তনের একটা ধারা, ওখানে তা চিরন্তন সত্ত্বসামান্য মাত্র। আত্মসত্তা ও আত্মপ্রকৃতির বিপরীত কোটিতে নিজেকে আস্বাদন করবার জন্যই সচ্চিদানন্দ নেমে এসেছেন জড়ের অচিতিতে। অবিদ্যার প্রতিভাস তাঁর একটা বাইরের মুখোস শুধু। তার আড়ালে নিজেকে তিনি গোপন রেখেছেন নিজেরই চিতিশক্তি হতে। তাইতে সে-শক্তি আপনভোলার মত তন্ময় হয়ে ডুবে আছে আপন রূপায়ণের লীলায়। এই রূপবিগ্রহের মধ্যে ধীরে-ধীরে জীবচেতনা ফুটে উঠছে—অবিদ্যার প্রাতিভাসিক ব্যাপ্রিয়াকে মেনে নিয়ে। অথচ আসলে সে-অবিদ্যাও আদ্য অচিতির গর্ভ হতে উন্মিষিত বিদ্যারই ফুটন্ত ফুল। এই ফুল-ফোটার পর্বে-পর্বে গড়ে উঠছে যে নিত্য-নূতন পরিবেশ, তাকে আশ্রয় করে চলছে জীবের আত্ম-আবিষ্কারের সাধনা এবং তারই জ্যোতিতে ঘটছে তার জীবনের দিব্য রূপান্তর—যে-জীবন দীর্ঘ-যুগব্যাপী উত্তরণের তপস্যায় সার্থক করতে চাইছে অচিতির অন্ধতমিস্রায় তার অবতরণের প্রয়োজনকে। বৈকুণ্ঠের নিত্যধামে আছে আনন্দজ্যোতির পূর্ণোচ্ছ্বাস, তারও পরে আছে লোকোত্তর আনন্দের দিব্যভূমি। অবিদ্যার নিরানন্দ অন্ধকার হতে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে তার কূলে উত্তীর্ণ হওয়াই এই বিশ্বচক্রাবর্তনের লক্ষ্য নয়। অথবা অতৃপ্ত চিত্তের হাহাকার নিয়ে বিদ্যার নিষ্ফল এষণায় অবিদ্যার খাতে মিথ্যা পাক খেয়ে মরা—এও তার নিয়তি নয়। বিশ্বলীলার এই তাৎপর্য হলে অবিদ্যা হত সর্বচিৎ ব্রহ্মের একটা দুর্বোধ প্রমাদ, অথবা তেমনি দুর্বোধ একটা লক্ষ্যহীন দুঃখহত নিয়তির অন্ধতাড়না। কিন্তু বস্তুত অবিদ্যার সাধনার মূলে আছে ব্রহ্মের আত্মরতির একটা নিগূঢ় প্রেতি। মানুষের দেহে আত্মা নেমে এসেছেন জন্মের দুয়ার-পথে, যুগ হতে যুগান্তরে আবর্তিত হয়ে চলেছে মানবজাতির প্রগতির তপস্যা—কিন্তু কেন? সে কি এইজন্যই নয় : বিশ্বোত্তীর্ণ মহিমায় বা বিশ্বভাবনায় নয় শুধু, এছাড়া আরও অভিনব উপায়ে ব্রহ্ম চান তাঁর নিত্যসিদ্ধ আনন্দস্বভাবের অনুভব, জড়দেহের কারাগারে নিজেকে বন্দী করে তার আঁধার ও নিরানন্দের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চান আনন্দ ও জ্যোতির নন্দনকানন, নিজের স্বরূপকে আবৃত করে আবার কৃচ্ছ্রতপস্যায় সে-আবরণ ঘুচিয়ে পেতে চান আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ। এরই জন্যে ঋতম্ভরা বিশ্বপ্রজ্ঞার 'পরে নেমে এসেছে অবিদ্যার কঞ্চুক। কিন্তু বিশ্বলীলার পক্ষে অবিদ্যা অপরিহার্য হলেও বিদ্যার সে একটা গৌণবৃত্তিই। অথচ সে একটা সাকূত অবতরণ—প্রমাদ অথবা স্খলন

নয়, দেবশক্তির একটা আনুকূল্য—সৃষ্টির অভিশাপ নয়। তাইতো মনে হয় : অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের সহস্রদল ঐশ্বর্যকে ফুটিয়ে তোলা একটি রূপ-বিগ্রহের চিদ্‌ঘন নিবিড়তায়, আনন্ত্যের এমন-একটি সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলা যাকে আর-কোনও উপায়ে রূপ দেওয়া অসম্ভব ছিল, এককথায় এই জড়ের পাষাণ কুঁদে বার করা দেবতার চিন্ময় নিকেতন—জড়বিশ্বে অবতীর্ণ চিৎপুরুষের 'পরে আছে বুঝি এই মহাতপস্যার দায়।

অবিদ্যা প্রকৃতির একটা বহিরঙ্গ বৃত্তি মাত্র—অন্তরাত্মায় কিন্তু তার অধিষ্ঠান নাই। এমন-কি প্রকৃতির সবখানি জুড়েও সে নাই। কেননা প্রকৃতি সর্বচিৎ ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি—তাই তার সমগ্র বৃত্তিকে কোনমতেই অবিদ্যাগ্রস্ত বলা চলে না। বস্তুত প্রকৃতির অখণ্ড অনাদি জ্যোতিঃশক্তির একটা বিশিষ্ট বিভূতিরূপে অবিদ্যার আবির্ভাব। কিন্তু কোথায় এ-বিভূতির উৎসমূল? শুদ্ধসন্মাত্রের কোন্ তত্ত্বকে আশ্রয় করে তার বিসৃষ্টি? অখণ্ড সৎ চিৎ আনন্দের আনন্ত্যে নিশ্চয় অবিদ্যার কোনও স্থান নাই। কেননা সেসব লোকোত্তর মহাভূমি হল শুদ্ধসন্মাত্রের ধ্রুবপদ—ওই দিব্যগঙ্গোত্রীর অম্লান শুভ্রতা হতেই বিশ্বের যা-কিছু নেমে এসেছে এই দ্বৈধকাতর বিসৃষ্টির আবিলতায়। অতএব ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবিদ্যার ছোঁয়াচ থাকতেই পারে না। অতিমানসেও অবিদ্যা নাই। কেননা অতিমানস সত্য উদ্ভাসিত হয়ে আছে অনন্ত জ্যোতিঃশক্তির ভাস্বর মহিমায়, তার সান্ততম লীলায়নেও সে-শক্তির পরিপূর্ণ আবেশ রয়েছে, তার মধ্যে বৈচিত্র্যের চেতনাকে নিত্য জড়িয়ে আছে একত্বের সর্বাবগাহী চেতনা।...কিন্তু অতিমানসের নীচে মনের ভূমিতেই আত্ম-সংবিতের তত্ত্বকে তিরস্কৃত করা সম্ভব হয়। কারণ মন চিৎপুরুষের সেই শক্তি, যা ভেদবুদ্ধিকে সৃষ্টি ক'রে তাকেই কায়েমী ক'রে চলে। নানাত্ববোধ তার মুখ্যবৃত্তি, যদিও তার পিছনে একত্ববোধের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস গৌণ হয়ে থাকে—তার প্রবৃত্তির অপরোক্ষ সাধনরূপে নয়। মন অতিমানসের একটা জন্য অবান্তরবিভূতি মাত্র, তাই একত্ববোধ তার স্বভাবধর্ম নয়। অতিমানসের আবেশে, তার দীপ্তির প্রতিফলনে তার মধ্যে একত্বের একটা অস্পষ্ট আভাস জেগে ওঠে। এই আভাসজ্ঞানের অবলম্বনটুকুও যদি না থাকে, মন আর অতি-মানসের মাঝে একটা যবনিকার অন্তরাল সৃষ্ট হয়ে সত্যের জ্যোতিকে যদি তিরস্কৃত করে, অথবা তার ফাঁকে-ফাঁকে ওপারের দু-একটি রশ্মি যদি এপারে এসে ছিটকে পড়ে এবং আবছা আলোর টুকরা দিয়ে রচে শুধু বিকৃত প্রতি-চ্ছবির মায়া—তাহলেই চেতনায় দেখা দেবে অবিদ্যার প্রতিভাস। উপনিষদ বলেন, মনের নিজের গড়া এমনি-একটা যবনিকা আছে অতিমানসকে আড়াল ক'রে। এ অধিমানসভূমির সেই 'হিরন্ময় পাত্র' যা অতিমানস সত্যের মুখকে অপিহিত রেখে তার আভাসকে প্রতিচ্ছুরিত করে। মনের মধ্যে ওই হিরণ্ময়

পাত্রই আবার দেখা দেয় অস্বচ্ছ ধ্যামলপ্রায় আবরণ হয়ে। তার ফলে অবাঙ্-মুখ মনের দৃষ্টি নানাত্বের 'পরে অভিনিবিষ্ট হয়। যে-একত্বের নাভিবিন্দু হতে নানাত্বের বিকিরণ, তার প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে নানাত্বকেই সে তার প্রবৃত্তির মুখ্য আশ্রয় ক'রে এবং অবশেষে একত্বের স্মৃতি বা বৃত্তিকে আশ্রয় করবার কল্পনাও তার মুছে যায়। অথচ তখনও একত্বই তার বৃত্তির গোপন আশ্রয়, তার প্রচ্ছন্ন ভাবনাকে স্বীকার না ক'রে এক পা-ও সে চলতে পারে না। কিন্তু অভিনিবিষ্ট মনঃশক্তি জানে না কোথায় তার উৎস, কোথায় তার বৃহত্তর স্বরূপের পূর্ণপ্রকাশ। এমনি করে আপন প্রবর্তক শক্তিকে ভুলে গিয়ে রূপায়ণী শক্তির লীলায়নে মন এতই তন্ময় হয়ে যায় যে, শক্তির সঙ্গে একাকার হয়ে আপনাকে পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে। কর্ম-সমাধিতে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে স্বপ্নসঞ্চারীর আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে কর্মকে সে চালিয়ে নিলেও, তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংবিৎ তার থাকে না। চেতনার অবরোহের এই শেষ ধাপ। এ যেন সুষুপ্তির অতল গহ্বরে তার নিমজ্জন—জড়সমাধির অথৈ গহনে ডুবে গিয়ে জড়প্রকৃতির মর্মমূলে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠা ক্রিয়াশক্তির প্রেতি-রূপে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। খণ্ডিত ক্রিয়া ও রূপায়ণের প্রতি অভি-নিবেশবশত একটা সীমিত ক্ষেত্রে চিতিশক্তির যে কুণ্ঠিত ব্যাপ্রিয়া, তাতে তার অখণ্ডস্বভাব কিন্তু কোনকালে সত্যকার খণ্ডভাবনায় ক্ষুন্ন হয় না। নিজের সব-কিছুকে পিছনে রেখে একটি বিভাবকেই সে যখন বর্তমানের তাগিদে কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণ পরিসরে এগিয়ে দেয়, তখনও তার উহ্য শক্তির প্রভাব সেখান থেকে লুপ্ত হয় না—পুরঃক্ষিপ্ত শক্তির কাছে সে গুপ্ত হয়ে থাকে মাত্র। বস্তুত শক্তির অভঙ্গ বীর্যই সেখানে আবিষ্ট থাকে অচিতির আবরণে আড়াল হয়ে। আর অভঙ্গ আত্মভাবদ্বারা অধিষ্ঠিত ওই অভঙ্গ শক্তি তার পুরঃ-ক্ষিপ্ত বীর্যবিভূতির সহায়ে তার বিশিষ্ট স্পন্দলীলার সকল ক্রিয়া নির্বাহ করে, তার সকল রূপায়ণে আবিষ্ট হয়।...আবার এও লক্ষণীয়, অবিদ্যার আবরণ দূর করতে আধারস্থিত চিন্ময় সন্ধিনী-শক্তি তার ঐকান্তিক অভিনিবেশের বীর্যকে চালিত করে প্রাকৃতধারার বিপরীতমুখে। ব্যষ্টি-চেতনায় প্রকৃতির পুরঃক্ষিপ্ত স্পন্দনকে নিরুদ্ধ ক'রে গুহাহিত অন্তর-পুরুষের প্রতি তার অভিনিবেশকে সে একাগ্র করে। সে-অন্তরপুরুষ হতে পারেন কূটস্থ আত্মা, চৈত্যপুরুষ, মনোময় বা প্রাণময় পুরুষ। যা-ই হ'ন না তিনি, চেতনায় তাঁর স্বরূপ কিন্তু উম্ঘাটিত হয় অন্তরাবৃত্ত অভিনিবেশের ফলে। স্বরূপজ্ঞানের পর সন্ধিনী-শক্তির প্রয়োজন হয় না প্রতীপ অভিনিবেশকে আঁকড়ে থাকবার। তখন সে ফি'রে যায় তার অভঙ্গসংবিতের উদার ব্যাপ্তিতে, অথবা সংবর্তুল চেতনার সম্পুটে জড়িয়ে ধরে পুরুষের ভাব ও প্রকৃতির ক্রিয়া, কূটস্থ আত্ম-

স্বরূপ ও আত্ম-শক্তির বিভূতি, আধারস্থ চিৎকেন্দ্র এবং তার সাধনসামগ্রী উভয়কেই। তখন তার বিসৃষ্টি সমস্ত সঙ্কোচ হতে নির্মুক্ত বিপুলতর চৈতন্যের পরিমণ্ডলে অন্তর্ভাবিত হয় : অন্তরাবিষ্ট পুরুষতত্ত্বের বিস্মৃতি-বশত প্রকৃতির যে-বিকার, তার ন্যূনতা আর তখন চেতনাকে স্পর্শ করে না। অথবা সন্ধিনী-শক্তি তখন তার বিসৃষ্ট সকল বিভূতিকে স্তব্ধ ক'রে পুরুষ ও প্রকৃতির ঊর্ধ্বতর ভূমিতে সমাহিত হতে পারে। কিন্তু তার আত্মসমাধানে অবরভূমির সঙ্গে সকল যোগ লুপ্ত হয় না। বরং আধারসত্তাকে উপরপানে আকর্ষণ ক'রে সেইসঙ্গে ঊর্ধ্বশক্তির প্রপাতকে সে নামিয়ে আনে অবরভূমিতে এবং দিব্যজ্যোতির প্লাবনে তার পূর্বতন বিসৃষ্টির আমূল রূপান্তর ঘটায়। এই রূপান্তরিত সত্তা তখন ঊর্ধ্বভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না—অভিনব আত্মবিসৃষ্টির উদারতর পরিবেশের মধ্যে সে ঊর্ধ্বশক্তির মহত্তর ঐশ্বর্যের বিলাসরূপে ঠাঁই পায়। আধারস্থ চিৎশক্তি যখন মনোময় হতে অতিমানস ভূমিতে তার পরিণামের উৎসর্পিণী ধারাকে উত্তীর্ণ করে, তখন আমাদের সমগ্র সত্তায় ঘটে এমনিতর একটা লোকোত্তর রূপান্তর।...কিন্তু সিদ্ধির প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি একই তপঃশক্তির বিভিন্ন পরিণাম—ক্ষেত্র ও প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুসারে। সর্বত্র চলেছে অনন্তস্বরূপের 'জ্ঞানময়ং তপঃ'-র সাধনা—যার মূলে আছে তাঁর ক্রমান্বিত শক্তির বিলাস এবং আত্মবিভাবনার প্রেতি।

এই যদি-বা হয় অবিদ্যাপরিণামের তত্ত্ব, তবু প্রশ্ন হতে পারে : পূর্ণ-চিন্ময় যিনি, তাঁর চিৎশক্তির একদেশী প্রবৃত্তিতে অবিদ্যা ও অচিতির এই আপাতবিলাসটুকুই-বা দেখা দেবে কেন? তাকে মেনে নিলেও তো সকল গোল চোকে না। তারও পরে তার গতি প্রকৃতি ও অধিকার সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়েই থাকে আমাদের চিত্তে—কেননা এসব তত্ত্ব খুঁটিয়ে না জানলে অবিদ্যা সম্পর্কে আতঙ্ক যেমন আমাদের ঘুচবে না, তেমনি বিশ্বব্যাপারে এই শক্তির সার্থকতাকে হৃদয়ঙ্গম করে তার আনুকূল্যের সুযোগ নিতেও আমরা কুণ্ঠিত হব।...কিন্তু অবিদ্যার রহস্য আসলে আমাদের বিভজ্যবৃত্ত বুদ্ধির একটা অলীক জল্পনা। দুটি ভাবের মধ্যে বুদ্ধি দেখে কি কল্পনা করে একটা ন্যায়ের বিরোধ এবং তাকে সে ধরে নেয় বাস্তবের বিরোধ বলে। তার ফলে বিরুদ্ধ দুটি ভাবের সহভাব ও একত্বকে সে অসম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করে বসে। বিদ্যা আর অবিদ্যার মাঝেও প্রাকৃতবুদ্ধির কল্পিত এমনতর একটা বিরোধ আছে। কিন্তু এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জেনেছি, অবিদ্যা বিদ্যাশক্তিরই একটা আত্মসঙ্কোচনী বৃত্তি। ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে উপস্থিত কর্মের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশদ্বারা নিজেকে সে সংহত করে। তার অভি-নিবেশের ফলে চেতনার একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি

তার বাকী অংশ ঢাকা পড়ে আবছায়ার অন্তরালে। কিন্তু তাবলে অন্তর্গূঢ় সমগ্র চৈতন্যের পরিপূর্ণ সত্তা ও ক্রিয়ার যে কোনও অভাব ঘটে সেখানে, তা নয়। আধারের অখন্ড চৈতন্যই সেখানে কাজ করে যায়—কিন্তু আত্মপ্রকৃতির 'পরে স্বকল্পিত এবং স্বারোপিত নিয়মের শাসন মেনে। চেতনার স্বেচ্ছাকৃত সকল সঙ্কোচই বহন করে বিশিষ্ট আকূতির বীর্য—দৌর্বল্য নয়। অভিনিবেশমাত্রেই আছে চিন্ময় সন্ধিনী-শক্তির প্রেতি—তার অক্ষমতা নয়। সত্য বটে, অতিমানসের অভিনিবেশে আছে বহুধা-বিসৃষ্ট অথচ অখন্ডগ্রাহী আনন্ত্যের বৈপুল্য। অথচ প্রাকৃত অভিনিবেশ বিভজ্যবৃত্ত এবং সীমার সঙ্কোচে পীড়িত। এও সত্য, সে-অভিনিবেশ সৃষ্টি করে বস্তুর তত্ত্বরূপের সম্পর্কে একটা প্রতীপ বা খন্ডিত ভাবনা একটা মিথ্যা কিংবা অর্ধসত্য প্রজ্ঞপ্তি। কিন্তু বিদ্যাকে এমনি করে খন্ডিত ও সঙ্কুচিত করবার প্রয়োজন কি ছিল, তাও আমরা এখন জানি। প্রয়োজনকে একবার যদি স্বীকার করি, তাহলে তাকে সার্থক করবার সামর্থ্যকেও-বা স্বীকার করব না কেন, কেনই-বা সে-সামর্থ্যকে মান্ব না পরমার্থসত্তার পরম শক্তিরই বিলাস বলে? বস্তুত, বিশিষ্ট বিভাবনার প্রয়োজনে এই-যে আত্মসঙ্কোচের সামর্থ্য, এ তো শুদ্ধসন্মাত্রের পরম চিতিশক্তির সঙ্গে অসমঞ্জস নয়ই; বরং অনন্তস্বরূপের বিচিত্রবিভূতির একটি প্রকাশ যে এই ধারাতে হবে, তা-ই কি একান্ত প্রত্যাশিত ছিল না?

যিনি প্রপঞ্চাতীত, নিজের মধ্যে বিশ্বের প্রপঞ্চ যদি তিনি ফুটিয়ে তোলেন, তাতে তাঁকে সীমার বাঁধন তো পরতে হয় না—কেননা বিশ্বের বিসৃষ্টি যে তাঁরই পরাৎপর সত্তা চৈতন্য শক্তি ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন। অনন্ত যদি নিজেরই মধ্যে সান্ত প্রতিভাসের অন্তহীন অন্যোন্যসংগমের মেলা গড়ে তোলেন, তাতে কি প্রকাশ পায় তাঁর শক্তির কুন্ঠা—না তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিভাবনার ঐশ্বর্য? এক যিনি, নানাত্বভাবনার সামর্থ্য তাঁর একত্বের মহিমাকে সঙ্কুচিত করে না—কেননা নানাত্বের মধ্যে তিনি যে আত্মসত্তার উল্লাসকেই আস্বাদন করেন বিচিত্ররূপে। বরং এই বৈচিত্র্যের উল্লাসেই তাঁর অনন্ত একত্বের যথার্থ পরিচয়— বুদ্ধিকল্পিত সংখ্যৈকত্বের সান্ত আড়ষ্টতার মধ্যে কোথায় সে-মহিমা? তেমনি, অবিদ্যাকে যদি জানি চিৎপুরুষের স্বতঃসমাহিত স্বতঃসঙ্কোচী বিচিত্র অভিনিবেশের সামর্থ্য বলে, তাহলে তাকে তাঁর স্বতঃসংবিন্ময় বিদ্যাশক্তির বৈচিত্র্যবিধায়ক ছন্দোলীলা বলেই-বা মান্ব না কেন? অবিদ্যা তখন আর তুচ্ছ অথবা হেয় নয়—প্রপঞ্চাতীতের প্রপঞ্চবিসৃষ্টির সে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি। অনন্তের অন্তহীন সান্তভাবনার অথবা বহুর আধারে একেরই বিচিত্র আত্মরতির সাধনরূপে তার মর্যাদা তখন অনস্বীকার্য। চেতনার অন্তহীন সামর্থ্যের একটি কোটিতে আছে আত্মসমাধানদ্বারা প্রপঞ্চের বিস্মৃতি—অথচ সন্ধিনী-শক্তির প্রেতিবশত জগদ্ভাবের অনুবৃত্তি তখনও

চলতে থাকে। আবার তার আরেক কোটিতে আছে বিশ্বব্যাপারে সমাহিত হয়ে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি—অথচ আত্মার আবেশে সেখানেও চলছে বিশ্বের ব্যাপ্রিয়া। কিন্তু চিদ্‌বীর্যের এই আপাত-বিরোধকে ছাড়িয়ে আছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্বয়ংপ্রজ্ঞ অভংগসত্তার মহিমা। এই কল্পিত বিরোধ সে-মহিমাকে খর্ব তো করেই না, বরং তারই ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে তাঁর অবাঙ্‌মানসগোচর অনির্বচনীয়তার রহস্যঝলমল দ্যোতনা।

চতুর্দশ অধ্যায়

অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

গীতা ৫।১৫

বিভু গ্রহণ করেন না কারও পাপ বা কারও সুকৃত; অজ্ঞান দ্বারা আবৃত রয়েছে জ্ঞান, তাইতে বিমুগ্ধ হয় মর্তের মানুষ। —গীতা (৫।১৫)

অমন্যতান্যতাত্মানো বৈ তে। তদিমে মূঢ়া উপজীবন্ত্যভিষঙ্গিনোঽনৃতাভিশংসিনঃ সত্যমিবানৃতং পশ্যন্তি ইন্দ্রজালবদিতি।

মৈত্র্যুপনিষৎ ৭।১০

তত্ত্ব ছাড়া আত্মার আরেকটা ধারণাই উপজীব্য তাদের; তাই তারা মূঢ় অভিষঙ্গী অনৃতশংসী—যেন ইন্দ্রজালের বশে অনৃতকে তারা দেখে সত্যের মত।

—মৈত্রী উপনিষদ (৭।১০)

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৮

অবিদ্যার মধ্যে থেকে ঘুরে মরে তারা—হোঁচট খেয়ে-খেয়ে চলে আঘাতে জর্জরিত হয়ে, অন্ধ দিশারীর পিছনে অন্ধের পালের মত।

—মুণ্ডকোপনিষদ (১।২।৮)

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

গীতা ২।৫০

যে বুদ্ধিযুক্ত, সে ত্যাগ করে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই।

—গীতা (২।৫০)

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবমং কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বান্ উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯

ব্রহ্মের আনন্দকে জেনেছে যে, তাকে সন্তপ্ত করে না এই ভাবনা : 'কেন আমি ভাল কাজ করিনি, কেন আমি মন্দ কাজ করলাম!' আত্মাকে যে জানে এ-দুটি ভাবনা হতেই নিষ্কৃতি পায় সে।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২।৯)

ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরেঃ।
ইম ঋতস্য বাবৃধুর্দুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধাঃ॥

ঋগ্বেদ ৭।৬০।৬

এদের আছে ভূরি অনৃতের চেতনা; এরা ঋতের আধারে ওঠে বেড়ে—অদিতির শক্তিমান্ অধৃষ্য পুত্র এরা। —ঋগ্বেদ (৭।৬০।৬)

প্রথমোত্তমে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্য-ভূয়মেব ভবতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫।৫।১

প্রথম আর শেষ অক্ষর দুটি সত্য, মাঝখানে আছে অনৃত; এই অনৃত তাই সত্যদ্বারাই পরিগৃহীত দুদিক হতে, অতএব সত্যেই তার সত্তার নির্ভর।*

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৫।৫।১)

অখণ্ড স্বতঃসংবিতের বিস্মৃতিহেতু বিদ্যাশক্তির যে-আত্মসঙ্কোচ, তা-ই যদি হয় অবিদ্যার স্বরূপ এবং একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র অথবা বিশ্বস্পন্দের বহিঃ-কঞ্চুকের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশ যদি তার প্রবৃত্তির ধারা হয়—তাহলে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনর্থ বা অশিবের অস্তিত্বকে আমরা ব্যাখ্যা করব কেমন করে? জীবনরহস্য কি জগৎরহস্য যার দিকেই মানুষের দৃষ্টি পড়ুক না কেন, কোথাহতে তার মধ্যে এল অশিবের করাল ছায়া—এই বেদনাময় প্রশ্ন চিরকাল তার চিত্তকে পীড়িত করে এসেছে। অন্তর্গূঢ় সর্ববিদ্যাদ্বারা আবিষ্ট সংকীর্ণ বিদ্যাশক্তিকে অবলম্বন করেই যে নিয়তিকৃত নিয়মের সীমিত পরিসরে গড়ে উঠবে বিশ্ববিধানের একটা বিশেষ ধারা—বিশ্বম্ভরা চিতিশক্তির এই প্রবৃত্তিকে অবশ্য দুর্বোধ কি অসঙ্গত মনে করতে পারি না। কিন্তু তার মধ্যে অসত্য আর প্রমাদ, অধর্ম আর অনর্থেরও সমাবেশ যে অপরিহার্য একথা স্বীকার করি কি করে? সর্বগত ব্রহ্মসত্তার চিন্ময় লীলায় কোথায় খুঁজে পাব এ-দুরিতের সার্থকতা? অথচ ব্রহ্মতত্ত্বের সম্পর্কে আমাদের ধারণা যদি যথার্থ হয়, তাহলে কোথাও-না-কোথাও এইসব বিরুদ্ধ প্রতিভাসের আবির্ভাবের একটা তাৎপর্য ও সার্থকতা আছে, বিশ্বের ঋতময় বিধানের কোনও-না-কোনও আনুকূল্য সাধিত হচ্ছে তাদের দ্বারা। কারণ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সব-কিছুই যখন ব্রহ্ম, তখন ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অব্যভিচারিত আত্মবিদ্যা তাঁর সর্ব-বিদ্যারই নামান্তর। অতএব তার মধ্যে অসত্য ও অশিবকে একটা যদৃচ্ছা-কল্পিত অথবা আকস্মিক উৎপাত বলে গণ্য করা যায় না। কিংবা বলা যায় না, বিশ্বপ্রজ্ঞ ব্রহ্মের চিৎশক্তিতে এ শুধু একটা অনিচ্ছাকৃত আত্মবিস্মৃতি বা বিভ্রমের ছলনা। অথবা এ কেবল হৃৎশয় পুরুষকে অতর্কিতে বন্দী করবার একটা কুৎসিৎ চক্রান্ত করা হয়েছে, যার ফাঁদে একবার পা দিলে সহজে আর গোলকধাঁধার প্যাঁচ হতে তাঁর নিষ্কৃতি নাই! এও বলতে পারি না, এ একটা অনাদি শাশ্বত দুর্বোধ প্রহেলিকা। সর্বজ্ঞ সর্বগুরু ঈশ্বরও তার রহস্য

---

* দুটি সত্যের একটি জড়জগতের সত্য, আরেকটি অতিচেতন চিৎজগতের সত্য। দুয়ের মাঝে আছে প্রত্যক-বৃত্ত এবং মনোময় চেতনার অবান্তর সত্য। তারা অসত্যদ্বারা বিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সে-অসত্যও নিজেকে গড়ে তোলে উপর হতে বা নীচ হতে সত্যের উপাদান আহরণ করে। তাই দুটি প্রত্যন্তলোক হতেই তার 'পরে চাপ পড়ছে তার অনৃত কল্পনাকে জীবনসত্যে এবং অধ্যাত্মসত্যে রূপান্তরিত করবার জন্যে।

জানেন না, সুতরাং আমরাই-বা জানব কি করে।...এই তামস মায়ারও পিছনে আছে বিশ্বপ্রজ্ঞার একটা সার্থক প্রেতি, সর্বচিতের একটা অকুণ্ঠ ঈশনা—যা আমাদের স্বানুভব এবং বিশ্বানুভবের বর্তমান কল্পে একটা অপরিহার্য প্রয়োজনকে সিদ্ধ করছে। অস্তিত্বের এইদিকটা এবার আমাদের আরও খুঁটিয়ে বুঝতে হবে; দেখতে হবে কোথায় তার উৎস, কতটুকুই-বা তার তাত্ত্বিকতার সীমা এবং বিশ্ব-প্রকৃতিতে কোথায় তার স্থান।

এ-সমস্যার বিচার হতে পারে তিন দিক থেকে : পরমার্থসতের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক, বিশ্বব্যাপারের কোথায় এর উৎস এবং কোথায় স্থিতি, ব্যষ্টি-জীবের 'পরে কতখানি এর প্রভাব এবং অধিকার। স্পষ্টই দেখছি, পরমার্থ-সতের মধ্যে অসত্য ও অশিবের নিদান খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা তাঁর স্ব-ভাবে এধরনের কোনও-কিছুর সত্তাই অকল্পনীয়। এরা অবিদ্যা ও অচিতির বিসৃষ্টি—শুদ্ধসন্মাত্রের মৌল বা প্রথমজ বিভূতি নয়। বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনা অথবা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন পুরুষের অনন্তবীর্যের স্বধর্মও এরা নয়।... কখনও তর্ক ওঠে : সত্য ও শিবের যেমন চরম কোটি আছে, তেমনি আছে অসত্য এবং অশিবেরও ; কিংবা এতটা না হলেও, তারা অন্যোন্যসাপেক্ষ নিশ্চয়ই। এই ভূমিতেই আছে বিদ্যা আর অবিদ্যা, সত্য আর অসত্য, শিব আর অশিবের দ্বন্দ্ব। এই আপেক্ষিকতাকে আশ্রয় করে তাদের সত্তা, তার বাইরে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে তাদের কোনও অস্তিত্বই নাই।...কিন্তু এসব দ্বন্দ্ব-সম্পর্কের স্বরূপসত্যের তো এই পরিচয় নয়। প্রথমত, স্পষ্টই দেখছি অসত্য আর অশিব অবিদ্যার পরিণাম মাত্র; যেখানে অবিদ্যা নাই, সেখানে তারাও নাই—সত্য আর শিবের সঙ্গে এইখানে তাদের তফাত। অতএব দিব্য-পুরুষে তাদের স্বয়ম্ভূসত্তা অথবা পরমা প্রকৃতিতে তাদের সহজ-স্থিতি কোনমতেই কল্পনা করা চলে না। বিদ্যার যে-সঙ্কোচে অবিদ্যার উদ্ভব, তার বাঁধন যদি খসে যায়, অবিদ্যা যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলে বিদ্যার উদার জ্যোতিতে, তাহলে অসত্য এবং অশিবও অপগত হয়। কেননা তারা উভয়েই অচেতনা ও বিকৃতচেতনার পরিণাম। অতএব অবিদ্যার অপসারণে অখণ্ড সত্যচেতনার আবির্ভাবে অসত্য ও অশিবেরও কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই থাকে না। তাই অসত্য ও অশিবের নিরপেক্ষ সত্তা বা পরাকাষ্ঠা কিছুতেই সিদ্ধ হতে পারে না। এরা বিশ্বভুবনের চলতি-পথের উপসৃষ্টি মাত্র। এরা আলোর কমল নয়, অচিতির অন্ধতমঃ হতেই ফুটেছে এই অসত্য অশিব ও সন্তাপের কালোর ফুল। পক্ষান্তরে, সত্য ও শিবের মধ্যে এমন-কোনও অবগুণ নাই, যা তাদের চরমত্বের সহজ প্রকাশকে ব্যাহত করতে পারে। সত্যে-মিথ্যায় ও শিবে-অশিবে আপেক্ষিকতার যে-দ্বন্দ্ব, তা আমাদের অনুভবসিদ্ধ তথ্য হলেও তত্ত্ব নয়—তাও ব্যাবহারিক চেতনারই একটা উপসৃষ্টি। এই দ্বন্দ্বকে অস্তিত্বের শাশ্বত

স্বভাবধর্ম বলতে পারি না, কেননা মানুষী চেতনার পঙ্গু বিচারেই তাদের সত্যতা নিরূপিত হয়েছে। সে-বিচারকে ছেয়ে আছে খানিক-জানা খানিক-না-জানার আলো-আঁধারি।

সত্যকে আমরা আপেক্ষিক মনে করি, কেননা আমাদের বিদ্যাকে ঘিরে রয়েছে অবিদ্যার বেড়া। মানুষের সত্যদৃষ্টি বাইরের প্রতিভাসে আটকা পড়ে যায়, কিন্তু সেখানে তো বস্তুস্বভাবের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। আরও গভীরে তলিয়ে গিয়ে যেটুকু আলোর দেখা পাই, তাও শুধু আন্দাজ অনুমান বা আভাসের মায়া—অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের দর্শন তো নয়। তাই আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকে একদেশদর্শিতা জল্পনা বা কৃত্রিমতার প্রাচুর্য। সত্যের সঙ্গে পরোক্ষসন্নিকর্ষজনিত অনুভবকে ভাষায় রূপ দিতে যাই যখন, তখন তার মধ্যে ফোটে তত্ত্বরূপ নয়—শুধু তার প্রতিচ্ছবি বা রেখার মায়া, শুধু ছায়াময় মানসপ্রত্যক্ষের শব্দময় ছায়া। তাকে কি করে বলি সত্যের সত্যবিগ্রহ, কি করে তাকে অপরোক্ষের মর্যাদা দিই? এইসব প্রতিচ্ছবি বা রূপরেখা স্বভাবতই অপূর্ণ এবং অস্পষ্ট, তাদের মলিন করেছে অবিদ্যা ও প্রমাদের ছায়ানুচরেরা। একটি সত্যের উপরোধে আর-সব সত্যকে তারা খেদিয়ে দেয় কি ঠেকিয়ে রাখে। এমন-কি তাদের স্বীকৃত সত্যকেও তারা পুরাপুরি প্রামাণ্যের মর্যাদা দেয় না। সত্যের একটি প্রত্যন্তভাগ মাত্র বিসর্পিত হয় রূপের কূলে, তার বাকিটুকু থাকে ছায়ায় ঢাকা—অদৃশ্য বিকৃত বা সন্দিগ্ধদর্শন হয়ে। এমন কথাও বলা চলে, মনের ছায়াছবিতে সত্যের সত্যরূপ কোনকালেই ফুটতে পারে না : মন যাকে দেখায়, সে তো সত্যের নিরাবরণ নিরঞ্জন বিগ্রহ নয়—তাকে যে ঢেকে রয়েছে অনৃতের নিচোল। অনেকসময় ওই নিচোলের আবরণটুকুই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু চেতনার অপরোক্ষবৃত্তি বা তাদাত্ম্যপ্রত্যয় দিয়ে সত্যকে জানার ধরন তো এমন নয়। সে-দর্শনেও সীমার সঙ্কোচ থাকতে পারে। কিন্তু যতটুকু তার প্রসার, তার মধ্যে তার প্রামাণ্য অব্যাহত। আর নির্বাধ প্রামাণ্যই আনে পরমার্থতত্ত্বের প্রথম সূচনা। অপরোক্ষদর্শন বা তাদাত্ম্য-প্রত্যয়েও ভ্রান্তির ছায়াপাত হতে পারে—মনের আহৃত নানা সংস্কার, অতি-ব্যাপ্তি-দুষ্ট অনুমান কি তত্ত্বাবধারণের বৈকল্যবশত। কিন্তু বস্তুর তত্ত্বরূপে সে-ভ্রান্তি উপসংক্রান্ত হয় না। তাদাত্ম্যদৃষ্টি অথবা তত্ত্বানুভবের স্বতঃ-প্রামাণ্যই হল বিদ্যার স্বরূপ এবং তার স্বয়ম্ভাব সত্তাতে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের মন দেখে তার গৌণরূপ—যার প্রামাণ্য সংশয়িত, যার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধতার স্বচ্ছতা নাই। অবিদ্যার স্বরূপে কিন্তু এই স্বয়ম্ভাব বা স্বতঃপ্রামাণ্যের অভাব স্বাভাবিক। অবিদ্যার সত্তা নির্ভর করছে বিদ্যার সঙ্কোচ অবরোধ বা অভাবের 'পরে। তেমনি প্রমাদের মূলে আছে সত্য হতে স্খলন, অনৃতের মূলে আছে সত্যের বিকৃতি বিরোধ কি নিরাকৃতি। কিন্তু বিদ্যার

সম্পর্কে এমন কথা বলা চলে না যে, অবিদ্যার সংকোচ অবরোধ বা অভাবই তার স্বরূপ। মানুষের চিত্তে কখনও হয়তো দেখি, অবিদ্যার সংকোচে কি নিরোধে বিদ্যার উন্মেষ—অর্ধচ্ছন্ন আলোক হতে অন্ধকারের অপসরণে, কখনও-বা দেখি অবিদ্যারই বিদ্যায় রূপান্তর। কিন্তু তবু জানি, সত্তার গভীর গহনে আছে বিদ্যার স্বভাবস্থিতি। সেখান হতেই আমাদের চেতনায় তার স্ব-তন্ত্র আবির্ভাব ঘটে।

ঋতচেতনাই শিবের আধার, আর অশিব বেঁচে থাকে শুধু অনৃত-চেতনাকে আশ্রয় করে। অবিমিশ্র ঋতচেতনাতে শুধু শিবেরই স্থান আছে। অশিবের খাদ সেখানে থাকতেই পারে না, কিংবা অশিবের এতটুকু আভাস থাকতে শিবের আর্বিভাব হয় না। কিন্তু সত্য ও প্রমাদের মত প্রাকৃতমনের কল্পিত শিব আর অশিবের সংজ্ঞাও অনিশ্চিত এবং আপেক্ষিক। বিশেষ-কোনও দেশে অথবা কালে যা সত্য, অন্যকোনও দেশে বা কালে হয়তো তা প্রমাদদুষ্ট। আজ আমরা যাকে মনে করছি শিবময়, অন্য-কোনও দেশে বা কালে তা-ই হয়তো অশিবের নিদান। আবার এও দেখি : আমরা যাকে বলছি শিবময়, তার পরিণাম হল অনর্থ; যাকে ভাবছি অশিব, চরমে তা দেখা দিল কল্যাণের মূর্তিতে। কিন্তু শিব হতে অপ্রত্যাশিতভাবে অশিবের উৎপত্তি হয় যখন, তখন তার মূলে থাকে বিদ্যার সংগে অবিদ্যার সংমিশ্রণজনিত ব্যামোহ এবং ঋতচেতনার সংগে অনৃতচেতনার সাংকর্য—যার জন্যে অজ্ঞান অথবা প্রমাদকে আমরা কল্যাণসাধনার দিশারী করি। কখনও-বা অশিবের অনাহূত উপদ্রবে শিবের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবার অশিব হতে শিবের আবির্ভাব যখন হয়, তখন সে অপ্রত্যাশিত বিপরীতপরিণামের মূলে থাকে অন্তর্গূঢ় কোনও ঋতময় চেতনা ও শক্তির আবেশ—যা অনৃত-চেতনা ও অনৃতসংকল্পকে আপন বীর্যে পরাভূত করে। অথবা হয়তো কল্যাণশক্তির অতর্কিত আর্বিভাবে অমংগলও হয়ে ওঠে মংগলের নিদান। শিব-অশিবের এই সাপেক্ষত্ব ও ব্যামিশ্রতা মানবচেতনারই বিশিষ্ট ধর্ম—মানুষের জীবনে বিশ্বশক্তির লীলায়নের এই ধারা। শিব ও অশিবের স্বরূপসত্যের কোনও পরিচয় এতে নাই। আপত্তি হতে পারে, জড়প্রকৃতির অনর্থ—যেমন দেহের যন্ত্রণা ইত্যাদি—বিদ্যা ও অবিদ্যার অথবা ঋতচেতনা ও অনৃতচেতনার ধার ধারে না, জড়প্রকৃতির স্বভাবেই নিহিত রয়েছে তাদের মূল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দুঃখকষ্টের নিদান হল বহিশ্চেতনায় চিৎ-শক্তির সংকোচ—যাতে আমাদের প্রাকৃত আধার পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সাম-রস্যের সূত্র খুঁজে পায় না, অথবা বিশ্বশক্তির সকল অভিঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে আত্মসাৎ করতে পারে না। নতুবা জ্যোতির্ময় চেতনার অকুণ্ঠ আবেশে, চিন্ময় সন্ধিনী-শক্তির নিরঙ্কুশ প্রেতিতে বেদনাবোধের কোনও ঠাঁই হতে পারে না।

অতএব সত্য ও অসত্যের অথবা কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বন্দ্ব দুটি স্ব-তন্ত্র বস্তুর আপেক্ষিক দ্বন্দ্ব নয়। এদের বিরোধ যেন আলো-ছায়ার বিরোধের মত। আলো না থাকলে ছায়া পড়ে না, কিন্তু তাবলে আলোর প্রকাশের জন্য ছায়ার তো কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্মের কোনও-কোনও মৌল-বিভাবের বিরোধী প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর যে-সম্পর্ক, আসলে তা কিন্তু আত্যন্তিক বিরোধের সম্পর্ক নয়। 'সত্যং শিবং' নিশ্চয় ব্রহ্মের দুটি মৌল-বিভাবের পরিচয় বহন করে। কিন্তু তাবলে অসত্য এবং অশিবকে তাঁর মৌলবিভূতি বলা চলে না—কেননা আনন্ত্য অথবা শাশ্বত-সদ্ভাবের কোনও বীর্য তো নাই তাদের মধ্যে। এমন-কি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মে তাদেরও স্বয়ম্ভাব নিহিত আছে বীজাকারে, এমন কথাও বলা চলে না—স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবের প্রামাণ্য তো দূরের কথা।

সত্য ও শিবের প্রকাশ থাকলে অসত্য ও অশিবেরও কল্পনা এসে জোটে তার সঙ্গে—একথা অস্বীকার করা যায় না; কারণ যার ভাব আছে, তার অভাবও অকল্পনীয় নয়। সৎ চিৎ আনন্দের প্রকাশ হতেই সম্ভব হল অসৎ অচিৎ ও নিরানন্দেরও প্রকাশের কল্পনা। আবার কল্পনা হতে দেখা দিল তাদের আপাতিক অপরিহার্য বাস্তবসিদ্ধি—কেননা যা-কিছু সম্ভাবিত, তাতেই নিহিত রয়েছে বাস্তবে পরিণত হবার একটা অনতিবর্তনীয় প্রবেগ। অতএব ব্রহ্মসদ্ভাবের দিব্যবিভূতিতে যেসব বিরোধের আভাস জেগে ওঠে, তাদের বেলাতেও ঠিক এই নিয়মই খাটবে। অর্থাৎ স্ফুরণোন্মুখ ব্রাহ্মী চেতনায় বিসৃষ্টির আদিপর্বেই যদি দেখা দেয় এইসব বিরোধী প্রত্যয়ের সূচনা, তাহলে তাদের পরোক্ষ পারমার্থিকতাকে তো মানতেই হয়। বিশ্বভাবনার সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্কেও স্বীকার না করে আর উপায় থাকে না তখন।...কিন্তু গোড়াতেই লক্ষ্য করা উচিত, অসত্য ও অশিবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বিশ্বের বিসৃষ্টিতেই। কালাতীত সৎস্বরূপে তাদের সিদ্ধসত্তা অকল্পনীয়। কেননা, যে একত্ব ও আনন্দ কালাতীতের স্বরূপধাতু, তার সঙ্গে অসত্য ও অশিবের কোনই সামঞ্জস্য নাই। বিশ্বেও তাদের স্থান হতে পারে না, যতক্ষণ না সংকুচিত বৃত্তিহেতু দেখা দেয় সত্য ও শিবের একদেশী ও আপেক্ষিক রূপায়ণ, অখণ্ড সত্তা ও চৈতন্য পরিকীর্ণ হয়ে না পড়ে বিবিক্ত সত্তা ও চৈতন্যের বিকল্পনায়। কারণ, বিশ্বচেতনার বহুধাবৈচিত্র্যের মধ্যেও যেখানে চিৎশক্তির বিভিন্ন ধারার একপ্রত্যয়সার অন্যোন্যসংগম, সেখানে আত্মবিজ্ঞান ও অন্যোন্য-বিজ্ঞান ফুটে ওঠে স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যরূপেই। অতএব সেখানে নিজেকে বা পরস্পরকে না জানবার ক্ষীণতম আশঙ্কাও থাকতে পারে না। স্বতঃসংবিন্ময় অদ্বৈতচেতনার ভিত্তিতে অখণ্ডসত্যের প্রতিষ্ঠা যেখানে, সেখানে কি করে অসত্যের ঠাঁই হবে ? যেখানে অনৃতচেতনা ও অনৃতসংকল্পের

বঞ্চনা নাই বলে অসত্য ও প্রমাদে তাদের পর্যবসান ঘটে না, সেখানেও অশিবের প্রবেশাধিকার নাই। চেতনায় বিবিক্তবোধ যখন জাগে, তখনই দেখা দেয় অসত্য ও অশিবের সম্ভাবনা। কিন্তু তবু তাদের এই যৌগপদ্য একেবারে অপরিহার্য নয়। বিবিক্ত পুরুষদের মধ্যে অদ্বৈতচেতনা সুস্পষ্ট জাগ্রত না হয়েও যদি পরস্পরের ভাবের যোগ নিবিড় হয় এবং খণ্ডবিজ্ঞানশাসিত স্বভাবধর্ম হতে বিচ্যুতি না ঘটে, তাহলে সেখানে অশিবের প্রবেশের কোনও পথ থাকে না কিংবা সত্য ও সৌষম্যের একচ্ছত্র প্রভাব ব্যাহত হয় না। অতএব অসত্য ও অশিবের পারমার্থিক সত্তা তো নাইই—এমন-কি বিশ্বব্যাপারেরও তারা অপরিহার্য অঙ্গ নয়। বিশ্বব্যাপারে তাদের আবির্ভাব ঘটে প্রকৃতি-পরিণামের এক বিশেষ পর্বে—অর্থাৎ বিবিক্তভাব যখন পর্যবসিত হয় অন্যোন্য-বিরুদ্ধতায়, অবিদ্যা যখন বিদ্যাকে আবৃত ক'রে সে-আবরণের ভূমিকায় রচে অনৃতচেতনা ও অনৃতজ্ঞানের বিক্ষেপ এবং তাইতে সংকল্পে ও বেদনায় কর্মে ও চেতনায় অনৃতের আবর্ত ঘুলিয়ে ওঠে।...প্রশ্ন হবে, বিশ্ব-বিসৃষ্টির কোন্ পর্বসন্ধিতে দ্বন্দ্ববিরোধের এই মেলা দেখা দেয়? মনে হয়, বিভজ্যবৃত্ত প্রাণ ও মনের মধ্যে চেতনার যে ক্রমিক আত্মনিগূহন, অথবা অচিতির গহনে তার যে আত্মনিমজ্জন—এ-দুয়ের যে-কোনও ভূমিতে বিরোধের প্রথম সূচনা অসম্ভব নয়। তখন আবার প্রশ্ন ওঠে: অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিব—এরা কি প্রাণ ও মনের স্বাভাবিক ধর্ম—প্রাণময় ও মনোময় ভূমির প্রাক্‌সিদ্ধ বিভূতি? না অচিতির তমোভাবদ্বারা প্রাণে ও মনে সংক্রামিত হয়েছে বলেই জড়বিসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যরূপে তারা দেখা দিয়েছে? আরও একটা প্রশ্ন: জড়াতীত প্রাণ ও মনের ভূমিতেও যদি তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাই, তাহলে কি মনে করব তারা সে-ভূমির অনাদিসিদ্ধ কোনও ধর্ম? কেননা, এমনও তো হতে পারে, জড়বিসৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণামহেতু অথবা তার উৎসর্পণের ফলে জড়াতীত ভূমিতে তারা উপচারিত হয়েছে।...এ-সিদ্ধান্ত যদি সমীচীন না হয়, তাহলে কি কল্পনা করা চলে: বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণেই তাদের প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছে অজড়ভূমির ফলোন্মুখ ধর্মরূপে, কেননা এই উপক্রমণিকাটুকু না থাকলে তাদের আবির্ভাব এখানে সম্ভব হত না। হয়তো-বা অচিতির সিসৃক্ষার অপরিহার্য পরিণামস্বরূপ সমষ্টি প্রাণ-মনেরই সহজ ধর্ম তারা।

জড়ের রাজ্য ছাড়িয়ে গেলেও যে এসব অনর্থের একটা স্বধাম খুঁজে পাওয়া যায় লোক-লোকান্তরে—এমন-একটা চিরাগত সংস্কার পরম্পরাপ্রাপ্ত প্রত্যয়ের আকারে সঞ্চিত আছে মানুষের মনে। এই পৃথিবীর বুকে প্রাণশক্তি ও প্রাণাশ্রয়ী মনের লীলায়নে যেসব বিকৃত বিপর্যস্ত ও বিসংবাদী শক্তি এবং ব্যাকৃতির বিক্ষোভ দেখি, তাদের উপধাভূমি আমরা খুঁজে পাই জড়োত্তর

জগতে—যেখানে প্রাণচঞ্চল মন ও প্রাণের বীর্যবিভূতির বিপুল উৎস নিহিত রয়েছে। অধিচেতনভূমির অনুভব বলে : বিশ্বে এমন-সব অপার্থিব শক্তি যে আছে, শুধু তা-ই নয়। সেসব শক্তির আধাররূপে এমন অপার্থিব জীবও থাকা সম্ভব, যাদের মূলা প্রকৃতি অতিসক্ত হয়ে আছে অবিদ্যাতে, স্তিমিত চেতনার অন্ধতমিস্রায়, শক্তির অপপ্রয়োগে, আনন্দের তির্যক বিলাসে। এক-কথায় আমরা যাকে বলি অশিব, তার সঙ্গে কার্যকারণের ওতপ্রোত সম্বন্ধে তারা জড়িয়ে আছে। এসব শক্তি বা সত্ত্বের কাজ হল পৃথিবীর জীবের 'পরে তাদের প্রতীপ প্রবৃত্তির ভার চাপানো। বিশ্বের মধ্যে তারাও চায় স্বারাজ্যের অকুণ্ঠ অধিকার, তাই সত্য শিব ও জ্যোতির উপচয়কে ব্যাহত করবে এই তাদের পণ—বিশেষ করে মানুষের অন্তরে দিব্যচেতনা ও দিব্যভাবনার উন্মেষকে পরাভূত করাই যেন তাদের ব্রত। সৃষ্টির এইদিকটার বিবৃতি আমরা পাই শিব ও অশিব, ঋত ও নির্ঋতি, দেবশক্তি ও বৃত্রশক্তির নিরন্তর দ্বন্দ্বে—পৃথিবীর সর্বদেশের সংহিতায় ও পুরাণে, গুহ্যবিদ্যার সকল অনুশাসনে যুগে-যুগে যার কাহিনী বর্ণিত হয়ে এসেছে।

দেবাসুর-দ্বন্দ্বের এই পৌরাণিক কল্পনা বিন্দুমাত্র অযৌক্তিক নয়, কেননা আধ্যাত্মিক অনুভবের 'পরে এর প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জড়কে একমাত্র সত্য ভেবে মনকে কুনো করে না রাখি যদি, জড়োত্তর ভূমিকে স্বীকার করবার মত সহজ ঔদার্য যদি আমাদের থাকে, তাহলে এসব সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করবার কোনও কারণ দেখি না। বিশ্ব ও বিশ্বভূতের আয়তন ও প্রতিষ্ঠারূপে বিশ্বাত্মার চিন্ময়ভাবনা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বিশ্বশক্তিরও সর্বত্রসঞ্চারী নিরঙ্কুশ প্রেতি। এই আদ্যা শক্তির আবার আছে বহুমুখী একটা প্রসৃতি, বিচিত্রবীর্যের একটা বিভাবনা, অথবা বিশ্বতোমুখ প্রবর্তনার অজস্র লীলায়ন। বিশ্বে যা-কিছু মূর্ত হয়ে উঠছে, তার পিছনে আছে শক্তি কি শক্তিব্যূহের অধিষ্ঠান। সে-শক্তি চায় আধারের পূর্ণতা বা পুষ্টি, তার অব্যাহত ক্রিয়াতে খোঁজে আপন প্রতিষ্ঠা; অর্থাৎ আধারের সিদ্ধি উপচয় ও ঈশনাতেই তার সার্থকতা। বিনষ্টির অভিঘাতেও আধার যদি অটুট থাকে, জয়শ্রীতে সে যদি হয় দুর্ধর্ষ, তাহলে শক্তিরও আয়ু বেড়ে যায়, তার আত্ম-রূপায়ণ সার্থক হয়। যেমন আছে বিদ্যার বীর্যবিভূতি অথবা জ্যোতির শক্তিনিচয়, তেমনি আছে অবিদ্যারও বীর্যবিভূতি এবং অন্ধতামিস্রের তামস শক্তিরাজি। অবিদ্যা ও অচিতির রাজ্যকে চিরায়ু করাই তাদের সাধনা। যেমন আছে সত্যের শক্তি, তেমনি আছে অসত্যেরও শক্তি। অসত্যই তাদের উপ-জীব্য; অসত্যের পুষ্টি ও বিজয়ই তাদের সাধ্য। এমন শক্তি আছে, শিবের সত্তা ভাবনা ও প্রেতি যার প্রাণ; তেমনি অশিবের সত্তা ভাবনা ও প্রেতিদ্বারা অনুপ্রাণিত শক্তিরও অভাব নাই। অদৃশ্যলোকের এই সত্যকে প্রাচীনেরা

রূপকের ভাষায় বর্ণনা করেছেন আলো ও আঁধারের, শিব ও অশিবের দ্বন্দ্ব-রূপে। তারা চায় জগৎকে গ্রাস করতে, মানুষের জীবনকে আপন খুশিতে চালিয়ে নিতে। বেদে আছে দেবতাদের সঙ্গে বৃত্রদের ও দিতিপুত্রদের সংঘর্ষের কথা; পরবর্তী যুগে তারা কল্পিত হয়েছে অসুর রাক্ষস ও পিশাচ-রূপে। জরথুশ্ত্রীয় ধর্মে আছে দুটি 'মইনু' বা শক্তির দ্বন্দ্বের কথা; পরের যুগে সেমিটিক ধর্মে এই বিরোধই চিত্রিত হয়েছে একদিকে ঈশ্বর এবং তাঁর দেববাহিনী, আরেকদিকে শয়তান ও তার অনুচরবর্গের বিরোধরূপে। সব কাহিনীর একমাত্র তাৎপর্য : এমন-সব অদৃশ্য শক্তি ও সত্ত্ব আছে এ-জগতে, যাদের একদল মানুষকে নিয়ে চলে সত্য ও শিবের দিব্য জ্যোতির্ময় পথে, আবার আরেক দল তাকে ঘুরিয়ে মারে অসত্য ও অশিবের অন্ধতমিস্রায়—অদেবী মায়ার গোলকধাঁধায়। আধুনিক মন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বা অনুসৃষ্ট অদৃশ্যশক্তি ছাড়া আর-কোনও শক্তি মানতে চায় না। একথা সে ভাবতেই পারে না, জড়জগতে অহরহ দেখছি মানুষ পশু পক্ষী সরীসৃপ মাছ পোকা-মাকড় কি জীবাণুর যে-মেলা, তার বাইরে আর-কিছু সৃষ্টি করবার সামর্থ্য প্রকৃতির থাকতে পারে। কিন্তু জড়ধর্মী অদৃশ্য বিশ্বশক্তি অজীব পিণ্ডের 'পরে ক্রিয়া করছে—একথা বিজ্ঞান স্বীকার যদি করতে পারে, তাহলে প্রাণধর্মী ও মনোধর্মী অদৃশ্য বিশ্বশক্তি যে মানুষের প্রাণ-মনের 'পরেও ক্রিয়া করবে—একথা মানতেই-বা তার আপত্তি কি? প্রাণ ও মন জড়াতীত অপুরুষীয় শক্তি হয়েও যদি চেতনভূত সৃষ্টি করতে পারে, অথবা পুরুষকে শরীরী করে তুলতে পারে জড়ের জগতে, এমন-কি জড়কে ব্যবহার করতে পারে আপন শক্তির বাহনরূপে—তাহলে স্বধামে থেকে তারা যে অদৃশ্য সূক্ষ্মতর উপাদানে চেতন-বিগ্রহ সৃষ্টি করবে, অথবা জড়প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত জীবের 'পরে প্রভাব বিস্তার করবে, এও তো কিছু অযৌক্তিক কি অসম্ভব নয়। যেসব পুরাণকথা অতীত যুগের বিশ্বাস ও অনুভবের উপর গড়ে উঠেছে, তাদের স্বীকার করি আর না করি, একটা-কিছু সত্যকে ভিত্তি করে যে তাদের কল্পনা, একথা অস্বীকার করা চলে না।...তাহলেই বলতে হয়, এই পার্থিবজীবনে অথবা অচিতির ঊর্ধ্ব-পরিণামের কোনও পর্বে শিব ও অশিবের বীজশক্তি নিহিত নয়। বস্তুত অন্তরিক্ষের প্রাণশক্তিতে নিগূঢ় থেকেই এই পৃথিবীতে তারা এক জড়াতীত মহাপ্রকৃতির বিসৃষ্টিরূপে প্রতিফলিত হচ্ছে।

এর প্রমাণ পাই, যখন বহিশ্চেতনা হতে অন্তরাবৃত্ত হয়ে প্রবেশ করি আধারের গভীর গুহায়। তখন দেখি, মানুষের হৃদয় মন ইন্দ্রিয়চেতনা কিছুই তার আপন শাসনে নাই। এক অনির্বচনীয় বিশ্বশক্তির নিমিত্ত হয়ে সে কাজ করে চলেছে—জানে না কোথায় তার কর্মশক্তির উৎস। জড়ভূমি হতে অন্তরাবৃত্ত হয়ে মানুষ যখন অবগাহন করে অধিচেতনার গহনে, তখনই সে

এই শক্তির প্রত্যক্ষ অনুভব পায় এবং আধারের 'পরে তার ক্রিয়াকে আপন বশে আনতে পারে। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কত অতর্কিত শক্তির আকর্ষণ তার ডাইনে-বাঁয়ে, কত ভাবের ইঙ্গিত ও প্রবৃত্তির প্রেরণাকে আপন মনের স্বাভাবিক বৃত্তি ভেবে তাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তখন সে উপলব্ধি করে, সে যে অচেতন জগতে অচিৎ জড়ত্বের বীজ হতে আবির্ভূত চেতনার আলেয়ারূপে আত্ম-অবিদ্যার অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু, তা নয়। বস্তুত সে চৈতন্যবিগ্রহরূপে বিশ্বম্ভরা পরা প্রকৃতির মূর্ত আকৃতি —বিদ্যা ও অবিদ্যার এক মহাসংগ্রামভূমি তার জীবন। তার মধ্যে একদিকে রয়েছে অচিতির অমানিশা হতে উন্মিষিত চিন্ময় প্রকৃতির কৃচ্ছ্রতপস্যা, আরেকদিকে উপচীয়মান চিতিশক্তির ইশারা—বিপুল জ্যোতির্লোকের অদৃষ্ট দিগন্তের দিকে। যে-শক্তিরাজি তাকে চালিত করতে চাইছে—বিশেষ করে শিব ও অশিবের শক্তি—তারা বিশ্বপ্রকৃতিরই সঙ্গোপন বীর্য। শুধু-যে এই জড়জগৎ তাদের রঙ্গপীঠ, তা নয়। তাকেও ছাড়িয়ে তারা ব্যাপ্ত রয়েছে প্রাণ ও মনের জড়োত্তর বিপুল প্রসারে।

এক্ষেত্রে একটা বিষয়ের গুরুত্বসম্পর্কে আমাদের প্রথমেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায়, এসব জড়াতীত শক্তির উদ্বেলন মানুষের বাঁধাধরা মাপকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে তাদের মধ্যে যেমন আছে দিব্য আসুর বা পৈশাচিক বীর্যের অতিমানুষ বিপুলতা, তেমনি আবার মানুষের আধারেও গড়ে ওঠে তাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা রূপায়ণ, মনুষ্যত্বের মহিমায় অথবা কার্পণ্যে তাদের প্রকাশ ঘটে। কখনও ক্ষণে-ক্ষণে, কখনও-বা দীর্ঘকাল ধরে আধারে আবিষ্ট হয়ে মানুষকে তারা চালিয়ে ফেরে—কর্ম ও প্রবৃত্তির নিয়ন্তা হয়ে তার সমগ্র প্রকৃতিকে করে জারিত। এই জারণের ফলে মানুষ হয়তো মনুষ্যোচিত ভাল-মন্দের সীমা হতে নিক্ষিপ্ত হয় অনেক দূরে। বিশেষত তার মধ্যে মন্দের ভাগটা কখনও চরমে উঠে মানুষের পরিমাণবুদ্ধিকে হত-চকিত করে, মনুষ্যস্বভাবের পরিচিত সীমার বেষ্টনী ছাড়িয়ে আনে অপ্রাকৃত দানবীয় বৈপুল্যের অমেয়তা। তখনই প্রশ্ন হয় : অশিবশক্তির চরম-কোটি থাকতে পারে না—একথা মনে করা ভুল নয় কি? মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন আছে সত্য-শিব-সুন্দরের চরম-কোটির প্রতি একটা উদ্যত অভীপ্সা এবং ব্যাকুলতা—তেমনি আসুরশক্তির অপ্রমেয় উপচয় এবং দুঃখ ও সন্তাপের অকল্পনীয় তীব্রতা দেখে মনে হয় না কি, আরেকদিকে অসত্য অশিব ও অসুন্দরেরও একটা পরাকাষ্ঠা তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে?... কিন্তু একটা-কিছু অপরিমেয় হলেই যে তার অন্যনিরপেক্ষ একটা পরমকোটিও থাকবে, একথা তো সত্য নয়। কারণ পরা কোটি বা পরমত্বকে তো পরিমেয় পদার্থ বলা চলে না। স্বভাবতই সে সকল পরিমিতির অতীত—শুধু ইয়ত্তার

বৈপুল্যে নয়, স্বরূপসত্তার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যেও সে অপরিমেয়। তাই সে একদিকে যেমন 'অণোরণীয়াম্', আরেকদিকে তেমনি 'মহতো মহীয়ান্'। সত্য বটে, মনোরাজ্য হতে অধ্যাত্মরাজ্যের দিকে যতই এগিয়ে চলি—আর এই চলাটাই হল পরা কোটির দিকে চলা—ততই আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে শক্তি জ্যোতি শান্তি ও আনন্দের একটা উপচীয়মান সংবেগ, একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিব্যাপ্তি, যাকে বলতে পারি আমাদের সীমার বাঁধন কাটবার নিশানা। কিন্তু এই অমেয়তার অনুভব প্রথমে আনে প্রমুক্তির দ্যোতনা, ঊর্ধ্বস্রোতা বিশ্বতোব্যাপ্তির ব্যঞ্জনা। তখনও তার মধ্যে স্বয়ম্ভূসত্তার অন্তর্গূঢ় অনপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের মহিমা ফোটে না—যা নাকি পরা কোটি বা পরমপদের স্বরূপ। দুঃখ ও অশিব কোনকালেই পরা ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না—কেননা তারা জন্যপদার্থ, অতএব স্বভাবতই সীমার সংকোচে কুণ্ঠিত। তাই বেদনা অপরিমেয় হলেই, হয় সে নিজেকে বা আধারকে বিনষ্ট করে, নয়তো পর্যবসিত হয় অসাড়তায়; কদাচিৎ আনন্দোচ্ছ্বাসেও তার রূপান্তর ঘটে। তেমনি অকল্যাণও যদি একান্ত এবং অপরিমেয় হয়ে ওঠে, তাহলে হয় সে জগৎকে নয়তো অকল্যাণের আধারকে বিধ্বস্ত করবে, অথবা বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজেকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মিশিয়ে দেবে অসতের মহাশূন্যতায়। অবশ্য অসত্য ও অশিবের তামস শক্তি নিজের অতিস্ফীতিতে আনন্ত্যের কোঠায় যেন পৌঁছতে চায়। কিন্তু তবু তাদের বৈপুল্যকে অপরিমেয়ই বলতে পারি—অনন্ত নয়। কখনও-বা তাদের চরমে দেখা দেয় অচিতির মত আনন্ত্যের একটা অতলগহন যেন; কিন্তু বস্তুত সে-অনন্ত অনন্ত নয়, অনন্তের আভাস মাত্র স্বয়ম্ভাবই পরকোটিত্বের একমাত্র লক্ষণ—এখন সে-স্বয়ম্ভাব স্বরূপসত্তাই হ'ক, অথবা স্বয়ম্ভূসতের নিত্যসমবেত ধর্মই হ'ক। অসত্য প্রমাদ অশিব—এরা বিশ্বশক্তি হলেও অনপেক্ষস্বভাব নয়। কেননা, তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে স্ববিরোধী তত্ত্বের বিপর্যয় বা প্রতিষেধের 'পরে। অতএব তারা কোনমতেই সত্য ও শিবের মত অনপেক্ষ স্বয়ম্ভূতত্ত্ব অথবা পরাৎপর স্বয়ম্ভূসত্তার স্বগতবিভাব হতে পারে না।

এসব তামস শক্তির জড়পূর্ব ও জড়াতীত সত্তার সম্পর্কে আমরা যে-প্রমাণ আহরণ করেছি, তাইতে কিন্তু আরেকটা সংশয় জাগে। মনে হতে পারে, এরা কি তবে বিশ্বের কোনও অনাদি মৌলিক তত্ত্ব? কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, জড়াতীত ভূমিতে প্রাণের অবরলোকেই এদের স্থান, তার ঊর্ধ্বে এদের গতিবিধি নাই। 'বায়ু-লোকের লোকপালের অনুচর' তারা—এই হল প্রাচীনদের উক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁদের কাছে বায়ু ছিল প্রাণতত্ত্বের প্রতীক, তাই বায়ুলোক বলতে বুঝব অন্তরিক্ষ—যেখানে প্রাণতত্ত্বের প্রাধান্য। অতএব এইসব প্রতীপশক্তি কখনও বিশ্বের আদ্যা শক্তি নয়। আসলে তারা প্রাকৃত-

প্রাণের আয়তনে মধ্যপ্রাণ বা মনের বিসৃষ্টি। জড়াতীত ভূমিতে থেকেও পার্থিবপ্রকৃতিতে তাদের প্রভাব সংক্রামিত হয় এইভাবে : অবরোহপ্রকৃতির সংবৃত্তিশক্তিতে যেসব লোক সৃষ্ট হয়েছে, তাদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে আরোহপ্রকৃতির বিবৃত্তিশক্তিতে সৃষ্ট কতগুলি সমান্তরাল লোক। এসব লোক ঠিক যে পার্থিবপ্রকৃতির বিসৃষ্টি, তা নয়। এরা দেখা দিয়েছে অবসর্পিণী লোকধারার উপকণ্ঠে, পার্থিব ঊর্ধ্বপরিণামের প্রাক্‌সিদ্ধ আশ্রয়রূপে। এই-খানেই অশিবশক্তির আবির্ভাব হতে পারে—অবশ্য স্বগতধর্মরূপে প্রাণের সবখানি জুড়ে নয়, কিন্তু সম্ভাবিত একটা বীজসত্তারূপে, যা অবশেষে নিয়তি-বশেই অচিতি হতে উন্মিষন্ত চৈতন্যের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়। মোট কথা, অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান আমাদের খুঁজতে হবে অচিতির মধ্যে—কেননা চেতনার অভিমুখে অচিতির যাত্রা শুরু হয় যখন, তখন সেই পথের বাঁকে দেখি তাদের রূপায়ণ। মনে হয়, ওইখানেই তাদের আবির্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়, অপরিহার্যও বটে।

অচিতি হতে প্রথম হল জড়। জড়ের মধ্যে অসত্য বা অশিব বলে কিছুই নাই, কেননা অসত্য এবং অশিবের সৃষ্টি হয় খণ্ডিত ও অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চর চেতনার বৃত্তিতে। জড়শক্তিতে কি জড়পদার্থে চেতনার এমন-কোনও বহিঃস্ফুট অভিব্যক্তি বা সাড়া আমরা খুঁজে পাই না। তার অন্তরগহনে নিগূঢ় হয়ে আছে যে-চেতনা, তা অদ্বিতীয় একরস নিষ্ক্রিয়। বস্তুর আধারশক্তিতে সমবেত ও তদ্‌গত হয়েও সে-চেতনা নিঃসাড়। শুধু অন্তর্গূঢ় অব্যক্ত ভাবনা দিয়ে সে শক্তির বিগ্রহকে ধরে আছে, এইটুকু তার প্রবর্তনা। এর বাইরে তার ক্রিয়াশক্তির আর-কোনও প্রকাশ নাই : সে যেন আত্মবিসৃষ্ট শক্তির রূপায়ণে আত্মহারা ও নিঃসুপ্ত—নিজেকে প্রকাশিত বা সংক্রামিত করবার কোনও প্রচেষ্টাই যেন তার মধ্যে নাই। কঠ উপনিষদের ভাষায়, জড়বিগ্রহেও চৈতন্য 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব'। কিন্তু সে-প্রতিমাতে মনোবিগ্রহের আবেশ নাই বলে তাতে আত্মসচেতন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার কোনও আভাস দেখা দেয়নি। তাই একমাত্র চেতনজীবের সংস্পর্শে এলেই জড়ের শুভাশুভ শক্তির পরিচয় মেলে। কিন্তু সে-শুভাশুভের নিরিখ হল স্পৃষ্ট জীবের ইষ্টানিষ্ট অথবা হিতাহিতের বোধ। অতএব তারা জড়বস্তুর স্বভাবধর্ম নয়। যে-শক্তি জড়কে আপন স্বার্থে ব্যবহার করছে, অথবা যে-চৈতন্য জড়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হচ্ছে, তারাই তার মধ্যে এই দ্বন্দ্বধর্মকে আরোপ করছে। আগুন মানুষকে পোড়ায় কি গরম রাখে—এর ভাল-মন্দের ভাবনা মানুষেরই, আগুনের নয়। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও পরোয়া না করে আগুন তার কাজ করে যায় মাত্র। বনৌ-ষধিতে রোগ সারে বা বিষ প্রাণহরণ করে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই দ্রব্যগুণের শুভাশুভ পরিণাম নির্ভর করছে দ্রব্যের 'পরে নয়, তার প্রযোক্তার 'পরে। এও

লক্ষণীয়, বিষ প্রাণ নিতেও পারে দিতেও পারে, ওষুধে রোগ সারাতেও পারে বাড়াতেও পারে। সুতরাং বিশুদ্ধ জড়ধর্ম তটস্থ উদাসীন—ভাল-মন্দের কোনও দায়ই তার নাই। মানুষ তার 'পরে ভাল-মন্দের আরোপ করে মাত্র। পরমা প্রকৃতিতে শিব-অশিবের দ্বন্দ্ব যেমন নাই, তেমনি নাই জড়প্রকৃতিতেও : একটি তাকে পেরিয়ে গেছে, আরেকটি পড়ে আছে তার নীচে। কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে রহস্যবিজ্ঞানের গভীর গবেষণাকে যদি প্রামাণিক বলে মানি, তাহলে হয়তো বিষয়টার আরেকটা চেহারা দেখতে পাব। রহস্যবিদ্যা বলে, জড়ের সঙ্গে চেতনশক্তির একটা নৈসর্গিক যোগাযোগ আছে এবং সে-শক্তিযোগের পরিণাম শুভ কি অশুভ দুইই হতে পারে। কিন্তু তবু একথা অনস্বীকার্য যে, এই শক্তিযোগেও বস্তুর তটস্থ ধর্ম ব্যাহত হয় না। কেননা তার ক্রিয়ার মূলে কোনও ব্যষ্টিচেতনার সাক্ষাৎ প্রেতি নাই - সে শুধু অপরের প্রযোজনায় শুভ অশুভ অথবা শুভাশুভ পরিণামের বাহন মাত্র। অতএব শিব-অশিবের দ্বন্দ্ব জড়তত্ত্বের সহজধর্ম নয় বলে জড়প্রকৃতিতে তার অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাই না।

এই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় চেতন প্রাণের ভূমিতে এবং প্রাণের মধ্যে মনের স্ফুরণে তার পূর্ণ রূপ স্ফুরিত হয়। প্রাণময় মন, বাসনামানস এবং ইন্দ্রিয়মানস যেমন অশিববোধের তেমনি অশিববস্তুরও স্রষ্টা। পশুর জীবনে অশিব বা অনর্থ একটা বাস্তব সত্য। দৈহিক কষ্ট এবং কষ্টবোধ, পরকৃত উৎপীড়ন ক্রূরতা সংঘর্ষ ও বঞ্চনা—এসব পশুজীবনের প্রত্যক্ষ অনর্থ। কিন্তু এই অনর্থবোধের সঙ্গে অধর্মবোধ জড়িয়ে নাই, কেননা পশুর মধ্যে পাপ-পুণ্যের কোন বালাই নাই—প্রাণের রক্ষণ এবং পোষণ অথবা প্রাণপ্রবৃত্তির পরিতর্পণের খাতিরে তথাকথিত ভাল-মন্দ সকল কর্মই তার মঞ্জুর হয়ে আছে। সুখ-দুঃখের বেদনায় অথবা প্রাণবাসনার তৃপ্তি কি অতৃপ্তিতে অবশ্যই শিব-অশিবের প্রচ্ছন্ন রূপ অনুস্যূত হয়ে আছে—অনুকূল ও প্রতিকূল ইন্দ্রিয়সংবেদনের আকারে। কিন্তু মনের মধ্যে ধর্মাধর্মের বোধে তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুধু মানুষের চেতনাতে। অবশ্য এহতে তাড়াতাড়ি এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হবে না যে : পাপ-পুণ্য মিথ্যা—মনের সংস্কার মাত্র; সুতরাং প্রকৃতির সকল বিক্ষেপে উদাসীন থাকা, কিংবা সব-কিছুকে সমানভাবে গ্রহণ করাই আমাদের পুরুষার্থ, অথবা তার বিধানকে দৈব্যব্রত বা স্বভাবের প্রবর্তনা মনে করে সব-কিছুকে সমান মর্যাদা দেওয়াই আমাদের সমন্বয়বুদ্ধির চরম পরিচয়। মানি, এও সত্যের একটা দিক। প্রাণ ও জড়ের একটা অবরসত্য আছে, যেখানে যুক্তি পৌঁছয় না। সেখানে সমস্তই নিষ্পক্ষ এবং তটস্থ। সে-সত্যের দৃষ্টিতে সব-কিছুই প্রাকৃতিক তথ্য মাত্র এবং তা-ই নিয়ে চলছে প্রাণের সৃষ্টি পুষ্টি ও বিনষ্টির লীলা। বিশ্বশক্তির এই তিনটি নিয়তস্পন্দের মধ্যে একটা অপরি-

হার্য অন্যোন্যযোগের সম্বন্ধ আছে। অথচ স্বস্থানে তারা কেউ কারও চেয়ে খাটো নয়।...আবার আছে বিবেকদৃষ্টির সত্য : প্রকৃতির সমস্ত তথ্যকেই সে দেখে জড়- এবং প্রাণ-প্রবৃত্তির আবশ্যক সাধনরূপে; সে-দৃষ্টি তটস্থ নিষ্পক্ষ নির্বিকার—সব-কিছুই তার সমানভাবে গ্রাহ্য। এ-দৃষ্টি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের। তাঁদের বুদ্ধি সাক্ষীর আসনে বসে সব দেখে এবং বুঝতেও চায়, কিন্তু বিশ্বশক্তির লীলাকে ভাল-মন্দের কোঠায় ভাগ করবার চেষ্টাকে মনে করে নিরর্থক।...এরও পরে আছে অধ্যাত্মচেতার তত্ত্বদৃষ্টির সত্য, যা যুক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। সে-দৃষ্টিতে ভাসছে বিশ্বের ভব্যরূপ। প্রকৃতির সব-কিছুকে সে নিষ্পক্ষ হয়ে গ্রহণ করে—অবিদ্যা ও অচিতির জগতের সত্য এবং স্বাভাবিক লক্ষণ বা পরিণামরূপে; অথবা দেবতার লীলাজ্ঞানে প্রশান্ত চিত্তের কারুণ্য নিয়ে সমস্তই সে মেনে নেয়। সে জানে, আজ যা অনর্থের আকারে দেখা দিয়েছে, তার কবল হতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় আছে চেতনা ও বিজ্ঞানের উত্তরায়ণে। তাই স্তব্ধচিত্তের প্রতীক্ষা নিয়ে সে বসে আছে। তবু আনুকূল্য সম্ভব ও সার্থক যেখানে, সেখানে আনুকূল্য বিতরণেও তার কার্পণ্য নাই।... কিন্তু তাসত্ত্বেও রয়েছে আমাদের চেতনার এই অন্তরিক্ষলোক—যেখানে শিব আর অশিবের দ্বন্দ্ব এতই সত্য যে, তুচ্ছ কি নিরর্থক বলে তাদের ঠেলে ফেলতেও পারি না। এই প্রবুদ্ধচেতনার রায়কে প্রামাণ্যের নিরিখে ক্ষেত্রবিশেষে যা-ই মনে করি না কেন, তবু এ যে প্রকৃতিপরিণামের একটা অপরিহার্য পর্ব—একথা অনস্বীকার্য।

কিন্তু কোথা হতে এই দ্বন্দ্বচেতনা জাগল? মানুষের মধ্যে এমন কি আছে, যা ভাল-মন্দের উদ্যত বোধকে তার জীবনে এতখানি শক্তিমন্ত করে তোলে? শুধু বহিরঙ্গ ব্যাপার দেখে বিচার করলে বলতে পারি, প্রাণময় মনের মধ্যেই এই দ্বন্দ্ববোধের অঙ্কুর দেখা দেয়। তার প্রথম মাপকাঠি হল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সংবিৎ : যা-কিছু প্রাণময় অহন্তার অনুকূল সুখাবহ ও হিতকর, তা-ই ভাল; আর যা-কিছু তার প্রতিকূল দুঃখদায়ক অনিষ্টকর বা বিনষ্টির সাধন, তা-ই মন্দ।...তার দ্বিতীয় মাপকাঠি সামাজিক হিতবোধ : যা সংঘজীবনের অনুকূল তার জন্য সংঘান্তর্ভুক্ত ব্যক্তির কাছে যা-কিছু দাবি করা যেতে পারে তার দায়রূপে, সংঘজীবন ও ব্যক্তিজীবনকে পুষ্ট তৃপ্ত উন্নত ও সুশৃঙ্খল করতে যা-কিছু সেবা আদায় করা চলে ব্যক্তির কাছ থেকে, তা-ই ভাল; আর সামাজিক দৃষ্টিতে যার পরিণাম বা প্রবর্তনা সমাজধর্মের প্রতিকূল, তা-ই মন্দ।...তারপর চিন্তনশীল মন নিয়ে আসে তার নিজের মাপকাঠি—ভাল-মন্দের বিচার করতে চায় সে বুদ্ধির ভিত্তিতে : কল্যাণ ও অকল্যাণের একটা তাত্ত্বিক রূপ আছে; তার মূলে কাজ করছে হয়তো যুক্তির বিধান, কি বিশ্বব্যাপ্ত স্বভাবের বিধান, কি কর্মের বিধান। এমনি করে যুক্তিকে ভাবা-

বেগকে রসবোধকে অথবা আত্মরতিকে ভিত্তি ক'রে একটা ধর্মসংহিতা সে খাড়া করে।...আবার ধর্মবুদ্ধি এসে দাঁড়ায় ঋতচেতনার পোষকরূপে: প্রকৃতি অনৃতের ধাত্রী বা প্রবর্তিকা হলেও ঈশ্বরের শাসন ঋতময়, তাঁর বাণী ঋতম্ভরা; এমন-কি সত্য ও ঋতই ঈশ্বর, তাছাড়া আর ঈশ্বর নাই—এই তার রায়।... কিন্তু মনে হয়, মানুষের আচারে এবং বিচারে ঋতচেতনার এই-যে স্বাভাবিক প্রবর্তনা, তার গভীরে আছে আরেকটা নিগূঢ়তর সত্যের আবেশ। এসমস্ত মাপকাঠিই হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং আড়ষ্ট, নয়তো জটিল এবং ব্যামিশ্র। তাদের প্রামাণ্যও অনিশ্চিত, কেননা মানুষের প্রাণে বা মনে কোনও পরিবর্তন কি বিবর্তন দেখা দিলে এসব আদর্শেরও বিপর্যয় ঘটে। অথচ হৃদয় বলে, চেতনার গভীরে কোথাও একটা শাশ্বতসত্যের প্রতিষ্ঠা প্রচ্ছন্ন আছে, তাকে সহজে জানবার নিগূঢ় সামর্থ্যও আছে আমাদের মধ্যে। অর্থাৎ ঋতপ্রবৃত্তির সত্যকার প্রেষণা আসে অন্তরের গভীর হতে, চৈত্যসত্তার চিন্ময় ভূমি হতে। সাধারণত একে আমরা বলি ধর্মাধর্মবোধ। স্বরূপত দৃক্‌শক্তি হলেও তার আধখানা বোধি আধখানা মন—তাই এ-বোধ অগভীর কৃত্রিম ও অবিশ্বস্ত। সত্যকার ঋতবোধ আছে এই চেতনার আরও গভীরে—বিশ্বতশ্চক্ষুর চক্ষুরূপে প্রকৃতির অন্তর্জ্যোতিরূপে সে আমাদের মাঝে জ্বলছে। অথচ বাইরে তার ক্রিয়া স্তিমিত, বহিশ্চর চেতনার আবর্জনায় তার রূপ আচ্ছন্ন।

কিন্তু এই গুহাহিত সাক্ষিচৈতন্য বা সাক্ষিজীবের স্বরূপ কি? কল্যাণ-অকল্যাণবোধের কি সার্থকতাই-বা আছে তার কাছে?...কেউ বলবেন: জগতে অনর্থ এবং পাপ আছে—এই বোধ হতে শরীরী জীবের চিত্তে জাগে অচিতি ও অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্ন জগতের তত্ত্বজ্ঞান। জীব বুঝতে পারে—জগৎ অনর্থ ও সন্তাপে জর্জরিত, এখানকার সুখ ও কল্যাণ আপেক্ষিক মাত্র। অতএব এর প্রতি বিমুখ হয়ে অনপেক্ষ ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধিকে সে করে তার পুরুষার্থ। জীবের কাছে কল্যাণ-অকল্যাণবোধের সার্থকতা এই।...আবার কেউ বলবেন: এ-বোধ হতে মানুষের হৃদয়ে জাগে কল্যাণসেবন ও অকল্যাণপরিহারের প্রবৃত্তি। তার ফলে যখন তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তখন ঈশ্বরের কল্যাণতম রূপকে দর্শন করবার জন্য জগৎ হতে বিমুখ হয়ে সে তাঁর দিকে ধাবিত হয়।... অথবা কুশলকর্মসাধনার 'পরে জোর দিয়ে বৌদ্ধ হয়তো বলবেন: এ-বোধ মানুষের অবিদ্যাকলুষিত অহংগ্রন্থি বিকীর্ণ করবার পক্ষে সহায় হয়ে আত্ম-ভাব ও দুঃখ হতে বিমুক্তি আনে।...কিন্তু এমনও হতে পারে, ঋতচেতনার স্ফুরণ চিৎপরিণামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। একে অবলম্বন করে জীব অবিদ্যার গহন হতে উত্তীর্ণ হয় চিন্ময় অদ্বৈতজ্যোতির সত্যলোকে, পায় দিব্যচেতনা ও দিব্যজীবনের স্বরাট অধিকার। আমাদের প্রাণ-মন কল্যাণ কি অকল্যাণ দুয়েরই দিকে অপক্ষপাতে ঝুঁকতে পারে। কিন্তু একমাত্র চৈত্য-

পুরুষ বিবেকদৃষ্টি দিয়ে তাদের মাঝে একটা ভেদের রেখা টানেন। সে-বিবেক নিশ্চয় মনঃকল্পিত ধর্মাধর্ম-বিবেকের চাইতে উদার ও গভীর। আধারে নিবিষ্ট চৈত্যপুরুষই সত্য-শিব-সুন্দরের নিত্য পূজারী, কেননা এই পূজাতে তাঁর পুষ্টি। অবশ্য অসত্য অশিব ও অসুন্দরের সংস্পর্শে আসা তাঁর অখণ্ড অনুভবের একটা অবর্জনীয় অঙ্গ—কিন্তু দৈবী সম্পদ বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়াও নিয়তির বিধান। চিৎপরিণামের পর্বে-পর্বে সর্বতোমুখ অনুভবের স্বাদু পিপ্পলকে আস্বাদন করাই গুহাহিত চৈত্য-পুরুষের স্বভাব। তিনি যে জীবনরসিক, তার পরিচয় সকল মাত্রাস্পর্শ হতেই তাদের অন্তর্গূঢ় 'সৌম্য মধু'র আহরণে, তাদের দিব্য প্রয়োজন ও আকূতির আবিষ্কারে। এমনি ক'রে বিচিত্র অনুভবের সোমপাত্র হতে আনন্দসুধা পানে আমাদের প্রাণ ও মনের পুষ্টি ঘটে, তারা অচিতির অন্ধলোক হতে উত্তীর্ণ হয় পরা সংবিতের দিব্যধামে, অবিদ্যার খণ্ডবোধজর্জর অনুভবকে রূপান্তরিত করে সম্যক্-চেতনা ও সম্যক্-বিজ্ঞানের বৃহৎসামে। হৃদয়গুহায় চৈত্যপুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন এইজন্যই—জন্ম হতে জন্মান্তরে অনুসরণ করে চলেছেন উত্তরায়ণের পথে উপচীয়মান আলোকের নিরন্ত অভিযান। জীবের পুষ্টি এবং উপচয় ঘটে 'অন্ধং তমঃ' হতে জ্যোতির্লোকে, অসত্য হতে সত্যে, দুঃখ-সন্তাপ হতে বিশ্বব্যাপী পরমানন্দের স্বধামে উত্তরণে। চৈত্যপুরুষের বিবেকদৃষ্টিতে শিব-অশিবের যে-রূপ ফোটে, মনঃকল্পিত কৃত্রিম আদর্শবাদের সঙ্গে তার সঙ্গতি না থাকাই সম্ভব। কারণ চৈত্যপুরুষের ঋতবোধ আরও গভীর। প্রাণের কোন্ ধারা উত্তরজ্যোতির অভিমুখী, কোন্ ধারা পরাঙ্মুখ, তার ধ্রুবচেতনা তাঁর আছে। সত্য বটে, অবরজ্যোতি যেমন ভাল-মন্দের নীচের তলায় পড়ে আছে, তেমনি উত্তরজ্যোতিও দুয়ের দ্বন্দ্ব পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, নিষ্পক্ষ তটস্থবৃত্তি নিয়ে বিশ্বের সব-কিছুকে আমরা সমান দরের মনে করব, অথবা ভাল-মন্দ সকল বৃত্তিতেই সমানভাবে সাড়া দেব। নির্দ্বন্দ্বভূমি বলতে বুঝি এমন লোক, যেখানে বৃহত্তর ঋতের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে বলে মনঃকল্পিত দ্বন্দ্ববিধুর বিধানের কোনও অবকাশ বা প্রয়োজনই নাই। পরমার্থসত্যের একটা স্বধর্ম আছে, যা সকল বিধিনিষেধের ওপারে। তেমনি আছে বিশ্বজনীন এক পরমকল্যাণ—যা স্বয়ম্ভূ স্বয়ম্প্রজ্ঞ স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃশাসিত ও বস্তুস্বভাবে নিত্যসমবেত, অথচ যার মধ্যে আছে সাবলীলতার অন্তহীন ব্যঞ্জনা ও পরম আনন্ত্যের জ্যোতির্ময় নিরঙ্কুশ চিদ্-বিলাস।

অসত্য এবং অশিব তাহলে অচিতিরই স্বাভাবিক পরিণাম; অর্থাৎ অবিদ্যার লীলায়নে অচিতি হতে প্রাণ ও মনের স্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের আবির্ভাব ঘটে। এইবার দেখতে হবে—কি তাদের উদ্ভবের রীতি, কাকে

আশ্রয় করে তারা টিকে আছে, তাদের কবল হতে নিষ্কৃতির উপায়ই-বা কি। অচিতি হতে প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনার বহির্ব্যক্তিতেই অসত্য ও অশিবের আবির্ভাবের রীতি ধরা পড়ে। এই আবির্ভাবের দুটি নিয়ামক তত্ত্ব আছে। তাদেরই প্রশাসনে অসত্য ও অশিবের অব্যবহিত যুগ্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। প্রথমত, অচিতির গহনে এক স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞানের নিগূঢ় অব্যক্ত চেতনা ও বীর্য অন্তর্লীন হয়ে আছে, এবং তাকে ছেয়ে আছে অন্নময় ও প্রাণময় চেতনার একটা অনির্বাচ্য আকারপ্রকারহীন পিণ্ডিত ভাবনা। এই ছায়াচ্ছন্ন ক্লিষ্ট আবরণের ভিতর দিয়ে মনশ্চেতনাকে আপন পথ কেটে নিতে হয় এবং তার আড়ষ্ট তামসিকতার 'পরে দখল জমাতে হয় স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞানের স্বচ্ছতা নিয়ে নয়—বিকল্পনার কৃত্রিমতা দিয়ে। কারণ, তখনও আধারকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে অবিদ্যার ঘোর, অচিৎ জড়ের অন্ধতামিস্রময় গুরুভার।...আবার এইসঙ্গে প্রাণের যে বিবিক্ত রূপায়ণ চলে, আপনাকে তার প্রতিষ্ঠিত করতে হয় নিষ্প্রাণ জড়ধর্মের অসাড়তার সঙ্গে লড়াই করে। সে-অসাড়তার ঝোঁক বিস্রম্ভির দিকে—নিষ্প্রাণ অচিতির সনাতন তামসিকতার দিকে। এই মাধ্যাকর্ষণ ও বিকলনশক্তির টানের সঙ্গ যুঝে-যুঝে প্রাণের নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়। বিবিক্ত প্রাণবিগ্রহের মধ্যে অন্যোন্যাসঙ্গের বা অবয়ব-সংকলনের একটা সীমিত প্রয়াস আছে। এই নিয়ে তাকে বহির্জগতের সঙ্গেও লড়তে হয়। সে-জগৎ তার একান্ত পরিপন্থী না হলেও সেখানে অতর্কিত আপদের লেখাজোখা নাই। অথচ এই জগতেই তাকে টিকে থাকতে হবে, এবং টিকতে হলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—ছিনিয়ে নিতে হবে জীবনের প্রকাশ ও প্রসারের একটা উন্মুক্ত ক্ষেত্র। এমনি করে পর্বে-পর্বে চেতনার যে-উন্মেষ ঘটে, তার ফলে ব্যক্তির প্রাণময় ও অন্নময় বিগ্রহের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। অন্ন ও প্রাণের উপাদানে এইভাবে প্রকৃতি যে-আধার গড়ে তোলে, তা বস্তুত চেতনার বহিঃপ্রকাশের বাহন হলেও চিন্ময় সত্যজীব প্রথমত তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকেন। তারপর মনশ্চেতনার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণময় ও অন্নময় জীবের আধারের পুষ্টি ঘটে এবং তার মধ্যে ক্রমে জেগে ওঠে দেহাত্মা প্রাণাত্মা ও মন-আত্মার অহংপ্রতিষ্ঠার তাগিদ। আমাদের এই-যে বহিশ্চর চেতনা ও বহির্মুখ জীবনধারা, তার বর্তমান রূপটির মূলে প্রকৃতি-পরিণামের এই দুটি আদিম ও মৌল বিধানের প্রেরণা রয়েছে।

চেতনার প্রথম উন্মেষে তাকে একটা অতর্কিত বিস্ময় বলেই মনে হয়। চিৎশক্তি জড়ের সগোত্র নয়, অথচ অচিৎপ্রকৃতির বুকে তার অহেতুক আবির্ভাব হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে তার মন্থর আত্মপ্রকাশের কৃচ্ছ্রসাধনা! ক্ষণভঙ্গুর আধারে জীবের আবির্ভাব। জন্মকালে তার কোনই জ্ঞান থাকে না—শুধু বংশক্রমাগত একটা স্বরূপযোগ্যতা ছাড়া। সুতরাং অবিদ্যার বিদ্যাভি-

মুখী মন্থর প্রগতির সেই তো যোগ্য সাধন। এইটুকু পুঁজি নিয়ে তার জ্ঞানের আহরণ আপ্যায়ন ও সঞ্চয়নের সাধনা চলে। তিলে-তিলে সে যেন মহাশূন্যের বুকে ফুটিয়ে তোলে সৃষ্টির শতদল। কেউ হয়তো কল্পনা করবেন : চেতনা অনাদি-অচিতিরই একটা যন্ত্রতন্ত্রিত রূপান্তর ছাড়া আর-কিছু নয়। অচিতি মস্তিষ্ককোষে বহির্জগতের কতগুলি ছাপ রেখে চলেছে। আবার কোষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা সত্ত্বোদ্রেকের বশে সে-লিপির অর্থোদ্ধার হয়ে তার জবাব বেরিয়ে আসছে। এই ছাপ-পড়া এবং তার প্রতিক্রিয়াতে সাড়া-জাগা—একেই বলি চেতনা।...এ কিন্তু চেতনার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। এতে পাই শুধু তার যান্ত্রিক ব্যাপারের একটা বহিদৃষ্ট পরিচয়—তার স্বরূপের তত্ত্ব নয়। তাছাড়া, মস্তিষ্ককোষের অচেতন লিপি ও সাড়া কি করে সচেতন প্রত্যক্ষে পর্যবসিত হল, কি করে তাহতে বিষয়ের এবং সেইসঙ্গে নিজেরও সচেতন প্রত্যয় জাগল—এর কোনও মীমাংসা কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে নাই। অথচ তারও পরে আছে চেতনার বিচিত্র বৃত্তি—আছে ভাবনা কল্পনা জল্পনা, দৃষ্ট-বিষয়কে নিয়ে বুদ্ধির কত স্বচ্ছন্দ কসরত। অচিতির যান্ত্রিক-ব্যাপার হতে এগুলি জাগে কেমন করে? বস্তুত জড় হতে চেতনা ও বিজ্ঞানের উন্মেষ তবেই সম্ভব হয়, যদি জড়ের মধ্যে পূর্বেই নিহিত থাকে চেতনার নিগূঢ় আবেশ এবং তার স্বরূপশক্তির মন্থর ক্রমবিকাশের একটা প্রেতি। তাছাড়া পশু-জীবনের নানা তথ্য হতে এবং আমাদেরও উন্মিষন্ত মনের নানা ব্যাপার হতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, এই নিগূঢ় চেতনাতেও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানশক্তির এমন-একটা অন্তশ্চর ধারা আছে—যা পরিবেশের সঙ্গে প্রাণ-শক্তির সংঘাতে আপনাহতে বহিশ্চেতনায় উৎসারিত হয়।

পশুতে আত্মচেতনার প্রথম উন্মেষে দেখা দেয় চিৎশক্তির দুটি প্রবৃত্তি। স্বভাবতই পশুচেতনা অজ্ঞ ও অসহায়—বিশ্বের অজানা পরিবেশে অনভিজ্ঞ বহিশ্চরবৃত্তির সামান্য পুঁজিই তার সম্বল। তাই অন্তর্গূঢ় চিতিশক্তি তার চেতনার সদরমহলে বোধির একটা ক্ষীণতম দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে। তার আলোকে তার জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয়, তার আপনাকে টিকিয়ে রাখবার অবিরাম প্রয়াস চলে। অবশ্য পশু স্বয়ং এই বোধির নিয়ামক নয়, বরং এর দ্বারাই তার সকল ব্যবহার নিয়মিত। তার চেতনার অন্নময় ও প্রাণময় ধাতুর মর্মকোষে অবস্থাবিশেষে কি প্রয়োজনবশে আপনাহতে এই বোধির দ্যুতি ঝিকিয়ে ওঠে। বোধির বহিঃপরিণাম তিলে-তিলে আধারে সঞ্চিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সহজপ্রবৃত্তির আকার ধরে—যা দরকার হলে পশুর ব্যবহারে মুহূর্তেই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এই সহজপ্রবৃত্তি পশুর জাতিসম্পদ, তাই জন্মের সঙ্গেই পশুব্যক্তি তার পূর্ণ অধিকার পায়। বোধির প্রত্যেক প্রকাশে বোধি অভ্রান্ত। কিন্তু সহজপ্রবৃত্তি সাধারণত অভ্রান্ত হলেও প্রমাদের

অবকাশও তাতে আছে। তার ভুল হয় কি প্রয়াস ব্যর্থ হয় বহিশ্চেতনা বা অপরিণত বুদ্ধির প্ররোচনায়। কখনও-বা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও সংস্কারবশে সহজপ্রবৃত্তি আগের ধারাতেই যন্ত্রের মত কাজ করে যায়—তাতেও তার বিপদ ঘটে।...বোধি ছাড়া জ্ঞান আহরণের দ্বিতীয় সাধন হল প্রাকৃত ব্যষ্টিসত্ত্বের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষদ্বারা আত্মবহির্ভূত জগতের বোধ। এই বোধকে আশ্রয় করে প্রথম জাগে সম্মুগ্ধ ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান, তার পরে বুদ্ধিজাত প্রত্যয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ব্যাপারের মূলে চৈতন্য যদি অন্তঃস্যূত না থাকত, তাহলে সন্নিকর্ষ হতে সংবিৎ কি বিজ্ঞান জাগা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক আধারে অধিচেতনার আবেশ আছে। অবচেতন প্রাণশক্তি তার সদ্যোজাত অভাব ও আকূতির প্ররোচনায় এই অধিচেতনায় উপসংক্রান্ত হয়ে তাকে উন্মুখ করে তোলে। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ আবার এই উন্মুখীনতাকেই বেদনাবোধে এবং বহির্বৃত্ত সত্ত্বোদ্রেকে উদ্দীপ্ত করে। তাইতে আধারে বহির্জগতের একটা সুস্পষ্ট সংবিৎ ক্রমে পুঞ্জিত হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রাণশক্তির অভিঘাতে বহিশ্চেতনার উন্মেষ ঘটে এইজন্যে যে, সন্নিকর্ষের কর্তা ও কর্ম উভয়ের মধ্যে চিৎশক্তির একটা প্রাক্‌সিদ্ধ অভিনিবেশ আছে—অধিচেতনার অব্যক্ত সামর্থ্য-রূপে। সন্নিকর্ষের গ্রাহক বা বিষয়ীর আধারে প্রাণশক্তি যখন তীক্ষ্ণ ও উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন এই অধিচেতনাই বহিশ্চেতনায় অভিঘাতের জবাবে সড়ার আকারে ফুটে ওঠে। তার এই উন্মেষ প্রথম রচে পশুর প্রাণময় মন এবং অবশেষে চিৎ-পরিণামের ধারা বেয়ে রূপান্তরিত হয় মানুষের মননশীল বুদ্ধিতে।

অন্তঃস্যূত অধিচেতনার পূর্ণরূপ যদি বাইরে প্রকাশ পেত, তাহলে বিষয়ীর চেতনার সঙ্গে বিষয়ের অন্তর্নিহিত আধেয়ের সাক্ষাৎ যোগ ঘটত এবং তার ফলে বিষয়ীর জ্ঞান হত অপরোক্ষ। কিন্তু তা সম্ভব হয় না প্রথমত অচিতির ব্যাঘাতবশত, দ্বিতীয়ত অপূর্ণ অথচ উপচীয়মান বহিশ্চেতনাকে আশ্রয় করে মন্থর ক্রমবিকাশই চিৎপরিণামের নিয়তি বলে। তাই অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তি প্রাণ-মনের বহির্বৃত্ত স্পন্দন ও ব্যাপারদ্বারা নিজেকে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মাত্র। অপরোক্ষসংবিতের অভাব অবগ্রহ বা অপ্রাচুর্যবশত বাধ্য হয়ে তাকে পরোক্ষজ্ঞানের সাধনরূপে সৃষ্টি করতে হয় ইন্দ্রিয় ও সহজবৃত্তির একটা কাঠামো। এই বহির্মুখ জ্ঞান-বুদ্ধির আধার হয় অব্যাকৃত চৈতন্যের পূর্বকল্পিত একটা ব্যূহ—যাকে বলা চলে অন্তঃপ্রকৃতির সর্বপ্রথম বহির্মুখ ব্যাকৃতি। প্রথমত এই ব্যূহে চৈতন্যের ক্ষীণতম একটা আভাস থাকে। তার পরিচয় আমরা পাই ইন্দ্রিয়সংবিতের অস্পষ্ট বৃত্তিতে এবং সত্ত্বোদ্রেকের অন্ধ সংবেগে। ক্রমে কায়সংস্থানের যতই উন্নতি হতে থাকে, ততই এই পিণ্ডিত চেতনা সংহত ও সুস্পষ্ট হয় প্রাণন-মন ও প্রাণময়-বুদ্ধির আকারে। কিন্তু তাদের মধ্যে গোড়ায় স্বয়ংচল যন্ত্রবৎ-বৃত্তির প্রাধান্য থাকে। তা দিয়ে ব্যাব-

হারিক জীবনের নানা প্রবৃত্তি আকূতি ও প্রয়োজনের তাগিদই মেটানো চলে। প্রথমত এইসব ক্রিয়ার মূলে থাকে বোধি ও সহজ-প্রবৃত্তিরই প্রেরণা, এবং আধারের অন্তঃসূত চেতনা বাইরে ফুটে ওঠে দেহ-প্রাণের আশ্রিত চিতিধাতুর স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনে। মনের প্রথম স্পন্দন যখন দেখা দেয়, তখন প্রাণচেতনার এই যন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে সে জড়িয়ে যায়—চেতনার স্বরলিপিতে প্রাণময় ইন্দ্রিয়-সংবিতের সুরই চড়া হয়, আর মনের সুর থাকে খাদে। কিন্তু ধীরে-ধীরে মনের মধ্যে নিজেকে নির্মুক্ত করবার তপস্যা শুরু হয়। প্রাণের সংস্কার আকূতি ও প্রয়োজনের তাগিদ মেটানো এখনও তার কাজ হলেও, এবার ফুটতে থাকে মনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—ভূয়োদর্শন সিসৃক্ষা কলানৈপুণ্য সাভি-প্রায় কৃতি ও সংকল্পসিদ্ধির প্রয়াসরূপে। সেইসঙ্গে ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও অন্ধ-প্রবৃত্তির মধ্যে লাগে ভাবাবেগের আমেজ। তাইতে প্রাণবৃত্তির মূঢ় প্রতিক্রিয়াতে অতিশয় সূক্ষ্ম ও সুকুমার বেদনাবোধের একটা প্রোতি ও দরদ অনুপ্রবিষ্ট হয়। এখনও মন প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এখনও তার মধ্যে উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ বৃত্তিকলাপ দেখা দেয়নি। সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রাণময়-বোধির একটা বিপুল পরিবেশ এখনও তার সঞ্চরণক্ষেত্র। তাই এখনও বুদ্ধিবৃত্তির উপচয় যেন আলাদা-একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার, যদিও পশুজীবনের উন্নতির সঙ্গে তারও উন্মেষ অপরিহার্য।

মানুষের স্বাভাবিক পশুভাবের সঙ্গে যখন বুদ্ধির যোগ ঘটে, তখন মানুষের সচেতন ইচ্ছাশক্তির প্রবর্তনায় পশুভাব অবিলুপ্ত এবং সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তার প্রভূত পরিবর্তন পরিমার্জন ও ঊর্ধ্বায়ন ঘটে। প্রাণময়-বোধি ও সহজপ্রবৃত্তির যন্ত্রাচার ক্রমেই শিথিল হয়, আত্মসচেতন মনোময়-প্রজ্ঞার তুলনায় তার পূর্বতন প্রাধান্য অনেকপরিমাণে ক্ষুণ্ণও হয়। বোধির মধ্যে আর আগের মত শুদ্ধ বোধিত্ব থাকে না : প্রাণময়-বোধির প্রবল প্রকাশেও প্রাণধর্ম মনো-ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। আর মনোময়-বোধিকে তো নিখাদ বোধি বলাই চলে না, কেননা মনের কারবারে তাকে চালু করবার জন্য স্বভাবতই তার মধ্যে অন্য-কিছুর ভেজাল মেশানো প্রয়োজন হয়। অবশ্য পশুতেও বহিশ্চর চেতনার প্রভাবে বোধিবৃত্তি ব্যাহত বা রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু সে-প্রভাব সাধারণত ক্ষীণ বলেই তার ফলে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত যান্ত্রিক বিধানের বিশেষ-কোনও বিপর্যয় ঘটে না। কিন্তু মনোময় মানুষের বোধি যখন চেত-নার সদরমহলে আসতে চায়, তখন অর্ধপথেই তার রূপান্তর ঘটে। কেননা তখন তার সহজ বাণীর তর্জমা হয় মনের প্রজ্ঞাবাদে, জ্ঞানের আদি উৎসকে আচ্ছন্ন করে ফুটে ওঠে মনঃকল্পিত টীকাভাষ্যের বাহুল্য। সহজবৃত্তিরও এই দশা : তার বোধিজাত সহজতার সঙ্গে মনোধর্মের সংমিশ্রণ ঘটে এবং তাইতে তার চলনে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অবশ্য বুদ্ধির সজাগ বৃত্তি এই

অনিশ্চিতবৃত্তিকে দূর করতে চায়, কেননা বুদ্ধির সব-কিছুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রবণতা আছে। তাই মনের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে সহজপ্রবৃত্তির সকল দায় একেবারে না মিটলেও ক্রমে তার অনেকখানি ঝুঁকি এসে পড়ে বুদ্ধির 'পরে। প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষে উৎসর্পিণী চিৎশক্তির সামর্থ্য ও অধিকার সুদূর-প্রসারী হয়। কিন্তু তার সঙ্গে প্রমাদের সম্ভাবনাও সমান তালে বেড়ে চলে। কারণ, মনের জ্যোতিরভিযানে প্রমাদের ছায়া তার নিত্য অনুচর এবং চেতনা ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এই ছায়ার পরিসর স্বভাবত তার মধ্যে বেড়েই চলে।

চিৎপরিণামের প্রত্যেক পর্বে বহিশ্চেতনার দুয়ার যদি বোধির দিকে খোলা থাকত, তাহলে প্রমাদের সম্ভাবনাও তিরোহিত হত। কারণ বোধি হল আধারে নিগূঢ় অতিমানসের জ্যোতিঃসম্পাতের একটা ঝলক। তার ফলে ঋতচিতের যে-উন্মেষ ঘটে, পরিসর একান্ত সঙ্কুচিত হলেও তার প্রবৃত্তি কিন্তু নিঃসংশয় ও নিরঙ্কুশ হয়। এ-অবস্থায় কোনও সহজপ্রবৃত্তি গড়ে উঠলে বোধির সঙ্গে তার যোগ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হত। অর্থাৎ প্রকৃতিপরিণামের নতুন ছন্দে অথবা অন্তরে-বাইরে পরিবেশের পরিবর্তনে কোনমতেই তার তালভঙ্গ হত না। তেমনি, বুদ্ধিও গড়ে উঠত বোধির অনুকূল হয়ে—বোধির বাণীকে মনের ভাষায় তর্জমা করতে গিয়ে তাকে কোথাও সে বিকৃত করত না। হয়তো তার শাণিত দীপ্তির খরধার খানিকটা কুণ্ঠিত হত অবর-কর্মের প্রয়োজনে—যদিও এই অবরকর্মের সাধনা হত তার একটা গৌণবৃত্তি মাত্র, এখনকার মত মুখ্যবৃত্তি নয়। কিন্তু তাহলেও কোথাও তার পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকত না, কিংবা তার কুণ্ঠিত তমোভাগ জ্যোতির্ভাগকে অসত্য বা প্রমাদের গহনে নামিয়ে আনত না।...অথচ তা হতে পারল না। কারণ, বর্তমানে রূপধাতুর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে জড়ে এবং প্রাণ আর মনকে তার আশ্রয়ে থেকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। এই জড়ের মধ্যে অচিতির আবেশ এতই গভীর যে, তার প্রভাবে আচ্ছন্ন বহিশ্চেতনা অন্তর্জ্যোতির দীপনীতে সহজে আর সাড়া দিতে পারছে না। অলখের অতর্কিত ইশারা আসে বটে ভিতর হতে—কিন্তু তবু অপূর্ণ হলেও বাইরের জগতের তথ্যই তার কাছে সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। অতএব ভিতরের ইশারাকে উপেক্ষা করে বাইরের স্পষ্টভাষণকে সে অধিক মর্যাদা দেয়। বাধ্য হয়ে তাকে এই ন্যূনতা আঁকড়ে থাকতে হয়, কেননা ঋতচিতের মন্থর বিকাশ ঘটানো হল প্রকৃতির অভিপ্রায়। প্রকৃতি বেছে নিয়েছে কৃচ্ছ্র-তপস্যার পথ। অচিতিকে তাই ধীরে-ধীরে ফুটিয়ে তুলছে সে অবিদ্যায়, অবিদ্যাকে করছে ব্যামিশ্র সঙ্কীর্ণ একদেশী জ্ঞানের আধার : এমনি করে বহু সাধ্যসাধনায় তার মধ্যে জাগিয়ে

তুলছে ঋতচিৎ ও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার হিরণ্যদ্যুতির সম্ভাবনা। এই উত্তরায়ণ ও রূপান্তরের পথে আমাদের অপূর্ণ মনোময়-প্রজ্ঞা একটা অপরিহার্য পর্ব-সংক্রমণের আয়তন মাত্র।

বস্তুত ব্যাবহারিক জগতে দেখছি, চিৎপরিণামের লীলা চলছে চিৎ-সত্তার দুটি কোটির অন্তরালে। একদিকে রয়েছে অবিদ্যার বহির্বৃত্তি—ধীরে-ধীরে বিদ্যাশক্তিতে তার রূপান্তর ঘটছে; আরেকদিকে আছে অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির এমন-একটা আবেশ, যার মধ্যে বিদ্যাশক্তির সকল বিভূতি পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে—অবিদ্যার মধ্যে ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠবার অপেক্ষায়। বহির্বৃত্ত অবিদ্যাতামসের মধ্যে সম্ভূতিসংবিৎ বা বিভূতিসংবিতের এতটুকু আভাস নাই, অথচ তা-ই বিদ্যাশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে—কেননা চিতিশক্তি সংবৃত্ত হয়ে রয়েছে তার মর্মগহনে। চেতনার অত্যন্তাভাব অবিদ্যার স্বভাব হলে তার বিপরিণাম অসম্ভব। অথচ দেখছি, অচিতি রূপান্তরিত হতে চাইছে চিতিতে —এই যেন তামস অবিদ্যার সাধনা। প্রথমত তার মধ্যে দেখা দেয় অজ্ঞানের অন্ধতমিস্রা—বাইরের অভিঘাতে এবং প্রয়োজনের তাগিদে সে-তমিস্রার বুকে বেদনার সাড়া জাগে। তারপর সে ফোটে জিজ্ঞাসাব্যাকুল অবিদ্যার আকারে। তখন জগতের যাবতীয় শক্তি ও বস্তুর সন্নিকর্ষ তার জ্ঞানের সাধন হয়—পাথরে চকমকি ঠোকার মত আঘাতে-আঘাতে তারা সংবিতের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোলে। আমরা তাকেই বলি অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের সত্ত্বোদ্রেক। কিন্তু বহির্বৃত্ত অবিদ্যাতামস এই সত্ত্বোদ্রেককে অভিভূত ক'রে অস্পষ্ট এবং অপূর্ণ একটা প্রত্যয়াভাসে পরিণত করে। বিষয়-সন্নিকর্ষহেতু বোধির যে-সাড়া, অবিদ্যাতামস হয় পুরাপুরি তার তাৎপর্য ধরতে পারে না, নয়তো তাকে বিকৃত আকারে গ্রহণ করে। তবু এই উপায়েই আধারচৈতন্যের প্রথম সমুদ্রেক ঘটে, দেখা দেয় নিসর্গ- অথবা অভ্যাস-জাত সহজজ্ঞানের একটা আদিম সঞ্চয় এবং তাকে আশ্রয় করে সংবিৎশক্তি কলায়-কলায় উপচিত হয়। প্রথমে জাগে গ্রাহকসংবিতের একটা অনতিস্ফুট আভাস। তার পরে সেই আভাসই পরিণত হয় সমর্থ সংবিৎশক্তিতে, বিষয়ের তাৎপর্যগ্রাহী বুদ্ধিবৃত্তিতে, উদ্বুদ্ধ-চেতনার কর্মপ্রেরণায়, কল্পনাপ্রণোদিত প্রবৃত্তির প্রযোজনায়। এমনি করে অর্ধ-বিদ্যা আর অর্ধ-অবিদ্যার সংমিশ্রণে ধীরে-ধীরে মেলতে থাকে চেতনার দল। জানাকেই আশ্রয় করে সে অজানার দিকে হাত বাড়ায় : কিন্তু জ্ঞান তার অসম্পূর্ণ—কেননা বিষয়সন্নিকর্ষে যেমন সে পুরাপুরি নাড়া খায় না, তেমনি পুরাপুরি সাড়াও দেয় না। তাই বিষয়ের সংস্পর্শকে সে ভুল বোঝে এবং ভুল বুঝে বোধিজাত সত্ত্বোদ্রেককেও বিকৃত করে। এইভাবে দুদিক থেকে তার 'পরে এসে পড়ে ভুলের মার।

স্পষ্টই দেখছি, এ-অবস্থায় ভ্রম কি প্রমাদ চিৎপরিণামের অপরিহার্য

অঙ্গ হবে। অবিদ্যাতামস হতে তার সামান্যবৃত্তিকে আশ্রয় করে যেখানে বিদ্যার দিকে মন্থর গতিতে চেতনার ঊর্ধ্বপরিণাম শুরু হয়েছে, সেখানে তাকে যে প্রমাদকেই অপরিহার্য নিমিত্ত এবং সাধন করে অগ্রসর হতে হবে একথা বলাই বাহুল্য। উন্মিষন্ত চেতনাকে পরোক্ষ উপায়ে জ্ঞান আহরণ করতে হচ্ছে। সুতরাং তার প্রামাণ্য সম্পর্কে আমাদের অংশত কৃতনিশ্চয় হওয়াও অসম্ভব। কারণ বিষয়সন্নিকর্ষে প্রথম একটা জড়ধর্মী রূপাভাস প্রতীক প্রতিবিম্ব বা সংবিৎকম্পন মাত্র জাগে। তার পরিণামে দেখা দেয় প্রাণচেতনার একটা সম্মুগ্ধ সংবিৎ। তাতে অর্থের আরোপ ক'রে ইন্দ্রিয় এবং মন তাকে মনোময় ভাবে বা রূপে পরিণত করে। তারপর এমনিতর মনের আহৃত বস্তু-জ্ঞানের মধ্যে বিচিত্র সম্বন্ধের যোজনা করতে হয়। যা জানা যায়নি, পর্য-বেক্ষণ দ্বারা তাকে আবিষ্কার করে সঞ্চিত অনুভব ও জ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। প্রতি পদে নানা ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দেয় অতর্কিত কত তথ্য, কত অর্থ ব্যাখ্যা ও বিচার—বিচিত্র সম্বন্ধের কত জালবোনা। তাদের পরখ করে কাউকে গ্রহণ কাউকে-বা বর্জন করতে হয়। এই জটলার মধ্যে ভ্রমের অবকাশ কোথাও থাকবে না, এমন দাবি করলে জ্ঞান-আহরণের অনেক রাস্তাই বন্ধ হয়ে যায়। ভূয়োদর্শন মনের একটা মুখ্য সাধন। কিন্তু ভূয়োদর্শন ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, কেননা তার প্রতি পদে আছে অজ্ঞানো-পহত ভূয়োদর্শী চেতনার ভুল করবার সম্ভাবনা। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানস একটা তথ্যকে সহজেই ভুল বুঝতে পারে। তাছাড়া বিষয়গ্রহণের বেলায় আমরা তার কত-কিছু বাদ দিয়ে চলি, তথ্য বাছতে কি জুড়তে ভুল করি, অজ্ঞাতসারে নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার দিয়ে বিষয়কে বিকৃত করে দেখি। এমনিতর জোড়াতাড়ার শেষে মনের পটে বস্তুর যে-প্রতিরূপ আঁকা হয়, তাকে খাঁটি বা পূর্ণাঙ্গ বলব কোন্ সাহসে? আবার এই প্রত্যক্ষের ভুলের বোঝার সঙ্গে এসে জোটে অনুমানের ভুল, তর্কের ভুল, বিচারবুদ্ধির ভুল। অতএব তথ্যের সংকলন যেখানে অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত, সেখানে তাকে ভিত্তি করে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করলে সেও যে অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

প্রাকৃতচেতনায় জ্ঞানের অভিযান জানা হতে অজানার দিকে চলেছে। অনুভবের সঞ্চয় স্মৃতি সংস্কার ও বিচার দিয়ে সে জ্ঞানের একটা কাঠামো, নানা রঙের নক্‌শা-কাটা একটা মনের ছক গড়ে তোলে। বাঁধাধরা একটা ছাঁদ থাকলেও মুহূর্তে-মুহূর্তে তার অবয়বের অদলবদল ঘটছে। নতুন-কোনও জ্ঞানের বিষয় পেলে তাকে যাচাই করা হয় অতীত জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সেইভাবে তাকে পুরানো কাঠামোর সঙ্গে জোড়া হয়। নতুনে-পুরানোতে জোড় না মিললে কোনরকম গোঁজামিলের ব্যবস্থা হয়, অথবা নতুনকে বাতিল করা হয়। কিন্তু জ্ঞানের যে-কাঠামোকে আমরা মানদণ্ড করেছি, তা যে নতুন

বিষয় কি জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্রের সঙ্গে খাপ খাবেই, জোর করে তো এমন কথা বলা যায় না। এমনও হতে পারে, নতুনকে পুরানোর সঙ্গে মেলাতে গিয়ে গরমিলটা আরও বেশী হল, অথবা তাকে বাতিল করাটা ভুল হল।...এমনি করে তথ্যকে ভুল দেখা এবং ভুল ব্যাখ্যা করা তো আছেই, তাছাড়াও আছে জ্ঞানের অপপ্রয়োগ—তথ্যের ভুল যোজনা, কল্পনার ব্যভিচার, বস্তুস্বরূপের কদর্থনা ইত্যাদির আকারে মনোময় প্রমাদের একটা জটিল জাল। অবশ্য গোধূলির আলোকে দীপ্ত মনোরাজ্যের এই প্রদোষচ্ছায়ায় আছে গুহাহিত বোধির প্রেরণা ও সত্যভাবনার নিগূঢ় প্রেতি—যা ভ্রমকে সংশোধন করে অথবা বুদ্ধিকে সংশোধনের তাগিদ দেয়, তার মধ্যে বস্তুর তত্ত্বরূপের জিজ্ঞাসা এবং অব্যভিচারী জ্ঞানের একটা আকূতি জাগায়। কিন্তু মন তার ইশারা বুঝতে পারে না বলে মানুষের অন্তরে বোধির অধিকারও সংকীর্ণ—বলতে গেলে সে যেন পরতন্ত্র সেখানে। কারণ অন্নময় প্রাণময় বা মনোময়—যে-ভূমির বোধিই হ'ক না কেন, আমাদের প্রাকৃতচেতনায় ভেসে ওঠে তার নিরাবরণ বিশুদ্ধ রূপটি নয়, কিন্তু মনের রঙে রাঙানো অথবা মনের নীলঘন কঞ্চুকে আবৃত একটা ছদ্মরূপ। এই কঞ্চুককে ভেদ করে বোধির আসল চেহারাটি ধরা শক্ত। তাই মনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, মনের 'পরে তার কি কাজ, তা না বুঝতে পেরে মানুষের অর্ধচেতন অস্থির বুদ্ধি বোধির ব্যাপারকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে। বিষয়ভেদে বোধিরও ভেদ আছে। ভূতার্থের বোধি, ভব্যার্থের বোধি, সর্বাধার অন্তর্যামী সত্যের বোধি—প্রত্যেকের ধারা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাদের ঘুলিয়ে ফেলে। এমনি করে জড়ো করা অর্ধজীর্ণ উপাদানের এলোমেলো একটা স্তূপ এবং তা-ই দিয়ে পরীক্ষাচ্ছলে গড়ে তোলা নিত্য-নতুন কাঠামো, আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে মনের কোণে লালন করা একটা আড়ষ্ট-কঠিন অথচ ব্যামিশ্র সংস্কারজর্জরিত ধারণা, অর্ধেক-গোছানো অর্ধেক-অগোছানো অর্ধেক-সত্য অর্ধেক-মিথ্যা অপূর্ণ জ্ঞানের নানা আবর্জনাতে বোঝাই করা নিজেকে—এই হল মানুষের প্রাকৃতজ্ঞানের পরিচয়।

প্রমাদমাত্রেই যে স্বরূপত অসত্য, তা নয়। হয়তো সে সত্যের অপূর্ণ ছবি, ভব্যার্থের একটা আভাস বা ফলোন্মুখ জল্পনা। যখন জানি না কিন্তু জানতে চাই, তখন অনেক অনিশ্চিত এবং অপরীক্ষিত সম্ভাবনাকেও আমাদের মেনে নিতে হয়। তার ফলে একটা অপূর্ণ বা অনুচিত প্রকল্পও যদি মনের মধ্যে গড়ে ওঠে, অপ্রত্যাশিতভাবে অজানা সত্যের দুয়ার খুলে দেওয়ায় তারও হয়তো সার্থকতা ঘটে। তখন সে-প্রকল্পকে ভেঙে নতুন করে গড়ে অথবা তার অন্তর্নিহিত গোপন সত্যকে আবিষ্কার করে অনুভবের ভান্ডারে অভিনব সম্পদও আমরা আহরণ করতে পারি। ভ্রমসঙ্কুল ব্যামিশ্র-জ্ঞানও চেতনা বুদ্ধি ও যুক্তির উপচয়ে ক্রমে জ্ঞানসাংকর্যের ভিতর দিয়ে আত্মজ্ঞান ও জগৎ-

জ্ঞানের অবিমিশ্র তাত্ত্বিক প্রত্যয়ে পেঁছিতে পারে। এমনি করে অনাদি অচিতির সর্বগ্রাসী বাধা ধীরে-ধীরে কেটে যেতে পারে, প্রবুদ্ধ মনশ্চেতনার দীপনীতে জ্বলে উঠতে পারে অখণ্ডবিজ্ঞানের ভাস্বর দ্যুতি, তার স্পর্শে থরে-থরে বিকসিত হতে পারে অপরোক্ষসংবিৎ ও বোধিচেতনার নিগূঢ় বীর্য, এবং সে-বীর্য আধারের পরিমার্জিত ও প্রতিবুদ্ধ সাধনসম্পদকে তার বাহন করে এই সংসারের বুকে মানসবুদ্ধিকে গড়ে তুলতে পারে তার সত্য প্রতিভূ ও সত্যের নির্মাতারূপে।

কিন্তু এইখানে চিৎপরিণামের দ্বিতীয় নিমিত্ত এসে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ আমাদের জ্ঞানের আকৃতি যে মানসবুদ্ধির স্বাভাবিক সঙ্কোচদ্বারা ব্যাহত একটা নৈর্ব্যক্তিক মনোময় ব্যাপার মাত্র, তা নয়। এছাড়াও আমাদের আছে অহন্তার দুরাগ্রহ। আছে দেহের অহং, প্রাণের অহং; তারা আত্মজ্ঞান বা জগৎজ্ঞানের সত্যকে আবিষ্কার করতে চায় না—চায় প্রাণের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা। তারও পরে আছে মনের অহং; সেও স্বরাজ্যের অধিকার খুঁজছে, অথচ প্রাণের প্রেতি তাকে ব্যবহার করছে প্রাণবাসনা ও প্রাণধর্মকে চরিতার্থ করবার সাধনরূপে। মনের পুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মধ্যে মনোময় ব্যক্তিচেতনাও পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘিরে দেখা দেয় মনের মেজাজে সংস্কারে ও আত্মরূপায়ণে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটা ঝোঁক। এই বহিশ্চর মনোময় ব্যক্তিচেতনা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক। জগতের সব-কিছুকে সে নিজের দৃষ্টিকোণ হতে দেখে। তাই সে পায় শুধু নিজের 'পরে তাদের প্রভাবের পরিচয়—তত্ত্বের পরিচয় নয়। একটা-কিছুকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার সমস্ত দেখার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজস্ব ঝোঁক আর মেজাজের বাহুল্যটুকু, চলছে নিজের রুচি ও সুবিধার আওতায় সত্যের সাজানো-গোছানো বা বাছাই-ছাঁটাই। ভূয়োদর্শন বা যুক্তি-বিচার সবার 'পরে এই মানসব্যক্তিত্বের প্রভাব ও শাসন রয়েছে। সে-ই ব্যষ্টি অহং-এর দাবিদাওয়ার সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলে। কখনও-কখনও মনের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি ও তত্ত্বের তীব্র একটা পিপাসা দেখা দেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি এ-পরিবেশে ফুটবে কি করে? বুদ্ধি যতই মার্জিত সতর্ক ও কঠোর হ'ক, জগতের তথ্য ও ভাবকে গ্রহণ করতে কিংবা মনের আহৃত জ্ঞানকে আকার দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে সত্যকে যে সে মোচড় দিয়ে বসে! এমনি করে সত্যের কত-যে বিকৃতি ঘটে, তার লেখাজোখা নাই। মনের অঙ্গনে দিনে-দিনে মিথ্যার জঞ্জাল স্তূপাকার হয়ে ওঠে। ক্রমে সত্যকে মিথ্যা করবার ঝোঁকটাই হয় স্বাভাবিক। তখন অচেতন বা অর্ধসচেতনভাবে বেড়ে ওঠে ভুল করবার প্রবণতা, সত্য-মিথ্যার বিবেক না করে তথ্য কি ভাবকে গ্রহণ করতে আর সঙ্কোচ হয় না—কেননা মনের গ্রহণবৃত্তির মূলে তখন কাজ

করছে তার ব্যক্তিগত রুচি মেজাজ যোগ্যতা বা সংস্কার। মনের এই অবস্থাই হল অসত্যবীজ অঙ্কুরিত হবার উর্বর ক্ষেত্র। এখানে ভুলের দুয়ার নানাদিকে খোলা রয়েছে। তাই অন্দরমহলে কখনও সে ঢোকে চোরের মত, কখনও-বা হানা দেয় দুর্ধর্ষ দস্যুর মত—অথচ তাকে না মেনেও উপায় নাই। অবশ্য সে-পথে সত্যও এসে বাসা বাঁধতে পারে—কিন্তু তার আগমন মঞ্জুরি পায় স্বাধিকারের দাবিতে নয়, মনের খোশখেয়ালে।

সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান অনুসারে ব্যক্তিচিত্তের তিনটি থাক আছে—তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক চিত্তের মূলে রয়েছে মোহাচ্ছন্ন অসাড়তার আবেশ—অচিতির সে-ই প্রথম সন্তান। রাজসিক চিত্তে কাজ করছে ভাবাবেগ ও কর্মচাঞ্চল্যের ক্ষুব্ধ উত্তালতা। আর সাত্ত্বিক চিত্তকে ঘিরে আছে আলোর সুষমা, সাম্যের ছন্দ।...তামস বুদ্ধির অধিষ্ঠান অন্নময় চিত্তে। ভাব তার মধ্যে কোনও সাড়া জাগায় না। অসাড় নিষ্ক্রিয় অন্ধতার প্রেরণায় চিরাচরিত সংস্কারের যে-বোঝা একবার মাথায় তুলে নিয়েছে, তাকে সে চিরকাল আঁকড়ে থাকবে। অভ্যস্ত ভাবকেও সে গ্রহণ করে আচ্ছন্ন হয়ে। নিজের কুণ্ডলীকে কিছুতেই প্রসারিত করতে চায় না বলে নতুন ভাবের ধাক্কা পেলে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্বভাবতই সে গোঁড়া—অচলায়তনের বাসিন্দা, তাই পরম্পরাগত জ্ঞানের কাঠামোকেই আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে। কলুর বলদের মত বাঁধা পথে পাক খেয়ে মরাই তার কর্মের রীতি। তাই তার বীর্য কুণ্ঠিত হয় কেবল অভ্যস্ত চিরাগত চিরপরিচিত বুদ্ধির-বালাইশূন্য সুতরাং নিরাপদ আচারের অনুবর্তনে। যা-কিছু নতুন বলে তার আরামশয়নে বিঘ্ন ঘটায়, তাকেই সে দুহাতে ঠেকাতে থাকে!...রাজসিক বুদ্ধির অধিষ্ঠান প্রাণময় চিত্ত। তার আবার দুটি ধারা : একটি আত্মরক্ষার প্রেরণায় উগ্র ও উত্তাল। ব্যক্তিমানস এবং তার অনুকূলে যা-কিছু তার আকূতিসম্মত বা জীবনদর্শনের উপযোগী, তাকেই সে চায় প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তার মনোময় অহন্তার প্রতিকূল কি ব্যক্তিগত বুদ্ধির রুচিবিরুদ্ধ যা-কিছু, তার প্রতি সে খড়্গহস্ত। আরেকধরনের রাজসিক বুদ্ধি নিত্য-নতুনের উপাসক—তার হৃদয়ে আবেগ, চিত্তে দুরাগ্রহ, গতিতে ঝঞ্ঝার মত্ততা। সে অস্থির, নিত্যচঞ্চল, উদ্দাম। তার ভাবনায় সত্যের শান্ত দীপ্তি নাই, আছে খরধার বুদ্ধির যুযুৎসা, গতির উচ্ছলতা, অভিনবের এষণা।...সাত্ত্বিক বুদ্ধি সত্যপিপাসু। সত্যের সম্পর্কে যথাসম্ভব উদার হয়েও সে সতর্ক ও বিচারশীল। যা-কিছু সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তাকেই সে মানিয়ে নেয় নিজের মতের সঙ্গে—কিন্তু বিনা পরখে নয়। যা গ্রহণযোগ্য তাকে গ্রহণ করতে তার দ্বিধা নাই, কেননা কুশলী শিল্পীর মত সমন্বয়বুদ্ধির সৌষম্য দিয়ে সে সত্যের প্রতিমা গড়ে। কিন্তু মানস প্রজ্ঞার দীপ্তিতে স্বাভাবিক একটা সঙ্কোচ আছে বলে সাত্ত্বিক বুদ্ধির দীপ্তিও

কুণ্ঠিত। তাই অত্যুদার হয়ে সত্য ও জ্ঞানের সকল বিভাবকে সমভাবে গ্রহণ করা তার সাধ্য নয়। প্রবুদ্ধচিত্তের অহং তার নিত্য সহচর বলে, তার ভূয়োদর্শন যুক্তি বিচার বা রুচি সব-কিছুর 'পরে এই অহংএর ছাপ পড়ে।...বেশীর ভাগ মানুষেই দেখা যায় এই তিনটি গুণের একটি-না-একটির প্রাধান্যের সঙ্গে আর-দুটির সংমিশ্রণ। তাই একই চিত্ত হতে পারে এক বিষয়ে উদার সাবলীল ও সৌষম্যময়, আরেক বিষয়ে উত্তাল অসহিষ্ণু সংস্কারাচ্ছন্ন ও বৈষম্যে বিক্ষুব্ধ, আবার আরেক বিষয়ে আচ্ছন্নবুদ্ধি ও পরাঙ্‌মুখ। ব্যক্তিভাবের এই-যে সঙ্কোচ, এই-যে নিজের চারদিকে ব্যূহ রচনা করে যা-কিছু অপাচ্য তাকে প্রত্যাখ্যান করবার একটা চেষ্টা, জীবচেতনার পুষ্টির দিক দিয়ে এরও একটা সার্থকতা আছে। পরিণামের ধারায় আজ যেখানে সে পৌঁছেছে, সেখানে তার আত্মপ্রগতির প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গি, অনুভবের একটা বিশেষ ধরন। এই বৈশিষ্ট্য এখন হবে—প্রকৃতির না হ'ক—অন্তত তার প্রাণ-মনের নিয়ন্তা। অতএব আপাতত একেই তার ধর্ম বলে মানতে হবে। ব্যক্তিভাব দ্বারা মনশ্চেতনার এই-যে সীমায়ন, সত্যের চারিদিকে এই-যে মানসিক রুচি ও মেজাজের বেষ্টনী, একে স্বভাবের আইন বলে স্বীকার করতেই হবে—যতদিন না ব্যক্তিচেতনা উত্তীর্ণ হচ্ছে বিশ্বচেতনার উদার লোকে, যতদিন না তাকে উন্মনা করে তুলছে উন্মনী ভূমির সুদূর আহ্বান। কিন্তু ঠিক এই কারণে এ-অবস্থায় ভুলের ফসল যে অপরিহার্যরূপেই ফলতে থাকে, তাও অনস্বীকার্য। চারদিকে এত বাধা আছে বলেই যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের জ্ঞানে অসত্যের বিকৃতি দেখা দিতে পারে, অচেতন বা অর্ধজাগ্রত চিত্তে ঘনিয়ে আসতে পারে আত্মবঞ্চনার ঘোর, জাগতে পারে দুয়ার হতে সত্য জ্ঞানকে খেদিয়ে দেবার দুর্বুদ্ধি, রুচিসম্মত মিথ্যাজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে প্রচার করবার তৎপরতা নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এই তো গেল জ্ঞানের গলদ। কিন্তু এর পুনরাবৃত্তি দেখা দিতে পারে সঙ্কল্প এবং কর্মের ক্ষেত্রেও। অবিদ্যা হতে জাগে অনৃতচেতনা এবং তাহতে দেখা দেয় 'দুরিত' বা ব্যবহারের একটা দুষ্ট ধরন—কোনও ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার সংস্পর্শে চিত্তের একটা দুষ্ট প্রতিক্রিয়া। অন্তশ্চেতনার গভীরতম অন্তস্থল হতে চৈত্যসত্তার যে-অনুশাসন প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির প্রেরণা নিয়ে আসে, তাকে উপেক্ষা করে বহিশ্চেতনা ক্রমে যেন আপন খুশিমত চলতে অভ্যস্ত হয়। আসলে কিন্তু অপ্রবুদ্ধ প্রাণ-মনের ইঙ্গিতকেই সে মান্য করে চলে, নিজেকে প্রাণময় অহংএর উদ্ধত দাবির কাছে বিকিয়ে দেয়। প্রকৃতিপরিণামের দ্বিতীয় সূত্র—যাকে বলেছি অনাত্মবৎ প্রতীয়মান জগতে প্রাণসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার বিবিক্ত প্রয়াস—এইখানে তা দেখা দেয় পরিণামের মুখ্য সাধন

হয়ে। বহিশ্চর প্রাণ-আত্মা কর্তৃত্বের অহংকারে স্পর্ধিত হয়ে ওঠে এইখানে এবং তার এই অবিদ্যামূঢ় স্পর্ধা প্রধানত আধারে উদ্বেল করে তোলে যত বিসংবাদ ও বৈষম্য, জীবনকে বাইরে-ভিতরে বিক্ষুব্ধ করে জাগায় দুষ্কৃতি ও অনর্থের কুটিল প্ররোচনা। প্রাকৃতপ্রাণ যতক্ষণ অমার্জিত অনিয়ন্ত্রিত ও আদিমসংস্কারে জর্জরিত থাকে, ততক্ষণ সত্য সম্যক্-চেতনা বা সম্যক্-কর্মের কোনও ধার সে ধারে না। তার লক্ষ্য তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠা, প্রাণশক্তির উপচয়, ভোগৈশ্বর্যের সাধনা, প্রবৃত্তির তর্পণ এবং বাসনার নিরঙ্কুশ চরিতার্থতা। এমনি করে প্রাণপুরুষের সকল দাবি ও প্রয়োজন মিটিয়ে চলাই হয় প্রাকৃত-প্রাণের একমাত্র কর্তব্য। এ-কর্তব্য পালন করতে সত্য ন্যায় বা কল্যাণ কোনও-কিছুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবার তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মন, আর জীবচেতনা। মনের গহনে আছে ঋত ও শিবের কল্পনা, চেতনায় আছে তার নিগূঢ় অনুভব। অতএব মনকে কাবু করে প্রাণ হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধ আকূতির একটা মঞ্জুরি। সে চায়, তার নিজস্ব প্রবৃত্তি বাসনা ও প্রতিষ্ঠাকে মন সত্য ন্যায় ও কল্যাণ বলে ঘোষণা করুক—কেননা এমনিতর একটা সমর্থন পেলেই তার নিরঙ্কুশ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক হবে। কিন্তু একবার মনের সায় পাবার পর আর তো তাকে আদর্শনিষ্ঠার কোনও দায় বহন করতে হবে না। তখন সত্য-শিবের সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র প্রাণময় অহংএর তৃপ্তি পুষ্টি বল ও মহিমা অর্জনের সাধনাই হবে তার পুরুষার্থ। প্রাণপুরুষের চাই আত্ম-প্রসারণের একটা প্রশস্ত অবকাশ, চাই স্বারাজ্যের অকুণ্ঠ অধিকার—সবাইকে সব-কিছুকে তার হাতের মুঠোয় চাই। তাকে বাঁচতে হবে, আপনাকে প্রতি-ষ্ঠিত করতে হবে, জুড়তে হবে বসুন্ধরার অনেকখানি ঠাঁই—নইলে হাত-পা ছড়িয়ে সে স্বচ্ছন্দ হবে কেমন করে? এ-দাবি যেমন তার নিজের জন্য, তেমনি তার গোষ্ঠীর জন্য। নিজের অহংকে এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীর অহংকেও তার তৃপ্ত করতে হবে। শুধু কি তা-ই? জগতের দরবারে এ উদ্যত দাবি তার ভাব আদর্শ কল্পনা প্রত্যয় ও স্বার্থের খাতিরে: কেননা এসমস্তই তার নিজস্ব অহন্তা ও মমতার প্রতিরূপ, অতএব এদের ভারও জগতের 'পরে চাপাতে হবে। আর যদি তা সাধ্যে না কুলায়, তাহলে অন্তত বাইরের মার থেকে ছলে-বলে-কৌশলে তাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তার জন্যে যে-পথ তাকে ধরতে হবে, তার ধারণা বা খেয়াল অনুযায়ী কখনও তা হবে ন্যায়সঙ্গত; কখনও-বা ন্যায়ের মুখোস প'রে আড়াল থেকে সে লেলিয়ে দেবে উলঙ্গ বর্বরতা বঞ্চনা ও মিথ্যাচার, সর্বধ্বংসী আততায়িতা ও প্রাণিহিংসার উন্মত্ত তাণ্ডব। ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য সাধনশুদ্ধির কোনও প্রয়োজন নাই; যা-ই তার সাধন হ'ক, ধর্মের যে-বুলিই মুখে থাকুক, ভোগাকাঙ্ক্ষার নিরঙ্কুশ তর্পণ হবে তার সাধনার

মূলমন্ত্র।...শুধু সাংসারিক স্বার্থের জগতে নয়, ভাবের ও ধর্মের জগতেও মানুষের প্রাণময় অহং নিয়ে এসেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের উগ্রতা—অত্যাচার বলাৎকার অসহিষ্ণুতা অপরের কণ্ঠরোধ ও ধর্ষণকে তার সাধন করেছে। এই কলুষের ছোঁয়াচ হতে বুদ্ধির সত্যৈষণা এবং অধ্যাত্মসাধনার উদার ক্ষেত্রও নিষ্কৃতি পায়নি।...শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রমত্ততা নয়, তার সঙ্গে আছে যা-কিছু আত্মপ্রসারের পরিপন্থী অথবা অহন্তার অবমন্তা, তার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তখন প্রাণপ্রকৃতির সাধন প্রতিক্রিয়া অথবা দুরাগ্রহরূপে দেখা দেয় ক্রূরতা বিশ্বাসঘাতকা প্রভৃতি যত অনর্থ। কামনা ও প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ পরিতর্পণে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সে করে না। এমন-কি তার জন্য বেদনার বন্ধুর পথে বা ধ্বংসের করাল গহ্বরে নেমে যেতেও তার দ্বিধা নাই, কেননা প্রকৃতির অন্ধ আবেগ তার মধ্যে এনেছে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ও তর্পণের উন্মাদনা, প্রাণশক্তি ও প্রাণসত্তার নির্বাধিত রূপায়ণের প্রেতি—শুধু আত্মরক্ষার আকূতিই নয়।

কিন্তু তাবলে প্রাণপুরুষ শুধু এই ধাতুতেই গড়া, সে 'পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ' এইমাত্র তার পরিচয়—এমন সিদ্ধান্ত করা অসংগত। অবশ্য সত্য ও শিবের সঙ্গে প্রাণপুরুষের মুখ্য কারবার না থাকলেও তার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ তার থাকতে পারে—যেমন তার একটা সহজ আকর্ষণ আছে আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতি। প্রাণশক্তি আধারে যা-কিছু গড়ে তোলে, তার সঙ্গে-সঙ্গে সত্তার গভীরে কোথায় যেন আনন্দের একটা প্রস্রবণ খুলে যায়। সে-আনন্দের উচ্ছলন যেমন মঙ্গলে তেমনি অমঙ্গলে, যেমন সত্যে তেমনি মিথ্যায়, যেমন জীবনের তর্পণে তেমনি মরণের উন্মাদনায়, যেমন আরামে তেমনি পীড়ায়, যেমন নিজের মর্মদহনে তেমনি পরের যন্ত্রণায়—আবার যেমন নিজের তেমনি পরের হর্ষে সুখে ও কল্যাণে। কল্যাণ অথবা অকল্যাণ দুয়ের মধ্যেই প্রাণশক্তি অপক্ষপাতে আত্মপ্রতিষ্ঠার তৃপ্তি খোঁজে। তার অন্তরে আছে পরোপকারের আগ্রহ, আসঙ্গের স্পৃহা—আছে ঔদার্য প্রীতি নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ: আত্মস্বার্থ অথবা বিশ্বহিত, আত্মোৎসর্গ বা পরের সর্বনাশ—দুয়েরই প্রতি তার সমান অনুরাগ। অর্থাৎ তার সমস্ত কর্মে আছে প্রাণকে সুপ্রতিষ্ঠ ও সার্থক করবার একটা অদম্য স্পৃহা। প্রাণসত্তার এই প্রকাশে সু-কুর স্থান নিশ্চয় আছে, কিন্তু তা-ই তার প্রবৃত্তির নিয়ামক নয়। প্রাণপ্রবৃত্তির এই ধারাকে আমরা দেখি মানুষের নীচের ধাপে—ইতর প্রকৃতির নিরাবরণ প্রমত্ততায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে মনের ধর্মবোধের এবং অধ্যাত্মচেতনার কল্যাণে জাগ্রত একটা বিবেক-শক্তি, তাই প্রাণপ্রবৃত্তির প্রকাশ সেখানে কুণ্ঠিত ও ছন্নরূপ। কিন্তু এততেও তার স্বভাবের বদল হয়নি। প্রাকৃত-জগতে আত্মা এবং আত্মশক্তির প্রকট ক্রিয়া আমরা কোথাও দেখতে পাই না। সেখানে প্রাণপুরুষ ও প্রাণ-

শক্তির এই আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদনাই হল প্রকৃতির মুখ্য করণশক্তি। এ না থাকলে আমাদের দেহ-মন অচল হত, ব্যর্থ হত—এ-সংসারে থেকে তাদের সকল সম্ভাবনাকে সার্থক করা অসম্ভব হত। কিন্তু এই বহির্বৃত্ত প্রাণপুরুষের অন্তরালে সত্যকার প্রাণময়-পুরুষ গুহাহিত হয়ে আছেন। তাঁকে জীবনের পুরোধা করতে পারলেই প্রাণের স্পর্ধিত অহমিকা শান্ত হয়ে প্রাণশক্তি আত্ম-শক্তির অনুগামী এবং চিন্ময় সত্য-পুরুষের মহাবীর্যময় সাধন হয়।

এই হল তবে জীবের চেতনায় ও সংকল্পে অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের অভ্যুত্থানের তত্ত্ব। অবিদ্যাতামসের পরিণামে চেতনার যে-সংকোচ দেখা দেয়, তা-ই হল প্রমাদের কারণ। সেই সংকোচকে এবং তজ্জনিত প্রমাদকে আঁকড়ে থাকবার বিবিক্ত প্রয়াস থেকে আসে অসত্য; আর প্রাণের অহমিকাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনৃতচেতনা হতে হয় অশিবের আবির্ভাব। কিন্তু স্পষ্ট দেখছি, তাদের পরতন্ত্র প্রকৃতি বিশ্বশক্তিরই একটা উৎক্ষেপ—আত্মবিভাবনার উল্লাসে উত্তরায়ণের পথে তার একটা প্রাতিভাসিক বিসৃষ্টি মাত্র। অতএব মহাপ্রকৃতির লীলায়নেই এই প্রতিভাসের তাৎপর্য খুঁজতে হবে।...আগেই দেখেছি, জীব-ভাবকে সুস্থিত করবার জন্য প্রাণময় অহংএর উন্মেষ বিশ্বপ্রকৃতির একটা কৌশল মাত্র। অবচেতনার অব্যাকৃত পিন্ডভাবের সংগে যে-জীবনচেতনা জড়িয়ে আছে, তার মুক্তি চাই—অচিতির পরিণামদ্বারা চাই চেতন পুরুষের আবির্ভাব। তার জন্যে অহংবোধকে কেন্দ্র করে প্রাণের বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন। বস্তুত জীবের অহং একটা অর্থক্রিয়াকারী অবাস্তব প্রতিভাস মাত্র। তার মধ্যে বহিশ্চেতনার ভাষায় গুহাহিত আত্মস্বরূপেরই একটা বিবৃতি ফুটেছে, অথবা ব্যবহারের জগতে দেখা দিয়েছে সত্য আত্মারই একটা মনোময় প্রতিচ্ছবি। অবিদ্যা তাকে যুগপৎ অপর পুরুষ এবং অন্তর্যামী দিব্য-পুরুষ হতে পৃথক করেছে। তবু চিৎপরিণামের গোপন আকূতি তাকে নিঃশব্দে ঠেলে নিয়ে চলেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব-সিদ্ধির তপস্যার দিকে। সে সসীম, তবু তার অন্তরে বেজে উঠেছে অসীমের আকুল-করা বাঁশির সুর। অবিদ্যার ভাষায় এই আকূতির তর্জমা হয় আত্মপ্রসারণের আকাঙ্ক্ষায় : সসীম হতে চায় অসীম সান্ত, বিশ্বজগৎকে চায় গ্রাস করতে, সব-কিছুর অন্তরে আবিষ্ট হয়ে চায় সামরস্যের সম্ভোগ—এমন-কি সম্ভুক্ত হয়েও চায় নিজেরই কামনার পরিতর্পণ, অপরের মধ্যে বা অপরের সহায়ে নিজেরই সত্তার উপচয়। অপরকে করায়ত্ত করে তার সত্তা ও বীর্যকে যদি সে আত্মসাৎ করতে পারে, তাতে যদি তার আত্মপ্রতিষ্ঠার এতটুকু আনুকূল্য হয়, অবন্ধন প্রাণের আনন্দ উচ্ছল হয়, দেহ-প্রাণ-মনের সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হয়—তবেই তার সাধনা ধন্য হয়।

কিন্তু জীবের এ-সাধনা চলছে বিবিক্ত আত্মস্বার্থের তাগিদে—সচেতন অন্যোন্যবিনিময় অন্যোন্যভাবনা ও একত্বসিদ্ধির প্রেরণায় নয়। তাইতো তার

জীবন জুড়ে বৈষম্য বিসংবাদ ও সংঘর্ষের কোলাহল মুখর হয়ে উঠে। প্রাণের এই বৈষম্য ও বিসংবাদকেই আমরা বলি অধর্ম এবং অনর্থ। কিন্তু তাদের প্রতি প্রকৃতির কোনও বিরাগ নাই। কেননা তারাও তার আত্মপরিণামের অপরিহার্য অংগ, তার খণ্ডিত সত্তায় অখণ্ডভাবনার সাধনা চলছে তাদেরই ভিতর দিয়ে। অধর্ম এবং অনর্থ অবিদ্যারই পরিণাম। খণ্ডবোধকে আশ্রয় করে অবিদ্যার চেতনা জাগে—খণ্ডবোধই তার সংকল্পের সাধন, তার আনন্দের উৎস। আর এই খণ্ডবোধরূপী অবিদ্যাতে অধর্ম এবং অনর্থেরও প্রতিষ্ঠা। পরিণামী প্রকৃতির আকূতি শিব ও অশিব উভয়কে আশ্রয় করে চরিতার্থ হয়। কোনও-কিছুকে বাদ দিয়ে তার চলবার উপায় নাই—কেননা শুধু সীমিত কল্যাণের সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখলে তার ঈপ্সিত পরিণামও খণ্ডিত এবং ব্যাহত হবে। তাই হাতের কাছে যে-উপাদান পায়, তাকেই যথাসম্ভব সে কাজে লাগায়। এইজন্যেই দেখি, কখনও তথাকথিত শিব হতে অশিবের আবির্ভাব, কখনও-বা অশিব হতে শিবের আবির্ভাব। কখনও দেখি, এতদিন যাকে অশিব মনে করেছি আজ সে-ই পেল শিবের মর্যাদা, এতদিন যা ছিল শিবময় আজ তা-ই হল অশিব। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই—কেননা আমাদের শিবত্ব-অশিবত্বের আদর্শ সীমিত ও ক্ষরস্বভাব, তাকে চলতে হয় প্রকৃতি-পরিণামের আইন মেনে। বিশ্বশক্তির পার্থিব-পরিণামের গোড়াতে কিন্তু এ-দ্বন্দ্বে কোনও বালাই নাই—মহাপ্রকৃতি সেখানে শিব অশিব উভয়কে অপক্ষপাতে আপন কাজে লাগায়। অথচ এই প্রকৃতিই মানুষের চেতনায় ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের বোঝা চাপিয়েছে। তার দায় হতে তাকে নিষ্কৃতি দেবার মতলবও তার নাই। তখন কি মনে হয় না, এই দ্বন্দ্ববোধেরও প্রকৃতি-পরিণামের অনুকূলে বিশেষ-একটা তাৎপর্য আছে? এ-বোধকে মানুষের বর্জন করে চলবার উপায় নাই—কেননা ভাল-মন্দের এমনতর বিবেক দিয়েই সে অনর্থকে পিছনে ফেলে ধাবিত হয় অর্থের দিকে এবং অবশেষে অর্থ ও অনর্থ উভয়ের দায় চুকিয়ে উত্তীর্ণ হয় পরমার্থের অন্তহীন শাশ্বত স্থিতিতে।

কিন্তু পরিণামী প্রকৃতির এই আকূতি কি করে সার্থক হবে? কোন্ বীর্যের সাধনায়, কোন্ প্রেতির সংবেগে, সৌষম্যের কোন্ মন্ত্রে, প্রগতির কোন্ ধারাকে বরণ করে সে সিদ্ধির চরমে পেঁাছবে? যুগ-যুগ ধরে মানুষের মন গ্রহণ ও বর্জনের পথটি শুধু বেছে নিয়েছে—তার ফলে ধর্মের অনুশাসন, শীলাচার বা সংহিতার আদর্শ হয়েছে তার জীবনের নিয়ামক। কিন্তু এ-ধরনের জীবনমীমাংসার একটা বাজারচলতি মূল্যই শুধু আছে, তাই এতে আসল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সন্ধানী দৃষ্টি রোগের নিদানতত্ত্ব পর্যন্ত পেঁাছতে পারেনি, কেবল রোগের লক্ষণ নিয়ে একটা

দায়সারাগোছের বিচার করে থেমে গেছে। সু-কুর দ্বন্দ্বে প্রকৃতির কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে, মানুষের প্রাণ-মনের কোন্ প্রবৃত্তি এ-দ্বন্দ্বের আশ্রয় ও প্রবর্তক—এ-সম্পর্কে নীতি শাস্ত্রের পাতায় সুস্পষ্ট কোনও মীমাংসা আমরা খুঁজে পাই না। তাছাড়া মানুষের ভাল-মন্দ যেমন একটা আপেক্ষিক ব্যাপার, তেমনি তার ধর্মসংহিতার কল্পিত আদর্শও তো আপেক্ষিক এবং অনিশ্চিত। বিভিন্ন ধর্মের যত বিধি-নিষেধ, সামাজিক বিচারে যা ভাল বা মন্দ, যা-কিছু জনহিতের অনুকূল বা প্রতিকূল ব'লে কল্পিত হয়েছে, মানুষের-গড়া সাময়িক আইন যাদের মঞ্জুর করেছে কি করেনি, আত্মহিত বা পরহিতের যারা প্রবর্তক বা নিবর্তক, যা-কিছু নানাধরনের আদর্শবাদের অনুগত, যে-সহজবৃত্তিকে ধর্মবুদ্ধি বলি তার অনুমোদন যে পেয়েছে কি পায়নি—এ-সমস্তরই একটা জগাখিচুড়ি দিয়ে মানুষের ধর্মসংহিতার বিধান রচিত হয়েছে। তার পুঁজিতে যেমন আছে পাঁচমিশেলী ভাবের জটিল সমাবেশ, তেমনি আছে সত্যের সঙ্গে অর্ধসত্য ও প্রমাদের নিত্য সংমিশ্রণ। মানুষের সঙ্কুচিত মনশ্চেতনায় যখন বিদ্যা-অবিদ্যার ব্যামিশ্রভাব প্রবল, তখন এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমরা মানুষ, সুতরাং মনই হবে আমাদের দেহ এবং প্রাণের স্থূল কামনা ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিয়ামক—ঘরে-বাইরে আমাদের কর্ম ও ব্যবহারকে সে-ই নিয়ন্ত্রিত করবে। মনের এই অনতিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ-শক্তিই ধর্মবুদ্ধির আকারে ব্যবহারের একটা আদর্শ গড়ে তোলে। আর আমরা তার অনুবর্তনে আত্মসংযমের চিরাচরিত কতকগুলি বিধান খাড়া করি। কিন্তু এ-বিধান একটা রফা মাত্র, সমাধান নয়। তাই আমাদের সংযমসাধনাতে কোনকালেই পূর্ণসিদ্ধি মেলে না। মানুষ যা ছিল চিরকাল তা-ই থেকে যায়, ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্যের সংমিশ্রণে সুরাসুরের দ্বন্দ্ব তার কোনদিন ঘুচতে চায় না, দেহ-প্রাণ-মনের অবশ্যা প্রকৃতিকে তার পঙ্গু মনোময় অহং বশ করতে চায় শুধু মিথ্যা আস্ফালনের জোরেই।

কেবল চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন না ক'রে সচেতন বিবেকবুদ্ধি দিয়ে যখন ভাল-মন্দের বাছাই শুরু করি, ভাবনা এবং কর্ম থেকে যা-কিছু মন্দ ঠেকে তাকে ছেঁটে ফেলে শুধু ভাল দিয়ে আধারকে যখন নতুন করে গড়ে তুলতে চাই, তখন জাগ্রত চিত্তের এই আদর্শসাধনাতে ধর্মবুদ্ধির একটা গভীরতর সার্থকতা ঘটে—কেননা এই উপায়ে আমাদের তপস্যা সত্যের আরও সন্নিহিত হয়। সমস্তটা জীবন সম্ভূতির লীলা, অতএব আমাতেই আছে সম্ভূতির সাধনা ও সিদ্ধির একটা নিত্য-প্রবেগ—এই সত্যভাবনাকে ভিত্তি করে তখন আমাদের জীবনকে গড়ে তোলবার তপস্যা চলে। কিন্তু মানুষের মন যত বড় আদর্শেরই কল্পনা করুক, তার মধ্যে আপেক্ষিকতার এবং কাট-ছাঁটের একটা সঙ্কোচ থাকবেই। অতএব মনঃকল্পিত আদর্শের ছাঁচে ঢেলে

নিজেকে গড়তে গেলে নিজের স্বভাবকে পীড়িত করতেই হয় এবং তার ফলে উপচিত প্রাণের ঔদার্যের জায়গায় দেখা দেয় কৃত্রিমতার কার্পণ্য। জীবনে সত্য হল অনন্তের আহ্বান—সত্য হল লোকোত্তরের হাতছানি। প্রকৃতির আরোপিত প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির বিধান দুইই ওই মহাসঙ্গম-তীর্থের দিকে আমাদের আকর্ষণ করছে। আমাদের অহংবৃত্তি অবিদ্যাচ্ছন্ন অতএব অধর্ম্য, তাই প্রকৃতির 'হাঁ-না'র দ্বন্দ্ব কিছুতেই তার ঘুচতে চায় না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঋতময় সমুচ্চিত বিধানকে আবিষ্কার করে। সমুচ্চয়ের সূত্রটি যদি খুঁজে না পাই, তাহলে হয় জীবনের দুর্ধর্ষ সংবেগ সিদ্ধির সংকীর্ণ আদর্শ ছাপিয়ে যাবে, তার সাধনসম্পদকে বিস্রস্ত পরাভূত করে চিরন্তন সার্থকতার সম্ভাবনাকে পরাহত করবে—কিংবা মধ্যপথে অর্ধসিদ্ধির চড়ায় আমাদের ঠেকিয়ে রাখবে। অথবা মনে হবে, অবিদ্যার বজ্রআঁটুনি ছিঁড়ে বের হবার আর-কোনও উপায় নাই শুধু জীবন হতে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া। জগতের সব ধর্মই সাধারণত মুক্তির এই পথটি বাতলে দেয়। 'ধর্মের অনুশাসন ভগবানের আদেশ, ধর্মশাস্ত্রের বিধানমত পুণ্য ও সদাচারের সাধনা মানুষের একমাত্র কর্তব্য, কেননা শাস্ত্রবাক্য ঋষির হৃদয়ে প্রতিফলিত ভগবানের বাণী'—এই উপদেশকেই ধর্মশাস্ত্রীরা মানুষের সাধনাঙ্গ বলে প্রচার করেন। তাঁদের মতে মানুষ এই পথে চলেই সামনে মহানিষ্ক্রমণের মুক্তদুয়ার দেখতে পাবে। কিন্তু নিষ্ক্রমণে জীবন-সমস্যার কোনই সমাধান হয় না। এ শুধু ভবপাশের দুর্মোচন বন্ধন হতে ব্যক্তির আমিটিকে কোনরকমে ফসকিয়ে নেওয়া! এ-দেশের প্রাচীন অধ্যাত্মবেত্তাদের কাছে কিন্তু সমস্যার স্বরূপটা আরও স্পষ্ট ছিল। তাঁরা মানতেন, সত্য সদাচার সম্যক্-সংকল্প সম্যক্-কর্ম—অধ্যাত্মসিদ্ধির সাধনাঙ্গ হিসাবে সবই অপরিহার্য। কিন্তু সিদ্ধির চরমভূমিতে পুরুষ যখন শাশ্বত অনন্তস্বরূপের বৃহৎ চেতনায় উত্তীর্ণ হয়, তখন পুণ্য ও পাপ উভয়ের ভারকে সে নির্ধূত করে—কেননা পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব অবিদ্যাব্যবহারের দ্বন্দ্ব। তাঁদের এই বৃহত্তর সত্যানুভূতির পিছনে ছিল বোধির এই আশ্বাস : ব্যাবহারিক জীবনে সবিশেষ কুশলের আচরণ বিশ্বপ্রকৃতির বিহিত একটা তপস্যা মাত্র—যা ধীরে-ধীরে আমাদের নিয়ে চলেছে লোকোত্তর নির্বিশেষ কুশলের অভিমুখে। কুশল-অকুশলের দ্বন্দ্ব অবিদ্যাস্পৃষ্ট প্রাণ ও মনেরই সমস্যা, তাই উন্মনী ভূমিতে তাদের স্থান নাই। যেমন অনন্ত ঋত-চিতের ভাস্বর ঔদার্যে সত্য ও প্রমাদের সকল দ্বন্দ্ব মুছে যায়, তেমনি পরমশিবের মহাভূমিতে পেঁছিও কুশল ও অকুশলের সকল সংঘাত হতে চিত্ত পায় মুক্তি—পায় অতিমুক্তি।

এই দ্বন্দ্ববোধের সমস্যা চিরকাল মানুষের মনকে পীড়িত করেছে। এর সন্তোষজনক কোনও সমাধান আজপর্যন্ত সে খুঁজে পায়নি। কোনও কৃত্রিম

উপায়ে যে এ-সমস্যার সমাধান হবে, এ-আশাও বৃথা। ভাল-মন্দের জ্ঞানবৃক্ষে ফলে আছে তেতো-মিঠে দুরকমের ফল, তার শিকড় তলে-তলে ছড়িয়েছে অচিতির মর্মগহন পর্যন্ত। আর এই অচিতি আমাদের আদিজননী এবং বর্তমানের ধাত্রী—তার গভীরে প্রোথিত রয়েছে আমাদের জড়সত্তার মূল। সেই মূল হতে বহিঃস্তর ফুঁড়ে বেরিয়েছে অবিদ্যার কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার বিচিত্র মেলা। এই অবিদ্যাই আমাদের চেতনার বেশীর ভাগ জুড়ে আছে, তার শাসনে পরা-সংবিৎ ও সম্যক-সম্বোধির দিকে চলেছে চেতনার কৃচ্ছ্র-মন্থর অভিযান। যতক্ষণ জ্ঞানবৃক্ষের শিকড়ে-শিকড়ে অন্ধ-অচিতির রসের জোগান থাকবে, যতক্ষণ অবিদ্যার আলোহাওয়ায় তার ডালপালা পুষ্ট হবে, ততক্ষণ তার বাড় আর বাহার থাকবেই—তার শাখায়-শাখায় দোরঙা ফুল আর দোআঁশলা ফলের প্রলাপ চলবেই।...অতএব সমস্যার চরম সমাধান হতে পারে রসের জোগান বন্ধ করে—তার স্বভাবের বিপর্যয় ঘটিয়ে। অচিতিকে যদি বৃহতের চেতনায় রূপান্তরিত করতে পারি, অবিদ্যাকে যদি পরা-বিদ্যার রূপ দিতে পারি, আত্মার চিন্ময় সত্যকে যদি জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে পারি—তবেই সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে অন্য-কোনও উপায়ে নয়। এছাড়া আর-যত কল-কৌশল, সেসব হয় শুধু জোড়াতাড়ার ব্যাপার, নয়তো কানাগলিতে ঢুকে পড়ার মত। চাই প্রকৃতির পরিপূর্ণ ও আমূল রূপান্তর—নইলে আর পথ নাই। আমাদের আত্মজ্ঞান আর জগৎজ্ঞানের 'পরে অচিতি তার অনাদি তামসিকতার ভার চাপিয়েছে এবং অবিদ্যা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অপূর্ণ খণ্ডিতচেতনার ভিত্তিতে। এই তামসিকতা ও খণ্ডভাবই আমাদের চিত্তে মিথ্যাজ্ঞান ও অনৃত-সঙ্কল্পের পত্তন করে। মিথ্যাজ্ঞান না থাকলে অসত্য বা প্রমাদ থাকত না। আবার অসত্য ও প্রমাদে প্রবৃত্তি না জারিত হলে আধারে অনৃতসঙ্কল্পের উদয় হত না। অনৃতসঙ্কল্প না থাকলে অধর্মাচরণ বা অনর্থের প্রাদুর্ভাবও সম্ভব হত না। যতক্ষণ কারণ আছে, ততক্ষণ কার্যও থাকবে। অতএব আধারে মিথ্যা প্রমাদ ও অধর্মের অভিনিবেশ থাকলে আমাদের স্বভাব ও কর্মও তার পরিণামের ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পাবে না। মনের সংযম সংযমই শুধু। তাতে রোগকে দাবিয়ে রাখা যায়, আরাম করা যায় না। মনের অনুশাসন বিধিনিষেধ কি আদর্শবাদ শুধু অভ্যাসের একটা খাঁজ কেটে দিতে পারে, যাকে ধরে প্রাত্যহিকের যন্ত্রাবর্তন বা খঞ্জের পরিক্রমা চলে। তাতে আমাদের আত্মপ্রকৃতির স্বাভাবিক চলন কুণ্ঠিত হয়, বাধ্য হয়ে সহজের পথে সে কেবল কুণ্ডলী রচে। এইজন্য চেতনার পূর্ণরূপান্তর এবং প্রকৃতির আমূল পরিবর্তনই হল সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান, সকল সাধনার চরম লক্ষ্য।

বিবিক্তসত্তার সঙ্কোচ ও খণ্ডতা যখন সকল বিপত্তির মূল, তখন আধার চৈত্যন্যের সমস্ত খণ্ডবৃত্তিকে অখণ্ডের সৌষম্যে সংহত ও প্রস্ফুটিত করে রূপা-

ন্তরের সাধনাও হওয়া চাই অভংগ অখণ্ডভাবের উদার সাধনা। কিন্তু আমাদের খণ্ডভাবনা বহুবিচিত্র ও জটিল। সুতরাং আধারের একটি অবয়বের আংশিক রূপান্তরকে অখণ্ড রূপান্তরের প্রতিভূ বলে চালিয়ে দিলে চলবে না। ভেদবুদ্ধি বা খণ্ডভাবনার প্রথম বিদাররেখাকে সৃষ্টি ক'রে আমাদের অহন্তা—বিশেষ করে আমাদের প্রাণময় অহং, কেননা প্রাকৃতচেতনায় তার জুলুম সবচাইতে স্পষ্ট। প্রাণময় অহংই আর-সবাইকে অনাত্মা বলে দূরে সরিয়ে দেয়—অহংকেন্দ্রীণতার খুঁটিতে বেঁধে নকল আত্মপ্রতিষ্ঠার চক্রপথে আমাদের পাক খাইয়ে মারে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রমাদ হতেই অধর্ম ও অশিবের প্রথম সূচনা। অনৃতচেতনা আধারের সর্বত্র অনৃতসংকল্পের প্রবেগ সঞ্চারিত করে—হৃদয়ে মনে প্রাণচেতনায় ইন্দ্রিয়চেতনায় এমন-কি দেহ-চেতনায় পর্যন্ত সে-সংকল্পের বিষ সংক্রামিত হয়। অনৃতসংকল্প হতে দেখা দেয় আধারের করণসমূহের অনৃতবৃত্তি—ভাবনা বেদনা সংকল্প ও ইন্দ্রিয়ের বহুগুণিত প্রমাদ ও বহুশাখ কৌটিল্যের দ্বারা জর্জরিত অনৃত আচরণ। যত-ক্ষণ অপরকে অনাত্মীয় বলে জানি, তার অন্তশ্চেতনার বা দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়ের আকূতির কোনই সন্ধান রাখি না, ততক্ষণ মানুষের সংগে আমাদের আচরণ কিছুতেই ঋতময় হতে পারে না। যৌথসংস্কারের গরজে এবং আমাদের পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কল্যাণে শুভেচ্ছা সমবেদনা কি পরচিত্তজ্ঞানের যে সামান্য পুঁজিটুকু আছে, জীবনে সম্যক্-কর্মের আদর্শকে সফল করবার পক্ষে কিছুতেই তাকে পর্যাপ্ত মনে করা চলে না। হৃদয়-মনকে প্রশস্ত করে অথবা প্রাণশক্তির উদার উপচয়ে সার্বজনীনতার পথে খানিকটা আমরা এগিয়ে যেতে পারি, কিংবা জঘন্য দুষ্কৃতির মার হতে সাময়িকভাবে হয়তো সমাজকে বাঁচাতেও পারি। কিন্তু আদর্শ সমাজ গড়ে তোলবার বাধা এতেও কাটে না, কেননা তারও পরে আমার ঈপ্সিত কল্যাণের সংগে অপরের ঈপ্সিত কল্যাণের সংঘাতকে উপলক্ষ্য করে অনিষ্ট ও অশান্তির বিষ ফেনিয়ে ওঠেই। নিঃস্বার্থতার বড়াই করতে গিয়ে অহমিকাকে ফাঁপিয়ে তোলা, অথবা নিজের জ্ঞানবুদ্ধির গর্বে স্ফীত হয়ে অজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া—এ তো আমাদের অহন্তা এবং অবিদ্যার স্বভাব। বিশ্বহিতৈষণাকে জীবনের ব্রত করেও আমাদের নিষ্কৃতি নাই; কেননা অহংএর সংকোচ ভেঙে বিশ্বময় আমি-ত্বের প্রসার ঘটাবার দীপ্ত বীর্য তার থাকলেও, এতে মানুষের অহমিকার বিনাশ হয় না অথবা সর্বাত্মভাবনায় তার রূপান্তর ঘটে না। স্বার্থপরের অহংএর মত বিশ্বহিতৈষীর অহংও উদ্দাম এবং সর্বগ্রাসী হতে পারে। বরং তার উদ্দামতা হয়তো আরও প্রবল, কেননা পুণ্যসাধনার গুমরে ফেঁপে ওঠবার সম্ভাবনা তার আরও বেশী। আবার বিশ্বহিতের উন্মাদনায় যদি নিজের দেহ-প্রাণ-মন বা আত্মার নিগ্রহ করি নিজের আমিকে পরের আমির কাছে

বিনয়াবনত করবার অছিলায়—তাতে অহিতের মাত্রা বাড়বেই, কমবে না। ঋতের ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠাই চাই, যাতে আত্মার অখর্ব সহজ মহিমায় সবার সঙ্গে এক হতে পারি—এই হল সত্যকার জীবনাদর্শ। আত্মাকে বলি দেওয়া বা বিকল করা কখনও ঋতের পথ নয়। কদাচ-কখনও আত্মবলির প্রয়োজন হতে পারে—বিশেষ-কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ-কোনও ব্রতসিদ্ধির জন্যে। হয়তো তার মূলে আছে হৃদয়ের কোনও গভীর আকৃতি, কোনও সত্য বা মহৎ লক্ষ্যের প্রবর্তনা। কিন্তু একে বলব জীবনধর্মের অপবাদ—উৎসর্গ বা স্বভাব নয়। শহীদ হবার তাগিদটাকে নির্বিচারে ফাঁপিয়ে তুলে একটা দলের অহংকেই শুধু অতিকায় করা চলে। কিন্তু তাতে কি ব্যষ্টির কি সমষ্টির সত্যকার আত্মোপলব্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় না। অবশ্য আত্মদান বা আত্মাহুতি জীবনের একটা গভীর সত্য এবং অপরিহার্য সাধনাঙ্গ, কেননা নিজের সংকীর্ণ অহংএর চাইতে বৃহৎ একটা-কিছুর মধ্যে নিজেকে আহুতি দিতে কি সমর্পণ করতে না পারলে সত্যকার আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু এই আত্মাহুতি দিতে হবে ঋতচেতনা ও ঋতসংকল্পের দীপ্তিকে অন্তরে উজ্জ্বল রেখে, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রবর্তনাকে জাগ্রতচিত্তে বহন ক'রে। শুদ্ধ-সত্ত্বের স্বরূপ প্রজ্ঞার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তার মধ্যে আছে সাম্য সৌষম্য শুভাশংসা সমবেদনা মৈত্রী ও করুণা, আছে সংযতচিত্তের ঋতচ্ছন্দা কর্মের প্রেতি। যতক্ষণ মনের রাজ্যে বন্দী হয়ে আছি, ততক্ষণ সত্ত্বশুদ্ধির সাধন-দ্বারা দৈবী সম্পদ অর্জন করা সাধ্যাবধি হতে পারে, কিন্তু তাকেই আমাদের পরমপুরুষার্থ বলতে পারি না। এ-সাধনায় অনৃতের মূলোচ্ছেদ হয় না—যদিও তার আংশিক উপশমের জন্য এরও যে প্রয়োজন আছে, একথা অনস্বীকার্য। জীবনসমস্যার সত্যকার সমাধান যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ এইসব পথচলতি সমাধানের কবচে নিজেকে আবৃত করে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করবার একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে। কেননা, সত্য ও সম্যক্ সমাধানকে খুঁজে বার করবার সামর্থ্য অর্জন না করা পর্যন্ত এমনতর কতগুলি আপাতিক বিধান ও আদর্শবাদকে মেনে চলা ছাড়া আমাদের এগিয়ে যাবার আর-কোনও উপায় নাই। কিন্তু তবু বলব, শীলের সাধন আমাদের সত্যৈষণার চরম লক্ষ্য নয়। এখনও চেতনার বহু দল মেলতে বাকী। উন্মিষিত বুদ্ধির পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে পরমপুরুষার্থকে আবিষ্কার করা এবং একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করা—এ-ই আমাদের সত্যকার জীবনব্রত।

সত্য সমাধানের দেখা তখনই পাব, যখন আত্মচেতনার পরিপূর্ণ উপচয়ে আমরা সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হব, তাদের আমাদের আত্মভূত বলে জানব, আত্মার প্রতিরূপ জ্ঞানে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলবে। এই পরম-বিজ্ঞানে ভেদবুদ্ধি উপশমিত হবে। বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার যে-আয়াস এতকাল

পরকে আঘাত বা আত্মসাৎ করে সার্থকতার পথ খুঁজছিল, আজ বিশ্বহিতের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার তপস্যায় তার বন্ধনমোচন ঘটবে—'বিশ্বের অধ্যাত্মসিদ্ধিতেই আমার সিদ্ধি' এই বিশাল বুদ্ধিতে ঘটবে সংকীর্ণ অহমিকার উদার মরণ। মৈত্রীভাবনা সকল ধর্মসাধনারই আদর্শ। সব ধর্মেই বলে, নিজের মত করে পরকে ভালবাসবে, অপরের কাছে যে-আচরণ প্রত্যাশা কর নিজেও অপরের সংগে তেমনি আচরণ করবে, পরের সুখদুঃখকে আপনার করে নেবে। কিন্তু অহংএর খোলে শামুকের মত বন্দী যে, তার পক্ষে এ-উপদেশ ঠিকমত পালন করা কি সম্ভব? বড়জোর সে বলতে পারে, 'আমার মনও তো তা-ই চায়—এই আকুতিই তো আমারও হৃদয় জুড়ে।' কাঁচা আমির সকল গলদ ঘুচিয়ে একটা মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার জন্য সরলচিত্তে নিষ্ঠার সংগে তপস্যাও সে করতে পারে। কিন্তু তাতে কতটুকুই-বা সে এগোতে পারবে? মৈত্রী-ভাবনার আদর্শ সিদ্ধ হবে, যখন অপরকে শুধু জানব নয়—সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করব আমারই আত্মস্বরূপ বলে। এই অন্তরংগ অনুভব তখন ফুটে উঠবে জীবনধর্মের সহজ ছন্দে, সিদ্ধ জ্ঞান রূপায়িত হবে অকৈতব আচরণে। কিন্তু অপরের সংগে একাত্ম হবার অর্থ এ নয় যে, তাদের অবিদ্যাবৃত্তির সংগেও আমাকে এক হতে হবে। কেননা, তাহলে একাত্মভাবের ফলে অবিদ্যা এবং অনাচারের উগ্রতা মন্দীভূত হলেও তাদের বৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হবে না, সুতরাং অবিদ্যার প্রবর্তনায় কর্মের মধ্যে অধর্ম ও প্রমাদের একটুখানি মোলায়েম রেশ থেকেই যাবে। পিণ্ডচেতনা যদি ব্রহ্মাণ্ডচেতনায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে বিশ্বের সব-কিছুই আত্মস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়, একথা সত্য। কিন্তু তবু আমাদের সর্বাত্মভাবের মূল থাকবে চিৎসত্তার তাদাত্ম্যভাবনাতে নিরূঢ়, শুধু অপরের হৃদয়-প্রাণ-মন-অহংএর একত্বভাবনাতেই নয়। তার জন্য চৈত্যসংবিৎ ও আত্মজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে মুক্তি আমাদের পেতেই হবে। নিজেকে অহমিকার আড়ষ্টতা হতে মুক্ত করে আত্মার সত্যস্বরূপে অবগাহন করা—এই আমাদের প্রথম কৃত্য। এই জ্যোতির্ময় সংবিৎই তখন অধ্যাত্মপরিণামের স্বভাব-ছন্দে পর-পর খুলে দেয় জ্যোতির দুয়ার। এইজন্যই আত্মার আহ্বানকে বলি সর্বনাশা—তার ডাক শুনলে বেরিয়ে পড়তেই হবে বিদ্যা-বুদ্ধি শীল সমাজ সবার দাবিকে উপেক্ষা করে, কেননা হাজার বড় হলেও এরা অবিদ্যা-রাজ্যেরই প্রজা। এদের আদর্শ মনোময় কল্যাণের আদর্শ—যে শুধু জানে অশিবের রূপের অদলবদল করতে বা তার কুশ্রীতাকে ঢাকা দিতে। কিন্তু এতে কখনও চিন্ময়রাজ্যে দ্বিজ হয়ে মানুষ জন্মাতে পারে না। অথচ এই দ্বিজত্ব ছাড়া শিবস্বরূপের সত্য ও সম্যক্ উপলব্ধি হবার নয়, কেননা আমরা বিশ্বকর্ম ও বিশ্বভাবের মর্মমূলে অবগাহন করতে পারি একমাত্র চিদা-বেশদ্বারা।

অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনায় আত্মোপলব্ধির তিনটি ধাপ আছে—যদিও তারা এক অখণ্ডবিজ্ঞানের তিনটি পর্ব মাত্র। প্রথমটি জীবাত্মার সাক্ষাৎকার। অবশ্য জীবাত্মা বলতে এখানে লক্ষ্য করছি পরমাত্মার সনাতন অংশভূত গুহাশায়ী চৈত্যপুরুষকে—ভাবনা-বেদনা-বাসনার ভোক্তা প্রাকৃতপুরুষকে নয়। এই চৈত্য-পুরুষ যখন প্রকৃতির ঈশান হন অর্থাৎ আমাদের চেতনায় নিত্যজাগ্রত থেকে দেহ-প্রাণ-মনকে 'যাথাতথ্যতঃ' আপন অন্তরঙ্গ সাধনরূপে প্রযোজিত করেন, তখনই আমরা অন্তরে নিত্যদিশারীর সন্ধান পাই—যিনি সত্য-শিব-সুন্দরের আনন্দময় বেত্তারূপে আমাদের হৃদয়-মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় বিধানদ্বারা, 'প্রাণ-শরীর-নেতা' হয়ে আমাদের নিয়ে চলেন চিন্ময় সিদ্ধির লোকোত্তর ধামের দিকে। এমন-কি অবিদ্যার তামস প্রবৃত্তির অন্তরালেও আমরা তখন দেখি এক বিশ্বতশ্চক্ষু সাক্ষিপুরুষের পলকহীন ঈক্ষণ, এক জীবন্ত জ্যোতির উদ্ভাস্বর মহিমা। তাকে অনুভব করি অন্তরের অন্তস্তলে কবিক্রতুরূপে। ঋতপথের অপ্রমাদী পথিক তিনি—মনের সত্যকে বিবিক্ত করেন অনৃত হতে, হৃদয়ের মর্মস্থল হতে উৎসারিত আকূতিকে বেছে নেন অধর্মের প্ররোচনায় কি জুলুম সাড়া দেবার দুরাগ্রহ হতে। উদগ্র বাসনায় আবর্তিত প্রাণপ্রকৃতির পঙ্কিল মিথ্যাচার ও তামস স্বার্থৈষণার ঘোর হতে মুক্ত করে তিনিই আমাদের প্রাণে ব্রহ্মবিহারের মুক্তচ্ছন্দ সংবেগ জাগান। আত্মোপলব্ধির এই হল প্রথম পর্ব—অর্থাৎ এমনি করে অহন্তার জায়গায় চৈত্যপুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করা দিব্য মহিমার সিংহাসনে।...তার দ্বিতীয় পর্ব হল আমাদেরই গুহাশায়ী অজ শাশ্বত সর্বভূতাত্মভূতাত্ম কূটস্থপুরুষের সংবিৎকে জাগিয়ে তোলা। এই উপলব্ধিতে আসে চেতনার মুক্তি—আসে তার বিশ্বময় প্রসার। অবিদ্যার সংসারে তবু আমাদের কর্মসাধনা চলতে পারে বটে। কিন্তু সে-কর্মে তখন আর প্রমাদ বা বন্ধন থাকে না, কেননা আমাদের অন্তরপুরুষ তখন আত্মবিদ্যার শাশ্বত জ্যোতির্লোকে সমাসীন।... তৃতীয় পর্ব হল পুরুষোত্তমের উপলব্ধি—যিনি যুগপৎ আমাদের পরাৎপর বিশ্বোত্তীর্ণ আত্মা, আমাদের বিশ্বাত্মভাবের অধিষ্ঠানস্বরূপ বিরাট্ পুরুষ, আবার প্রত্যেকের 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' অন্তর্যামী ভগবান। আমাদের চৈত্যপুরুষ তাঁর সনাতন অংশস্বরূপ। এই চৈত্যপুরুষই সত্য জীব, আমাদের প্রকৃতিতে জন্ম-জন্ম ধরে চলছে এঁর নিত্য পরিণাম। শাশ্বত সুদীপ্ত পাবক হতে বিস্ফুলিঙ্গরূপে ইনিই জাত হয়ে 'বর্ধমানঃ স্বে দমে'—প্রবৃদ্ধ হয়ে চলেছেন আপন ঘরে। বৈশ্বানরের প্রতিভূরূপে ইনিই জীবের আধারে শাশ্বত মহা-প্রাণী—তাঁর জ্যোতি কান্তি বীর্য ও আনন্দের চিন্ময় বাহন। পুরুষোত্তমকে আমাদের সত্তা ও কর্মের মহেশ্বররূপে জেনে নিজেকে তাঁর দিব্য অমিত-বিক্রমের প্রণালিকা, তাঁর মহাশক্তির আধার করতে পারি। তখন সেই শক্তির

অধ্যুষ্য জ্যোতির্ময় নির্দেশে এই পার্থিবজীবন হবে প্রশাসিত। অশুদ্ধ প্রাণের আবেগ বা মনোময় সংকীর্ণ আদর্শ তখন আমাদের কর্মের নিয়ন্তা হবে না, কেননা মহাশক্তির লীলায়ন ঘটে বস্তুস্বরূপের শাশ্বত সত্যের সাবলীল ছন্দে। সে-ছন্দ মনের বিকল্প হতে আবির্ভূত হয় না। তার প্রতি পর্বে ও প্রত্যেক বিশিষ্ট সংস্থানে যে লোকোত্তরের সূক্ষ্ম অতিগহন সত্যের প্রেতি থাকে, সে-সত্য বিরাটের পরা প্রজ্ঞা দ্বারা পরিদৃষ্ট এবং তাঁর পরসংকল্প দ্বারা কল্পিত। তখন জ্ঞানের মুক্তি নিয়ে আসে সংকল্পেরও মুক্তি—তাকে বলতে পারি বিজ্ঞানসিদ্ধির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অনর্থ আত্ম-অবিদ্যার ফল, অতএব আত্মচেতনার উন্মেষে আত্মবিদ্যার জ্যোতিতে তার ঘোর কেটে যাবে। আজ ভূতে-ভূতে আমরা যে-বিভক্তভাবের সৃষ্টি করেছি, তার কার্পণ্য দূর হবে—যখন অন্তর্যামী সত্যপুরুষের আবেশ হতে প্রকৃতিকে আমরা আর বিযুক্ত রাখব না, স্বরূপস্থিতি আর প্রকৃতিপরিণামের মধ্যে কল্পিত ভেদের প্রাচীর ভেঙে ফেলব, এই প্রকৃতি-স্থ জীবভাবের সঙ্গে প্রকৃতিস্থ ও প্রকৃত্যতীত সর্বগত পুরুষোত্তমের সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে তাঁর নিত্য সদ্ভাবের অনুভবে নন্দিত হব।

পরমা প্রকৃতিকে চিন্ময় সন্মাত্রের স্বরূপশক্তি বলে জানি। এই দিব্য-প্রকৃতির সঙ্গে অপরা প্রকৃতির যে-ভেদ, অবিদ্যাকল্পিত বিভক্তপ্রত্যয়ের তা-ই হল চরম কোটি। বিদ্যা-অবিদ্যার মিথুনলীলা আধার হতে দূর হয়নি, এখনও তা চিৎ-সত্তার বিকল বাহনরূপে কাজ করছে—এমন অবস্থাতেও পরা শক্তি বা পরমা প্রকৃতি আমাদের মধ্যে লীলায়িত হতে পারেন, এমন-কি তাঁর ক্রিয়ার সংবিৎও আমাদের জাগতে পারে। কিন্তু তবু অপরা প্রকৃতির দ্বারা অধ্যুষিত দেহ-প্রাণ-মন তাঁর জ্যোতি ও বীর্যকে পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না বলে তাঁর আবেশ আধারে তখন কাজ করে স্তিমিত ও গুণীভূত হয়ে। কিন্তু একে তো আমাদের পরম সিদ্ধি বলতে পারি না। পুরুষোত্তমের পরমা প্রকৃতির দিব্যভাবে ও দিব্যবীর্যে আধারের সব-কিছু আবার নতুন ছাঁচে ঢালা হবে—এই তো আমাদের কাম্য। কিন্তু সত্তার এই সহস্রদল মহিমা সিদ্ধ হবে না, যদি আধারের ক্রিয়াশক্তিতে রীতের রূপান্তর না ঘটে। প্রকৃতির সমগ্র ধারায় ঊর্ধ্বগপরিণামের অধ্যুষ্য সংবেগ আনতে হবে—শুধু আধারের এখানে-সেখানে দু-চারটি প্রদীপ জেলে ভিতরে-ভিতরে একটুখানি অদল-বদলের ব্যবস্থা করলেই চলবে না। এক শাশ্বত ঋত-চিতের দেববীর্য আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে প্রাকৃতধারাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করবে—নিজের সত্তা জ্ঞান ও ক্রিয়ার উজানধারাতে রূপান্তরিত করবে তাকে। তখনই এক স্বতঃস্ফূর্ত সত্যসংবিৎ সত্যসঙ্কল্প সত্যবেদনা সত্যস্পন্দ ও সত্যকৃতি হবে আমাদের আত্ম-প্রকৃতির সত্য ও সম্যক ছন্দ।